

اشْرَافُ الْقُلُوبِ

# আশরাফুল হিদায়া

[বাংলা]

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস, শেখ জুব্বারুল দারুল

কুব্বান শামসুল উলুম জামিয়াতুল মাদরাসা, ঢাকা-১২১১

মাওলানা আব্দুর রায়্যাক আল-হুসাইনী

মাওলানা মুহাম্মদ আবু মুসা

মাওলানা মামুনুর রশীদ

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নব্বন্ধ হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

# আশরাফুল হিদায়া

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

---

হাদিয়া : ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]



## নাহ্মাদুল্ ওয়া নুসাল্লি ‘আলা রাসূলিলি কারীম।

হাম্দ ও সালাতের পর ফিক্‌ শাস্ত্রে সর্বজনবিধিত, সুবিখ্যাত গ্রন্থ আল্লামা শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল ফারগানানী আলমুরগীনানী (র.) (মৃত: ৫৯৩ হি.) কর্তৃক বিরচিত হিদায়া-এর পরিচয় সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও পাঠক সমাজের নিকট নতুন করে তুলে ধরার কোনো অবকাশ রাখে না। এটা স্ব-স্থানে মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সকল মায়হাবের আলোচনা-পর্যালোচনা, নকলী ও আকলী দলিলের সমন্বয়ে সংকলিত আপন মর্যাদায় উদ্ভাসিত এক অনন্য গ্রন্থ। প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সকল মাদ্রাসায় এটি পাঠ্যসূচির শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। মূলত হিদায়া কিতাবখানাতে ইলমে ফিক্‌হের প্রয়োজনীয় সকল বিধানাবলির বিশদ ব্যাখ্যা সুচারুরূপে প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীগণ ও পাঠক সমাজের পক্ষে এ সুবিখ্যাত গ্রন্থের সরাসরি অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ জাতীয় কিতাব বাংলাদেশে এটাই প্রথম। ইসলামিয়া কুতুবখানা এ মহাগ্রন্থটির ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী ইলম পিপাসু পাঠক মহলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিকাশের গৌরব অর্জন করেছে মাত্র।

পূর্বাপরের সকল প্রশংসাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। কেননা তাঁরই অশেষ কৃপায় আমরা এ মহান উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হয়েছি। আশা করি এটা আসাতিয়ায়ে কেরাম ও কোমলমতি তাল্লেবে ইলমদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানান। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিশেষ করে চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম আলহাজ হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী, মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতি আব্দুর রায়যাক, মুহাদ্দিস মাওলানা আবু মুসা ও মাওলানা মামুনুর রশীদ তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। “জাযাহ্‌মুল্লাহ্‌ খায়রান ফিদ-দারাইন।” আর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি—তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!!



# সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>ইলমে ফিক্‌হের ভূমিকা</b>		হিদায়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও এর মর্যাদা .....	৭৪
ফিক্‌হের সংজ্ঞা ও পরিচিতি .....	৭	হিদায়া প্রণেতার অনুসৃত নীতি ও পরিভাষা .....	৭৬
কুরআন-হাদীস এবং ফিক্‌হের পারস্পরিক সম্পর্ক .....	৮	মুকাদ্দামাতুল কিতাব .....	৭৯
ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা .....	১০	<b>كتاب الطهارة</b>	
ফিক্‌হের সূচনা ও ক্রমবিকাশ .....	১৩	<b>অধ্যায় : তাহারাতি</b> .....	৮৫
প্রথম যুগ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক যুগ .....	১৪	অনুচ্ছেদ : অজু ভঙ্গের কারণসমূহ .....	১০৮
দ্বিতীয় যুগ : কিবাবে সাহাবায়ে কিরামের যুগ .....	১৮	অনুচ্ছেদ : গোসল .....	১১৯
তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা ও তাবিঈনে		পরিচ্ছেদ : যে পানি দ্বারা অজু জায়েজ এবং	
কেরামের যুগ .....	১৯	যে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয় .....	১২৮
চতুর্থ যুগ : ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও		অনুচ্ছেদ : কুয়ার বর্ণনা .....	১৫৪
ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিক্‌হ		অনুচ্ছেদ : উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির বিবরণ .....	১৬৫
এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ .....	২৯	পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের বিবরণ .....	১৭৮
পঞ্চম যুগ : ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার		পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসাহ করার বিবরণ .....	১৯৮
পূর্ণাঙ্গতা তাকলীদের যুগ এবং ইলমে		পরিচ্ছেদ : হায়েম ও ইসতিহাযা .....	২১৪
ফিক্‌হ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ .....	৩৮	অনুচ্ছেদ : মুসতাহাযা .....	২২৯
ষষ্ঠ যুগ : খালিস তাকলীদের যুগ .....	৪২	অনুচ্ছেদ : নিফাস .....	২৩৪
ফিক্‌হ চতুষ্ঠয়ের সূচনা ও বিকাশ .....	৪৮	পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে	
ইমাম আবু হানীফা (র.) : জীবন ও সাধনা .....	৫০	পরিভ্রতা অর্জন .....	২৩৮
ফিক্‌হে হানাফীর বেশিষ্টা .....	৬০	পরিচ্ছেদ : ইস্তিনজা .....	২৫৭
ফিক্‌হে হানাফীর দলিল .....	৬০	<b>كتاب الصلوة</b>	
ফিক্‌হে হানাফী ও হাদীস .....	৬৩	<b>অধ্যায় : নামাজ</b> .....	২৬২
তাকলীদ : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা .....	৬৯	পরিচ্ছেদ : নামাজের সময়সমূহ .....	২৬৫
ফকীহ ও মুজতাহিদগণের শ্রেণী বিন্যাস .....	৭১	অনুচ্ছেদ : নামাজের মোস্তাহাব সময় .....	২৭৪
ফিক্‌হে হানাফীর বিভিন্ন পরিভাষা .....	৭২	অনুচ্ছেদ : নামাজের মাকরুহ সময় .....	২৭৯
হিদায়া প্রণেতার জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি .....	৭৪	পরিচ্ছেদ : আযানের বর্ণনা .....	২৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : নামাজের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ .....	৩০৬	পরিচ্ছেদ : তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ .....	৫৬৩
পরিচ্ছেদ : নামাজের ধারাবাহিক বিবরণ .....	৩২০	পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাজ .....	৫৭৬
অনুচ্ছেদ : কিরাআত .....	৩৭৩	পরিচ্ছেদ : সালাতুল জুমুআ .....	৫৯৩
অনুচ্ছেদ : ইমামত .....	৩৮৭	পরিচ্ছেদ : দুই ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) -এর বিধান .....	৬১৬
পরিচ্ছেদ : নামাজের মধ্যে হাদাস হওয়া .....	৪১৬	অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাশরীক .....	৬২৯
পরিচ্ছেদ : যা নামাজকে ভঙ্গ করে এবং যা নামাজকে মাকরুহ করে .....	৪৩৪	পরিচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফ .....	৬৩৪
অনুচ্ছেদ : নামাজের মাকরুহ .....	৪৫২	পরিচ্ছেদ : ইসতিসকা-এর নামাজ .....	৬৪০
অনুচ্ছেদ : বিবিধ মাসাইল .....	৪৬৫	পরিচ্ছেদ : ভয়কালীন নামাজ .....	৬৪৪
পরিচ্ছেদ : সালাতুল বিতর .....	৪৬৮	পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাজ .....	৬৪৯
পরিচ্ছেদ : নফল নামাজ .....	৪৭৬	অনুচ্ছেদ : কাফন পরান .....	৬৫৬
অনুচ্ছেদ : কিরাআত সংক্রান্ত .....	৪৮৩	অনুচ্ছেদ : মাইয়েতের উপর নামাজ আদায় .....	৬৬০
অনুচ্ছেদ : কিয়ামে রামাজান .....	৫০১	অনুচ্ছেদ : জানাযা বহন করা .....	৬৭২
পরিচ্ছেদ : জামাআত পাওয়া বা তাতে शामिल হওয়ার মাসাইল .....	৫০৬	অনুচ্ছেদ : দাফন .....	৬৭৪
পরিচ্ছেদ : কাজা নামাজের বিবরণ .....	৫২১	পরিচ্ছেদ : শহীদের বিবরণ .....	৬৭৭
পরিচ্ছেদ : সাজদায়ে সাহ্ব-এর বিবরণ .....	৫৩০	পরিচ্ছেদ : কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করা .....	৬৮৫
পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ .....	৫৫৩		

## ফিক্‌হের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

ফিক্‌হ (فقه) শব্দটি আরবি। এটি বাবে سَمِعَ ও كَرَّمَ হতে ব্যবহৃত হয়। বাবে سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়- كَرَّمَ اللهُ رُوحَهُ فِيهِمْ فَأَيُّ عِلْمٍ عَلِمُوا আর كَرَّمَ اللهُ رُوحَهُ فِيهِمْ فَأَيُّ عِلْمٍ عَلِمُوا থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ হওয়া। যেমন বলা হয়- فَتَنَّا نَفْسَهُ وَهُوَ قَبِيلٌ مِّنْ قَوْمٍ فَتَهَا-

— [লিসানুল আরব-১৩ তম খণ্ড; পৃঃ ৫২২।

প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুকাররাম ইবনে মনযূর (র.) বলেন, **اَلْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الرَّبِّينِ لِيَسَادَتِهِمْ وَتَرْفِيهِمْ وَفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ اَنْوَاعِ الْعِلْمِ**। ফিকহ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হলো, কোনো কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। পরে অন্যান্য ইলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর শর'ই ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব, ফজিলত ও মাহাত্ম্যের কারণে এর ব্যবহার শর'ই ইলমের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে হতে থাকে। [লিসানুল আরাব প্রাপ্ত]

শায়খ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হামকাফী (র.) দূরবল মুখতার কিতাবে উল্লেখ করেন যে، فَاَلَيْفُ لَعْنَةُ الْعِلْمِ ফিক্বাহ শব্দের  
 بِالنَّسْرِ ثُمَّ حَصَّ يَعْلَمُ الشَّرْعَ وَتَبَّى بِالْكَسْرِ فَهِيَ عِلْمٌ وَتَفَهُ بِالضَّمِّ فَقَاءَةٌ صَارَ قِيَّتَهَا  
 অভিধানিক অর্থ হলো— কোনো কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও জানা। পরে তা শর'ঈ বিষয়াদি জানার সাথে খাস হয়ে  
 যায়। এ শব্দটি مِنْ بَابٍ سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর مَضَرٌّ (ক্রিয়ামূল) وَفَهًا অর্থ— সে জেনেছে বা জ্ঞাত  
 হয়েছে। আর مِنْ بَابٍ كَرَّمَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর مَضَرٌّ হবে فَقَاءَةً অর্থ—সে ফকীহ হয়েছে।

—[শাসী-১ য খণ্ড; পৃ: ১১৮]

আল্লামা ইবনে নুজায়ম (র.)ও তৎপ্রণীত আল বাহরুর রায়িক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

—[আল্ বাহুরুর রায়িক ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩]

আল্লামা রশীদ রিয়া মিশরী (র.) তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দটি কুরআন মাজীদের বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে এটি গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইলমের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিভাষায় : ফিকহ কাকে বলা হয়; এ সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। উসূলবিদ ওলামায়ে কেরামের মতে, **الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ الْمُكَتَسَبِ مِنْ أَدْوِيَّتِهَا النَّفْصِيَّةِ**।  
 শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরিয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিকহ বলা হয়।

এ সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমাণাদি বলে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস তথা শরিয়তের দলিল চতুষ্টয়কে বুঝানো হয়েছে। — [শাযী ১ম খণ্ড: ১১]

ফিক্‌বদ (فِقْهَاءُ) ওলামায়ে কেরামের মতে, حِفْظُ الْفُرُوعِ অর্থাৎ শরিয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হকুম আহকামের সংরক্ষণ করাকে ফিক্‌হ বলা হয়। সূফী সাধকদের মতে, الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিক্‌হ। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, أَلْفَيْهِ الرَّاهِدُ فِي الذَّنْبِ الرَّابِعُ فِي أَلْفَيْهِ الْأَخْرَجَ الْبَصِيرُ بِدِينِهِ الْمُدَارِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ যে ব্যক্তি পরকালমুখী কিন্তু ইহকাল বিমুখ, কিন্তু দীনের প্রতি বসীরত সম্পন্ন অর্থাৎ সতর্ক দৃষ্টা বা প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত, এ জাতীয় ব্যক্তিকে ফক্‌হী বলা হয়। — [শাখী ১ম খণ্ড; পৃঃ ১২০]

إِنْفَهَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَوَّلِيَّتِهَا (র.) ফিক্‌হের সংজ্ঞায় বলেন, الشَّرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরিয়তের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়। — [আল্ ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ— ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৬]

ইমাম আ'যম ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, نَفْسٌ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا (র.) বলেন, সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয়; তা সহ নফস সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়। এ সংজ্ঞায় وَعِنْدَ دَائِرَةِ وَعِنْدَ دَائِرَةِ তথা আকীদা-বিশ্বাস وَعِنْدَ دَائِرَةِ তথা আখলাক ও তাসাউফ এবং وَعِنْدَ دَائِرَةِ তথা সালাত, সওম, বেচাকেনা ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত ইল্মের নাম হয় “ইল্মুল কালাম”। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ইল্মের নাম হয় “ইল্মুত তাসাউফ” এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় “ইল্মুল ফিক্‌হ”। — [আল্ ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ— ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৫—১৬]

ইল্মে ফিক্‌হের مَوْضُوع (বিষয়বস্তু) ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য :

ইল্মে ফিক্‌হের مَوْضُوع বা আলোচ্য বিষয় হলো فِعْلُ الْمَكْلَبِ অর্থাৎ মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান (عَاقِل) মানুষের কর্ম ও আমল। অর্থাৎ যেহেতু বালেগ, জ্ঞানবান ও মুকাল্লাফ, মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়ে এই ইল্মের মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত; মোস্তাহাব; মুস্তাহসান, মুবাহ; জায়েজ, নাজাজেজ, হালাল, হারাম, মাকরুহ তাহরীমী ও মাকরুহ তানযীহী ইত্যাদির থেকে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তা নির্দেশ করা হয়; তাই মুকাল্লাফ মানুষের কর্ম এবং আমলই এই ইল্মের مَوْضُوع বা বিষয়বস্তু। আর এই ইল্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো, الْفَوْرُ يَسْعَادَةُ الدَّارَيْنِ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কামিয়ারী ও সফলতা অর্জন করা।

— [আল ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ— ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৭]

### কুরআন-হাদীস এবং ফিক্‌হের পারস্পরিক সম্পর্ক

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ফিক্‌হ কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত আমলী শরিয়তের বিধি-বিধানের নামই হচ্ছে ফিক্‌হ। মাতা-পিতার সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক কুরআন হাদীসের সাথেও ফিক্‌হের সেই একই সম্পর্ক। কুরআন ও হাদীস হলো শরিয়তের أَصْل বা মূল। আর ফিক্‌হ হলো, এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। ইলাহী হিদায়েত ও নববী শরিয়তের বাস্তবরূপ হলো এই ফিক্‌হ। ফিক্‌হ কুরআন ও হাদীসেরই বাস্তব ভিত্তিক ব্যাখ্যা। ফিক্‌হ ব্যতিরেকে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়িত করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। মাসাইলে গায়রে মানসূসা (مَسَائِلُ غَيْرِ مَنْصُوصَةٍ) তথা যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই সে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে ফিক্‌হের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিরেকে কোনো গতান্তর নেই। এমনকি মাসাইলে মানসূসা (مَسَائِلُ مَنْصُوصَةٍ)-এর মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিক্‌হের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আলিমগণ ফিক্‌হের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন فَتَاهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ (র.) ফিক্‌হের সংজ্ঞায় বলেন, الشَّرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়তের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী-শরিয়তের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকেই ফিক্‌হ বলা হয়। কাজেই ফিক্‌হকে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু ভাবার আদৌ কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ এলা যায় যে, দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে; তেমনি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে ফিক্‌হ মিশে ছিল। নুনিপুণ গোয়াল যেমন তার সাধনা ও মেহনতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেয়; তেমনি ফকীহগণও কুরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত ছিল দীর্ঘ-সাধনা ও গবেষণা করে সেগুলোকেই তারা উম্মতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে ফিক্‌হের নামে পেশ করেছেন। যেমন- অণু-পরমাণুতে এটোমিক শক্তি পূর্ব

হতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণার পর আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন যে, এতে এটোমিক শক্তি রয়েছে। অতএব বিজ্ঞানীদের গবেষণা যেমন নুতন কিছু সৃষ্টি নয়, এমনিভাবে ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবনও কুদ্দুস হাদীসের বিপরীতে আলাদা নুতন কিছুর জন্ম দেওয়া নয়। মূলত কুরআন-হাদীসেরই সহজ রূপায়ন হলো এই ফিকহ। কাজেই দ্বিধাহীন চিন্তে বলা যায় যে, ফিকহের উপর আমল করা প্রকারণের কুরআন ও হাদীসের উপরই আমল করা। এ কারণেই ফিকহ হাসিল করার জন্য কুরআন ও হাদীসে বহু তাকিদ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে— وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ আভিয়ানে বের হওয়া সমীচীন নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিকহ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে; যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়। [৯-১২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জবান থেকেও ফিকহের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্বন্ধে বহু হাদীস বিবৃত হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: مَنْ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَلْيَنْفِقْ فِي الدِّينِ আদ্বাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ফিকহ তথা জ্ঞান দান করেন।

—[মিশকাত; পৃঃ ৩২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন— النَّاسُ مَعَاوِدٌ كَمَعَاوِدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ سَوَاءٌ سَوَاءٌ سَوَاءٌ سَوَاءٌ সোনা-রূপার খনিরাজির ন্যায় মানুষও খনিতুল্য। তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামি যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। যদি তারা ফিকহ তথা দীনের ইল্ম হাসিল করে থাকে

—[প্রাগুক্ত]

তিনি আরো ইরশাদ করেন— إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رَجُلًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَلِذَا آتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا হতে লোকজন দীন বিষয়ে ফিকহ হাসিল করার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে। — [মিশকাত; পৃঃ ৩৪]

আরো ইরশাদ হয়েছে, أَحَدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفَيْ عَابِدٍ একজন ফকীহ শয়তানের পক্ষে হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষাও ভয়ংকর। — [প্রাগুক্ত]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, مَا عَيْدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشَىٰ أَفْضَلُ مِنْ فَيْهِ فِي الدِّينِ وَلَفَيْهِ وَاحِدٌ বান্দা! আদ্বাহ তা'আলা যত ইবাদত করে তন্মধ্যে ফিকহ ফিন্দীন তথা দীন বিষয়ে ফিকহ ও ইল্ম হাসিল করাই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। একজন ফকীহ শয়তানের পক্ষে হাজার আবিদের অপেক্ষায়ও ভয়ংকর। আর প্রত্যেক জিনিসেরই একটি গুণ রয়েছে, দীন ইসলামের গুণ হলো ফিকহ। — [আওয়ারিফুল মা'আরিফ-১ম খণ্ড; পৃঃ ২২৫]

এক হাদীসে আছে, فَكَيْفَ مَجْلِسُ فَيْهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ফিকহী মজলিস অর্থাৎ ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা, ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

—[আছারুল ফিকহিল ইসলামী-১ম খণ্ড; পৃঃ ৮৬]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَدُودُوا তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই ফিকহ হাসিল করে নাও।

—[বুখারী শরীফ-১ম খণ্ড; পৃঃ ১০]

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া করে বলেছেন- **اللَّهُمَّ فَتِّهِ فِي الدِّينِ** একদা রাশূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া করে বলেছেন- **اللَّهُمَّ فَتِّهِ فِي الدِّينِ** হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের ফিকহ দান করুন এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্ম দান করুন। — [বুখারী শরীফ-১ম খণ্ড]

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহর বাণী **كُونُوا رَبَّانِيِّينَ** -এর ব্যাখ্যা বলেন, **فَهَاءَ** , **كُونُوا حُكَمَاءَ** অর্থাৎ তোমরা বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহ হও।

— [বুখারী শরীফ-১ম খণ্ড; পৃঃ ১৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ফিকহ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু নয়; বরং তা এমন একটি বিষয় যার শিক্ষার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ও অনুমোদন রয়েছে। কাজেই ফিকহ শাস্ত্রে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্নতর কিছু বলে আখ্যায়িত করা চরম মূর্থতা এবং অর্বাচীনতারই শামিল।

### ফিকহের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিণীম। কুরআন ও সুন্নাহর পরই ফিকহের স্থান। শামী গ্রন্থের ভূমিকা অংশে উল্লেখ রয়েছে যে, **إِنَّ أُمَّةَ الْإِسْلَامِ لَا حَيَاةَ لَهَا بِدُونِ الْفِقْهِ إِذْ هُوَ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ** ফিকহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন। ফিকহ ব্যতীত এ উম্মাহের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার কেন্দ্র ভূমিই হচ্ছে এই ফিকহ। — [শামী-১ম খণ্ড; পৃঃ ২২]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হাদীস বুঝাও ফিকহ বুঝার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে ওহি নাজিলের কালেই কুরআন মাজীদে ফিকহ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এমনভাবে হাদীসের মধ্যেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত হয়েছে। দরসগাহে নববী থেকে তা'লীম প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ফিকহ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। হাদীসের কিতাবে এর বহু নজীর বিদ্যমান রয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আহযাব (খন্দকের) যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী কারীম ﷺ বলেছেন, বনী কুরায়যার মহত্মা না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। **(لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)**। পথমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই সালাত আদায় করব। কেননা নবী কারীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি তাদের কোনো দলেরই তিরস্কার করেননি। — [বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড; পৃঃ ৫৯১] এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, একদল সাহাবী **لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ** হাদীসের শব্দের ওপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর ইল্লাত (عِلَّتْ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, হযরত ﷺ-এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও এখানে সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তারা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধা বিভক্তি এবং তাদের দুইভাবে আমল করার সংবাদ নবী কারীম ﷺ-কে জানানো হলে তিনি যাহিরী হাদীসের ওপর আমলকারীদেরকেও কিছু বলেননি এবং হুকুমের ইল্লাত (عِلَّتْ) বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাদেরকেও কিছু বলেননি। এমনভাবে হাদীসের কিতাবে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামনের গভর্নর করে সেখানে পঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন **يَا مُعَاذُ مَا تَقْضِي بِنَا مُعَاذُ** হে মু'আয! তুমি কিসে ঐ জিন্তে কি কি বিস্বাসের ফয়সালা করবে? জবাবে



তিনি বলেছেন, بِكَتَابِ اللَّهِ কুরআন মাজীদেদে দ্বারা। অতঃপর নবী কারীম ﷺ বললেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব। নবী কারীম ﷺ পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তাতেও তা না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي তখন আমি আমার রায় এবং ফিকহের দ্বারা ইজতিহাদ করব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ بِمَا সাকল প্রশংসা এ আল্লাহর যিনি তার রাসূলের রাসূল তথা প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তৌফিক দান করেছেন যে ব্যাপারে রাসূল সন্তুষ্ট আছেন।—[মুসনাদে আহমাদ]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার দু'জন সাহাবী সফরে বের হলেন। পশ্চিমদিকে সালাতের সময় হলো। তখন তাদের নিকট কোনো পানিই ছিল না। তাই তাঁরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাজের সময় বাকি থাকতেই তারা পানিও পেয়ে গেলেন। তখন তাদের একজনে অজু করে সালাত দোহরিয়ে নিলেন; কিন্তু অপরজন অজু করলেন না এবং সালাতও দোহরালেন না। অতঃপর সফর শেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাঁকে জানালেন। সব কথা শুনে তিনি “যে ব্যক্তি অজু ও সালাত দোহরায়নি” তাকে বললেন, أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجْرَ أَنْتَ صَلَوَتِكَ তুমি সুন্নত মুতাবিক কাজ করছে এবং তোমার আদায়কৃত নামাজই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অজু করে তার সালাত দোহরিয়ে নিয়েছিলেন তাকে বললেন, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব।—[সুন্নে আবু দাউদ; ১ম খণ্ড]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব সাহাবী ফিকহের ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত ওমর, হযরত আয়িশা, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল, হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত, হযরত আবু মুসা আশ'আরী, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় ফিকহ ছিল, ফিকহের চর্চা ছিল কিন্তু ফিকহ শাস্ত্রের বর্তমান রূপ ছিল না। তা ছাড়া ইসলামি অহকামের প্রকারভেদ তথা ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের কোনো বিতর্কও তখন হতো না; বরং তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করেই চলতেন। কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী কারীম ﷺ তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনে সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে কোনো ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়নি এবং প্রণীতও হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর ইসলাম যখন দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন তাহযীব ও তামাদুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য-নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন ও হাদীসের উপর নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীস মন্বন করে আমলী শরিয়তের যে সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয় তাই হচ্ছে ফিকহ। এ ছাড়াও আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা ফিকহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

১. কুরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিধি-বিধান এতে নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুরআন ও হাদীসে নামাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি কারো নামাজে ভুল হয় অথবা কোনো আমল ছুটে যায় তাহলে এ কথা বলার কোনো উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কী? এবং কিভাবে এর প্রতিকার করতে হবে। এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধানও আবশ্যিক।

২. কুরআন মাজীদে কোনো কোনো স্থানে বাহ্যত বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা: **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُدْعَوْنَ لِلْغَيْبِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ أَمْرًا كَثِيرًا وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُسَوِّدٌ** (হুদ: ২০)। আবার সূরা তালকের এক আয়াতে উল্লেখ আছে, **وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** আর গর্বতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। [৬৫-৪]

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে মহিলার স্বামী মারা যাবে তার ইদতকাল হবে চারমাস দশদিন। চাই সে গর্ববতী হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ববতী মহিলার ইদতকাল হলো, সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে উপরোক্ত আয়াত দুটো থেকে কোনো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরি। কেননা আল্লাহর কালামে বৈপরীত্য থাকতে পারে না।

৩. অনুরূপভাবে এক আয়াতে রয়েছে, **وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَاصْنَعُوا لَهُ قُرْآنًا شَبِيحًا** কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে। [৭০-২০] আর অপর আয়াতে রয়েছে **وَأَنصِتُوا** যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিচুপ হয়ে থাকবে। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। [৭-২০৪] এই দুই আয়াতের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাজে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই কিরাআত পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের তিলাওয়াত কালে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে, নিজে কুরআন তিলাওয়াত করবে না। এই দুই আয়াতের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য।

৪. কখনো কখনো কুরআন এবং হাদীসের হুকুমের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, **وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَاصْنَعُوا لَهُ قُرْآنًا شَبِيحًا** কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ হয় পাঠ করবে। [৭০-২০] অথচ হাদীস শরীফে রয়েছে, **لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না। — [মিশকাত; পৃঃ ৭৮] আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাতে ফাতিহা পড়া জরুরি নয়। কুরআন মাজীদে যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই নামাজ হয়ে যাবে। অথচ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এই দুই নসের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি দেখা যায়। এতদুভয় নসের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যিক।

৫. এমনিভাবে দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক হাদীসে আছে; **لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত হয়নি। — [মিশকাত; পৃঃ ৭৮] অপর এক হাদীসে আছে, **كَانَ لَهُ إِمَامٌ قَرَأَ لَهُ الْأَمَامَ لَهُ قَرَأَ** সালাতে যার ইমাম রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতের সাথে সালাত আদায় করছে, ইমামের কিরাআতই তার জন্য কিরাআত অর্থাৎ তাকে আর ভিন্নভাবে কিরাআত পড়তে হবে না। — [সুনানে ইবনে মাজাহ; পৃঃ ৬১] এ দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদুভয়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যিক।

৬. কুরআন মাজীদ এবং হাদীস শরীফে একাধিক অর্থবোধক শব্দও বহু ব্যবহৃত হয়েছে যা সামঞ্জস্য বিধানের দাবি রাখে। অন্যথায় আয়াত এবং হাদীসের উপর আমল করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, **وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّيْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ** তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুর (قُرُوء) পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে। [২:২২৮] আভিধানিক অর্থে কুর (قُرُوء) শব্দটি ঋতু (حَيْض) এবং পবিত্রতা (طَهْر) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এ শব্দটি এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই অপরিহার্য।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالشَّيْطَانَ** যে ব্যক্তি জমি বর্ণা দেওয়া থেকে বিরত থাকে না সে যেন আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে।— [সুনানে আবু দাউদ; পৃঃ ৪৮৩]

**مَخَابِرَة** অর্থ জমি বর্ণা দেওয়া। জমি বর্ণা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন পদ্ধতি নিষিদ্ধ এখানে এর স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। অথচ হাদীসের উপর আমল করতে হলে এর স্পষ্ট বর্ণনা আবশ্যিক।

৭. স্থান-কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে নুতন সমস্যার উদ্ভব হয়। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তাই এ জাতীয় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও অত্যাাবশ্যিক।

৮. আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কুরআন সুন্নাহ হতে সরাসরি মাসআলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন মাজীদেবর শানে নুযূল এবং হাদীসের শানে উরুদ জানতে হবে। জানতে হবে কোনটি খাস, কোনটি আম, কোনটি মুজমাল, কোনটি মুফাস্সাল, কোনটি মুহকাম, কোনটি মুতাশাবিহ কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসুখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় নুসুস থেকে মাসআলা উদ্ভাবন ও **اِسْتِنْبَاط** করা সম্ভব হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীস কিংবা এক আয়াত ও এক হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত বাহ্যিক অসঙ্গতি নিরসন করা এবং সূট ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান অত্যাাবশ্যিক হয়ে দেখা দিলে ফকীহগণ ইসলামি আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীস মন্বন করে প্রণয়ন করেন ইসলামি আইন শাস্ত্রের এক মহামূল্যবান ভাণ্ডার যা আজ ইলমে ফিক্হ নামে পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তে ফিক্হ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য তেমনিভাবে ইসলামি জীবন যাপনের জন্য ফিক্হ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনে আমলের জন্য “প্রয়োজনীয় ফিক্হ” শিক্ষা করা ফরজে আইন এবং ইলমে ফিক্হে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ফরজে কিফায়।— [আসারুত তাশরী]

## ফিকহের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ইসলামি ফিক্হের মূল উৎস হলো পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ **ﷺ**-এর হাদীস। এই দু' উৎস মূলের ভিত্তিতে কাল পরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলির যে সমাধান ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। প্রাথমিকভাবে যে, ইসলামে ফিক্হের সূচনা এবং ফিক্হের চর্চা ওঠি নাড়িলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালেও এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। যুগজামানার ভিত্তিতে ফিক্হের এ ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা ছয়টি যুগে ভাগ করতে পারি।

১. প্রথম যুগ : রাসুলুল্লাহ **ﷺ**-এর মুবারক যুগ যা তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরি সন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

২. দ্বিতীয় যুগ : কেবারে (كبار) সাহাবায়ে কেরামের যুগ। এই যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমান্তরালে এসে শেষ হয়েছে।

৩. তৃতীয় যুগ : সেগারে (صغار) সাহাবা ও তাবিঈনে কেরামের যুগ। এ যুগ খোলাফায়ে রাশিদীনের সমান্তরালে পর থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভিক পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪. চতুর্থ যুগ : ফিক্হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিক্হ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকায়ে কেরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবিস্কৃত হয়েছেন যাদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাদের সনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিক্হ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিদমত আজাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. পঞ্চম যুগ : ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলীদেবর যুগ এবং ইলমে ফিক্হ মুনাযারার বিষয়ে

পরিণত হওয়ার যুগ। আয়িমায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মছন করে যে সব মাসআলা মাসাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন এ যুগে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক (تَحْكِيك) ও তাফতীশ (تَفْشِيح) -এর ব্যাপারে মুনাযারা এবং বাহাস বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি এ যুগেই সংকলিত হয়েছিল ফিকহ শাস্ত্রের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থরাজি। আব্বাসী খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাতারিদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্য এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

৬. ৬ষ্ঠ যুগ : খালিস তাকলীদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

—তারিখু তাসরী'ইল ইসলামী : শায়খ মুহাম্মদ খিয়রী বেগ; তারিখে ফিকহে ইসলামী; ভূমিকা অংশ; পৃঃ ১৬-১৭।

প্রথম যুগ : রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর মুবারক যুগ :

এ যুগের সূচনা হয় মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে; আর শেষ হয় দশম হিজরি সনে গিয়ে তাঁর ইনতিকালের মধ্য দিয়ে। এ সময়ের যাবতীয় বিষয়ই রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর যাতে পাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন-প্রণয়ন উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফতোয়া, ফারাইয, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব ওহির মাধ্যমে তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময় স্বতন্ত্র ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ সময় ইসলামি ফিকহের উৎস ছিল মাত্র দুটি—(১) কুরআন মাজীদ, (২) রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থাৎ তাঁর হাদীস। উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআনিক বিধান এবং রাসুলে পাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবতারণা হতো না। এমনিভাবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি এবং বিবাদের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না। কুরআন মাজীদে ফিকহের যে সমাধান পেশ করা হয়েছে, এর কতকগুলো তো এমন যা সমাজে অনুপ্রবর্তি ফাসিদ আমল এবং বাতিল চিন্তা-ভাবনার মূলাৎপাটনের নিমিত্তে নাজিল করা হয়েছে, আবার কতক আয়াত এমন যা কারো প্রশ্নের জবাব হিসেবে নাজিল করা হয়েছে। আবার কতক আয়াত এমনও আছে যা কারো প্রশ্নের জবাবে নয়; বরং এমনিই নাজিল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সবের কিছু উদাহরণ নিয়ে প্রদত্ত হলো।

১. হজ এবং ওমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানো (সাঁঙ্গি) ওয়াজিব। এভাবে দৌড়ানোর নিয়ম হযরত ইব্রাহীম (আ.) -এর সময় হতে চলে আসছে। মুশরিক লোকেরা হজ ও ওমরার অনুষ্ঠানাদিতে শিরক ও বিদ'আতের প্রবর্তন করেছিল। তারা এ পাহাড়ঘয়ে দেব মূর্তি স্থাপন করে সাঁঙ্গি সময়ে এগুলো প্রদক্ষিণ করতো। এ কারণে কোনো কোনো সাহাবী বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সাঁঙ্গি করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। এ ভুল আকীদার মূলাৎপাটনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন, **إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ** (সূরাঃ য়ে কেউ কা'বা গৃহের হজ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সাঁঙ্গি করবে তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। [২:১৫৮])

২ হাজার সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। তা সত্ত্বেও কুরাইশগণ আজিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুযদাফিকা উপত্যকায় ৯ম তারিখের উকুফ (অবস্থান) আদায় করতো। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপ অহমিকা পরিহার করে সকলের সাথে আরাফায় অবস্থান করে তথা থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে— **ثُمَّ أَيْدُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তৃত আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [২ঃ১৯৯]

৩. ইনতিকালের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে ছিলেন তাদের কেউ কেউ ইহুদি ধর্মের কোনো কোনো কাজ

পূর্ববৎ করতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাজিল করলেন—  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ - كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ \*  
 করে। এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। নিচয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [২৪: ২০৮]

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল আকীদার মূলেৎপাটন করে সহীহ আকীদা এবং বিতুদ্ধ আমলের তা'লীম প্রদান করা হয়েছে। এভাবে বহু আয়াতে শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবেও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল করেছেন।

৪. যেমন ইরশাদ হয়েছে—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ - فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ — خَيْرٌ وَأَنْ تَخْلَاطُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُلْكُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ  
 الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও, কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; কী ত'রা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত, এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো দুনিয়া ও আখিরাতে সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত! আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [২৪: ২১৯-২২০]

৫. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا  
 تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ -

লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল; এটা অরুচি। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিচয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন। [২: ২২২]

৬. আরো ইরশাদ হয়েছে—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -

পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা (আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। [২: ২১৭]

৭. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন—

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ أَمَرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ

লোকে তোমার নিকট ফতোয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন যে, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি ক তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ; আর যদি ভাই বোন উভয়ে থাকে তবে পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমারা পথভ্রষ্ট হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ তোমাদের পরিত্যক্তভাবে রাখেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বদিক অবহিত। [৪ঃ১৭৬]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -

যেমনভাবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদে ত নাযিল হয়েছে। এমনিভাবে কোনো প্রেক্ষিত বা জিজ্ঞাসা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধি-বিধান সফলিত ত নাযিল করেছেন। পূর্বেও এ কথা বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদে সর্বমোট পাঁচশত আয়াত দ্বারা আহকাম স্ত হয়েছে। (নূরুল আনওয়ার; পৃঃ ৫) যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত; মু'আমলা-মু'আশারা, লেন-দেন, লা-বাণিজ্য, দাওয়াত, জিহাদ, বিবাহ-শাদী, পারিবারিক জীবন; সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, রব ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের এক একটির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াতও নাযিল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদে যে ফিক্‌হ বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি রাখা হয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর না কঠোরতা আরোপ করেননি। [২২:৭৮]

২. **عَدَمُ الْحَرْجِ** অর্থাৎ তাকলীফ তথা শরিয়তের বাধ্য-বাধকতা হ্রাস করা। এটি মূলত

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ ফরজ হওয়ার হুকুম হলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হজ কি প্রতি বছর ফরজ? উত্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমি যদি হাঁ

বলি তবে তা-ই হবে। যে বিষয়ে তোমাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। — [আল কুরআনুল কারীম; টীকা নং ৩৮৫ ই. ফা. বাংলাদেশ]

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরিয়তের তাকলীফ তথা বিধি-বিধানকে কমিয়ে রাখা এটাই শরিয়তদাতার উদ্দেশ্য।

৩. درج ارفاء पर्यायक्रमे शरियतের বিধানে পূর্ণতা দান করা। বহু বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাই। মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদের ব্যাপারে প্রথমে নিম্নের আয়াতটি নাজিল করা হয়। **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ** লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উভয়ের মধ্যেই পাপ রয়েছে। তবে মানুষের জন্য এতে উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। [২:২১৯]

অতঃপর মানুষের মধ্যে যখন মদের কুফল সম্পর্কে কিস্তি সাধনার সৃষ্টি হলো, তখন আরেকটু অগ্রসর হয়ে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** হে মু'মিনগণ! তোমরা মদ্যপানরত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পারো। [৪: ৪৩]

দ্বিতীয় নির্দেশটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হলে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় পর্যায়ে নাজিল করলেন **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا** লোকেরা তোমাদেরকে ফিলিস্তিন হওয়ার পর সাহাবীগণের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ফলে যারা মদ মুখে নিয়েছিলেন তারা তা গুলিয়ে সব মুখ থেকে বের করে দেন। যারা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ছিলেন তারা হাত থেকে গ্লাসটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর যাদের ঘরে মদের মটকা ছিল তারা মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। এতে মদীনার অলিতে গলিতে মদের সয়লাব বইতে লাগল। — [তারিখুত তাশরীইল ইসলামী]

এ আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরামের অন্তর থেকে মদের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। তরবিয়াতের ক্ষেত্রে পর্যাযক্রমে কোনো বিধানকে পূর্ণতা দান করার এ নীতিটি এতই ফলপ্রসূ যে, শেষোক্ত আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ফলে যারা মদ মুখে নিয়েছিলেন তারা তা গুলিয়ে সব মুখ থেকে বের করে দেন। যারা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে ছিলেন তারা হাত থেকে গ্লাসটি ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর যাদের ঘরে মদের মটকা ছিল তারা মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। এতে মদীনার অলিতে গলিতে মদের সয়লাব বইতে লাগল। — [তারিখুত তাশরীইল ইসলামী]

এ পর্যায়ে নামাজের বর্তমান পদ্ধতিটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আমরা যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সালাতের এ পদ্ধতি ছিল না। প্রাথমিক যুগে সালাম কলাম কথাবার্তা এদিক ওদিক তাকানো চলাফেরা করা ইত্যাদি সব কিছুই নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য বৈধ ছিল। পরে যখন সাহাবায়ে কেরাম সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন তখন পর্যাযক্রমে কখনো এদিক ওদিক তাকানো আবার কখনো সালাম কলাম ইত্যাদি একাত্মতা বিনষ্টকারী কাজগুলোকে হারাম করে দেওয়া হয়। শরিয়তকে এভাবে পর্যাযক্রমিক ভাবে পেশ করায় এ নীতি খুবই ফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বা সুন্নাহ; কুরআন মাজীদের মাধ্যমে যেমনিভাবে শরিয়তের বহু বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসের মাধ্যমেও শরিয়তের বহু বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। বলা হয় আহকামাতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১. প্রত্যেক মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এ কথা উল্লেখ পূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন **خَمْسَ صَلَوَاتٍ افترضهنَّ الله** (দৈনিক) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করেছেন। — [নাসাই শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৮০]

২. তিন সময় নামাজ পড়া নিষেধ। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে এক হাদীসে বর্ণিত আছে— **عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْرَأَ فِيهِنَّ**

مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَزْغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَالِمُ الظُّهَيْرِ حَتَّى تَبْعِلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

হযরত উক্বা ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময় এমন যে সময়ে রাসূল ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়তে এবং মৃত লোকদেরকে কবরস্থ করতে (জানাযার নামাজ আদায় করতে) নিষেধ করেছেন। (১) সূর্যোদয়ের সময় যতক্ষণ না তা উপরের দিকে উঠে আসে। (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যতক্ষণ না তা হেলে যায়। (৩) ঠিক সূর্যাস্তের সময় যতক্ষণ না তা পূর্ণাঙ্গভাবে আন্তমিত হয়। — [বলুগুল মারাম; ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৩]

৩. জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالِ غَيْرِ ইমামকে এ জন্যই তো ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে যাতে তার ইজ্তিদা করা হয়। যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে কিরাআত পড়বে তখন তোমরা তা চুপ করে শুনবে। এবং যখন সে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। — [আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ সূত্র মিশকাত; পৃঃ ৮১]

অপর এক হাদীসে আছে— عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ (رض) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَمَعَ هযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত যয়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোনো অবস্থাতেই কিরাআত পড়া যাবে না। — [মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১৫]

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে দীনের সামগ্রিক বিষয়ের বিধি-বিধানই বিবৃত হয়েছে। এ সব হাদীসের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে দীনের তালীম দিয়েছেন এবং তৎকালীন সমাজের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন। মানুষের জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যার মৌলিক সমাধান কুরআন ও হাদীসে নেই।

**দ্বিতীয় যুগ : কিবারে সাহাবায়ে কিরামের যুগ :**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর একাদশ হিজরি সন থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং শেষ হয় তা চল্লিশ হিজরি সনে গিয়ে। আর এ সময়েই খিলাফতের রাশিদানও পরিসমাপ্তি ঘটে। খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগে বিভিন্ন দেশ জয় এবং নানা প্রকার সামাজিকতার সম্পর্কে আসার কারণে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এ সব সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদীস ছাড়া আরো দুটি উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে।

১. সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদীনের সোনালী যুগে যদি মুসলিম সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিতো তাহলে তার সমাধানের জন্য প্রথমে তারা কুরআন ও হাদীসের সিদ্ধান্ত তালিশ করতেন। যদি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে না পাওয়া যেতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একেই ইজমায়ে সাহাবা বলা হয়। এটিই হলো ইজমার গ্রহণ যোগ্যতার মূলভিত্তি। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী কালে ইজমা ইসলামি আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

২. বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত অভিমত। এ যুগে উদ্ভাবিত যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া যেতো না এবং যার সমাধানে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবেও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত পেশ করেছেন। একেই কিয়াসের ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীতে এটিই ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ১৭৫]



তৃতীয় যুগ : সিগারে সাহাবা ও তাবীঈনে কেরামের যুগ :

এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিকালের পর হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল তথা একচল্লিশ হিজরি স্ক থেকে শুরু হয়ে হিজরি প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বিস্তৃত । এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে শরিয়তের হুকুম-আহকাম সুবিন্যস্ত করার তথা ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা চরমভাবে দেখা দেয় । এর কারণ বহুবিদ । নিম্নে তা প্রদত্ত হলে। —

১. এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন তাদের অনেকেই ইসলামি খিলাফতের বি গুল সম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন । অপর দিকে এককভাবে কোনো সাহাবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না । তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য হলেন । এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের রায়ও বিভিন্ন হতে থাকল ।

২. রাজনৈতি কারণে এ সময়ে যে সব চরমপন্থী ও বিপথগামী যথা শিয়া, খারেজী ইত্যাদি ফিরকার উদ্ভব ঘটে, তারা নিজ নিজ আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার কারণেও মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্না দেখা দেয় ।

৩. অনাবল লোকদের বিপুল পরিমাণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া এবং তাদেরও লেখা-পড়া ফতোয়া ফারায়িযের কাজে অংশ গ্রহণ করা । এ কারণেও ফতোয়ার মধ্যে বিভিন্ন্না পরিলক্ষিত হয় ।

৪. এ সময়ে ইসলাম বিদ্বৈশী এবং স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে রচিত জাল হাদীসও মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে । এ সব বানোয়াট এবং জাল হাদীসের কারণেও মাসআলা মাসাইলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় । হাদীস বিশারদদের মতে নিম্নোক্ত কারণে জাল হাদীস রচনা করা হয় । — [তারিখে ফিকহে ইসলাম]

(ক) الْخِلَافَاتُ السِّيَاسِيَّةُ (রাজনৈতিক মতানৈক্য) অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ভ্রান্ত মতের প্রতিষ্ঠা প্রাধান্য এবং নিজেদের আচরিত মতাদর্শকে সপ্রমাণিত এবং জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য জাল হাদীস রচনা করা হয় । এ ক্ষেত্রে রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সবচেয়ে অগ্রগামী । ইমাম মালিক (র.)-কে রাফিযীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর জবাবে বলেছেন— لَا تَكْلِمُهُمْ وَلَا تَرَوْعُهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ (তাদের কথা বলবেন না এবং তাদের লোকে কোনো হাদীসও বর্ণনা করবেন না । কেননা ওরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে ।

১. উল্লেখ্য যে, শিয়া সম্প্রদায়েরই একটি দলকে রাফিযী বলা হয় । এই দলটি হযরত আলী (রা.)-কে মানে কিন্তু প্রথম তিন খলীফাকে মন্দ বলে; বরং তারা নয়; সাত বা পাঁচজন সাহাবী ছাড়া অন্য সকল সাহাবীকে কাম্বির মনে করে । তাদের সম্পর্কে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন,

هَؤُلَاءِ قَدْ قَصَرُوا الْإِسْلَامَ عَلَى تَسَعَةٍ مِنْهُمْ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْعَبْدِ وَكَذَا لَهُمْ فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ اقْوَالٌ قِيلَ زَادَ فِيهِ عُمَانٌ وَكَذَا نَقَصَ عَنْهُ وَقِيلَ نَقَصَ وَلَمْ يَزِدْ وَقِيلَ هُوَ مَحْفُوظٌ عَنْهَا وَهَؤُلَاءِ لَا يَبْتَغِرُونَ بِصَحَّةِ أَحَادِيثِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكُتِبِهِمْ .

অতঃপর আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন,

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ الرَّافِضَةِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ وَالْأَصَحُّ تَكْفِيرُهُمْ وَفِي إِكْفَارِ الْمُلْحِدِينَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَكْفِيرِ مُنْكَرٍ خِلَافَةِ الشَّيْخَيْنِ -

— [মা'আরিফুস সুনা ১ম খণ্ড; পৃ : ১৮৮]

বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিয়া, রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্ব প্রথম জাল হাদীস রচনা করে । উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, রাফিযী সম্প্রদায়ের লোকদের আকীদা এবং দাবি হলো, "নবী কারীম ﷺ বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবায়ে কেরামকে "গাদীয়ে আম" নামক স্থানে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন । তাতে তিনি হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, هَذَا وَصِيَّيَّ وَآخِي (এই (আলী) আমার অসী, আমার ভাই এবং আমার পরবর্তী খলীফা, সুতরাং তোমরা সকলে তার কথা শুনতে এবং তার আনুগত্য করবে । হাদীস নামে প্রচারিত এ বাকাটি আদৌ হাদীস

নয়; বরং এটি নিছক রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্যই মূলতঃ রচিত। হযরত আলী (রা.)-ই নবী কারীম ﷺ-এর পরবর্তী বৈধ খলীফা। এ কথা প্রমাণ করার জন্য শিয়ারা যে কত শত হাদীস জাল করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই কিন্তু তাদের রচিত ও প্রচারিত এসবগুলোই মিথ্যা এবং বানোয়াট।

— [আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী; পৃ : ৮০]

(খ) الرَّزْدَقُ যিন্দীক লোকেরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাল হাদীস রচনা করে। তারা কখনো শিয়া মতবাদের আবরণে, কখনো সুফী বাদের আবরণে, আবার কখনো দর্শনের আবরণে আশ্রয় প্রকাশ করেছে। তাদের রচিত হাদীস যে সর্বত্র মিথ্যা এবং বানোয়াট তা তাদের হাদীস নামে প্রচারিত ব্যাপ্ত থেকেই প্রতীয়মান হয়। যেমন কথিত আছে যে، عَرَفَ عَلَى جَمَلٍ أَوْزَقَ بَصَائِعِ الرُّكْبَانِ وَبَعَائِقِ الْمَشَاةِ আরাফার দিন বিকালে আমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে জমিতে অবতরণ করেন এবং তিনি এখানে এসে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের একটি উটের উপর সওয়ার হয়ে সওয়ারিতে আরোহী হাজীদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং মু'আনাকা করেন। পদব্রজে চলাচলকারী হাজীদের সাথে।

(গ) দলীয়, গোত্রীয়, বংশীয়, ভাষাগত ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তিতেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। এমনকি মায়হাবের বাড়াবাড়ির কারণেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে এ মর্মে জাল হাদীস রচনা করা হলো، سَيَكُونُ رَجُلٌ فِي أَمْنِي يَقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سَيَكُونُ رَجُلٌ فِي أَمْنِي يَقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ أَضَرَّ عَلَى أَمْنِي مِنْ إِبْلِيسَ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে আবু হানীফা নামে এক ব্যক্তির জন্য হবে এবং সে হবে আমার উম্মতের মুকুট। এভাবে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মর্যাদা হ্রাস করতে গিয়ে হাদীস জাল করা হয়। যেমন মাউযুআত গ্রন্থে উল্লেখ আছে— سَيَكُونُ رَجُلٌ فِي أَمْنِي يَقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ هُوَ أَضَرَّ عَلَى أَمْنِي مِنْ إِبْلِيسَ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস নামে এক ব্যক্তির জন্য হবে; সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীসের থেকেও অধিক ক্ষতিকর। এগুলো সবই হচ্ছে মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত।

(ঘ) জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রচার, ওয়াজ-নসিহত দ্বারা জনগণকে ধর্মপ্রাণ বানানো, ইবাদত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী বানানো এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার জন্যও জাল হাদীস রচনা করা হয়।

(ঙ) ইসলামি দর্শন এবং ফিক্হী মতানৈক্যের কারণেও এক ফিক্হের অনুসারী লোকেরা অন্য ফিক্হের বিপক্ষে হাদীস রচনা করে। যেমন বলা হয়، قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ তবে সে কুফরি করল।

(চ) টাকা পয়সা উপার্জনের জন্যও কেউ কেউ সুন্দর সুন্দর ঘটনাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতো। যাতে লোকেরা তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে হাদিয়া তুহফা প্রদান করে।

(ছ) রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য লাভের জন্যও স্বার্থ লোভী লোকেরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস রচনা করে।

(জ) প্রসিদ্ধি লাভের জন্যও একদল লোক জাল হাদীস রচনায় আশ্রয় নিয়োগ করে।

— [আস্ সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃ : ৭৯ - ৮৮]

৫. আহলুল হাদীস এবং আহলুর রায়, এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহলুল হাদীস তথা হাদীস বিশারদ আলিমগণ যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন তারা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। অপর পক্ষে আহলুর রায় তথা ওলামায়ে মুজতাহিদীন যদি কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন তারা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করতেন। এতে ঐ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ইসলামের হেফাজতের লক্ষ্যে শরিয়তের হুকুম-আহকামকে সুবিন্যস্ত করা অর্থাৎ ফিক্হ ও উন্সুলে ফিক্হ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় যুগে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহরে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ফতোয়া দানের জন্য কতিপয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেন্দ্রসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) মাদীনা মুনাওয়ারা, (২) মক্কা মুকাররমা, (৩) কূফা

(ইরাক), (৪) বসরা, (৫) শাম (সিরিয়া), (৬) মিসর, (৭) ইয়ামান। এ সব কেন্দ্রসমূহে যে সকল মুফতিয়ানে কেরাম ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন। পর্যায়েক্রমে তাদের আলোচনা তুল ধরা হলো।

### মদীনা শরীফ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হতে হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত মদীনা শরীফ ছিল মুসলিম জাহানের ফতোয়া প্রদানের বিশেষ কেন্দ্র। এ সময় খলীফাতুল মুসলিমীন ও আমীরুল মু'মিনীনগণসহ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিহ (রা.), হযরত আবু দূসা আশআরী (রা.), হযরত উরাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), হযরত আবুদুদারদা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত মু'আবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

উক্তর আল্লামা খালিদ মাহমুদ বলেন, কম-বেশি সমস্ত সাহাবীই ফকীহ ছিলেন। তবে উচ্চ মানের ফকীহ তাঁদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের অধিক ছিল না। হাফিয ইবনে কায়্যাম (র.)-এর মতে ফতোয়া প্রদানকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা একশত ত্রিশ থেকে কিছু বেশি ছিল। — [আসারুল ফিকাহিল ইসলামী: ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৩-২৪৪]

আল্লামা খিযরী বেগ (র.)-এর মতে তৎকালীন যুগে মদীনা শরীফে যে সব মনীযী ফতোয়া প্রদানের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা এবং নবী কারীম ﷺ-এর সর্ব কনিষ্ঠা জীবন সঙ্গিনী। হিজরতের দু'বছর পূর্বে নবী কারীম ﷺ-এর সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অপর এক বর্ণনা মতে তখন তিনি সাত বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তাঁকে স্বামীর বাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। নবী কারীম ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আঠার বছর। সর্বমোট তিনি নয় বছর নবী কারীম ﷺ-এর মুবারক সুহবতের দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন। হযরত 'আতা ইবনে আবু রাবাহ (র.) বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ফকীহ ছিলেন এবং তাঁর রায়কে সকলের রায়ের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বড় আলিম, ফকীহ এবং কবি হিসেবে আমি আর কাউকে পাইনি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবনসহ ফিকহের সকল অধ্যায়েই তাঁর থেকে কিছু না কিছু হাদীস অবশ্যই পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম দীনি কোনো বিষয়ে সমস্যা পড়লে এর সমাধানের লক্ষ্যে তাঁরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর স্মরণাপন্ন হতেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাগিনা উরওয়া ইবনে যু'বায়ের এবং তাঁর ভতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)-ই তাঁর থেকে সব চেয়ে বেশি রিওয়ায়াত করেছেন। হিজরি ৫৭ সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। — [তারীখে ফিকহে ইসলামী: পৃঃ ২১১]

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) স্বীয় পিতা হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কমবয়স্ক হওয়ার কারণে বদর ও ওহুদে শরিক হতে না পারলেও পরবর্তীতে তিনি খন্দক, মূতা, ইয়ারমুক ইত্যাদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। এমনভাবে মিসর এবং আফ্রিকা বিজয় অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ করে চলতেন। রাসূল ﷺ যে স্থানে সালাত আদায় করেছেন তিনিও সেখানে সালাত আদায় করেছেন, যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন তিনিও সেখানে অবতরণ করেছেন। এমনকি যে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিনজা করেছেন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সেখানে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে পরে উঠে চলে এসেছেন। পরে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের নিমিত্তেই আমি এরূপ করেছি। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ইমাম এবং মুফতি ছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফতোয়া প্রদান করতেন। কতিপয় সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাবিঈদের অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর সাহেবজাদা সালিম এবং আজাদকৃত গোলাম নাকি'ই (র.) তাঁর থেকে অধিক পরিমাণে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ৭৩ হিজরি

সনে ইনতিকাল করেছেন।

৩. **হযরত আবু হুরায়রা (রা.)** : হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নাম আন্দুর রহমান এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সাখর। তিনি ছিলেন দাওস বংশীয় মানুষ। তিনি খায়বার বিজয়ের পর সপ্তম হিজরি সনে মদীনায় এসে ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন থেকে নিয়ে নবী কারীম ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি ছায়ার মতোই নবী কারীম ﷺ-কে অনুসরণ করে চলেছেন। এ কারণেই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য তাঁর অর্জিত হয়। তার থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর জামাতা হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং তাঁর আজাদকৃত গোলাম হযরত আরাজ (র.)-ই তাঁর থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন উচ্চপায়েয় ফকীহ ও আবিদ ছিলেন। এমনিভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি ৫৭ হিজরি সনে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। উপরোক্ত এ মহান তিন ব্যক্তিত্বই তৎকালীন যুগে মদীনা শরীফে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হাদীস ও ফতোয়া বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। মদীনাবাসীদের ইলম তাদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল এবং বড় বড় তাবিঈনে কেরাম তাদের থেকে দীনের তা'লীম হাসিল করেছেন।

মদীনা শরীফে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাবঈগণের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন :

৪. **হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.)** : হযরত ওমর (রা.)-এর দু'বছর পর জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী একজন উচ্চমানের ফকীহ তাবিঈ ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বড় বড় মুফতিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত কাতাদা এবং আলী ইবনে মাদীনী (র.) বলেন, তাবিঈগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের তুলনায় অধিক বড় আলিম এবং ফকীহ আমি আর কাউকে পাইনি। তিনি রাজা-বাদশাহদের দেওয়া হাদিয়া কখনো গ্রহণ করতেন না। দীনি বিষয়ে হযরত হাসান বসরী (র.) কোনো সমস্যা পড়লে পত্রের মাধ্যমে তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট তার সমাধান তলব করতেন। এক বর্ণনা মতে ৯৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. **হযরত উরওয়া ইবনে যু'বায়ের আসাদী (র.)** : উরওয়া ইবনে যু'বায়ের (র.) হযরত উসমান গনী (রা.)-এর খিলাফত কালে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বহু সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং নিজ খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে ফিকহের ইলম হাসিল করেছেন। বস্তুত: তিনি হাদীসের হাফিজ হওয়ার পাশাপাশি একজন ঐতিহাসিকও ছিলেন। হিশাম এবং তাঁর অপরাপর সন্তানগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে ইমাম যুহরী এবং আবু যিনাদ (র.) সহ মদীনার অপরাপর আলিমগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমি তাঁকে জ্ঞানের এমন সাগর হিসেবে পেয়েছি যার জ্ঞান-পানি কখনো শুকায়নি। তিনিও হিজরি ৯৪ সনে ইনতিকাল করেছেন।

৬. **আবু বকর ইবনে আন্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম মাখযুমী (র.)** : হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর জন্ম। তিনি নিজ পিতা এবং অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম যুহরী ও সেগারে তাবিঈদের অনেকে। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, আল্লাহভীরু, দানশীল এবং উচ্চ পর্যায়ের একজন ফকীহ ছিলেন। তাঁকে "রাহিবে কুরায়শ" বলা হতো। তিনি ৯৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেছেন।

৭. **হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আবী তালিব হাশিমী (র.)** : তিনি অধিক ইবাদত গুজার ছিলেন বিধায় তাঁকে যায়নুল আবিদীন (ইবাদতকারীদের শোভা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৮. **হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (র.)** : তিনি হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আকাসা (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তাদের থেকেই তিনি হাদীস এবং ফিকহ হাসিল করেছেন। তিনি হাদীস ও ফিকহের ইমাম হওয়ার পাশাপাশি একজন কবিও ছিলেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত উবায়দুল্লাহ (র.) ইলমের এক সাগর ছিলেন। তিনি ৯৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৯. **হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.)** : তিনি নিজ পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তাঁদের থেকেই তিনি হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, দু'জা বিমুখতা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর

ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল না। তিনি অন্যায়ের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ১০৬ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন। — [তারিখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ১১২-১১৪]

১০. হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) : তিনি হযরত মায়মূনা, হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল হানাফিয়া (র.) বলেন, আমার মতে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকেও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.)-এর নিকট কেউ ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতে আসলে তিনি বলতেন, সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের কাছে যাও। তিনি ১০৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১১. হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (র.) : তিনি স্বীয় ফুফু হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। মূলত তাঁর তারবিয়াত করেছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)। হযরত ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র.) বলেন, আমি মদীনার মধ্যে এমন কোনো লোক পাইনি যাকে হযরত কাসিম (র.)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যায়। আবুয যিনাদ (র.) বলেন, তৎকালীন জমানায় কাসিম (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ এবং হাদীস বিশারদ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, কাসিম (র.) সে যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। ইবনে সাঈদ (র.) বলেন, কাসিম (র.) একজন উচ্চ মানের ফকীহ এবং যাহিদ লোক ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বলেন, আমার শক্তি থাকলে আমি কাসিম (র.)-কে মুসলিম জাহানের খলীফা নিযুক্ত করতাম। তিনি ১০৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেছেন।

১৩. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে যুহরী (র.) : পঞ্চাশ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি খুবই উদার এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য প্রকাশে অকুতোভয়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ইবনে মালিক এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইমাম মালিক, লায়স ইবনে সাআদ এবং হযরত রবীআ (র.) প্রমুখ মনীষী উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ১২৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৫. আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র.) : তিনি হাসান ইবনে মালিক এবং বহু তাবিঈনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, আমার মতে রবীআ (র.)-এর তুলনায় আবুয যিনাদ (র.) বড় ধরনের ফকীহ ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) আবুয যিনাদ (র.)-কে আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস বলতেন। ১৪৩ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. হযরত ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র.) : তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সহ বহু তাবিঈনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (র.) বলেন, আমার মতে তিনি ইমাম যুহরী (র.) থেকেও উত্তম ছিলেন। তিনিও ১৪৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৭. হযরত রবী'আ ইবনে আবু আব্দুর রহমান (র.) : তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সহ বহু তাবিঈনে কেরাম থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হাফিযুল হাদীস হওয়ার পাশাপাশি ফকীহ এবং মুজতাহিদও ছিলেন। ইয়াহুইয়া ইবনে সাঈদ এবং কাযী সিওয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ এবং ইবনে সীরীন (র.) তাঁর প্রজ্ঞা, ইলম এবং দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৩৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

— [তারিখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ১১৫-১১৭]

### মক্কা মুকাররমা

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দিনের জন্য হযরত মু'আয (রা.)-কে সেখানকার মু'আল্লিম ও মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও মক্কা মুকাররমায় আরো পাঁচ মুফতি ফতোয়া প্রদানের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবী আর বাকি চারজন হচ্ছেন তাবিঈ।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) : তিনি হিজরতের দু' বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। ফলে আব্বাস তা'আলা তাঁকে রঈসুল মুফাস্সিরীন বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত

‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একজন শ্রেষ্ঠতম মুফাস্সির ছিলেন। তিনি যদিও আমার মতো বয়সী ছিলেন তবে তাঁর সমুত্ত্বা কেউ ছিল না। মা’মার (র.) বলেন ইবনে আব্বাস, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তাফসীর এবং ফিকহের ক্ষেত্রে মক্কাবাসী লোকদের ইলমের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা.)। তিনি ৬৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. মুজাহিদ ইবনে জুবায়ের (র.) : হযরত মুজাহিদ (র.) ছিলেন একজন বিখ্যাত তাফসীরবিদ। তিনি হযরত সা’দ, হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সুহবতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে কুরআন মাজীদার ইলম হাসিল করেছেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট তিনবার কুরআন মাজীদ খতম করেছি। প্রতিটি আয়াতের তিলাওয়াত শেষে আমি তাঁকে এর মর্ম, এ শানে নুযল এবং এ আয়াতটি কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করতাম। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, তাফসীর বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) অনেক সময় আমার সওয়াবির রিকাব টেনে ধরে আমাকে তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি ১০৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

—[তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২১৮]

৩. হযরত ইকরামা (র.) : তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম এবং শাগরিদ ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ছাড়া হযরত আয়েশা এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। বিশেষভাবে তিনি ফিকহ হাসিল করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট থেকে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার থেকেও বড় আলিম হিসেবে আপনি কাউকে জানেন কি? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। আমার থেকেও বড় আলিম আছেন এবং তিনি হলেন, হযরত ইকরামা (র.)। তিনি ১০৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৪. হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (র.) : হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর মাথার চুল ছিল কিছুটা কঁকড়া। তিনি অত্যন্ত বাগ্মী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, আমি আতা (র.) থেকে উত্তম কোনো মানুষ আর দেখিনি। তিনি সাধারণত নীরব থাকতেন। যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো যেন তাঁকে গায়বীভাবে আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, হে মক্কাবাসী লোকেরা! তোমরা আমার কাছে আসছ অথচ তোমাদের মধ্যে আতার মতো ব্যক্তিত্বও বিদ্যমান আছে। তিনি ১১৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৫. আবুয যুবায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (র.) : তিনি হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন ধীমান ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। হযরত আতা (র.) বলেন, আমরা হযরত জাবির (রা.)-এর নিকট যাতায়াত করতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আমরা এ সম্পর্কে মুযাকারা করতাম। হাদীস হিফজ করার ক্ষেত্রে আবুয যুবায়েরই আমাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। ১২৭ হিজরি সনে তিনি এ নম্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন — [তারীখে ফিকহে ইসলামী]

## কৃফা (ইরাক)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে ইরাক এলাকা? কৃফা ও বসরা নামে দু’টি নতুন শহরের গোড়া পত্তন হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামের এক জামা’আত এই নতুন শহরে বসবাস আরম্ভ করলে খলীফা হযরত ওমর (রা.) ফকীহল উম্মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে কৃফার মু’আল্লিম, মুফতি এবং প্রশাসক নিয়োগ করেন। সেখানে তাঁর দশ বছর অবস্থানকালে স্থানীয় জ্ঞান পিপাসু সবাই তাঁর সন্নিধ্যে এসে জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের মহাসুযোগ লাভ করেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কৃফা।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে ফকীহ সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এই দুই বরণ্যে ব্যক্তিত্ব এবং তাদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দীনের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে কুফা ইলম নগরীর রূপ পরিগ্রহ করে। এই ফলশ্রুতিতে এখানকার বহু মুজতাহিদ এবং তাবিঈনে কেয়াম বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রেখে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হোন। নিয়ে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. হযরত আলকামা ইবনে কায়স নাখঈ (র.) : তিনি নবী কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর, ওসমান ইবনে মাসউদ ও আলী (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ফিকহের ইলম হাসিল করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে। আচার আচরণে তিনি তাঁর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি যা জানি এবং আমি যা পড়ি তা আলকামাও জানে এবং সেও তা পড়ে। ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ এবং মুহাদিস ছিলেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি পরকালমুখী এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। তিনি ৬২ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. হযরত মাসরুক ইবনে আজদা হামদানী (র.) : তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন আমর ইবনে মাদীকারাব (র.)-এর ভাতিজা। হযরত ওমর, আলী এবং ইবনে মাসউদ (রা.)-এর থেকে তিনি ইলম হাসিল করেছেন। প্রখ্যাত বিচারক কাজি শুরায়হ (র.) তাঁর সাথে পরামর্শ করে ফতোয়া দিতেন এবং তিনি তাঁর তুলনায়ও অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬৩ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত উবায়দা ইবনে আমর সালমানী (র.) : তিনি ইয়ামন বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে তিনি ইলম হাসিল করেছেন। হযরত শাবী (র.)-এর মতে বিচার বিষয়ে তিনি কাজি শুরায়হ (র.)-এর সমকক্ষ ছিলেন। ৯২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ (র.) : তিনি হযরত আলকামা (র.)-এর ভাতিজা এবং কুফার বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তিনি হযরত মু'আয এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। ৯৫ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. হযরত শুরায়হ ইবনে হারিস কিনদী (র.) : নবী যুগে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত ওমর, আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার যুগে তিনি কুফার কাজি পদে নিযুক্ত হোন। অব্যাহতভাবে ষাট বছর পর্যন্ত তিনি কাজির পদে বহাল থেকে এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইনতিকালের এক বছর আগে এ পদ থেকে ইস্তিফা দেন। অবশেষে ৭৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ (র.) : তিনি ছিলেন ইরাকের একজন বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আলকামা, মাসরুক, আসওয়াদ (র.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ফকীহ হাম্বাদ ইবনে আবু সালামার তিনি উস্তাদ ছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলতেন, ইব্রাহীম নাখঈ (র.) বিদ্যামান থাকা অবস্থায় তোমরা আমার নিকট ফতোয়ার জন্য আসছ! আমি তো তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো ইলমী কথাই বলি না। তিনি ৯৫ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৭. হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) : তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর শাগরিদ ছিলেন। হজের সময় লোকেরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে কি সাঈদ ইবনে জুবায়ের নেই? তিনি তাঁর সামনে কাউকে অন্যের গিবত করতে দিতেন না। ৯৮ হিজরি সনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাকে শহীদ করে দেয়।

৮. হযরত আমর ইবনে ওরবাহীল শাবী (র.) : তাবিঈগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ফকীহ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফত কালে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত আলী, আবু হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা এবং ইবনে

‘ওমর (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সম্মানিত উস্তাদ ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কৃফার কাজি (বিচারক) ছিলেন। মাকহুল এবং আবু হুসায়ন (র.) বলেন, শা’বী (র.)-এর তুলনায় বড় আলিম এবং ফকীহ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইবনে আবু লায়লা (র.) বলেন, শা’বী (র.) সর্বদা হাদীসের অনুসরণ করে চলতেন এবং তিনি একজন খোশমিযাজ মানুষ ছিলেন। ১০৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

### বসরা

বসরায় অবস্থানকারী যে সব সাহাবী ও তাবিঈ ফতোয়ার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনিযীবৃন্দ হলেন অন্যতম।

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক আনসারী (রা.) : হযরত আনাস (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুহবতে থেকে তার থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)-এর থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) আশিটি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম সত্তর খানা হাদীস তাঁর সূত্রে নিজ উদ্ধৃত করেছেন। আর সম্মিলিতভাবে তাঁরা উভয়েই তার থেকে একশত আটশ খানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ৯৩ হিজরি সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

২. হযরত আবুল আলিয়া রফী ইবনে মিহরান (র.) : তিনি ছিলেন হযরত ওমর ইবনে মাসউদ এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে উঁচু স্থানে বসাতেন। আর কুরায়শ লোকেরা বসাতেন এর থেকে কিছুটা তুলনামূলক নিচু স্থানে। ৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত হাসান ইবনে আবুল হাসান সায়্যার (র.) : মদীনা শরীফে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয সমাপ্ত করে নেন। অতঃপর জিহাদ এবং ইলম ও আমলের ময়দানে বাণিয়ে পড়েন। তিনি একজন বড় ধরনের মুজাহিদ ছিলেন। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইবনে সাঈদ (র.) বলেন, তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ আলিম এবং বাগ্মী ব্যক্তি ছিলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে এবং হকের পক্ষে তিনি ছিলেন চির সোচ্চার। তিনি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। তিনি হক কথা বলতে কারোই তোয়াক্কা করতেন না। ১১০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. হযরত আবুশ শা’সা জাবির ইবনে যায়েদ (র.) : তিনি বসরার বিশিষ্ট ফকীহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিশেষ শাগরিদ ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমাদের মাঝে জাবির ইবনে যায়েদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা কেন আমার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করো? আমরা ইবনে দীনার (র.) বলেন, ফতোয়ার বিষয়ে জাবির ইবনে যায়েদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি ৯৩ হিজরি সনে এই নম্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

৫. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) : তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফত কালের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং আনাস (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ফকীহ এবং ইমাম ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেনজীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সমকালীন অনেকেই তাঁর ফিকহ এবং পারহেযগারীর বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ইনতিকালের একশত দিন পর ১১০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত কাতাদা ইবনে দা’আমা দূসী (র.) : তিনি হযরত আনাস (রা.) এবং সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধা ছিল খুবই প্রখর। তাফসীর বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে কাতাদার তুলনায় অধিক প্রজ্ঞাবান আমি আর কাউকে পাইনি। ফিকহ ও মেধার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। আরবি ভাষা তত্ত্ব এবং মানুষের বংশধারা সম্পর্কে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১১৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন। — [তারিখ ফিকহে ইসলামী : পৃঃ ২২০]



## শাম (সিরিয়া)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে হযরত মু'আয, উবাদাহ ইবনে সামিত এবং হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে সিরিয়ার মু'আলিম ও মুফতি হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। পরবর্তীতে যে সকল তাবিঈ এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশ'আরী (র.) : তিনি ছিলেন হযরত ওমর এবং হযরত মু'আয (রা.)-এর শাগরিদ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়েছিলেন সেখানকার লোকদেরকে ফিক্‌হের তালীম দেওয়ার জন্য। তাঁর থেকে সিরিয়াবাসীর তাবিঈনে কেরাম ফিক্‌হ হাসিল করেছেন। ৭৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. হযরত আবু ইদরীস খাওলানী (র.) : তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এবং আরো অনেক সাহাবী থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তিনি একজন সু-বক্তা এবং সিরিয়ার বিচারকও ছিলেন। ৮০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. হযরত কবীসা ইবনে যুওয়াইব (র.) : তিনি হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কবীসা (র.) এ উম্মতের উল্লেখযোগ্য আলিমদের অন্যতম ছিলেন। শা'বী (র.) বলেন, কবীসা (র.) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সমূহের সর্বাধিক সংরক্ষক ছিলেন।

৪. হযরত মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম (র.) : মূলত তিনি ছিলেন কাবুলের বাসিন্দা। তিনি সিরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তিনি এ উম্মতের তিনজন আলিমের অন্যতম ছিলেন। আবু হাতিম (র.) বলেন, সিরিয়াতে মাকহুলের তুলনায় বড় ফকীহ তৎকালে আর কেউ ছিল না। ১১৩ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৫. হযরত রাজা ইবনে হায়ওয়া (র.) : তিনি হযরত মু'আবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি সিরিয়ার শায়খ এবং হুকুমতের রুকনে আযীম অর্থাৎ অন্যতম স্তম্ভতুল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত মাতার (র.) বলেন, রাজার তুলনায় বড় ফকীহ সিরিয়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মাকহুল (র.) বলেন, রাজা সিরিয়াবাসীদের নেতা ছিলেন। তিনি ১১২ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৬. হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) : তিনি ছিলেন বনী উমায়্যার অষ্টম খলীফা। মদীনা মুনাওওয়ারায় তাঁর জন্ম তবে তিনি মিসরে লালিত পালিত হয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক এবং বহু তাবিঈর নিকট থেকে তিনি ইলম হাসিল করেছেন। তিনি একজন উচ্চমানের ইমাম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ইবাদত ওজার, দীন ব্যাপারে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়পরায়ণতায় তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর, ভাকওয়া ও পরহেয়গারীর ক্ষেত্রে তিনি হাসান বসরীর এবং ইলুমর ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (র.)-এর অনুরূপ ছিলেন। এ কারণেই তাঁকে “ওমরে ছানী” বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১০১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।—[তারীখে ফিক্‌হ ইসলামী]

## মিসর

মিসরে আগত সাহাবীগণের মধ্যে প্রধান ফকীহ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)। আর তাবিঈদের মধ্যে দু' জন সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো,

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ এবং কুরআন তিলাওয়াতকারী সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং এগুলোর এক এক বিষয়ের ওপর একটি করে তিনি সহীফাও (সংকলন) বের করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আমার থেকেও হাদীস সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কারণ তিনি হাদীস

লিখতেন; কিন্তু আমি লিখতাম না। মিসরবাসী লোকেরা তাঁর থেকে বহু ইলম হাসিল করেছেন। তিনি ৬৫ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২. হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) : তিনি হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী, আবু বসরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তিনি মিসরের খ্যাতিমান মুফতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৯০ হিজরি সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

৩. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র.) : তিনি মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁকে মিসরের প্রধান মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একজন ধীমান, সহনশীল তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ফকীহ ছিলেন। হযরত লায়স ইবনে সা'দ (র.) বলেন, ইয়াযীদ আমাদের আলিম এবং আমাদের নেতা ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই মিসরে ইলমের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে হালাল হারাম সম্পর্কিত বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি সত্যকথা বলতে কারো তোয়াক্বা করতেন না। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে মিসরের গভর্নর তাঁকে দেখার জন্য আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, মশার রক্ত লাগা কাপড়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে আপনার ফতোয়া কি? জবাবে তিনি বললেন, প্রত্যহ হাজার মানুষকে খুন করে এখন আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করছ? ১২৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

## ইয়ামান

রাসুল্লাহ ﷺ কিছু দিনের জন্য ইয়ামানে হযরত আলী (রা.) কে প্রশাসক হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। এরপর সেখানে আবু মুসা আশআরী (রা.) কে আমীর ও মু'আল্লিমরূপে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাবিঈগণের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনজন সেখানে ফকীহ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১. হযরত তাউস ইবনে কাসসান (র.) : তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত মুফতি ছিলেন। তিনি হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত আয়েশা সিদ্দীকা এবং আবু হুরায়রা (রা.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। আমর ইবনে দীনার (র.) বলেন, আমি তাউসের মতো বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি। তিনি ইয়ামনবাসীদের শায়খ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি বহবার হজতে পালন করেছেন এবং হজের সফরেই ১০৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহ (র.) : তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত আলিম ও বিচারক ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আক্বাস এবং জাবির (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। ১১৪ হিজরি সনে তিনি ইহলীলা সাজ করে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

৩. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর (র.) : তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা.) এবং তাবিঈনে কেরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা (র.) বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (র.) থেকেও অগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, যদি কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে যুহরী (র.)-এর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয় তবে ইয়াহইয়া (র.)-এর কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। ১২৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, উপরে যে সব সাহাবী ও তাবিঈনে কিরামের আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা তাদের নিজ নিজ যুগে একদিকে যেমন ফতোয়া প্রদানের কাজ করতেন, অপরদিকে তাঁরা হাদীসও রিওয়ায়াত করতেন। আবার যারা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন তারাও কোনো নির্দিষ্ট ফিক্‌হের অনুসরণ করতেন না এবং তখন তাকলীদে সাখসীর ওপর আমল করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না; বরং তৎকালীন যুগে তাকলীদে মুতলাকের ওপর আমল প্রচলিত ছিল।

—[তারীখে ফিক্‌হে ইসলামী; পৃঃ ২২৫-২২৮]

চতুর্থ যুগ : ফিকহ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ এবং ইলমে ফিকহ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করার যুগ :

এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কোরাম এ ধরা পুষ্টে আবির্ভূত হয়েছেন যাদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ-যুগ ধরে স্রবণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাদের সুনামধনা শিষ্যবৃন্দ ও এ পৃথিবীতে এসে ফিকহ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হিজরি তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অধর্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বর্ভাব্য যে, এ যুগেই ইমাম আবু হানীফা (র.) তাঁর সহযোগী-সহকর্মী ও শিষ্য শাগরিদগণের সহায়তায় ফিকহের নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাবে ইলমে ফিকহ গ্রন্থাকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। বিচারক এবং কাজিগণ এ ফিকহের অনুসরণে মকাদ্দমার ফয়সালা দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকেন। আবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়াও তখন নিজ গতিতে চলতে থাকে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণের শিষ্যবৃন্দ তাদের নিজ নিজ উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিকহের প্রচার প্রসারে ব্রতী হোন। তাঁদের অতিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁদের উদ্ভাবিত মূল নীতির আলোকে নতুন নতুন মাসআলার জবাব দিতে থাকেন। উসূলে ফিকহও এ যুগে বিধিবদ্ধ হতে থাকে।

এ যুগের ফুকাহায়ে কোরাম সর্বশ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো :

○ ইমাম আবু হানীফা (র.) : প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তিনি ৮০ হিজরি সনে কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবু সূলায়মান (র.)-এর নিকট ফিকহ-এর ইলম হাসিল করেন এবং হাদীসের ইলম হাসিল করেন আতা ইবনে আবু রাবাহ, নাকী (র.) সহ অসংখ্য তাবিঈনে কোরাম থেকে। বস্তুত তিনি নিজেও তাবিঈনে কোরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন-প্রণয়ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রের সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূর্ববর্তী যুগে ফিকহ কোনো স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্ররূপে ছিল না। মাসআলা বা ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের জবাব দান বা ফতোয়া প্রদানের কোনো সঠিক ও বিধিবদ্ধ নিয়ম তৎকালে ছিল না। সর্বোপরি তৎকালে এমন বহু মাসআলা এবং সমস্যাও দেখা দিল যার স্পষ্ট কোনো সমাধান কুরআন হাদীস এবং সাহাবায়ে কোরামের বাণীতে পাওয়া যেতো না। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) ইসলামি ফিকহ বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সেই প্রেক্ষিতে ফিকহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একদল লোক এ মহতী কাজে ব্রতী হোন। এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামি ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার প্রক্রিয়া।

ফিকহী মাসআলা সংকলন ও লিপিবদ্ধ করণে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসৃত নীতি ছিল; তিনি প্রথমেই মাসআলার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন মাজীদে কোনোভাবেই এর সমাধান না পাওয়া গেলে তিনি হাদীসের মধ্যে এর সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীসের মধ্যেও এর সমাধান না পাওয়া গেলে আসারে সাহাবা এবং ফতোয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন। তাতেও না পাওয়া গেলে অর্থাৎ বিষয়টি ইব্রাহীমে নাঈঈ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব পর্যন্ত পৌছে গেলে তখন তাদের ন্যায় তিনিও ইজতিহাদ করতেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৩০১]

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জমানায় কূফাতে আরো তিনজন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. হযরত সুফইয়ান সাওরী (র.) : তিনি ইমামুল মুহাদ্দিসীন ছিলেন। তাঁর দীনদারী, পরহেযগারী এবং যুহদ ও তাকওয়ার উপর সমস্ত মানুষ একমত। তিনি ঐ সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগণের একজন যাদের ওপর মানুষ তাকলীদ করেছে। সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, হালাল হারাম বিষয়ে সুফইয়ান সাওরী (র.) থেকে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। ৯৭ হিজরি সনে তাঁর জন্ম এবং ১৬১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাঈঈ (র.) : তিনি ৯৫ হিজরি সনে বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ধীমান ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। খলীফা মাহ্দীর জমানায় তাকে কূফার বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। তিনি সর্বদা সঠিক ফয়সালা দিতেন এবং তিনি ছিলেন প্রত্যাং পন্থমতি। ১৭৭ হিজরিতে তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন।

৩. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র.) : ১৭৪ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। তিনি একজন বিদগ্ধ ফকীহ ছিলেন। খিলাফতে বনী উমাইয়্যার জমানায় সর্বপ্রথম তাকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। এরপর আব্বাসী যুগেও পুনরায় তাকে ফকীহ এবং মুফতি পদে নিয়োগ দান করা হয়। সর্বসাকুল্যে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে এ মহান জিমাদারী আদায় করেছেন। সুফইয়ান সাওরী (র.) বলেন, ইবনে আবু লায়লা এবং শবরুমা (র.) আমাদের ফকীহ। তিনি ১৪৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে যারা তাঁর নিকট থেকে ফিক্‌হের তা'লীম হাসিল করেছেন এবং ইজতিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যারা বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম (র.) : ১১৩ হিজরি সনে তাঁর জন্ম। যৌবনে পদার্পণ করার পর তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া, আবু ইসহাক এবং অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং এতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মাদীন (র.) বলেন, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) সর্বাধিক হাদীস জানতেন এবং তিনি একজন বিদগ্ধ রিওয়ায়াতকারীও ছিলেন। হাদীস অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি ইবনে আবু লায়লা (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মজলিসে গিয়ে বসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই গভীর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ইলমী মদদগার অর্থাৎ শিক্ষা সহকারীরূপে পরিগণিত হন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতানুসারে কিতাব রচনা করে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতামত সারা বিশ্বে প্রচার করেন। খলীফা মাহ্দীর খিলাফতকালে তিনি কাজির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সমগ্র আব্বাসীয় সম্রাজ্যের তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৮৩ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. ইমাম যুফার (র.) : ইমাম যুফার ইবনে হুয়ায়ল কূফী (র.) ১১০ হিজরিতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিক্‌হের অনুশীলন করে শেষ পর্যন্ত কিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি দুনিয়ার খামেলা হতে মুক্ত থেকে সারা জীবন শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা দানের কাজে অতিবাহিত করেন। ১৫৮ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফরকদ শায়বানী (র.) ১৩২ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য কালেই তিনি লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (র.) যখন বাগদাদে খলীফা মনসূরের কাগাগারে তখন তিনি তাঁর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা শুরু করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ইনতিকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট ফিক্‌হের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। মদীনায় গিয়ে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর মুআত্তা অধ্যয়ন করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) খুব মেধাবী, প্রতীভাবান এবং বিচক্ষণ ছিলেন। মাসআলার বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সময়েই তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাসআলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তাঁর শরণাপন্ন হতো। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মায়হানের শিক্ষাধারা বেশির ভাগই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দ্বারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদে- রাজত্বকালে তিনিও কাজির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুঈ কুফী (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করেন সাহেবাইনের নিকটে। তিনি ফিকহে হানফীর ওপর বহু কিতাব লিখেছেন। কিয়াসে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাজির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২০৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

ফিকহে হানাফী ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতি সম্পর্কিত হলেও বাস্তবে তা তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর এই চার শাগরিদের মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই ইমাম আবু হানীফা এবং এই চার ইমামের রায়ের সমষ্টির নামই হলো ফিকহে হানাফী।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর শিষ্যদের ঐ সমস্ত শাগরিদবৃন্দ যারা স্বীয় উস্তাদগণের নীতি ও নির্দেশনা মূতাবিক কিতাব প্রণয়ন করেছেন এবং ফিকহে হানাফীর প্রচার ও প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইব্রাহীম ইবনে রুস্তম মিরওয়ামী (র.) : তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে ফিকহের ইল্ম হাসিল করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে। তিনিই নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিরল বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ২১১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. আহমদ ইবনে হাফস (র.) : তিনি আবু হাফস কবীর বুখারী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ফিকহ হাসিল করেছেন এবং তাঁর কিতাব সমূহের তিনিই রাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক প্রণীত মাবসূত গ্রন্থটি তাঁরই হাতে লিখিত।

৩. বশীর ইবনে গিয়াস মুরীসী (র.) : তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট থেকে ফিকহের ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করেন এবং ২২৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. বিশর ইবনে ওয়ালীদ কিন্দী (র.) : তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর ছাত্র এবং তাঁর কিতাবসমূহের রাবী ছিলেন। খলীফা মুতাসিম বিল্লাহর জমানায় তিনি বাগদাদের কাজি ছিলেন এবং ২৩৮ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৫. ঈসা ইবনে আবান (র.) : তিনি ইমাম মুহাম্মদ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। ২২১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৬. মুহাম্মদ ইবনে সিমাআ তামীমী (র.) : তিনি লায়স ইবনে সা'দ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে হাদীসের ইল্ম হাসিল করেছেন এবং ফিকহ হাসিল করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে। খলীফা মামুনুর রশীদের যুগে তিনি বাগদাদের কাজি ছিলেন। তিনি নাওয়াদিরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদের সংকলক ছিলেন। তিনি ২৩৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৭. মুহাম্মদ ইবনে শুজা' সালজী (র.) : তিনি হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শিষ্য এবং বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাস্বীহুল আসার, কিতাবুন নাওয়াদির, কিতাবুল মুযারাবা ইত্যাদি গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। ২৬৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. আবু সুলায়মান মুসা ইবনে সুলায়মান জুযজানী (র.) : তিনি ফিকহ হাসিল করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট থেকে এবং তিনি ছিলেন মাসাইলে উসূল এবং “আমালী” (أَمَالِي) প্রণেতা। ২০০ হিজরির পরে তিনি ইনতিকাল করেন।

৯. হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম বসরী (র.) : তিনি ইমাম যুফার এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর শাগরিদ এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ফকীহ ছিলেন। তিনি “ওয়াক্ফের বিধান ও শর্ত” শিরোনামে একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। ২৪৫ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১০. আবু জা'ফর আহমদ ইবনে ইমরান (র.) : তিনি ইবনে সিমাজা (র.)-এর শিষ্য এবং ইমাম আবু জা'ফর তাহাভী (র.)-এর উস্তাদ ছিলেন। ২৮০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. আহমদ ইবনে ওমর আবু খাসসাক (র.) : তিনি নিজ পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তার পিতা হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল হিয়াল, কিতাবুল ওয়াসায়ী, কিতাবুল শরত, কিতাবুল ওয়াক্ফ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি অংক শাস্ত্র ও ফারাইয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ২৬১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১২. বাস্কাব ইবনে কুতায়বা ইবনে আসাদ (র.) : তিনি মিসরের কাজি এবং হিলাপুর্ রায়-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি বহু কিতাবের প্রণেতা। ২৯০ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

১৩. ইমাম আবু হাযিম আব্দুল হামীদ ইবনে আব্দুল আযীয (র.) : তিনি ঈসা ও শায়খ হিলালের ছাত্র এবং কৃষার কাজি ছিলেন। তিনি কিতাবুল মুহাযির, কিতাবু আদাবিল কাযী এবং কিতাবুল ফারাইয প্রণয়ন করেন এবং ২৯২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৪. আবু সাঈদ আহমদ ইবনে হুসায়ন বারদাসী (র.) : তিনি ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (র.) এবং আবু আলী দাক্কাব (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৩১৭ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১৫. শায়খ আবু আলী দাক্কাব (র.) : তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্র মুসা ইবনে নসর (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। ৩১৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. ইমাম আবু জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আযদী তাহাভী (র.) : তিনি ২৩০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ছাত্র ইমাম মুযানী (র.) তাঁর মামা ছিলেন। প্রথমে তিনি মামার নিকট ফিকহে শাফিঈ শিক্ষা করেন; অতঃপর হানাফী মত গ্রহণ করেন এবং আবু জা'ফর আহমদ ইবনে আবু ইমরান ও আবু হাযিম (র.)-এর নিকট ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফী মাহাযবের একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিকহের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা হানাফী মাহাযবের প্রসারে বেশ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ৩২১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২৯৯]

উপরে যে সব ইমাম ও মুজতাহিদীনে কেরামের কথা বলা হয়েছে তাদের ছাড়াও এ যুগে আরো বহু ফকীহ এবং মুজতাহিদীনে কেরাম এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ ইমাম শাফিঈ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

✽ ইমাম মালিক (র.) : তিনি ৯৩ হিজরি সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই তিনি বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে হুরমূয (র.)-এর নিকট থেকে প্রথমে হাদীসের ইলম হাসিল করেন। অতঃপর ইমাম মুহরী, নাকি' ইবনে যাকওয়ান এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। হিজায়ের ফকীহ রবী'আতুর রায় (র.)-এর নিকট থেকে তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে যারা তার শায়েখ ছিলেন তাদের নির্দেশ ও অনুমতিতে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, সন্তরজন উস্তাদ আমার যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতোয়া প্রদানের এই আসনে উপবিষ্ট হইনি।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসেরও সর্ববীকৃত ইমাম ছিলেন। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং আরোও অনেকে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম মালিক (র.)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলনের নাম হলো **الموطأ** (আল মুআত্তা)। বহু মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আমীর এবং সূফী এর থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

ফিকহ সংকলন এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.)-এর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদার ওপর অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিতর্ক মনে করতেন, সেগুলোর ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর মতে হিজায়ের প্রবীণতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণই ছিলেন শুদ্ধাভিধির মাপকাঠি। মদীনাবাসীদের আমল এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন।

মদীনাবাসীগণ আমল করেননি বলে তিনি অনেক বিপুল হাদীসও গ্রহণ করেননি। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে تَعَامَلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ অর্থাৎ মদীনাবাসীদের আমলও ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম উৎস। মদীনাবাসীদের আমল এবং ইজমার পরই কিয়াসের স্থান। কিন্তু হানাকী মাযহাবের মতো তাঁর মাযহাবে কিয়াসের ততো আধিক্য নেই। অবশ্য হানাকী মাযহাবের ইস্তিহসানের (إِسْتِحْسَان) মতো মালিকী মাযহাবেও فَصَالِحُ مَرْسَلَةٍ তথা 'ইসতিস্লাহ (إِسْتِصْلَاح)'-এর ওপর আমল করা হয়। إِسْتِصْلَاح-এর মর্ম হলো এমন মুসলাহাত (কল্যাণ) যা দ্বারা শরিয়ত সম্বত এমন উদ্দেশ্যের হিফাজত করা হয় যার শরিয়ত সম্বত হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে এ ব্যাপারে সরাসরি শরিয়তে কোনো প্রমাণ নেই, যেমন এর বাতুলতার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ নেই। বরং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুমের দ্বারা এর শরিয়ত সম্বত হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এই إِسْتِصْلَاح-এর ওপর আমল করা জায়েজ। অবশ্য যদি কোনো জায়গায় এর বিপক্ষে শরিয়তের কোনো নস (কুরআন বা হাদীস) বা কিয়াস আছে বলে প্রমাণিত হয় তবেই এর ওপর আমল করার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে যাবে। ইমাম গাযালী (র.) তাঁর মুস্তাস্ফা (مُسْتَضْفَى) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিজ্ঞারিত আলোচনা করেছেন। মোদ্দাকথা হলো ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ফিকহ শাস্ত্রের উৎস হলো, কুরআন হাদীস, মদীনাবাসীদের আমল, কিয়াস এবং ইসতিসলাহ। — [তারিখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৩১০-৩১১]

ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষা মজলিস ছিল খুব শান-শওকতের। তিনি খুব সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিধান করে; আতর সুরমা লাগিয়ে খুব জাকজমকপূর্ণ আসনে বসে শিক্ষা দান করতেন। হাদীসে নববী ও কুরআন মাজীদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের মানসেই তিনি এরূপ করতেন। তিনি আজীবনই মদীনায়ে ছিলেন, অন্য কোনো শহরে যাননি। মসজিদে নববীতে বসেই তিনি শিক্ষা দান করতেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করতেন। বিশেষভাবে মিসর ও আফ্রিকাবাসীগণ তাঁর নিকট থেকে ফিকহ শিক্ষা করার জন্য আসতেন এবং শিক্ষা সমাপনাশুে নিজ নিজ দেশে গিয়ে তা প্রচার করতেন।

মদীনায়ে ইমাম মালিক (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সালামা আল মাজিশুন (র.)। তিনি কুরায়শ বংশের বনী তায়ম গোত্রের আজাদকৃত দাস ছিলেন। অনেকেই তার নিকট থেকে ফিকহে মালিকী শিক্ষা করেছেন। ২১২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, মিসরবাসী ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র দ্বারাই মূলত মালিকী মাযহাবের অধিক প্রসার লাভ ঘটেছে। বরং মিসরীয় ছাত্র-শিষ্যদের মাধ্যমেই মালিকী মাযহাব দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে ইমাম মালিক (র.)-এর মিসরীয় ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী (র.) : তিনি লায়স ইবনে সা'দ, সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না, সুফইয়ান সাওরী (র.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ১৪৮ হিজরিতে ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষালয়ে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৩১ বছর পর্যন্ত তাঁর সুহবতে থাকেন। অর্থাৎ ইমাম মালিক (র.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই থাকেন। ইমাম মালিক (র.) তাকে "ফকীহে মিসর" উপাধি দিয়ে ছিলেন। হাদীস ও মালিকী মাযহাবের জ্ঞানে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম আভাকী (র.) : তিনি ইমাম মালিক; লায়স ইবনে সা'দ; ইবনে মাজিশুন এবং মুসলিম ইবনে খালিদ প্রমুখ মনীযীবৃন্দের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ১৫৮ হিজরিতে মদীনায়ে এসে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। অতঃপর মিসরে ফিরে গিয়ে সেখানে মালিকী মাযহাব প্রচার করেন। ১৯১ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. মাশহাব ইবনে আব্দুল আযীয আল কায়সী আল আমেরী আল জা'দী (র.) : তিনি ইমাম লায়স ইবনে সা'দ এবং ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা হাসিল করেন। আর ফিকহ হাসিল করেন তিনি ইমাম মালিক (র.) ও মাদানী, মিসরী মাশায়িখে কেয়ামের নিকট থেকে। ইবনুল কাসিম (র.)-এর পর তিনি মিসরের ফকীহগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে হাকাম ইবনে আ'য়ান (র.) : তিনি ইমাম মাযিক (র.)-এর মাযহাবের মুহাজ্জিক ফকীহ ছিলেন। আশহাব (র.)-এর পর তিনিই মিসরে মালিকী মাযহাবের ইমাম নিয়োজিত হন। তিনি ইমাম মালিক : লায়স ইবনে সা'দ, ইবনে উয়ায়না এবং ইবনে লাহী'আ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র.) মিসরে আসলে তাঁর নিকটই আবস্থান করতেন। ২২৪ হিজরিতে তিনি মিসরেই ইনতিকাল করেন।

৫. আসবাগ ইবনে ফারাজ উমুতী (র.) : তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর ইনতিকালের দিন মদীনায়ে এসে পৌছেন এবং ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে কাসিম, ইবনে ওয়াহাব এবং আশহাব (র.) প্রমুখের নিকট ফিকহ হাশিল করেন। তাকে ইবনে ওয়াহাব (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর উস্তাদ আশহাব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি আপনার পরবর্তী জানেশীল হিসেবে কাকে রেখে যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেছেন, আসবাগ ইবনে ফারাজকে রেখে যাচ্ছি। ইবনে মঈন (র.) বলেন, তৎকালীন যুগে ইমাম মালিক (র.)-এর রায় এবং মতামত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন আসবাগ ইবনে ফারাজ। তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর এক একটি মাসআলা তন্ময় করে জানতেন।

৬. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হাকাম (র.) : তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে ইলম হাশিল করেন। তারপর তিনি ইবনে ওয়াহাব, আশহাব, ইবনে কাসিম (র.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সুহবতেও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন। তিনি মিসরের সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ ছিলেন। ২৬৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৭. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ ইসকান্দারী (র.) : তিনি ইবনে মাজিশুন ও ইবনে আব্দুল হাকাম (র.) থেকে ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ১৮০ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ২৬৯ হিজরিতে তিনি দামেসকে ইনতিকাল করেন।

স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (র.)-এর নিম্নোপ্লিখিত ছাত্রগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন :

১. আবু আব্দুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান কুরতুবী (র.) : শাবতুন তাঁর উপাধি ছিল। তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট মুআত্তা কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাড়াও লায়স ইবনে সা'দ এবং ইবনে উয়ায়না (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। মালিকী মাযহাবের উপর তিনিই সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেছেন। ২১৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. ঈসা ইবনে দীনার উদ্দোলুসী (র.) : তিনি স্পেন হতে মদীনায়ে এসে ইমাম মালিক এবং ইবনে কাসিম (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কর্ডোভার সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন। প্রাচ্য অঞ্চলের সমস্ত ফতোয়ার জবাব তিনিই দিতেন। ২১২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

৩. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর লায়সী (র.) : তিনি প্রথমে যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান (র.)-এর নিকট ইমাম মালিক (র.)-এর মুআত্তা কিতাবটি পাঠ করেন। অতঃপর মদীনায়ে এসে পুনরায় তিনি এ কিতাবটি সরাসরিভাবে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। এ বছরই ইমাম মালিক (র.) ইনতিকাল করেন। বহুদিন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর আবার সফরে যান এবং ইবনে কাসিম (র.)-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। مؤطا মালিক কিতাবটি তাঁর রিওয়ায়েতেই বিখ্যাত। সেখানে তিনিই ছিলেন মালিকী মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি : ২৩৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলায়মান সুলামী (র.) : তিনি স্পেনেই বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর ২০৮ হিজরিতে আরো ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন এবং ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে মাজিশুন, মুতাররিফ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হাকাম এবং আসাদ ইবনে মুসা (র.) প্রমুখের নিকট হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা করেন। অতঃপর স্পেনে প্রত্যাবর্তন করলে আমীর আব্দুর রহমান ইবনুল হাকাম তাকে কর্ডোভার মুফতি নিয়োগ করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের হাফিজ ছিলেন। كِتَابُ الرَّاٰضِحَةِ فِي السُّنَنِ وَنُفَيْهِ তাঁর বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ। ২৩৮ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।



৫. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী (র.) : তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে **موطأ** (মুআত্তা) শ্রবণ করেছেন। হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনি লায়স ইবনে সা'দ; সুফইয়ান সাওরীসহ আরো কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে। তৎকালীন যুগে আফ্রিকাতে তাঁর সমপর্যায়ের কোনো ফকীহ ছিল না। ১৮৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬. আসাদ ইবনে ফুরাত (র.) : প্রথমে তিনি তিউনিসে আলী ইবনে যিয়াদের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর মদীনায় এসে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট **موطأ** কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইরাক সফর করে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আসাদ ইবনে ওমর এবং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট থেকে ফিক্‌হে হানাফী শিক্ষা করেন। তিনি তিউনিসের একজন কাজিও ছিলেন। ২১৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭. আব্দুস সালাম ইবনে সাঈদ আততাল্লুখী (র.) : তাঁর উপাধি ছিল শাহনূন। তিনি প্রথমে মিসর গিয়ে ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র ইবনে কাসিম, ইবনে ওয়াহাব ও অন্যান্যদের নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অতঃপর সেখান থেকে মদীনায় গিয়ে মদীনার আলিমদের নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৯১ হিজরিতে আফ্রিকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি আফ্রিকার কাজি নিযুক্ত হন। একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে আরো বহু গুণাবলির সমন্বয় হয়েছিল; যা অন্যান্যদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। যেমন- তাকওয়া ও পরহেজগারী, অকুতোভয় সত্যভাষী, পানাহারে সরলতা, দানশীলতা ও বদান্যতা এবং রাজা বাদশাহদের পক্ষ থেকে দেওয়া উপঢৌকন কবুল না করা ইত্যাদি। তাঁর উদ্ভাব ইবনে কাসিম (র.) বলতেন, আফ্রিকাতে শাহনূনের অনুরূপ আর কেউ নেই। ২৪০ হিজরিতে তার ইনতিকাল হয়। —[তারিখে ফিক্‌হে ইসলামী; পৃঃ ৩০৮-৩১৮]

পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে ফিক্‌হে মালিকী প্রচার করেন ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্রের ছাত্রগণ। তাদের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত দু' জন ফকীহ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১. আহমদ ইবনে মাযাল ইবনে গীলান (র.) : তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ, দার্শনিক, তার্কিক ও বাগ্মী আলিম ছিলেন। পাশাপাশি তিনি একজন দীনদার ইবাদত গুজার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাজিতুন এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমেই মালিকী মাযহাবের সঙ্গীর্ণ হয়ে ছিল।

২. কাজি আবু ইসহাক (র.) : তিনি ইবনে মাযাল (র.)-এর নিকট থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্র এবং ইবনে মাদীনী (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। আবু বকুর ইবনুল খতীব (র.) বলেন, কাজি আবু ইসহাক সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একজন ফকীহ ছিলেন। তিনিই এতদঞ্চলে মালিকী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তাদের পক্ষ হয়ে তিনি বহু বাহাছ ও মুনাযারা করেছেন। হাদীস ও ফিক্‌হের উপর তিনি বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। মালিকী মাযহাবের লোকেরা ইরাকে কাজি আবু ইসহাক (র.)-এর নিকট থেকেই ফিক্‌হ শিক্ষা করেছেন। ইমাম মালিক (র.)-এর পর কাজি আবু ইসহাক (র.)-এর অনুরূপ এত বড় আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস আর সৃষ্টি হয়নি। তিনি প্রথমে মাদাইন এবং নাহারওয়াভের বিচারক হয়েছিলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি প্রধান বিচারপতির আসনও অলংকৃত করেন। সর্বমোট তিনি বত্রিশ অথবা পঞ্চাশ বছর এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ২০০ হিজরিতে তাঁর জন্য এবং ২৮২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

❁ ইমাম শাফি'ঈ (র.) : তিনি আসকালান প্রদেশের গায়াহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মাতাই তাঁকে লালন পালন করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি মক্কায় পৌঁছে সেখানকার শায়খ মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র.)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়সে তাঁর উদ্ভাদ শায়খ যানজী (র.) তাঁকে ফতোয়া দানের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উদ্ভাদের অনুমতিক্রমে তাঁর দেওয়া একখানা পত্র নিয়ে ইমাম মালিক (র.) এবং সেখানকার মাশাযিখে কেরামের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মদীনা পৌঁছে তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট মুআত্তা মালিক অধ্যয়ন করেন এবং তা মুখস্থ করে তাকে শুনান। এতে ইমাম মালিক (র.) বিষয়াভিভূত হন এবং তাঁকে খুব কাছে টেনে নেন। এ ছাড়াও আরো ৮১ জন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট তিনি ফিক্‌হ ও হাদীস শিক্ষা করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের খিলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈয়দ বংশের অর্থাৎ হযরত আলী

(রা.)-এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অতঃপর রবী ইবনে ফযল-এর সুপারিশক্রমে তিনি মুক্তি পেয়ে সপনে পুনঃ বহাল হন। কিন্তু বেশি দিন তাঁর এ চাকরি অব্যাহত থাকেনি। অতঃপর তিনি ইরাক চলে যান। ইরাক গিয়ে তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মক্কায় আগত মিসরীয়, স্পেনীয় ও আফ্রিকার আলিমগণের সাথেও তিনি ভাবের আদান প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৫ হিজরিতে পুনরায় তিনি ইরাক সফর করেন এবং দু' বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে জ্ঞান পিপাসু লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেন। এ সময় তিনি যেসব ফতোয়া প্রদান করেছেন সেগুলোকে তাঁর **قَوْلُ قَدِيمٍ** “পুরাতন অভিমত” বলা হয়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ইরাকে অবস্থানকালে তাঁর মাযহাবের বেশ প্রসার লাভ ঘটে। সেখানকার একদল আলিমও তাঁর মাযহাব অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হিজরিতে তৃতীয়বার তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসর চলে যান।

মিসরে মালিকী মাযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। ইমাম শাফিঈ (র.) মিসরী আলিমদের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তাঁর ইজতিহাদ চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন তিনি পূর্বের মতামতে কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ফতোয়া প্রদান করেন এবং এ হিসেবে কিছু কিতাবও রচনা করেন। একেই ইমাম শাফিঈ (র.)-এর **قَوْلُ جَدِيدٍ** “নূতন অভিমত” বলা হয়। ইমাম শাফিঈ (র.) নিজেই তাঁর মাযহাবের প্রচার কার্য চালিয়ে যান। পরে তাঁর ছাত্র শিমর্যাও এ প্রচারকার্যে যোগদান করেন। ফলে মিসরে তাঁর মাযহাব খুবই গ্রহণীয় হয়। তিনি ১৯৮ হিজরি হতে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর মিসরেই অবস্থান করেন এবং এখানেই ২০৪ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদী উসূল তৎপ্রণীত **رِسَالَةُ أَصُولِيَّةٍ** নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আর তা হলো, ইমাম শাফিঈ (র.) প্রথমে কুরআন মাজীদে যাহিরী অর্থকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত হতো যে, এখানে কুরআনের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয় তাহলে তিনি এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। অতঃপর তিনি হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করতেন। যে কোনো অঞ্চলের আলিমই এই হাদীস বর্ণনা করুক না কেন তিনি তাতে কোনো বাছ-বিচার করতেন না। শুধু সনদ **مُتَّصِلٌ** এবং রাবী **ثِقَةٌ** হওয়ার শর্ত আরোপ করতেন। ইমাম শাফিঈ (র.) ইমাম মালিক (র.)-এর ন্যায় হাদীসের মর্মানুযায়ী কেউ আমল করেছে বলে প্রমাণ থাকার শর্ত এবং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ন্যায় বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেননি। তিনি কুরআন ও হাদীসকে একই নজরে দেখতেন এবং উভয়ের অনুগত্যই সমভাবে ওয়াজিবুল আমল মনে করতেন। হাদীসের পর তিনি ইজমার ওপর আমল করতেন। কুরআন হাদীস ও ইজমার দ্বারা কোনো মাসআলার সমাধান না হলে তিনি তা কিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন। তবে কিয়াসের জন্য তিনি এই শর্ত আরোপ করতেন-যে, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো **أَمْلٌ** বা নীতি থাকতে হবে। তিনি হানাফীদের **إِسْتِخْسَانٌ** এবং মালিকীদের **إِسْتِضْلَاحٌ**-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি এই গুলোর কাছাকাছি দলিলের ওপর আমল করতেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ৩২০-৩২৪]

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিকহের প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে ইরাকী ও মিসরী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ হলেন অন্যতম। তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের পরিচয় ও অবদান নিয়ে তুলে ধরা হলো :

১. আবু সাওর ইব্রাহীম ইবনে খালিদ ইবনে ইয়ামান কালবী আল বাগদাদী (র.) : প্রথমে হানাফী মাযহাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মাযহাব গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিকহ প্রবর্তন করেন। ঐ ফিকহের কিছু অনুসারীও ছিল। কিন্তু পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি ২৪০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাযল (র.) : তিনি প্রথমে শাফি'ঈ ফিকহ শিক্ষা করেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিকহ প্রবর্তন করেন। তাঁর ঐ মাযহাবের নামই হলো হাযলী মাযহাব।

৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ আয যাকরানী আল বাগদাদী (র.) : তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব কাদীমের (পুরাতন) সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ২৬০ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪. আবু আলী হুসাইন ইবনে আলী আলকারাবীসী (র.) : তিনি প্রথমে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিকহে শাফি'ঈ (র.)-এর অনুসারী হয়ে যান। ২৪৫ হিজরিতে তিনি মারা যান।

৫. আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল আযীয আল বাগদাদী (র.) : তিনি প্রথমে বাগদাদে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাবে কাদীমের অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি যাহরী মাযহাব গ্রহণ করেন।

৬. আবু ওসমান ইবনে সাঈদ আনমাতী (র.) : তিনি ইমাম মুযানী, ইমাম রবী' এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট থেকে ফিকহ শিক্ষা করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন। ২৮৮ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৭. আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে সুরায়জ (র.) : তিনি যাকরানী এবং আনমাতী (র.) প্রমুখ শাফি'ঈ ফকীহগণের ছাত্র ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তিনি উক্ত মাযহাবের পক্ষে বহু মুনাযারা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি। ৩০৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আবু আহমদ তাবারানী (র.) : তিনি ইবনুল কাস উপাধিতে মশহুর ছিলেন। ইবনে সুরায়জ (র.)-এর নিকট তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তালখীস, মিফতাহ, আদাবুল কাযী এবং উসুলুল ফিকহ ইত্যাদি গ্রন্থাবলি তাঁর রচিত। ৩৩৫ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

মিসরে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নিকট যারা ফিকহ হাসিল করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া মিসরী (র.) : ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রবীণ এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর একজন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। মৃত্যুকালে ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনিই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ফিকহকে দেশের কানায় কানায় ছড়িয়ে দেন। خلیفان -এর মাসআলায় তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ৩৩১ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

২. আবু ইব্রাহীম ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী (র.) : ১৯৯ হিজরিতে ইমাম শাফি'ঈ (র.) মিসরে আগমন করলে তিনি তাঁর নিকট থেকে ফিকহ শিক্ষায় পূর্ণতা অর্জন করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাঁকে "হামীয়ে মাযহাব" উপাধি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির ওপরই শাফি'ঈ মাযহাব নির্ভরশীল। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়ার আলিমগণ তাঁর থেকেই ফিকহে শাফি'ঈ শিক্ষা লাভ করেছেন। ২৬৪ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৩. রবী' ইবনে সুলায়মান ইবনে আব্দুল জাব্বার মুরাদী (র.) : তিনি ১৭৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুরাদী ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর খিদমতে দীর্ঘ দিন ছিলেন এবং তার থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবের রাবীও ছিলেন। শাফি'ঈ মতাবলয়ীগণ ইমাম রবী' (র.)-এর রিওয়াযাতকে ইমাম মুযানীর রিওয়ায়েতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি ২৭০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ আত্ তুজায়বী (র.) : তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ ছিলেন। ইবনে ওয়াহাব (র.)-এর নিকট তিনি হাদীস এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর নিকট তিনি ফিকহ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের ওপর বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ২৪৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'শা সাদাকী আল মিসরী (র.) : ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। ২৬৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল হান্দাদ (র.) : ইমাম মুযানী (র.)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর জন্ম হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ছাত্রদের নিকট তিনি ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি হাফিযে কুরআন হিসেবে অতীতীয়, ফিকহের ইমাম, আরব অভিধান শাস্ত্রের সমুদ্র এবং সুস্বত তত্ত্ব বিশ্লেষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বেনজীর। ইলমী বিষয়ে তিনি মিসরের অলংকার ছিলেন এবং আইন আদালতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফকীহ ও বিচারক। ৩৪৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

❶ **ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)** : তিনি ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর তাঁর মা তাঁকে লালন পালন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হুশায়ম এবং সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইয়ামনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুর রায়যাক (র.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) ইরাক গেলে ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.) তাঁর থেকে ফিকহ শিক্ষা করেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.) ষয়েজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি ফিকহ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে<sup>২</sup> তাকে গণ্য করা হতো বেশি। তথাপিও তিনি নিজস্ব ফিকহ মুতাবিক ফতোয়া দিতে শুরু করেন। মুসনাদে আহমদ তাঁর অমর কীর্তি যাতে ৪৩ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে। ফিকহ রচনায় ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল। কুরআন ও সহীহ সনদের হাদীসের ওপর আমল করাই ছিল তাঁর নীতি। তিনি খবরে ওয়াহিদ-এর উপরও আমল করতেন যদি তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হতো। তিনি **أَوَّلُ أَصْحَابِهِ** কে কিয়াসের উপর অধিকার দিতেন। হানফী ও শাফিঈ মতাবলম্বীদের ন্যায় তিনি দিয়ায়েত, পর্যালোচনা, ভাবার্থ গ্রহণ এবং কিয়াস থেকে বিরত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। মালিকীদের মতো মদীনাবাসীদের আমলকেও তিনি প্রামাণ্য দলিল মনে করতেন না। মারফু' (**مَرْفُوعٌ**) অথবা মাওকুফ (**مَوْكُوفٌ**) উভয় অবস্থায়ই সহীহ হাদীসকে তিনি আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণেই তাঁর মাযহাবে একই মাসআলায় একাধিক হুকুম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হলে তিনি কিয়াস দ্বারা মাসআলার সমাধান করতেন। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ইমাম চতুর্ভুজের সকলের নিকটই ইজমা ও কিয়াস শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)-এর ছাত্র যারা তার থেকে ফিকহে হাশলী রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন :

১. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানী ওরফে আসরম (র.) : তিনি হাশলী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি ফিকহে হাশলীর উপর কিতাবুস সুনান নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং তিনি প্রতিটি মাসআলা হাদীসের দলিল দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ২৭৩ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

২. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইবনে রাহওয়াইহ (**إِبْنُ رَاهْوَيْهٍ**) (র.) : তিনিও ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং তিনিও ফিকহে হাশলীর ওপর কিতাবুস সুনান নামে কিতাব রচনা করেছেন। ২৩৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. আহমদ ইবনে হাফ্জা মিরওয়াযী (র.) : ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চতরের ফকীহ ও বিচক্ষণ আলিম ছিলেন।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাশল (র.) : তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা এবং বড় ধরনের একজন ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ২৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

— [তারিখে ফিকহে ইসলামী; পৃঃ ২২৫-২৩০]

**পঞ্চম যুগ** : ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা তাকলীদের যুগ এবং ইলমে ফিকহ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ :

এ যুগ হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয় এবং হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এসে এর সমাপ্তি ঘটে। এ যুগ হচ্ছে ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ। তাকলীদের যুগ। সর্বোপরি এ যুগ হচ্ছে ইলমে ফিকহ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইয়ামগণের তাকলীদ করতে থাকেন এবং তাদের ফিকহী মতাদর্শের ভিত্তিতে কিতাব লিখতে শুরু করেন। আয়িমাময়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস মশ্বন কার যে সব মাসআলা মাসআলের উদ্ভাবন (**الْمُسْتَنْبَطُ**) করেছিলেন এ সময়ে এসে সে সব মাসআলের তাহকীক তাফতীশ তথা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাছ বিতর্কের সূচনা হয়। চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফিঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাশল (র.)-এর তাকলীদ করার উপর

মুসলিম উম্মাহর ইজমা (একমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এর কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজমায় (একমত্যে) উপনীত হয়েছেন যে, শরিয়তের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরি সালাফে সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরি আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিপুলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২. হাদীস শরীফে আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামা'আতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবলমাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ নেই।

৩. خَيْرُ الْقُرُونِ তথা উত্তম যুগ থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়েছে। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলি বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য। —[ইকদুল জীদ]

উল্লেখ্য যে, এই যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশ করা যদিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ সকলেই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ হয়ে যায়; তথাপিও এই যুগের ফকীহগণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান নেই। যেমন—

১. ফিকহ সংকলন ও সম্পাদনার যুগে ইমামগণ শরিয়তের এমন অনেক হুকুম-আহকাম ইস্তিহাভ করেছেন যেগুলোর عِلَّتْ وَمَنْطَأُ অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য তাঁরা বর্ণনা করেননি। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে এ যুগে এমন কিছু ফকীহ-এর আবির্ভাব হয় যারা তাঁদের ইমামগণের সেই সমুদয় আহকামের কারণ সম্পক্ষে আলোচনা করেন। এ ধরনের ফুকাহায়ে কেরামকে আসহাবুত তাখরীজ (أَصْحَابُ التَّخْرِيجِ) বলা হয়। تَخْرِيجُ مَنْطَأُ অর্থ-শর'সি হুকুম-আহকামের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করে তা নির্ণয় করা।

২. মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখী রায় সমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু আলিমও এ যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যাদেরকে আসহাবে তারজীহ (أَصْحَابُ التَّرْجِيحِ) বলা হয়।

৩. আসহাবে তাখরীজ এবং তারজীহ ফকীহগণ ব্যতীত সে যুগে এমন আলিম এবং ফকীহও বিদ্যমান ছিলেন যারা إِمْلَاءً وَتَفْصِيلًا অর্থাৎ মোটামুটিভাবে এবং বিস্তারিতভাবে নিজ নিজ মাযহাবের তায়িদ ও সহায়তা করেছেন। إِمْلَاءً সহায়তা করার মানে হচ্ছে তাঁর নিজ মাযহাবের ইমামের উচ্চ শিক্ষা, গভীর জ্ঞান, পরহেযগারী, আল্লাহ ভীরুতা, সত্যবাদিতা, ইজতিহাদের দক্ষতা, মাসআলা ইস্তিহাভ করার নিপুণতা, কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য ইত্যাদি খুব জোরে শোরে প্রচার করেছেন। আর تَفْصِيلًا তায়ীদের অর্থ হলো, তাঁরা নিজ ইমামের মাযহাব ও মাসআলার সমর্থনে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, মুনাসাযা ও বিতর্ক করেছেন এবং এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

— [তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃঃ ৪০০]

এ যুগের হানাফী মতাবলম্বী যে সব ফুকাহায়ে কেরাম এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইমাম আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান কারখী (র.)। [মৃত্যু-২৪০]

২. আবু বকর আহমদ ইবনে 'আলী আর রাযী আল জাসসাস (র.)। [মৃত্যু-৩৭০]

৩. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল বলখী ওরফে ছোট আবু হানীফা। [মৃত্যু-৩৬২]

৪. আবুল লায়স নাসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (র.)। [মৃত্যু ৩৭৩]

৫. আবু আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৮]

৬. আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুদুরী (র.)। [মৃত্যু-৪২৮]

৭. আবু য়ায়েদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আদ দাবুসী সমরকন্দী (র.)। [মৃত্যু-৪৩০]

৮. আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী আয্হমীরী (র.)। [মৃত্যু-৪৩৬]

৯. আবু বকর খায়রবাদা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৪৩২]
  ১০. শামসুল আযিমা আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ হালওয়ানী আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৪৪৮]
  ১১. শামসুল আযিমা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সারাখসী (র.)। [মৃত্যু-৫৯০]
  ১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী দামগানী (র.)। [মৃত্যু-৪৭৮]
  ১৩. আলী ইবনে মুহাম্মদ বাযদুবী (র.)। [মৃত্যু-৪৮০]
  ১৪. শামসুল আযিমা বকর ইবনে মুহাম্মদ যার নাজী (র.)। [মৃত্যু-৫১৩]
  ১৫. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসমাইল সাফফার (র.)। [মৃত্যু-৫৭৪]
  ১৬. তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল বুখারী (র.)। [মৃত্যু-৫৪৩]
  ১৭. যহীরুদ্দীন আব্দুর রশীদ ইবনে আবু হানীফা ইবনে আব্দুর রায়যাক আল ওয়ালজী (র.)। [মৃত্যু-৫৪০ হি:]
  ১৮. আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ কাসানী (র.)। [মৃত্যু-৫৮৭]
  ১৯. ফখরুদ্দীন হাসান ইবনে মানসুর আল উযজলী ওরফে কাযীখান (র.)। [মৃত্যু-৫৯২]
  ২০. আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল জলীল ফারগানী আল মুরগিনানী সাহেবে হিদায়া (র.)। [মৃত্যু-৫৯৩]
- এ যুগের মালিকী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যারা তাদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহুয়া ইবনে লুবাবা উন্দোলুসী (র.)। [মৃত্যু-৩৩৬]
২. আবু বকর ইবনে আলা আল কুশায়রী (র.)। [মৃত্যু- ৩৪৪]
৩. আবু ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ইবনে শা'বান আল 'আনাসী (র.)। [মৃত্যু-৩৫৫]
৪. মুহাম্মদ ইবনে হারিস ইবনে আসাদ আল খুশানী (র.)। [মৃত্যু-৩৬১]
৫. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মু'আযযী আল উন্দোলুসী (র.)। [মৃত্যু-৩৬৭]
৬. ইউসুফ ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল বার (র.)। [মৃত্যু-৩৮০]
৭. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবু যায়দ আব্দুর রহমান নাকরী আল কীরওয়ানী (র.)। [মৃত্যু-৩৮৬]
৮. আবু সাঈদ খালাফ ইবনে আবুল কাসিম আযদী ওরফে বারান্দাস (র.)।
৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আবহরী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৫]
১০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে আবু যিমীনী আলবীরী (র.)। [মৃত্যু-৩৯৯]
১১. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল মুআফিরী ওরফে ইবনে কাবিসী (র.)। [মৃত্যু-৪০৩]
১২. কাযী আব্দুল ওয়াহাব ইবনে নাসর বাগদাদী মালিকী (র.)। [মৃত্যু-৪২২]
১৩. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী ওরফে লবীদী (র.)। [মৃত্যু-৪৪০]
১৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস সায়কালী (র.)। [মৃত্যু-৪৬১]
১৫. আবুল ওয়ালীদ সুলায়মান ইবনে খালাফ আল বাজী (র.)। [মৃত্যু-৪৯৪]
১৬. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ রিব'ঈ ওরফে লখমী (র.)। [মৃত্যু-৪৯৮]
১৭. আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুশদ কুরতুবী (র.)। [মৃত্যু-৪২০]
১৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওমর তামীমী মাযরী সায়কালী (র.)। [মৃত্যু-৫৩৬]
১৯. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুল আরবী আল মু'আফিরী আল আশবীলী (র.)। [মৃত্যু-৫৪৩]
২০. কাযী আবুল ফযল 'আযায ইবনে মুসা ইবনে আযায ইয়াহসীবী আস সাবতী (র.)। [মৃত্যু- ৫৪১]
২১. ইসমাইল ইবনে মক্কী আল 'আওফী (র.)। [মৃত্যু-৫৪১]
২২. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ মালিকী (র.)। [মৃত্যু-৫৯৫]
২৩. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে নাজম ইবনে শাস জুযামী আস সা'দী (র.)। [মৃত্যু-৬১০]

এ যুগের শাফিঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম যারা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন. তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আহমদ মিরওয়াযী (র.) । [মৃত্যু-৩৪০]
২. আবু আহমদ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে আবুল কাযী খাওয়ারিয়মী (র.) । [মৃত্যু-৩৪০]
৩. আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক আয যাবঈ নিশাপুরী (র.) । [মৃত্যু-৩৪৩]
৪. আবু আলী হুসায়ন ইবনে হুসায়ন ওরফে ইবনে আবু হুরায়রা (র.) । [মৃত্যু-৩৪৫]
৫. আবুস সাযিব উভবা উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (র.) । [মৃত্যু-৩৫০]
৬. কাযী আবু হামিদ আহমদ ইবনে বিশর মির ওয়াযী (র.) । [মৃত্যু-৩৬২]
৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (র.) । [মৃত্যু-৩৬৫]
৮. আবু সাহল মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান সা'লুকী (র.) । [মৃত্যু-৩৬৯]
৯. আবুল কাসিম আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ দারিকী (র.) । [মৃত্যু-৩৭৫]
১০. আবুল কাসিম আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে হুসায়ন আয যমীরী (র.) । [মৃত্যু-৩৮৬]
১১. আবু আলী হুসাইন ইবনে শু'আযব সানজী (র.) । [মৃত্যু-৪০৩]
১২. আবু হামিদ ইবনে মুহাম্মদ ইসফারাইনী (র.) । [মৃত্যু-৪০৮]
১৩. আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ যাববী ওরফে ইবনুল মুহামিলী (র.) । [মৃত্যু-৪১৫]
১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র.) । [মৃত্যু-৪১৭]
১৫. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইসফারাইনী (র.) । [মৃত্যু-৪১৮]
১৬. আবুত তায়্যিব তাহির ইবনে আব্দুল্লাহ তাবারী (র.) । [মৃত্যু-৪৫০]
১৭. আবু আসিম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ হিরুজী ইবাদী (র.) । [মৃত্যু-৪৫৮]
১৮. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ মাযরাবী (র.) । [মৃত্যু-৪৫০]
১৯. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ফাওরানী আল মিরওয়াযী (র.) । [মৃত্যু-৪৬১]
২০. আবু আব্দুল্লাহ কাযী হুসায়ন মিরওয়াযী (র.) । [মৃত্যু-৪৬২]
২১. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আলী ফিরুযাবাদী শীরাযী (র.) । [মৃত্যু-৪৭৬]
২২. আবু নাসর আব্দুস সাযি়িদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে সাব্বাগ (র.) । [মৃত্যু-৪৭৭]
২৩. আবু সা'দ আব্দুর রহমান ইবনে মামুন মুতাওয়াযী (র.) । [মৃত্যু-৪৮৮]
২৪. আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ জুওয়াযনী ওরফে ইমামুল হারামাইন (র.) । [মৃত্যু-৪৭৮]
২৫. আবুল মাহাসিন আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে ইসমাইল রুয়ানী (র.) । [মৃত্যু-৫০২]
২৬. হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী (র.) । [মৃত্যু-৫০৫]
২৭. আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মানসুর ইবনে মুসলিম ইরাকী (র.) । [মৃত্যু-৫৯৬]
২৮. আবু সা'দ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিবাতুল্লাহ তামীমী, আল মুসিলী (র.) ।
২৯. আবুল কাসিম আব্দুল করীম ইবনে মুহাম্মদ কাযবীনী আবু রাফিঈ (র.) । [মৃত্যু-৬২৩]
৩০. মুহীউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহুইয়া ইবনে শরফ ইবনে মিররী আন নববী (র.) । [মৃত্যু-৬৭৬]

এ যুগে হাদ্বলী মাযহাবের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরাম যারা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ হিরুজী আল আনসারী (র.) । [মৃত্যু-৬৮১]
২. হাকিম শামসুদ্দিন আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান ইবনে আলী আল বাগদাদী (র.) । [মৃত্যু-৫৯৭]

**৬ষ্ঠ যুগঃ খালিস তাকলীদের যুগ :** সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এই যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে ওলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এমনকি মাসআলার ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। কেননা চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকহ শাস্ত্র বা ইসলামি আইন শাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন সমস্ত সমস্যারই সমাধান ফুকাহায়ে কেরামের রচিত কিতাবসমূহে রয়েছে। ইয়তো সেই বিশেষ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা ঐ সমস্যার সমাধানের মূলনীতি সেখানে উল্লেখ রয়েছে। সে যুগের কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনো তা সংঘটিত হয়নি। সে সব কিতাবে এত খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখনো অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোনো সময় সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে, তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাব সমূহেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মুজিমা শান যা মূলত **لَا تَزُولُ الْيُزُورُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ** আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সরক্ষক। (১৫-৯) ঘোষণার-ই বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ করার অর্থ হলো, জ্ঞাত জিনিসকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হাঁ যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাবসমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে করতে হবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। মোদ্দাকথা হলো, ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় এমনিভাবে বন্ধাহীন ইজতিহাদেরও এতে কোনো সুযোগ নেই। এই যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌছে ছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইবনে হুমাম (র.) আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) এবং আল্লামা কামাল ইবনে পাশা (র.) প্রমুখ; মালিকী মাযহাবে আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.); শাফিঈ মাযহাবে আল্লামা ইয়ুযুদ্দীন আর্দুস সালাম (র.), শায়খ তকী উদ্দীন সুবকী (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র.), শায়খ জালালুদ্দীন মহর্রী (র.) প্রমুখ এবং হাম্বলী মাযহাবে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র.) ও আল্লামা ইবনে কায়্যাম (র.) প্রমুখ। তারা নিজ নিজ ইমামের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিকহের ক্রম বিকাশের এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশেও ফিকহ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশে ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিকহের দরস দিয়ে; মাসআলার মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুফতি এবং ফকীহ-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. শায়খ নিযামুদ্দীন (র.) : তিনি একদিকে সূফীসাধক অপর দিকে ছিলেন বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি ৭২৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২. শায়খ ইয়াহইয়া মনীরী (র.) : তিনি একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৭২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৩. শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (র.) : তৎকালীন যুগে এ মহান সাধকও একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। তিনি ৮৮০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৪. শায়খ আলম ইবনে আ'লামা আন্দরপতি (র.) : আমীর তাতার খানের নির্দেশে এবং তার সহায়তায় তিনি ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করেন। উপমহাদেশে এ কিতাবটিই হলো সর্বপ্রথম রচিত ফিকহ গ্রন্থ। তিনি ৭৮৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৫. শায়খ আবুল ফাত হ রুক্ন ইবনে হুসাম নাগারী (র.) : ফাতাওয়ায়ে হাম্বাদিয়া গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।



৬. শায়খ ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ মুলতানী (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা বুজুর্গ ফকীহ ছিলেন। ৭৯৫ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৭. মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (র.) : তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন।

৮. মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (র.) : এ মহান বুজুর্গ উচ্চমানের আরবি ভাষাবিদ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি শরহে হিদায়া নামে হিদায়া কিতাবের একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। এ ছাড়াও উসূলে বায়দুবীর একখানা শরাহ রচনা করে তিনি অমর অবদান রেখে গেছেন। তিনি ৯২৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

৯. সিরাজ উদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক হিন্দী (র.) : তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। তিনি التَّوْنِيعُ নামে হিদায়ার একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তা পুরা করে যেতে পারেননি। তিনি ৭৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১০. বারকলী মুহীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে গীর আলী (র.) : তিনি তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া নামক একখানা অমূল্য গ্রন্থ মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন। ৯৮২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. মাওলানা হামিদ ইবনে মুহাম্মদ কুনূবী (র.) : তিনি খ্যাতনামা একজন ফকীহ ছিলেন। ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া নামকগ্রন্থ খানি তার অমর অবদান। ৯৮৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১২. কাজি আবুল ফাতাহ বিলগিরামী (র.) : তিনি একজন ফকীহ এবং বিলগিরামের কাজি ছিলেন। ১০০১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৩. হযরত শাহ বাকী বিল্লাহ (র.) : তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর গীর ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এবং ফকীহও ছিলেন। ১০১২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৪. হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) : এ মহান বুজুর্গ একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। তিনি বহুগ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ১০৩৪ হিজরি সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

১৫. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) : তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। হাশিয়ায়ে মিশকাত তাঁর অমর অবদান। ১০৭০ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৬. মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিদে দেহলবী (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ১০৫২ বা ১০৫৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৭. বাদশাহ আলমগীর (র.) : তিনি মোগল সাম্রাজ্যের একজন পরহেযগার দীনদার আলিম বাদশাহ ছিলেন। তিনি সাতশ ফকীহ আলিমের সমন্বয়ে একটি ফতোয়া বোর্ড গঠন করে তাদের মাধ্যমে শরঈ বিধানের একটি সংকলন বের করেন, যা ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী নামে খ্যাত। তিনি তাঁর শাসন আমলে সমস্ত রাজকীয় কাজে এ গ্রন্থখানিকে অনুসরণ করে চলতেন এবং সর্বক্ষেত্রে এর অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। ১১১৮ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৮. মোস্তা নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী (র.) : বাদশাহ আলমগীর (র.) সাতশ আলিমের সমন্বয়ে যে ফতোয়া বোর্ড গঠন করেছিলেন, এর প্রধান ছিলেন এ মহান ফকীহ। তিনি ১১০৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৯. শায়খ মোস্তাজিউদ্দীন (র.) : তিনি একজন উচ্চ স্তরের হানাফী ফকীহ ছিলেন। তিনি নুফল আনওয়ার নামে উসূলে ফিকহ বিষয়ের “আল মানার” কিতাটির শরাহ রচনা করেছেন। এ মহান বুজুর্গের আরেকটি অমর কীর্তি হলো তাফসীরুল আহমদিয়া ফী আয়াতিশ্ শরীআ-যা এ দেশে তাফসীরে আহমদী নামে খ্যাত। ১১৩০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২০. মোস্তা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.) : তিনি একজন উসুলবিদ ফকীহ আলিম ছিলেন। হানাফী ফিকহের উসুলের উপর প্রণীত مَسْلَمُ الْاُتْمُن কিতাবখানি তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ১১১৯ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২১. মোস্তা ইসামুদ্দীন (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। শরহে বিকায়ার টীকা حَوَاشِي شَرْحِ (حَوَاشِي) তাঁর একটি ফিকহী অবদান। তিনি ৯০০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

২২. মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (র.) : দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক এই ফকীহ **مُكَلَّمُ الثُّبُوتِ**-এর একখানা শরাহ প্রণয়ন করেছেন। ১১৬১ হিজরি সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৩. মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন ইবনে কারীমুদ্দীন উসমানী কনৌজী (র.) : তিনিও **كَنْفُ الْمُبْتَدِئِ** নামে একখানা শরাহ লিখেছেন।

২৪. বাহরুল উলুম মাওলানা আব্দুল আলী ইবনে নিযামুদ্দীন ইবনে কুতুবুদ্দীন (র.) : তিনি **مُكَلَّمُ الثُّبُوتِ** গ্রন্থের ব্যাখ্যায় **فَوَاتِجُ الرَّحْمَنِ** নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে উম্মতকে উপহার দিয়েছেন।

২৫. ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাম্মদিসে দেহলবী (র.) : এ মহান বুজুর্গ একজন দার্শনিক ফকীহ, মুফতি ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি হানাফী ফিক্‌হের অনুসারী ছিলেন। তাঁর প্রণীত আল মুসাওওয়া শরহে মুআত্তা (আরবি), আল মুসাফফা (ফারসি), ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বীদ, আল ইনসাফ ফী ব্যায়ে আসবাবিল ইখতিলাফ এবং আল হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ই তা প্রমাণিত হয়। তিনি ১১৭৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

২৬. শাহ আবদুল আযীয মুহাম্মদিসে দেহলবী (র.) : তিনি একজন সেরা মুফতি ছিলেন। ফতোয়ায়ে আযীযিয়া তাঁর অমর অবদান। ১২৩৯ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) : এ মহান বুজুর্গ একজন মুফাসসির, ফকীহ ও সুফী সাধক ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ শাফের ওপর মাবসূত এবং মালাবুদা মিনহ নামে দু' খানা মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। ১২২৫ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

২৮. মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (র.) : তিনি এ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর প্রণীত উমদাতুর রি'আয়া আলা শরহিল বিকায়া তাঁর ফকীহ হওয়ার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়াও তিনি মুজমুআয়ে ফতোয়া ও ফাওয়ায়িদে বাহিয়া গ্রন্থদ্বয় সহ আরো বহু কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ১৩০৪ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

১৯. মাওলানা ওয়াহীদুয্‌যামান ইবনে মসীহুয্‌যামান লাখনৌভী ফারুকী (র.) : তিনি একজন ফকীহ আলিম ছিলেন। তিনি নূরুল হিদায়া আলা শরহিল বিকায়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ১৩০৭ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩০. আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাজা শামসুদ্দীন দেহলভী (র.) : আনানামী শরহে হুসসামী নামক গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

৩১. শাহ আবুল্লাহ দেহলভী (র.) : তিনি একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত ফিক্‌হের কিতাব কানযুদ-দাকায়িক-এর ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে অমর অবদান রেখে গেছেন।

৩২. মাওলানা মুহাম্মদ আহসান ইবনে লুতফে আলী (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কানযুদ দাকায়িক, ইকদুল জীদ এবং আল ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ ইত্যাদি গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেছেন। ১৩১২ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৩. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) : তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে পূর্ণ কামালাত ও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। “মিফতাহুল জান্নাত” সহ তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। ১২৯০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৪. মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) : হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া তাঁর অমর অবদান। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩৫. মুফতি আবদুল্লাহ টুনকী বিহারী (র.) : তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যাপ্তি ছিল। ফকীহ পদটি তাঁর কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

৩৬. মুফতি আযীযুর রহমান (র.) : তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আজীবন ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ তাঁর অমর অবদান।

৩৭. শায়খুল হিন্দু মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রে ঈযাহুল আদিল্লা তাঁর অমর অবদান।

৩৮. মাওলানা ই'যাহ আলী (র.) : তিনি একজন খ্যাতনামা আদীব ও মুফতি ছিলেন। হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ আরবি, হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ ফারসি, হাশিয়ায়ে নিকায়া এবং হাশিয়ায়ে কানুযুদ দাকায়িক ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। তিনি হিজরি ১৩৭৪ সনে ইনতিকাল করেন।

৩৯. মুফতি কিফায়েত উল্লাহ (র.) : তিনি দিল্লীর মুফতীয়ে আ'যম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর ফতোয়া ইরান, আফগান, তুরক, মিসর, আরব ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ওলামায়ে কেরামের সমর্থন লাভ করেছে। তাঁর রচিত তা'লীমুল ইসলাম এবং কিফায়াতুল মুফতী কিতাবসমূহ উপমহাদেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ মহান বুজুর্গ ১৯৫২ইং সনে ইনতিকাল করেন।

৪০. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (র.) : বেহেশতী জেওর এবং ইমদাদুল ফাতাওয়া ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। ১৩৬২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৪১. মুফতি নিয়ামুদ্দীন (র.) : তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি ছিলেন। তাঁর রচিত ফতোয়ায়ে নিয়ামিয়া আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে এক অমূল্য গ্রন্থ।

৪২. মুফতি মাহমুদ হাসান গান্ধী (র.) : তাঁর রচিত ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ফিক্‌হ শাস্ত্রে এক অমূল্য অবদান। তিনি ১৯৯৫ ইং সনে ইনতিকাল করেন।

৪৩. মুফতি আবদুশ শাকুর লাক্ষনৌতী (র.) : তিনি ইলমুল ফিক্‌হ নামে গ্রন্থ একখানা রচনা করে ফিক্‌হ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

৪৪. মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) : এ মহান ব্যক্তিত্ব একজন খ্যাতনামা ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, মাসাইলে আহলে হাদীস এবং ইসলাম কা নিয়ামে আরবী ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

৪৫. মাওলানা ইউসুফ বিননৌরী (র.) : তিনি হলেন সর্বজন পরিচিত একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ। মা'আরিফুস সুনান গ্রন্থখানা তাঁর অমর অবদান।

৪৬. মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী (র.) : তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থখানি তাঁর অমর কীর্তি।

৪৭. মাওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী (র.) : তিনি একজন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ধীমান গবেষক আলিম ছিলেন। ই'লাউস সুনান গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

—(তারীখে ইলমে ফিক্‌হ; পৃ: ১২০-১২৪)

এ ছাড়াও আরো বহু মনীষী এই উপমহাদেশে ফিক্‌হ ও ফতোয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন।

অনুরূপভাবে ভারত উপমহাদেশের বাইরেও এই তাকলীদের যুগে বহুজন বহুভাবে ইলমে ফিক্‌হের ক্রম বিকাশের ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এ পর্যায়ে আরব, মিসর, ইরাক ইত্যাদি মুসলিম দেশসমূহের ওলামায়ে কেরামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরস দানের মাধ্যমে এবং কিতাব রচনা করে এ খিদমত আজ্ঞাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এমনভাবে বোর্ড গঠন করেও ওলামায়ে কেরাম এ গুরু দায়িত্ব আজ্ঞাম দিয়ে আসছেন। এ ক্ষেত্রে “আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমী” ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন

ফিক্‌হী বিষয়ে সেমিনার সেম্পুজিয়াম করে ফিক্‌হের ক্রম বিকাশের ধারাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলছেন। বিশেষ করে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার আলোকে যে সব সমস্যা নতুন করে উদ্ভাবিত হচ্ছে তাঁরা এর সমাধানে সদা সচেষ্ট। গোটা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে এ একাডেমী গঠিত। এর মূল কেন্দ্র হচ্ছে সউদী আরবে।

তাকলীদের এই যুগে ফিক্‌হের ক্রম বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাংলাদেশী মুফতি ও ফুকাহায়ে কেরামের অবদানকেও খাটো করে দেখা যায় না। নিম্নে বাংলাদেশের বিখ্যাত কতিপয় মুফতি এবং ফকীহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র.) : সমকালীন যুগে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কোনো আলিম ছিল না। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও পরগণায় একটি মাদরাসা স্থাপন করে-সেখান থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চালু করেন। ৭০০ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন এবং সোনার গাওয়েই তাঁকে দাফন করা হয়।

২. মাওলানা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র.) : তিনি হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ যে সব হুকুম-আহকাম তথা ফারাইয নির্ধারণ করে দিয়েছেন; মানুষ যেন তা যথাযথভাবে পালন করে সে লক্ষ্যে ফারাইযী আন্দোলন নামে একটি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনের ধারাটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভিত্তিতেই প্রবাহমান ছিল, যা এর নামকরণ ঘারাই প্রতীয়মান হয়। এ মহান বুজুর্গ ১২৫৬ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।

৩. মাওলানা হাকিম আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (র.) : তিনি একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আল ফতোয়াল ইয়ামানিয়া ফিল আহকামিস সামানিয়া, মুফীদুল মুফতি এবং আন নাওয়ায়িদুল মুনীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ইত্যাদি গ্রন্থাদি রচনা করে অমর অবদান রেখে গেছেন। তিনি ১৯৩৯ ইং সালে ইনতিকাল করেন।

৪. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ফয়য়ুজ্জা (র.) : তিনি একজন বিখ্যাত মুফতি ছিলেন। তিনি মুঈন্‌নুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। আমৃত্যু তিনি ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। **الْفَيَّصَلَةُ الْجَلِيلَةُ فِي حُكْمِ سَعَةِ النَّحْبَةِ** সহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের ওপর তিনি বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন। ১১৭০/৭২ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫. মুফতি দীন মুহাম্মদ খান (র.) : তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। ফতোয়া ফারাইয প্রদানের কাজে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। তিনি এ কাজেই আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৭৪ ইং তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) : তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে একজন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন আলিম ছিলেন। তিনি বেহেশতী জেওর সহ বহু ফিক্‌হী কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এসব তাঁর অমর কীর্তি। এ মহান বুজুর্গ ১৯৬৮ ইং সালে ইনতিকাল করেন।

৭. মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বরকতী (র.) : তিনি একজন বিখ্যাত মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ, আদাবুল মুফতী, হাদিয়াতুল মুসাল্লীন, তারীখে ইলমে ফিক্‌হ, ফিক্‌হস সুনান ওয়াল আসার, লুবুব উসূলিল ফিক্‌হ, আততাহীহ লিল ফিক্‌হ, মালাবুদা লিল ফিক্‌হ, তরীকায়ে হজ্জ গ্রন্থাদি তাঁর অমর অবদান। এ মহান বুজুর্গ বিশ হাজার ফতোয়ার একটি সংকলনও রেখে গেছেন, যার নাম হচ্ছে “ফতোয়ায়ে বরকতিয়া”। তবে এখনো তা প্রকাশিত হয়নি। ১৩৯৪ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৮. মুফতি আবদুল মুঈয (র.) : তিনি লালবাগ জামিয়ার প্রধান মুফতি ছিলেন। আজীবন তিনি ফতোয়া প্রদানের বিদমত আশ্রম দিয়েছেন। তিনি ইংরেজি ১৯৮৪ সনে ইনতিকাল করেন।

৯. মাওলানা আবদুর রহমান (র.) : তিনি একজন মুফতি ও ফকীহ ছিলেন। ফতোয়া ফারাইয প্রদান করা তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ইমান শিক্ষা ও তালাকের মাসাইল নামে দু'খানা কিতাব লিখে তিনি ফিক্‌ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখে যান। ইংরেজি ১৯৬৮ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

১০. মুফতি আবদুল ওয়াহিদ (র.) : তিনি বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। আজীব তিনি ফতোয়া ফারাইযের কাজ আগ্রাম দিয়েছেন। ১৪০১ বাংলা সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

১১. মুফতি মুহাম্মদ আলী (র.) : তিনি বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বিডি মাদরাসায় প্রধান মুফতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১২. মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহীম (র.) : তিনি একজন মুহাদিস ও মুফতি ছিলেন। বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি প্রধ মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। ৩৭০০ ফতোয়ার এক বিরাট পাণ্ডুলিপি ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর কীর্তি।

১৩. মুফতি বিলায়েত হুসাইন (র.) : তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুফতি ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুহাদিস ও মুফ পদে নিয়োজিত থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চায় ময়দানে অমর অবদান রেখে গেছেন।

১৪. মুফতি নূরুল হক (র.) : তিনি জিরী মাদরাসার প্রধান মুফতি ছিলেন। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর দে জোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি ইংরেজি ১৯৮৭ সালে ইনতিকাল করেন।

ফিক্‌হের ক্রম বিকাশ এবং ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অবদানও অনস্বীকার্য। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দীনি বিষয়ে হাজারো মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব পুস্তকাদি পাঠ কে অসংখ্য পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পাচ্ছে। এ পর্যায়ে ফিক্‌হ চর্চা এবং ফিক্‌হের ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথির্ বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ ফতোয়ায়ে আলমগীরী এবং হিদায়া অনুবাদের বিষয়টি অবিস্মরণীয়। বিশেষভাবে ছয় খে প্রকাশিত ফতোয়া ও মাসাইল এবং একখণ্ডে প্রকাশিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম গ্রন্থ দু'টো সারা দেশে বিপুল সাং জগাতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থ দু'টো দেশের বাইরেও দারুণ আলাড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সব ফতোয়া গ্রন্থ খে বাংলা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলা মাসাইল সম্পর্কে অবগত হওয়া সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ফিক্‌হ গ্রন্থের উপর কিতাব সংকলন ও অনুবাদ করে এ ধারাে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। তাদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এমনভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ দেশে ওলামায়ে কেরাম ফিক্‌হের বিভিন্ন কিতাব অনুবাদ করছেন এবং বিষয় ভিত্তিকভাবে কিছু কিছু গ্রন্থ রচনাও করছে এগুলো তাদের অমরকীর্তি। এতেও ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশের ধারা এগিয়ে চলছে। ভবিষ্যতে আরো বহু ধরনে অবদান এ দেশের ওলামায়ে কেরাম রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমরা আশা রাখি।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।-(৬, ৫ সূরা তালাক)

## ফিক্‌হ চতুষ্টয়ের সূচনা ও বিকাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় ফিক্‌হের সূচনা হয় যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। তবে ফিক্‌হ প্রশ্নের ও সংকলনের কাজ হিজরি প্রথম শতকে শুরু হলেও তা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে এসে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। যে সব মুজতাহিদীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিক্‌হ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে এবং যারা জীবন ব্যাপী সাধনা করে মুসলিম জীবনের সকল দিকের জন্য ইসলামি শরিয়তের সুবিন্যস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পেশ করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অবদান অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়। মূলতঃ দীনের হিফাজতের লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ জাতীয় অবিস্মরণীয় যিদমত আজাম দানের ভৌগোলিক ও যোগ্যতা দান করেছেন। ফিক্‌হ রচনা, এর প্রচারণা এবং বিকাশে তাদের যে ইখলাস, লিঙ্কাহিয়াত ও ঐকান্তিকতা ছিল, এর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চির অমর করে রাখার নিমিত্তে তাদের ফিক্‌হ তথা মাযহাবকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর ইজমা (একমত্যা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদ করার ওপর। অবশ্য মাযহাব চতুষ্টয় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার পূর্বে কিছু কাল পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ফকীহগণের মাযহাবও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। যেমন ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.), ইমাম হাসান বসরী (র.) ও ইমাম আওয়াঈ (র.)-এর মাযহাব। তৎকালীন যুগে মুসলিম জনগণ তাদেরও অনুসরণ করতেন। এ তিনটি মাযহাব হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। এরপর তাদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া ইমাম আবু সাওর (র.)-এর মাযহাবও হিজরি তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চালু থেকে পরে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ইমাম দাউদ যাহিরী (র.)-এর মাযহাব প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (র.)-এর মতে হিজরি ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায়। এতদ্বিন্ত ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (র.), সুফয়ান ইবনে উয়য়না (র.) এবং লায়স ইবনে সা'দ (র.)-এর মাযহাবও কিছু কাল পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে এগুলোর চর্চা এবং অনুসরণও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু হানাফী, মালিকী, শাফিঈ এবং হাম্বলী এই চার মাযহাবই অবশিষ্ট থেকে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বাকি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ উপরোক্ত মাযহাব চতুষ্টয়ের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করাকে অপরিহার্য বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। (আয়িমায়ে আরবা'আ; ১৯, ২০) ফিক্‌হে হানাফীর উৎপত্তি ও বিকাশের ওপর যেহেতু স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা হবে তাই এখানে শুধুমাত্র ফিক্‌হত্রয় সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হলো।

ফিক্‌হে মালিকী : ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.) এ ফিক্‌হের প্রবর্তক। মদীনা শরীফ থেকেই এ ফিক্‌হের সূচনা হয়। তারপর হিজায়ের বিভিন্ন এলাকায় তা প্রসার লাভ করে। এরপর বসরা, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন ও সুদানে, তারপর খুরাসান, কাযবীন, আযহার, ইয়ামন, নীসাপুর, পারস্য, রোম ও সিরিয়ার শহরসমূহে এর ব্যাপক বিস্তৃতি হয়। ফকীহ আব্দুর রহীম ইবনে মালিক (র.) মিসরে সর্বপ্রথম ফিক্‌হে মালিকীর প্রচলন করেন। তারপর 'আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (র.)-এর ব্যাপক প্রচার করেন। সে সময় ইমাম মালিক (র.)-এর বহু শাগরিদ মিসরে বিদ্যমান থাকায় সেখানে মালিকী ফিক্‌হ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালিকী ফিক্‌হের অনুসারী আমীর এবং কাজিদের মাধ্যমেও পশ্চিম আফ্রিকায় এ মাযহাবের বিশেষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম তকী উদ্দীন সুবকী (র.) 'আল ইকদুস সামীন' নামক কিতাবে লিখেন; নবম শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশসমূহের অধিকাংশ মুসলমান ফিক্‌হে মালিকীর অনুসারী ছিল। স্পেনে প্রথমে ইমাম আওয়াঈ (র.)-এর মাযহাব প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ফিক্‌হে মালিকীর প্রসার ঘটে। ইমাম মালিক (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান, গাযী ইবনে কায়স, ইয়াহইয়া ইবনে কায়স, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া প্রমুখ ফকীহবৃন্দ মদীনা থেকে স্পেনে এসে এখানে মালিকী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার করেন। স্পেনের বিশিষ্ট খলীফা হিশাম ইবনে আবদুর রহমান ফিক্‌হে মালিকী অনুসরণ করার জন্য দেশময় নির্দেশ জারি করেন। খলীফা

হিশাম ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়াহুইয়াকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কাজি নিয়োগ করতেন। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারি পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এসব কারণে স্পেনে ফিকহে মালিকীর সম্প্রসার ঘটে খুব বেশি।

— (ফাতোয়া ও মাসাইল; পৃঃ ৮৫-৮৬)

**ফিকহে শাফি'ঈ :** ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফি'ঈ (র.) হলেন এ ফিকহের প্রবর্তক। মিসরে এ ফিকহের সূচনা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন মিসরীয়। এরপর ইরাকেও এর বিকাশ ঘটে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হিজাজ, বাগদাদ, খুরাসান, সিরিয়া, ইয়ামন, মাওয়ারাউন নাহার, পারস্য, ভারত, আফ্রিকা এবং স্পেন পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে এসব জায়গার কোথাও কোথাও ফিকহে শাফি'ঈর ব্যাপক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং সেখানে ফিকহের দরস প্রদান করেন। তিনি যখন যেখানে গমন করেছেন তখন থেকে সেখানে শাফি'ঈ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটেছে। সিরিয়ায় প্রথমে ইমাম আওয়া'ঈ (র.)-এর মাযহাব চালু ছিল। কিন্তু ইমাম আবু যুর'আ মুহাম্মদ ইবনে ওসমান দামেশকী (র.) যখন দামেশকের কাজি হন তখন তিনি সেখানে ফিকহে শাফি'ঈ চালু করেন। তারপর অন্যান্য কাজিগণও এ ফিকহ গ্রহণ করেন। আবু যুর'আ দামেশকীর কৌশল ছিল, কোনো আলিম শাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুখতাসার লিল মুযানী মুখস্ব করলে তাকে এক দীনার পুরস্কার দিতেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) লিখেন, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়ায় শাফি'ঈ মাযহাব ব্যতীত কোনো মাযহাবেরই প্রচলন ছিল না। ইমাম সুবকী (র.) “তাবাকাতুশ শাফি'ইয়া” নামক গ্রন্থে লিখেন; মাওয়ারাউন নাহার এলাকায় মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) শেখ সা'দী (র.)-এর সহযোগিতায় ফিকহে শাফি'ঈর প্রচার করেন। আল্লামা মাকদেসী (র.) বলেন, প্রাচ্যের দেশ তথা কাওর, শাশ, আবলাক, তুস ও ফাসা ইত্যাদি স্থানে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। সারাখস, নীশাপুর ও মারু এলাকায়ও শাফি'ঈ মাযহাবের প্রচলন ছিল। ইসফারাইন এলাকায় আবু বারযা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক নীশাপুরী (র.) শাফি'ঈ মাযহাব এবং এ মাযহাবের কিতাবাদী প্রচলন করেন। বাগদাদে হানাফী মাযহাবের প্রচলন ছিল, ইমাম শাফি'ঈ (র.) সেখানে গিয়ে স্বীয় মাযহাবের প্রচার করেন। ইমাম সুবকী (র.) বর্ণনা করেন, আরবের তিহামা অঞ্চলে শাফি'ঈ মাযহাব প্রচলিত ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র.) বলেন, ফিকহায় ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মুমিন তাঁর শাসন আমলের শেষভাগে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী লোকদেরকে কাজি পদে নিয়োগ দান করেন।

— (আইম্মায়ে আরবা'আ; পৃঃ ২৭)

**ফিকহে হাফলী :** এ ফিকহের প্রবর্তক হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাফল (র.)। বাগদাদ ছিল এ ফিকহের কেন্দ্র। এই ফিকহের প্রচার উপরোক্ত ফিকহ দু'টির তুলনায় কিছুটা কম ছিল। আল্লামা ইবনে খালদুন (র.)-এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ফিকহে হাফলীতে ইজতিহাদের ব্যবহার ছিল খুব কম। এ মাযহাবের মাসআলা মাসাইল নিরূপণে হাদীসী হাদীস এবং নুসুসের ওপরই অধিকতর নির্ভর করা হতো। হাফলী হাযহাবের অনুসারী যে সকল ফকীহ ইরাক ও সিরিয়ায় অবস্থান করতেন তারা সকলেই হাদীস বর্ণনায় ছিলেন অগ্রগামী। হাফলী মাযহাব বাগদাদ অতিক্রম করে সিরিয়ায় অধিকাংশ এলাকায়ও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। এমনকি সপ্তম শতাব্দীর পর সিরিয়ায় হাফলী মাযহাবেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা সুযুতী (র.)-এর বর্ণনা অনুসারে বুখা য়ে, চতুর্থ শতাব্দীতে বাগদাদ এবং ইরাকের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য দেশেও হাফলী মাযহাব প্রসার লাভ করে। শাযখ আবদুল গনী মাকদেসী (র.) মিসরে সর্বপ্রথম এ মাযহাব প্রচলন করেন। তিনি বলেন, চতুর্থ শতাব্দীতে বসরা, দায়লাম, বিহার, খুজিস্তান ইত্যাদি এলাকায়ও হাফলী মাযহাব বিদ্যমান ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র.) ৩২৩ হিজরির এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেন যে, সে সময় বাগদাদে হাফলী মাযহাবের এত অধিক প্রভাব ছিল যে, এ মাযহাবের অনুসারী ফকীহ ওলামায়ে কোরাম যদি আমীর ওমরাদের বাড়িতে নবীয শরাব ইত্যাদি পেতেন তাহলে তারা তা ফেলে দিতেন, নর্তকী ও গায়িকাদের প্রহার করতেন, বাদ্যযন্ত্র পেলে তা ভেঙ্গে ছুরমার করে দিতেন। শরীয়ত বিরোধী কাজের ব্যাপারে তাঁদের এ কঠোর নীতির ফলে রাজা-বাদশাহ এবং সাধারণ জনগণও তাঁদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। এতে ফিকহে হাফলী প্রচারে ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সন্মুখীন হয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যাম (র.) এ মাযহাবের বিরাট শত্রু। তাঁদের মাধ্যমেই এ ফিকহের প্রসার ঘটেছে খুব বেশি।

## ইমাম আবু হানীফা (র.) : জীবন ও সাধনা

হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী এই চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.) হলেন মুজতাহিদকুল শিরোমণি এবং সমস্ত ইমামগণেরও ইমাম। তাঁর নাম নুমান এবং উপনাম আবু হানীফা। এই নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাবিত।

ইমাম আবু হানীফা বিখ্যাত ইলম নগরী কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সন্থকে মতভেদ থাকলেও প্রসিদ্ধ মতে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসন আমলে ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা যাহিদ আল কাওসারী (র.)-এর মতে, ৭০ হিজরি সনে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জন্ম এবং বিভিন্ন উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি একে প্রাধান্য দিয়েছেন। —(আসসুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃঃ ৪০১)

ইমাম আবু হানীফা (র.) অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইলমে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এ বিষয়ে এত গভীর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর প্রতি ইশারা করে বলতো, তিনি হলেন ইলমে কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। সে সময়ের যিন্দীক, নাস্তিক ও বাতিল আকীদাপন্থীদের বিরুদ্ধে মুনাযারা করে তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নিজের বক্তব্য—“শুধুমাত্র মুনাযারা ও বাহাসের উদ্দেশ্যে আমাকে বিশ বার বাসরায় গমন করতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় পূর্ণ এক বছর আবাবার কোনো সময় এক বছরের কম বাসরায় অবস্থান করতে হয়েছে। এ সময় ইলমে কালামই ছিল আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। একেই দীন ও শরিয়তের মৌলিক জ্ঞান বলে আমি মনে করতাম। এরপর আমি ভেবে-চিন্তে দেখলাম যে, সাহায্যে কেলাম আমাদের তুলনায় দীন ও শরিয়তের ব্যাপারে অধিক ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। তথাপিও তারা তর্ক-বিতর্ক এবং বাহাস-মুবাহাসায় লিপ্ত হননি, বরং দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ককে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তারা তো শরিয়তের ফিকহী মাসআলা-মাসাইল ও আহকামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর এ জন্য তাঁরা ইলমের মজলিস কায়েম করেছিলেন। তখন আমি ইলমে কালাম বাদ দিয়ে ফিকহ ও হাদীস শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করলাম।” এরপর তিনি সে যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাম্মাদ (র.)-এর ইলমী হালকায় শারিক হয়ে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম হাম্মাদ (র.)-এর দরসের এ মজলিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা হাম্মাদ (র.) ইবরাহীম নাখঈ থেকে, তিনি আলকামা (র.) থেকে, আর আলকামা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি আঠার বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট লেখাপড়া করেন। উস্তাদ হাম্মাদের ইনতিকালের পর ছাত্রগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কুফায় অবস্থিত এ মাদরাসাটির দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেন। —(আল সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃঃ ৪০১)

উল্লেখ্য যে, আবু হানীফা (র.) জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ইলমে কালাম শিক্ষায়ই রত ছিলেন-তা নয়; বরং এর সাথে সাথে তিনি ইলমে হাদীসও শিক্ষা করেছেন। তবে ঐ সময় তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষার তুলনায় ইলমে কালামকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য ২২ বছর বয়সে পৌছার পর তিনি কেবলমাত্র ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ শিক্ষায় আত্মযোগ করেন। হাম্মাদ (র.)-এর সাহচর্যে থাকাকালে দরসের অবশিষ্ট সময়ে তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসের খিদমতে হাজির হয়ে হাদীস শিক্ষা লাভ করতেন। তা ছাড়া সেকালের ইলমী মারকায় বাসরা, মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাউওয়ারার শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেলাম ও ইমামগণের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁদের সাথে বিভিন্ন ইসমী বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। এসব আলোচনার মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা (র.) যেমনিভাবে তাঁদের থেকে ইলমী ফায়দা হাসিল করেন অনুরূপভাবে তাঁরাও ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। এর ফলে গোটা বিশ্বে তাঁর ইলম ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।



ইমাম আবু হানীফা (র.) যেসব আসাতিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন তাদের সংখ্যা চার হাজারের মতো। তাদের মধ্যে হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, আমির ইবনে শুরাহবীল, আলকামা ইবনে মারসাদ কুফী, সালামা ইবনে কুহায়ল কুফী, আতা ইবনে আবী রাবাহ মাক্কী, আদী ইবনে সাবিত আনসারী, ইয়াহইয়া ইবনে সাদ্দ আনসারী, নাফি ইবনে মাওলা ইবনে ওমর মাদানী, অমর ইবনে নীনার মক্কী, আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল আ'রায মাদানী, মুহারির ইবনে দিছার, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, সিমাক ইবনে হারব কুফী, ইয়াযীদ ইবনে সুহায়ব কুফী, আবু যুরায়র, মুহাম্মদ মুসলিম মাক্কী (র.)। তাঁরা সকলেই যুগের সেরা ফকীহ এবং সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তৎকালীন ইমাম, ফকীহ বেং মুহাদ্দিসগণও এ কথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর বিশেষ উস্তাদ মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্বন্ধে বলেন, **كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ**

“তিনি তাঁর যুগের সর্বাধিক বড় আলিম ছিলেন।”—(তাহযীবুত তাহযীবঃ আত্তামা ইবনে হাজার আসকালানী, পৃঃ ২৯০) উল্লেখ্য যে, সেকালে আলিম বলে মুহাদ্দিস এবং ইলম দ্বারা ইলমে হাদীসকেই বুঝানো হতো। এ হিসেবে এ কথার মর্ম এই হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) তৎকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ছিলেন।

প্রখ্যাত হাফিজ হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) যাঁর থেকে ইয়াহইয়া ইবনে মাদ্দন, আলী ইবনে মাদীনী ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন, বলেন—

**أَدْرَكَتْ أَلْفَ رَجُلٍ رَوَيْتُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ مَا رَأَيْتُ فِيهِمْ أَفْقَهُ وَلَا أَدْرَعُ وَلَا أَعْلَمُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ ثَلَاثَةِ خَمْسَةٍ**  
আমি এক হাজার মাশায়িখে হাদীসকে পেয়েছি এবং তাদের অধিকাংশের থেকেই আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তন্মধ্যে পাঁচজনকে সবচেয়ে বড় ফকীহ, আলিম এবং মুত্তাকী হিসেবে পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে প্রথম ও সেরা ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (র.)। — (তাহযীবুত তাহযীবঃ ইবনে হাজার আসকালানী (র.); ১১ খণ্ড; পৃঃ ৩৬৬-৩৬৯)

শাকীক বলখী (র.) বলেন—**كَانَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ أَدْرَعِ النَّاسِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ وَأَعْبَدِ النَّاسِ**

ইমাম আবু হানীফা (র.) তৎকালীন যুগের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরহেযগার, সবচেয়ে বড় আলিম এবং সর্বাধিক ইবাদত ওজার ব্যক্তি ছিলেন। — (ই'লাউস সুনান; পৃঃ ৩০৯)

সুফয়ান সাওরী (র.)-এর মতে, **كَانَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ أَفْقَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ**

ইমাম আবু হানীফা (র.) পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহবিদ ছিলেন। — (প্রাণ্ডক্ত; পৃঃ ৩০৯)

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর মতে, **أَفْقَهُ النَّاسِ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَيْتُ فِي الْفَقْهِ وَشَلِّهِ**

ইমাম আবু হানীফা (র.) সমকালীন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। ফিকহ-এর মধ্যে তাঁর সমতুল্য আমি কাউকে দেখিনি। — (প্রাণ্ডক্ত; পৃঃ ৫)

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, **النَّاسُ عِبَالٌ فِي الْفَقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ**

ইলমে ফিকহে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পরিজনতুল্য।

— (মুকাদ্দিমায়ে ই'লাউস সুনান; পৃঃ ৩১৩)

এভাবে বহু ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ইলম, ফিকহ ও পরহেযগারী ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হাফিজ যাহবী, আত্তামা ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিজ ইরাকী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম তাবারী, আত্তামা সুযুতী, খতীব বেগদাদী, হাফিজ ইবনুল জাওযী, আত্তামা নববী, আত্তামা কাসতালানী এবং আত্তামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) প্রমুখ ইমামুল হাদীস ওলামা ও মাশায়িখে কেরামের মতে, ইমাম আবু হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবিঈ। তিনি হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আত্তামা সুযুতী (র.) তাবয়ীযুস্ সঈফা (تَبْيِيضُ الصَّعِيْقَةِ) গ্রন্থে দলিলের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা, হযরত আনাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স, ওয়াসিলা ইবনে

আসকা, আয়িশা বিনতে আব্জরাদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাবয়ীযুস সাহীফা গ্রন্থে আবু মা'শার (র.) থেকে বর্ণিত আছে— **أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** আব্বাসী সুযুতী (র.) বলেন, হাদীসটি সহীহ। আবু নু'আয়ম ইশ্বাহানী (র.) **عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ صَاحِبِ الرَّأْيِ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ جُنْدِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْجِيَادُ لَا أَكْلَهُ وَلَا أُحْرَمَهُ** বলেন, ইমাম আবু হানীফা হযরত আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ও আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (র.)-এর সাক্ষ্য লাভ করেছেন। (লিসানুল মীয়ান) ইয়াহইয়া ইবনে মাদ্বীন (র.) বলেন—

**إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ صَاحِبَ الرَّأْيِ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ جُنْدِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْجِيَادُ لَا أَكْلَهُ وَلَا أُحْرَمَهُ**

আব্বাসী আবু মা'শার আবদুল করীম (র.) বলেন, ইমাম আ'যম (র.) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন। কাজেই ইমাম আবু হানীফা (র.) একজন তাবীঈ এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। —(দরসে তিরমিযী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৯২-৯৩)

তাকওয়া, পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী এবং চারিত্রিক গুণাবলিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একদা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) খলীফা হারুনুর রশীদের সামনে ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) অত্যন্ত পরহেযগারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর নিকট কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তা জানা থাকলে তিনি তার উত্তর দিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু। জাগতিক শানশওকত ও জাঁকজমক তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হতে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। পরোপকার, ন্যায্যপরায়ণতা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য, সংযম, মায়ের খিদমত ও উস্তাদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি বহু গুণাবলির তিনি অধিকারী ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রধানতম উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবু সূলায়মান (র.)-এর ইনতিকালের পর ইমাম আ'যম (র.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করার পর প্রথমত তিনি স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হালকায়ে দরস কায়মে করতে ইতস্তত করছিলেন। এতে তিনি একদা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খনন করছেন। পরে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর বসরা গমন করে এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সীরা (র.)-এর নিকট এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, স্বপ্নদ্রষ্টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার বিকশিত করবেন। এরপর থেকে ইমাম সাহেব প্রসন্ন মনে ফিকহ ও ফতোয়ার দরস দিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দরস-তাদরীসের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আলিমগণ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বসরা, মুসিল, মিসর, ইয়ামন, বাহরাইন, কূফা, বাগদাদ, জায়ীরা এবং রাশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে হাদীস ও ফিকহ-এর শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহুসংখ্যক ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং কাজি ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে কাজি আবু ইউসুফ, ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী, য়াফর ইবনে হুযায়ল আখরী, হাসান ইবনে যিয়াদ, হাজাম ইবনে আবদুল্লাহ বলখী, মুগীরা ইবনে মিকসাম, যাকারিয়া ইবনে আবু য়ায়দা, মিস'আর ইবনে কুদাম, সুফয়ান সাওরী, মালিক ইবনে মিজওয়াল, ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক, হাসান ইবনে সালিহ, আবু বকর ইবনে আয্যাশ, ঈসা ইবনে ইউনুস, আলী ইবনে মুসহির, হাফস ইবনে গিয়াস, আবু আসিম নাবীল, জারীর ইবনে আবদুল হামীদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, আবু ইসহাক ফায়রা, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, মক্কী ইবনে ইব্রাহীম, আবদুর রহমান মুকরী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান (র.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আবু হানীফা (র.) ইলমে হাদীসেও বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে তিনি কিতাবুল আসার (كِتَابُ الْأَسَارِ) ফিকহী তারতীব অনুসারে বিন্যস্ত করেন। আব্বা মা সুযুতী (র.)-এর মতে এটিই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কিতাব।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল আযীয দারাওয়াদী (র.) বলেন—

كَانَ مَالِكٌ يَنْظُرُ فِى كُتُبِ ابْنِ حَبِيبٍ وَتَنْفَعُ بِهَا

ইমাম মালিক (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক প্রণীত কিতাবসমূহ দেখতেন এবং এর দ্বারা তিনি উপকৃত হতেন। এ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক প্রণীত এ কিতাব মুত্তাফা মালাক -এর পূর্বে সংকলিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জনৈক শিষ্যের মতে, ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থে সত্তর হাজার হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। —[দরসে তিরমিযী: ১ম খণ্ড; পৃঃ ৯৮]

ইমাম আযম (র.) যদিও ইলমে কালাম, ইলমে হাদীস এবং ইলমে ফিকহ ইত্যাদি সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন, তবে তিনি তাঁর জীবনকে ফিকহ-এর খিদমতেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এ জনাই তাকে আহলুল রায় বলা হতো। আহলুল রায় মানে ফিকহ শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তি। ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার মূলনীতি কি ছিল? এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, “আমি ফিকহী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সে সম্পর্কে হুকুম না পাই তবে সুন্নত অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস থেকে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসুলুল্লাহ হতে সে হুকুম না পাই তবে সাহাবীগণের মধ্যে যার কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তার কথা গ্রহণ করি। তাঁদের মতামত বর্তমান থাকতে তা প্রত্যাখ্যান করে অন্য কারো মতামত গ্রহণ করি না। যখন সাহাবীদের কোনো অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাসআলার সিদ্ধান্ত ইব্রাহীম নাখসি, শাবী, ইবনে সীরীন, হাসান, আতা, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) প্রমুখ ফকীহগণের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন আমিও ইজতিহাদ করি, যেমন তাঁরা ইজতিহাদ করেন।”

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ইজতিহাদের পদ্ধতি এই ছিল, যে সব বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কোনো অভিমত পাওয়া যেতো না সে সব বিষয়ে তিনি কিয়াস করতেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বহুতেন, আমার প্রকাশিত মতের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে হাদীসকে গ্রহণ করবে এবং জেনে রাখবে যে, এটাই আমার মত। ইমাম আযম (র.) শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল বিষয়ের সমাধান কল্পে প্রখ্যাত চল্লিশ জন ফকীহ -এর সমন্বয়ে ইলমে ফিকহের একটি মজলিস (আল-মাজমাউল ফিকহী) গঠন করেছিলেন। এই মজলিস সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত দিতো তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কোনো বিষয়ে তাঁদের একজনও যদি ভিন্নমত পোষণ করতেন তবে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হতো। এরপর একমত্যাে পৌছতে পারলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কথিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর এসব মজলিস থেকে ৬০ হাজার, কারো মতে ৮৩ হাজার আবার কারো মতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উদ্ভাবিত ও সংকলিত মাসআলার সংখ্যা পাঁচ লক্ষ গিয়ে পৌছেছে। —[জামিউল মাসাইল; পৃঃ ৩৫] আইন সংক্রান্ত সমস্যার শরয়ী ফয়সালা প্রদান করা হয় এবং এগুলো তাঁর জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন শিরোনামে সংগৃহীত হয়েছিল।

ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তিনি তৎকালীন শাসকবর্গ কর্তৃক অমানুষিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনামলে দু'বার তাঁকে বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। ফলে তাঁকে দু'বার জেলখানায় অন্তরীণ জীবনযাপন করতে হয়। তারপরও তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করায় কারাগারেই তাঁকে বিধ্বস্ত করানো হয়। এর ফলে তিনি ১৫০ হিজরি সনে কারাগারেই ইনতিকাল করেন। বাগদাদের বিখ্যাত নামক কবরস্থানের পূর্বপার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

## ফিক্‌হে হানাফী'র উৎপত্তি ও বিকাশ

ইসলামে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব বা ফিক্‌হে হানাফী'ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আ'যম ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত (র.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফী মাযহাব বা ফিক্‌হে হানাফী করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিকভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হলো, এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবু হানীফা (র.) ছিলেন মুজতাহিদ কুল শিরোমনি। সর্বোপরি অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন, এটিও এ মাযহাবের প্রসার ও প্রচারের অন্যতম কারণ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পূর্ববর্তী যুগে “ফিক্‌হ” কোনো স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র হিসাবে ছিল না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, *الْفِقْهُ أَيْ حَيِّفَةُ نَبِيِّ حَيِّفَةٍ* সমগ্র মানবজাতি ফিক্‌হে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সন্তান তুল্য। —[আসরুল ফিক্‌হিল ইসলামী; পৃঃ ২২৩]

আল্লামা মুওয়াফফিক (مُوقِف) (র.) বলেন,

وَأَبُو حَنِيفَةَ (رَح) أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ وَمِنْ قَبْلِهِ

ইমাম আবু হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই শরিয়তের ইলম তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেউই তাঁকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

আল্লামা সুহূতী (র.) বলেন,

إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ وَرَتَّبَهَا أَبَوَابًا ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَلَمْ يَسْبِقْ أَبَا حَنِيفَةَ أَحَدٌ.

ইমাম আবু হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম এই ইলমে শরিয়ত তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন এবং তা অধ্যয়ন হিসাবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তাঁর অনুসরণ করেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.)। ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে কেউ এ বিষয়ে পেছনে ফেলতে পারেনি।

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (র.) বলেন,

إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الْفِقْهِ وَرَتَّبَهُ أَبَوَابًا وَكَتَبَ عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ

ইমাম আবু হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন এবং একে অধ্যয়ন হিসাবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্‌হ যেভাবে আছে তিনিই এভাবে তা লেখার ব্যবস্থা করেন।

[মানাকিবে মুওয়াফফিক ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৩৬, তাবযীযুস সাহীফা; পৃঃ ৩৬, আল খায়রাতুল হিসান; পৃঃ ২৮ আসরুল তাশরী; পৃঃ ২২৪]

ইমাম আবু হানীফা (র.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমুহ সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ বাইশ বছর কাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি “ফিক্‌হী বোর্ড” গঠন করে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয়ভিত্তিক ভাবে ফিক্‌হের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। যা ইলমে ফিক্‌হ নামে পরিচিতি ও সুবিদিত।

ইমাম তাহাভী মিসরী (র.) মুস্তাসিল সনদে আসাদ ইবনে ফুরাত (ইমাম মালিক (র.)-এর ছাত্র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ফিক্‌হী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। শায়খ আবদুল কাদির কুরাশী (র.) তাঁদের নাম *الْحَوَامِرُ الْمُضَيَّنَّةُ* গ্রন্থে এ ভাবে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন—

(১) ইমাম যুফার (র.) (মৃ. ১৫৮ হি.), (২) ইমাম মালিক ইবনে মিজওয়াল (র.) (মৃ. ১৫৯ হি.), (৩) ইমাম মালিক ইবনে নাযীর তাঈ (র.) (মৃ. ১৬০ হি.), (৪) ইমাম মিনদাল ইবনে আলী (র.) (মৃ. ১৬৮ হি.), (৫) ইমাম নয়ঃ ইবনে আবদুল করীম (র.) (মৃ. ১৬৯ হি.), (৬) ইমাম আ'র ইবনে মায়মুন (র.) (মৃ. ১৭১ হি.), (৭) ইমাম

হিব্বান ইবনে আলী (র.) (মৃ. ১৭২ হি.), (৮) ইমাম আবু ইসমা (র.) (মৃ. ১৭৩ হি.), (৯) ইমাম মুহায়র ইবনে মু'আবিয়া (র.) (মৃ. ১৭৩ হি.), (১০) ইমাম কাসিম ইবনে মা'আন (র.) (মৃ. ১৭৫ হি.), (১১) ইমাম হাশ্বাদ ইবনে আবু হানীফা (র.) (মৃ. ১৭৬ হি.), (১২) ইমাম সায়াজ ইবনে বিসতাম (র.) (মৃ. ১৭৭ হি.), (১৩) ইমাম শরীক ইবনে আবদুল্লাহ (র.) (মৃ. ১৭৮), (১৪) ইমাম 'আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ (র.) (মৃ. ১৮০ হি.), (১৫) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) (মৃ. ১৮১ হি.), (১৬) ইমাম আবু ইউসুফ (র) (মৃত ১৮২), (১৭) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নুহ (র.) (মৃ. ১৮৩), (১৮) ইমাম হায়সাম ইবনে বশীর (র.) মৃ. ১৮৩ হি.), (১৯) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (র.) (মৃ. ১৮৪ হি.) (২০) ইমাম ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (র.) (মৃ. ১৮৭ হি.), (২১) ইমাম আদ ইবনে ওমর (র.) (মৃ. ১৮৮ হি.), (২২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৩) ইমাম আলী ইবনে মুসহির (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৪) ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.), (২৫) ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস (র.) (মৃ. ১৯২ হি.), (২৬) ইমাম ফযল ইবনে মুসা (র.) (মৃ. ১৯২ হি.), (২৭) ইমাম আলী ইবনে যিবয়ান (র.) (মৃ. ১৯২ হি.), (২৮) ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস (র.) (মৃ. ১৯৪ হি.), (২৯) ইমাম অকী' ইবনে জাররাহ (র.) (মৃ. ১৯৭ হি.), (৩০) ইমাম হিশাম ইবনে ইউসুফ (র.) (মৃ. ১৯৭ হি.), (৩১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাতান (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.), (৩২) ইমাম শুআয়ব ইবনে ইসহাক (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.), (৩৩) ইমাম আবু হাফস ইবনে আবদুর রহমান (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৪) ইমাম আবু মূতী বলখী (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৫) ইমাম খালিদ ইবনে সুলায়মান (র.) (মৃ. ১৯৯ হি.), (৩৬) ইমাম আবদুল হামীদ (র.) (মৃ. ২০৩ হি.), (৩৭) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) (মৃ. ২০৪ হি.), (৩৮) ইমাম আবু আসিম নাবীল (র.) (মৃ. ২১২ হি.), (৩৯) ইমাম হাশ্বাদ ইবনে দলীল (র.) (মৃ. ২১৫ হি.), (৪০) ইমাম মকী ইবনে ইব্রাহীম (র.) (মৃ. ২১৫ হি.)।

তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম দাউদ তায়ী (র.), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (র.), ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ তামীমী (র.) এবং ইমাম ইয়াহইয়া যায়িদা (র.)। লেখার দায়িত্ব ছিল হযরত ইয়াহইয়া (র.)-এর উপর। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

— [আসারুল ফিকহিল ইসলামী; পৃঃ ২০৯-২১০]

এ মজলিসে সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিপিবদ্ধ করা হতো। তাদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এরপর একমত পোষে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কাজেই বলা যায় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ফিকহী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব ফিকহী মাসাইল লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা কারো ব্যক্তিগত ফিকহ ছিল না; বরং এ ছিল মূলত; এক *شُورائی* (পরামর্শ ভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিকহ)। যদিও সদরে মজলিস (مَدْرَئَة) -এর দিকে সন্ধান করে আমরা এর তাকলীদ করাকেও তাকলীদে শাখসী হিসাবে অভিহিত করে থাকি।—(সীরাতুন নু'মান; পৃঃ ১৬৪) এ সম্পর্কে সদরুল আঞ্জাম আল্লামা মুওয়াফ্ফাক (র.) বলেন,

فَوَضَعَ أَبُو حَنِيفَةَ (رحم) مَذْهَبَهُ شُورَى بَيْنَهُمْ لَمْ يَسْتَعِدَّ فِيهِ يَنْفِيسَهُ دُونَهُمْ اجْتِهَادًا مِنْهُ فِي الْوَيْدِ وَمِبَالَعَةً فِي التَّصْحِيحِ لِكُلِّ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ يُلْقِي مَسْئَلَةً مَسْئَلَةً وَيَسْمَعُ مَا عِنْدَهُمْ وَيَقُولُ مَا عِنْدَهُ وَيَنْظُرُهُمْ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَقِرَّ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِيهَا ثُمَّ يَفْتِيهَا أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَصُولِ حَتَّى أَتَيْتُ الْأَصُولَ كُلَّهَا .

অর্থাৎ আবু হানীফা (র.) তাঁর মাযহাব তথা ফিকহী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিসে শুরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছু করেননি। দীন বিষয়ে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ, রাসূল এবং মু'মিনদের কল্যাণ কামনার্থেই তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিকহী বোর্ডের সামনে তিনি এক একটি মাসআলা করে পেশ করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি

তখনতেন এবং সব শেষে নিজের দলিল এবং যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এ ভাবে এক এক মাসআলার উপর মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশি সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যদের সাথে মুনাযারা বা বাহাছ করতেন। পরিশেষে কোনো একটি অভিমতের উপর বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিক্‌হে হানাফী লিপিবদ্ধ হয়। — [মানাকিবে মুওয়াফফাক; ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৩৩]

ফিক্‌হী মাসআলা লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসৃত নীতি কি ছিল, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেন, إِذَا جَاءَنَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَأْخُذُ بِهِ وَإِذَا جَاءَنَا مِنَ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ رَأَيْنَاهُمْ .

নবী কবীর ﷺ-এর কোনো হাদীস আমাদের নিকট পৌছলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মুতাবিক ফয়সালা করি; যদি আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরামের রিওয়াযতে পৌছে তবে আমরা এ সব বর্ণনাসমূহের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের কাছে তাবিসনে কেরামের বর্ণনা পৌছলে আমরা এর মোকাবেলায়! নিজেদের অভিমত পেশ করি অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করি। — [আল ইনতিকাহ; পৃঃ ১৪১]

তিনি আরো বলেন,

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَمَا لَمْ أَجِدْ فَيُسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَنْبَاءِ الصَّحَاحِ عَنْهُ التَّيْسُ ثَمَّتْ فِي أَيْدِي الْبَقَاتِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَيَقُولُ أَصْحَابِي أَخَذُ يَقُولُ مَنْ ثَمَّتْ وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ ثَمَّتْ وَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَالْعَطَاءِ فَاجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا .

আমি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদ থেকে দলিল প্রমাণ গ্রহণ করতাম। কুরআন মাজীদে দলিল প্রমাণ না পেলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং সহীহ আসার -যা নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে মানুষের কাছে পৌছেছে সে মুতাবিক ফয়সালা করতাম। এতেও না পেলে সাহাবীগণের যে কোনো একজনের অভিমত অনুসারে ফয়সালা করতাম। বিষয়টি ইব্রাহীমে নাঈফ, শা'বী, হাসান বসরী ও আতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছলে তাঁরা যেমন ইজতিহাদ করেছেন তখন আমিও তাঁদের অনুরূপ ইজতিহাদ করি। — [আল মানাকিব আল্লামা যাহবী; পৃঃ ২০]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) তাঁর নিজের ও নিজের আসাতিয়ায়ে কেরামের রায়ের উপর সর্বদাই হাদীস এবং আসারে সাহাবাকে-অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দীনকে কোনো বিষয়ে নিজের রায় প্রকাশ করা এবং সে মতে ফতোয়া দেওয়া তিনি জায়েজ মনে করতেন না।

ইমাম আযম (র.) বলতেন,

لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِي صَلَاحٍ مَاذَا فِيهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ يَلْحَقِيهِ فُسْرًا .

যতদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক বাকি থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্যে ফালাহ ও কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকেরা হাদীস বিহীন ইল্ম তলবে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে। — [মীযানুল কুবরাঃ আল্লামা শা'বানী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

তিনি আরো বলতেন, رَأَيْتُكَ وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ .

দীন বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায় অনুপাতে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বদা সুন্নাহ তথা হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যে এর থেকে বাইরে চলে যাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। — [মীযানুল কুবরাঃ আল্লামা শা'বানী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫০]

দুর্বল সনদেও যদি কোনো হাদীস পাওয়া যায় তবে এটিও রায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। একদা খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের নিকট কোনো এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করল যে, ইমাম আবু হানীফা ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীসের কোনো পরোয়া করেন না। খলীফা এ সম্পর্কে ইমাম আ'যম (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি ভুল শুনেছেন। আমি কখনো এমন করি না। আমি সর্বাত্মক কুরআনের উপর আমল করি। এরপর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ফতোয়ার

উপর, এরপর অপরাপর সাহাবীগণের ফতোয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো এক মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের একাধিক অভিমত থাকে তবে অনন্যোপায় হয়ে এ ক্ষেত্রে আমি কিয়াস করি এবং তাঁদের কোনো একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। —[মীযানুল কুবরা; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫০]

যে ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, তাঁর জবাবে আলামা শা'রানী (র.) বলেন, এ জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে যে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, নীনি ব্যাপারে বে-পরোয়া এবং কথাবার্তা অসতর্ক। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে অনবহিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا**। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭-৩৬) এ জাতীয় সতর্কবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যায় অভিযোগ করা থেকে বিরত না থাকে তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, তাঁর হৃদয় আত্মা অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। —[প্রাণ্ডুর]

উল্লেখ্য যে, আলামা শা'রানী (র.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলিম নন; বরং তিনি হচ্ছেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী আলিম। তাঁরপরও যা হক এবং সত্য, তিনি অকুণ্ঠ চিন্তে তাই বলে গেছেন। মীযানুল কুবরা নামক তদীয় গ্রন্থের এক স্থানে তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্বন্ধে লিখেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর খিদমতে এসে বলেন, আমাকে হাদীস থেকে আলাদা করে দিন। এ কথা শুনে তিনি লোকটিকে খুব শাসালেন এবং বললেন, হাদীস না থাকলে আমাদের কোনো ব্যক্তি কুরআন মাজীদে কিছুই বুঝতে পারত না। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (র.) এ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বানরের গোশত সম্পর্কে তোমার কি রায়? এর হালাল হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কোনো বিধান আছে কি? লোকটি একেবারে খামোশ হয়ে গেল। পরক্ষণে সে লোকটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে আপনার রায় কি? জবাবে তিনি বললেন, বানর চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী পশু, কাজেই তা হালাল হতে পারে না। —[মীযানুল কুবরা; পৃঃ ১৫৮]

বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৮৩ হাজার মাসআলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাসআলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিক্‌হে হানাফীতে মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছে। আলামা খাওয়ারিযিমী (র.) স্বীয় **جَامِعُ الْمَسَائِلِ** গ্রন্থে বলেন—

**قَدْ قِيلَ بَلَفَتْ مَسَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ خَمْسِيَانَةَ أَلْفٍ مَسْئَلَةٍ وَكُتِبَ وَأَصْحَابُهُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ**।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর (উদ্ধৃতিত ও লিপিবদ্ধকৃত) মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর (বক্তব্যের) প্রমাণ বহন করে। —[জামিউল মাসাইল; পৃঃ ৩৫]

ফিক্‌হে হানাফীর বিকাশ : ফিক্‌হে হানাফীর বিকাশ সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন, এ মাযহাবের উসূল ও নীতিমালা অত্যধিক ব্যাপক। মাসাইলের সংখ্যাও প্রচুর। সব বিষয়ের সূক্ষ্মাঙ্গীকৃত মাসআলার সমাধান এতে রয়েছে। ফিক্‌হে হানাফীতে এমন সহজভাবে মাসআলা মাসাইল প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মানুষের সামর্থ্য ও সাধ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল, সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা ফিক্‌হে হানাফীকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, একে তিনি গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের নিকট সমাদৃত করে দিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্‌দিসে দেহলভী (র.) বলেন, **وَأَهْلُ الرُّومِ وَمَوْرَاءَ النَّهْرِ وَالْهِنْدِ حَنِيفُونَ**। রোম, মা-ওয়ারউন্ নাহার এবং পাক ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমান সকলেই হানাফী।

— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২১২]

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্‌দিসে দেহলভী (র.) লিখেন,

**درجميع بلدان وجميع اقاليم بادشاهان حنفى اند وقضاة اكثر ومدبران واكثر عوام حنفى**।

দেশ ও রাষ্ট্রের সমস্ত কর্ণধার রাজা বাদশাহগণ ছিলেন হানাফী, কাজি তথা বিচারপতিগণ হানাফী, শিক্ষকবৃন্দ হানাফী এমনকি অধিকাংশ জনসাধারণও ছিল হানাফী। —[কলমাত طيبات; ১১ নং মাকতুব]

১৭০ হিজরি সনে খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করলে হানারী ফিক্‌হে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এতে ফিক্‌হে হানারী ফরাসি ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আকাসী খিলাফতের অধীনে যত বিচারপতি ছিল সকলেই তাঁর নির্দেশ মতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এমনভাবে নতুন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর মতামতকেই অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকেই নির্বাচন করেছিলেন যারা ফিক্‌হের ক্ষেত্রে একই ফিক্‌হের অনুসারী ছিলেন। ফলে ফিক্‌হে হানারী অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোটা অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে হযম উদুন্সুদী (র.) বলেন—

مَذْهَبَانِ اِنتَشَرَا فِي بَدْءِ اَمْرِهِمَا بِالرَّيْاسَةِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّامِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالْأَنْدَلُسِ .

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দুটি মাহহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানারী মাহহাব, আর উদুন্সুদে মালিকী মাহহাব।

— وفیات الاعيان ২য় খণ্ড; পৃঃ ২১৬।

ফিক্‌হে হানারী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ার পেছনে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপর দিকে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাগরিদ ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক, বলখ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুনিচ, জানজান, ইস্তিরাবাদ, বস্‌তাম, ফারগানা, খাওয়ারিম, ভারত ইত্যাদি স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সর্বত্র ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহহাব প্রচার করেন। নিজেরা এর উপর আমল করেন, লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত দেন, এর উপর কিতাব রচনা করেন এবং অপরাপর মাহহাবের অনুসারীদের সাথে নিজদের মাহহাবের যৌক্তিকতা ভুলে ধরে মুনাযারা ও মুবাহাসা করেন। এতেই মৌলিকভাবে ফিক্‌হে হানারী বিশ্বব্যাপী সামগ্রীকতা লাভ করে।

— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩০।

বসরায় ফিক্‌হে হানারী প্রচার : বসরায় ওসমান বাতী (র.) ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ ও মুফতি। ইমাম যুফার (র.)-এর পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ খালিদ সিমতী (র.) শিক্ষা সমাপনের পর বসরায় ফিরে যান। তিনি দরসের মজলিস কয়েম করে সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহহাব প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মজলিসে যখন তিনি ওসমান বাতীর মতের খিলাফ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত বর্ণনা করতেন তখন ওসমান বাতীর শাগরিদরা তাঁকে শুধু গালমন্দই নয় বরং প্রহার করতেও উদ্যত হতো। তাই খালিদ সিমতী (র.) সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহহাব প্রচার করতে ব্যর্থ হন। এরপর ইমাম যুফার (র.) বসরায় গমন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ ও বুদ্ধিমান, তিনি নিজে মজলিস কয়েম না করে প্রথমে ওসমান বাতীর দরসে বসতে আরম্ভ করেন। ওসমান বাতী কোনো ব্যাপারে মাসআলা বললে তিনি বলতেন, এ ব্যাপারে আরো একটি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত রয়েছে। ওসমান বাতী (র.) তা জানতে চাইলে তিনি তা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উসূল ও নীতিমালা অনুসারে বর্ণনা করতেন। শক্তিশালী প্রমাণ ও অকাটা যুক্তির কারণে ওসমান বাতী (র.) তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ইমাম যুফার (র.) যখন বুঝতে পারতেন যে, মজলিসের সকল ছাত্র তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে তখন তিনি বলতেন, এটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। তা শুনে মজলিসে অংশ গ্রহণকারীরা বলে উঠত, যে-ই বলুক না কেন এটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। এ কৌশল অলঙ্ঘনে ধীরে ধীরে মজলিসের সকল ছাত্র ইমাম যুফার (র.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং বাতীর দরস বর্জন করে ইমাম যুফারের দরসে ভিড় জমাতে থাকেন। এভাবে সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহহাবের প্রসার ঘটে।

— [লামহাতুন নয়র ফী সীরাতিল ইমাম যুফার]

পশ্চিমাদেশে হানারী মাহহাবের প্রচার : পশ্চিমা দেশ তথা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে তারাবলুচ, তিউনিচ এবং আল জাযায়রে প্রাথমিক পর্যায়ে হানারী মাহহাবের প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু যখন আসাদ ইবনে ফুরাত সেখানকার বিচারপতি নিযুক্ত হন তখন তিনি হানারী মাহহাবের প্রচারে ব্রতী হন এবং তাঁর মাধ্যমে আফ্রিকা অঞ্চলে ফিক্‌হে হানারী বিপুল প্রসার ঘটে। হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকায় ফিক্‌হে হানারী প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এরপর তা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। উদুন্সুদে ও প্রাচীন কাল থেকেই ফিক্‌হে হানারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি ইবনে ফারহনেনের অভিমত। আল্লামা মাকদিসী (র.)-এর মতে জায়ীরা অধিবাসীরা সকলেই হানারী মাহহাবের অনুসারী



হলেন। আল্লামা মাকদিসী পাশ্চাত্য দেশীয় কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের প্রচার ঘটল কিভাবে, তোমরা তাকে কখনো ইরাক সফরে যাওনি? জবাবে তিনি বললেন, মালিকী মাযহাবের খ্যাত ফকীহ ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব (র.) যখন ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করে দেশে গিয়ে আসেন তখন আসাদ ইবনে ফুরাত (র.) স্থায়ী ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করতে জ্ঞাবোধ করেন। তাই তিনি তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল না করে সরাসরি ইমাম মালিক (র.)-এর দরবারে চলে ন। তখন ইমাম মালিক (র.) বেশ অসুস্থ ছিলেন। আসাদ ইবনে ফুরাত বেশ কিছু দিন তাঁর দরবারে থাকার পর নিনী তাঁকে বললেন, ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব-এর নিকট আমি আমার ইলম আমানত রেখেছি তুমি তাঁর নিকট চলে ও, তাহলে তোমাকে সফরের এ কষ্টও সহ্য করার প্রয়োজন হবে না। শায়খের এ কথা মেনে নেওয়া তাঁর জন্য বই কঠিন ছিল। তাই তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম মালিক (র.)-এর ন্যায় ইলমের অধিকারী আর গনো আলিম আছে কি? জবাবে লোকেরা বললেন, হ্যাঁ, কুফাতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর একজন নওজোয়ান গরিদ আছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান। তিনি একজন উচ্চমানের ফকীহ। তুমি তাঁর কাছে যেতে পার। তৎপরে আসাদ ইবনে ফুরাত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দরবারে গেলেন। তিনি তাঁকে খুব যত্নসহকারে ফিকহের লীম দিলেন। ফিকহের মধ্যে তাঁর যখন বেশ ব্যুৎপত্তি হাসিল হলো তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁকে দেশে পাঠিয়ে ন। দেশে এসে তিনি ফিকহের দরস দিতে আরম্ভ করলে অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে ফিকহ লিখতে শুরু করেন। ভাবেই আফ্রিকায় হানাফী ফিকহের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে।

মিসরে ফিকহে হানাফীর প্রচার : খলীফা মাহদীর জমানায় মিসরে হানাফী ফিকহের সূচনা হয়। যতদিন পর্যন্ত সরে আব্বাসী খলীফাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত সেখানে হানাফী ফিকহের প্রাধান্য ছিল। তবে প্রাচ্য ঞ্চলে ফিকহে হানাফীর যতটা প্রচার ছিল মিসরে এর ততটা প্রচার ছিল না এবং অঞ্চলে ফিকহে হানাফী ততটা মঞ্জীকতাও লাভ করতে পারেনি।

— الرِّحْمَةُ النَّعِيْبَةُ بِالرِّحْمَةِ النَّعِيْبَةِ | ২য় খণ্ড; পৃঃ ২৪।

ডঃ আল্লামা খালিদ মাহমুদের মতে সুলতান নুরুদ্দীন (র.) একজন হানাফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ক্ষমতার নন্দে বসার পর “মানাকিবে ইমাম আবু হানীফা”-এর উপর কিতাব প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে রিয়ায় ফিকহে হানাফীর প্রচার ঘটে। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে মিসরেও এ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে। এমনিভাবে এ য়হাব মিসরীয় লোকদের নিকট সমাদৃত হতে থাকে। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (র.)-এর মাধ্যমেও ফিকহে হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি কাহেরাতে “মাদরাসায়ে সিউফিয়া” নামে একটি হানাফী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ দরাসার মাধ্যমে ফিকহে হানাফী ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তুরস্কের ওসমানী নীফাগণ যখন মিসর দখল করে নেন তখন তাঁরা দেশের সমস্ত আদালতে হানাফী ফকীহদের থেকেই কাজি বর্টিত ও মনোনীত করেন। এতে ছাত্রদের মধ্যে হানাফী ফিকহ হাসিল করার আগ্রহ চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। এ বেও মিসরে ফিকহে হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তখন হানাফী ফিকহ অনুসারেই সমস্ত ফতোয়া ও ফয়সালা প্রদান ঞা হতো। এভাবে সরকারী পঠপোষকতায় হানাফী মাযহাব মিসরে একটি জাতীয় মাযহাবের রূপ পরিগ্রহ করে।

— [আসারুল ফিকহিল ইসলামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩৩।

সিরিয়াতে ফিকহে হানাফীর প্রচার : সিরিয়াতে প্রথম থেকেই হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। এখনকার ধিবাসী প্রায় সকলেই এ মাযহাবের অনুসারী ছিল। এখানে সরকারী পঠপোষকতা না থাকলেও ফিকহে হানাফীর গার ও প্রসারে কোনো রূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

— (প্রাগুক্ত)

প্রাচ্য দেশে ফিকহে হানাফীর প্রচার : প্রাচ্য দেশ তর্ক ইরাক, খুরাসান, সীসতান এবং মা-ওয়ারাউন নাহারে ফিকহে হানাফীর প্রাধান্য ছিল। এখানকার কিছু কিছু অধিবাসী শাফিঈ মাযহাবেরও অনুসারী ছিল। মসজিদে এবং মীসর উমারাদের দরবারে হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে কখনো কখনো মুনাযারার মজলিসও ঞঘটিত হতো। এ পথ ধরে ফিকহের বিষয়টি দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। তবে এর ফলে মাযহাবী ঞম্প্রদায়িকতাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনি করে মাযহাবী সাম্প্রাদায়িকতা মানুষের মধ্যে চরম মূদ ও স্থবিরতা এনে দেয়। যার ফলে মানুষিক ঞশক্ততা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

রাশিয়া ও পারস্যে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার : আরমিনিয়া, আজরবায়জান, তিব্বীয় এবং আহওয়ায় অঞ্চলে হানাফী মাহাবের প্রাধান্য ছিল। এমনিভাবে পারস্য দেশে প্রথমে ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য ছিল। পরে সেখানে শিয়া ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ আবু যুহরা (র.) বলেন, ইরানে প্রথমে হানাফী ফিক্‌হের প্রাধান্য ছিল। পরে সেখানে ইসনা আশারিয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত উপমহাদেশে ফিক্‌হে হানাফীর প্রচার : পাক ভারত, বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী। এখানে শাফিঈ মাহাবের অনুসারীও কিছু লোক আছে। তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

— [আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামি; ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৩৬-২৩৮]

### ফিক্‌হে হানাফীর বৈশিষ্ট্য

ফিক্‌হে হানাফীর বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্য হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :-

১. হানাফী ফিক্‌হে রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত তথা যুক্তির সামঞ্জস্যতা রয়েছে।
২. হানাফী ফিক্‌হে অপরাপের ফিক্‌হের তুলনায় সরল এবং সহজে পালনযোগ্য।
৩. হানাফী ফিক্‌হে বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক।
৪. তাহযীব, তামাদুন বা কৃষ্টি-কালচারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিক্‌হের তুলনায় এতে অনেক বেশি।
৫. হানাফী ফিক্‌হে অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ। কারণ এতে প্রজা সাধারণ বিশেষত আমুসলিম প্রজাদের দাবি ও চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
৬. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসআলা মাসাইল হানাফী ফিক্‌হে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসম্মত।
৭. হানাফী ফিক্‌হে কুরআন ও হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের কোনো আয়াতই আমলের আওতা বহির্ভূত থাকেনি। (ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রম বিকাশ পৃঃ ৭২)

### ফিক্‌হে হানাফীর দলিল

ফিক্‌হে হানাফীর মূল দলিল হচ্ছে সাতটি : (১) কিতাবুল্লাহ (কুরআন মাজীদ), (২) সুন্নাহ (হাদীস), (৩) সাহাবায়ে কেরামের অভিमत, (৪) ইজমা, (৫) কিয়াস, (৬) ইস্তিহাসান, (৭) উরফ। এ সব দলিলের ভিত্তিতেই ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.) মাসআলা-মাসাইল ইস্তিয়াত তথা উদ্ভাবন করতেন।

১. কিতাবুল্লাহ : তথা কুরআন মাজীদ। ইসলামি ফিক্‌হের মূল উৎসই হলো, এই কুরআন মাজীদ। কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রদীপ স্তম্ভ, যা কিয়ামত পর্যন্ত দীপ্তিমান থাকবে। এতে শরিয়তের সামগ্রিক বিধান কলী ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়তের অন্য যত উৎস আছে-সবই এর থেকে উদ্গত।

২. সুন্নাহ : তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস। মূলত ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো এই হাদীস। কুরআন যেমনিভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল, হাদীসও ঠিক তেমনভাবে শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। হাদীস কুরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগিতে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যায় যে সব কথা বলেছেন এবং যে সব কাজ করেছেন মূলত একেই হাদীস বলা হয়। হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। যারা হাদীস মানে না তাঁরা মূলত ইসলামকেই মানে না।

৩. আকওয়ালে সাহাবা : তথা সাহাবায়ে কেরামের অভিमत। ফিক্‌হে হানাফীর তৃতীয় মূল উৎস হলো, সাহাবায়ে কেরামের অভিमत ও তাঁদের ফতোয়া। ইমাম আবু হানীফা (র.) মাসাইল ইস্তিয়াত ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। যখন তিনি কোনো বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং সে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের কোনো বক্তব্য পেতেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্য হতে যে কারো বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যাওয়া অবস্থায় অন্য কারো বক্তব্য তিনি গ্রহণ করতেন না। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের মতামত না পাওয়া অবস্থায় তিনি ইজতিহাদ করতেন, তাবদ্বিগণের তাকলীদ করতেন না।

৪. ইজমা : অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদীনে কেরামের শরিয়তের কোনো হুকুমের ব্যাপারে ঐকমত্য যা। ডঃ আবু যুহরা ইজমার সংজ্ঞা বলেন,

هُوَ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ -

কোনো এককালে উম্মতে ইসলামিয়ার মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনো শর'ঈ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার নাম ইজমা  
— [শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪-৩৫]

মোল্লা জিউন (র.) বলেন,  
هُوَ فِي اللُّغَةِ اِلْتِفَاقٌ وَ فِي الشَّرِيعَةِ اِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ صَالِحِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُجْتَمِعَةٍ فِي عَصْرِ رَأَى عَلَى أَمْرِ قَوْمِي أَوْ فِعْلِي -

ইজমার আভিধানিক অর্থ— একমত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় “একই যুগের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ -এর তের নেককার মুজতাহিদগণের “উক্তি বা কর্মজাতীয়” কোনো বিষয়ের উপর ঐকমত্য হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

— [নূরুল আনওয়ার; পৃঃ ২২৩]

ইজমার উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিদ'আতী এবং ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের লোকদের ঐকমত্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। না হানাফী ফকীহগণের মতে এ জাতীয় লোকদের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, ইজমা শরিয়তের প্রামাণ্য ল। হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিকহবিদগণ বলেছেন, ইজমা কাতঈ বা অকাট্য দলিল হিসাবে গণ্য। আর কেউ বলেছেন, ইজমা যন্নী দলিল হিসাবে গণ্য। শায়খ ফখরুল ইসলাম (র.) বলেন,

الْإِجْمَاعُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَعْلَامًا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَجَعَلَهُ كَالْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْأَدْلَى الْقَطْعِيَّةُ يَوْ قَطْعًا لَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ شَاهَدُوا وَعَانَيْنَا وَالثَّانِي إِجْمَاعٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ فِي فِصْلِ غَيْرِ مُجْتَهِدٍ فِيهِ فَبِ كَالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الْمُسْتَفِيضِ وَالثَّالِثُ فِي فِصْلِ مُجْتَهِدٍ فِيهِ فَإِنَّهُ فِي مِثْلِ الْحَالِ يَكُونُ كَخَيْرِ الْأُيُغْتَبَرُ ظَنًّا فَقَطْ تَكُونُ فِيهِ شُبُهَةٌ -

ইজমার তিনটি স্তর রয়েছে :

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইজমা হলো : সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। এটি মুতাওয়াতি'র পর্যায়ের হাদীস এবং টি দলিলের ন্যায় গণ্য। এর দ্বারা কাতঈ ও অকাট্য ইলম হাসিল হয়। কেননা তাঁরা নবী করীম ﷺ -কে খছেন এবং তাঁরাই হলেন, শরিয়তের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২. তাবিঈগণের ইজমা : যা গায়ের ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজমা মশহুর হাদীসের ন্যায় গণ্য।

৩. তৃতীয় পর্যায়ের ইজমা হলো : যা কোন ইজতিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজমা খবরে হিদের ন্যায় যন্নী হিসাবে গণ্য। এতে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

(الْإِسْمَاعُ أَبُو حَنِيفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ وَأَرَاءُهُ وَفَقْهُهُ)

উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাস সে অবস্থাতেই প্রযোজ্য হবে, যদি ইজমা মুতাওয়াতি'র পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসে। যদি মার বিষয়টি খবরে ওয়াহিদের ন্যায় পৌঁছে থাকে তবে এর দ্বারা ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। ও তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যদিও ঈ ও অকাট্য দলিল। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা খবরে ওয়াহিদের ন্যায় যন্নীই হবে।

যা যে, ইজমা সর্বাবস্থায় কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেন,

مَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ فَقَدْ أَبْطَلَ دِينَهُ لِأَنَّ مَدَارَ أَصُولِ الدِّينِ كُلِّهَا وَمَرْجِعُهَا إِلَى إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ -

যে ব্যক্তি ইজমা অস্বীকার করল সে দীনকে নিঃশেষ করে দিল। কেননা দীনের সকল পর্যায়ের উসূল তথা নীতি মুসলমানদের ইজমার উপরই নির্ভরশীল। (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল পর্যায়ের উসূল ইমামই াসকে ইসলামি আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা, নিত করা ইত্যাদি।

৫. কিয়াস : কিয়াস ইসলামি শরিয়তের প্রামাণ্য দলিল। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল পর্যায়ের উসূল ইমামই াসকে ইসলামি আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা, নিত করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়—**تَفْذِيرُ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ وَالْعَلْوُ** মূল বিষয়ের সাথে হুকুম ও ইল্লাতের মধ্যে কোনো শাখা বিষয়কে তুলনা করাকে কিয়াস বলা হয়। —[নূরুল আনওয়ারঃ পৃঃ ২২৮]

বস্তুত যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই সে জাতীয় বিষয়কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোনো বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবন করাকে কিয়াস বলা হয়। ইসলামি আইনের উৎস হিসাবে কিয়াসের মর্যাদা কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের পরেই। কিয়াসের এ মর্যাদার কারণ অতি স্পষ্ট। কেননা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা কিয়াসের হজ্জিয়াত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নীতি ছিল, তিনি যখন কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়াতে কোনো সমাধান না পেতেন, তখন তিনি ইজতিহাদ করতেন এবং সংঘটিত সমস্যার উপর সামগ্রিকভাবে সুস্মাতিসুস্ক দৃষ্টি রেখে কখনো কিয়াস এবং কখনো ইসতিহসানের উপর আমল করতেন। এ কারণে কোনো কোনো আলিম বলেছেন, কিয়াস মূলত নুসূসেরই তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কাজেই কিয়াস নুসূস বর্হীভূত বা এর বিপরীত কোনো কিছু এ কথা বলা ঠিক নয়।

৬. ইসতিহসান : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ইসতিহসান শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা কিয়াসে জলী (প্রকাশ্য কিয়াস)-এর মোকাবেলায় আসে। অর্থাৎ কিয়াসে জলীকে ছেড়ে কিয়াসে খফী (অপ্রকাশ্য কিয়াস) অবলম্বন করাকেই ইসতিহসান বলা যায়। কেননা কিয়াসে জলী অনেক সময় এমন একটি বিষয় চায় যা নস, (কুরআন, হাদীস) ইজমা এবং উরফের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় উসূল বিদগণের মতে কিয়াসে জলীকে বাদ দেওয়া পছন্দনীয়, তাই একে ইসতিহসান (পছন্দ করা) বলা হয়। উসূলে ফিকহের পরিভাষায় সাধারণত ইসতিহসান বলতে কিয়াসে খফী, আর কিয়াস বলতে কিয়াসে জলীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। মূলত ইসতিহসান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও উরফ বিরোধী কোনো কিছু নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষ কিয়াসকে পরিহার করে এ সর্বের উপর আমল করার নামই হলো ইসতিহসান।

৭. উরফ : হানাফী ফিকহে উরফ শরিয়তের সহকারী উৎস হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান না করা গেলেই সে অবস্থায় ইসতিহসান অথবা উরফ দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা হতো। এ বিষয়ে সাহল ইবনে মুহাম্মিদ (র.) বলেন,

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذَ بِالْحَقِّ وَفَرَّاسَ الْقَبِيحِ وَالتَّظَرُّفِ مَعَامَلَاتِ النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوا عَلَيْهِ وَصَلَحَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ يَمْضِي الْأَمْرُ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا قَبِعَ الْقِيَاسُ يَمْضِيهَا عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ مَا دَامَ يَمْضِي لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا يَتَعَامَلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ .

ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের মূল কথা হলো, নির্ভরযোগ্য বস্তু গ্রহণ করা, দোষযুক্ত বস্তু থেকে পলায়ন করা এবং মানুষের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিয়াসের উপর অবিচল থাকতো এবং তাদের মু'আমালা যথাযথভাবে পরিচালিত হতো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিয়াসের মাধ্যমেই ফয়সালা করতেন। যখন তিনি কিয়াসের মধ্যে কোনো অসুবিধা লক্ষ্য করতেন তখন মানুষের কার্যাবলিকে ইসতিহসানের আলোকে সমাধান করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো অসুবিধা না দেখতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা এভাবেই চলতো। আর কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মুসলমানদের আচার-আচরণ তথা সামাজিক প্রথার দিকে ফিরে আসতেন।

— [শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দু'টি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) যখন কোনো বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও ইজমা না পেতেন তখন তিনি মানুষের বিভিন্ন বিষয়কে কিয়াস ও ইসতিহসানের আলোকে সমাধান করতেন। আর শেখোক্ত বিষয় দু'টোর মধ্যে যেটি মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হতো এবং যেটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অধিকতর নিকটবর্তী হতো তিনি সেটিই গ্রহণ করতেন।

২. কোনো বিষয়ে কিয়াস ও ইসতিহসান দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা না গেলে সে ক্ষেত্রে তিনি মানুষের কার্যাবলির প্রতি নজর করতেন। কার্যাবলি অর্থ সে “উরফ” যা মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রচলিত। তিনি উরফের উপর তখনই আমল করতেন যখন কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের কোনোটিতেই শরঈ দলিল না পেতেন এবং না সে বিষয়ে কিয়াস ও ইসতিহসানের নীতি অবলম্বনের কোনো অবকাশ ছিল। এহেন অবস্থায় কোনোটিতে সমাধান না পেয়েই কেবলমাত্র তিনি ‘উরফ’-এর নীতি অবলম্বন করতেন। উল্লেখ্য যে, ‘উরফ দু’ প্রকার।

১. উরফে সহীহ, যা “নস”-এর পরিপন্থী নয়।

২. উরফে ফাসিদ, যা “নস”-এর পরিপন্থী। মোম্বাদকথা হচ্ছে, উরফ শরিয়তের সহকারী উৎস। সমস্যার সমাধানে কোনো দলিল না পাওয়া গেলেই কেবল ইমাম আবু হানীফা (র.) উরফ-এর নীতি অবলম্বন করতেন।

— [শামী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫-৩৬]

### ফিকহে হানাফী ও হাদীস

উপরে যে সব দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোই হলো ফিকহে হানাফীর দলিল। তন্মধ্যে চারটি হলো বুনিয়াদী দলিল, আর বাকি তিনটি হলো সহকারী দলিল বা সহকারী উৎস। এ সবের উপর ভিত্তি করেই ফিকহে হানাফী রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ফিকহে হানাফীর কোনো কথাই উপরোক্ত দলিলসমূহের বাইরে নয়। বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের বাইরে নয়। তা সত্ত্বেও কতক লোক এ কথা প্রমাণ করার অহেতুক চেষ্টা করেছেন যে, মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) হাদীসের উপর খুব কমই اِسْتِئْذَان (নির্ভর) করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, তিনি কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের এ বক্তব্য যথার্থ কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, আসলেই কি ইমাম আবু হানীফা (র.) হাদীসের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না কি প্রতিকূল? যদি তিনি কতক হাদীসের ব্যাপারে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে তা কি কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাহে মাসহরার দলিলের ভিত্তিতে, না কি বিনা দলিলে? এ বিষয়গুলো জানার পরই আমরা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ভূমিকা এবং مَرْفُوع যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব। বস্তুত যারা বলেন, “ইমাম আবু হানীফা (র.) কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন” তাঁদের এ বক্তব্য একেবারেই অবাস্তব। এ জাতীয় অহেতুক ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন—

كَذَبَ وَاللَّهِ وَافْتَرَى عَلَيْنَا مَنْ يَقُولُ إِنَّا نَقْدِمُ الْقِيَاسَ عَلَى النَّصِّ وَهَلْ يَحْتَاجُ بَعْدَ النَّصِّ إِلَى الْقِيَاسِ ؟

যে ব্যক্তি বলে, আমরা কিয়াসকে নস (কুরআন-হাদীস)-এর উপর প্রাধান্য দেই, আল্লাহর কসম! সে আমাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। (আমরা বলব) নস থাকা অবস্থায়ও কি কিয়াসের প্রয়োজন আছে?

— [আল মীযান : আল্লামা শারানী; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কিয়াসকে সে স্থানই দিয়েছেন যা এর প্রাপ্য। তিনি বলেছেন, কিয়াসের প্রয়োজন তো তখন যখন নস পাওয়া যাবে না। যখন নস পাওয়া যাবে তখন কিয়াসের প্রয়োজন নেই। এমনকি তিনি বলেছেন, اَمَّا أَمْرًا أَوَّلًا بِكُتَابِ اللَّهِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأُظْهِرَ الصَّحَابَةِ وَتَعَمَّلَ بِمَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ فَإِنْ اَخْتَلَفُوا فَسْنَا حُكْمًا عَلَى حُكْمٍ بِجَمَاعِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْمَسْئَلَتَيْنِ حَتَّى يَبْضُغَ الْمَعْنَى.

— [আল মীযান; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫১]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

إِنَّا نَأْخُذُ أَوَّلًا بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأُظْهِرَ الصَّحَابَةِ وَتَعَمَّلَ بِمَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ فَإِنْ اَخْتَلَفُوا فَسْنَا حُكْمًا عَلَى حُكْمٍ بِجَمَاعِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْمَسْئَلَتَيْنِ حَتَّى يَبْضُغَ الْمَعْنَى.

আমরা প্রথমত কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদকে দলিল গ্রহণ করি। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। তাঁরপর সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা। সাহাবায়ে কেরাম যে বিষয়ে সর্বসম্মত, আমরা এর উপর আমল করি। যদি তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায়, তখন আমরা সামগ্রিক ইল্লাহের ভিত্তিতে এক হকুমকে অন্য হকুমের উপর কিয়াস করি যে যাবৎ না নসের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। (প্রাপ্তক)

তাঁর থেকে আরো উল্লেখ রয়েছে,  
 إِنَّا نَعْمَلُ أَوَّلًا بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بِأَحَادِيثِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَمْرِو عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

আমরা প্রথমে কুরআন মাজীদের উপর আমল করি, তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুননের উপর, এরপর আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)-এর আছার তথা বক্তব্যের উপর।

তিনি আরো বলতেন,  
 مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بَابِي وَأَمْسَى وَلَيْسَ لَنَا مُخَالَفَتُهُ. وَمَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ تَخَيَّرْنَا وَمَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمْ فَهَمَّ رَجُلًا نَحْنُ رَجُلًا.

যা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তা আমার মাথার মুকুট ও চোখের জ্যোতি হিসাবে বিনাবাক্য ব্যয়ে গৃহীত, এতে আমার মতবিরোধের কোনো অবকাশ নেই। আদ্বাহর রাসূলের প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আর যা কিছু তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, এর থেকে আমরা আমাদের পছন্দমতে যার বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ করে থাকি। আর যা কিছু তাঁদের ছাড়া অন্য কারো (তাবিঈ) থেকে বর্ণিত, সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, তাঁরাও পুরুষ আমরাও পুরুষ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের ন্যায় ইজতিহাদ করি। — [প্রাপ্তক; পৃঃ ৫২]

বর্ণিত আছে যে, একদা খলীফা আবু জা'ফর মানসুর ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে এ মর্মে পত্র দিয়েছিলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।" ইমাম আ'যম (র.)-এর জবাবে লিখেছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সত্যিকার বক্তব্য তা নয়, যা আপনি শুনেছেন। আমি তো প্রথমেই কুরআন মাজীদের উপর আমল করে থাকি। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী (রা.)-এর ফতোওয়ার উপর আমল করি। এরপর অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়ার উপর আমল করি। যদি কোনো মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমি কিয়াস করি। খালিক ও মাখলূকের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। — [আল মীযান; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৫২]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্টতায়ন হয় যে, কিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া কয়িন কালেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নীতি হতে পারে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) তো দূরের কথা কোনো ফকীহই এ নীতি অবলম্বন করতে পারেন না। আর এ কারণে তিনি مُتَعَارِضٌ (বাহ্যত সংঘর্ষিক), দুই হাদীসের ক্ষেত্রে تَطْبِيقٌ (সামঞ্জস্য বিধান করা), تَرْجِيحٌ (অগ্রাধিকার প্রদান), تَسْنَخٌ (রহিতকরণ) বা تَسْقَاطٌ (বাদ দেওয়া) নীতি অবলম্বন করেছেন। সর্বোপরি বাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসকে একত্রিত করে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাসআলা তুলে ধরা হলো।

مُسْنَلَةُ رُفْعِ الْيَدَيْنِ : তাকবীরে তাহরীমার সময় رُفْعُ يَدَيْنِ করা অর্থাৎ উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করা সুনন। এ বিষয়ে ইমাম চতুর্থের সকলেই একমত। এ ছাড়া রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় رُفْعُ يَدَيْنِ করা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সুনন নয়। এ বিষয়টি একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন—  
 (١) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (رض) أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

আলকামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করতেন, আমি কি তোমাদেরকে সেভাবে সালাত আদায় করে দেখাব? অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া আর অন্য কোনো সময় তিনি তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করেননি। — [তিরমিযী শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৫]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হযম যাহিরী (র.) তৎপ্রণীত আল মুহাল্লা (المحلى) গ্রন্থে একে সহীহ বলে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। আত্লামা আহমদ শাকির (র.) শরহে তিরমিযীতে উল্লেখ করেছেন যে,

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَفَاطِ وَمَأْتَلُوا فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ -

হাদীসটি সহীহ। আত্লামা ইবনে হযম যাহিরী (র.) এবং অপরাপর হুফফায়ে হাদীস এটিকে সহীহ বলে নিজদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর যারা এই হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তাঁদের এ আপত্তি মূলত কোনো আপত্তিই নয়। — [শরহে তিরমিযী আহমদ শাকির; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৪১]

(২) عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أَدْبِهِ ثُمَّ لَا يَمُوعُ.

হযরত বারী ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। এরপর তিনি আর কখনো হাত উত্তোলন করতেন না।

— [আবু দাউদ শরীফ; ১ম খণ্ড; পৃঃ ১০৯]

আত্লামা মারিদীনী (র.) “আল জাওহরুন নকী” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি হুবহু এই শব্দেই আল কামিল (الْكَامِلُ لِإِبْنِ عَدِيٍّ) তে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে এই শব্দেই তা দারাকুতনী এবং মু'জামে তাবারানী (আওসাত) তেও উদ্ধৃত হয়েছে। আত্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) عَنْ الْفَرَقْدَيْنِ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ব্যাপারে যত ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এক এক করে তিনি এই সব ক'টিরই জবাব দিয়েছেন। — [দরসে তিরমিযী; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩২-৩৩]

(৩) عَنْ عَبْدِ بْنِ زَيْبٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَرْفَعُ.

‘আব্বাদ ইবনে যুযায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তিনি সালাতের শুরুতে একবার উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর সালাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি আর কোথাও তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন না। — [বায়হাকী শরীফ সুত্র নসবুর রায়; ১ম খণ্ড; পৃঃ ৪০৪]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) الْوَرَايَةُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَيْدَايَةِ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, (يَسْتَرْفِئُ إِسْنَادُ) (হাদীসটির সনদ দেখা উচিত)। আত্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, আমি হাফিয ইবনে হাজার (র.)-এর নির্দেশ পালনার্থে হাদীসটির সনদ তন্ন তন্ন করে যাচাই করে দেখেছি যে, এর প্রত্যেক রাবীই সিকা ও নির্ভরযোগ্য। তবে আব্বাদ ইবনে যুযায়র (র.) হলেন তাবীঈ। এই হিসাবে হাদীসটি মুরসাল হাদীস হিসাবে পরিগণিত হয়। আর মুরসাল হাদীস জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে হুজ্জত (দলিল হিসাবে স্বীকৃত)।

(৪) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَائِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَُا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ.

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে অস্থির ও আশ্বালনকারী উটের ন্যায় উভয় হস্ত উত্তোলনকৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সালাতে ধীরস্থির থাকবে। — (সহীহ মুসলিম; ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৮১)

হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাল্বীসুল হাবীর গ্রন্থে এ মর্মে আপত্তি করেছেন যে, - مِنْ أَحَدٍ يَحْدِثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَى مَنَعِ الرَّقْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ.

অর্থাৎ ঋকুতে যাওয়ার সময় রফেঁ যিদ্দীন নিষিদ্ধ হওয়ার উপর যারা জাবির ইবনে সামুরা (রা.) -এর এ হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের ইলমের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত ইবনে হাজার (র.)

-এর আপত্তির সারমর্ম হচ্ছে, এ হাদীসের সম্পর্ক رَفَعِ يَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ -এর সাথে, ঋকুর সাথে নয়। এ আপত্তির জবাবে আত্লামা জামালুদীন যায়লাঈ (র.) নসবুর রায় (النَّصَبُ الرَّايَةُ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি একাধিক

— [দরসে তিরমিযী; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৩৬]

সুফয়ান ইবনে উয়ায়না (র.) বলেন, একদা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওয়া'ঈ (র.) মক্কা শরীফের দারুল খায়াতীন-এ মিলিত হলেন। এ সময় ইমাম আওয়া'ঈ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলন কালে رُفِعَ يَدَيَّ করেন না? জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র.) বললেন, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উত্তোলনকালে উভয় হাত উঠানোর বিষয়টি সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, এ কারণে আমি তা করি না। ইমাম আওয়া'ঈ (র.) বললেন, এটি কেমন করে হতে পারে? وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ (অথচ আমাকে যুহরী (র.) বলেছেন, তিনি সালিম (র.) থেকে, সালিম (র.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাত উঠাতেন।) তখন ইমাম আবু হানীফা (র.) বললেন, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ إِفْتِنَاحِ الصَّلَاةِ وَلَا يَغْوُو إِلَى شَيْءٍ مِنَ ذَلِكَ (আমাকে হাম্মাদ (র.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্রাহীম (র.) থেকে, ইব্রাহীম (র.) আলকামা ও আসওয়াদ (র.) থেকে এবং তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র নামাজ শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। তা ছাড়া নামাজের মাঝখানে আর হাত উঠাতেন না।)। তখন ইমাম আওয়া'ঈ (র.) বললেন, أَحَدَيْتُكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَتَقُولُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ -

(আমি যুহরী (র.)-এর সূত্রে সালিম এবং তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা শুনাচ্ছি আর আপনি আমাকে হাম্মাদ (র.)-এর সূত্রে ইব্রাহীম (র.)-এর বর্ণনা শুনাচ্ছেন? ইমাম আবু হানীফা (র.) জবাবে বললেন, হাম্মাদ (র.) যুহরী (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন। ইব্রাহীম (র.) সালিম (র.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন। আর আলকামা (র.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে কোনো অংশেই কম নন। যদিও ইবনে ওমর (রা.) সাহাবী ছিলেন। আর আসওয়াদ (র.) তো অনেক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে,

إِبْرَاهِيمُ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا فَضْلُ الصُّحْبَةِ لَقُلْتُ إِنَّ عِلْفَمَةَ أَفْقَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ نَبِيُّ اللَّهِ .



ইব্রাহীম (র.) সালিম (র.) -এর তুলনায় বড় ফকীহ ছিলেন, যদি সুহবত তথা সাহচর্যের ফজিলত না থাকতো তবে আমি বলতাম, আলকামা (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বড় আলিম এবং ফকীহ ছিলেন। আর আবদুল্লাহ তো হলেন আবদুল্লাহই।

আবদুল্লাহ দ্বারা বুঝানো হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে। অর্থাৎ উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে কেউই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সমকক্ষ নয়। উপরোক্ত বিতর্ক থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দু' বর্ণনার মধ্যে বিরোধকালে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) রাবীর ফিকহী জ্ঞানকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। অর্থাৎ যে রাবী ফিকহের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতেন তাঁকেই প্রাধান্য দিতেন। এর কারণ ছিল, হানাফী ফকীহগণের মতে যিনি ফকীহ, তাঁর বর্ণনার সাথে যিনি ফকীহ নন তাঁর বর্ণনার মোকাবেলা হতে পারে না। কেননা ফকীহ রাবী হিফয ও যবতের দিক থেকে অধিকতর শক্তিমান। সুতরাং ফকীহ রাবীগণের রিওয়ায়াতের অপরাপর রাবীর রিওয়ায়াতের তুলনায় অপ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। — [الإمام أبو حنيفة حياته وعصره وأراءه وفقهه] ২৪৪-২৪৫

مَسْنَدُ التَّائِبِينَ : নামাজে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পর “আমীন” আন্তে বা জোরে বলা উভয়ই জায়েজ। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আমীন আন্তে বলা উত্তম। কেননা হাদীসে আছে, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

আলকামা ইবনে ওয়াইল (র.) তাঁর পিতা ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তিলাওয়াত করার পর আমীন বললেন এবং তিনি তা আন্তে বললেন।

— [সুনানে তিরমিযী-১ম খণ্ড; পৃঃ ৩৪]

তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে,

كَانَ عَمْرٌ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرُانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَلَا بِالتَّعَوُّدِ وَلَا بِالتَّائِبِينَ.

হযরত ওমর ও আলী (রা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আউযুবিলাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম এবং আমীন (এই তিনটি বিষয়) জোরে বলতেন না; (বরং আন্তে আন্তে বলতেন)। — [শুর্হ মা'আলিল আসার-১ম খণ্ড; পৃঃ ৯৯]

এমনভাবে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলতেন,

أَنْعَ يَخْفَيْنَ عَنِ الْإِمَامِ التَّعَوُّدُ وَيُسَمِّى اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأُمِينَ وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

চারটি বিষয় ইমাম থেকে গোপনে পাঠ করা হবে। (১) আউযুবিলাহি, (২) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (৩) আমীন, (৪) আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। — [কানুন্সুল উমাল-৪র্থ খণ্ড; পৃঃ ২৪৯]

ইমাম তাবারী (র.) বলেন,

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিসিনে কেবলমাত্র আমীন বলতেন। — [ইলাউস সুনান ২য় খণ্ড; পৃঃ ২২৩]

مَسْنَدُ الْإِمَامِ : জামা'আতে ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা অবস্থায় মুসল্লীগণ সূরা ফাতিহা এবং কিরাআত পাঠ করবে কিনা? এ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, يَجُوزُ (যে নামাজে কিরাআত জোরে পড়া হয়) এবং سَرَى (যে নামাজে কিরাআত আন্তে পড়া হয়) উভয় নামাজেই ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া মাকরুহ তাহরীমী। এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, তাহলে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةً فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَزَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে কিরাআত পড়তেন, এমতাবস্থায় তিনি এক আনসারী সাহাবীর কিরাআত শুনতে পেলেন, তখনই **وَأَذِى الْقُرْآنَ فَانصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ** আয়াত নাজিল হয়।—[দরসে তিরমিযী ২য় খণ্ড; পৃঃ ৮৬]

হযরত আবুল আলিয়া (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং তাঁর বর্ণনাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, অতঃপর তাঁরা ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে যান। —[প্রাণ্ডক; পৃঃ ৮৬]

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سَتْنًا وَعَلَّمَنَا صَلَوَاتًا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَكُمْ أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ** .

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি আমাদেরকে সালাতের তালীম দিলেন এবং সুনুতের বিশদ বিবরণ পেশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন প্রথমে (নামাজের) কাতার ঠিক করবে, তারপর তোমাদের একজন ইমামত করবে। যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন সে কিরাআত পড়বে তখন তোমরা তা চুপ করে শুনবে। আর সে **غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** পড়ে শেষ করলে তোমরা আমীন বলবে। —[সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড; পৃঃ ১৭৪]

অপর এক হাদীসে আছে, **عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْآيَاتِ الْكُرْآنِ** . হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যার ইমাম আছে অর্থাৎ যে জামা'আতের সাথে ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করছে, ইমামের কিরাআতই তাঁর কিরাআত (এর জন্য যথেষ্ট)।

—[সুনানে ইবনে মাজাহ; পৃঃ ৬১১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) কুরআন, হাদীস এবং ফতোয়ায় সাহাবার আলোকেই মাসাইল বর্ণনা করেছেন। তিনি আদৌ কিয়াসকে নসের উপর প্রাধান্য দেননি। অবশ্য কোনো মাসআলায় নস না পাওয়া যাওয়ার অবস্থায়ই কেবলমাত্র তিনি কিয়াসের শিক্তি অবলম্বন করেছেন।

**عَنْ عِيسَى بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ** গ্রন্থে হাফিয ইবনে কায়্যাম (র.) লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) য'ঈফ তথা দুর্বল হাদীসকেও কিয়াস এবং ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির উপরই হানাফী মায়হাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। যেমন—

১. ইমাম আবু হানীফা (র.) নামাজে উচ্চৈঃস্বরে হাসার হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও একে কিয়াস এবং ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. সফরে খেজুরের নাবীয দ্বারা অজু জায়েজ হওয়ার হাদীস য'ঈফ হওয়া সত্ত্বেও একে কিয়াস এবং রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. দশ দিরহামের কম চুরি করলে চোরের হাত কাটা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মেনে নিয়েছেন।

৪. হয়েয়ের সর্বোচ্চ মুদত দশ দিন নির্দিষ্টকারী হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানীফা (র.) শহর হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসটি দুর্বল।

৬. কুয়া পবিত্র করার বিধানে ইমাম আবু হানীফা “গায়রে মারফু' আছার” তথা দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াসকে বর্জন করেছেন।

আল্লামা ইবনে কায়্যামের উপরোক্ত বক্তব্য থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কিয়াসকে কখনো হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন না; বরং দুর্বল হাদীসকেও তিনি কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি তিনি মুরসাল হাদীসও গ্রহণ করতেন এবং একেও তিনি রায় এবং কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। অথচ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-ও কতক শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করতেন। আর মুহাদ্দিসগণ তো মুরসাল হাদীসকে গ্রহণই করতেন না। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রতি দোষারোপ যে, তিনি কিয়াস ও রায়কে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এহেন বক্তব্য সত্যিই চরম দুর্ভাগ্যজনক। — [আস সুনাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীহল ইসলামী; পৃঃ ৪১৯]

## তাকলীদ : পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস হলো, কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পূরক আরো দুটি উৎস তথা ইজমা ও কিয়াসের সংযোজন ঘটে। এই দলিল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামি শরিয়তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিন্যস্ত করেছেন। কুরআন হাদীস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন মুজতাহিদ ইমামগণের সিদ্ধান্তে বিভিন্ণতা দেখা দেয়। এর ফলে বহু মাযহাবের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী সময়ে সে সবের মধ্যে চারটির উপরে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চারটি মাযহাব হলো— (১) হানাফী, (২) মালিকী, (৩) শাফিঈ ও (৪) হাযলী।

এই চার মাযহাবের যে কোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদ করলেই কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ হয়ে যাবে। বহুত্ব তাকলীদ (تقليد) শব্দটি আরবি। এর অর্থ— গলায় মালা বা হার পরিয়ে দেওয়া। ফিক্হ শাস্ত্রের নীতিমালা বিশেষত ওলামায়ে কেরামের মতে তাকলীদের সংজ্ঞা হলো,

الْعَمَلُ بِقَوْلِ إِمَامٍ مُّجْتَهِدٍ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ دَلِيلٍ

অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ অব্বেশণ ব্যতীত কোনো মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলীদ বলা হয় — (কাওয়ায়িদুল ফিক্হ মুফতি আমীমুল ইহসান)

দলিল প্রমাণ অব্বেশণ ব্যতীত' এ কথার মানে হলো, মুকাল্লিদ তার ইমামের প্রতি এরূপ আস্থা পোষণ করবে যে, অনুসরণীয় বিষয়ে আমার ইমামের নিকট প্রমাণ তো অবশ্যই আছে এবং তা সত্যও বটে। কাজেই প্রমাণ পেলে অনুসরণ করব, অন্যথায় করব না, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আমি শিকার হবো না। অবশ্য কোনো ইমামের তাকলীদ করার পর প্রমাণ জানতে সচেষ্ট হওয়া তাকলীদের পরিপন্থী কাজ নয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআন হাদীসের মর্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :

১. যে সব মর্ম অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা উদ্ধারে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। যেমন— নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং চুরি, জেনা, মদ্যপান ইত্যাদি হারাম হওয়া। এসবের হুকুম-আহকাম কুরআন-হাদীস হতে সবাই উদ্ধার করতে সক্ষম। কাজেই এই শ্রেণীর আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদও তাকলীদের কোনো প্রয়োজন নেই।

২. এমন সব আয়াত ও হাদীস যার মধ্যে বাহ্যত কোনো না কোনো অস্পষ্টতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

تَالَاكُ طَرَاثُ النَّارِیْغَ تِیْنُ كُرُرٍ (قُرُوءٍ) پَرِثُ (ইন্দত পালনের জন্য) অপেক্ষা করবে। (২ : ২২৮)

এ আয়াতে উল্লিখিত কুর শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর এক অর্থ হায়িয় (حَیْض) এবং অন্য অর্থ পবিত্রতা (طَهْر)। এখানে কোন অর্থটি উদ্দেশ্য তাতে দ্বিধা বিদ্যমান। তাই আয়াতের যুক্তিযুক্ত অর্থ নিরূপণে ইজতিহাদ প্রয়োজন, যা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمَخَابِرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

কোনো ব্যক্তি যদি মুখাবারা (বর্গাচাষ) পরিত্যাগ না করে, তবে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

—(আবু দাউদ, কিতাবুল বৃহ; পৃঃ ৪৮৩)

এখানে বাহ্যত অস্পষ্টতা এই যে, মুখাবারা (ভূমি চাষ ব্যবস্থা) বহু প্রকারের হতে পারে। যথা— টাকার বিনিময়ে, ফসলের অংশের বিনিময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানের ফসলের বিনিময়ে ইত্যাদি। এ হাদীসে কোন ধরনের মুখাবারা উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা উক্ত আয়াত ও হাদীসে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা নিরসনে হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক ও বিবেচনা অনুযায়ী আমল করবে অথবা কোনো মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করবে। আর এ কথা অনবীকার্য যে, এরূপ বিষয়ে সাধারণ মানুষ নিজ বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মারাত্মক ভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে। তখন যত মানুষ তত মাযহাব সৃষ্টি হবে। ফলে

ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। এমনকি ইসলামের অস্তিত্বই আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণে সে আশঙ্কা নেই। এ কারণেই ইমাম চতুস্তয়ের কোনো একজনের তাকলীদ ও অনুসরণ করাকে সর্বসম্মত রায় অনুসারে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমামের অনুসরণ করার মানে কুরআন ও হাদীসকে বাদ দেওয়া নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার জন্যই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাদের অনুসরণ করা। কেননা তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব নয়; বরং সেটা হবে নফস পরন্তী বা আত্মপূজা। পক্ষান্তরে যারা তাকলীদের বিরুদ্ধে প্রলাপোক্তি করে তারাও প্রকৃতপক্ষে কারো না কারো অবশ্যই তাকলীদ করে। যেমন এ হাদীসটি সহীহ বা য'ঈ, ফ দুর্বল বা মুনকার-এ কথা আমরা কিভাবে বলতে পারি? যারা সারা জীবন সাধনা করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তাদের অনুসরণ করেই আমরা এ কথা বলি। আমরা বলি এ হাদীসটি বুখারী শরীফে আছে, কাজেই এটি সহীহ। এভাবে বলে আমরা কি মূলত ইমাম বুখারী (র.)-এর অনুসরণ (তাকলীদ) করছি না? এ ক্ষেত্রে যদি তাকলীদ বৈধ হয় তাহলে ফিকহের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ হবে না কেন?

বস্তুত তাকলীদ দু'প্রকার : (১) তাকলীদে মুতলাক (২) তাকলীদে শাখসী। (১) তাকলীদে মুতলাক মানে হলো, নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ না করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমামের মতের অনুসরণ করা। (২) তাকলীদে শাখসী অর্থাৎ শরিয়তের সামগ্রিক বিষয়ে নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করা। স্বত্বাভ্যে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাকলীদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখন সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই সমাধান পাওয়া যেতো; কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর ওহীর মাধ্যমে নতুন বিষয়ে সমাধান লাভ করার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদের সূচনা হয়। তবে সাহাবীগণের মধ্যে তাকলীদে মুতলাকই অধিক প্রচলিত ছিল। এই তাকলীদে মুতলাকের ধারা ক্রমান্বয়ে তাকলীদে শাখসীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাফলী এই চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ (তাকলীদে শাখসী) -এর উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়। বর্তমানে তাকলীদ বলতে তাকলীদে শাখসীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার উপর কুরআন এবং হাদীসেও বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু এই দাবিটি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ধার করে এর উপর আমল করা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শরিয়ত মুতাবিক আমল করার জন্য কোনো না কোনো ইমামের অনুসরণ অবশ্যই অপরিহার্য।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান, তবে আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের ইলম (জ্ঞান) যাদের আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

— (১৬—৪৩)

এ আয়াতে যারা জানে না তাদেরকে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করার হুকুম করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকলীদের আবশ্যিকতা প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَعَثَنِي فِيكُمْ فَأَقْتَدُوا بِالْبَإْيَنِ مِنْ بَعْدِي أَيُّ بَكْرٍ وَعَمَرُ (رض)

আমি জানি না, কতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান থাকবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে এই দুই জনের অনুসরণ (তাকলীদ) করবে। অর্থাৎ আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। — (মিশকাত, তিরমিযী; পৃঃ ৫৬০)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তীতে দু'জন খলীফার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং তাদের খিলাফত-কালে তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশও এতে বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, এক সময় একজনই মাত্র খলীফা হয়ে থাকেন, দু'জন নয়। সুতরাং যিনি যখন খলীফা থাকবেন, তখন শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট কোনো একজনের কথা মান্য করা কেই তাকলীদে শাখসী বলা হয়। অতএব তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার কথা উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাকলীদে শাখসীর অপরিহার্যতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও প্রমাণিত। কেননা পূর্ববর্তী মুসলমানদের সময়কাল নবী কারীম ﷺ -এর যুগের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছিল না বললেই চলে। তাঁরা সুবিধা লাভের নিমিত্তে “তাকলীদে মুতলাক” করতেন না; বরং যখন যে বিষয়ে যে ফয়সালা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন, তখন তাঁরা তাঁর ফয়সালাই

গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা লাভের নিমিত্তে নিজ নিজ চাহিদা মতো বিভিন্ন মুজতাহিদের ফয়সালা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এহেন অবস্থায় তাকলীদে মতলাক অনুযায়ী যে কোনো ইমামের অনুসরণের দ্বারা অব্যাহত থাকলে শর'ঈ বিধি-বিধান খেল-তামাশায় পরিণত হওয়া অবশ্যজারী হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে অজু ভঙ্গ হয় না, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে মহিলাদের শরীর স্পর্শ করলে তাতে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এতে অজু ভঙ্গ হয় না। এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এবং মহিলাদের শরীর স্পর্শ করার অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসরণের দাবি করে তবে তা বৈধ হবে না। কারণ এরূপ করা সুবিধাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। এহেন সুবিধাবাদের দ্বারা শরিয়তের মাসআলা মাসাইল হালকা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ জন্যই মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক ইমামের নির্দিষ্টভাবে তাকলীদ করা অপরিহার্য। উল্লিখিত কারণে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর ওলামায়ে কেরামের যুগে “তাকলীদে মতলাকের” অনুমতি রহিত হলে তাকলীদে শাখসী তথা চার ইমামের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোনো এক ইমামের অনুসরণ (তাকলীদ) ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই “আহলে হক” এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

### ফকীহ ও মুজতাহিদগণের শ্রেণীবিন্যাস

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনে কামাল পাশা (র.) বলেছেন, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ সাতশ্রেণীতে বিভক্ত।

১. মুজতাহিদ ফিশ শারয়ি (مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ)।
২. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مُجْتَهِدٌ فِي الْمَذْهَبِ)।
৩. মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مُجْتَهِدٌ فِي الْمَسَائِلِ)।
৪. আসহাবুত তাখরীজ (أَصْحَابُ التَّخْرِيجِ)।
৫. আসহাবুত তারজীহ (أَصْحَابُ التَّرْجِيحِ)।
৬. আসহাবুত তাময়ীয (أَصْحَابُ التَّمْيِيزِ)।
৭. মুকাল্লিদীনে মাযয (مُقَلِّدِينَ مَحْضٍ)।

প্রথম শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিশ শারয়ি (مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ)। তাঁরা হলেন, ঐ সমস্ত মহান ফুকাহা ও মুজতাহিদীনে কেরাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দান করেছেন। তারা স্বাধীনভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে ইজতিহাদ করে মাসাইল বের করতে সক্ষম এবং أَصْل ও فُرُوع-এর ক্ষেত্রে কারো নির্ধারিত নীতিমালার অনুসারী বা মুকাল্লিদ নন; বরং তারা নিজেরাই কুরআন হাদীস থেকে ইজতিহাদের নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাদেরকে মুজতাহিদে মতলাক (مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ) এবং মুজতাহিদে মুস্তাকিল (مُجْتَهِدٌ مُسْتَقِلٌّ)-ও বলা হয়। তাঁরা হলেন; চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং সে যুগের আরো কতিপয় ইমাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مُجْتَهِدٌ فِي الْمَذْهَبِ)। তাঁরা ঐ সকল ফিকহবিদ যারা মুজতাহিদে মতলাকের কোনো ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে সে আলোকে ইজতিহাদ পূর্বক কুরআন ও হাদীস থেকে মাসাইল আহরণ করেন। এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণকে মুজতাহিদে মুনতাসাব (مُجْتَهِدٌ مُنْتَسِبٌ)-ও বলা হয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী : মুজতাহিদ ফিল মাসাইল (مُجْتَهِدٌ فِي الْمَسَائِلِ)। তাঁরা এ সকল ফিকহবিদ : যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের পক্ষ হতে যে সকল বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইমামের নির্ধারিত

মূলনীতি অনুসরণ করে ফয়সালা দিতে এবং মাসাইল আহরণ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ইমামের বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণের নেই। ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, ইমাম সারাক্ষী (র.) প্রমুখ এই শ্রেণীর ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত।

**চতুর্থ শ্রেণী :** আসহাবুত তাখরীজ (أَصْحَابُ التَّخْرِيجِ)। তারা ঐ সকল ফিক্‌হবিদ যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। তবে উসুল ও নীতির উপর পারদর্শিতা থাকার কারণে মাযহাবের ইমামগণ থেকে বর্ণিত কোনো অস্পষ্ট (مُجْمَل) বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দ্ব্যর্থবোধক (ذُو الِوَحْشَيْنِ) বাক্যের কোনো একটিকে নির্ধারিত করার তাদের যোগ্যতা রয়েছে। ইমাম আবু বকর রাযী এবং হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন মুরগীনানী (র.) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

**পঞ্চম শ্রেণী :** আসহাবুত তারজীহ (أَصْحَابُ التَّرْجِيحِ)। তারা ঐ সকল ফিক্‌হবিদ যাদের কাজ হলো ইমামের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে বর্ণিত একাধিক মতামতের কোনো একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সময় তারা বলেন, هَذَا أَوْلَى (এটি উত্তম), هَذَا أَصَحُّ (এটি বিস্তৃততম), هَذَا أَزْكَى بِالنِّيَّاسِ (এটি অধিক যুক্তিযুক্ত) ইত্যাদি। ইমাম কুদুরী প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

**ষষ্ঠ শ্রেণী :** আসহাবুত তাময়ীয (أَصْحَابُ التَّمْيِيزِ)। তারা ঐ সকল ফিক্‌হবিদ যারা ইমামে মাযহাবের মুকাল্লিদ। তাদের কাজ হলো ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও মতামত দলিলের ভিত্তিতে কোনটি সবল এবং কোনটি দুর্বল তা নির্ণয় করা। বিকায়, কানয, মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

**সপ্তম শ্রেণী :** মুকাল্লিদীনে মহায (مُقَلِّدِينَ مَحَظٍ)। তারা এ সমস্ত ওলামায়ে কেরাম যারা উল্লিখিত যোগ্যতা সমূহের কোনো একটির উপরও ক্ষমতা রাখে না, যারা দুর্বল ও সবলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং যেখানে যে ধরনের মতামত পায় তাই বর্ণনা করে থাকে। এ সকল আলিমকে নিছক মুকাল্লিদ বলা হয়। তাদের নিজস্ব মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

— (শামী; ১ম খণ্ড; পৃ: ৭৭)।

### ফিক্‌হে হানাফীর বিভিন্ন পরিভাষা

ইসলামের বিধান মতে মানুষের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ১. মশরু' (مَشْرُوعٌ) অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত ও শরিয়ত অনুমোদিত। ২. গায়রে মশরু' (غَيْرُ الْمَشْرُوعِ) অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। শরিয়ত সম্মত এবং শরিয়ত অনুমোদিত কার্যাবলি আবার সাত প্রকার ১. ফরজ, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. মোস্তাহাব ৫. হারাম, ৬. মাকরুহ তাহারীমী, ৭. মাকরুহ তানখীহী, ৮. মুবাহ।

১. মশরুজ : অর্থ- অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় আদেশ যা দলিলে কাতঈ অর্থাৎ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহ; কোনোরূপ অবকাশ নেই। যেমন ইসলামের পাঁচ রুকুন যা কুরআন মাজীদে অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি এ হুকুমকে অস্বীকার করে তবে কাফির বলে গণ্য হবে। আর তরক করলে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

ফরজ দু'প্রকার : ১. ফরজে আইন যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। ২. ফরজে কিফায়া-যা আদায় করা সকল মুসলমানদের উপর ফরজ নয়; বরং সমাজের কিছু লোক আদায় করলে তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হয়ে যাবে। যেমন জানায়ার নামাজ, জিহাদ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ফরজে কিফায়ার ক্ষেত্রেও আদায়ের আগে সমাজের সকল মুসলমানই এর জন্য مَسْنُور (জিমাফার)। কিন্তু সমাজের কিছু লোক তা আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যায়।

২. ওয়াজিব : ওয়াজিবও ফরজের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। তবে আকীদাগত দিক থেকে ওয়াজিব এবং ফরজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে দলিলে কাতঈ তথা অকাট্য দলিল দ্বারা। আর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে দলিলে যন্নী দ্বারা, যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেমন- সাদাকাতুল ফিতর, বিতরের নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ওয়াজিবকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে না।

৩. সুন্নত : ফরজ বা ওয়াজিব ব্যতীত নীনের যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে করেছেন, করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন, শরিয়তের পরিভাষায় একে সুন্নত বলা হয়। এ ছাড়া খেলাফাতে রাশিদীন যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন, সেগুলোকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন— হাদীসে বর্ণিত আছে,

نَعْلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُصُوا عَنْهَا بِالتَّوَّاجِدِ .

তোমাদের জন্য অপরিহার্য হলো আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায় রাশিদীনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা। —(মিশকাত; পৃ: ৩০)

সুন্নত দু'প্রকার : ১. সুন্নতে মুআক্কাদা, ২. সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা।

১. সুন্নতে মুআক্কাদা : যে সব কাজ নবী কারীম ﷺ ইবাদত হিসাবে নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। তবে ওজরবশতঃ কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। আমলের দিক থেকে সুন্নতে মুআক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি; বিনা কারণে তা বর্জন করা বা বর্জনের অভ্যাস করে নেওয়া অনুচিত ও গুনাহের কাজ।

২. সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদা : যে সকল কাজ নবী কারীম ﷺ অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত করেছেন এবং বিনা কারণে কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ যারা করবেন তাঁরা ছওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না। — (ফাতওয়া ও মাসাইল; ১ম খণ্ড; পৃ : ৩৩-৩৪)

৪. মোত্তাহাব : যে সব কাজ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। মোত্তাহাব কাজ আদায় করলে ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে; কিন্তু না করলে কোনো গুনাহ হবে না। ফকীহদের পরিভাষায় মোত্তাহাবকে নফল (نَفْل) মানদূব (مَنْدُوب) এবং তাতাওউ (تَطَوُّع) ও বলা হয়।

৫. হারাম : যে সব কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই তাকে হারাম বলা হয়। যেমন কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, মদ পান করা, ঘুরি করা ও জেনা করা ইত্যাদি। বিনা ওজরে কেউ হারাম কাজ করলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর কেউ যদি তা অবীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৬. মাকরুহ তাহরীমী : যে কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং দলিলে যন্নী দ্বারা প্রমাণিত। বিনা ওজরে এসব কাজ গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭. মাকরুহ তানযীহী : যে কাজের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শরিয়তে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত নয় এবং যা বর্জন করলে ছওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু করলে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে না; বরং অনুচিত কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

৮. মুবাহ : যে কাজ করতে কোনো ছওয়াব নেই এবং না করতেও কোনো গুনাহ নেই। ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারবে।

— (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ; ১ম খণ্ড; পৃ : ৫২ - ৫৩)

শর্ত ও রুকন : مَا يَتَرَفَقُ عَلَيْهِ وَجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ

কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যার উপর নির্ভরশীল এবং যেটি এ বস্তুর হাকীকত থেকে খারিজ, একে শর্ত বলা হয়। আর যদি সে জিনিসটি ঐ বস্তুর হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে একে রুকন বলা হয়। যেমন অজু নামাজের জন্য শর্ত কিন্তু রুকু সিজদা নামাজের রুকন।

সহীহ, ফাসিদ ও বাতিল : هُوَمَا اسْتَوْفَى اَرْكَانَهُ وَشُرُوطُهُ الشَّرْعِيَّةُ

যে কাজে শরিয়ত কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও শরিয়ত অনুমোদিত রুকনসমূহ সমভিব্যাহারে পাওয়া যায় তাকে সহীহ বলা হয়। আর যার মধ্যে এসব কিছু পাওয়া যাবে না সেটি সহীহ বলে গণ্য হবে না। যদি মূল বিষয় বা “মূল আকদে” কোনো ক্রটি থাকে তবে একে বাতিল বলা হয়। আর যদি গুণাগুণ বা رُفْع -এর মধ্যে কোনো ক্রটি থাকে তবে একে ফাসিদ বলা হয়। কোনো আমল নির্ধারিত সময়ের ভেতর সম্পাদন করাকে আদা (اِدَاء) বলা হয়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পাদন করাকে কাযা (قَضَاء) বলা হয়, আর সময়ের ভেতর পুনঃ সম্পাদন করাকে দুহরানো (دُهْرَانًا) বলা হয়। —(প্রাণ্ডক; পৃ : ৫৫-৫৬)

## হিদায়া প্রণেতার জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি

আব্দাম্মা বুরহানুদ্দীন মুরগীনাভী (র.) হানাফী মায়হাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ এবং হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি বুরহান উদ্দীন, পিতার নাম আবু বকর। বংশ পরিচয় নিম্নরূপ : আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল ইবনে খলীল (র.)। তিনি হযরত আবু বরক সিদ্দীক (র.)-এর বংশধর। তিনি ফারগানা প্রদেশের মুরগীনা শহরের অধিবাসী ছিলেন বিধায় তাঁকে মুরগীনাভী বলা হয়। তিনি ৫১১ হিজরি সনে ৮ই রজব সোমবার বাদ আসর জন্মগ্রহণ করেন। আব্দাম্মা বুরহানুদ্দীন (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিক দিয়েও তিনি সে যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আব্দাম্মা ইবনে কামাল পাশা (র.) তাঁকে তাবাকাতে ফুকাহা আসহাবুত তাব্বিজীহ (পঞ্চম শ্রেণী)-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মায়হাবও বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ফকীহ তথা আসহাবুত তাব্বিজীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শায়খ মুরগীনাভী বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলম হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. মুফতী উস সালালায়ন নাজমুদ্দীন আবু হাফস ওমার নাসাফী (র.) (ইনি আকাইদ বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত নাসাফিয়া গ্রন্থের প্রণেতা)। ২. ইমাম সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.), ৩. ইমাম যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুসায়ন (র.), ৪. ইমাম কিওয়ামুদ্দীন (قَوَامُ الدِّينِ) আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ আল বুখারী (র.), ৫. আবুল লায়স আহমদ ইবনে ওমর (র.), ৬. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান (র.), ৭. মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে মাসউদ (র.), ৮. ওসমান ইবনে ইব্রাহীম (র.), ৯. শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন (র.), ১০. মিনহাজুশ শরীআহ মুহাম্মদ ইবনে হুসায়ন (র.) প্রমুখ।

আব্দাম্মা বুরহানুদ্দীন (র.)-এর নিকট থেকে যারা ইলম হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন (র.), শায়খুল ইসলাম ইমামুদ্দীন (র.), কাযিউল কুযাত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.), শামসুল আশ্বা মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সাত্তার কুরদী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুরহানুদ্দীন (র.) ৫৯৩ হিজরি সনের জিলহজ মাসের ১০ তারিখে ইনতিকাল করেন। তিনি ইনতিকালের সময় ভিন পুত্র রেখে যান। তাঁরা তৎকালীন যুগে খ্যাতনামা আলিম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। — (আনওয়ারুল বারী; ২য় খণ্ড-পৃ : ১১২) ইনতিকালের পর তাকে সমরকন্দ শহরে দাফন করা হয়। (কাশফুয যুনুন)।

শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো (১) مَحْمُوعُ النَّوَائِلِ (মাজমুউন নাওয়াযিল), (২) مُنْتَقَى (মুনতাকী), (৩) تَجْنِيسُ (তাজনীস), (৪) مَزِيد (মযীদ), ৫. مَنَاسِكُ الْحَجِّ (মানাসিকুল হজ), (৬) تَنْفِيزُ النَّذْبِ (নাশরুল মায়হাব), (৭) كِتَابُ الْفَرَايِضِ (কিতাবুল ফারায়য), (৮) مَخْتَارَاتُ النَّوَائِلِ (মুখতারাতুন নাওয়াযিল), (৯) بَيَانَةُ النَّبَتِيِّ (বিদায়াতুল মুবতাদী), (১০) كِفَايَةُ النَّهْنِيِّ (কিফায়াতুল মুনতাহী), (১১) هِدَايَةُ (হিদায়া)।

## হিদায়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও এর মর্যাদা

ফিক্হ জগতে, বিশেষত হানাফী ফিক্হের পরিমণ্ডলে হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়াদী কিতাব। এক কথায় একে ফিক্হে হানাফীর বিশ্বকোষ বলা যায়। বস্তুত সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এ গ্রন্থ ফিক্হ জগতে হানাফী মায়হাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমনকি পাক ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন কালেও বিচার বিভাগে হিদায়াকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিদায়া গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়ে থাকে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিক্হ শাস্ত্রের বিদ্যাঙ্গনে এই কিতাবটি পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। এ কিতাবটিকে কেন্দ্র করে যত গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তা অন্য কোনো ফিক্হ গ্রন্থের ক্ষেত্রে হয়নি।



গবেষক ও সুস্বদৃশী আলিমগণ হিদায়া কিতাবের এ অসাধারণ জনপ্রিয়তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, কিতাবের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য। হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, “হানাফী ফিকহের মতন (مَتْن) গুলোর মাঝে প্রামাণ্যতা, ব্যাপকতা, সার্বিকতা ও সুসংক্ষিপ্ততার দিক থেকে الْجَمَاعَةُ الصَّغِيرَةُ এবং مَخْتَصَرُ الْقُدْرِيِّ ছিল শীর্ষস্থানীয়।” তাই এ দুটো কিতাবকে সামনে রেখে তিনি دِيَاةُ الْمُتَبَدِّلِ নামে একটি মতন (বা মূলগ্রন্থ) সংকলন করেছেন। ফলে তাতে দু'টি মূল গ্রন্থের যাবতীয় গুণ ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটে। এরপর তিনি প্রায় আশি খণ্ডে উক্ত মূল গ্রন্থটির একটি সুবিশদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নামকরণ করেন كِفَايَةُ الْمُتَنَبِّهِ নামক এই সুবিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি ইসলামি ফিকহ ভাণ্ডারের যাবতীয় গবেষণালব্ধ ও ইজতিহাদ ভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করেন। এই সুবিশাল গ্রন্থ বর্তমানে যদিও প্রাংশংস করা হচ্ছে এবং একে মানব সাধারণের চূড়ান্ত সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। অতঃপর তিনি কিতাবটির এই দীর্ঘ কলেবরের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেন যে, হয়তো এ কারণে কিতাবটি পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই তিনি আশি খণ্ডের এই সুবিশাল গ্রন্থের মহাসমুদ্রের নির্ধারিত সীমার মধ্যে সংক্ষিপ্ত (অথচ পূর্ণাঙ্গ) কলেবরে চার খণ্ডের হিদায়া এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। গ্রন্থকার (র.) ৫৭৩ হিজরি সনের জিলকাদ মাসের বুধবার দিন জোহরের নামাজের পর এ গ্রন্থখানির রচনা কর্মের শুভ সূচনা করেন। কেননা হাদীসে আছে—

مَا مِنْ شَيْءٍ بَدِئَ يَوْمَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا نَمَّ

যে কোনো জিনিস বুধবার দিন আরম্ভ করা হলে তবে তা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।

অতঃপর দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত নিরলস সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন মেহনত করে তিনি এ গ্রন্থ সংকলনের কাজ সুসমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থখানি مَخْتَصَرُ (সংক্ষিপ্ত) হওয়ার পাশাপাশি جَامِعُ (ব্যাপক) এবং مُحَقَّقُ (এর প্রতিটি কথা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত)ও বটে। এ কারণেই এর এত বিপুল জনপ্রিয়তা। সর্বোপরি এটি এমন একটি কিতাব যাতে পক্ষ-বিপক্ষ প্রত্যেক ইমামের প্রতিটি মাসআলার সমর্থনে دَلِيلٌ نَقْلِيٌّ অর্থাৎ উৎসভিত্তিক প্রমাণের পাশাপাশি دَلِيلٌ اِقْلِيٌّ অর্থাৎ যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এতে এর যাবতীয় সূত্র ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিতাবখানি সকল মহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হিদায়া কিতাবের বিশ্ব বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল কাদীরের মতো উচ্চমানের কিতাব রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কিনা? জবাবে তিনি বলেন, খুবই সম্ভব। অতঃপর পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হিদায়ার মতো কোনো কিতাব লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না? জবাবে তিনি পরিকার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, আমার পক্ষে এর এক ছত্র লেখাও সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁর কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না; বরং এ ছিল তাঁর গ্রন্থটির সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন।

হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) তনয় শায়খ ইমাদুদ্দীন (র.) হিদায়াগ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

كِتَابُ الْهِدَايَةِ يَهْدِي الْهَدَى \* إِلَى حَافِظِيهِ وَجَلَوُ الْمُنَى  
فَلَا رُشْمَ وَاحْفَظْهُ بِأَذَى الْحَبِيبِ \* فَمَنْ تَأَلَّى نَالَ أَفْضَلَ الْمُنَى

হিদায়া কিতাবখানি হিদায়েতের পথ নির্দেশ দান করে। এর সংরক্ষণকারীদের (জাহালতের) অক্ষত্ব দূর করে। সুতরাং হে জ্ঞানবান! তুমি একে আঁকড়ে ধর এবং সংরক্ষণ কর। বস্তুত যে ব্যক্তি হিদায়া প্রদর্শিত হিদায়েত লাভ করল সে চরম লক্ষ্য অর্জনে ধন্য হলো।

— (যফরুল মুহাসসিলীন: পৃ: ১৯৭)

হিদায়া গ্রন্থের পাদটীকা লেখক শায়খ হাম্মাদ (র.) বর্ণনা করেন যে, কোনো এক কবি মনীষী হিদায়াগ্রন্থের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেছেন,

إِنَّ الْهِدَايَةَ كَالْقُرْآنِ قَدْ نَسِخَتْ \* مَا صَفَّقُوا قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبٍ  
فَاخْطُ قَرَأَتَهَا وَالزَّمَّ يَلَاوَنَهَا \* بِسُكْمٍ مَقَالِكِ مِنْ نَبْغٍ وَمِنْ كَيْبٍ

হিদায়া গ্রন্থটি কুরআনের মতোই “ফিকহ বিষয়ে লিখিত পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে” রহিত করে দিয়েছে। পরিঘূর্ণিত বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোনো কিতাব কেউ আর রচনা করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তোমারা এর পাঠ সংরক্ষণ করবে এবং নিয়মিতভাবে তা পাঠ করবে। তাহলে তোমার অভিব্যক্তি ও বক্তৃতা মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

দ্বিতীয় যে কারণটি আলিম, ফকীহ ও বিদ্বৎ সমাজে বহু শতাব্দী ব্যাপী অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে তা হলো, গ্রন্থকারের ইখলাস, লিভাখিয়াত, তাকওয়া এবং আল্লাহ প্রেমে আত্ম নিবেদন। একটি মাত্র ঘটনা থেকে সাহিবুল হিদায়ার এই অত্যুজ্জ্বল দিক সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী (র.) বলেন, হিদায়া কিতাবের মকবুলিয়াত ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়ার গুঢ় রহস্য এই যে, শায়খ বুরহানুদ্দীন (র.) সুদীর্ঘ ভের বছর বিরামহীন সিয়াম পালনে রত থেকে এ গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। আর এ সিয়াম পালনের বিষয়টি এমন গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন যাতে তার খাদিমও তা জানতে না পারেন। খাদিম যখন খানা নিয়ে আসতো, তখন তিনি বলতেন, রেখে যাও। পরে কোনো ডালিবুল ইলম, মুসাফির কিংবা আশে-পাশের কোনো ফকির মিসকিনকে থেকে সে খাবার দিয়ে দিতেন। খাদিম যথা সময়ে ফিরে এসে খালি বর্তন নিয়ে যেতেন এবং ভাবতেন যে, তিনি ষ্টেয়ে নিয়েছেন। এ হলো, সালাফে সালিহীন এবং বর্তমান যুগের লেখক, গবেষক ও পণ্ডিত লোকদের মধ্যে পার্থক্য। আল্লামা সায্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) এ গুঢ়-রহস্য এ বলে ব্যক্ত করেছেন যে, “কী যেন একটা তাদের মাঝে ছিল। আর কী যেন একটা আমাদের মাঝে নেই।”

হিদায়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কেউ কেউ এরূপ সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছে যে, এতে সাহিবুল হিদায়া হানাকী মায়হাবের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ যেসব হাদীস পেশ করেছেন এর অনেক গুলোই যঈফ অর্থাৎ দুর্বল। এ অহেতুক অভিযোগের জবাবে হাদীসশাস্ত্রের প্রাজ্ঞ বহু মনীষী হিদায়ার হাদীসসমূহের তাকরীজ বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং মূল সূত্র ও উৎস উল্লেখ করে প্রতিটি হাদীসের প্রামাণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন। যেমন—

১. ইমাম মহীউদ্দীন আবদুল কাদীর ইবনে মুহাম্মদ আল কুরাশী (র.) রচিত **الْعَيْنَاةُ بِمَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ**
২. শায়খ আলাউদ্দীন (র.) রচিত **الْكَيْفَاةُ فِي مَعْرِفَةِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ** ৩. আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) রচিত **النَّصَبُ الرَّايَةُ لِأَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ** ইত্যাদি গ্রন্থাবলী।

—(যফরুল মুহাসসিলীন— পৃ: ১৯৪ - ১৯৯)

## হিদায়া প্রণেতার অনুসৃত নীতি ও পরিভাষা

সাহিবে হিদায়া এ কিতাব প্রণয়নে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন- যা জানা অতীব জরুরি।

১. হিদায়া গ্রন্থে সাহিবে হিদায়া **قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** বলে নিজেকেই বুঝিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) “মাদারিজুন নবুওয়াহ্” নামক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খ আবুস সুউদ (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে হিদায়া প্রণেতা **قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَفَا عَنْهُ** বলেই স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রন্থ প্রণেতার ইনতিকালের পর তার কোনো এক শিষ্য বাক্যাটিকে **قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** -এর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে নাম পুরুষের সীগার সাথে উল্লেখ করেননি। যাতে আত্মগরিমা বা অহঙ্কার বশত তিনি “নিজস্ব রায় পেশ করেছেন” বলে ধারণা না করা হয়। এটিই শীর্ষস্থানীয় ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের চিরন্তন অভ্যাস।

২. যে মতটি গ্রন্থকারের নিকট পছন্দনীয় এর দলিল তিনি সর্বশেষে উল্লেখ করেন, যাতে এ দলিল পূর্বোক্তিত দলিলসমূহের জবাব হয়ে যায়। অবশ্য মতামত উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যেটি তুলনামূলক শক্তিশালী সেটিকে তিনি অগ্রা উল্লেখ করেন।

৩. সাহিবে হিদায়া যখন **قَالَ مَشَانِخُنَا** (আমাদের মাশাখিখে কেরাম বলেছেন) বলেন, তখন তিনি এর দ্বারা **مَشَارَاةُ النَّهْرِ** তথা মেসোপটেমিয়ার মধ্য হতে বুখারা ও সমরকন্দের আলিমগণকে বুঝিয়ে থাকেন। **الْعَيْنَاةُ** নামক গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে আল্লামা কাসিম (র.) বলেন, **مَشَانِخُ** বলতে সাহিবে হিদায়ার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত ওলানামায়ে কেরাম যারা ইমাম আযম (র.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হননি।

৪. সাহিবে হিদায়া যেখানে **فِي دِيَارِنَا** (আমাদের দেশ) বলেছেন, সেখানে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো **مَشَارَاةُ النَّهْرِ** তথা মেসোপটেমিয়ার শহরসমূহকে বুঝানো। ফতহুল কাদীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৫. তিনি পূর্বোল্লিখিত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا تَلَوْنَا (যা আমরা তিলাওয়াত করেছি); পূর্বোল্লিখিত (যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণ) -এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا ذَكَّرْنَا (যা আমরা উল্লেখ করেছি) বা مَا بَيَّنَّا (যা আমরা বর্ণনা করেছি) এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا رَوَيْنَا (যা আমরা রিওয়ায়াত করেছি) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও তিনি পূর্বোল্লিখিত আয়াত বা হাদীস বা دَلِيلٌ غَفْلِيٌّ ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مَا بَيَّنَّا শব্দও ব্যবহার করেছেন। الْكَيْفَانِيَّةُ وَ تَتَانِجِ الْأَفْكَارِ فِي كَشْفِ الرُّمُوزِ وَالْإِسْتِرَارِ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৬. অনেক সময় তিনি মূল মাসআলার উপর কুরআনের আয়াত দ্বারা إِسْتِدْلَال করেন, অতঃপর এ নসের عِلَّتْ (কারণ) বর্ণনা করেন। পরিণামে তা মূল মাসআলার উপর একটি স্বতন্ত্র دَلِيلٌ غَفْلِيٌّ -এর রূপ পরিগ্রহ করে। تَتَانِجِ أَنْكَازِ কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৭. কখনো তিনি যুক্তিভিত্তিক দলিলকে فَهْ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। যেমন- বলেন, كَذَا الْفَهْمُ الْغَفْلَةُ مِيفْتَاحُهَا সাআদা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৮. অনেক সময় তিনি একটি যুক্তিভিত্তিক দলিলের পর আরেকটি যুক্তিভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করেন। এতে তার উদ্দেশ্য থাকে দ্বিতীয় দলিল দ্বারা প্রথম দলিলের لَيْسَ এবং عِلَّتْ বর্ণনা করা। الْأَفْكَارِ تَتَانِجِ গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে।

৯. مَدْعِي (দাবি) -এর উপর দলিল পেশ করার পর কোথাও তিনি هَذَا وَمَذْهَبٌ বলেছেন। এতে তার উদ্দেশ্য হলো, এ কথা ব্যক্ত করা যে, এখান থেকে دَلِيلٌ لَيْسَ বর্ণনা করা হবে।

১০. الْأَصْلُ শব্দ দ্বারা মাবসূত কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা তাঁর উদ্দেশ্য।

১১. গ্রন্থকার التَّخْتَصُّرُ শব্দ দ্বারা মুখ্যতাসারুল কুদুরী বুঝিয়েছেন এবং الْكِتَابُ শব্দ দ্বারা জামে'উসসগীর কে বুঝানোই হলো তাঁর উদ্দেশ্য।

১২. বহু মাসআলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার قَالَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ মাসআলা কুদুরী বা জামে' সগীর -এর মূল কিতাব থেকে উদ্ধৃত।

১৩. গ্রন্থকার (র.) সাধারণত বাবের শুরুতে কুদুরীর মাসআলা এবং বাবের শেষে জামে' সগীরের মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

১৪. কুদুরী এবং জামে' সগীরের عِبَارَت -এর মধ্যে পার্থক্য থাকলে সে ক্ষেত্রে النَّجْمِ الْصَّغِيرِ বলে জামে' সগীরের বক্তব্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

১৫. যে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে সে ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) قَالُوا শব্দ ব্যবহার করেছেন।

১৬. সাহিবে হিদায়া যে ক্ষেত্রে هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى كَذَا বলেছেন, সেক্ষেত্রে এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, এ কথা বর্ণনা করা যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই হাদীসকে এই অর্থের উপর প্রয়োগ করেন। আর যেখানে نَحْنُ বলেছেন সেখানে এর দ্বারা তার নিজেই বুঝানো হলো উদ্দেশ্য।

১৭. عِنْدَ فُلَانٍ (অমুকের নিকট) -এর দ্বারা গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো; অমুকের মাযহাব বর্ণনা করা। আর عَنْ فُلَانٍ (অমুক থেকে) যেখানে তিনি বলেছেন, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, এটি অমুকের একটি রিওয়ায়াত। কিন্তু এটি তার মাযহাব নয়।

১৮. যে ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.) মাসআলা বর্ণনা করার পর এর নযীরও উল্লেখ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মাসআলার প্রতি ইশারা করার জন্য إِسْمُ إِشَارَةِ قَرِيبٍ এবং নযীরের প্রতি ইশারা করার জন্য إِسْمُ إِشَارَةِ بَعِيدٍ ব্যবহার করেছেন।

১৯. তিনি বহু সম্ভাব্য প্রশ্নের سُؤَالَ مُفَدَّر -এর উত্তর দান করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উত্তরকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ فُلَانٌ قَوْلٌ (যদি প্রশ্ন করা হই) قُلْنَا كَذَا (তাহলে জবাবে আমরা বলব) এরূপ বলেননি। কিন্তু তিন স্থানে তিনি এ নীতির বিপরীত করেছেন। অর্থাৎ আদাবুল কাযীর দুই জায়গায় এবং কিতাবুল গসবের এক জায়গায় তিনি স্পষ্টভাবে প্রশ্ন উল্লেখ করে এর জবাব বিশ্লেষণ করেছেন।

২০. **ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ** শব্দটি গ্রন্থকার (র.) বহু স্থানে ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রচিত ছ'খানা কিতাব থেকে সংগৃহীত মাসআলা বা মতামতের প্রতি ইঙ্গিত করা। সে ছ'খানা কিতাব হলো, (১) মাযসূত, (২) যিয়াদাত, (৩) জামে' সগীর, (৪) জামে' কবীর, (৫) সিয়ারে সগীর, (৬) সিয়ারে কবীর।

২১. **مَسَائِلُ السَّوَادِ** গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত মাসআলাসমূহকে **السَّوَادِ** বলা হয়। এসব মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক রচিত উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হলো,

১. কাইসানিয়াত (**كَيْسَانِيَّاتٌ**) -এ গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ জনৈক কায়সান নামক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংকলন করেছেন।

২. জুরজানিয়াত (**جُرْجَانِيَّاتٌ**) -এ গ্রন্থ তিনি জুরজান শহরে অবস্থান কালে সংকলন করেছেন।

৩. হারুনিয়াত (**هَارُونِيَّاتٌ**) -এ গ্রন্থ তিনি খলীফা হারুনর রশীদের উদ্দেশ্যে সংকলন করেছেন।

৪. রাঙ্কীয়াত (**رَنْكِيَّاتٌ**) -এ গ্রন্থখানা তিনি রাঙ্কা শহরে অবস্থানকালে সংকলন করেছেন।

৫. আমালিয়ে মুহাম্মদ (**أَمَالِي مُحَمَّدٍ**) ইত্যাদি।

গ্রন্থকার (র.) এ কিতাবে **صَاحِبِينَ** (সাহেবাইন), **شَيْخِينَ** (শায়খাইন) এবং **طُرَفِينَ** (তরফাইন) শব্দগুলোও ব্যবহার করেছেন। **صَاحِبِينَ** বলে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে, **شَيْخِينَ** বলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-কে এবং **طُرَفِينَ** বলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে বুঝিয়েছেন।

— (যফরুল মুহাসিলীন, ফাতওয়া মাসাইল; ১ম খণ্ড)

আশরাফুল হিদায়া (আরবি-বাংলা)-এর **خُصُوصِيَّاتٌ** বা বৈশিষ্ট্য :

১. প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সারগর্ভ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আরো রয়েছে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব, ফজিলত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা।

২. এতে হিদায়ার মূল ইবারতের সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ রয়েছে।

৩. এতে আরবি জটিল শব্দের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ (**حَلَلُ لُغَاتٍ**)-ও প্রদত্ত হয়েছে।

৪. প্রাসঙ্গিক আলোচনা শিরোনামের অধীনে এতে সংশ্লিষ্ট মাসআলার উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও প্রদত্ত হয়েছে।

৫. কুরআন মাজীদে আয়াতের ক্ষেত্রে সূরা ও আয়াত নম্বর প্রদান করা হয়েছে। (যা হিদায়ার মূল ইবারতে নেই)।

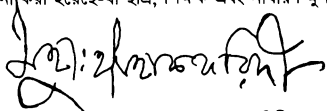
৬. হাদীসের ক্ষেত্রে এর মূল সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. হানাফী মাযহাবের প্রামাণিকতাকে বলিষ্ঠভাবে সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে এতে অতিরিক্ত **دَلِيلٌ** (প্রমাণাদি)ও সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষভাবে ইখতিলাফী মাসাইলের ক্ষেত্রে এ দিকে আরো লক্ষ্য বেশি রাখা হয়েছে।

৮. ফায়দা শিরোনামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

৯. এতে হানাফী মাযহাবকে **مُحَقَّقٌ** -**مُدَلَّلٌ** সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১০. মুকাদ্দিমাতুল কিতাব শিরোনামের অধীনে ফিক্‌হের পরিচিতি, সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ফিক্‌হের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাকলীদ ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে-যা ছাত্র, শিক্ষক এবং সাধারণ মুসলমান সকলের জন্যই উপকারী ও জরুরি।



(মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী)

মুহতামিম

শেখ জনুরুদ্দিন দারুল কুরআন শামসুল উলুম

চৌধুরীপাড়া মাদরাসা, ঢাকা-১২১৯

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْلَىٰ مَعَالِمَ الْعِلْمِ وَأَعْلَمَهُ وَأَظْهَرَ شُعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَمَهُ وَبَعَثَ رُسُلًا وَانْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ سَبِيلِ الْحَقِّ هَادِينَ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَىٰ سَنَنِ سَنِينِهِمْ دَاعِينَ يَسْلُكُونَ فِيهِمَا لَمْ يُؤْثِرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْإِجْتِهَادِ مُسْتَرِشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ هُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ حَتَّىٰ وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَدَقِيقٍ غَيْرَ أَنَّ الْحَوَادِثَ مُتَعَايِبَةُ الْوُقُوعِ وَالتَّوَارِثُ لَا يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْمَوْضُوعِ وَأَقْتِنَا صُ الشُّوَارِدِ بِالْإِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ وَالْإِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنَ صَلَاحَةِ الرِّجَالِ وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَاخِذِ يُعْضُّ عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ -

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য খাস যিনি ইলমের নিদর্শন ও ঝাঞ্ঝাসমূহ সমুন্নত করেছেন। যিনি শরিয়তের শি'আর তথা বৈশিষ্ট্যাবলি ও বিধি-বিধানসমূহকে সুপ্রকাশিত করেছেন, যিনি নবী-রাসূল ﷺ সকলকে সত্যের পথ প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন, আর যিনি আলিমগণকে তাঁদের স্থলবর্তী করেছেন যারা (লোকদেরকে) তাঁদের সুন্নতের পথের দিকে আহবান করেন (এবং) যে সকল বিষয়ে তাঁদের (নবী-রাসূলগণের) থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর থেকে পথ নির্দেশ প্রার্থনা করে ইজতিহাদের নীতি অনুসরণ করেন। আর আল্লাহই সঠিক পথ নির্দেশের অধিকারী।

আর তিনিই (আল্লাহই) প্রথম যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে তৌফিক দান করেছেন, ফলে তাঁরা স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার মাসআলা (কিতাবাদিতে) সঙ্কলন করেছেন। কিন্তু উদ্ভূত সমস্যা যেহেতু পর্যায়ক্রমে ঘটমান, তাই নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় এসব বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাণ্ড করে নিতে অক্ষম। সর্বোপরি উৎস মূল থেকে বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ আহরণ বা সংগ্রহ করা এবং সদৃশ মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পণ্ডিত লোকদের কীর্তিরূপে স্বীকৃত। আর মাসায়েলের উৎসসমূহ যা দৃঢ়ভাবে ধারণযোগ্য এর উপর অবগতি লাভ করা ও বিজ্ঞজ্ঞানদের কাজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার নিমিত্তে তাঁর এই কিতাবটিকে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** (রা) : **قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এর দ্বারা শুরু করেছেন। কেননা প্রথম নাজিলকৃত ওহীতে আল্লাহর নামে পড়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ**—এর দ্বারা পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬-সূরা আলাক-১)। আর কালামে মাজীদের সূচনা করা হয়েছে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**—এর দ্বারা। দ্বিতীয়ত হাদীসের মধ্যে আছে, **إِذَا قِيلَ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَىٰ**—আল্লাহর প্রশংসার দ্বারা যে কাজের সূচনা হয় না তা বরকতহীন হয়ে থাকে। ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় **إِذَا قِيلَ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَىٰ**—এর দ্বারা **أَجْزَىٰ** শব্দ উদ্ধৃত রয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, **كُلُّ أَمْرٍ يُبَالٍ لَمْ يَبْدَأْ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَىٰ**—যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা যদি আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয় তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়। মূলকথা হচ্ছে, যদি কোনো কাজ আল্লাহর প্রশংসা এবং তার নামে শুরু না

করা হয় তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সর্বোপরি আমাদের আসলাফ এবং পূর্বসূরি বুজুর্গদের আমলও এরূপ যে, তারা কিতাব রচনাকালে ধীয় কিতাবাদিকে আল্লাহর প্রশংসা, হামদ এবং বিসমিল্লাহর মাধ্যমেই শুরু করতেন। কুরআন হাদীস এবং বুজুর্গদের ভরীকার অনুসরণ করে **مَعْنَى** ও তাই করেছেন।

جنسی الف ولام الحمد শব্দের الحمد শব্দের মতে কেরামের ওলাম সুন্নাহ ওয়ালা জামা'আতের ওলামায়ে কেরামের মতে قوله الحمد  
অথবা استغفراني (হামদ) আদ্বাহ তা'আলার জন্যই খাস। অর্থاً جنس حمد (হামদ) সকল প্রকার حمد

لَآئِهٖ مُسْتَجِيعٌ لِّجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَجِيعٌ لِّجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ نَهْرٌ مُسْتَعِيقٌ لِّجَمِيعِ الْعَمِدِ قَالَهُ مُسْتَعِيقٌ لِّجَمِيعِ الْعَمِدِ .

الحَمْدُ هُوَ : শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা। আর পরিভাষায় حمد -এর সংজ্ঞা হচ্ছে নিম্নরূপ :  
 الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِي نِعْمَةً كَأَوْ غَيْرِهَا  
 (খুসী) উপর মৌখিকভাবে  
 - (শরহে তাহযীব; পৃঃ ২)

-(শরহে তাহযীব; পৃঃ ২)

قَوْلُهُ لَيْلٍ ۝ আল্লাহ শব্দটি আরবি, না ইবরানি, না সুরয়ানি এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিদ্বৎময় মতে শব্দটি আরবি। যারা আরবি বলেন তাদের মধ্যে এটি صفت না علم এ বিষয়ে ফের মতভেদ রয়েছে। যারা একে علم বলেন তাদের মধ্যে আবার দুই দল। এক দলের মতে শব্দটি مشتق আর অপর দলের মতে এটি جامد বরং এটি হচ্ছে علم مرتجل অর্থাৎ এটি এমন একটি শব্দ (নামবাচক বিশেষ্য) যা কোনো কিছু থেকে উদ্ভাবিত হয়নি। এটিই জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। (আল-কুনূযুল ইযায়িয়া; পৃঃ ২৪) আল্লামা তাফতায়ানী (র.) আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: اللَّهُ عِلْمٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِلذَّاتِ الرَّائِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ। বিদ্বৎময় মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি এ চিরন্তন যাতের সম্ভাব্যচক নাম, যার অস্তিত্ব অবশ্যজবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণাবলি দ্বারা মজিত। (শরহে তাহযীব; পৃঃ ২)

مَعْلَمٌ -مَعْلَمٌ : قَوْلُهُ مَعْلَمٌ  
 শরীফের দলিল চতুষ্টয় তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে বুঝানো। এগুলোকে সমুন্নত করার অর্থ হলো, মহান  
 আল্লাহ কর্তৃক আমাদেরকে এ সব বিষয়াদির অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—  
 اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ الْبَيْكَمَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ .

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করবে না। (৭-সূরা আ'রাফ- ৩)

(৭-সূরা আ'রাফ- ৩)

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ - অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

এবং রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো। (৫৯-সূরা হাশর- ৭)

(৫৯-সূরা হাশর- ৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَبَيْنَ بُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ . وَسَاءَ مَصِيرًا .

কারো নিকট সংপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথ বাতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দণ্ড করব, আর তা কত মন্দ আবাস!

(৪- সূরা নিসা-১১৫)

(४- मुरा निसा-११५)

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ - আরো ইরশাদ হয়েছে-

অতএব হে চক্ষুস্থান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

(৫৯ - সূরা হাশর- ২)

কোনো কোনো আলিম বলেন, **مَعَالِم** দ্বারা ওলামায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। আর ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা সমন্বিত করার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

بِرَفْعِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।

(৫৮- সুরা যুজাদালা- ১১)

- شعراء - যেন-এর বহুবচন। علماء - এরা-এর বহুবচন। আর ওয়ারিশ বীয়া-এর খলীফা এবং স্থলবর্তী হয়ে থাকেন।

سنن শব্দটি سننة-এর বহুবচন। سننة (সুনত) অর্থ- রাস্তা, অভ্যাস। سنن শব্দের অর্থ হচ্ছে طرق (রাস্তা) আর দ্বিতীয় سنن শব্দের অর্থ হলো- আদত, অভ্যাস। এই হিসাবে داعين سننهم অর্থ হবে তারা (আলিমগণ) এমন পথের দিকে দাওয়াত দেন যা (লোকদেরকে) নবী-রাসূলদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ وَحَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ : এখানে اوائل المستنبطين (প্রথম যুগের মুজতাহিদগণ) বলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তাঁর শিষ্যগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা نصوص (কুরআন-হাদীস) থেকে دلائل বা প্রমাণাদি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারাই হলেন অগ্রগামী এবং মাসাইল রচনার ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আর পরবর্তীতে যে সকল ইমাম ফিক্হ জগতে অবদান রেখেছেন তারা সকলেই ছিলেন তাদের অনুবর্তী। বহুত্ব استنباط অর্থ- ভূমি খুঁড়ে পানি বের করা। এমনিভাবে نصوص থেকে وصف مؤثر বের করা থেকে استنباط বলা হয়। কেননা মাটি খুঁড়ে পানি বের করা এবং وصف مؤثر বের করা উভয়টিই কষ্টসাধ্য কাজ। এ কষ্টসাধ্য কাজ আজ্ঞাম দানের কারণেই নবী-রাসূলগণের পরেই ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা। উল্লেখ্য যে, পানি এবং ইলমের মাঝে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা পানি حیات حیات-এর سبب আর ইলম হচ্ছে حیات ارواح-এর سبب অর্থাৎ যেমনিভাবে পানির দ্বারা মানব জীবন বেঁচে থাকে তেমনিভাবে মানব আত্মা বেঁচে থাকে ইলম দ্বারা। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআন মাজীদে আদ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَحِينَا بِهِ بِلْدَةِ مِينَا :-(৫০-সূরা কাফ-১১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَمِنْ كَانَ مِينَا فَاحِينَا . যে ব্যক্তি মৃত ছিল (আধ্যাত্মিকভাবে); পরে আমি তাকে (ইলমে ওহী দ্বারা) জীবিত করেছি।

-(৬-সূরা আন'আম-১২২)

مَسَائِلُ (কিয়াসী মাসায়িল) ও مسائل (কিয়াসী মাসায়িল) উদ্দেশ্য। যেমন কুয়ার যদি বিষ্ঠা পতিত হয় তবে কিয়াসের দৃষ্টিতে এই পানি নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু কুয়ার পানি ماء قليل (স্বল্প পানি)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর স্বল্প পানিতে নাপাকী পড়তেই তা নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু استحسان তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে পানি নাপাক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা মাঠে ময়দানে যে সব কুয়া থাকে তাতে সাধারণত ঢাকনা ইত্যাদি থাকে না। আর গবাদি পশু এর আশে পাশে সচরাচর মল ত্যাগ করে থাকে এবং বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এগুলোকে কুয়াতে নিক্ষেপ করে। সুতরাং স্বল্প পরিমাণ মল বা বিষ্ঠা কুয়ার পতিত হলে তা মাফ বলে গণ্য হবে। এর বেশি পরিমাণ পতিত হলে তা মাফ বলে গণ্য হবে না। سوال مفرد غير ان الحوادث-এর জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। سوال مفرد-এর সারমর্ম হলো, যদি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম সব ধরনের মাসাইলই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী কালের আলিমগণ কেন دلائل (দলিল) استنباط করা এবং মাসাইল সংকলন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। (অথচ গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে এ কাজের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না।) সর্বোপরি লেখক নিজেই পরবর্তীতে কেন আল-হিদায়া গ্রন্থ সংকলন করলেন? سوال مفرد غير ان الحوادث বাক্যে লেখক এ প্রশ্নেরই জবাব প্রদান করেছেন। জবাবের তুলনায় হচ্ছে, যেহেতু উদ্ভূত সমস্যাবলি প্রায় প্রত্যাহই নতুনভাবে সংঘটিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট কোনো موضوع (আলোচ্য বিষয়) এ সব বিষয়াবল্যকে পরিব্যাপ্ত করে নিতেও অক্ষম, তাই এসব ঘটমান উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সর্ব কালেই মাসাইল সংকলন হতে থাকবে। এটি কোনো قابل اشكال কথা নয়।

قَوْلُهُ وَاقْتَنَصَ الشَّوَارِدَ بِالْإِتِّبَاسِ مِنَ الشَّوَارِدِ : শিকার করা। شوارد-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- ঘাট। এর অর্থ হচ্ছে- বন্য পশু। اقْتِنَصَ অর্থ- আহরণ করা, সংগ্রহ করা। موارد-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- ঘাট। এখানে موارد দ্বারা اصول (মূলনীতি) বুঝানো হয়েছে। উক্ত ইবারতে মুশকিল ও জটিল মাসাইল استنباط ও উদ্ভাবন করাকে বন্যপশু শিকার করার সাথে تشبيه দেওয়া হয়েছে বা তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْإِمْتِنَانِ مِنَ صَنَعَةِ الرَّجَالِ : অর্থাৎ সদৃশ বিষয়াদির উপর আহকামকে কিয়াস করা কামিল ও পণ্ডিত মানুষের কাজ সকলের কাজ নয়। কেননা এটি বড় কঠিন কাজ যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

عَنْ نَاجِزٍ : نَاجِزٍ-এর مصدر হচ্ছে- عَضَّ অর্থ- দাঁত দ্বারা কাটা। نَاجِزٍ-এর বহুবচন। এর অর্থ- চোয়ালের দাঁত।



وَقَدْ جَرَى عَلَى الْمَوْعِدِ فِي مَبْدَأِ الْمَيْتَةِ أَنْ أَشْرَحَهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى  
 شَرْحًا أَرَسَهُ بِكَفَايَةِ الْمُنْتَهَى فَشَرَعْتُ فِيهِ وَالْوَعْدُ بِسَوْعِ بَعْضِ الْمَسَاعِ وَجِئْتُ أَكَادُ  
 اتِّكَا عَنْهُ إِيكَاءَ الْفَرَاغِ تَبَيَّنَتْ فِيهِ نَبْذًا مِنَ الْأَطْنَابِ وَخَشِيتُ أَنْ يَهْجَرَ لِأَجْلِهِ الْكِتَابُ  
 فَصَرَفْتُ عَنَّا الْعِنَايَةَ إِلَى شَرْحِ آخِرِ مَوْسُومٍ بِالْهِدَايَةِ أَجْمَعَ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى  
 بَيَّنَّ عُيُونَ الرِّوَايَةِ وَمُتَوْنِ الدِّرَايَةِ تَارِكًا لِلزَّوَائِدِ فِي كُلِّ بَابٍ مُعْرِضًا عَنْ هَذَا النَّوعِ مِنْ  
 الْإِسْهَابِ مَعَ مَا أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَصُولٍ يَنْسَجِبُ عَلَيْهَا فَضُولٌ وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ  
 يُؤَفِّقَنِي لِاتِّمَامِهَا وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِمَامِهَا حَتَّى أَنْ مَن سَمَتْ هِمَّتُهُ إِلَى  
 مَزِيدِ الْوُقُوفِ يَرْغَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَرِ وَمَنْ أَعَجَلَهُ الْوَقْتُ عَنْهُ يَقْتَصِرْ عَلَى الْأَصْغَرِ  
 وَالْأَقْصَرِ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبَ وَالْفَنِّ خَيْرٌ كُلُّهُ ثُمَّ سَأَلْنِي بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ  
 أُمْلِيَ عَلَيْهِمُ الْمَجْمُوعَ الثَّانِي فَافْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَعَالَى فِي تَخْرِيرِ مَا  
 أَقَاوِلُهُ مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أَحَاوَلُهُ إِنَّهُ الْمَيْسِرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ وَهُوَ عَلَى مَا  
 يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

অনুবাদ : উল্লেখ্য যে, ‘বিদ্যায়তুল মুনতাহী’ নামক কিতাবের ভূমিকায় আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা যদি তৌফিক দান করেন, তবে কিফায়তুল মুনতাহী নামকরণ পূর্বক আমি এ কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করব। অতঃপর আমি শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) লিখতে আরম্ভ করলাম। অবশ্য ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে কিছু অবকাশ থাকে। (অর্থাৎ যদিও কৃত প্রতিশ্রুতি পালনে কোনো বাধ্য-বাধকতা ছিল না।) অতঃপর যখন আমি কিফায়তুল মুনতাহী কিতাব সঙ্কলনের কাজ থেকে ফারোগ (অবসর) হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় উপনীত হলাম তখন এতে কিছু ‘বিশদতা বা দীর্ঘসূত্রতা’ (الطباب) অনুভব করলাম এবং আশঙ্কা করলাম যে, এ (বিশদতার) কারণে (হয়তো) গ্রন্থখানি পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই ‘আল হিদায়া’ নামকরণ পূর্বক আমি অপর একটি শরাহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার প্রতি মনোনিবেশ করলাম। আল্লাহ তা‘আলা তৌফিক দিলে এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে আমি পছন্দনীয় বর্ণনা এবং মজবুত যৌক্তিক দলিলসমূহ জমা করব বা সমাধিষ্ট করব। আর এ ক্ষেত্রে আমি অতিবিশদ আলোচনার ধারা উপেক্ষা করে চলব। তবে এতে এমন সব মূলনীতি সন্নিবেশিত থাকবে-যার ওপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয় (مفروع) উদ্ভাবিত (متفرع) হবে।

আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাকে এ কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেন এবং তা সমাপ্তির পর যেন আমার খাতিমা বিল খায়ের হয় অর্থাৎ এ শুভকাজ সম্পন্ন করার পর যেন সৌভাগ্যের সাথে তিনি আমার জীবনের অবসান ঘটান। আর অধিক জ্ঞান অর্জনের উৎসূহ যাদের হবে তারা যেন সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ (কিফায়তুল মুনতাহী) টি অধ্যয়ন করার প্রতি মনোনিবেশ করে। আর যাদের সময়ের তাড়াহুড়া থাকবে অর্থাৎ যাদের সময় ও সুযোগ কম হবে তারা (ভুলনামূলক) ছোট ও সংক্ষিপ্ত পরিধির ব্যাখ্যাগ্রন্থ (আল হিদায়া) টি অধ্যয়ন করার উপর নির্ভর করবে। আর وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ পছন্দের ক্ষেত্রে মানুষের তো রুচি বৈচিত্র্য রয়েছেই।

উল্লেখ্য যে, এ ফিক্‌হশাস্ত্র (ফন) সর্বোত্তমভাবেই সর্বাধিক কল্যাণকর। অতঃপর আমার কতিপয় সুহৃদ ভ্রাতা আমার নিকট এ আবেদন করলেন যে, আমি যেন তাদের জন্য উক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং আমি ফিক্‌হী কথা (মাসআলা) লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করে তা লিখতে শুরু করলাম, তাঁর দরবারে সাকাতর প্রার্থনা সহকারে, যেন তিনি আমার প্রয়াস সহজ করে দেন। তিনিই সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনিই যা ইচ্ছা তা করার উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং আবেদন কবুল করার ব্যাপারে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। আর আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الطباب এ লম্বা বক্তব্য যা কোনো রহস্য বা نكتة-এর ভিত্তিতে দীর্ঘায়িত হয়। পক্ষান্তরে যদি এর মধ্যে কোনো ফায়দা বা রহস্য না থাকে, এমনিই লম্বা করা হয় তবে এ জাতীয় দীর্ঘ বক্তব্যকে تطويل বলা হয়।

عُيُونُ الرَوَايَةِ : পছন্দনীয় বর্ণনা। কেননা عَيْنُ الشَّيْءِ زَيْنُ الشَّيْءِ-কে বলা হয়। আর مَرْوِيَات -বর্ণিত (বর্ণিত বিষয়)। মূলত عُيُونُ الرَوَايَةِ শব্দে الْمُؤَصِّفُ إِلَى الْمُوصُوفِ-এর নীতি অবলম্বিত হয়েছে।

عُيُونُ الرَوَايَةِ : ..... بَعْدَ اخْتِمَامِهَا : এখানে উভয় শব্দে مؤن্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এর مرجع হবে আল-হিদায়া। পক্ষান্তরে কোনো نسخة-এর ثنية-এর مؤন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ضمير-এর مرجع হবে আল-হিদায়া ও কিফায়াতুল মুনতাহী গ্রন্থ দুটি।

عُيُونُ الرَوَايَةِ : قَوْلُهُ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتِشِقُونَ مَذَاهِبَ : এখানে মতাবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اُطْرُقُ مُخْتَلِفَةً অর্থানুসারে রচনা বৈচিত্র্য বা চরিত্রের বিভিন্নতা। فن দ্বারা মুরাদ হলো, ইলমে ফিক্‌হ এবং المجموع الثانی দ্বারা মুরাদ হলো হিদায়া।

ভূমিকার সার-সংক্ষেপ : গ্রন্থকার (র.) (আল্লাহ তা'আলার) হাম্দ (حمد) ও ছানা (ثناء) করার পর বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে নবী-রাসূলগণের স্থলবর্তী করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তারা স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার মাসায়েল উদ্ভাবন ও সংকলন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর উদ্ভূত সমস্যা যেহেতু সর্বদাই ঘটে যাচ্ছে এবং এগুলোকে যেহেতু একই গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত করে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই মাসায়েল সংকলন ও উদ্ভাবনের কাজ সর্বদাই চলবে। তবে এ মহান কাজ সকলের পক্ষে আজ্ঞাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে যাদের পাণ্ডিত্য আছে এবং যাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে তারাই কেবল এ কাজ আজ্ঞাম দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবের ভূমিকা অংশে যেহেতু কিফায়াতুল মুনতাহী নামক একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে শরাহ লেখার কাজ শুরু করলাম। অতঃপর রচনার কাজ সমাপ্ত করার কাছাকাছি অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর আমি অনুভব করলাম যে, শরাহটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, বিশদতা এবং দীর্ঘ সূত্রতার কারণে গ্রন্থটি হয়তো পরিত্যক্ত হতে পারে। এ আশঙ্কা নিরশনের লক্ষ্যে আমি আলি হিদায়া নামে আরেক শরাহ লেখার কাজ শুরু করলাম, যা প্রথমটির তুলনায় মুখতাসার এবং সংক্ষিপ্ত হবে। এতে থাকবে পছন্দনীয় বর্ণনা এবং মজবুত যৌক্তিক দলিল-প্রমাণসমূহ। আর এতে এমন সব মূলনীতিও সন্নিবেশিত থাকবে যার উপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয়াদি উদ্ভাবন করা যাবে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেন, যেন গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি তার জীবনের অবসান ঘটান। এরপর তিনি বলেন, যাদের মধ্যে অধিক জ্ঞান আহরণের উচ্চশৃংখা আছে তারা যেন শরহে আকবর তথা কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবটি মুতালাআ করে। আর যাদের সময় ও সুযোগ কম তারা যেন শরহে আসগর তথা হিদায়া অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, তৎপর আমার কতিপয় সুহৃদ ভ্রাতা অনুরোধ করলেন, যেন আমি তাদের জন্য দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি, তাই আমি আল্লাহর দরবারে সাকাতর প্রার্থনা সহকারে তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে হিদায়া গ্রন্থখানা সংকলন করার কাজ আরম্ভ করলাম। অতঃপর বললেন, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

# كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الْآيَةُ فَفَرَضَ الطَّهَارَةَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ بِهَذَا النَّصِّ وَالْغَسْلُ هُوَ الْإِسَالَةُ وَالْمَسْحُ هُوَ الْإِصَابَةُ وَحُدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى اسْفَلِ الذَّقَنِ وَالْيَاسِي شَحْمَتِي الْأُذُنَيْنِ لِأَنَّ الْمَوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا .

## অধ্যায় : তাহারাতি

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা গ্রহি পর্বন্ত ধৌত করবে।-(৫-সূরা মায়িদা- ৬) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজুতে তিনটি অঙ্গ ধোয়া এবং মাথা মাসাহ করা ফরজ। গোসল (غسل) অর্থ-(পানি) প্রবাহিত করা। আর মাসাহ (مسح) অর্থ-(ভিজা হাত শরীরের অঙ্গের উপর) বুলানো। মুখমণ্ডলের সীমানা হলো, মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া হতে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। কেননা وجه শব্দটি مواجه থেকে উদ্গত হয়েছে। আর مواجه (মুখামুখি হওয়া) প্রমাণিত হয় এই পুরা অংশের মাধ্যমে। (সুতরাং মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় এই পরিমাণ অঙ্গ ধোয়া অপরিহার্য।)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যটির মধ্যে তিন ধরনের بحث (আলোচনা) রয়েছে। (১) বাক্যটির تركيب نحوى সম্পর্কিত আলোচনা। (২) শব্দের বিশ্লেষণ। (৩) طهارات শব্দের বিশ্লেষণ। كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যের মধ্যে تركيب-এর দিক থেকে তিন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ এ ক্ষেত্রে كِتَابُ الطَّهَارَاتِ বাক্যটি هَذَا مبتدأ-এর দিক থেকে তিন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (২) هَذَا كِتَابُ الطَّহَارَاتِ هَذَا - খবর এর হবে। (৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (২৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৩৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৪৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৫৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৬৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৭৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৮৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯১) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯২) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৩) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৪) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৫) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৬) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৭) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৮) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (৯৯) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ। (১০০) هَذَا كِتَابُ الطَّهَارَاتِ هَذَا - খবর এবং এর مبتدأ।

একটি এবং একটি শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে- লেখা, জমা করা ইত্যাদি। كِتَاب শব্দটি مَكْتُوب (লিখিত) অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন كتاب خلق শব্দটি مخلوق-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর পরিভাষায় كتاب বলা হয় মাসাইলের ঐ সমষ্টিকে, যা স্বতন্ত্রভাবে ধর্তব্য (معتبر) ও গৃহীত হয়। চাই এতে مختلف نوع তথা বিভিন্ন ধরনের মাসায়েল থাকুক বা না থাকুক। طهارة শব্দটি বিভিন্নভাবে পঠিত হতে পারে। যেমন- طهارة - طهارة ও طهارة। যদি طهارة অক্ষরে পেশ দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে- পবিত্রতা হাসিল করার পানি। যদি طهارة অক্ষরে যের দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে- পবিত্রতা অর্জন করার পানি বা উপকরণ। আর যদি طهارة অক্ষরে যবর দিয়ে طهارة পড়া হয় তবে এটি مصدر হবে। এর

অর্থ হবে- পবিত্রতা অর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায় হদস ও জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করাকে طهارة বলা হয়। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে তিন অঙ্গ ধৌত করা এবং মাথা মাসাহ করার নাম طهارة।

আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষনৌবী (র.) আল্লামা হালবী (র.)-এর সূত্রে শরহে বিকায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সি'আয়া (الـ حاية)-এর মধ্যে একথা উল্লেখ করেছেন যে, তাহারাতের ক্ষেত্রে দুই ধরনের শর্ত রয়েছে।

(১) شروط وجوب (২) شروط صحت অর্থাৎ যে সব শর্ত পাওয়া গেলে তাহারাৎ গুণ্জিব হয় তা নয়টি। (১) ইসলাম; (২) জ্ঞানবান হওয়া; (৩) বালিগ হওয়া; (৪) হদস হওয়া (চাই হদসে আসগর হোক বা আকবর হোক); (৫) সমস্ত শরীয়ে পাক পানি বহিয়ে দেওয়া; (৬) হায়েযের অবস্থা না হওয়া; (৭) নিফাস না হওয়া; (৮) পানি বা মাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া; (৯) সময়ের মধ্যে এর সুযোগ এবং অবকাশ থাকা। شروط صحت অর্থাৎ তাহারাৎ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত চারটি। (১) সমস্ত শরীয়ে পানি পৌছানো; (২) হায়েয না হওয়া; (৩) নিফাস না হওয়া; (৪) যে ব্যক্তি মাজুর নয়, এ জাতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহারাৎ হাসিলের সময় نافض طهارة (তাহারাৎ ভঙ্গকারী) কোনো বিষয় সংঘটিত না হওয়া এবং তাহারাৎ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হদস বা জানাবাত পাওয়া যাওয়া। তাহারাতের হুকুম হলো, যে কাজ তাহারাৎ ব্যতিরেকে বৈধ হয় না, সে কাজ তাহারাতের মাধ্যমে বৈধ বা মুবাহ হয়ে যাওয়া।

আলাহু! এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হিদায়া গ্রন্থকার طهارات শব্দটিকে جمع-এর صيغة-এর সাথে কেন ব্যবহার করেছেন? অথচ طهارة শব্দটি مصدر-এর কোনো تثنیه আছে। আর مصدر-এর কোনো تثنیه আছে।

জবাব : যদি مصدر-এর শেষে تاء নানিহ থাকে তবে ঐ مصدر-এর تثنیه ও جمع ব্যবহার করা বৈধ আছে। স্বত্বা যে, এখানে (رح) مصنف শব্দটিকে جمع ব্যবহার করে طهارة-এর বিভিন্ন انواع (প্রকারসমূহ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা رفع نجاست و طهارة ও رفع خبث و طهارة-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অথচ এ দুটি দুই مختلف نوع সম্পর্কিত বিষয়।

উল্লেখ্য, এখানে গ্রন্থকার (র.) كِتَابُ الطَّهَارَاتِ তথা তাহারাৎ অধ্যায়কে অপরাপর অধ্যায়ের উপর مقدم করলেন কেন? এ সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, শরিয়ত স্বীকৃত ও অনুমোদিত (مشروعات) বিষয়সমূহ হচ্ছে চার প্রকার। (১) ালিস হক্কুল্লাহ (خَالِصٌ حَقُّهُ اللّٰهُ) (২) খালিস হক্কুল ইবাদ (خَالِصٌ حَقُّهُ الْعِبَاد) (৩) হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয়। তবে এতে হক্কুল্লাহ প্রবল; (৪) হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ মিশ্রিত বিষয় তবে এতে হক্কুল ইবাদ প্রবল। এ সব বিষয়াদির মধ্যে হক্কুল্লাহ-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায় গ্রন্থকার (র.) হক্কুল্লাহ (ইবাদত)-এর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতঃপর ইবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় প্রথমে নামাজের আলোচনা করেছেন। কেননা ইসলামের মধ্যে ঈমানের পর নামাজের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কুরআন মাজীদে বহু স্থানে নামাজের প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِضِينَ . (২-সূরা বাকারা-৪৩)

তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো এবং রকুকারীদের সাথে রকু করো।

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ .

নামাজ দীনের স্তম্ভ। যে নামাজ কায়েম করল সে দীন কায়েম করল। (হাদীস)

আর তাহারাৎ নামাজের জন্য পূর্বশর্ত। হাদীসে আছে، وَفَتْحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ (পবিত্রতা নামাজের কুঞ্জি) এবং এ মুন্নীতিও সর্বজন স্বীকৃত যে، شَرَطَ الشَّرْعُ مُقَدِّمَ عَلَى الشَّرْءِ (যে সব বিষয়াদি কোনো কাজের জন্য পূর্বশর্ত, সে সব বিষয়াদি ঐ কাজের অগ্রে পাওয়া যাওয়া অত্যাব্যশ্যক), এ কারণে (رح) مصنف -এর আলোচনার দ্বারা তাঁর এই কিতাবটি শুরু করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন (র.) অজু সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা কিতাবের শুভসূচনা করেছেন। অথচ দুনিয়ার নিয়ম হলো, দাবি আগে এবং দলিল পরে উল্লেখ করা। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থকার (র.) এমনটি কর- ন কেন? জবাবে আলিমগণ বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) تَبَيَّنَ وَ تَبَيَّنَ অর্থাৎ বরকত হাসিলের জন্য এমনটি করেছেন। যদিও এটি প্রচলিত নিয়মের বিপরীত কাজ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

উপরোক্ত আয়াতে কয়েক ধরনের আলোচনা রয়েছে। (১) এখানে ان শব্দ ব্যবহার না করে اذا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা اذا শব্দটি ইয়াকীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং ان শব্দটি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া মু'মিনের ক্ষেত্রে একটি ইয়াকীনী বিষয়, সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়, তাই এখানে اذا ব্যবহার করা হয়েছে। (২) দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী। কেননা বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা.) স্বীয় হার হারানোর ঘটনা বর্ণনার পর বলেছেন—  
فَنَزَلَتْ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ..... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

আর এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হার হারানোর এ ঘটনা হিজরতের কয়েক বছর পর সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এই আয়াত মাদানী হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লেখ্য যে, মুক্তা মকাররমায় যখন সালাত ফরজ হয় তখন অজুও ফরজ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারেও কারো কোনো দ্বিমত নেই। আত্মা ইবনে আবদুল বার (র.) বলেন, সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে, নামাজ ফরজ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো নামাজই অজু ছাড়া আদায় করেননি। এ কথাটি জাহিল, অজ্ঞ এবং ইসলামের দূশমন মানুষ ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এখন এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, অজু করার আমল পূর্ব হতে জারি থাকা অবস্থায় এরূপ দীর্ঘ দিন পর এ আয়াত নাজিল করার মাঝে কি হিকমত? এ সম্বন্ধে আত্মা আবদুল হাই লক্লেবী (র.) সি'আয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যাতে অজুর হুকুমটি مشل হয়ে যায় এ হিকমতের نظر پیش চলমান অজুর আমলকে আয়াত নাজিল করে পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অথবা অজুর বিধান সম্পর্কিত উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যেতে পারে, আয়াতের প্রথমংশ যেখানে অজুর কথা বলা হয়েছে তা অজু ফরজ হওয়ার সময় মক্কায়েই নাজিল হয়েছে, আর আয়াতের শেষাংশ যেখানে তায়াম্মুমের কথা বর্ণিত হয়েছে তা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।—(আল-ইত্ফাক)

(৩) তৃতীয় আলোচনা হচ্ছে, যাহিরী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে কোনো ব্যক্তিই নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে চাই সে محدث (অজুহীন) হোক বা غير محدث (অজুহীন না) হোক সর্বাবস্থায়ই তাকে অজু করতে হবে। اصحاب ظاهر-এর মাহযাব এটিই। অর্থাৎ অজু থাকলেও অজু করতে হবে এবং না থাকলেও অজু করতে হবে। কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের মাহযাব এর থেকে ভিন্নতর। তাঁদের মতে এখানে একটি শর্ত উহ্য আছে। তা হলো, وانتم محدثون এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হবে, অজুহীন অবস্থায় তোমরা নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করলে তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে প্রথমে অজু করা। হাদীস হাদীস প্রমাণিত যে, অজু ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো অজুহীন হওয়া। অর্থাৎ অজুহীন হলেই কেবল অজু ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। সর্বোপরি অজুহীন ব্যক্তিরই কেবল অজু করা ওয়াজিব, এ কথাটি আলোচ্য আয়াতের دلالة النص থেকেও প্রমাণিত হয়।  
وَأَن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .

আত্মা তা'আলা তায়াম্মুমের বিধানকে حدث-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, حدث হওয়া তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। উল্লেখ্য যে, তায়াম্মুম হলো, অজুর খলীফা বা بدل। আর এ قاعده টি সর্বজন যীকৃত যে, بدل-এর মধ্যে যে জিনিসটি نص হিসাবে গণ্য হবে اصل-এর মধ্যেও তা نص হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং حدث হওয়া অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হিসাবে গণ্য হবে, যেমন তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

অর্থান্ন قطع হচ্ছে فرض (ফরজ) শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) فرض শব্দের এক অর্থ হচ্ছে অর্থান্ন কর্তন করা। যেমন বলা হয়, فرض الخياط الثوب, দর্জি কাপড় কেটেছে। (২) فرض শব্দের এক অর্থ হচ্ছে তাকদীর (نفدير) অর্থান্ন নিরূপণ করা, সাব্যস্ত করা। যেমন আত্মা তা'আলা ইরশাদ করেন, أَنَصَفَ مَا فَرَضْتُمْ (এখানে فَرَضْتُمْ-এর অর্থ হচ্ছে أَذَرْتُمْ) অর্থান্ন তোমরা যা সাব্যস্ত করছে এর অর্ধেক। (৩) এর এক অর্থ হচ্ছে তাকদীর প্রদান করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, سَوَّرَ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا অর্থান্ন তাকদীর প্রদান করে। (৪) فرض الله لكم (যেমন আত্মা তা'আলা ইরশাদ করেন, فَرَضَ اللَّهُ لَكُم) অর্থান্ন নিরূপণ করা, সাব্যস্ত করা।

تَحِلُّهُ آمَانِكُمْ (৫) সীমা (حد) নির্ধারণ করা -এর অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, مَحْدُودًا (নির্ধারিত) مَحْدُودًا مَفْرُوضًا এখানে لَا تَخْذَنَّ مِنْ عَبْدِكَ نَبِيًّا مَفْرُوضًا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৬) এটি (عطية) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, فَرَضْتُ الرَّجُلَ (আমি এক ব্যক্তিকে কিছু দান করেছি)। (৮) বৃদ্ধ হওয়া। যেমন বলা হয়, فَرَضْتُ الْبَقَرَةَ (গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে)। এই অর্থেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, لَا فَايِسَ وَلَا يَكِرْ (গরুটি বৃদ্ধও নয় এবং অল্পবয়স্কও নয়)। (৯) আযমতের অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, فَارَضَ فَايِسٌ (অমুক ব্যক্তি একজন নেতা)। শরিয়তের পরিভাষায় ফরজ এমন হুকুমকে বলা হয় যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এর হুকুম হলো, যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তা বর্জন করবে সে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব এমন হুকুমকে বলা হয় যা دليل غنى দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে সেও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তবে তার ছওয়াব ফরজের উপর আমলকারীর তুলনায় কিছুটা কম হবে। আর বর্জনকারীর শাস্তিও ফরজ বর্জনকারীর শাস্তির তুলনায় কম হবে।

উল্লেখ্য যে, دلالت চার প্রকার। (১) قَطِيعُ الدَّلَالَةِ قَطِيعُ الثُّبُوتِ -যেমন কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত মুতাওয়াতিহ হাদীস যা স্পষ্ট এবং যাতে কোনোরূপ তাবীল (تاويل)-এর অবকাশ নেই। (২) قَطِيعُ الثُّبُوتِ قَطِيعُ الدَّلَالَةِ -যেমন কুরআন মাজীদের আয়াত এবং ঐ সমস্ত হাদীস যার মধ্যে তাবীল (تاويل)-এর অবকাশ রয়েছে। (৩) قَطِيعُ الثُّبُوتِ -যেমন ঐ সমস্ত খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) যা স্পষ্ট ও صريح (৪) قَطِيعُ الدَّلَالَةِ -যেমন- খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) যাতে বিভিন্ন ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম প্রকারটি ইযাকীনের ফায়দা দেয়। দ্বিতীয় প্রকারটি ظن তথা প্রবল ধারণার ফায়দা দেয়। তৃতীয় প্রকার দ্বারা وجوب এবং تحريم মকروه সাব্যস্ত হয়। আর চতুর্থ প্রকার দ্বারা সুনত ও মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। —(হাশিয়ায় শরহে নিকায়)

এখানে طهارة শব্দটি وضو -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وضو -এর আর অক্ষরে যদি পেশ হয় তবে এর অর্থ হবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় অজুর অপসমূহ ধোয়া ও মাসাহ করা। আর যদি وار অক্ষরে যবর দেওয়া হয় তবে এর অর্থ হবে ঐ পানি যার দ্বারা অজু করা হয়।

এখানে হিদায়া গ্রন্থকার অজুর বিষয়টিকে গোসল ইত্যাদির আগে বর্ণনা করেছেন। এর প্রথম কারণ হলো, গোসলের তুলনায় অজুর বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অজুর অঙ্গ (محل) সমূহ গোসলের অঙ্গ (محل) সমূহের جزء। আর كل -এর উপর مقدم হয় طبعاً তাই অজুর আলোচনাকে গোসলের আলোচনার উপর مقدم করা হয়েছে। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলাও প্রথমে অজুর কথা বর্ণনা করে বলেছেন, وَأَنْ كُنْتُمْ حُبًّا فَاطْهَرُوا এবং পরে গোসলের কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন, غُسل -এর অক্ষরে যদি পেশসহ পড়া হয় তবে এর অর্থ হবে গোসল করা। যে পানি দ্বারা গোসল করা হয় একেও غسل বলা হয়। যদি অক্ষরে যের পড়া হয় (غُسل) তবে এর অর্থ হবে ঐ সমস্ত জিনিস যার দ্বারা মাথা ধোঁত করা হয়, যেমন বিতামী ইত্যাদি। আর غُسل অক্ষরে যদি যবর হয় (غُسل) তবে এর অর্থ হবে ধোঁত করা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অজুর ফরজ চারটি, অর্থাৎ তিন অঙ্গ ধোঁত করা এবং মাথা মাসাহ করা। এই চারটি বিষয়ের ফরযিত কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, الْإِسْلَاءُ -এর অর্থ পানি প্রবাহিত করা। এর দ্বারা ইমাম মালিক (র.) -এর রদ করা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর মতে অজুর অঙ্গসমূহের উপর পানি প্রবাহিত করাই শুধু যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে শরীর মর্দন করাও শর্ত। মাসাহ অর্থ تَطَاطُر (পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়া) ব্যতীত ভিজা হাত অঙ্গসমূহের উপর বুলানো।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতে طَوَّلاً وَعَرَصًا তথা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিক থেকে চেহারার সীমানা হলো, মাথার অগ্রভাগের চুলের উপস্থিতি থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত চেহারা ধোঁত করা ফরজ। কেননা وجه শব্দটি (মুখোমুখি হওয়া) থেকে উদ্গত হয়েছে। আর مواجهة এই পুরা চেহারার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এই পূর্ণ চেহারা ধোঁত করা ফরজ।

وَالْمَرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِي الْفَسْلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِرُفَرٍ (رح) وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الْغَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ وَلِنَا أَنْ هَذِهِ الْغَايَةُ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا إِذَا لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوُضْيِفَةَ الْكُلَّ وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إِلَيْهَا إِذِ الْإِسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِي هُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ.

অনুবাদ : আমাদের তিন ইমামের মতে কনুইদ্বয় এবং পায়ের টাখনুদ্বয়ও ধৌত করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (অতএব হাত-পা ধৌত করার সময় এই স্থানগুলোও ধৌত করতে হবে।) কিন্তু ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, গায়া (غاية) অর্থاً الى শব্দের পরবর্তী বিষয়টি মুগায়া (مغيا) তথা الى শব্দের পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয় না। যেমন- রোজার ক্ষেত্রে লায়ল (ليل)-রাত্রি রোজা রাখার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের (ইমামগণের) যুক্তি হলো, আলোচ্য আয়াতে এই গায়া (غاية) তৎপরবর্তী অংশকে বাদ দেওয়া (إسقاط)-এর নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে যদি কনুই এবং টাখনুর কথা উল্লেখ না থাকতো তবে হাত-পা বলতে যা বুঝা যায় এর পুরোটাই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হতো। পক্ষান্তরে রোজা সম্পর্কিত আয়াতে الى ব্যবহৃত হয়েছে সওম তথা রোজাকে গায়া غاية তথা ليل (রাত্রি) পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে। কেননা সামান্য সময়ের জন্য (পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে) বিরত থাকার উপরও صوم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। إِلَى اللَّيْلِ (নিশাগম পর্যন্ত) বলার কারণে রাত পর্যন্ত রোজা রাখা প্রতীয়মান হয়েছে। আল-কা'ব (الكعب) অর্থ- ভাসমান বা বেরিয়ে থাকা হাড়। এটিই সহীহ অভিমত। الكاعب শব্দটি এর থেকেই উদ্গত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مرفق শব্দের মিম অক্ষরে যের এবং ف অক্ষরে যবর হবে। অবশ্য এর বিপরীতও জায়েজ আছে। অর্থাৎ মিম অক্ষরে যবর এবং ف অক্ষরে যের। এর অর্থ কনুই। প্রকৃতপক্ষে বাহুর জোড়াকে مرفق বলা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পায়ের পাতার উপরিভাগে ভাসমান যে হাড় রয়েছে যেখানে জুতার ফিতা বাঁধা হয় ঐ জোড়াটিকে كعب বলা হয়। মূলত এ কথা সহীহ নয়। সহীহ অভিমত অনুসারে كَعْب অর্থ পায়ের গোড়ালির নিচে ভাসমান হাড়, যাকে টাখনু বলা হয়। كاعب শব্দটি এর থেকেই উদ্গত হয়েছে। এর বহুবচন كَوَاعِبُ এমন যুবতী মহিলাকে বলা হয় যাদের স্তন উন্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাত ধৌত করার ক্ষেত্রে কনুইদ্বয় এবং পা ধৌত করার ক্ষেত্রে টাখনুদ্বয় হাত এবং পায়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা? এ সম্বন্ধে আমাদের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হাতের সাথে কনুই ধৌত করা এবং পায়ের সাথে টাখনু ধৌত করা ফরজ। এটি ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এরও অভিমত। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর একটি রিওয়ায়াতও বটে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে হাত ধোয়ার সময় কনুই ও পা ধোয়ার সময় টাখনু ধৌত করা ফরজ নয়। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর একটি রিওয়ায়াতও বটে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য আয়াতে مَرَفَقٌ এবং كَعْبَيْنِ শব্দ দুটো غاية আর غايَةً - مطلقاً - مغيب-এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হয় না। কাজেই কনুই হাতের হুকুমের মধ্যে এবং টাখনু পায়ের হুকুমের মধ্যে দাখিল হবে না।

আমাদের ইমামত্রয়ের বক্তব্য হলো, غَايَة - مغيا -এর মধ্যে مطلقا দাখিল হয় না, ইমাম যুফার (র.)-এর এ কথা আমরা স্বীকার করি না। কেননা غَايَة দুই প্রকার। (১) غَايَة হয়তো তৎপূর্ববর্তী শব্দ مغيا -এর جنس থেকে হবে (অথবা হবে না) অর্থাৎ যদি غَايَة -কে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে صدر كلام অর্থাৎ مغيا -এবং তৎপরবর্তী বিষয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে নেয়। (২) অথবা غَايَة তৎপূর্ববর্তী শব্দ অর্থাৎ مغيا -এর جنس থেকে হবে না। অর্থাৎ غَايَة -কে যদি পৃথক করে দেওয়া হয় তবে مغيا অর্থাৎ غَايَة -এবং তৎপরবর্তী বিষয়কে নিজের মধ্যে শামিল করে নেয় না। لَيْل আয়াতে ثُمَّ آتَمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ -এর প্রথমোক্ত প্রকার مغيا -এর মধ্যে দাখিল হয় না। لَيْل (রাত) যেহেতু রোজার جنس থেকে নয়, এ জন্য لَيْل (রাত) রোজার হুকুমের মধ্যে দাখিল নয়। কিন্তু مَرْفَقَيْنِ (কনুইদ্বয়) -এবং يَدَيْنِ (হস্তদ্বয়) এবং كَعْبَيْنِ (টাখনুদ্বয়) যেহেতু رَجُلَيْنِ (পদদ্বয়)-এর جنس থেকে তাই এই দুই غَايَة -এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হবে। কাজেই হাত ধোয়ার সাথে কনুই এবং পা ধোয়ার সাথে টাখনুও ধৌত করতে হবে।

এ হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণিত দলিলের সারমর্ম হচ্ছে গায়ে দুই প্রকার। (১) غَايَةِ إِبْثَات (২) غَايَةِ إِسْقَاط এ দুই প্রকার গায়ে-এর মধ্যে مَا بِهِ الْإِمْتِيَاز হচ্ছে, যদি صَدَرَ كَلَامٌ অর্থাৎ মগিয়া - গায়ে - কে নিজের মধ্যে शामिल রাখে তাহলে এটি غَايَةِ إِسْقَاط হবে। আর গায়ে যদি মগিয়া - কে নিজের মধ্যে शामिल না রাখে তবে তা গায়ে إِبْثَات হবে। لَيْل (রাত) آيَاتُكُمْ إِلَى اللَّيْلِ - মগিয়া-এর হুকুমের মধ্যে দাখিল হয় না। যেমন- মগিয়া-এর মধ্যে शामिल নয়। আর غَايَةِ إِسْقَاط-এর মধ্যে গায়ে - মগিয়া-এর মধ্যে शामिल করা তথা বহির্ভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই غَايَةِ إِسْقَاط-এর ক্ষেত্রে গায়ে - মগিয়া - এর মধ্যে शामिल آيَاتُكُمْ إِلَى اللَّيْلِ-এর মধ্যে مَرَاتِقُكُمْ (কনুই) (হাত)-এর মধ্যে शामिल হবে এবং آيَاتُكُمْ إِلَى اللَّيْلِ-এর মধ্যে آيَاتُكُمْ (পা)-এর মধ্যে शामिल হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে آيَاتُكُمْ إِلَى اللَّيْلِ-এর মধ্যে مَرَاتِقُكُمْ (কনুই)-এর উল্লেখ করা হয়েছে কনুই এর পরবর্তী অংশকে হাতের হুকুম থেকে বহির্ভূত করার জন্য এবং آيَاتُكُمْ-এর উল্লেখ করা হয়েছে টাখনু পরবর্তী অংশকে পা খোয়ার হুকুম থেকে বহির্ভূত করার জন্য।



قَالَ : وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسِجِ الرَّأْسِ بِمِقْدَارِ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُغَّ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سِبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخَفَّيْهِ وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَانْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي التَّقْدِيرِ يَثْلَثُ شَعْرَاتٍ وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْتِيعَابِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَدَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (رح) يَثْلَثُ أَصَابِعَ الْيَدِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ .

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাথা মাসাহ করার ক্ষেত্রে মাথার অগ্রভাগ (ناصية) তথা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী কারীম ﷺ কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে অজু করলেন। তখন তিনি মাথার সমুখ ভাগ (ناصية) ও মোজার উপর মাসাহ করলেন। যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) এখানে (পরিমাণের বর্ণনায়) সংক্ষিপ্ত (مُجْمَل) সেহেতু আলোচ্য হাদীসটিকে এর বয়ান বা ব্যাখ্যারূপে যুক্ত করা হয়। এ হাদীসটি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্য “তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ”-এর বিপরীতে আমাদের মায়হাবের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। এমনিভাবে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত “পূর্ণ মাথা মাসাহ করা শর্ত”-এর বিপক্ষেও আমাদের দলিল। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আমাদের ইমামগণের কেউ কেউ ফরজ মাসাহের পরিমাণ হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কেননা آلَةُ الْمَسْحِ (যার ঘরা মাসাহ করা হয়)-এর মধ্যে যে জিনিসটি (আঙ্গুলসমূহ) আসল আঙ্গুল তিনটি এর أَكْثَرُ বা তুলনামূলক অধিক।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ-এর অর্থ হলো, ভিজা হাত বুলানো। চাই তা পাত্রের পানির দ্বারা ভিজানো হোক বা কোনো مَسْفُول অঙ্গকে ধৌত করার পর এ অর্দ্রতা হাতের মধ্যে বাকি থাকুক। মাথা মাসাহ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। কেননা মাথা মাসাহ করার বিষয়টি স্পষ্ট নস তথা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট বিধান দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য কি পরিমাণ মাসাহ করতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ইমামগণের মতে মাথার চার ভাগের একভাগ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। চাই তা মাথার সমুখ ভাগের এক-চতুর্থাংশ হোক বা পিছনের দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক কিংবা ডান বা-বা দিকের এক-চতুর্থাংশ হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে مَطْلَعُ মাথা মাসাহ করা ফরজ। সুতরাং কেউ যদি তিন চুল বা তিন মতে এক চুল পরিমাণ মাসাহ করে তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ। ইমামগণ সকলেই أَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ আয়াত দ্বারা আয়াত দ্বারা استِدْلَال করেন।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, أَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ বা অক্ষরটি অতিরিক্ত (زائده)। তাই أَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ -এর অর্থ হবে অমসحوا بِرُءُوسِكُمْ (তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করবে)। আর এ কথা অভ্যস্ত স্পষ্ট যে, মাথা (رَأْس) বলতে পূর্ণ মাথাকেই বুঝায়, অংশ বিশেষকে বুঝায় না। কাজেই এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই ফরজ। শরহে নিকায়ার মুসান্নিফ (مُصَنَّف) বলেন, এ মাসআলায় ইমাম মালিক (র.) احتياط-এর উপর আমল করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে أَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ আয়াতটি মাসাহ-এর পরিমাণ بِمِقْدَارِ مَسْحٍ বর্ণনার ক্ষেত্রে الْمَطْلَعُ يَجْرِي عَلَى أَطْلَاقِهِ -এর (নীতি) অনুসারে مَطْلَعُ মাথা মাসাহ করা ফরজ। সুতরাং ইমাম

শাফিঈ (র.)-এর মতে **أُتِيَ رَأْسُ** অর্থাৎ মাথার নূনতম অংশ মাসাহ করার দ্বারাই মাসাহের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। আর সেই নূনতম পরিমাণ হচ্ছে এক চুল অথবা হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে তিন চুল। সুতরাং এ পরিমাণ মাসাহ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

হানাফী ইমামগণের মতে মাসাহ-এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি হচ্ছে **مَجْمَل** (সংক্ষিপ্ত)। **مَجْمَل**-এর জন্য **بَيَانُ إِجْمَالٍ** হচ্ছে জরুরি। আর হযরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসে সেই **إِجْمَال**-এরই বয়ান পেশ করা হয়েছে। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ :

**إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سِبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِمْ وَخَفَّيَهُ .**

(একদা নবী করীম **ﷺ** কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে অজু করলেন এবং মাথার সম্মুখ ভাগের উপর এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন।) হিদায়া গ্রন্থকারের পেশকৃত হাদীসটি হযরত মুগীরা ও হযরত হুযায়ফা (রা.) উভয়ের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা **مَرْكِب**। হযরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসটি যা ইমাম মুসলিম (র.) উদ্ধৃত করেছেন, এর শব্দাবলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

**إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِمْ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خَفَّيِهِ .**  
(একদা নবী করীম **ﷺ** অজু করে মাথার সম্মুখ ভাগের উপর মাসাহ করলেন এবং মাসাহ করলেন তিনি পাগড়ি ও মোজার উপর।)

আর হুযায়ফা (রা.)-এর হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

**أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سِبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ فَأَنَابَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجَنَّهُ بِمَاءٍ تَوَضَّأَ .**

(একদা নবী করীম **ﷺ** কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনার জন্য বলেন আমি পানি নিয়ে আসলাম। এরপর তিনি অজু করলেন।)

উপরোক্ত হাদীস দুটির সারমর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** পেশাব করার পর অজু করেছেন এবং অজুতে তিনি মাথার সম্মুখ ভাগ পরিমাণ জায়গা মাসাহ করেছেন। সম্মুখ ভাগ হলো মাথার চারভাগের এক ভাগের সমপরিমাণ। এ কারণে হানাফী ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা **استدلال** করে বলেন যে, মাথার চারভাগের একভাগ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসেও এ কথার প্রতি সমর্থন রয়েছে।

হাদীসটি নিম্নরূপ-

**عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ فَطَرِيقَةً فَادْخَلَ يَدَيْهِ تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مَقْدِمَ رَأْسِهِ .**

(হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-কে অজু করতে দেখছি। তখন তাঁর মাথায় কাতারা পাগড়ি ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পাগড়ির নিচে ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসাহ করেছেন।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের পুরোটাই মাসাহ করেছেন। আর এটিই হচ্ছে মাথার চতুর্থাংশ, একেই পূর্বোক্তিতে হাদীসে **نَاصِيَةِ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপরীতে আমাদের দলিল। ইমাম মালিক (র.)-এর বিপরীতে এ হাদীস এ জন্য দলিল যে, যদি পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ হতো তাহলে শরিয়ত প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ **ﷺ** মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করার উপর **كُفِيَ** করতেন না। এমনভাবে এ হাদীস ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপরীতে এ হিসাবে দলিল যে, যদি মাথা এক-চতুর্থাংশের কম মাসাহ করা জায়েজ হতো তবে **بَيَانُ** **جَوَازٍ**-এর জন্য হলেও কমপক্ষে একবার তিনি এর উপর অবশ্যই আমল করতেন। অথচ রাসূলুল্লাহ **ﷺ** থেকে কোনো হাদীস দ্বারাই মাথার এক-চতুর্থাংশের কম মাসাহ করা প্রমাণিত হয় না।

হানাফী আলিমগণের কেউ কেউ **مَقْدَرُ نَاصِيَةِ** তিন আঙ্গুল পরিমাণ বলে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের দলিল হলো, হাত দ্বারাই মাসাহ করা হয়। আর হাতের মধ্যে আঙ্গুল হলো আসল (মূল)। আর এর মধ্যে আঙ্গুল তিনটি হলো **اَكْشَر** অর্থাৎ দুইয়ের তুলনায় অধিক। আর **نَاعِدَهُ** আছে যে, **لَيُكَفَّرَنَّ عَنْكَ الْكُلُّ**। কাজেই তিন আঙ্গুলকে **أَكْشَر** এর স্থলাভিষিক্ত ধরে এর উপর **كُلِّ**-এর হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা হয় তাহলেই (শরিয়তে) মাসাহ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَسَنُّ الطَّهَّارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَذْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَإِنَّ الْيَدَ أَلَّةَ التَّطَهِيرِ فَتُسَنَّ الْيَدَايَةُ يَتَنَظِّفُهَا وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرَّسْغِ لَوْ قُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ قَالَ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالَى فِي إِبْتِدَاءِ الْوُضْءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضْءَ لِمَنْ لَمْ يَسْمِ وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَإِنْ سَمَّاها فِي الْكِتَابِ سَنَةٌ وَسُمِّيَ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ .

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুর সুন্নত হলো- অজুকারী ব্যক্তির ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পানির পায়ে হাত ঢুকানোর পূর্বে উভয় হাত ধোত করা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিন বার না ধোয়া পর্যন্ত পায়ে না ডুবায়। কেননা সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিল। (অর্থাৎ কোন অঙ্গ স্পর্শ করেছিল।) অধিকন্তু হাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের অল (মাধ্যম)। সুতরাং তা পবিত্রকরণের মাধ্যমে অজু আরম্ভ করা সুন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ধোত করার পরিমাণ কত পর্যন্ত। কেননা তাহারা সম্পাদনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অজুর শুরুতে যে বিসমিল্লাহ বলেনি তার অজু হয়নি। এ হাদীসের মর্ম হলো, (অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বললে) অজুর ফজিলত হাসিল হবে না। বিতদ্বতম মতানুসারে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব। যদিও মূল কিতাবে (কুদুরীতে) একে সুন্নত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইস্তিনজার আগে ও পরে বিসমিল্লাহ বলবে। এটিই সঠিক অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سُنَّةٌ -এর বহুবচন। সুন্নত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- পথ-পন্থা। শরিয়তের পরিভাষায় সুন্নত ঐ আমলকে বলা হয় যা নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে পালন করেছেন, তবে মাঝে মাঝে তরকক করেছেন, যাতে তা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়। সুন্নতের উপর আমলকারী ব্যক্তি ছাওয়াবের অধিকারী হবে এবং সুন্নত বর্জনকারী ব্যক্তি ভরৎসনা ও শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। স্তবর্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) فرض (ফরজ) শব্দটিকে একবচনের সাথে এবং سنن (ক্রিয়ামূল) يُطْلَقُ مصدر (ক্রিয়ামূল) مصدر (ক্রিয়ামূল) جمع ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে সুন্নত (سنت) শব্দটি এমন নয়। এ কারণে একে جمع -এর صيغة -এর সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্নত হলো, অজুকারী ব্যক্তি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে উভয় হাত পানির পায়ে ঢুকানোর আগে তা ভালভাবে ধোয়ে নেবে। হাত ধোয়ার তরীকা হলো, পানি যদি কোনো ছোট পায়ে রাখা থাকে তবে বাম হাত দ্বারা পাত্রটি ধরে তা ডান হাতের উপর ঢালবে (এবং তা পরিষ্কার করে ধোবে)। অতঃপর তা ডান হাতে ধরে বাম হাতের উপর পানি ঢালবে এবং হাতটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে। যদি পানির পাত্রটি এমন বড় হয় যে, এক হাত দ্বারা উঠানো সম্ভব নয় তাহলে একটি ছোট মগ বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা পানি উঠিয়ে বাম হাত দ্বারা ডান হাতের উপর পানি ঢালবে। এভাবে ডান হাত ধোয়ার পর ডান হাতে ঐ ছোট পাত্রটি নিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢালবে। এভাবে উভয় হাত পরিষ্কার



لَا صَلَوةَ لِمَن لَّجَارَ الْمَسْجِدَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ অর্থাৎ মসজিদের প্রতিবেশির জন্য মসজিদ ছাড়া সালাত আদায় হয় না।

হাদীসে ১ অক্ষরটি **صَلَوَةٌ** এবং **فَضِيلَةٌ** (নামাজের ফজিলত)-এর **نَفْي** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। **لَا** (যে) **إِنَّمَا** **لِمَن** **لَّاعَهْدَ لَهُ** (যে) **وَصَلَاتُهُ** (নামাজ সহীহ হওয়া)-এর **نَفْي** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপভাবে **لَهُ** (যে) **وَصَلَاتُهُ** (নামাজ সহীহ হওয়া)-এর **نَفْي** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। মোদাককাহা হলো, উপরোক্ত হাদীস দু'টির ন্যায় “হাদীসে তাসমিয়ার” মধ্যেও ঠিক তদ্রূপই হয়েছে। অর্থাৎ এখানে **وَصَلَاتُهُ** -এর **نَفْي** করা উদ্দেশ্য, **وَصَلَاتُهُ** -এর **وَصَلَاتُهُ** -এর **نَفْي** করা উদ্দেশ্য নয়। আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ (র.)-এর হাদীসের মধ্যেও আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ: صَلَوَتُهُ إِذَا قُتِلَ فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ.

এক ব্যক্তি সহীহভাবে সালাত আদায় করতে পারছিল না, নবী করীম ﷺ তাকে বলেছিলেন, যখন তুমি নামাজ আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন ঠিক সেইভাবে অজু করবে যেভাবে অজু করার জন্য আল্লাহ তোমাকে হুকুম করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা’আলা যে অজুর হুকুম করেছেন তাতে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ নেই। কাজেই অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হতে পারে না।

দারাকুতুনীর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَطْهَرُ جَسَدَهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ لَمْ يَطْهَرِ إِلَّا مَوْضِعَ الرُّؤُوسِ.

যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে অজু শুরু করল তার এ অজু তার সমস্ত শরীরকে পাক করে দেবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে অজু শুরু করল না তার শুধুমাত্র অজুর অঙ্গসমূহ পাক হবে। (পূর্ণ শরীর নয়)। এতেও প্রমাণিত হয় যে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা অজু সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম মতে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব। যদিও ইমাম কুদুরী (র.) একে সুন্নত বলে আখ্যা দিয়েছেন। হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, বহু হাদীসে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই মোস্তাহাব হওয়ার কথা যুক্তিযুক্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইস্তিনজার আগে বা পরে উভয় অবস্থাতেই বিসমিল্লাহ পড়া যায় এবং এটিই সহীহ অভিমত। তবে কারো কারো অভিমত হলো, ইস্তিনজার আগে বিসমিল্লাহ পড়বে। আবার কারো অভিমত হলো, ইস্তিনজার পরে বিসমিল্লাহ পড়বে।

যারা বলেন ইস্তিনজার আগে বিসমিল্লাহ পড়বে; তাদের যুক্তি হলো, ইস্তিনজা অজুর সুন্নতসমূহ থেকে একটি সুন্নত। কাজেই ইস্তিনজার আগেই বিসমিল্লাহ পড়তে হবে। যাতে অজুর সমস্ত কর্ম-কাণ্ড, চাই তা ফরজ হোক বা সুন্নত হোক সব কিছুই সূচনাই যেন বিসমিল্লাহর মাধ্যমে হয়ে যায়।

যারা বলেন ইস্তিনজার পর বিসমিল্লাহ বলবে তাদের যুক্তি হলো, ইস্তিনজা পূর্ববর্তী অবস্থা হলো, **كَشَفَ عَوْرَتَهُ** (সতর খোলা থাকা)-এর অবস্থা। আর সতর খোলা অবস্থায় আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন নয়। কাজেই ইস্তিনজার পর বিসমিল্লাহ বলবে। আর **قَوْلُ أَصَحَّ** তথা বিশুদ্ধতম অভিমতটির যুক্তি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ فِيهِ يَذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ أَقْطَعُ

যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নামের সাথে শুরু না করা হয় তবে তা বরকতহীন হয়ে যায়। এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অজুর শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্ছনীয়। আর ইস্তিনজাও যেহেতু অজুর সাথেই সংশ্লিষ্ট তাই ইস্তিনজার আগে বিসমিল্লাহ বলাও মোস্তাহাব।

وَالسَّوَاكُ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَؤَظُّبُ عَلَيْهِ وَرَغَدَ فَقَدِمَ يُعَالِجُ بِالْأَصْبَعِ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَالْمُضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُمَا عَلَى الْمَوَظَبَةِ وَكَيْفِيَّتَهُمَا أَنَّ يُمَضِّضُ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وَضُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعُ الْأَذْنَيْنِ وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَالْمَرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخُلْفَةِ.

অনুবাদ : মিসওয়াক করা। কেননা নবী করীম ﷺ সব সময় তা করতেন। মিসওয়াক না থাকলে আব্দুল দ্বারা মিসওয়াক করবে। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপও করেছেন। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও সুন্নত। কেননা নবী করীম ﷺ এ দু'টি কাজ (অজুতে) নিয়মিতভাবে করতেন। এর নিয়ম হলো, তিনবার কুলি করা এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে কুলি করা। অতঃপর অনুরূপ নিয়মে তিনবার নাকে পানি দেবে। নবী করীম ﷺ -এর অজু অনুরূপভাবেই বর্ণিত রয়েছে। উভয় কান মাসাহ করা। মাথা মাসাহের (অবশিষ্ট) পানি দ্বারা তা সম্পাদন করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ। এর উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের হুকুম বর্ণনা করা; সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মিসওয়াক করা সুন্নত। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মিসওয়াক করার উপর আমল করেছেন। কিন্তু তিনি তা কখনো তরকও করেছেন। অগত্যা যদি কখনো মিসওয়াক না থাকে তবে আব্দুল দ্বারা মিসওয়াক করবে। কেননা এ কাজটিও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে। **مَوَظَبَتٌ مَعَ التَّرَكِّ** (মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সর্বদা কোনো আমল করা) সুন্নত হওয়ার দলিল। আর **يَلْتَزِكُ مَوَظَبَتَيْنِ** (মাঝে মধ্যে তরক করা ছাড়া সর্বদা কোনো আমল করা) ওয়াজিব হওয়ার দলিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মধ্যে যে মিসওয়াক করা তরক করতেন এর দলিল হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন গ্রাম্য সাহাবীকে নামাজের তালিম দিয়েছিলেন। সে তালিমের মধ্যে মিসওয়াকের কথা উল্লেখ নেই। যদি মিসওয়াক করা ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি তাঁকে অবশ্যই মিসওয়াকের তালিম দিতেন। —(ইনায়া) যদি কোনো ব্যক্তির কাছে মিসওয়াক না থাকে তবে আব্দুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী এ ব্যাপারে দলিল। তিনি বলেছেন, **يَجُوزُ مِنَ السَّوَاكِ الْأَصْبَعُ** (মিসওয়াক না থাকা অবস্থায়) আব্দুল মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে। এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাবারানী (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَهْذِبُ قُرْهُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدْخُلُ أَصْبَعُهُ زَيْتِي.

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আব্দাহর রাসূল! যে ব্যক্তির মুখে দাঁত নেই সেও কি মিসওয়াক করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেও করবে। আমি বললাম কিভাবে করবে? জবাবে তিনি বললেন, মুখের মধ্যে হাতের আব্দুল ঢুকিয়ে তা করবে। —(ফতহুল কাদীর শরহে নিকায়্য)

উল্লেখ্য যে, মিসওয়াক **سُنَّتٌ صَلَوَةٌ** (সুন্নতে সালাত) না **سُنَّتٌ وَضُو** (সুন্নতে অজু) এ বিষয়ে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। (১) মিসওয়াক **سُنَّتٌ وَضُو** (অজুর সুন্নত)। কেননা নাসাঈ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

لَوْ لَا أَنَّا شَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেকবার অঙ্জু করার সময় মিসওয়াক করার হুকুম করতাম।

এমনিভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সূত্রে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَرْتَدُّ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَيَسْتَقِظُ إِلَّا تَوَسَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখনই তিনি অঙ্জু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।

(২) ভিন্ন মতে মিসওয়াক করা سُنَّتٌ صَلَوَةٌ (নামাজের সুন্নত)। তাদের দলিল হলো, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَوْ لَا أَنَّا شَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَوةٍ أَوْ مَعَ كُلِّ صَلَوةٍ رَوَاهُ - (السنة)

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে নামাজের সময় অথবা প্রত্যেক নামাজের সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় মতে মিসওয়াক করা سُنَّتٌ دِينَ (দীনের সুন্নত)। এটিই সর্বাধিক বলিষ্ঠ অভিমত। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকেও এ ধরনের মতামত বর্ণিত রয়েছে। এ অভিমতের পক্ষে দলিল হলো, হযরত আবু আয্ব্যু আনসারী (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ :

أَرَبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْخَنَازِ وَالْتَعَطُّ وَالسَّوَاكِ وَالْيَكَّاحُ.

চারটি কাজ নবী-রাসূলগণের সুন্নত। (১) খতনা করানো; (২) অতর ব্যবহার করা; (৩) মিসওয়াক করা; (৪) বিবাহ করা।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হাদীসে আছে, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে মিসওয়াকের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে মিসওয়াকের বহু ফজিলতের কথা বর্ণিত রয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلَوةٌ بِسَّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَوةً بِغَيْرِ سَّوَاكِ.

মিসওয়াক করে এক নামাজ আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া সত্তর নামাজ আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ এতে সত্তরগুণ হুত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত যে, পাঁচ অবস্থায় মিসওয়াক করা মোস্তাহাব। (১) দাঁত লাল হয়ে গেলে; (২) মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে; (৩) ঘুম থেকে উঠার পর; (৪) নামাজে দাঁড়ানোর পূর্বে; (৫) অঙ্জু করার সময়।

ফায়দা : মিসওয়াক নরম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা আঙ্গুলের সমপরিমাণ মোটা এবং এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হবে। সোজা হওয়া ভাল। এমন ডালের হবে যাতে গিরা কম থাকে। তিক্ত গাছের ডাল হলে ভাল যেমন নীম ইত্যাদি। এতে কফ-কাশি দূরীভূত হবে, বক্ষ পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং হজমও ভাল হবে।

মিসওয়াক করার সুন্নত তরীকা হলো, মিসওয়াক লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি উভয়ভাবে করবে। যদি শুধু একদিকে করতেন হয় তাহলে লম্বালম্বিভাবে করবে। কেউ কেউ বলেছেন আড়াআড়ি ভাবে করবে, লম্বা-লম্বিভাবে করবে না। উল্লেখ্য যে, দাঁতের ক্ষেদ্রে যা আড়াআড়ি মুখের ক্ষেদ্রে তা লম্বালম্বি হিসাবে গণ্য। —(শরহে নিকায়)

كُلِّمَ كَرًا وَالْمَضْمَعَةُ وَالْإِسْتِنْشَاءُ الْكُلِّمَ كَرًا এবং নাকে পানি দেওয়া উভয়টিই অজুতে সুন্নত। এ বিষয়ের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা অজুতে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। বাইশ জন সাহাবী থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অঙ্জুর কথা বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের সকলেই কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে কত বার কুলি করতে হবে এবং কত বার নাকে পানি দিতে হবে, এ বিষয়ে একাধিক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ তো এ বিষয়ে একবারেই নিশুপ। আবার কেউ একবার কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। কেউ তিনবারের কথা বর্ণনা করেছেন। যে বাইশ জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অঙ্জুর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন, (১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা.); (২) হযরত ওসমান (রা.); (৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.); (৪) হযরত মুণীরা (রা.); (৫) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব

(রা.); (৬) হযরত নিক্দাম ইবনে মাদীকারাব (রা.); (৭) হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রা.); (৮) হযরত আবু বকর (রা.); (৯) হযরত আবু হুরায়রা (রা.); (১০) হযরত ওয়াইল ইবনে হজ্জার (রা.); (১১) হযরত জুবায়র ইবনে নুফায়র (রা.); (১২) হযরত আবু উমামা (রা.); (১৩) হযরত আনাস (রা.); (১৪) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.); (১৫) হযরত কাব ইবনে আমর আল-ইয়ামানী (রা.); (১৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু অওফা (রা.); (১৭) হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.); (১৮) হযরত আবু কাহিল কায়স ইবনে আইয (রা.); (১৯) হযরত কুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয় (রা.); (২০) হযরত আয়েশা (রা.); (২১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রা.); (২২) হযরত আমর ইবনে ওতাইব আন আবিহি আন জাদিহী।

—(ফতহুল কাদীর-হাশিয়ায়ে শরহে নিকায়)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে مواظبت و مداومت (সর্বদা করা)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ আমল দু'টো নবী করীম ﷺ নিয়মিতভাবে করতে বলেছেন। তিনি যে, “এ দু'টো কাজ মাঝে মধ্যে তরকও করতেন” তা উল্লেখ করেননি। কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একদা নবী করীম ﷺ এক গ্রাম্য সাহাবীকে অজ্বর আক্রমণ দিয়েছেন। কিন্তু এ সময় তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা বলেননি। এমনিভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজ্বর কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। অতএব যেহেতু مواظبت -এর সাথে মাঝে মধ্যে তা তরক করার কথাও হাদীসে প্রমাণিত আছে তাই (অজুতে) কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত বলেই গণ্য হবে, ওয়াজিব এবং ফরজ হিসাবে গণ্য হবে না। যেভাবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা غَسَلَ جَنَابَتَيْ نَبِيِّ ﷺ-এর কারণে এ দু'টো আমলকে غَسَلَ جَنَابَتَيْ مَرْفُوعَا এবং وضوء-এর মধ্যে ফরজ হিসাবে সাব্যস্ত করছেন। সর্বোপরি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে مَوْفُوعَا এবং مَرْفُوعَا উভয়ভাবেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الْغُسْلُ كُفْلٌ كُفْلٌ كُفْلٌ كُفْلٌ كُفْلٌ কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া অজুতে সুন্নত, কিন্তু গোশলে ওয়াজিব। — (ইনায় - কিফায়)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার তরিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে তিনবার কুলি করবে এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি দ্বারা কুলি করবে। অতঃপর এমনিভাবে তিনবার নাকি পানি দেবে এবং প্রত্যেক বারই নতুন পানি ব্যবহার করবে। কেননা অজ্বর বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, একবার পানি নিয়ে এ পানি দ্বারা কুলি করবে এবং নাকে পানি দেবে। কেননা ইমাম আবু দাউদ (র.) সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এ মর্মে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) আমলীভাবে নবী করীম ﷺ -এর অজ্বর বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার হাতে পানি নিয়ে সে পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করার জন্য একবার পানি নেওয়াই যথেষ্ট, سَاءَ حَبِيبٌ -এর কোনো প্রয়োজন নেই। — (শরহে নিকায়)

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, بَيِّنَ جَوَازٌ (“এটিও জায়েজ” এ কথা বর্ণনা করা)-এর জন্য নবী করীম ﷺ কখনো এরূপ করেছেন। তবে উত্তম তো তা-ই যা আমরা অবলম্বন করছি।

ইনায় প্রণেতা (صاحب عنایہ) উক্ত হাদীসের জবাবে বলেছেন, যুখ এবং নাক পৃথক পৃথক দু'টি অঙ্গ, কাজেই এক অঙ্গটি পানি উভয় আমলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয় না, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হওয়া সমীচীন।

ফাওয়ায়িদ শরহে নিকায় প্রণেতা বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া যেমনিভাবে সুন্নত ঠিক তেমনিভাবে কুলিও নাকে পানি দেওয়ার উপর مقدم করা (আধিকার দেওয়া)-ও অনুরূপ সুন্নত। শরহে নিকায় গ্রন্থে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, مضمضة (কুলি করা) و استنشاق (নাকে পানি দেওয়া) উভয়টি ডান হাতে সম্পাদন করবে। কেউ কেউ বলেছেন, استنشاق বাম হাতে করবে। কিন্তু সনহীহ মত হলো, নাকে পানি দেবে ডান হাতে, আর নাক পরিষ্কার করবে বাম হাতে।

وَمَسَحَ الْأَنْفَينِ الخ অজ্বর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, উভয় কান মাসাহ করা। আত্মা হলওয়ানী এবং শায়খুল ইসলাম (র.)-এর অভিমত অনুসারে কান মাসাহ করার তরীকা হলো, নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি কানের ভেতর ঢুকিয়ে তা মৃদু নাড়া দেবে। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই কান মাসাহ করেছেন। ইবনে মাজাহ শরীফে সনহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,



إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسَّحَ أَذُنَيْهِ فَادْخَلَهُمَا السَّبَاتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى ظَاهِرِ أَذُنَيْهِ.

উভয় কান মাসাহ করেছেন এবং (মাসাহের সময়) তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের ভিতর ঢুকিয়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় কানের উপর বুলিয়েছেন। এভাবেই তিনি উভয় কানের উপরি ভাগ এবং ভিতরের অংশ মাসাহ করেছেন। আর এ পদ্ধতিটিই হচ্ছে উত্তম। — (ফাতহুল কাদীর)

আমাদের মাযহাবে মাথা মাসাহের পানি ঘারাই কান মাসাহ করা সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে নতুন পানি দ্বারা কান মাসাহ করা সুন্নত। তাদের (ইমামত্রয়ের) দলিল হলো ঐ হাদীস যা মুসাদদারকে হাকিম গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলো, হিববান ইবনে ওয়াসি (حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَآخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خَلَّافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ.

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে য়ায়েদ (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অজু করতে দেখেছেন এবং অজুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মাসাহ করার জন্য যে পানি নিয়েছিলেন কান মাসাহ করার জন্য ঐ পানি ছাড়া তিনি পুনরায় ভিন্ন পানি নিয়েছিলেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করা সুন্নত।

আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যে হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

“কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ।” এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের হুকুম বর্ণনা করা। অর্থাৎ এ কথা বর্ণনা করা যে, মাথা এবং কান উভয় অঙ্গের অজুয় হুকুম একই। এ হাদীসে সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা শরিয়াতের আহকাম বর্ণনা করার জন্যই নবী করীম ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। সৃষ্টির হাকীকত এবং সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করার জন্য তিনি প্রেরিত হননি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মাথা এবং কানের হুকুম যেহেতু এক, তাই কান মাসাহ করা মাথা মাসাহের স্থলাভিষিক্ত হওয়া চাই। অথচ বিষয়টি এমন নয়।

এরূপ প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে বলা হবে যে, মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি دليل قطعي অর্থাৎ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আর কান মাসাহ করার বিষয়টি خبر واحد (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা প্রমাণিত। তাই কান মাসাহ করা সুন্নত। আর সুন্নতের দ্বারা কখনো ফরজ আদায় হতে পারে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন، الْحَوِطُ مِنَ الْبَيْتِ الْحَوِطُ مِنَ الْبَيْتِ হাতীমে কা'বা কা'বারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি হাতীমের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে তবে তার নামাজ সহীহ হবে না। কেননা কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আর হাতীম কা'বার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথাটি خبر واحد দ্বারা প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, خبر واحد -এর উপর আমল তখনই ওয়াজিব হবে যদি এর কারণে دليل قطعي -এর উপর আমল বাতিল হয়ে হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি خبر واحد -এর উপর আমল করার কারণে دليل قطعي -এর উপর আমল বাতিল হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় خبر واحد -এর উপর আমল করা যাবে না।

আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে ঐ হাদীস যা হাকিম, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তা হলো—

إِنَّهُ قَالَ لَا آخِرَ لَكُمْ يَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَسَحَّ بِهَا رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ.

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অজু সম্পর্কে সংবাদ দেব? (অতঃপর তিনি অজুয় বিবরণ পেশ করলেন) তাতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, এরপর তিনি এক অজলি পানি নিয়ে এর দ্বারা মাথা এবং উভয় কান মাসাহ করলেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَالَ وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ  
وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) لِأَنَّ السُّنَّةَ  
إِكْمَالُ الْفَرِيضِ فِي مَحَلِّهِ وَالِدَاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرِيضِ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْ لَا تَتَخَلَّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرِيضِ فِي مَحَلِّهِ .

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, দাড়ি খিলাল করা। কেননা হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সুন্নত এবং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ মাত্র। কেননা সুন্নত হলো এমন কাজ, যা দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ ফরজের স্থান নয়। আব্দুল খিলাল করা। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের আব্দুলসমূহ খিলাল করো, যাতে জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশ না করে। আর এর যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। কাজেই আব্দুল খিলাল করা সুন্নত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.)-এর মতে দাড়ি খিলাল করাও সুন্নত। দলিল হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-কে দাড়ি খিলাল করার হুকুম দিয়েছেন। ইনশা গ্রন্থকার হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَى جَبْرِئِيلَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُخْلِلَ لِحْيَتِي إِذْ تَوَضَّأْتُ .

নবী করীম ﷺ বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, আমি যখন অজু করি তখন যেন আমি দাড়িও খিলাল করি। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত ওসমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْلِلُ لِحْيَتَهُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুতে স্বীয় দাড়ি খিলাল করতেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অজু করতেন, তখন তিনি দাড়ি খিলাল করতেন। হাদীসটি ইমাম বায্‌যার (র.) বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো ফকীহ বলেন যে, দাড়ি খিলাল করা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সুন্নত। কিন্তু طرفین অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সুন্নত নয় বরং জায়েজ। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, সুন্নত এমন কাজকে বলা হয় যা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করে। আর দাড়ির ভিতরের অংশ ফরজের স্থান নয়, তাই একে বিদ'আতও বলা যাবে না। আর যে কাজ সুন্নত নয় এবং বিদ'আতও নয়, এ কাজকে জায়েজ বলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, হাত ও পায়ের আব্দুলসমূহ খিলাল করা। হাতের আব্দুলসমূহ খিলাল করার উত্তম তরীকা হলো, এক হাতের আব্দুল অপর হাতের আব্দুলের ভিতর ঢুকিয়ে খিলাল করা। 'শরহে নিকায়' গ্রন্থে আছে যে, খিলাল করার উত্তম নিয়ম হলো, ডান হাতের হাতুলীর ভিতরের অংশ বাম হাতের হাতুলীর ওপরের অংশের উপর রেখে আব্দুল আব্দুলের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। এ নিয়মে ডান হাতের আব্দুলসমূহও খিলাল করবে। পায়ের

আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার তরীকা হলো, বাম হাত ডান পায়ের নিচে রেখে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পায়ের আঙ্গুলসমূহের ভিতরে ঢুকিয়ে পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে। উল্লেখ্য যে, ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে খিলাল শুরু করে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত গিয়ে তা শেষ করবে। —(শরহে নিকায়)

আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত হওয়ার এক দলিল তো হিদায়া প্রণেতা শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে আরো বহু দলিল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তুমি অজু করবে তখন তুমি তোমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

তাবারানী অচ্ছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَخَلِّلْ أَصَابِعَهُ بِأَمْلَاءٍ خَلَّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

যদি কেউ পানি দ্বারা তার আঙ্গুলসমূহ খিলাল না করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার আঙ্গুলসমূহের মাঝে জাহান্নামের আগুন ঢুকিয়ে দেবেন।

ফতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রণেতা আব্বাস ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যত হাদীস আছে এ সবার মধ্যে হযরত লাকীত ইবনে সাব্বিরা (রা.)-এর হাদীসটি সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। হাদীসটি সুনানে আরবা'তে উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবী বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْسِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি অজু করবে তখন পরিপূর্ণভাবে অজু করবে এবং আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে সব গুলোতেই *صِغِه امر* (আদেশসূচক ক্রিয়া) ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, *امر* - *وجوب* -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসাবে তো আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত না হয়ে ওয়াজিব হওয়া চাই। জবাব : যদি আঙ্গুলসমূহের মাঝে পানি না পৌছে তবে আঙ্গুল খিলাল করে এর মাঝে পানি পৌছানো ওয়াজিব। আর যদি স্বাভাবিক নিয়মে পানি পৌছে যায় তাহলে খিলাল করা সুন্নত। আব্বাস আবদুল হাই লক্কৌবী (র.) বলেন, আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে যেহেতু আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আঙ্গুল খিলাল করা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; কিন্তু যেহেতু অজুতে ওয়াজিব কোনো আমলই নেই তাই আঙ্গুল খিলাল করা ওয়াজিব নয়। আর অজুতে ওয়াজিব আমল না থাকার কারণ হলো, অজু নামাজের জন্য শর্ত। এই হিসাবে অজু নামাজের *تابع* বা অধীন। এ অবস্থায় নামাজের ন্যায় অজুতেও যদি ওয়াজিব আমল আছে বলে মনে নেওয়া হয় তাহলে *اصل* ও *تابع* এক পর্যায়ে হয়ে যাওয়া *لازم* হয়ে পড়ে। অথচ এটি যুক্তিযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি যৌক্তিক দলিল হচ্ছে এই যে, হাত এবং পা দৌত করা ফরজ। আর খিলাল করার দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। আর অজুতে যে জিনিসের দ্বারা ফরজকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয় তা সুন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নত।

وَتَكَرَّرَ الْغُسْلُ إِلَى الثَّلَاثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ هَذَا وَضُوٌّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وَضُوٌّ مِنْ بَضَائِعِ اللَّهِ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وَضُوْنِي وَ وَضُوُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا وَنَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ وَالْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤْيَيْهِ سُنَّةٌ. قَالَ وَرَسَتْحِبُّ لِمَتَوَضَّأَ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَّارَةَ فَالْيَنِيَّةُ فِي الْوَضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) فَرَضَ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ الْيَنِيَّةِ كَالْتِمِيمِ وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَبْقَى قَرْنُهُ إِلَّا بِالْيَنِيَّةِ وَلَكِنَّهُ يَبْقَى مَفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ لَوْ قَوَّعَهُ طَهَّارَةٌ بِاسْتِغْمَالِ الْمُطَهَّرِ بِخِلَافِ التَّمِيمِ لِأَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهَّرٍ إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ أَوْ هُوَ يَنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَهُوَ السَّنَّةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) السَّنَّةُ هُوَ التَّثْلِيثُ بِمِثَالِهِ مُخْتَلِفَةٌ.

অনুবাদ : তিনবার পর্যন্ত (أَعْضَاءُ مَغْسُولَةٍ) পুনঃ ধৌত করা। কেননা নবী করীম ﷺ এক এক অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন অজু যা না করলে আল্লাহ তা'আলা নামাজই কবুল করবেন না। আবার দু'বার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা ঐ ব্যক্তির অজু যাকে আল্লাহ দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন। আবার তিনি তিনবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। যে এর বেশি বা কম করল, সে সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায় করল। এই কঠোর হুশিয়ারী তিনবার করে ধোয়াকে সুনুত বলে বিশ্বাস না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, অজুকারীর জন্য মোস্তাহাব হলো, পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। আমাদের মতে অজুতে নিয়ত করা সুনুত। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে নিয়ত করা ফরজ। কেননা অজু একটি ইবাদত। সুতরাং তায়াম্মুমের ন্যায় অজুও নিয়ত ছাড়া সহীহ হবে না। আমাদের দলিল হলো, নিয়ত ছাড়া অজু ইবাদতরূপে গণ্য হবে না ঠিক, কিন্তু مَفْتَاحُ الصَّلَاةِ (সালাতে প্রবেশের মাধ্যম) রূপে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা পবিত্রতার উপকরণ (পানি) যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এতে পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু তায়াম্মুমের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা নামাজ আদায়ের নিয়ত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি পবিত্রকারী বস্তুরূপে গণ্য হয় না। অথবা تِمِيم শব্দটিই ইচ্ছা ও নিয়তের অর্থবহ। (তাই তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ।) সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা। এটি সুনুত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুনুত হচ্ছে প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসাহ করা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ-এর কথা উল্লেখ করে এর (أَعْضَاءُ مَغْسُولَةٍ) কে তিন তিনবার করে ধৌত করাও অজুর সুনুত। تَكَرَّرَ সুনুত নয়। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে একবার করে ধোয়া ফরজ। দু'বার করে ধোয়া সুনুত। আর তিনবার করে ধোয়া হচ্ছে اكْمَال অর্থাৎ পূর্ণতা দান করা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দু'বার এবং

তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। আবার কেউ এ কথাও বলেছেন যে, দ্বিতীয়বার ধোয়া সুন্নত এবং তৃতীয়বার ধোয়া নফল। কোনো কোনো ফকীহের মতে দ্বিতীয়বার ধোয়া নফল এবং তৃতীয়বার ধোয়া সুন্নত। আবু বকর ইসকাফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনবার দৌত করার সমষ্টির দ্বারা ই ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নামাজে কিয়াম বা রুকু দীর্ঘ করে তবে এই পুরটাই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে।

**أَعْظَا مَغْسُوَّةً** - কে তিনবার করে দৌত করা সুন্নত হওয়া সম্পর্কে এক হাদীস তো হিদায়া গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করেছেন। সে হাদীসে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু অঙ্গসমূহ একবার করে দৌত করার পর বলেছেন, এটি এমন অজু যা না হলে নামাজই কবুল হয় না। দু'বার করে দৌত করে বলেছেন, এটি ঐ ব্যক্তির অজু যার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আবার তিনবার করে দৌত করে বলেছেন, এটি আশার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। যে এর বেশি বা কম করল সে সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায় করল। হাদীসে বর্ণিত **تَعَدَّى** (সীমালঙ্ঘন করল) শব্দের সম্পর্ক হলো **زَا** (বেশি করল)-এর সাথে এবং **ظَلَمَ** (অন্যায় করল) শব্দের সম্পর্ক হলো **نَقَصَ** (কম করল)-এর সাথে। **ظَلَمَ** শব্দটি কম করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে **وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ فِتْنًا** এখানে **ظَلِمَ** শব্দটি **نَقَصَ** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ কঠোর হুঁশিয়ারী তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কারো এই বিশ্বাস হয় যে, কামিল সুন্নত তিনবার দৌত করার দ্বারা আদায় হয় না। অর্থাৎ এই বিশ্বাসের সাথে কেউ যদি কমবেশি করে তবে সে **تَعَدَّى ظَلَمَ** (সীমালঙ্ঘন করল এবং অন্যায়) করল। কিন্তু যদি সন্দেহের অবস্থায় মনের প্রশান্তি হাসিলের জন্য তিনবারের অধিক দৌত করে অথবা যদি প্রয়োজনের কারণে তিনবারের কম দৌত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই কঠোর হুঁশিয়ারী প্রযোজ্য হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং কখনো তিনবার, কখনো দু'বার, আবার কখনো একবার দৌত করেছেন।

**تَكَرَّرَ الْغَسْلُ إِلَى الثَّلَاثِ** - এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَيُغَسِّلُ كَفَّيَّ ثَلَاثًا فَيَذْكُرُ صَفَةَ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الرَّأْسَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ آسَأَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَآسَأَ .

হযরত আমার ইবনে শুআয়ব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অজু কিভাবে করতে হবে? এ প্রশ্নের পর তিনি একটি পাত্রে করে পানি আনার জন্য বললেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাত কজি পর্যন্ত তিনবার দৌত করলেন। এরপর তিনি **أَعْظَا مَغْسُوَّةً** তিন তিনবার করে দৌত করার কথা বর্ণনা করলেন। অবশ্য মাথা মাসাহর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। সর্বশেষ তিনি বললেন, এ নিয়মেই অজু করতে হবে। কেউ যদি এর থেকে বেশি বা কম করে তবে সে অন্যায় করল এবং জুলুম করল অথবা তিনি বলেছেন, সে জুলুম করল এবং অন্যায় করল। ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসে আছে, **فَقَدْ تَعَدَّى ظَلَمَ** আর নাসাঈ শরীফের হাদীসে আছে, **فَقَدْ آسَأَ وَتَعَدَّى ظَلَمَ** অর্থাৎ হাদীসের শেষাংশের বাক্যের মধ্যে শব্দের কিছুটা অগ্র-পচাত্ত রয়েছে।

**حَدَّثَ** (বর্ণনা) দূর করার **نِيَّاتٌ** (নিয়ত) হলো, মনে মনে অজু করার সংকল্প করা অথবা নাপাকী (حَدَثٌ) দূর করার ইচ্ছা করা কিংবা এমন কোনো ইবাদতের ইরাদা করা যা তাহারায ব্যতিরেকে সহীহ হয় না। অজুতে নিয়ত করা জরুরি কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগণের মতে অজুতে নিয়ত করা সুন্নত। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে নিয়ত করা ফরজ। ইমামগ্রন্থের দলিল, নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনা **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** (আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। আর অজুও যেহেতু একটি আমল, তাই এটিও নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। তাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, অজু একটি ইবাদত। আর ইবাদত নিয়ত ছাড়া সহীহ হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আদ্বাহর আনুগত্যে বিতর্কবিস্তৃ হয়ে ইখলাসের সাথে তার ইবাদত করতে। (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮-৫) আর ইখলাস নিয়ত ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই (ইমামদ্বয়ের) বক্তব্য হলো, কোনো ইবাদতই নিয়ত ব্যতীত সম্ভব নয়। যেমনিভাবে তায়াম্মুমের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়ত ফরজ।

আমাদের দলিল হলো, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে অজ্ঞ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি তাকে অজ্ঞর তালীম দিয়েছেন; কিন্তু নিয়তের কথা বলেননি।—(শরহে নিকায়্য) এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিয়ত করা অজ্ঞতে ফরজ নয়। যদি ফরজ হতো তাহলে নবী করীম ﷺ অবশ্যই তাকে নিয়তের তালীম দিতেন। আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, নামাজের জন্য অজ্ঞ হলো শর্ত। নামাজের অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি নয়। কাজেই এ ক্ষেত্রেও নিয়ত জরুরি হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার যে দলিলটি পেশ করেছেন তা মূলত ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব। সে দলিলের সারমর্ম হলো, নিঃসন্দেহে অজ্ঞ একটি ইবাদত এবং তা নিয়ত ছাড়া সহীহ হতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞ নিয়ত ছাড়া مُفْتَحُ الْمَلَكُوتِ (নামাজ শুরু করার চাবি) হতে পারে। কেননা নামাজের চাবি হলো তাহারাত বা পবিত্রতা। আর এই তাহারাত নিয়ত করা, না করার সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই তা (তাহারাত) উভয় অবস্থায়ই مُحَقَّقٌ হতে পারে। কেননা পানি-مُطَهَّرٌ (পবিত্রকারী) বস্তু। আদ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا (আমি আকাশ হতে বিতর্ক পানি বর্ষণ করি।—(সূরা ফুরকান, ২৫-৪৮)

সুতরাং পাককারী জিনিস অর্থাৎ পানি ব্যবহারের পর পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। চাই তাহারাতের নিয়ত করুক বা না করুক। يَغْلِبُ التَّيَمُّمُ (তায়াম্মুমের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম) বলে (رحم) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কiyাসের জবাব দিয়েছেন। সে জবাবের সারমর্ম হলো, অজ্ঞকে তায়াম্মুমের উপর কiyাস করা ঠিক নয়; বরং এ কiyাস হচ্ছে مَعَ الْفَارِقِ কেননা অজ্ঞ করা হয় পানি দ্বারা, আর পানি بِدَائِمٍ পাক-পবিত্রকারী জিনিস। পক্ষান্তরে তায়াম্মুম করা হয় মাটি দ্বারা। আর মাটি بِفَانِهِ পাককারী জিনিস নয়; বরং নামাজের ইরাদা করা অবস্থায় তা পাককারী হিসাবে গণ্য হয়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মাটি পাককারী বস্তু রূপে গণ্য হয় اَمْرَ تَعْبِيدٍ হিসেবে। আর اَمْرَ تَعْبِيدٍ-এর মধ্যে নিয়ত অপরিহার্য। কাজেই তায়াম্মুমের উপর অজ্ঞকে কiyাস করা ঠিক নয়।

(শাফি'ঈ মতাবলম্বী আলিমগণের উদ্দেশ্যে) আমাদের দ্বিতীয় জবাব হলো, তায়াম্মুমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে قَضَدٌ و اِرَادَةٌ (ইচ্ছা ও সংকল্প) আর اَمْرٌ شَرْعِيٌّ-এর মধ্যে আভিধানিক অর্থ ধর্তব্য হয়ে থাকে। এ কারণেই তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়তের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর اَعْمَالٌ بِاَلْبَيِّنَاتِ হাদীসের জবাব হলো, হাদীসে বর্ণিত اَعْمَالٌ শব্দ দ্বারা عِبَادَاتٌ উদ্দেশ্য। কেননা শরিয়তে যে সব কাজ মুবাহ এর অনেক গুলোই নিয়ত ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন বিবাহ, তালাক ইত্যাদি। বরং اَعْمَالٌ দ্বারা عِبَادَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর অজ্ঞ مُسْتَقِلَّةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি হচ্ছে নামাজের জন্য وَاسِيَةٌ মাত্র। কাজেই অজ্ঞ নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে না।

শরহে নিকায়্য গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে اَعْمَالٌ শব্দের আগে نَوَاقٍ শব্দটি উহা আছে। এ হিসাবে হাদীসের মর্ম হচ্ছে আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু نَفْسَ عَمَلٍ নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়।

إِعْتِبَارًا بِالْمَفْسُولِ وَلَنَا أَنْ أَنْسَأَ (رض) تَوْضًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ هَذَا وَضُوهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي يَرَوِي مِنَ التَّثْلِيثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَا رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَلَأنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا فَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ بِخِلَافِ الْغَسْلِ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّكْرَارُ.

অনুবাদ : মাসাহকে তিনি ধোয়ার অঙ্গসমূহের (أَعْضَاءُ مَسْئُولَةٍ) উপর কিয়াস করেন। আমাের দলিল এই যে, হযরত আনাস (রা.) (মুখ, হাত, পা) তিনবার করে ধোয়ে অজু করলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন একবার। তারপর তিনি বলেছেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু। আর তিনবার মাসাহ করার যে হাদীস আছে, তা মূলত একইবার হাত ভিজিয়ে তিনবার মাসাহ করার ওপর مَحْمُولٌ এবং ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুযায়ী এ-ও শরিয়ত সম্মত। তা ছাড়া ফরজ হলো মাসাহ করা। অতঃপর বারংবার মাসাহ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই তিনবার মাসাহ করা সুন্নত হতে পারে না। অতএব মাথা মাসাহ করা মূলত মোজার উপর মাসাহ করার সাদৃশ্য। পক্ষান্তরে অঙ্গ ধৌত করার বিষয়টি এর থেকে বাতিক্রম। কেননা تَكَرَّرَ (পুনঃ পুনঃ ধোয়া) غَسَلَ (ধোয়া)-এর জন্য ক্ষতিকারক নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, পূর্ণ মাথা মাসাহ করাও অজুর সুন্নতসমূহের মধ্যে অন্যতম। পূর্ণ মাথা মাসাহ করার নিয়ম হলো, প্রথমে উভয় হাতের হাতুলী আঙ্গুলসহ ভিজাবে। তারপর শাহাদাত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে আলাদা রেখে উভয় হাতের তিন তিন আঙ্গুল মাথার অগ্রভাগের উপর রাখবে। অতঃপর আঙ্গুলসমূহ টেনে মাথার পেছনের দিকে আনবে। এরপর মাথার প্রান্তি দিয়ে টেনে উভয় হাতের হাতুলী সামনের দিকে আনবে। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের উপরিভাগ এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরের ভাগ মাসাহ করবে।—(ফতহুল কাদীর) নিহায়া গ্রন্থে অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণিত আছে যে, এসব কাজ সম্পন্ন করে উভয় হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা গর্দান মাসাহ করবে।

মোদাক্কা হলো, আমাদের মাথাবে পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তিনবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) মাথা মাসাহ করার বিষয়টিকে غُسْرٌ مَسْئُولٍ-এর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে মুখ, হাত ও পা তিনবার ধৌত করা সুন্নত; ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ মাথাও তিনবার মাসাহ করা সুন্নত।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত আনাস (রা.) মুখ, হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করে অজু করেছেন এবং মাথা মাসাহ করেছেন একবার। অবশেষে তিনি বলেছেন, এটিই হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজু। উল্লেখ্য যে, হযরত আলী এবং ওসমান (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসে مَسَحَ بِرَأْسِهِ তিনবার করে ধৌত করা এবং মাথা তিনবার করে মাসাহ করার কথা বর্ণিত আছে। এর জবাবে أَخْبَأَ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাত ভিজিয়ে এর দ্বারাই তিনবার মাথা মাসাহ করেছেন। তিনবার নতুন পানি নিয়ে এর দ্বারা তিনবার মাথা মাসাহ করেননি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ করাও শরিয়ত সম্মত। আমাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, ফরজ হলো মাথা মাসাহ করা। আর বারংবার মাসাহ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। আর এটি غُسْلٌ কুরআন, হাদীস এবং ইজমার পরিপন্থী কাজ। কাজেই تَكَرَّرَ مَسَحَ (পুনঃ পুনঃ মাসাহ করা) সুন্নত হতে পারে না। আসলে মূলত মাথা মাসাহ করার বিষয়টি মোজার উপর মাসাহ করার সদৃশ। অর্থাৎ মোজার উপর মাসাহ করার ক্ষেত্রে যে ভাবে تَغْلِيظٌ (তিনবার ধোয়া) সুন্নত নয়। এমনিভাবে মাথা মাসাহের ক্ষেত্রেও تَغْلِيظٌ সুন্নত নয়। পক্ষান্তরে ধোয়া (غَسَلَ)-এর বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। কেননা তা تَكَرَّرَ-এর কারণে কাসিদ হয় না। অর্থাৎ تَكَرَّرَ সত্ত্বেও غَسَلَ ই থাকে। তাই ধোয়ার ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়া সুন্নত।





আমাদের দলিল হলো, **مَفْرُوضَةٌ** এর বর্ণনা করতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতে **وَ** অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আর অভিধান বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, **وَ** অব্যয়টি শুধুমাত্র **جمع** অর্থাৎ একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আমরা যদি এ কথা মেনেও নেই যে, আলোচ্য আয়াতে, **وَ** অব্যয়টি **تعقيب** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপিও আমরা বলব যে, যেহেতু আয়াতে **وَ** এবং **وَ** উভয় অক্ষরই বিদ্যমান আছে তাই আয়াতের মর্ম হবে, **اربعة** **اعضاء** তথা **اربعة** **اعضاء**। অত্র চতুষ্টয়ের দ্বিতীয়টির বিষয়টি **فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ** -এর পরে সম্পন্ন (مرتب) হবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, **فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ** এবং **غَسَلَ أَعْضَاءَ رِجْلَيْهِ** এর মধ্যে তরতীব রক্ষা করা জরুরি; কিন্তু এর দ্বারা অত্র চতুষ্টয়ের মাঝে তারতীব জরুরি এ কথা সাব্যস্ত হয় না। অথচ আমাদের বক্তব্য হলো, অত্র চতুষ্টয়ের তারতীব সম্পর্কে **اربعة** **اعضاء** -এর মাঝে তারতীব সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, আলোচ্য আয়াতে **اربعة** **اعضاء** এর বর্ণনার ক্ষেত্রে **وَ** অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। আর তারতীবের ফায়দা দেয় না। এ কারণেই আমরা বলি যে, অজুতে **مَفْرُوضَةٌ** -এর মাঝে তারতীব জরুরি নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ **ﷺ** যেহেতু কুয়আন মাজীদে বর্ণিত ধারা অনুসারে অজু সম্পাদন করেছে তাই আমরা বলি যে, অজুতে তারতীব রক্ষা করা সুন্নত ফরজ নয়।

এখানে একটি **اشكال** (প্রশ্ন) হয় যে, হিদায়া গ্রন্থকার এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, **وَ** অব্যয়টি **جمع** -এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এ ব্যাপারে তিনি **اجماع** সংঘটিত হওয়ায় দাবি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তার এ দাবি ঠিক নয়। কেননা আলিমদের কেউ কেউ বলেছেন যে, **وَ** অক্ষরটি তারতীবের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উক্ত **اشكال** -এর জবাবে **شارحين** ক্রাম বলেন, শায়খ আবু আলী ফারমি (র.) বলেছেন, ইল্মে নাহ বিশেষজ্ঞদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, **وَ** অক্ষরটি **مطلق** **جمع** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমামুন নাহ আল্লামা সীবাওয়াহ (র.) স্বীয় কিতাবের সতের জায়গায় এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, **وَ** **مطلق** **جمع** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হিদায়া গ্রন্থকার এ সব বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই **اجماع** -এর দাবি করেছেন। উল্লেখ্য যে, কতিপয় ব্যক্তির মতভেদ **اجماع** সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে **مانع** (প্রতিবন্ধক) নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা ছিল **ابتداءً باليمين** অর্থাৎ ডান দিক থেকে অজু শুরু করা। স্বত্বব্য যে, হাত পা ধোয়ার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম বা মোস্তাহাব। শরহে নিকায়্যা গ্রন্থের **مصنف** বলেছেন যে, বিতর্কতম মতে ডান দিক থেকে অজু শুরু করা সুন্নত। যেমন তুফহা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ **ﷺ** সর্বদা ডান দিক থেকে অজু করতেন। সর্বোপরি তিনি বলেছে, **إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاَبْدَأْ بِالْيَمِينِ** যখন তোমরা অজু করবে তখন ডান দিক থেকে তা শুরু করবে। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে খুযায়মা এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (র.) উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ **ﷺ** আরো বলেছেন **اللَّهُ يَبِغُ السَّيْمَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى السَّنَكِلِ وَالرَّجُلِ** সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা বা পসন্দ করতেন। এমনকি জুতা পরিধান করা এবং চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও। অপর এক হাদীসে আছে, **اللَّهُ يَبِغُ السَّيْمَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي طُهُورِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَتَرْكِبِهِ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ **ﷺ** সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি অজু করা, জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ তার সকল কাজের ক্ষেত্রেই তিনি ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

فَصَلِّ فِي نَوَاقِصِ الرُّضُوءِ : الْمَعَانِي النَّاقِصَةُ لِلرُّضُوءِ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ يَقُولُهُ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا الْحَدَّثُ قَالَ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَعْتَابُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ وَالْدَّمَ وَالْفَيْعُ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطَهِيرِ وَالْفَيْعُ مِلْءُ الْفَيْمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُصُ الرُّضُوءَ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاءَ فَأَمَّ يَتَوَضَّأُ وَلَآنَ غَسَلَ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمَرَ تَعَبُدِي فَيُقْصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرُّضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرَفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ لِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةً تَعَدَّى الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّبِيلَانِ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطَهِيرِ وَيَمْلَأُ الْفَيْمَ فِي الْفَيْعِ لِأَنَّ بَزْوَالَ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً لَأَخَارِجَهُ.

### অনুচ্ছেদ : অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

অনুবাদ : অজু ভঙ্গের কারণগুলো যথাক্রমে : (১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন “অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচ স্থান থেকে আসে” (৪. মায়িদা, ৪৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল حدث (অজু ভঙ্গের কারণ) কী? তিনি বললেন, পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছু বের হয় । আলোচ্য হাদীসের ۱ (যা- কিছু) শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক । সুতরাং প্রকৃতিগত ও অপ্রকৃতিগতভাবে যা কিছু বের হয় সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত । (২) দেহের কোনো অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি তা পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে । (৩) মুখ ভর্তি বমি হওয়া । ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া (দেহের অন্য কোনো স্থান থেকে) কিছু বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না । কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করে অজু করেননি । তাছাড়া যে স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি, তা ধোত করা যুক্তি-উর্ধ্ব করণীয় (امر تعبدي) বিধান । সুতরাং শরিয়তের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে । আর তা হলো প্রকৃতিগত পথ । আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল প্রবাহিত রক্তের জন্যই অজু আবশ্যক । তিনি আরো বলেছেন, নামাজ অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাক থেকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে এবং পরবর্তী নামাজের ওপর “বেনা” করে যতক্ষণ না কথা বলবে । (আমাদের) আকলী দলিল হলো, নাজাসাত নির্গত হওয়া তাহারাৎ ও পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ, মূল আয়াতের সাথে এতটুকু তো যুক্তিসঙ্গত । অবশ্য নির্দিষ্ট চার অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ যুক্তির উর্ধ্বে । কিন্তু প্রথম বিষয়টি স্থানান্তরিত হওয়ায় দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হবে । তবে নির্গত হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তা তাহারাভের হুকুমভুক্ত কোনো অংশে গড়িয়ে পৌছবে । আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে । কেননা “আবরণতুক” ওঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র নির্গত হয় না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

[illegible]

**দ্বিতীয় নকলী দলিল :** **مَنْ نَأَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَصْرَفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا تَبَكَّرَ** — (ইবনে মাজাহ) রাশুন্নাহা বলেছেন, নামাজ অবহায়া কারো বমি হলে কিংবা নাক থেকে রক্ত বরলে সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে এবং পূর্ববর্তী নামাজের উপর বনো করে হাফজ না কথা বলবে। — (ইবনে মাজাহ) এ হাদীস এভাবে আমাদের দলিল থেকে, এ হাদীসের মধ্যে অজু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর امر (নির্দেশ) উজ্জ্বলের জন্য আসে। বুঝা গেলে বমি করা বা নাক থেকে রক্ত বারার পর অজু করা ওয়াজিব।

আমাদের আকলী দলিল, যা মূলত ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর আকলী দলিলের জবাব; সাবীলাইন থেকে নাজাসাত বের হওয়া পরিভ্রাতা ভঙ্গের কারণ। এতদ্রুপ পরিমাণ اصل مقيس عليه -এর মধ্যে কিয়াস সম্ভব। তবে নিম্নোক্ত চার অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া কিয়াস। সুতরাং خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّيِّبَاتِ কে السَّيِّئَاتِ -এর خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّيِّبَاتِ -এর উপর কিয়াস করা হয়েছে এবং তাহারাও ভঙ্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাহারাও ভঙ্গের জন্য যেহেতু তাহারাও জরুরি ভাই الثَّيِّبَاتِ -এর خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّيِّبَاتِ -এর কারণে তাহারাও দূরীভূত হওয়া চাই অঙ্গ ধোয়ার হুজুম নিজে নিজেই সাবিত হয়ে গেছে। কেননা ঐখান বিষয়টি স্থানান্তরিত হওয়ায় দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হয় যখন سبيلين থেকে নাজাসাত বের হওয়া سبيلين থেকে নাজাসাত বের হওয়ার মতোই। এ হিসেবে سبيلين থেকে নাজাসাত বের হলে যেমনিভাবে অজু ভেঙ্গে যায়, এমনিভাবে سبيلين غير থেকে বের হলেও তো অজু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। অথচ আপনারা এখানে বের হওয়ার সাথে সাথে سيلان-এরও শর্ত আরোপ করেছেন?

হিদায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন اصل و فرع উভয় স্থানেই বুরূজ তথা নির্গত হওয়ার বিষয়টিই ধর্তব্য বিষয়। তবে রক্ত ও পুঁজ তখনই নির্গত বলে সাব্যস্ত হবে যখন তা এমন স্থানে গড়িয়ে যায়, যা অজু ও গোসালের মধ্যে ধোয়া আবশ্যিক। আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। দলিল এই যে, আবরণতুক উঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র; বের হয় না।

পক্ষান্তরে পেশা-পায়খানার পথ দুটি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলেই অজু ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হবে। কেননা তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার স্থান অতিক্রম ও নির্গত হয়। প্রমাণিত হবে। আর বমির ক্ষেত্রে নির্গত হয়েছে তখনই ধরা হবে যখন তা মুখ তখন হবে। মুখ ভরা বমির অর্থ হলো যা অনায়াসে আটকানো যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, মুখ ভরা ভাবনাই হবে যখন কথা বলতে কষ্ট হয়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন অর্ধ মুখ থেকে বেশি হয়।—(নিহায়া) দলিল হলো, বাতনের ভিতরের দুটো দিক রয়েছে, এক, যাহিরই বাতিন। কেননা মুখ খুললে তা যাহিরের অনুরূপ, আর মুখ বন্ধ করলে তা বাতিন-এর অনুরূপ। আমরা উভয়টির উপর লক্ষ্য রেখে বলছি যদি মুখ ভরে না হয় তবে বাতিন-এর অনুরূপ ধরে বলা হয়েছে যে, বুকজ পাওয়া যায়নি, তাই এ সূরতে অজু ভঙ্গ হবে না। আর যদি মুখ ভরে হয় তবে যাহির-এর অনুরূপ ধরে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে বুকজ পাওয়া গেছে তাই এ সূরতে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর মাযহাব উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে خَارِجٌ مِّنْ غَيْرِ السَّبِيلِ -এর কারণে মুত্লাকান অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের। তাঁর মতে প্রবাহিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা তিনি পেশাব পাখ্যানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়া স্থানের উপর কিয়াস করেন। বমি অল্প বিস্তর অজু ভঙ্গের কারণ। দলিল এই যে, রাবুল্লাহ عليه السلام বলেছেন، حدث، الفليس، الفليس - বমি অর্থাৎ রাসুল্লাহ عليه السلام মুত্লাকান বমিকে অজু ভঙ্গের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[illegible]

সাতটি জিনিস দ্বারা অজু (সোহরান জরুরি)। পেশাবের ফোঁটা দ্বারা, প্রবাহিত রক্ত দ্বারা, পুঁজ দ্বারা, ভরা মুখে বমি দ্বারা, চিৎ হয়ে ঘুমানো দ্বারা, পুরুষের (সাবালেগ) নামাজে অষ্টহাসি দ্বারা এবং রক্ত বের হওয়া দ্বারা। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মুখ ভরা বমি অজু ভঙ্গের কারণ। এ কথাগুলো হিদায়া গ্রন্থকার এভাবে বলেছেন; যখন আলী (রা.) অজু ভঙ্গের সবকটি কারণ গণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, **أَوْسَعُ مَلَأَ الْفَمُ** কিংবা মুখ ভরা বমি। এখানে যখন হাদীসগুলো পরা'র বিরোধী, তখন সমন্বয়ের জন্য ইমাম শাফি'র (র.) বর্ণিত হাদীসকে অল্প বমির উপর, আর ইমাম যুফার (রা.) বর্ণিত হাদীসকে বেশি বমির উপর ভরসা দেবে। পক্ষান্তরে পেশাব পায়খানার রাস্তা **سَبِيلِ** এবং অন্যান্য স্থান থেকে নির্গত হওয়া নাজাসাতের পার্শ্বক্য আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

يَخْلَافُ السَّبِيلَيْنِ لِأَنَّ ذَاكَ الْمَوْضِعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ التَّجَاسَةِ فَيَسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ وَمِلءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكْلُفٍ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتَبِرْ خَارِجًا وَقَالَ زُفَرُ (رح) قَلِيلُ الْقَيْ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ وَكَذَا لَا يَشْتَرِكُ السَّيْلَانُ إِعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ وَلَا طَلَقَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُلُسُ حَدَّثَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضْوَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا وَقَوْلُ عَلِيٍّ (رض) حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً أَوْ دَسْعَةً تَمْلًا الْفَمِ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يَحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (رح) عَلَى الْقَلِيلِ وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ (رح) عَلَى الْكَثِيرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلُكَيْنِ مَا قَدَّمَاهُ وَلَوْ قَاءَ مُتَّفَقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ بَمَلَأُ الْفَمِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يُعْتَبَرُ إِتْحَادُ الْمَجْلِسِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يُعْتَبَرُ إِتْحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغُثْيَانُ ثُمَّ مَا لَا يَكُونُ حَدْثًا لَا يَكُونُ نَجِسًا يُرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُكْمًا حَيْثُ كَمْ يَنْتَقِضُ بِهِ الطَّهَارَةُ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مَرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْعَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) نَاقِضٌ إِذَا قَاءَ مِلءُ الْفَمِ وَالْخِلَافُ فِي الْمُرْتَفَى مِنَ الْجَوْفِ أَمَّا النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ التَّجَاسَةِ لِأَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ نَجِسٌ بِالْمَجَاوِرَةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ التَّجَاسَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْ غَيْرُ نَاقِضٍ -

অনুবাদ : পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলে অজু ভঙ্গ হয়েছে বলে ধরা হবে।) কেননা তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার “স্থানচ্যুতি” ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে। মুখ ভরা বমির অর্থ হলো, অনায়াসে যা আটকানো সম্ভব নয়। কেননা দৃশ্যত তা নির্গত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্গত হয়েছে বলেই গণ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের তদ্রূপ, রক্তের ক্ষেত্রেও তিনি প্রবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না, পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়ার স্থানের উপর কিয়াস করে। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বমি অজু ভঙ্গের কারণ বাণী হচ্ছে শর্তমুক্ত। আমাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস প্রবাহিত না হলে এক দু' ফোঁটা রক্ত বের হলে অজু আবশ্যক নয়। (কুতনী) এবং হযরত আলী (রা.) অজু ভঙ্গের সবক'টি কারণ গণনা প্রসঙ্গে বলেছেন কিংবা মুখ ভরা বমি। এখানে যখন হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী তখন সমন্বয়ের জন্য ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে অল্প বমির উপর এবং ইমাম যুফার (র.) বর্ণিত হাদীসকে বেশি বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব পায়খানার রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকে নাজাসাত নির্গত হওয়ার পার্থক্য ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি। কেউ যদি বিভিন্ন দফায় এত পরিমাণ বমি করে যে,

একত্র করা হলে তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থানের অভিন্নতা বিবেচ্য হবে। (অর্থাৎ একই কারণে বা বিভিন্ন কারণে একই মজলিসে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।) আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বমনোদ্বেগকারী হেতু অর্থাৎ উদ্গারের অভিন্নতা বিবেচ্য। (অর্থাৎ একই মজলিসে বা বিভিন্ন মজলিসে একই কারণে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে নির্গত পদার্থ অজু ভঙ্গের কারণ নয়, তা নাপাকও নয় এবং এটাই বিতুদ্ধ অভিমত। যেহেতু এর দ্বারা তাহারা ত ভঙ্গ হয় না, তাই শরিয়তের বিধানে তা নাপাক নয় বলে প্রমাণিত। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন পিত্ত বা খাদদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। আর শ্লেষ্মা বমন হলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা কোনো অবস্থায়ই অজু ভঙ্গকারী নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটিও মুখ ভর্তি হলে অজু ভঙ্গের কারণ হবে। এ মতপার্থক্য হচ্ছে উদর থেকে উঠে আসা শ্লেষ্মার ব্যাপারে। মাথা থেকে নেমে আসা শ্লেষ্মার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বসম্মত মতেই তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। কেননা মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর যুক্তি হলো, (উদরস্থ) শ্লেষ্মা নাজাসাতের সাথে স্পর্শ হেতু নাজাসাত রূপে গণ্য। আর অন্য দুই ইমামের যুক্তি হলো, এই শ্লেষ্মা যেহেতু পিচ্ছিল, কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করে না। যা এর সাথে লেগে থাকে তা অতি অল্প। আর বমির ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ অজু ভঙ্গকারী নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَوْ فَا، مَنَّوْنَا الخ যদি কোনো অজুকারী ব্যক্তি কয়েকবার বমি করে এবং প্রত্যেকবার ভরা মুখ হতে কম বমি করে। এমতাবস্থায় একত্র করার পর যদি মুখ ভর্তি পরিমাণ হয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মজলিস এক হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি একই মজলিসে বারবার বমি করে চাই সবব এক হোক বা ভিন্ন হোক। সববগুলো একত্র করা হবে। যদি মুখ ভরা পরিমাণ হয় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। (অন্যথায় অজু ভঙ্গ হবেনা।)

যেমন : একই মজলিসে একটি আয়াতে সিদ্ধাকে বারবার তিলাওয়াত করলেও একই সিদ্ধাওয়াত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সবব এক হতে হবে। আর বমির সবব হলো উদ্বেগ। সুতরাং যদি একই কারণে কয়েকবার বমি হয়, চাই আর মজলিস এক হোক বা বিভিন্ন হোক সবগুলো একত্র করা হবে। যদি ভরা মুখ পরিমাণ হয় তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। দলিল হলো, হুকুম সবব অনুযায়ী হয়, এজন্য সবব এক হওয়ার কারণে হুকুমও এক হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি কায়দা বর্ণনা করেছেন। কায়দাটি হলো, যে সকল বস্তু নাকিযে অজু নয় সেগুলো নাপাকও নয়। সুতরাং কম বমি আর অপ্রবাহিত রক্ত নাজিস নয়, তাই অজু ভঙ্গকারীও নয়। এটাই বিতুদ্ধ মত। শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলো নাজিস নয়। কেননা এগুলো দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না।

গ্রন্থকার وهو الاصح বলে ইমাম মুহাম্মদ-এর মত থেকে ইহতিরায করতেন। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কম বমি ও অপ্রবাহিত রক্তকে নাজিস বলেন।

وَمِنْهَا إِذَا فَا، مَنَّوْنَا أَوْ طَعَّمَ الخ গ্রন্থকার উপরোক্ত ইবারতে এ কথা বলতে চান যে, মুখ ভর্তি বমির কারণে অজু তখন ভেঙ্গে যাবে যখন পিত্ত বমি বা খাদদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। তবে যদি সে খালিস শ্লেষ্মা বমি করে যাতে খাদদ্রব্য জাতীয় বস্তুর কোনো মিশ্রণ আছে তবে এর দু' সূরত রয়েছে। হয়তো শ্লেষ্মা মাথা থেকে নেমে আসবে, না হয় উদর থেকে উঠে আসবে। প্রথম সূরত সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গকারী নয়। কেননা মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। আর দ্বিতীয় সূরত তরফাইনের মতে অজু ভঙ্গকারী নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গকারী। শর্ত হলো মুখ ভর্তি হওয়া। তার দলিল হচ্ছে, শ্লেষ্মা যদিও সন্তানগতভাবে নাপাক নয় তবে উদরের নাজাসাতের সাথে মিশ্রণের কারণে নাপাক হয়ে গেছে। এবং এমন স্থান পর্যন্ত বেরিয়ে আসছে যা গোসলের মধ্যে পাক করার হুকুম রয়েছে। অর্থাৎ গোসলের মধ্যে কুলি করা ফরজ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে خروج نجاست পাওয়া গেছে তাই অজু ভেঙ্গে যাবে। যেমন খাদদ্রব্য বা পিত্ত বমি হলে অজু ভেঙ্গে যায়। তরফাইনের (র.) দলিল হলো, শ্লেষ্মা যেহেতু পিচ্ছিল কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করতে পারে না। আর যে নাজাসাত তার সাথে মিশ্রিত হয় তা-ও একেবারেই কম। আর বমির ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ দ্বারা অজু ভঙ্গ হয় না। তাই বমিও অজু ভঙ্গকারী নয়।

وَلَوْ قَاءَ دِمًا وَهُوَ عَلِقَ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلءُ الْفِيمِ لِأَنَّهُ سَوْدَاءٌ مُخْتَرِفَةٌ وَإِنْ كَانَ مَانِعًا  
فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) إغْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ يَقْوَةُ نَفْسِهِ  
يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِأَنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قَرْحَةٍ فِى  
الْجَوْفِ وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَالَانَ مِنَ الْأَنْفِ نَقَضَ الْوُضُوءَ بِالِاتِّفَاقِ لَوْصُولِهِ إِلَى  
مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطَهُّيرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ -

**অনুবাদ :** আর যদি কেউ রক্ত বমি করে এবং তা জমাট হয়, তবে এতে মুখভর্তি হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কেননা মূলত তা পিত্ত নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ। আর যদি তরল হয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, অন্যান্য প্রকার বমির মতো এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখ ভর্তি হওয়া বিবেচ্য। অন্য দুই ইমামের মতে যদি স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প হলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয়। সুতরাং তা উদরস্থ কোনো ক্ষত থেকে নির্গত হয়েছে বলে গণ্য হবে। (আর রক্ত) মাথার ভিতর থেকে গড়িয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত উপনীত হলে সর্বসম্মত মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা তা তাহারাতের হুকুম ভুক্ত অংশে চলে এসেছে। সুতরাং নির্গত হওয়া **متحقق** হয়ে গেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি কেউ রক্ত বমি করে, তবে ঐ রক্ত দু'ধরনের হতে পারে। হয়তো জমাট হবে, না হয় প্রবাহিত হবে। কেননা তা মূলত পিত্ত নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ যা পাকস্থলী থেকে বের হয়। আর যে জিনিস পাকস্থলী থেকে বের হয় তা অজু ভঙ্গকারী হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো মুখ ভর্তি হওয়া। আর যদি প্রবাহিত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এখানেও মুখ ভর্তি পরিমাণ রক্ত হলে অজু ভঙ্গকারী হবে নতুবা নয়। দলিল হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) রক্তের বমিকে অন্যান্য বমির উপর কিয়াস করেন। অন্যান্য বমি পাঁচ প্রকার- এক. খাদদ্রব্যের বমি, দুই. পানি বমি, তিন. পিত্ত বমি, চার. তিক্ত বমি, পাঁচ. কাল গাঢ় বমি। যেমনিভাবে এগুলোর মধ্যে মুখ ভর্তি পরিমাণ হওয়া শর্ত এমনিভাবে রক্ত বমির মধ্যেও মুখ ভর্তি পরিমাণ হওয়া শর্ত।

**শায়খাইন (র.) বলেন,** যদি রক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তবে অল্প হলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয় সুতরাং তা উদরের কোনো ক্ষতস্থান থেকে বের হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে রক্ত ক্ষতস্থান থেকে বের হয় তা অজু ভঙ্গের কারণ হওয়ার জন্য প্রবাহিত হওয়া শর্ত। এমনিভাবে এখানেও প্রবাহিত হওয়া শর্ত যদিও তা মুখ ভরে না হয়। যদি রক্ত মাথা থেকে বের হয় আর প্রবাহিত হয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। দলিল হলো, এ রক্ত এমন স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছে যাকে পাক করার বিধান রয়েছে। সুতরাং তা প্রবাহিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَكِنًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُنْزِلَ لَسَقَطَ لِأَنَّ الْإِضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْحَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلَا يَغْرَى عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ عَادَةً وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَبَيَّنِّ بِهِ وَالْإِتِّكَاءُ يُزِيلُ مُسْكَةَ الْيَقِظَةِ لِرُزَالِ الْمَقْعِدِ عَنِ الْأَرْضِ وَكَيْلُغُ الْإِسْتِرْحَاءِ فِي النَّوْمِ غَايَتُهُ بِهَذَا الشَّرْعِ مِنَ الْإِسْتِنَادِ غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ مِنَ السَّقُوطِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ بَعْضَ الْإِسْتِمْسَاكِ بَاقٍ إِذَا لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يَتِمَّ الْإِسْتِرْحَاءُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرَحَّتْ مَفَاصِلُهُ - وَالْغَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونُ لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِي الْإِسْتِرْحَاءِ وَالْإِغْمَاءُ حَدَّثَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ إِلَّا أَنَا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ وَالْإِغْمَاءُ فَرْقُهُ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ -

অনুবাদ : (৪) ঘুমানো- কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে যে, তা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে। কেননা পার্শ্ব শয়ন শরীরের গ্রন্থিগুলোর শিথিলতার কারণ। ফলে এ অবস্থা স্বভাবতই কিছু (বায়ু) বের হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর স্বভাবত যা বিদ্যমান তা ইয়াকিনী বিষয় বলে গণ্য। আর হেলান অবস্থায় ঘুম আসলে ভূমির সাথে নিতম্বের সংলগ্নতা না থাকার কারণে জাগ্রতাবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। আর কিছুতে উক্ত প্রকার ঠেস দিয়ে ঘুমালে অঙ্গ শৈথিল্য চরমে পৌঁছে যায়। তবে ঠেকনাটি তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে (নামাজে বা নামাজের বাইরে) দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা অবস্থার ঘুম তেমন নয়। এটাই বিতর্ক মত। কেননা আশিক নিয়ন্ত্রণ তখনো বহাল থাকে, তা না হলে সে তো পড়েই যেতো। সুতরাং এ অবস্থায় পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল হয় না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সিজদায় যে ঘুমায়, তার উপর অজু জরুরি নয়। অজু জরুরি হলো তার উপর যে, পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়, কেননা পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তার গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে। (৫) এমন সংজ্ঞাহীনতা, যাতে বোধ শক্তি লোপ পায়। (৬) এবং জুনুনী (অপ্রকৃতিস্থতা) কেননা, এগুলো অঙ্গ শৈথিল্যের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শয়নের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। সংজ্ঞাহীনতা সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গের কারণ। ঘুমের ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি এটাই। কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য আমরা হাদীস থেকে পেয়েছি। সংজ্ঞাহীনতাকে আবার নিদ্রার উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। কেননা তা নিদ্রার চেয়ে বেশি প্রবল।



## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজু ভঙ্গের এটাও কারণ যে, অজুকারী ব্যক্তি কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমানো যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়। শরহে নিকায়ার গ্রন্থকার লিখেন, যদি কাত হয়ে কিংবা এক নিত্যশের উপর ঠেস দিয়ে ঘুমায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমায় যে, তা সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায় তবে এর দু'টো সুরত রয়েছে। যদি নিত্য ভূমি হতে আলাদা হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে অজু ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ভূমি হতে আলাদা না হয় তবে ইমাম তাহাবী ও ইমাম কুদুরী (র.) লিখেছেন যে, অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা এতে তার গ্রন্থিতুলো শিখিল হয়ে পড়ে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা ভূমির উপর নিত্য লেগে থাকা বায়ু নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

কাত হয়ে ঘুমানোর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাওয়ার দলিল হলো, কাত হয়ে শোয়া গ্রন্থি ঢিলা হওয়ার কারণ। সুতরাং কাত হয়ে শোয়ার দ্বারা সাধারণত কোনো না কোনো জিনিস বের হয়েই থাকে। আর কায়দা আছে যে, যে জিনিস স্বভাতঃ সার্বিত তা ইয়াকীন ইয়াকীনী বিষয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। বুঝা গেল কাত হয়ে শোয়ার দ্বারা বায়ু ইত্যাদি বের হয়েছে। আর বায়ু বের হওয়ার দ্বারা নিশ্চিতভাবে অজু ভেঙ্গে যায়। এজন্য এর দ্বারাও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। উক্ত দলিল দ্বারা বুঝা গেল শুধুমাত্র ঘুম হাদাস নয়। কারো কারো মতে ঘুমও হাদাস। আর হেলান দিয়ে ঘুমানো এমন যা জাম্রত অবস্থার নিয়ন্ত্রণকে দূরীভূত করে দেয়। কেননা এ অবস্থায় নিত্য ভূমি থেকে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং শোয়া অবস্থায় অঙ্গের নিয়ন্ত্রণ তো অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমালে অঙ্গের শৈথিল্য চরমে পৌঁছে যায়। শুধু এতটুকু যে, ঠেকানটি তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং অজু ভঙ্গের ভিত্তি হলো অঙ্গ শৈথিল্য হওয়া যা এখনো বিদ্যমান। তাই এ সুরতেও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ নামাজে বা নামাজের বাইরে দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমায় তবে অজু ভঙ্গ হবে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। দলিল এই যে, এ সকল অবস্থায় কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে। তা-না হলে তো লোকটি পড়েই যেতো। সুতরাং পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল না হওয়ায় তার অজু ভঙ্গ হবে না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সিজদা অবস্থায় ঘুমায় তার উপর অজু ওয়াজিব নয়। অজু ওয়াজিব হলো ঐ ব্যক্তির উপর, যে পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়। কেননা পার্শ্বের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে তাঁর গ্রন্থিতুলো শিখিল হয়ে যায়। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَسِيتَ فَقَالَ إِنَّ الْوُسْوَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ -

তিনি [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)] রাসুলুল্লাহ ﷺ -কে সিজদা অবস্থায় ঘুমতে দেখলেন। এমনকি তাঁর নাকের শব্দ আসতে লাগল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, অজু ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে কাত হয়ে ঘুমায়। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন কাত হয়ে ঘুমায় তখন তার গ্রন্থিতুলো শিখিল হয়ে যায়।

وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَمَلِ الْخ : সংজ্ঞাহীনতা এক ধরনের রোগ বিশেষ, যা বোধ শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এর দ্বারা মুরাদ হলো জ্ঞান লোপ পাওয়া, সবব যাই হোকনা কেন। আর জুনুন এমন ব্যাধি যা আকল বুদ্ধিকে নিস্তেজ ও নিঃশেষ করে দেয়। আঘিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে اغما-এর ব্যবহার জায়েজ; কিন্তু جنون-এর ব্যবহার জায়েজ নয়। মোটকথা, اغما ও جنون অজু ভঙ্গকারী। দলিল হলো, এ তুলোর দ্বারা অঙ্গ শৈথিল্য হওয়া পার্শ্ব শয়নের চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। اغما সর্বাবস্থায় অজু ভঙ্গকারী। ঘুমের ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি এটাই ছিল। তবে ঘুমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হওয়া পার্থক্য আমরা হাদীস থেকে পেয়েছি, তাই কিয়াসকে বর্জন করেছি। সংজ্ঞাহীনতাকে (اغما) আবার ঘুমের উপর কিয়াসও করা যাবে না, কেননা তা ঘুমের চেয়ে বেশি প্রবল। তাই এগুলো দ্বারা অবশ্যই অজু ভেঙ্গে যাবে।

وَالْفَهْقَهَةُ فِي صَلَوةِ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا تَنْقُضُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحم) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجِسٍ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ وَخَارِجِ الصَّلَوةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا مَنْ ضَحَكَ مِنْكُمْ فَهَقَّهَ فَلْيُعِدِّ الْوُضُوءَ وَالصَّلَوةَ جَمِيعًا وَيَمْنِلِهِ يَتْرَكَ الْقِيَاسَ وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلَوةٍ مُطْلَقَةٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَالْفَهْقَهَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ وَلِجِرَانِهِ وَالضَّحْكُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ دُونَ جِرَانِهِ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ يَفْسِدُ الصَّلَوةَ دُونَ الْوُضُوءِ -

অনুবাদ : (৭) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজে অট্টহাসি। অবশ্য কিয়াস ও যুক্তির দাবি হলো অজু ভঙ্গ না হওয়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতও তাই। কেননা এটি নাজাসাত নির্গত কান্না কোনো বিষয় নয়। এ কারণে সালাতুল জানাযায়, তিলাওয়াতে সিজদায় এবং নামাজের বাইরে তা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- শুনো, তোমাদের কেউ অট্টহাসি হাসলে অজু ও নামাজ উভয়ই পুনরায় আদায় করবে। -(দারু কুতনী) বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের (মাশহুর হাদীস) দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে হাদীসটি যেহেতু সালোহ সম্পর্কিত, সেহেতু এর হুকুম তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যা ফহقه বা অট্টহাসি হলো যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী লোক শুনতে পায়। আর ضحك হলো ঐ হাসি হলো যা নিজে শুনতে পায়, কিন্তু অন্যরা তা শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ضحك দ্বারা অজু নষ্ট হয় না, কিন্তু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফহقه হলো এমন হাসি যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী মানুষ উভয়ে শুনতে পায়। দাঁত বের হোক বা না হোক। ضحك হলো যা নিজে শুনে তবে অন্যরা শুনতে পায় না। تيسم হলো এমন হাসি যা কেউ শুনতে পায় না। তيسম দ্বারা নামাজ অজু কিছুই বাতিল হয় না। ضحك দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় তবে অজু ভাঙ্গে না। আর আকিল বালিগের অট্টহাসির (ফহقه) হুকুম হলো, যদি তা রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট নামাজে হয় অথবা রুকু বা সিজদা বিশিষ্ট নামাজ যা ইশারা করে আদায় করছে তাতে পাওয়া যায় তবে এর দ্বারা নামাজ অজু উভয়টিই বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কাহ্কাহা অজু ভঙ্গকারী নয়। কিয়াসের চাহিদাও তাই। তাঁদের দলিল এই যে, কাহ্কাহা দ্বারা নাজাসাত নির্গত হয় না। অথচ নাজাসাত নির্গত হওয়াই অজু ভঙ্গকারী। তাই তো কাহ্কাহা নামাজে জানাযায়, সিজদায় তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে অজু ভঙ্গকারী নয়।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার নামাজ পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক বেদুঈন সাহাবী যার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল এসে হঠাৎ করে পড়ে যান। সাহাবায়ে কেয়াম নামাজে থাকা অবস্থায় হাসতে লাগলেন। নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুনো তোমাদের মধ্যে যারা নামাজে অট্টহাসি দিয়েছে, তারা নামাজ ও অজু উভয়টি দোহরাবে। এটা হাদীসে মাশহুর। আর হাদীসে মাশহুর দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে যেহেতু হাদীসটি সালাতে কামিলা তথা রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাজ সম্পর্কিত, তাই তার হুকুম এতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর থেকে অতিক্রম করে নামাজে জানাযা, সিজদায় তিলাওয়াত এবং নামাজের বাইরে অজু ভঙ্গকারী হবে না। কেননা খেলাফে কিয়াস হুকুম তার মাওরাদ থেকে অতিক্রম করে না।

وَالَّذَايَةَ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبْرِ نَاقِضَةً فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْجِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ مِنْهُ لَا يَنْقُضُ وَالْمَرَادُ بِالذَّيَةِ الدُّودَةُ وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَاشْتَبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ بِخِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْقَبْلِ وَالذَّكَرِ لِأَنَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَرَّةُ مُفْضَاءً يَسْتَحِبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنَ الدُّبْرِ -

অনুবাদ : (৮) পিছনের রাস্তা দিয়ে কোনো কীট বের হলে তা অজ্ঞ ভঙ্গকারী হবে। তবে ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে বা গোশত খণ্ড খসে পড়লে অজ্ঞ ভঙ্গ হবে না। মূল পাঠে “দাব্বা” দ্বারা উদ্দেশ্য “কীট”। কেননা (মূলত কীট নাজাসাত নয় বরং) তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাজিস বা নাপাক এবং তা অতি অল্প। আর অল্প নাজাসাত পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়া অজ্ঞ ভঙ্গের কারণ। কিন্তু অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া অজ্ঞ ভঙ্গের কারণ নয়। তাই (অন্যস্থান থেকে অল্প বের হওয়া) ঢেকুরের সঙ্গে তুলনীয় এবং (পেশাব পায়খানার রাস্তা থেকে অল্প বের হওয়া) নিঃশব্দ বাতকর্মের সাথে তুলনীয়। (অর্থাৎ মৃদু বাত কর্মে নির্গত নাজাসাত অতি অল্প হলেও পায়খানার রাস্তায় বলে তা অজ্ঞ ভঙ্গকারী হয়। সুতরাং পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত কীটও অজ্ঞ ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে ঢেকুরের সাথে নির্গত অতি অল্প নাজাসাত অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে নির্গত কীট অজ্ঞ ভঙ্গকারী হবে না।) পক্ষান্তরে নারী অথবা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে উভয় পথ সংযুক্ত এমন কোনো নারীর বায়ু নির্গত হলে তার জন্য অজ্ঞ করে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা সেটা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে কীট পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয় এর দ্বারা অজ্ঞ ভেঙ্গে যায়। যেমন বাতকর্ম এবং কংকর বের হওয়ার দ্বারা অজ্ঞ ভেঙ্গে যায়। যদি কীট পিছনের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষত স্থান থেকে বের হয় অথবা ক্ষতের থেকে গোশত খণ্ড খসে পড়ে তবে তা অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়।

মূল মতনে “দাব্বা” দ্বারা কীট উদ্দেশ্য। উপরোক্ত দু’ সুরতের মধ্যে পার্থক্য হলো, মূলত কীট নাজাসাত নয়; বরং তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাপাক। আর তা অতি অল্প, অল্প নাজাসাত পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হলে অজ্ঞ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য স্থান থেকে বের হলে অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। তাই আমরা বলেছি, কীট পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হলে অজ্ঞ ভঙ্গকারী আর অন্য কোনো স্থান বা ক্ষত থেকে বের হলে অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং ঢেকুরের অনুরূপ। আর পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে অল্প বের হওয়া নিঃশব্দ বাত কর্মের অনুরূপ। অর্থাৎ ঢেকুর অন্য রাস্তা দিয়ে হওয়ায় অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। আর নিঃশব্দ বাতকর্ম পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ায় অজ্ঞ ভঙ্গকারী। পক্ষান্তরে নারী বা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে বায়ু বের হয় তা অজ্ঞ ভঙ্গকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, রাসুল্লাহ ﷺ  $\text{كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ}$  কে অজ্ঞ ভঙ্গকারী বলেছেন। এ হিসাবে তো বাতকর্ম, বা বাতকর্ম নয়। এ জাতীয় কোনো কিছু পুরুষ বা মহিলার লজ্জাহান দিয়ে বের হলে অজ্ঞ ভঙ্গকারী হবে না কেন? এর জবাব হচ্ছে, সকল মুজতাহিদ একমত যে, উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে  $\text{كُلُّ مَا يَخْرُجُ}$  দ্বারা  $\text{كُلُّ نَجَسٍ يَخْرُجُ}$  উদ্দেশ্য। সুতরাং পুরুষ বা মহিলার লজ্জাহান দিয়ে বের হওয়া বায়ু যেহেতু নাজিস নয় তাই তা অজ্ঞ ভঙ্গকারীও নয়।

যদি কোনো মহিলার উভয়পথ সংযুক্ত হয় এবং তার সামনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হয় তবে অজ্ঞ করে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা তা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার অজ্ঞ করা ওয়াজিব নয়। কেননা সম্ভাবনাময় বিধানের দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

فَإِنْ قُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَالَتْ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إِنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْجِ نَقَضَ وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ زُفَرُ (رحا) يَنْقُضُ فِي الرُّجْمَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحا) لَا يَنْقُضُ فِي الرُّجْمَيْنِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَجَسَةٌ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيرُ قَبِيحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا فَيَصِيرُ صَدِيدًا ثُمَّ يَصِيرُ مَاءً هَذَا إِذَا قُشِرَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصَرِهِ فَلَا يَنْقُضُ لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

অনুবাদ : কোনো ফোঁড়া-ফোঁস্কার চামড়া তুলে ফেলার কারণে তা থেকে পানি পুঁজ ইত্যাদি গড়িয়ে যদি ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তাহলে অজু ভঙ্গ হবে। আর যদি অতিক্রম না করে তবে অজু ভঙ্গ হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই অজু ভঙ্গ হবে না। মূলত এটা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া ভিন্ন পথে নাজাসাত নির্গত হওয়ার মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত পানি-পুঁজ ইত্যাদি অবশ্যই নাজিস। কেননা এ গুলো মূলত রক্ত যা পর্যায়ক্রমে পক্ক হয়ে নির্গত ক্রেদ এবং আরো বেশি পক্ক হওয়ার পর পুঁজ এবং এরপর তরল হয়ে পানি হয়ে যায়। আর এই পার্থক্য তখনই হবে যখন আবরণ ত্বক সরিয়ে ফেলার কারণে তা আপনা-আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা (হাদীসে الْخَارِجُ বা নির্গত শব্দ রয়েছে, অথচ) এটা خَارِج বা নির্গত নয়, বরং مَخْرُج বা নিঃসারিত হয়েছে। (বিত্ত্ব দ্বক মত হলো, নিঃসারিত হলেও তা অজু ভঙ্গের কারণ হবে। কেননা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এই দলিল চতুষ্টয় প্রমাণ করে যে, নির্গত পদার্থের নাপাকিত্বই হলো অজু ভঙ্গের কারণ, আর এই নাপাকিত্বের গুণ নিঃসারিত পদার্থেও বিদ্যমান।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ফোঁড়ার চামড়া তুলে ফেলা হয় তারপর পানি পুঁজ বা অন্য কোনো কিছু বের হয়। এর দু'টো সুরত রয়েছে। এক, ক্ষতস্থান হতে গড়িয়ে পড়েছে অথবা পড়েনি। যদি বের হওয়ার সাথে সাথে গড়িয়েও পড়ে তবে অজু ভঙ্গকারী। আর গড়িয়ে না পড়লে অজু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাব ইমাম যুফার (র.) ব্যতীত ফুকাহায়ে আহনাফ সকলের। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে, তা গড়িয়ে পড়ুক বা না পড়ুক। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় অজু ভঙ্গ হবে না। মূলত এই মাসআলা خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ইমাম যুফার (র.)-এর মতে خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ মুতলাকান অজু ভঙ্গকারী। প্রবাহিত হোক বা না হোক। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গকারী নয়। আমাদের মতে প্রবাহিত হলে অজু ভঙ্গকারী আর না হলে অজু ভঙ্গকারী নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সমস্ত ক্ষতের পানি, পুঁজ ইত্যাদি নাজিস। কেননা রক্ত পক্ক হয়ে ক্রেদ হয়ে যায়। অতঃপর আরো পক্ক হয়ে পুঁজ হয়ে যায়। এরপর তরল হয়ে পানি হয়ে যায়। আর এ সব হলো নাপাক। নাপাক তখনই অজুভঙ্গকারী হবে যখন প্রবাহমান হয়। এজন্য উপরোক্ত সব সুরতও অজু ভঙ্গকারী হবে। উল্লেখ্য যে, অজু ভঙ্গের হুকুম তখন দেওয়া হবে যখন আবরণ ত্বক সরিয়ে ফেলা হয় আর তা আপনা আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা خَارِج নয় বরং مَخْرُج যা নিঃসারিত করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

فَصَلِّ فِي الْغُسْلِ : وَفَرَضَ الْغُسْلُ الْمَضْمُضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ وَغَسَلَ سَائِرَ الْبَدَنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) هُمَا سُنَّتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ أَوْ مِنْ السُّنَّةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمُضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا أَمْرٌ بِالْإِطْهَارِ وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنْ مَا تَعَذَّرَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارَجَ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الرَّجْلِ وَالْمُوجِبَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى حَالَةُ الْحَدِيثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُمَا فَرَضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ -

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : গোসল : গোসলের ফরজ হলো কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া । ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সন্নত । কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দশটি বিষয় ফিতরাত অর্থাৎ সন্নতের অন্তর্ভুক্ত । এর মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । এ কারণেই অজুতে এ দুটিকে সন্নত বলে গণ্য করা হয় । আমাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা‘আলার বাণী যদি তোমরা জুনবী হও তাহলে পূর্ণরূপে তাহারাতি হাসিল কর । এখানে পূর্ণরূপে তাহারাতি হাসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যার মর্ম হলো সমস্ত শরীর পবিত্র করা । তবে যেখানে পানি পৌছানো দুরূহ, সেগুলো (ধোয়ার আওতা থেকে) বহির্ভূত । আর অজুর অবস্থা ভিন্ন । কেননা অজুর মধ্যে (وجه) চেহারা ধোয়া ওয়াজিব । আর আভিধানিক অর্থে وجه ঘারা এতটুকু অংশ বুঝায় যা মুখোমুখিতে প্রকাশ পায় । আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরের মধ্যে মুখোমুখির অবস্থা অনুপস্থিত । ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অজু ভঙ্গের অবস্থা । এর দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী-কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি জানাবাতের গোসলে ফরজ এবং অজুতে সন্নত ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার অজুর আহকাম বর্ণনার পর গোসলের আহকাম বর্ণনা শুরু করেছেন । কারণ, এক. গোসলের তুলনায় অজুর আহকাম বেশি । দুই. অজুর মহল হলো جزء بدن আর গোসলের মহল হলো كل البدن কায়দা আছে جزء - كل -এর পূর্বে আসে । তিন. এর দ্বারা আদ্বারের কালামের অনুসরণ উদ্দেশ্য । কেননা সেখানেও আগে অজুর আহকাম পরে গোসলের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে । উপরোক্ত কারণগুলোকে সামনে রেখে অজুর আহকাম গোসলের অর্গাকামের পূর্বে আলোচিত হয়েছে । غسین - غس -এর উপর পেশ, অর্থ اغتسال অর্থাৎ সমস্ত শরীর ধোয়া । ফুকাহায়ে আহনাফের মতে গোসলের তিনটি ফরজ- কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া । ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া অজুর ন্যায় গোসলের মধ্যেও সন্নত । তাঁদের প্রথম নকলী দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বিষয়কে সন্নতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন । এর মধ্যে পাঁচটির সম্পর্ক মাথার সাথে যেমন- সিঁথি কাটা, মিসওয়াব করা, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, সোঁফ কাটা । আর পাঁচটির সম্পর্ক শরীরের সাথে যেমন : খতনা করা, নাজীর নিচের পশম কাটা, বগলের নিচের চুল উঠানো, নখ কাটা এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা । এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সন্নত ।

দ্বিতীয় আকলী দলিল : তারা গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার উপর কিয়াস করেন । অর্থাৎ এগুলো অজুর ন্যায় গোসলেও সন্নত ।

আমাদের দলিল : আল্লাহ তা‘আলার বাণী- “তোমরা যদি জুনবী হও তবে পূর্ণরূপে তাহারাতি হাসিল কর । এখানে পূর্ণরূপে তাহারাতি হাসিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যার অর্থ হলো সমস্ত শরীর পবিত্র করা । তবে যেখানে পানি পৌছানো অসম্ভব যেমন চোখের ভিতরের অংশে, তা ধোয়ার আওতার বহির্ভূত বলে গণ্য হবে । পক্ষান্তরে অজুর হকুম ভিন্ন । কেননা অজুর মধ্যে চেহারা ধোয়া ওয়াজিব । যেমন আল্লাহর বাণী- وَجْهَكُمْ তোমরা চেহারা ধোও । আর আভিধানিক অর্থেও চেহারা দ্বারা এতটুকু অংশ বুঝায় যা মুখোমুখিতে প্রকাশ পায় । আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরীণ অংশে মুখোমুখির অবস্থা অনুপস্থিত । তাই গোসলকে অজুর উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না । এতে তাদের আকলী দলিলের জবাব হতো গেল । আর তাদের বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, উক্ত হাদীসটি অজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কেননা হয়রত ইবনে আব্বাস ও হয়রত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জানাবাতের গোসলে ফরজ আর অজুতে সন্নত ।

وَسَنَّتَهُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَزَيْلُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ  
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رَجُلَيْهِ ثُمَّ يَغِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ  
يَتَنَحَّى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا حَكَّتْ مِمْوَنَةُ (رض) اغْتَسَلَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ وَأَنَا يُوْخِرُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلَا يَفِيدُ  
الْفَسْلَ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لَا يُوْخِرُ وَأَنَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ كَيْلَا تَزْدَادَ  
بِإِصَابَةِ الْمَاءِ -

**অনুবাদ :** গোসলের সুন্নত : গোসলকারী প্রথমে দু' হাত এবং লজ্জাস্থান ধুইবে। আর শরীরে নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করবে, অতঃপর নামাজের অনুরূপ অজু করবে, তবে পদদ্বয় ধুইবে না। এরপর মাথায় ও সারা শরীরে তিন বার পানি প্রবাহিত করবে। এরপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নেবে। হযরত মায়মুনা (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলের অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। পা ধোয়া সর্বশেষে করার কারণ এই যে, পা দুটো ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোনো লাভ নেই। এমনকি তক্তার উপরে (বা উটুস্থানে) দাঁড়িয়ে গোসল করলে তখন পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না। প্রথমে হাকীকী নাজাসাত (নাপাক পদার্থ) দূর করে নেওয়ার কারণ হলো, পানি লেগে তা যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোসলের সুন্নত তরীকা হলো, প্রথমে উভয় হাত কব্জিসহ ধুইবে। কেননা এগুলো হলো পাক করার মাধ্যম। স্বীয় লজ্জাস্থান ধুইবে। কেননা এটি নাজাসাতের স্থান, তারপর তাই এর মধ্যে নাজাসাত লেগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শরীরে নাজাসাতে হাকীকী লেগে থাকলে ধুইবে। যাতে তার উপর পানি ঢেলে দিলে অন্যত্র নাজাসাত ছড়িয়ে না পড়ে। অতঃপর নামাজের অজুর ন্যায় অজু করবে। তবে পা ধুইবে না। তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং তিনবার সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। শামসুল আয়িম্মা হুলুওয়ানী (র.) বলেন, প্রথমে ডান কাঁধের উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর বাম কাঁধের উপর তিনবার তারপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে দিবে। কেউ কেউ বলেন, ডান কাঁধ থেকে আরম্ভ করে তারপর মাথার উপর তারপর বাম কাঁধের উপর পানি ঢালবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মাথা থেকে আরম্ভ করবে। কুদূরীর ইবারত দ্বারা এটাই বুঝা যায়। অতঃপর ঐ স্থান হতে সরে গিয়ে উভয় পা ধুইবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত মায়মুনা (রা.) রাসুলুল্লাহর ﷺ গোসলের এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন।

ফাতুল্ল দাদীরের গ্রন্থকার শায়খ ইবনুল হুমাম (র.) পূর্ণ হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন—

رَوَى الْجَسَاعَةُ عَنْهَا قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَنَزَّ عَلَى يَدَيْهِ فغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا  
ثُمَّ أَفْرَغَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى شِكَائِهِ فغَسَلَ مَذَاقِيرَهُ ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ يَأْأَرْضُ ثُمَّ تَمَضَّمُ وَأَسْتَنْشِقُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ  
وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فغَسَلَ قَدَمَيْهِ -

এক দল লোক হযরত মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মুনা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি পানি উভয় হাতের উপর ঢেলে দু'বার বা তিনবার হাতগুলো ধুইলেন অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং নিজের লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘসলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চোখা ধুইলেন, উভয় হাত ধুইলেন। তারপর তিনবার মাথা ধুইলেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন, তারপর ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধুইলেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সবশেষে পা ধোয়ার কারণ হলো, পা দুটো যেহেতু ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে তাই আগে ধোয়াতে কোনো লাভ নেই। তবে কেউ যদি কোনো উঁচু জায়গায় যেমন তক্তা বা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গোসল করে তবে বিলম্ব পা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ صَفَائِهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَصُولَ الشَّعْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِكَفِّهِكَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَصُولَ شَعْرِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلٌّ ذَوَائِبُهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ بِخِلَافِ اللَّحْيَةِ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي إِنْصَالِ الْمَاءِ إِلَى أَثْنَائِهَا . قَالَ وَالْمَعَانِي الْمَوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ إِثْرَالِ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّقِيقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْبِقْظَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) خُرُوجُ الْمَنِيِّ كَيْفَ مَا كَانَ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ أَى الْغُسْلُ مِنْ الْمَنِيِّ وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجَنْبَ وَ الْجَنَابَةَ فِي اللَّغَةِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ يُقَالُ اجْنَبَ الرَّجُلُ إِذَا قَضَى شَهْوَتَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ انْفِصَالُهُ عَنْ مَكَانِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) ظُهُورُهُ أَيْضًا عِتْبَارًا لِلْخُرُوجِ بِالْمَرْأَةِ إِذَا الْغُسْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَهُمَا أَنَّهُ مَتَى وَجَبَ مِنْ وَجْهِ فَالْإِحْتِبَاطُ فِي الْإِنْجَابِ —

অনুবাদ : স্ত্রী লোকের জন্য গোসলের সময় বেগী খুলে নেওয়া জরুরি নয়, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন, চুলের গোড়ায় পানি পৌছেলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। বেগি বাঁধা চুল ভিজানো ও স্ত্রী লোকের জন্য জরুরি নয়, এটি-ই বিতুদ্ধ অভিমত। কেননা তা কষ্টসাধ্য কাজ। দাড়ির ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌছানো কষ্টদায়ক নয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ হলো : (১) জাথর বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগে ও কামোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে, বীর্যস্খলন যেভাবেই হোক তাতে গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানির কারণে পানি আবশ্যক, অর্থাৎ বীর্যস্খলনের কারণে গোসল আবশ্যক। আমাদের দলিল হলো, পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ জুনুবি সাথে সম্পর্কিত। جنابة শব্দের আভিধানিক অর্থ কামোদ্দীপনার সাথে বীর্যস্খলন। (উদাহরণত) লোকটি জুনুবি হয়েছে তখনই বলা হয়, যখন লোকটি স্ত্রীর সাথে কাম ইচ্ছা চরিতার্থ করে। উক্ত হাদীস সকাম বীর্যস্খলনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বীর্যের স্খলনকালে কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বীর্যের প্রকাশ বা নির্গমন কামোত্তেজনাসহ হওয়া শর্ত। তিনি নির্গমন অবস্থাকে মূল স্থান থেকে স্খলন অবস্থার উপর কিয়াস করেন। কেননা গোসলের সম্পর্ক উভয়ের সাথে। উক্ত দুই ইমামের যুক্তি হলো, যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার এক কারণ বিদ্যমান তখন সর্বকর্তার চাহিদা হলো গোসল ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত কর।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা, যদি গোসলের সময় স্ত্রী লোকের চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায় তবে তার বেগি খোলা ওয়াজিব নয়। দলিল হলো হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর হাদীস— غَسَلَ بِرَأْسِي فَأَنْقَضَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا إِثْمًا بِكَفِّهِكَ أَنْ تَحْفِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَتَّابَاتٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عَلَى الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ — (فَتْحُ الْقَدِيرِ)

উম্মে সালামা (রা.) বলেন : আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার মাথার চুলগুলো খুব শক্ত করে বেঁধে রাখি। জানাবাতের গোসলের সময় আমার কি তা খুলতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিনকোষ পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, চুল ভিজানো জরুরি নয়, যদি গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বেশি বাঁধা চুল ভিজানোও মহিলার জন্য জরুরি নয়, এটাই হলো বিশুদ্ধ মত। কেননা বেশি ভিজানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পক্ষান্তরে দাড়ির ব্যাপারটি এর থেকে ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌঁছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই দাড়ির ভিতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এমনিভাবে মহিলাদের চুল খোলা থাকলেও তার মধ্যে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। কেননা এতে কষ্টের কোনো কিছু নেই।

الْبِغْ : প্রশ্ণকার উপরোক্ত ইবারতে মধ্যে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করা শুরু করেছেন।

প্রথম কারণ হলো, সবেগ ও সকামে বীর্যখলিত হওয়া। বীর্যখলন পুরুষের হোক বা মহিলার হোক। ঘুমে হোক বা জাগ্রত অবস্থায় হোক, সর্বাবস্থায়ই গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.) বলেন, বীর্যখলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। চাই বীর্য সবেগে বা নিঃসবেগে বের হোক। সুতরাং যদি কোনো ভাৱী জিনিস উঠানোর দ্বারা বীর্য বের হয়ে যায় বা উপর থেকে নিচে অবতরণের সময় বীর্য বের হয়ে যায় তবে এ অবস্থায় আমাদের মতে গোসল ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- **لَا بَغْيَ مِنَ الْمَاءِ** অর্থাৎ বীর্য দ্বারা গোসল ওয়াজিব। উক্ত হাদীস শাহওয়াত (সবেগ)-এর কয়েদ থেকে **مَطْلُق** -এর কানুন অনুযায়ী হাদীসটি **مَطْلُق**-ই থাকবে। আমাদের দলিল : আল্লাহ তা'আলার সূতরাং **أَطْلَقَ بَعْرِي عَلَى أَطْلَافِهِ** -এর কানুন অনুযায়ী হাদীসটি **مَطْلُق**-ই থাকবে। আমাদের দলিল : আল্লাহ তা'আলার সূতরাং **وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا** যদি তোমরা জুনবী হও তবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। উক্ত আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের হুকুমের সাথে জুনবীও शामिल। **جُنَابَةٍ** শব্দের আভিধানিক অর্থ সকাম অবস্থায় বীর্য বের হওয়া। সুতরাং কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে কাম-ইচ্ছা পূর্ণ করলে আরবীগণ বলেন **أَخْتَبَ الرَّجُلُ**। বুঝা গেল যে, সবেগে ও সকর্মে বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশ করা হাদীসের জবাব হলো, উক্ত হাদীস সকাম বীর্যখলনের অর্থেই ব্যবহৃত হবে। কেননা হাদীসটি তার শব্দের দিক থেকে ব্যাপক। তাইতো এটি হাদীসে পেশাব, মূত্র, ওদী, সকাম ও বে-কাম বীর্যখলন সবগুলো शामिल। এ কথা সর্বজন রীকৃত যে, এ হাদীস দ্বারা সবগুলো মুরাদ নয়। সুতরাং যেহেতু সকাম বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, তাই এ হাদীসকে সকাম বীর্য বের হওয়ার অর্থেই গণ্য করতে হবে। আমাদের মায়হাবের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বীর্যের ব্যাখ্যা সম্বলিত বক্তব্যও রয়েছে।

তিনি বলেন- **الْمَنِيُّ بِأَنَّهُ أَبْيَضٌ خَبِيثٌ يَنْكِرُ مِنْهُ الذَّكْرُ** বীর্য হলো সাদা গাঢ় পদার্থ বিশেষ, যার দ্বারা পুরষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়। আর একথা সর্বাধিকৃত যে, পুরষাঙ্গ তখনই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যখন সবেগে বীর্য বের হয়ে আসে। বুঝা গেল যে, সবেগ ছাড়া যা বের হয় তা বীর্য নয়। এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না। হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো বীর্য যখন তার স্থান থেকে পৃথক হয় তখন কামোত্তেজনার সাথে বের হওয়া। তবে লজ্জাস্থান থেকে বের হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকা শর্ত কি-না এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বের হওয়ার সময় কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বীর্য প্রকাশের সময় কামোত্তেজনাসহ বের হওয়া শর্ত। তাঁর দলিল হলো, কিয়াস। অর্থাৎ তিনি বের হওয়ার অবস্থাকে মূল স্থান থেকে পৃথক হওয়ার অবস্থার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে মূল স্থান থেকে বীর্য পৃথক হওয়ার সময় কামোত্তেজনা জরুরি এমনিভাবে বীর্য বের হওয়ার সময়ও কামোত্তেজনা জরুরি। কেননা উভয়ের সাথেই গোসলের সম্পর্ক রয়েছে।

তরফাইনের দলিল হলো, বীর্য পৃথক হওয়ার সময় যেহেতু কামোত্তেজনা পাওয়া গেছে সেহেতু তার দাবি হলো গোসল ওয়াজিব হওয়া। আর বের হওয়ার সময় যেহেতু কামোত্তেজনা ছিল না তাই এর দাবি হলো গোসল ওয়াজিব না হওয়া। এখন এ সূরতে যেহেতু গোসল ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার উভয়টিরই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাই আমরা সর্তকতাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছি গোসল ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, উভয় মায়হাবের ফল হলো, কেউ যদি খলিত বীর্য কোনো উপায়ে রোধ করে রাখে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর তা বেরিয়ে আসে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে।



وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ انْزَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا التَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتْ  
 الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ انْزَالٌ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ وَلَآئِهٖ سَبَبٌ لِلانْزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ  
 وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقَلْبِهِ فَيَقَامُ مَقَامَهُ وَكَذَا الْإِنْبِلَاجُ فِي الذَّيْرِ لِكَمَالِ السَّبَبِيَّةِ  
 يَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إِحْتِيَاطًا بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ وَمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ  
 نَاقِصَةٌ وَالْحَيْضُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطْهَرْنَ بِالتَّشْدِيدِ وَكَذَا التَّفَاقُّسُ بِالْإِجْمَاعِ  
 وَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ صَاحِبُ الْكِتَابِ  
 نَصَّ عَلَى السُّنَنِ وَقِيلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَسَمَّى مُحَمَّدٌ (رَح) الْغُسْلَ فِي يَوْمِ  
 الْجُمُعَةِ حَسَنًا فِي الْأَصْلِ وَقَالَ مَا لِيكَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ  
 فَلْيَغْتَسِلْ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ  
 اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَبِهَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ عَلَى التَّسْخِغِ ثُمَّ هَذَا  
 الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رَح) وَهُوَ الصَّحِيحُ لِرِزَادَةِ فُضِّلَتِهَا عَلَى الْوَقْتِ  
 وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا وَفِيهِ خِلَافُ الْحَسَنِ وَالْعِيدَانِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ فِيهِمَا  
 الْإِجْتِمَاعُ فَيُسْتَحَبُّ الْإِغْتِسَالُ دَفْعًا لِلتَّأَذُّي بِالرَّائِحَةِ وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ  
 فَسُنَنِيَّتُهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

অনুবাদ : (২) বীর্যঞ্জন ব্যতিরেকে দুই যৌনঙ্গের মিলন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উভয় খতনা স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়। বীর্য বের হোক বা না হোক। আর এজন্য যে, দুই অঙ্গের মিলন হলো বীর্য বের হওয়ার কারণ। আর পুরুষাঙ্গ রয়েছে তার দৃষ্টির আগোচরে। পরিমাণ অল্প হলে ঞ্জন তার অজ্ঞাতও থাকতে পারে। কাজেই কারণকে ঞ্জনের স্থলবত্তী ধরে নেওয়া হয়েছে। গুহাদ্বারে প্রবেশ করানোর এই একই হুকুম। কেননা ঞ্জনের কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আর যার সাথে এ কাজ করা হয়, সতর্কতা স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব। পণ্ড সংগম ও যৌনাস্ব ছাড়া মৈথুন এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে ঞ্জনের কারণ দুর্বল। (৩) ঞ্জত্বাব (এর সমাপ্তি)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন حتى يَطْهَرْنَ (এর উপর তশদীদ-এর কিরাআত অনুযায়ী) যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে। (৪) তদ্রূপ সর্বসম্মত মতে নিক্ষেপও। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল সন্নত করেছেন, জুম্মা, দু' ঈদ, আরাফায় অবস্থান ও ইহ্রামের জন্য। মূল গ্রন্থকার ইমাম কুদুরী (র.) স্পষ্ট সন্নত বলেছেন। কারো কারো মতে এই চার সময়ের গোসল মোস্তাহাব। মূল (মাবসূত) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুমার গোসলকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমায় যে শরিক হয়, সে যেন গোসল করে নেয়। - (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন যে অজু করে, তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে গোসল করে তা উত্তম।— (আবু দাউদ, তিরমিযী) (সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে) ইমাম মালিক (র.) বর্ণিত হাদীসের নির্দেশকে মুস্তাহাব অর্থে ধরে নেওয়া হবে। কিংবা রহিত বলে গণ্য করা হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এই গোসল হলো সাল্যতুল জুমার জন্য এবং এটিই বিতদ্ধ মত। কেননা সময়ের তুলনায় তার ফজিলত অধিক। তাছাড়া নামাজের সাথেই তাহারাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম হাসান (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। দু'ঈদও জুম'আর মতোই। কেননা উভয় ঈদেই বড় সমাবেশ হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতে গোসল মোস্তাহাব। আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ হজের বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُشَانٌ মহিলা-পুরুষের খতনা করার স্থান। সে কালের আরবদের অভ্যাস ছিল পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরকেও খতনা করানো হতো। ইবনুল হুমা (র.) লিখেন পুরুষের খতনা করা সুন্নত, আর মহিলাদের জন্য ভালো। কেননা খতনাকৃত মহিলার সাথে সহবাসে অধিক তৃপ্তি পাওয়া যায়। পুরুষ খতনা না করলে তাকে জোর করা হবে। তবে খাৎনা ঘারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জোর জবরদস্তি করা হবে না। মহিলা খতনা না করলে তাকে জোর করা হবে না।

মাসআলা : যদি উভয় খতনা স্থান মিলে যায় আর পুরুষাঙ্গ মহিলার গুণাগুণে অদৃশ্য হয়ে যায় তবে উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব, বীর্য বের হোক বা না হোক। দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস إِذَا نَفَى الْخُتَّانَ وَغَابَتْ অর্থাৎ উভয় খতনার স্থান যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলার যৌনাঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়, বীর্যঞ্চলন ঘটুক বা না ঘটুক।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যে জিনিসের উপর হুকুম দেওয়া হয় তা যদি خَفِيَ হয় আর তার কোনো سَبَب জাহির হয়, তখন এই امر خفئ ঐ سبب ظاهر -এর স্থলাভিষিক্ত হয়।

আর হুকুম ঐ سبب-এর উপর জারি হয়। সুতরাং خُتَّانَيْنِ বীর্য বের হওয়ার سَبَب। আর বীর্য যার ঘারা গোসলের হুকুম দেওয়া হবে তা হলো অদৃশ্য। আবার কখনো বীর্যঞ্চলন কম হওয়ার কারণে অজ্ঞাতও থেকে যায় যে বীর্য ঞ্চলন হলো কি হলো না। এ জন্য الخفاء-কে انزال তথা বীর্য ঞ্চলনের এর স্থলে ধরা হয়েছে। আর গোসলের হুকুম النقاء -এর উপর দেওয়া হয়েছে। বীর্যঞ্চলনের উপর নয়।

যদি পুরুষাঙ্গ গুহাঘারে প্রবেশ করানো হয় তারও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা বীর্য বের হওয়ার কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এমনকি কোনো কোনো ফাসিক লোক গুহাঘারে কামভাবে চরিতার্থ করাকে প্রাধান্য দিয়ে সামনের রাস্তার তুলনায়। তাই তো কোনো কোনো ফকীহ বলেন, দাড়িহীন বালকের محاذات ঘারা এমনভাবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় যেমনভাবে মহিলাদের محاذات ঘারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যার সাথে এ কাজ করা হয়, সতর্কতা স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব। কেননা হতে পারে সেও তৃপ্তি অনুভব করেছে। আর বীর্যও বের হয়েছে অথবা সে তৃপ্তি অনুভব করেনি এবং তার বীর্যও বের হয়নি কিন্তু পবিত্রতায় যেহেতু সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তাই তার উপরও গোসল ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে পশুসঙ্গ ও যৌনসঙ্গ ছাড়া হস্তমৈথুন একটি ভিন্ন বিষয়। তাই এখানে বীর্যঞ্চলন ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা এখানে বীর্যঞ্চলনের কারণ একেবারেই দুর্বল। কেননা কোনো ভাল প্রকৃতির লোক এ ধরনের কাজ সমর্থন করতে পারে না।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, ঋতুপ্রাব বন্ধ হওয়া। দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী-حَتَّى يَطْهَرْنَ অর্থাৎ ঋতুবতীর নিকট যেয়ো না যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপে পাক হয়। আর এ উত্তমরূপে পাক তখনই হবে যখন ঋতুপ্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসল করে নেয়। তবে এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, يَطْهَرْنَ-এর তাশদীদ ছাড়াও কিরাআতে

মুতাওয়াতিহা রয়েছে। তখনতো আয়াতটি উপলব্ধি অর্থে ব্যবহৃত হবে না। এর জন্যই হলো, দু' কিরাআত দু' আয়াতের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) উভয় কিরাআতের উপর আমল করেন। আর তা এভাবে যে, দশদিন পূর্ণ হবার পর যদি ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে স্বামীর জন্য তার গোসল ছাড়াই সহবাস করা জায়েজ। এ সুরতে তাশদীদ বিহীন আয়াতটি দলিল হবে। কেননা মহিলাটি রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই পাক হয়ে গিয়েছে। আর যদি দশদিনের কমে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে সহবাস করার জন্য তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। এ সুরতে তাশদীদযুক্ত আয়াতটি দলিল হবে। একই হুকুম নিফাসের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ সর্বসম্মত মতে নিফাসও গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : উপরোক্ত ইবারতে সুন্নত গোসলের আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদুরী (র.) চার অবস্থায় গোসল মাসনুন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এক. জুমা, দুই. দু' ঈদ, তিন. আবাবা এবং চার. ইহরামের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, এই সময়ের গোসল মোস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থে জুমার গোসলকে উত্তম বলেছেন। ইমাম মালিক (র.) ওয়াজিব বলেছেন ইমাম মালিক (র.)-এর প্রথম দলিল—

الْفَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুমার দিন প্রত্যেক বালিগ-এর উপর গোসল করা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে ব্যক্তি গোসল করে তা তার জন্য উত্তম। এ হাদীস দ্বারা সুন্নত তো সাবিত হয় না; বরং মোস্তাহাব সাবিত হয়। হাদীসে অজু এবং এ হাদীস বিরোধ হয়ে যাওয়ায় উভয় হাদীসের সমাধান দিতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক বর্ণিত

প্রথম হাদীস : يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ-কে মোস্তাহাব অর্থে ধরে নেওয়া হবে। যাতে উভয় হাদীসের সমাধান হয়ে যায়। বিরোধ না থাকে। ইমাম মালিক (র.)-এর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস : يَا أَبُؤ سَائِدٍ خُذِرَى (রা.) থেকে বর্ণিত الْفَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ এখানে واجب অর্থ متاكداً দ্বারা জুমার দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বুঝা যায়, ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় জবাব : হাদীসে উজুবকে রহিত বলে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগে জুমু'আর দিন গোসল বরা ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়। নসখ হওয়ার দলিল হযরত ইকরিমা (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম আবু দাউদ (র.) তাঁর কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

হাদীসটি হলো এই যে—

إِنَّ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْعَرَاءِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَى الْفَسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّهُ ظُهُورٌ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَرَجٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْفَسْلَ كَانَ النَّاسُ مِنْهُمْ وَبَنَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَارِبَ السَّفِينِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيضٌ - فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرَى النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ حَتَّى أَذَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا رَجَعَ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ أَحْذَكُمْ مِثْلَ مَا يَجِدُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَ قَالَ أَبُو عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَاسْتَوَا غَيْرَ الصُّوفِ وَكَفُّوا الْعَمَلَ وَوَسَّحَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِينَ كَانَ يَزِدُّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ -

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, ইরাকের কিছু লোক বলল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমু'আর দিন গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, না, তবে যে ব্যক্তি গোসল করবে তা তার জন্য উত্তম। আর কেউ যদি গোসল না করে, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। গোসলের সূচনা কিভাবে হলো তা আমি আপনাদেরকে সবিস্তার বর্ণনা। ঘটনা ছিল হলো, (তৎকালীন যুগে) লোন্টেরা খুব মেহনত করতো, পশমি কাপড় পরিধান করতো, তাদের মসজিদের

ছাদ ঝুপড়ির মতো একেবারেই নিচু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন গরমের দিনে তাশরীফ আনলেন। লোকেরা পশমি কাপড় পরিহিত থাকায় ঘর্মাক্ত ছিল। এমনকি তাদের থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। যা অপরজনকে কষ্ট দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থা দেখে ঘোষণা দিলেন হে লোক সকল! এ (জুমার) দিন আসবে, তখন তোমরা গোসল করে এবং তৈল ও খুশবু ব্যবহার করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা ভালো করে দিলেন, লোকেরা পশমি কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড় ব্যবহার করতে লাগল এবং কাম কাজ বন্ধ করে দিল। মসজিদগুলোও প্রশস্ত হয়ে গেল। এবং ঘামের কারণে তারা যে একে অপরকে কষ্ট দিত তাও দূর হয়ে গেল। (তখন গোসলের উজ্জ্বল হুকুম নানিস্থ হয়ে যায়।) পুরো হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, ইসলামের প্রথম যুগে জুমার দিনের গোসল ওয়াজিব ছিল পরবর্তীতে তা মানসূহ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জুমার দিনের গোসল, জুমার দিনের কারণে সুন্নত নাকি জুমার নামাজের কারণে সুন্নত। এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, জুমার দিনের গোসলের ফজিলত “দিন” অর্থাৎ জুমার দিনের কারণে, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ** জুমার দিন সকল দিনের সরদার। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, গোসলের ফজিলত জুমার নামাজের কারণে; মোহা আলী কারী (র.)-এর মতে এ মতই বিতর্ক। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ**—(বুখারী ও মুসলিম) তোমাদের মধ্যে যে জুমা পাবে সে যেন জুমার নামাজের জন্য গোসল করে। এমনিভাবে জুমার দিনের জুমার নামাজের ফজিলত রয়েছে। জুমার দিনের সরদারী জুমার নামাজের কারণেই। এছাড়া তাহারাতের সম্পর্ক নামাজের সাথে দিনের সাথে বা সময়ের সাথে নয়। এ কারণেও গোসলের ফজিলত নামাজের জন্য হওয়া চাই, জুমার দিনের জন্য নয়। হাসান ইবনে যিয়াদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মধ্যকার ইখতিলাফের ফল এভাবে প্রকাশ পাবে যে, এক ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করেছে। পরে তার অজু চলে গেছে। সে অজু করে জুমার নামাজ আদায় করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার সুন্নত গোসল আদায় হয়নি। হাসান ইবনে যিয়াদের মতে আদায় হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দু' ঈদও জুমার মতোই। কেননা উভয় ঈদেই অনেক লোক সমাগম হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতেও গোসল মোস্তাহাব। দু' ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা হাদীস দ্বারা সাবিত।

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْغَيْدَيْنِ** রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের দিনে গোসল করতেন। আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে হজের অধ্যায়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোদ্দা কথা, এগার ধরনের গোসল রয়েছে, তন্মধ্যে পাঁচটি হলো ফরজ। এক. বীরখ্বলনের কারণে, দুই. দুই খতনা স্থান একত্রিত হওয়ার কারণে, তিন. স্বপ্নদোষের কারণে, চার. ঋতুস্রাবের কারণে, পাঁচ. নিফাসের কারণে।

চারটি হলো সুন্নত। এক. জুমার দিনের গোসল, দুই. আরাফার দিনের গোসল, তিন. দুই ঈদের গোসল, চার. ইহরামের জন্য গোসল।

একটি হলো ওয়াজিব; যেমন— মাওয়েতকে গোসল দেওয়া। একটি হলো মোস্তাহাব; যেমন— কোনো কাফির যখন মুসলমান হয়, আর জুনুবী না হয়। তখন তার গোসল করা মোস্তাহাব।

قَالَ وَلَيْسَ فِي الْمَذِي وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ  
 فَحْلٍ يُمَذَّى وَفِيهِ الْوُضُوءُ وَالْوَدْيُ الْغَلِيظُ مِنَ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ خُرُوجًا  
 فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ وَالْمَنَى حَائِثٌ أَبْيَضُ يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ  
 إِلَى الْبَيَاضِ يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَالتَّفْسِيرُ مَا ثَوَّرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, মযী ও ওদী বের হলে তাতে গোসল ওয়াজিব নয়, তবে অজু ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল মানুষেরই মযী নির্গত হয়। আর তাতে অজু আবশ্যক। (আবু দাউদ, মুসনায়ে আহমদ) ودی হলো পেশাবের পর নির্গত অপেক্ষাকৃত গাঢ় তরল পদার্থ। তাই তা পেশাবের হুকুমের মধ্যেই গণ্য হবে। মনী হচ্ছে, সাদা আঠাল পদার্থ, যার স্বলন পুরুষঙ্গকে নিতেজ করে দেয়। মذى হলো সাদাটে তরল পদার্থ যা স্ত্রীকে আদর আহ্লাদ করার সময় নির্গত হয়। এ ব্যাখ্যা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মযী, ও ওদী বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে না, তবে অজু ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন فِيهِ الْوُضُوءُ كُلُّ فَحْلٍ يُمَذَّى وَفِيهِ الْوُضُوءُ প্রত্যেক পুরুষেরই মযী বের হয় এবং তাতে অজু করা জরুরি।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, যখন মযী ও ওদী দ্বারা অজু ওয়াজিব হয়, কিন্তু গোসল ওয়াজিব হয় না তবে তা এ দু'টোকে : فَضْلٌ فِي الْغُسْلِ -এর মধ্যে উল্লেখ করা দরকার ছিল, فَضْلٌ فِي الْوُضُوءِ -এর মধ্যে নয়?

এর জবাব হচ্ছে, এ দুটি যেহেতু مَنِ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই এগুলোকে الْغُسْلُ -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উত্তম জবাব হলো এই যে, এগুলোকে এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো ইমাম আহমদ (র.)-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করা। কেননা ইমাম আহমদ (র.) এগুলোর কারণে গোসলকে ওয়াজিব বলেন।

আরেকটি প্রশ্ন হলো, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে السَّبِيلَيْنِ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ অজু উদ্ভাবনী ودی ও মذى তা সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে ভিন্নভাবে এগুলোকে কেন বয়ান করা হলো? জাবাব হচ্ছে, এগুলোর ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে ইমাম মালিক (র.) এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কেননা ইমাম মালিক (রা.) এগুলোর বের হওয়া কারণে অজু আবশ্যক বলেন না।

আরেকটি প্রশ্ন, ودی বের হওয়া দ্বারা অজু করা কিভাবে বুঝে আসবে? কেননা ودی তা পেশাবের পর বের হয়। সুতরাং অজু তা ওদীর পূর্বেই পেশাবের কারণে ওয়াজিব হয়ে গেছে, এ ক্ষেত্রে ওদীর কোনো দখল নেই? জবাব হলো, উপরোক্ত অবস্থার সুরত হচ্ছে হলো, এক ব্যক্তি পেশাব করেছে তারপর অজু করেছে; তারপর তার ওদী বের হলো। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির ওপর অজু করা ওয়াজিব হবে।



আল্লুরের কান্দি থেকে যে পানি নিজে নিজে বের হয় তার দ্বারা অজু জায়েজ। এ মাসআলাটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর  
 جوامع গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুদুরীতেও এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।—(ফাত্‌হুল কাদীর)

وَلَا يَجُوزُ بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبِيعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرَبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ  
الزَّوْدِ وَمَاءِ الْبَاقِلِيِّ وَالْمَرْقِ وَمَاءِ الزَّرْدِجِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِمَاءِ  
الْبَاقِلِيِّ مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبِيعِ فَإِنْ تَغَيَّرَ يَذُونِ الطَّبِيعِ يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ -

অনুবাদ : এমন পানি দ্বারা (পবিত্রতা অর্জন) জায়েজ নয়, যাতে অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দিয়েছে। যেমন- শরবত, সিরকা, গোলাব জল, সবজির পানি, গুরুয়ার পানি, লোশ্র (গাজর) ভিজিয়ে রাখা পানি। কেননা এগুলোকে সাধারণ পানি مطلق বলা হয় না। সবজির পানির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা জ্বাল দেওয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর যদি বিনা জ্বালে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি পানির সাথে অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দেয় (আর পানির প্রকৃত গুণ হলো বর্ণ, স্বাদ এবং গন্ধ) তবে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। যেমন- সিরকা, গোলাবজল, সবজির পানি, গুরুয়ার পানি, লোশ্র ভিজিয়ে রাখা পানি ইত্যাদি।

ইবনুল হুমাম (র.) লিখেছেন যে, যদি اشربه দ্বারা বৃক্ষের নির্গত পানি, যেমন- আশ্বরের শরবত, আনারসের শরবত, আর সিরকা দ্বারা খালিস সিরকা মুরাদ হয় তবে এই উভয় প্রকারের পানি বৃক্ষ ও ফলের নিংড়ানো পানির ন্যায় হবে। সবজির পানি, গুরুয়ার পানি ঐ পানির ন্যায় হবে, যার উপর অন্য কোনো বস্তু প্রভাব বিস্তার করেছে। বস্তুত মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত ইবারতে لف نشر مرتب হবে। অর্থাৎ يَمَّا اُعْتَصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالْتَمَرِ-এর উদাহরণ আগে হবে আর يَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ-এর উদাহরণ পরে হবে। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে النَّهَارَ وَاللَّيْلَ لَكُمْ الْبَيْتُ وَالنَّهَارَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَيَمَّا اُعْتَصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالْتَمَرِ তিনি তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ স্বত্বান করতে পারো। — (২৮ - কাাসা - ৭৩)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় لف نشر مرتب হয়েছে। আর যদি اشربه দ্বারা মিষ্টান্ন মিলানো পানি যেমন- শীরা বা মধু মিলানো পানি, আর সিরকা দ্বারা পানি মিশ্রিত সিরকা মুরাদ হয়, এমতাবস্থায় এ সকল পানি, অন্য বস্তুর প্রভাব বিস্তার ওয়াল পানির ন্যায় হবে।

উপরোক্ত পানি দ্বারা অজু জায়েজ না হওয়ার দলিল হলো— এ সকল পানিকে সাধারণ পানি বলা হয় না। অর্থাৎ 'পানি' শব্দ দ্বারা ঐ সকল পানির দিকে মন ধাবিত হয় না। যেমন- কোনো ব্যক্তি বলল, আমি পানি পান করিনি অথচ সে সবজির পানি বা গুরুয়া পান করেছিল এতে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হেদায়া প্রণেতা বলেন, সবজির পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা মরিচ ইত্যাদি দ্বারা জ্বাল দেওয়া হয় আর তাতে পানি পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে এগুলো দ্বারা অজু জায়েজ নয়। আর যদি বিনা জ্বালে পরিবর্তন হয়, তবে অজু জায়েজ।



وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالِطُهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيْرُ أَحَدٍ أَوْ صَافٍ كَمَاءِ الْمَدَرِ وَالْمَاءِ  
الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ الرَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ أَوْ الْأَشْنَانُ قَالَ أَجْرَى فِي الْمُخْتَصِرِ مَاءُ الزَّرْدِجِ  
مَجْرَى الْمَرْقِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الرَّعْفَرَانِ هُوَ الصَّحِيحُ  
كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِقِيُّ وَالْإِمَامُ السَّرْحِيسِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِمَاءِ  
الرَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ لَا يَرَى أَنَّهُ يُقَالُ مَاءُ  
الرَّعْفَرَانِ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَخْلُو عَنْهَا عَادَةً وَلَنَا إِسْمُ الْمَاءِ بَاءً عَلَى  
الْإِطْلَاقِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ إِسْمٌ عَلَى حِدَةٍ وَاضْفَأْتُهُ إِلَى الرَّعْفَرَانِ كِإِضَافَتِهِ إِلَى  
السَّيْرِ وَالْعَيْنِ وَلِأَنَّ الْخُلْطَ الْقَلِيلَ لَا يَغْتَبَرُ بِهِ لِعَدَمِ امْكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا فِي  
أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَيُغْتَبَرُ الْغَالِبُ وَالْغَلْبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا يَتَغَيَّرُ اللَّوْنُ هُوَ الصَّحِيحُ -

**অনুবাদ :** যে পানির সাথে কোনো পাক জিনিস মিশ্রিত হয় আর তা পানির (তিনটি গুণের) কোনো একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ। যেমন- বন্যার ঘোলা পানি এবং জাফরান, সাবান ও উশনান মিশ্রিত পানি।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদুরীতে লেখা ভিজিয়ে রাখা পানিকে ঝোলের পর্যায়ে ধরা হয়েছে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মতে তা জাফরান মিশ্রিত পানির সমপর্যায়ের, এ মতটিই বিশুদ্ধ। নাতিফী ও ইমাম সারখসী (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাফরান এবং এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয়, তা দ্বারা অজ্ঞ জায়েজ নয়। কেননা এটা সাধারণ পানি নয়। তুমি লক্ষ্য করছ না যে, তাকে (শুধু পানি না বলে) জাফরানের পানি বলা হয়। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না। আমাদের যুক্তি হলো, এ ক্ষেত্রে পানি নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ণ আছে। এর জন্য তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোনো নাম যুক্ত হয়নি। জাফরানের দিকে সন্ধান করে (জাফরানের পানি বলা) মূলত কুয়া ও ঝরনার দিকে সন্ধান করার মতো। তা ছাড়া সামান্য মিশ্রণ পরিহার করা সম্ভব নয় বিধায় ধর্তব্যও নয়, যেমন মাটি পদার্থের ক্ষেত্রে। সুতরাং প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। আর প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত অজ্ঞা পরিমাণ দ্বারা, রং এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি পানির সাথে কোনো পাক জিনিস মিশ্রিত হয় এবং তা পানির তিনটি গুণের (বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ) কোনো একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে সে পানি দ্বারা অজ্ঞ করা জায়েজ, যেমন- বন্যার ঘোলা পানি, জাফরান সাবান বা উশনান মিশ্রিত পানি, উশনান এক ধরনের লবণাক্ত ঘাস যা সাবানের ন্যায় কাপড়ের ময়লা দূর করে।

কুদূরী কিতাবে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পানির দুই বা তিনটি গুণে পরিবর্তন এসে যায় তবে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। নিহায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অজু জায়েজ। এমনকি হেমন্ত কালে যখন কূপের মধ্যে বৃষ্কের পাতা পড়ে পানির সব গুণ পরিবর্তন করে দেয় তখনও মাশায়খগণ উক্ত পানি দ্বারা অজু জায়েজ বলেন। বুখা গেল সব গুণ পরিবর্তন হয়ে গেলেও অজু জায়েজ। শরহে তাহাবীতেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তবে শর্ত হলো পানির তরলতা অবশিষ্ট থাকতে হবে। যদি কোনো জিনিস মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানি গাঢ় হয়ে যায় তবে তাদের নিকটও অজু জায়েজ হবে না।

আল্লামা ইবনুল হুমায় (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন, ফকীহ আহমদ ইবনে ইবরাহীম মায়দানী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অধিক পাতা পড়ার কারণে যদি পানির বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়, এবং হাতে পানি উঠলে পাতার বর্ণ দেখা যায়, তবে এর কী হুকুম? উত্তরে তিনি বলেন, এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। তবে এ পানি পান করা বা অন্য কোনো জিনিস খোয়া জায়েজ। কেননা এ পানি পাক। অজু না জায়েজ হওয়ার কারণ হলো— পানিতে পাতার বর্ণ প্রবল হওয়ায় এ পানি مفید مایه‌م যেন সবজির পানি-এর ন্যায় হয়ে গেছে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এ ধরনের পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়।

এ স্থানে মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারতের উপর একটি প্রশ্ন হয়, পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী لَا مَا غَيْرَ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ -এর বাণী اَوْ لَوْنِهِ দ্বারা বুঝা যায় পানির একটি গুণ পরিবর্তন হলেও তার দ্বারা অজু জায়েজ নয়। অথচ কুদূরী গ্রন্থকার জায়েজ বলেছেন? উত্তর হলো, হাদীসে বর্ণিত ۞ نَجَسٌ ۞ দ্বারা ۞ نَجَسٌ ۞ অর্থাৎ ۞ نَجَسٌ ۞ আর এই হাদীস ۞ جَارٍ ۞ -এর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখন হাদীসের মূল অর্থ হবে জারি পানি পাক, কোনো নাপাক জিনিস তাকে নাপাক করতে পারবে না। তবে যদি তার বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন তা ব্যবহার করা জায়েজ নেই। কারণ উপরোক্ত গুণ গুলো নাপাকরই ইঙ্গিত বহন করে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদূরী তাঁর মুখতাসারুল কুদূরীতে গাজরের পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরেছেন অর্থাৎ উভয়টি দ্বারা অজু নাজায়েজ। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) গাজরের পানিকে জাফরান মিশ্রিত পানির ন্যায় বলেছেন অর্থাৎ পানির একটি গুণ চলে গেলেও উভয়টি দ্বারা অজু জায়েজ। ইমাম নাতিফী ও ইমাম সারখসী (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাফরান এবং এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয় তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা ۞ مفید مایه‌م তাই তো এই পানিকে জাফরানের পানি বলা হয়। ইয়াফত যেহেতু نغید -কে চায়, তাই বৃষ্কের পানি, ফলের রস এবং গোলাব জলের ন্যায় জাফরানের পানিও ۞ مفید مایه‌م হবে, ۞ مطلق مایه‌م নয়। আর ۞ مایه‌م ۞ ۞ تَبَيَّنُوا ۞ না থাকলে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী ۞ نَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ۞ অর্থাৎ ۞ مطلق مایه‌م ۞ না পেলে তায়াম্মুম করো। বুখা গেল জাফরানের পানি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম জায়েজ। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না। তাই মাটি জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা ۞ مطلق مایه‌ম ۞ -এর কোনো অসুবিধা হয় না। মোদাকথা, পানি মাটি জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা ۞ مطلق مایه‌ম ۞ হিসাবেই থাকে, তা দ্বারা অজু জায়েজ, আর মাটি জাতীয় নয় এমন পদার্থের মিশ্রণ দ্বারা পানি ۞ مفید مایه‌ম ۞ হয়ে যায় তাই এর দ্বারা অজু জায়েজ নয়। আমাদের (হানাফীদের) ১ম যুক্তি হলো— পানি নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ণ আছে, তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোনো নাম যুক্ত হয়নি। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে যেমন জাফরানের পানি এখানে তো নতুন নাম যুক্ত হয়েছে? তবে তার জবাব এই যে, জাফরানের পানি বলা এমন যেমন বলা হয় কূপের পানি, ঝরনার পানি, অথচ এগুলো ۞ مطلق مایه‌ম ۞, তদ্রূপ জাফরানের পানিও ۞ مطلق مایه‌ম ۞। পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, এমন তো সবজি বা ঝোলের পানিও। তবে তো এগুলো দ্বারা কি অজু জায়েজ? আপনারা তো নাজায়েজ বলেন? জবাব হলো— নিশ্চয় সবজির দ্বারা নতুন নাম আসেনি তবে সবজি মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত হয়ে গেছে, তাই এই পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। সুতরাং জাফরানও যদি পানিতে এ পরিমাণ মিশ্রিত হয় যার দ্বারা পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত হয়ে যায় তবে তা দ্বারাও অজু নাজায়েজ হবে।

আমাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো— সামান্য জিনিসের মিশ্রণ পরিহার করা অসম্ভব, তাই তা ধর্ষব্যও নয়। যেমন— মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। তাই প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। প্রণিধান যোগ্য যে, প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত পরিমাণ দ্বারা, রংয়ের পরিবর্তন দ্বারা নয়। আর এটাই হলো বিতদ্বতম অভিমত।

وَأَن تَغَيَّرَ بِالطَّبِخِ بَعْدَمَا خُلِطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ  
مَعْنَى الْمُنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا إِذَا طُبِخَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النِّظَافَةِ  
كَالْأَشْنَانِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الَّذِي أُغْلِيَ بِالسِّدْرِ بِذَلِكَ وَرَدَّتِ السُّنَّةُ  
إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ فَيَصِيرُ كَالسَّوْنِقِ الْمَخْلُوطِ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ -

**অনুবাদ :** মিশ্রণের পর যদি জ্বাল দেওয়ার দ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় তবে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা তা আসমান থেকে বর্ষিত পানির স্বভাবে নেই। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেওয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ উদ্দেশ্য হয় যেমন উশনান বা এই জাতীয় কিছু তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা মাইয়েতকে বরই পাতার জ্বাল দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়। হাদীসেও তা বর্ণিত আছে। তবে যদি তা পানির উপর প্রবল হয়ে ছাতু (মিশ্রিত পানির) মতো হয়ে যায়। (তাহলে জায়েজ হবে না) কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি পানিতে কোনো জিনিস মিশ্রিত করে জ্বাল দেওয়া হয় তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। তবে যদি নিরেট পানি জ্বাল দেওয়া হয় আর এর দ্বারা পানি পরিবর্তন হয়ে যায় তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা জ্বাল দেওয়া মিশ্রিত পানি আসমান থেকে বর্ষিত পানির মতো নয়। তাই তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেওয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ উদ্দেশ্য হয় যেমন উশনান ইত্যাদি, তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা মাইয়েতকে বরই পাতা দ্বারা জোশ দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়, আর হাদীসেও তা বর্ণিত আছে।

শরহে নেকায়ার গ্রন্থকার বলেন, বুখারী ও মুসলিমে শুধু আছে إَغْلَوْا بِمَاءِ السِّدْرِ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও, কিন্তু তা দ্বারা জ্বাল দেওয়ার কথা বুখায় না, যেমনটি হেদায়ী গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। আদ্বাহই উত্তম জানেন। (ফাতহুল কাদীর) এর জবাবে বলা হয়, বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল দেওয়া তখনই সম্ভব যখন পানি ও পাতা পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যায়, আর এই মিশ্রণ জ্বাল দেওয়া ব্যতীত সম্ভব নয় এ জন্য হেদায়ী গ্রন্থকার بِالسِّدْرِ إَغْلَوْا বলেছেন। আর হাদীসের উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। তবে হ্যাঁ অধিক পরিষ্করণের জন্য যে জিনিস পানিতে জ্বাল দেওয়া হয় তা পানির উপর প্রবল না হওয়া চাই। যদি প্রবল হয়ে যায় তবে অজু জায়েজ হবে না। যেমন- পানিতে ছাতু মিলিয়ে জ্বাল দেওয়া হলে তা দ্বারা অজু জায়েজ নয়। কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা 'বুযা'আ নামক কৃপ সম্পর্কিত। তার পানি ছিল প্রবাহিত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে ইমাম আবু দাউদ (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা -এর অর্থ নাপাকি বহন করার ব্যাপারে দুর্বল। (অর্থাৎ নাপাক হয়ে যাবে।)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবারতে ‘পানি’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্থির পানি এবং ঐ পানি যা প্রবাহিত নয় এবং প্রবাহিত পানির হুকুমও নয়। হেদায়ার কোনো কোনো ছাপায় **قِيلَا كَانْ أَوْ كَيْفَرًا** আবার কোনো কোনো ছাপায় **قِيلَا كَاتِ النَّجَاسَةِ أَوْ كَيْفَرًا** বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ছাপার ভিত্তিতে ইবারতের ব্যাখ্যা হলো, قليل و كثير শব্দ দু'টো فاعিল-এর ওয়নে فاعل -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে قِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ থেকে উহা থাকার ক্ষেত্রে فِعْلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ -এর সাথে تشبيه علامت قريب থেকে قُرْبُ الْمَوْتِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ -এর মধ্যে اقرب থেকে علامت قريب করা হয়েছে। এখন صور مسئله হবে প্রত্যেক নাপাকি মিশ্রিত পানি দ্বারা অজু জাজেজ নেই, নাপাকি কম বা বেশি হোক। قليل -এর قيد দ্বারা ইমাম মালিক (র.) বক্তব্য থেকে احتراز করা হয়েছে। কেননা তাঁর মতে অল্প নাপাকি পানিকে, নাপাক করে না যতক্ষণ পানির তিন গুণের কোনো একটি পরিবর্তন না হয়।

দ্বিতীয় ছাপা অনুযায়ী **صورت مسئله** হবে, স্থির পানি কম হোক বা বেশি হোক যদি তাতে নাপাকি পড়ে তবে তা দ্বারা অজ্ঞ জায়েজ নয়। **قيل** পানি দ্বারা উদ্দেশ্য এ পরিমাণ পানি যা কেবল অজ্ঞ গোসলের জন্য যথেষ্ট।

সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বুখা'আর পানি দিয়ে অজু করব? অথচ তাতে হয়েযের কাপড়, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত জাতীয় জিনিস দিক্ষেপ করা হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি পবিত্র, কোনো কিছু তাকে নাপাক করতে পারে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) সুতরাং يَسْبِغُ بِمَاءٍ جَارِيٍّ -এর হাদীসে এর পানি جاری ماء -এর হকুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার দ্বারা অল্পপানি নাপাক না হওয়ার উপর দলিল দেওয়া জায়েজ হবে না। এ পর্যায়ে গ্রন্থকারের উপর প্রশ্ন জাগে যে, অধ্যায়ের শুরুতে উক্ত হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার উপর দলিল দিয়েছেন। আর এ স্থানে উক্ত হাদীসকে يَسْبِغُ بِمَاءٍ সম্পর্কিত বলেছেন, এখন طَهُورُ الْيَدَيْنِ যদি لا -এর জন্য হয় তখন উক্ত হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যায়, তবে يَسْبِغُ بِمَاءٍ -এর সাথে সম্পর্কিত বলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যি, لا يَدِمُ عَهْدَ رَاحِي -এর জন্য হয় তবে يَسْبِغُ بِمَاءٍ সম্পর্কিত বলা সहीহ হবে কিন্তু; সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া সहीহ হবে না। ইনশা'য় গ্রন্থকার আল্লামা আব্দাউদ্দীন আব্দুল আযীয (র.) -এর বরাতে দিয়ে এর জবাবে বলেন, طَهُورُ الْيَدَيْنِ -এর لا يَدِمُ -এর জন্য। কাজেই হাদীস দ্বারা সাধারণ পানি পাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া সहीহ। আর يَسْبِغُ بِمَاءٍ সম্পর্কিত বলাও বাতিল

তা ছাড়া হাদীসের মূল متن -এও اضطراب রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় قَلْبَيْنِ أَوْثَرًا কোনো কোনো বর্ণনায় أَرْبَعِينَ غَرِيًّا আবার কোনো বর্ণনায় دَلْرًا أَرْبَعِينَ রয়েছে। এমনভাবে দ্বিতীয় অংশ কোনো বর্ণনায় لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ কোনো বর্ণনায় لم ينجس কোনো বর্ণনায় تَمَّ يَنْجِسُهُ شَيْءٌ আবার কোনো বর্ণনায় تَمَّ يَنْجِسُهُ شَيْءٌ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, متن -এর মধ্যে اضطراب হওয়া ضعیف হওয়ার কারণ, رجال যতই মজবুত হোক না কেন, সর্বোপরি উপরোক্ত হাদীসের সনদেও اضطراب বিদ্যমান। فَلَ -এর অর্থও অস্পষ্টতা রয়েছে। কেননা فَلَا শব্দটি কখনো فَا ت মানুষের দেহের গঠন কখনো رأس পাহাড়ের চূড়া, কখনো লোটা, আবার কখনো মটকার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমনিভাবে لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ -এর অর্থ ইমাম শাফি'ঈ (র.) করেছেন যে, দুই মটকা পরিমাণ পানি হলে পানি নাপাক হয় না। এমনভাবে এ অর্থও মুদ্রাদ নেওয়া যেতে পারে যে, নাপাকি বরদাশ্ত করার ব্যাপারে দুর্বল অর্থাৎ নাপাক হয়ে যায়। মোদাকথা, উক্ত হাদীসে যেহেতু বহ اضطراب এবং বহ احتمال বিদ্যমান কাজেই এ হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না।

وَالْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَزَ الْوُضُوءُ بِهِ إِذَا لَمْ يَرْ لَهَا أَثَرَ لَا تَنْهَى لَا  
تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرِيَانِ الْمَاءِ وَالْأَثَرُ هُوَ الطَّعْمُ أَوْ الرَّائِحَةُ أَوْ اللَّوْنُ وَالْجَارِي مَا لَا يَتَكَرَّرُ  
اسْتِعْمَالُهُ وَقِيلَ مَا يَذْهَبُ بِتَبْنَةٍ وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ  
يَتَحَرَّكُ الطَّرَفُ الْآخِرُ إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَزَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ  
الْآخِرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِذَا أَثَرَ التَّحْرِيكَ فِي السَّرَائِيَةِ فَوْقَ أَثَرِ  
النِّجَاسَةِ ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ يَغْتَبِرُ التَّحْرِيكَ بِالْإِغْتِسَالِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي  
يُوسُفَ (رح) وَعَنْهُ بِالتَّحْرِيكَ بِالْيَدِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) بِالتَّوَضُّعِ وَجَهَ الْأَوَّلُ أَنَّ  
الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْحَبَاضِ أَشَدَّ مِنْهَا إِلَى التَّوَضُّعِ وَبَعْضُهُمْ قَدَرُوا بِالْمَسَاحَةِ عَشْرًا  
فِي عَشْرِ يَذْرَاعٍ الْكَرْبَاسِ تَوْسِيعَةً لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي  
الْعُمِّيِّ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَنْحَسِرُ بِالْإِغْتِرَافِ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ جَزَ  
الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْجِسُ مَوْضِعَ الْوُقُوعِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ  
(رح) أَنَّهُ لَا يَنْجِسُ إِلَّا يَظْهَرُ النِّجَاسَةُ فِيهِ كَالْمَاءِ الْجَارِي -

অনুবাদ : প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানি দ্বারা অজু জায়েজ। যদি তাতে নাজাসাতের কোনো আলামত দেখা না যায়। কেননা পানির প্রবাহের কারণে তা স্থির থাকে না। আর আলামত হলো স্বাদ গন্ধ বা বর্ণ। প্রবহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আসে না। কেউ কেউ বলেন, যা খড়কুটা ভাসিয়ে নেয়। এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি ভরসায়িত হয় না এমন বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাজাসাত পড়লে অপর পার্শ্বে অজু করা জায়েজ। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, এতে অপর পার্শ্বে নাজাসাত পৌছবে না। কারণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তরঙ্গের প্রভাব নাজাসাতের প্রভাবের চেয়ে বেশি। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের দ্বারা স্টু তরঙ্গ গ্রহণ করেন। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে হাত দিয়ে নাড়ার তরঙ্গ গ্রহণ করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তিনি অজু দ্বারা স্টু তরঙ্গ গ্রহণ করেন।

প্রথম মতের যুক্তি হলো — হাউজ ও পুকুরে অজুর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশি। কোনো কোনো ফকীহ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে দশ দশ হাত (চতুর্দিকে) হতে হবে। এর উপরই ফতোয়া। গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, তা এমন পরিমাণ হবে যে, অঞ্জলি ভরে পানি তোলায় সময় তলা জেগে উঠবে না। এটাই বিতর্ক মত। মূল কিতাবের এক কথা, অন্য পার্শ্বে অজু জায়েজ হবে, ইঙ্গিত করে যে, নাজাসাত পড়ার স্থান নাপাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উক্ত স্থানও নাপাক হবে না। যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়, যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়ে তবে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কিন্তু শর্ত হলো তাতে নাজাসাতের কোনো আলামত না থাকা চাই। নাজাসাত দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্যমান হোক। দলিল হলো, পানির প্রবাহের কারণে নাজাসাত স্থির থাকতে পারে না। তাই নাজাসাত পড়ার পরও প্রবহমান পানি পাক থাকে। নাজাসাতের আলামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ।

উল্লেখ্য যে, প্রবহমান পানির সংজ্ঞায় ফুকাহাগণের ইখতিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে আসে না। যেমন কেউ নালা থেকে পানি নিয়ে হাত ধোত করল, ধোত করা পানি নালায় পড়ল, দ্বিতীয় বার অতঃপর নালা থেকে পানি নেওয়া হলো তখন প্রথম পানি থেকে নেওয়া হলো না। কেননা প্রথম পানি প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে। কেউ বলেন, প্রবহমান পানি হলো যা শুষ্ক খড়কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তি প্রব্ধের দিক থেকে পানিভে হাত দিলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয় না সেটি পানি প্রবহমান পানি। কেউ কেউ বলেন, মানুষ যাকে جاری ماء বলে সেটিই প্রবহমান পানি।

وَالْفُؤَيْبَرُ الْمَظْمُومُ الْع. هَ: হানানী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি পানির এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলে যায় তবে তা অল্প পানি, আর যদি না মিলে তাহলে অধিক পানি। তবে কমবেশি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে। আর **مُتَقَدِّمِينَ حَنِيفِيَةً** বলেন, এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরঙ্গায়িত না হলে বড় পুকুর বা বেশি পানি; আর তরঙ্গায়িত হলে কম পানি। নাড়া দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানি উপর নিচ হওয়া। কেননা পানি বেশি হলে উঁচু হয়ে নড়ে বুকুরে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা অল্প পানি নাড়া দিলেও বুকুদ পয়দা হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মতে নাড়ার কারণ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, গোসালের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ কেউ যিৎ পুকুরের এক পার্শ্ব দিয়ে মাঝারি ধরনের গোসল করে আর এর দ্বারা দ্বিতীয় পার্শ্ব না নড়ে তবে এটা বড় পুকুর বলে বিবেচিত হবে। আর যদি অন্য পার্শ্ব নড়ে তবে এটা বড় পুকুর বলে গণ্য হবে না। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এরও অজ্ঞিত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে অন্য একটি বর্ণনা বর্ণনায়, তিনি হাত দিয়ে নাড়া দেওয়ার বিষয়টি **اعتبار** করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ ধর্তব্য হবে। প্রথম মতের যুক্তি হলো— হাউজ এবং পুকুরে অল্প তুলনায় গোসালের প্রয়োজনই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা অজ্ঞ সাধারণত ঘরেই করা হয় আর গোসল হাউজে করা হয়। এ জন্য গোসল দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ মুরাদ নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মতের যুক্তি হলো— হাত নাড়ার তরঙ্গ অজ্ঞ দ্বারাও হয় আবার হাত ধোয়ার দ্বারাও হয়, তবে হাত ধোয়ার দ্বারা যে তরঙ্গ হয় তা অন্যান্য নাড়ার তুলনায় হালকা। তাই জন সাধারণের জন্য সজ্ঞ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত মত গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয় মতের যুক্তি হলো, মাঝারি ধরনের নাড়াতে গ্রহণ করা হবে। আর মাঝারি ধরনের নাড়া হলে যা অজ্ঞ দ্বারা সৃষ্টি হয়। তাই এই মতকে গ্রহণ করা হয়েছে। **مُتَاَخَّرِينَ حَنِيفِيَةً** বলেন, এক পার্শ্বের পানি অন্য পার্শ্ব পৌঁছা নাড়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে জ্ঞানত হবে। তাই কোনো কোনো মুতায়াক্ষিবীনে হানানীফা বলেন, মাটির বর্ণের হিসাব হবে অর্থাৎ পুকুরের এক পার্শ্বে গোসল করায় পানিতে মাটির বর্ণ এসে গেছে আর এ বর্ণ যদি অন্য পার্শ্বে পৌঁছে যায় তাহলে **مَاءٌ** বিবেচিত হবে। আর যদি না পৌঁছে তবে **مَاءٌ كَثِيرٌ** হবে।

আবু হাফস কবীর (র.) থেকে বর্ণিত যে, এক ক্ষেত্রে রং এর বিষয়টি চর্চ্যব হবে। অর্থাৎ যদি পুরুতের এক পাশে জাফরান চলে দেওয়া হয়, আর অন্য পাশে তার রং পৌছে যায় তবে **فيل** .**ما** নড়ুবা **كثير** .**ما** বলে গণ্য হবে। আবু সুলাইমান জুযজানী (র.) পরিমাণের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে চতুর্দিকে দশ দান হাত হলে **كثير** .**ما** (ফিল) .**ما** হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দশ পানির হাউজ আমার এই কম হলে **فيل** .**ما** হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে আর যদি কম হয় তাহলে **فيل** .**ما** হবে। হাউজ মাপার পর কোনো সমাজদেৱ সমাপরিমাণ হয় তবে **كثير** .**ما** হবে আর যদি কম হয় তাহলে **فيل** .**ما** হবে। হাউজ মাপার পর কোনো

মাজাসের চতুর্দিক দিয়ে ইরাকের সীমানা চলেছে। মাজাসের নামের কারণ হলো এখানে বর্ণনায় বর্ণিতদিকে দশ দশ হাত ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, হাউজের ভিতরে আট আট হাত করে আর বাহিরে দশ দশ হাত ছিল। মোটকথা, মাশায়েষণ আবু সলাইমান জুজালানী (র.)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন। হেনায়া গ্রন্থকার বলেন, মাশুের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে মাপের দ্বারা পরিমাপ নির্ধারণকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো এই যে, পানি এমন পরিমাণ হতে হবে যাতে অঙ্গুলি তরে পানি তোলার সময় পানির তলা জেগে না উঠে। এটাই বিপুল অভিমত। কেউ কেউ বলেনছেন সর্বনিম্ন এক হাত হওয়া জরুরি। কেউ কেউ দুই হাত হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ফকীহ এক বিঘ হওয়াকে ধরে নিয়েছেন। দ্বিঘা গ্রন্থকার বলেন, কুদুরী কিতাবের এ কথা বড় পুরুরের অন্য পার্শ্বে অজু জায়েজ হবে ইংগিত করে যে, যে স্থানে নাজাসাত পড়ে তা নাপাক হয়ে যাবে। নাজাসাত দূর্যমান হোক বা অদূর্যমান হোক। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাজাসাত পড়ার সময়ও নাপাক হবে না, যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পাবে। যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।



قَالَ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يَنْجِسُهُ كَالْبَقِي وَالذَّبَابِ  
وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقْرِبِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحه) يُفْسِدُهُ لِأَنَّ التَّخْرِيمَ لَا يَطْرُقُ  
الْكِرَامَةَ أَيْ لِلنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ دُودِ النَّحْلِ وَسُوسِ الثَّمَارِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَلَنَا قَوْلُهُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكَلُهُ وَشَرِبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْمَجِيسَ اخْتِلَاطُ  
الدِّمِّ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ حَتَّى حَلَّ الْمَذْكُومِ لِإِنْعِدَامِ الدِّمِّ فِيهِ وَلِأَدَمَ فِيهَا  
وَالْحَرَمَةَ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالطِّينِ -

অনুবাদ : মশা, মাছি, ভিমরুল, বিষ্ণু ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, (এগুলোর মৃত্যু) পানিকে নষ্ট করে দেবে। কেননা সন্ধানার্থে না হয়ে অন্য কারণে যা হারাম'এ হুরমত নাজাসাতের আলামত। তবে মৌমাছি ও ফলের পোকার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, এ ধরনের পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা খাওয়া ও পান করা এবং তা দ্বারা অঙ্কুর করা জায়েজ। অথবা এ জন্যে যে, পশু মরার সময় তার প্রবাহিত নাপাক রক্ত পশুর শরীরের, اجزاء -এর সাথে মিশে যায়; এটিই মূলত এ মনসুস এ কারণেই জবাইকৃত পশু হালাল। কেননা তার থেকে রক্ত দূরীভূত হয়ে গেছে। আর এ সকল পশুর মধ্যে রক্তই নেই। (ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর জবাব হলো— হারাম হওয়ার জন্য নাজাসাত জরুরি নয়। যেমন মাটি হারাম অথচ তা নাজিস নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। যেমন— মশা, মাছি, ভিমরুল এবং বিষ্ণু ইত্যাদি। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এ সকল প্রাণীর মৃত্যুর দ্বারাও পানি নাপাক হয়ে যাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— এ সকল প্রাণী হারাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইবশাদ করেছেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

তোমাদের উপর মৃত্যুপ্রাপী হারাম করা হয়েছে। আর হারাম করা যদি সন্ধানার্থে না হয় তবে এটি নাজাসাতের আলামত। দ্বারা মানুষকে নাজাসাতের হুকুম থেকে খারিজ করা হয়েছে। কেননা মানুষ যদি জুনুবি না হয়ে পানিতে মারা যায় তবে এর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। কেননা মানুষকে হারাম করা হয়েছে তার সন্ধানের জন্য, নাজাসাতের জন্য নয়। যদি মৌমাছির বাচ্চা মধুতে মারা যায় অথবা ফলের পোকা ফলের মধ্যে মারা যায় এতে মধু ও ফল নাপাক হবে না। দলিল হলো, কিয়াস অনুযায়ী এ সকল জিনিসও নাপাক হয়ে যাওয়ার কথা তবে এগুলোতে মানবীয় চাহিদা বিদ্যমান থাকায় পাক বলা হয়েছে।

আমাদের প্রথম দলিল—

عَنْ سَلْمَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ إِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ يَمُوتُ فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَقَالَ هَذَا هُوَ الْحَلَالُ أَكَلُهُ وَشَرِبُهُ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ (الكفافية)



وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يَفْسِدُهُ كَمَا لَئْسَ بِكَ وَالْضَّفْدَعُ وَالسَّرَطَانُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحم) يَفْسِدُهُ إِلَّا السَّمَكُ لِمَا مَرَّ وَلَنَا أَنَّهُ مَاتَ فِي مَعْيِنِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَبَيْضَةِ حَالٍ مُخْهَا دَمًا وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا إِذَا الدَّمُ يُلَيِّسُ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَاءِ وَالْدَّمُ هُوَ النَّجَسُ وَفِي غَيْرِ الْمَاءِ قَبْلَ غَيْرِ السَّمَكِ يَفْسِدُهُ لِإِنْعِدَامِ الْمَعْيِنِ وَقِيلَ لَا يَفْسِدُهُ لِعَدَمِ الدَّمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْضَّفْدَعُ الْبَحْرِيُّ وَالْبَرِّيُّ سَوَاءٌ وَقِيلَ الْبَرِّيُّ يَفْسِدُ لِيُجُودَ الدَّمُ وَعَدَمِ الْمَعْيِنِ وَمَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ مَا يَكُونُ تَوَالِدَهُ وَمَثْوَاهُ فِي الْمَاءِ وَمَائِي الْمَعَايِشُ دُونَ مَائِي الْمَوْلِدِ مُفْسِدٌ -

অনুবাদ : মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি যা পানিতে থাকে, পানিতে এগুলোর মৃত্যু, পানি নষ্ট (নাপাক) করবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পূর্বোল্লিখিত যুক্তির আলোকে মাছ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দেবে। তার দলিল ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, এগুলো নিজ উৎপত্তিস্থলে মারা গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে নাজাসাতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে না। যেমন- ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও (তা নাপাক হয় না)। তা ছাড়া এগুলোর কোনো রক্ত নেই, কেননা রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করে না। আর রক্তই হলো নাজিস। পানি ছাড়া অন্য কিছুতে এগুলো মারা গেলে, কেউ বলেছেন মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু এ বস্তুকে নাপাক করে দেবে, সে সব গুলোর উৎপত্তিস্থল না হওয়ার কারণে। আবার কেউ বলেছেন তা নষ্ট করবে না রক্ত না থাকার কারণে। এ মতই বিতর্ক। জলজ ব্যাঙ এবং স্থল ব্যাঙ দুটির হুকুম সমান। আর কেউ কেউ বলেছেন, স্থল ব্যাঙ পানি নষ্ট করে দেবে, কেননা এতে রক্ত বিদ্যমান এবং যেহেতু তা উৎপত্তিস্থলে মারা যায়নি। জলজ প্রাণী দ্বারা সে সকল প্রাণীকে বুঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে। যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয় তা পানিকে নষ্ট করে দিবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পানিতে থাকে এমন প্রাণী পানিতে মারা গেলে এতে পানি নাপাক হবে না। পানি কম বা বেশি হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু মারা গেলে তাতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তার দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাহরীম যদি সম্মানার্থে না হয় তবে তা নাজিস হওয়ার আলামত। আর যেহেতু এ সকল জন্তু হারাম তাই পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ স্থানে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর উপর প্রশ্ন হলো—**كتاب الزنبان** এ বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যাঙ ও কাকড়া খাওয়া হালাল, সুতরাং উপরোক্ত দলিল যথার্থ নয়? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, **كتاب الزنبان** -তে বর্ণিত মতটি আসহাবে শাফি'ঈদের মত নয়। তারা উক্ত মতটি মানেন না। তাহা ইমাম নববী (র.) কর্তৃক ইমাম শাফি'ঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সকল জন্তু পানিতে বাস করে আর সেগুলো যদি খাওয়া যায় তবে সেগুলোর মৃত্যু দ্বারা পানি নাপাক হবে না। আর যদি খাওয়া না যায় যেমন— ব্যাঙ ইত্যাদি; এগুলো কম পানি অথবা কোনো প্রবাহিত জিনিসের মধ্যে মারা গেলে এতে সে পানি বা ঐ জিনিসটি নাপাক হয়ে যাবে। একই ব্যাখ্যা কাকড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি হারাম হওয়া প্রবল।

**আমাদের প্রথম দলিল :** জলজ প্রাণী যদি পানিতে মারা যায়, তবে তো সেগুলো নিজ উৎপত্তি স্থলেই মারা গেছে। এতে ঐ প্রাণী নিজ উৎপত্তিস্থলে থাকা অবস্থাই নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তবে এর উপর এ অবস্থায় নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। কেননা উৎপত্তিস্থলেই যদি একে নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় তবে কোনো মানুষই আর পাক হতে পারবে না। কেননা মানুষের শিরায় নাপাক রক্ত রয়েছে। তাই নাপাকী যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপত্তিস্থলে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে নাপাক বলা যাবে না। যেমন ডিমের কুসুম রঙে পরিবর্তিত হলেও উৎপত্তিস্থলে থাকা অবস্থায় একে নাপাক বলা যাবে না। এমনকি এ ধরনের ডিম পকেটে নিয়ে নামাজ পড়লেও নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নাপাক যদি তার উৎপত্তিস্থলে না থাকে বরং বের হয়ে যায় তখন তাকে নাপাকের হুকুম দেওয়া যাবে। সুতরাং শিশি ভরা রক্ত পকেটে নিয়ে যদি নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা শিশি নাপাকের উৎপত্তিস্থল নয়। মোদাকথা, জলজ প্রাণী পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না। কারণ এটা তার উৎপত্তিস্থল।

**আমাদের দ্বিতীয় দলিল :** মূলত প্রবাহিত রক্ত হলো নাপাক, আর রক্তের প্রকৃতি হলো গরম, পানির প্রকৃতি হলো ঠাণ্ডা, উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিরাজমান। তাই রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করতে পারে না। আর যেগুলো পানিতে বাস করে সে গুলোতে রক্ত নেই। তা ছাড়া রক্তের বর্ণ রোদ্রে কালো হয়ে যায়। আর জলজ প্রাণী থেকে যে জিনিস বের হয় তা রোদ্রে সাদা বর্ণ ধারণ করে। বুঝা গেল জলজ প্রাণীতে রক্ত নেই। তাই রক্ত না থাকায় এগুলো পানিতে মারা গেলে পানি নাপাক হবে না। পানি বেশি হোক বা কম হোক।

জলজ প্রাণী পানি ছাড়া অন্য কিছুতে মারা গেলে যেমন সিরকা, দুধ ইত্যাদি, এতে ইখতিলাফ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণী একে নাপাক করে দেবে। কেননা এগুলো উৎপত্তিস্থলে মরেনি। আবার কেউ কেউ বলেছেন নাপাক করবে না। কেননা এগুলোতে রক্ত নেই; অথচ রক্তই হলো নাজিস। হিদায়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর বলেছেন, জলজ ব্যাঙ বা স্থল ব্যাঙ উভয়টির হুকুম সমান। উভয়টি মরার দ্বারা পানি নাপাক হবে না। জলজ ব্যাঙ ও স্থল ব্যাঙ এর মধ্যে পার্থক্য হলো জলজ ব্যাঙের আঙ্গুলের মাঝখানে হাসের ন্যায় পাতলা চামড়া থাকে। স্থল ব্যাঙের মধ্যে এমনটি থাকে না। কোনো কোনো ফকীহ বলেন, স্থল ব্যাঙের পানিতে মারা যাওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। কেননা এগুলোতে রক্ত বিদ্যমান আছে।

জলজ প্রাণীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে প্রাণীর জন্ম ও বাস পানিতে তা জলজ প্রাণী, আর যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয় সেগুলোর মৃত্যু দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে।

قَالَ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِطَهْرِ الْإِمَالِكِ وَالشَّافِعِيُّ (رح) هَمَّا يَقُولَانِ إِنَّ الطَّهْرَ مَا يَطْهَرُ غَيْرُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالْقَطْعِ وَقَالَ زُفَرٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ (رح) إِنْ كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ مُتَوَضِّعًا فَهُوَ طَهُورٌ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرَ طَهُورٍ لِأَنَّ الْعَضْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً وَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا لِكُنْهٍ نَجَسٍ حُكْمًا وَبِاعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ نَجَسًا فَقُلْنَا بِإِنْتِفَاءِ الطَّهْورِيَّةِ وَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ عَمَلًا بِالشُّبْهَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ طَاهِرٌ غَيْرَ طَهُورٍ لِأَنَّ مِلَاقَةَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرِ لَا تُرْجِبُ التَّنَجِّسَ إِلَّا أَنَّهُ أَقْبَمَتْ بِهِ قُرْبَةً فَتَغَيَّرَتْ بِهِ صِفَتُهُ كِمَالِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُونُسَ (رح) هُوَ نَجَسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا تَهَ مَاءً أَزَلْتِ بِهِ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ فَيَعْتَبَرُ بِمَاءٍ أَزَلْتِ بِهِ النَّجَاسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ ثُمَّ فِي رَوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) نَجَاسَةٌ غَلِيظَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَقِيقِيَّةِ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي يُونُسَ (رح) عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ نَجَاسَةٌ خَفِيفَةٌ لِمَكَانِ الْإِخْتِلَافِ -

অনুবাদ ৪ ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ব্যবহৃত পানি হাদাস থেকে পবিত্রতা দান করে না। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, (কুরআনে বর্ণিত) طهر বলা হয় এমন জিনিসকে যা অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন قطع বলা হয় এমন জিনিসকে যা বারবার কর্তন করতে সক্ষম। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এবং এটা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও দ্বিতীয় অভিমত। পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি অজ্ঞ অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আবার তাহারাতি হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না। কেননা অঙ্গ মূলত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী সে অঙ্গ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ গুণের বিলুপ্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত যে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পারে না। তবে যেহেতু তা দ্বারা একটি ইবাদত আদায় করা হয়েছে সেহেতু তার গুণ পারিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন সাদাকার মাল।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এ পানি নাপাক। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। তাছাড়া এ পানি দ্বারা হুকমী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। সুতরাং তা ঐ পানির সমতুল্য হবে, যা দ্বারা হাকীকী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে ইমাম হাসান (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য ব্যবহৃত পানির সমতুল্য গণ্য করে এ পানিও নাজাসাতে গলীয়া (গুরু নাপাক) হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে সাকীফা (লঘু নাপাক) হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

(গ) তৃতীয় জবাব হলো— আমরা মেনে নিলাম যে, **فعل** -এর **وزن** - **مبالغه** -এর **صيغة** হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **طهور** - **لازم** - **طهر** لفظা **مشتق** হয়েছে, **طهر** থেকে নয়। এ হিসাবে **طهور** -এর অর্থ হবে খুব ভালভাবে পাক করা বারবার পাক নয়। মোট কথা **مبالغه** -এর **صيغة** যদি **لازم** **فعل** থেকে **مشتق** হয় তখন **مبالغه** **مشتق** **فعل** **متعدى** থেকে **مشتق** থাকে না। আর যদি **متعدى** **فعل** থেকে **مشتق** হয় যেমন **قطر** তখন **مفعول** -এর সাথেও সম্পর্ক থাকে। সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পানি ভালভাবে পাক প্রতীয়মান আসে কিন্তু বারবার পাক করা প্রতীয়মান হয় না।—(সেকায়া)

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, মুহাদিস ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত যদিও পাক কেননা বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো নাজাসাত নেই কিন্তু শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নাজিস। কেননা ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী মুহাদিস ব্যক্তির অঙ্গ করা ফরজ। তাই ব্যবহৃত পানি প্রথমটির হিসেবে পাক আর দ্বিতীয়টির হিসেবে নাপাক। প্রকৃতপক্ষে একটিকে ছেড়ে অপরটির উপর আমল করার তুলনায় উভয়টির উপরই আমল করাই উত্তম। তাই আমরা উভয় অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবহৃত পানিকে طَهَّرَ غَيْرَ مَطْهَرٍ তথা নিজে পবিত্র তবে অন্যকে পবিত্রকারী নয় বলেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল, অঙ্গুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাক, পানিও পাক, আর পাক জিনিস পাক জিনিস-এর সাথে মিলিত হওয়া নাপাক হওয়ার কারণ নয়। তবে যদি পানি নৈকট্য অর্জন বা ইবাদত আদায়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাতে পানির গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন সাদাকা ও যাকাতের মাল। কেননা মাল মূলগতভাবে পাক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পাক করবেন এবং পরিশোধিত করবেন — (৯, তাওবা - ১০৩)

যাকাত আদায়কৃত মালকে শরিয়ত ময়লা-আবর্জনা বলে আখ্যা দিয়েছে। তাই তো যাকাতের মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গকে দেওয়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে পানি যখন নৈকট্য অর্জন বা নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন নাজাসাতে হুকমিয়ার কারণে পানি ময়লা হয়ে যায় এবং তার মূলরূপে অবশিষ্ট থাকে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র তবে অন্যের পবিত্রকারী নয়, তা ছাড়া এ কথাটিও স্বতঃসিদ্ধ যে সাহাবায়ে কেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত পানির জন্য সর্বদা উদ্বীঘ্ন থাকতেন। নিজেদের শরীরে, মুখে মাখতেন। এখন পানি যদি নিজে নাপাক হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি করতে অবশ্যই বাধা করতেন, যেমন হযরত আবু তায়্যিবা (রা.) (শিক্ষা পাচারকারী)-কে তার শরীরের রক্ত পান করতে নিষেধ করেছেন। — (ইনায়া)

ব্যবহৃত পানি অন্যকে পবিত্র না করার এটাও দলিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেলাম অনেক সময় সফর করেছেন। সফরে তাদের পানির প্রয়োজন হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত পানি জমা করে রাখার আদেশ দেননি। বুঝা গেল যে, ব্যবহৃত পানি দ্বিতীয়বার পবিত্রকারী নয়। ব্যবহৃত পানি নাপাক হওয়ার উপর শায়খাইন (র.)-এর প্রথম দলিল হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থির পানিতে যেমনিভাবে নাজাসাতে হাকীকিয়া তথা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এমনিভাবে নাজাসাতে হুকমিয়া তথা গোসল করা থেকেও নিষেধ করেছেন। বুঝা গেল পেশাব যেমনিভাবে স্থির পানিকে নাপাক করে দেয় এমনিভাবে গোসলও নাপাক করে দেয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো— ব্যবহৃত পানি ঐ পানি যার দ্বারা নাজাসাতে হুকমিয়া দূর করা হয়েছে। সুতরাং এ পানিকে ঐ পানির সাথে কিয়াস করা হয়েছে যার দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা হয়েছে। আর যে পানি দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী দূর করা হয় তা নাপাক সুতরাং ব্যবহৃত পানিও নাপাক। মাওলানা আব্দুল হাই লাক্কৌতী (র.) বলেন, কোনো মুসাফির যদি চরম পিপাসার্ত হয় এবং তার কাছে পানিও থাকে তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। যদি অজুতে ব্যবহৃত পানি পাক হতো মুসাফিরের জন্য এ বিধান থাকতো যে, পানি দ্বারা অঙ্গ করবে আর ব্যবহৃত পানি পান করার জন্য জমা করবে। বুঝা গেল যে, এ পানি নাপাক। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গলীয়া হওয়ার উপর কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন, যে পানি নাজাসাতে হাকীকিয়া দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনিভাবে এ পানি নাজাসাতে গলীয়ার হুকুমে এমনিভাবে যে পানি নাজাসাতে হুকমিয়া দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে তাও নাজাসাতে গলীয়ার হুকুমে হবে। ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খাফীয়া হওয়ার উপর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) দলিল পেশ করেন যে, ব্যবহৃত পানি পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। আর ওলামাদের মতবিরোধ দ্বারা সহজ জিনিস বেরিয়ে আসে। তাই ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে খাফীয়া-এর হুকুমে হবে, নাজাসাতে গলীয়ার হুকুমে হবে না।

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتَعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ  
 قَالَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُونُسَ (رح) وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَيْضًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ  
 (رح) لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ بِاتِّحْقَالِ نَجَاسَةِ الْأَنَامِ  
 إِلَيْهِ وَإِنَّهَا تَزَالُ بِالْقُرْبَةِ وَأَبُو يُونُسَ (رح) يَقُولُ اسْقَاطُ الْفَرْضِ مُؤَيَّرٌ أَيْضًا فَيَثْبُتُ  
 الْفَسَادُ بِالْأَمْرَيْنِ -

**অনুবাদ :** ব্যবহৃত পানি অর্থ, যে পানি দ্বারা হাদাস দূর করা হয়েছে বা ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু ছওয়াব হাসিলের নিয়তে পানি ব্যবহার করলেই সেই পানি ব্যবহৃত গণ্য হবে। কেননা গুনাহের নাজাসাত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণেই পানি ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর গুনাহ দূর হয় ছওয়াবের নিয়ত দ্বারা। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, (পানির মধ্যে) ফরজ সাকিত করারও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং উভয় কারণেই (পানির) নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দ্বিতীয় বাহাছ তথা ব্যবহৃত পানির হাকীকত এবং সবব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খাইন (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হওয়ার দুটো সবব রয়েছে। (১) হাদাস দূর করার নিয়তে ব্যবহার করা, (২) নৈকট্য বা ছওয়াবের নিয়তে তা ব্যবহার করা। উভয়টি বা উভয়ের যে কোনো একটি পাওয়া গেলেই পানি ব্যবহৃত বলে পরিগণিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হওয়ার মাত্র একটি সবব তথা নৈকট্য হাসিলের নিয়তে তা ব্যবহার করা। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে সবব একটি তথা হাদাস দূর করার নিয়তে তা ব্যবহার করা। সুতরাং কোনো অজুহীন ব্যক্তি যদি নৈকট্যতা বা ছওয়াব -এর ইরাদায় অজু করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। আর যদি অজু ওয়ালা কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র ঠাণ্ডা হাসিলের জন্য অজু করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে না, যদি অজুহীন ব্যক্তি ঠাণ্ডা হাসিলের জন্য অজু করে তবে শায়খাইন ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এ কারণে যে, উপরোক্ত অবস্থায় নৈকট্য ও ছওয়াবের দ্বিগত ছিল না। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে এর কারণ হলো যে, নিয়ত ব্যতীত নাপাক দূর হয় না।

যদি কোনো বা-অজু ব্যক্তি নৈকট্য ও ছওয়াবের নিয়তে একবার অজু করার পর পুনরায় অজু করে তবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ব্যবহৃত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— গুনাহের নাজাসাত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে পানি ব্যবহৃত হয়। আর এ নাজাসাত শুধু নৈকট্য ও ছওয়াবের নিয়ত দ্বারাই দূর করা যায়। বুঝা গেল যে, পানি কুববত-এর নিয়ত ব্যতীত ব্যবহৃত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, পানির মধ্যে ফরজ সাকিত করারও প্রভাব রয়েছে। মোটকথা শায়খাইন (র.)-এর মতে পানির গুণাগুণ তখনই পরিবর্তিত বলে গণ্য হবে যখন নাজাসাতে হুকমিয়া স্থান থেকে পৃথক হয়ে পানির দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর নাজাসাতে হুকমিয়া উপরোক্ত উভয় অবস্থায়-ই পানির দিকে স্থানান্তরিত হয়। তাই উভয় অবস্থায়ই পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে।



وَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَمَا زَالَ عَنِ الْعُضْوِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا  
لِأَنَّ سُقُوطَ حُكْمِ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ بَعْدَهُ . وَالْجُنُبُ إِذَا  
انْغَمَسَ فِي الْيَمِّ لَطَلِبَ الدَّلْوَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحا) الرَّجُلُ يَحَالِمُ لِعَدَمِ الصَّبِّ وَهُوَ  
شَرْطٌ عِنْدَهُ لِإِسْقَاطِ الْفَرَضِ وَالْمَاءُ يَحَالِمُ لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحا) كِلَاهُمَا  
طَاهِرَانِ الرَّجُلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ وَالْمَاءُ لِعَدَمِ نَيْتَةِ الْقُرْبَةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا)  
كِلَاهُمَا نَجَسَانِ الْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْفَرَضِ عَنِ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمَلَقَةِ وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ الْخُذْنِ  
فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ  
طَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ .

অনুবাদ : কখন পানি ব্যবহৃত রূপে গণ্য হবে? বিশুদ্ধমত হলো— (ধৌত) অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। কেননা (পানি শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনের তাগিদে পানির উপর “ব্যবহৃত” হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় না। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সে প্রয়োজন আর বাকি নেই। জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি তালশ করার জন্য কূপের মধ্যে ডুব দেয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে জুনুবী-ই থেকে যাবে। কেননা সে তার গায়ে পানি ঢালেনি। অথচ এটি তাঁর মতে ফরজ গোসল আদায় হওয়ার জন্য শর্ত। আর পানিও পূর্ব অবস্থায় পাক থাকবে। কেননা উভয় কারণই এখানে অনুপস্থিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে (পানি ও মানুষ) উভয়ই পাক। লোকটি পবিত্র হয়ে গেল পানি ঢালার শর্ত না হওয়ার কারণে, আর পানি পবিত্র থাকল ছওয়াবের নিয়ত না থাকার কারণে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উভয়ই অপবিত্র। পানি এ কারণে অপবিত্র যে, (পানির সাথে) প্রথম সংস্পর্শের সাথে সাথেই শরীরের অংশ বিশেষ থেকে জানাবাত দূরীভূত করা হয়েছে। আর লোকটি অপবিত্র এজন্য যে, অবশিষ্ট অঙ্গে হাদাস বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর মতে লোক অপবিত্র থাকার কারণ হলো “ব্যবহৃত” পানি অপবিত্র হওয়া। তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো— লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা (শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পানির উপর “ব্যবহৃত” হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় না। তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা গুলোর মাঝে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তৃতীয় বাহাছ তথা ব্যবহৃত পানির সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হানাফী আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পানি যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের উপর বিরাজমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ব্যবহৃত এর হুকুম দেওয়া হয় না। তবে তা যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এখনো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

কোনো স্থান বা পাত্রে অবস্থান না করার পূর্ব মুহূর্ত এর হুকুম কি হবে সম্পর্কে ওলামাগণের মতবিরোধ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখ'ঈ এবং কোনো কোনো মাশায়েখে বলখ—এর মতে পানি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো স্থানে গিয়ে স্থির না হওয়া পর্যন্ত তা ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে না। ইমাম তাহাবী (র.)-ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হানফীগণের মাহাব হলো— পানি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তা ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হবে। কোনো স্থানে গিয়ে স্থির হওয়া ব্যবহৃত হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এমনকি পানি শরীর থেকে পৃথক হয়ে যদি কোনো কাপড়ে লেগে যায় তবে শাযখানৈনের মতে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে আহনাফ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি মাথা মাসাহ করতে ভুলে যায়। অতঃপর সে দাড়ির আর্দ্রতা দিয়ে মাথা মাসাহ করে এতে মাসাহ জায়েজ হবে না। দলিল হলো— শরীর থেকে পৃথক হওয়ার আগে পানিকে ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম জরুরতের কারণে দেওয়া হয়নি কিন্তু পৃথক হওয়ার পর কোনো জরুরত অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে শরীর থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই এর উপর ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত ইবারতে জুনুবী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যার শরীরে নাজাসাতে হাকীকী নেই। আর কূপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দশ বর্গগজ হাউজ থেকে কম হওয়া। এখন সুরতে মাসআলা হলো— কোন জুনুবী ব্যক্তি যদি ব্যলতি তালাশ করার জন্য অথবা শরীরকে ঠাণ্ডা করার জন্য কূপে ডুব দেয়। কিন্তু তার শরীরে পানি (ভালভাবে) না লাগে, এতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে লোকটি জুনুবী থেকে যাবে। আর পানি পূর্বের অবস্থায় পাক থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ব্যক্তি ও পানি উভয়ই পাক। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ব্যক্তি ও পানি উভয়ই নাপাক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— ফরজ আদায়ের জন্য শরীরের উপর পানি ঢেলে দেওয়া পূর্ব শর্ত; আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। এ জন্য জুনুবী ব্যক্তির ফরজ আদায় হয়নি, তাই ব্যক্তিটি জুনুবী-ই থেকে যাবে। আর পানি পাক থাকার কারণ হলো— ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুটি কারণ রয়েছে। (১) হাদাস দূর বা (২) নৈকট বা ছওয়াব লাভের আশায় পানি ব্যবহার করা। উপরোক্ত সুরতে উভয় কারণ না পাওয়া যাওয়ায় পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে না, তাই পানি পূর্বের ন্যায় পাক থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— ফরজ আদায়ের জন্য শরীরে পানি ঢেলে দেওয়া শর্ত নয়। তাই শুধু ডুব দ্বারা ই তার ফরজে জানাবাত সাকিত হয়ে যাবে বিধায় লোকটি পাক। আর পানি পাক হওয়ার কারণ হলো, লোকটি নৈকট বা ছওয়াব অর্জনের নিয়ত করেনি যা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— পানি নাপাক এ কারণে যে, জুনুবী ব্যক্তির কিছু অঙ্গ পানিতে মিলায় ঐ অঙ্গের ফরজ আদায় হয়ে গেছে, তার দরুন পানিও ব্যবহৃত হয়ে গেছে। যদিও সে নিয়ত করেনি। কেননা জানাবাতের ফরজ সাকিত হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। আর ব্যক্তি এ কারণে নাপাক যে, তার কিছু কিছু অঙ্গে হাদাস অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর এই অবশিষ্ট অঙ্গগুলো নাপাক পানি দ্বারা পাক হবে না। কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি নাপাক থাকার কারণ হলো— ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফরজ আদায়ের জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাই নিয়ত ছাড়াই তার ফরজ গোসল আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু পানি ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার কারণে তার শরীর নাপাক হয়ে গেছে। এ মত অনুযায়ী জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে; তবে নামাজ আদায় করতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফার (র.) একটি বর্ণনা হলো— ব্যক্তি পাক হয়ে গেছে। কেননা পানি শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং যখন ঐ ব্যক্তি পানি থেকে পৃথক হলো তখন পানি ব্যবহৃত বলে সাব্যস্ত হলো। এরপর তো সে পানিতে আর ডুব দেয়নি। তাই সে পাকই থেকে গেল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর উসুলের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখে, তাই এ বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।

قَالَ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغٌ فَقَدْ طَهَّرَ جَارَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخَنْزِيرِ  
وَالْأَدَمِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا إِهَابٍ دُبِغٌ فَقَدْ طَهَّرَ وَهُوَ يَعْْمُرُ بِهِ حُجَّةً عَلَى  
مَالِكٍ (رح) فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَلَا يَعَارِضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَهُوَ  
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَذْبُوحِ وَحُجَّةٌ عَلَى  
الشَّافِعِيِّ (رح) فِي جِلْدِ الْكَلْبِ وَلَيْسَ الْكَلْبُ نَجَسٌ الْعَيْنِ إِلَّا تَرَى أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ  
جَرَأَةً وَأَصْطِبَادًا بِخِلَافِ الْخَنْزِيرِ لِأَنَّهُ نَجَسٌ الْعَيْنِ إِذَا هَاءٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ  
رَجَسٌ مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِ لِقُرْبِهِ وَحُرْمَةِ الْإِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْأَدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ فَخَرَجَا عَمَّا  
رَوَيْنَاهُ ثُمَّ مَا يَمْنَعُ النَّتْنِ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دُبَاغٌ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا أَوْ تَنْزِيحًا لِأَنَّ  
الْمَقْصُودَ بِخَصْلِ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهِ ثُمَّ مَا يَطْهَرُ جِلْدُهُ بِالدُّبَاغِ يَطْهَرُ  
بِالذِّكَاةِ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الدُّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجَسَةِ وَكَذَلِكَ يَطْهَرُ لَحْمُهُ  
وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا —

অনুবাদ : শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত যে কোনো চামড়া দাবাগাত তথা পরিশোধন করা হলে তা পাক হয়ে যায়। তাতে সালাত আদায় করা এবং তা থেকে (তৈরি পাত্রের পানি দিয়ে) অঞ্জু করা জায়েজ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে কোনো চামড়া পরিশোধন করা হলে, তা পাক হয়ে যায়।

এ হাদীসটি তার অর্থ— ব্যাপকতার ভিত্তিতে মৃত পশুর চামড়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। আর মৃত পশুর চামড়া কাজে লাগানোর ব্যাপারে বর্ণিত নিষেধ বাণী, তোমরা দাবাগাত করে মৃত পশুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হবে না। কে উপরোক্তবিত্ত হাদীসের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা যে চামড়া দাবাগাত করা হয়নি, তাকেই ইহাব বলা হয়।

তদ্রূপ আলাচ্য হাদীস কুকুরের চামড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। কেননা কুকুর (শূকরের মতো) সত্তাগতভাবে নাপাক নয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, পাহারা দেওয়া ও শিকার করার ক্ষেত্রে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়? আর শূকর হলো সত্তাগতভাবেই নাপাক। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী فَإِنَّهُ رَجَسٌ (নিঃসন্দেহে তা নাজাসাত)-এর ۞ সর্বনামটি খَنْزِير -এর দিকে راجع হয়েছে। কেননা এ সর্বনামের নিকটবর্তী শব্দ এটিই। মানব দেহের কোনো অংশ দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম হওয়ার কারণ (নাপাকি নয় বরং) তার মর্যাদা ও কারামত। সুতরাং এ দুটি আমাদের বর্ণিত হাদীসের আওতার বাইরে। যে প্রক্রিয়া দুর্গন্ধ ও পচন রোধ করে, তাকেই দাবাগাত বা পরিশোধন করা বলে। চাই তা রোদে শুকিয়ে হোক বা মাটি মেখে হোক। কেননা মূল উদ্দেশ্য এতটুকুর দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্য শর্ত আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। যে চামড়া দাবাগাত করলে পাক হয়, তা জবাই করার মাধ্যমেও পাক হয়। কেননা জবাই দ্বারা অর্পিতা দূর করার ক্ষেত্রে দাবাগাত করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। এরূপ জবাই দ্বারা গোশতও পাক হয়ে যায়। এটাই বিতর্ক অতিমত। যদিও তা খাওয়া হালাল না হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِهَاب-এর হামযা যে-এর সাথে গঠিত হবে। বহুবচন رَافِيَةً وَ رَافِيَةً বিনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, দাবাগতের পর চামড়াটিকে اوم আর দাবাগতের পূর্বে اهاب বলা হয়। جلد শব্দটি উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইনায়্যা গ্রন্থকার লিখেছেন, চামড়ার দাবাগাত-এর সাথে তিনটি মাসআলার সম্পর্ক রয়েছে। এক, চামড়াটি পাক হওয়া, দুই চামড়া দ্বারা পোশাক বা জায়নামাজ বানানো, তিন, চামড়া দিয়ে মশক বানিয়ে তা দ্বারা অঙ্ক করা। প্রথম মাসআলাটির সম্পর্ক كِتَابُ الصَّبْرِ -এর সাথে, দ্বিতীয় মাসআলাটির সম্পর্ক كِتَابُ الصَّلَاةِ -এর সাথে (যা সে, দুই অধ্যায়ে আলোচিত হবে) আর তৃতীয় মাসআলাটির সম্পর্ক উপরোক্ত অধ্যায়ের সাথে যা এখানে আলোচিত হয়েছে।

কুদরী গ্রন্থকার وَالصَّلَاةُ فِيهِ বলেছেন, কিন্তু وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ বলেননি? যদিও উভয়টির হুকুম একই। কারণ হলো— পোশাক-এর পবিত্রতা مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ তথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যেমন আদ্বাহর বাণী وَيُطَهِّرُ وَ يُطَهِّرُكَ فَطَهِّرُ আর স্থান-এর পবিত্রতা এমনটি নয় বরং لَا لَكَ النَّصَّ দ্বারা সাবিত। এ জন্য কুদরী গ্রন্থকার فِيهِ وَالصَّلَاةُ বলেছেন।

ইবারতের মধ্যে শূকর-এর আলোচনা মানুষের পূর্বে করা হয়েছে। কারণ হলো, এখানে নাজাসাত-এর আলোচনা হয়েছে যা অপমান জনক আলোচনা। আর অপমান জাতীয় আলোচনার স্থানে বিলম্ব বা পরে আলোচনা করার মধ্যে তায়ীম নিহিত থাকে। যেমন : আদ্বাহর বাণী -لَهُمْ مَسَاجِدُ وَصَلَاتٌ وَمَسَاجِدُ -এর মধ্যে مساجد-এর আলোচনা পরে করা হয়েছে তায়ীমের উদ্দেশ্যে।

উপরে বর্ণিত ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো— আমাদের (হানাফীগণের) মতে শূকর আর মানুষের চামড়া ব্যতীত সকল চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। যে ধরনের জিনিস দ্বারা ই দাবাগাত করা হোক না কেন। তাতে সালাত আদায় করা বা তার মশকে পানি নিয়ে তা দ্বারা অঙ্ক করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, মৃতের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে কুকুরের চামড়াও দাবাগাত দ্বারা পাক হয় না। مبسوط নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ -এর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কিয়াস দ্বারা। অর্থাৎ যেমনিভাবে শূকরের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পাক হয় না এমনিভাবে কুকুরের চামড়াও পাক হবে না। অথবা مبسوط-এর বর্ণনা অনুযায়ী غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ -এর চামড়াও দাবাগাত করার দ্বারা পাক হবে না।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল নিম্নোক্ত হাদীস—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ يَسْأَلُ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ. (ابوداود . نسائي . ابن ماجه . ترمذی)

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকালের একমাস পূর্বে জুহাইনা গোত্রের নিকট তিন লিখলেন যে, তোমরা দাবাগতের পর মৃত পশুর চামড়া দ্বারা এবং তার রগ দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত হাদীস (إِهَابٍ) দ্বারা বুঝা গেল মৃতের চামড়া নাপাক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْهَابٌ دُبْعٌ فَقَدْ طَهَّرَ (الترمذی . الموطأ (۱) )

ইমাম মালিক . صحيح ابن حبان . مسند احمد

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোনো চামড়া দাবাগাত করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

বশো, জোমার প্রতি যে প্রত্যাশে হয়েছিল তাতে লোকের যা আহ্বার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, মরা, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এটা অবশ্যই নাপাক। (৬. আন'আম. ১৪৫) উক্ত আয়াতের মধ্যে **فانهم** -এর **ضمير** -এর **مرجع** দুটি হতে পারে (ক) **لحم** (খ) **خنزير**। তবে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে **خنزير**-এর দিকে ফিরানোই উত্তম। তখন **فانهم** -এর অর্থ হবে, শূকর নাজাস এবং নাপাক। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের মধ্যে **خنزير** শব্দটি **مضاف اليه** আর **مضاف** দ্বারা **غير مقصود** হয়ে থাকে। সুতরাং **ضمير**-এর **مرجع** **خنزير** হতে পারে না? এর জবাব হচ্ছে এই যে, **مضاف اليه** **مرجع** **ضمير**-এর হতে পারে, এতে কোনো বাধা নেই।



وَشَعَرَ الْمَيِّتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) نَجَسٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتَةِ وَلَنَا أَنَّهُ لَاحْيَوَةٌ فِيهِمَا وَلِهَذَا لَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحُلُّهُمَا الْمَوْتُ إِذَا الْمَوْتُ زَوَالَ الْحَيَوَةِ وَشَعَرَ الْإِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) نَجَسٌ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَنَا أَنَّ عَدَمَ الْإِنْتِفَاعِ وَالْبَيْعِ لِكِرَامَتِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةٍ -

অনুবাদ : মৃত পশুর পশম ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন নাপাক, কেননা এগুলো মৃত পশুরই অংশ। আমাদের দলিল হলো— তাতে প্রাণ নেই, এ জন্য এগুলো কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ দু'টোতে মৃত্যু প্রবেশ করে না। কেননা মৃত্যু অর্থ প্রাণের বিলোপ। মানুষের চুল ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন নাপাক, কেননা এর দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ নয় এবং তা বিক্রি করাও জায়েজ নয়। আমাদের দলিল হলো— তার ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। সুতরাং তা নাজাসাতের পরিচায়ক নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মৃত পশুর পশম ও হাড় পাক, অর্থাৎ যদি এগুলো পানিতে পড়ে তবে ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ। এমনভাবে মৃত পশুর পাছা, খুর, শিং, পর, নখ, ঠোঁট প্রভৃতির হুকুম এই একই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, এসব নাপাক। তার দলিল হলো, এগুলো মৃত পশুরই অংশ। আর মৃত পশুর সবকিছু নাপাক। আমাদের দলিল হলো— মৃত পশুর সমস্ত অঙ্গ নাপাক নয়। বরং শুধু ঐ সমস্ত অঙ্গ নাপাক যেগুলোর মধ্যে প্রাণ আছে। আর তা মউতের দ্বারা দূর হয়ে যায়। উপরোক্ত বস্ত্রগুলোর মধ্যে প্রাণ নেই। কেননা এগুলোর কোনোটাকে যদি কাটা হয় তখন পশুর কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। তাই প্রাণ না থাকায় এগুলোতে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না। অথচ মৃত্যু হলো প্রাণ বিলোপ করার নাম।

কুদুরী গ্রন্থকার দ্বিতীয় মাসআলা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মানুষের চুল ও হাড় পাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— মানুষের চুল ও হাড় উপকার লাভের যোগ্য নয় এবং এগুলো বিক্রি করাও জায়েজ নয়। বুখা গেল যে, উভয়টি নাপাক। আমাদের দলিল হলো— এগুলোর ব্যবহার বা বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা, যা সেগুলোর নাজাসাতের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া এ কথা সত্যসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাথার চুল হলক করে সাহাবায়ে কেরামগণের মাঝে বন্টন করেছেন। এগুলোও তো চুল পাক হওয়ার পরিচয় বহন করে।

**فَضْلٌ : فِي الْبَيْرِ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبَيْرِ نَجَاسَةٌ نَزَحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِاجْتِمَاعِ السَّلَفِ وَمَسَائِلِ الْبَيْرِ مُبْتَلِيَةً عَلَى اتِّبَاعِ الْأَثَرِ دُونَ الْقِيَاسِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَغْرِ الْأَيْلِ أَوْ الْغَنَمِ لَمْ تَفْسِدِ الْمَاءُ اسْتِخْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ تَفْسِدَهُ لِقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَجَهُ الْاسْتِخْسَانِ أَنَّ أَبَارَ الْفُلُوكِ لَيْسَتْ لَهَا رُدْسٌ حَاجِزَةٌ وَالْمَوَاشِي تَبْعُرُ حَوْلَهَا فَتُلْقِي فِيهَا الرِّيحَ فِيهَا فَجَعَلَ الْقَلِيلَ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ وَالْأَضْرُورَةِ فِي الْكَثِيرِ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرُ النَّاطِرُ الْيَوْمَ فِي الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ -**

### অনুচ্ছেদ ৪ কুয়ার বর্ণনা

• অনুবাদ : কূপে কোনো নাজাসাত পড়লে (যদি তা ১০ × ১০ হাতের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যমান পানি নিষ্কাশনই তার জন্য তাহারাতে বলে গণ্য। এর দলিল হলো সালাফে সালিহীনের ইজমা। আর কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সালিহীনের ফাতাওয়া, কিয়াস নয়। কুয়ায় উট বা বকরির দু'একটি লাদি পড়লে তাতে পানি নষ্ট হবে না। এ হকুম সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হলো পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে। ইয়তিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হচ্ছে—খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোনো কিছু থাকে না, আর গবাদি পশু তার আশে পাশে মল ত্যাগ করে থাকে, এবং বাতাস এসে এগুলোকে কুয়ার ভিতর এনে ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকিদ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দর্শক যা অধিক মনে করে, তা-ই অধিক। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি অল্প পানিতে নাজাসাত পড়ে তবে পানি নাপাক হয়ে যায়। পুরো পানি বের করে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, কূপে নাজাসাত পড়লে সমস্ত পানি বের করা সম্ভব হয় না। এতে বুঝা যায় যে, কূপের কিছু আহকাম পূর্ব বর্ণিত মাসআলা হতে ভিন্ন। তাই গ্রন্থকার কুয়ার মাসআলা ভিন্নভাবে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, যদি কূপে পশু ব্যতীত অন্য কোনো নাজাসাত পড়ে যেমন, পেশাব, মদ, রক্ত বা শূকর চাই নাজাসাত কম হোক বা বেশি হোক, কূপের সমস্ত পানি বের করা জরুরি। সমস্ত পানি বের করাটা কূপের জন্য তাহারাতে বলে বিবেচিত। অর্থাৎ কূপের দেয়াল খোয়া জরুরি নয় শুধু পানি বের করে ফেললেই কূপ পাক হয়ে যাবে। দলিল হলো, সাহাবী (রা.) ও তাবিয়ীগণের ইজমা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সালিহীনের ফাতাওয়া। এখানে কিয়াসের কোনো দখল নেই। সুতরাং কিয়াস দ্বারা পানির নির্দিষ্টত্ব কোনো পরিমাণ বের করা যাবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে দু'টো বিপরীতমুখী কিয়াস রয়েছে। প্রথম কিয়াস হলো, পানি একেবারেই নাপাক না হওয়া। কেননা কূপের নিম্নদেশ হতে পানি অনবরত বের হচ্ছে। তাই কূপের পানি جاری মা-এর অনুরূপ হবে। আর جاری মা- নাজাসাত পড়ার দ্বারা নাপাক হয় না। দ্বিতীয় কিয়াস হলো, পানি পাক-ই না হওয়া। কেননা কূপে নাজাসাত পড়ায় পানি নাপাক হয়ে গেছে, কুয়ার দেয়াল নাপাক হয়ে গেছে, তার মাটি নাপাক হয়ে গেছে, এমনকি যতটুকু পানি বের করা হবে এ পরিমাণ পানি কূপের নিচ হতে বের হবে যা নাপাক, মাটি নাপাক, আবার নাপাক পানি নাপাক দেয়ালের সাথে মিলে নিজেও নাপাক হয়ে যাবে। আর এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে কিয়ামত অবধি কূপ পাক হবে না। মোদ্দাকথা, কুয়া সংক্রান্ত সকল মাসআলার ভিত্তি হবে সাহাবী ও তাবিয়ীদের ফতোয়া। কিয়াস নয়।



وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْبَاسِ وَالصَّحِيجِ وَالْمُنْكَمِرِ وَالرَّوْثِ وَالْخَشْيِ وَالْبَعْرِ لِأَنَّ  
الضَّرُورَةَ تَشْتَمِلُ الْكُلَّ وَفِي شَأْنِ تَبَعْرِ فِي الْمِخْلَبِ بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَيْنِ قَالُوا يُزِمُّ  
الْبَعْرَةَ وَيَشْرَبُ اللَّبَنَ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَلَا يَغْفَى الْقَلِيلُ فِي الْإِتَاءِ عَلَى مَا قِيلَ لِعَدِمِ  
الضَّرُورَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ كَالْيَسِيرِ فِي حَقِّ الْبَعْرَةِ وَالْبَعْرَتَيْنِ -

অনুবাদ : শুষ্ক ও তাজা বিষ্ঠা এবং গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা আর উটের লাদা ও ঘোড়া বা গরুর গোবরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা প্রয়োজন সবগুলোতেই বিদ্যমান। দোহন পাড়ে বকরি দু'এক গোটা বিষ্ঠা ত্যাগ করলে সে সম্পর্কে ফকীহগণ বলেছেন, বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা এখানে প্রয়োজন রয়েছে। কারো কারো মতে সাধারণ পাড়ে অল্পও মাফযোগ্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'একটি বিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাত্রও কুয়ার অনুরূপ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি কুয়ায় উট বা বকরি দু'একটি লাদি পড়ে তবে ইস্তিহসানের চাহিদা হলো পানি নাপাক হবে না, আর কিয়াসের চাহিদা হলো নাপাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, দু'একটি লাদি দ্বারা স্বল্প পরিমাণ উদ্দেশ্য।

কিয়াসের দলিল হলো, নাজাসাত অল্প পানিতে পড়েছে। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, অল্প পানিতে নাজাসাত পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায়। নাজাসাত কম হোক বা বেশি হোক। এখানে কুয়া দ্বারা এমন কুয়া উদ্দেশ্য যা ১০০ বর্গহাতের থেকে কম। ইস্তিহসানের কারণ হলো দু'টি—

এক. বন জঙ্গলের কুয়ার উপর বাধাদানকারী কোনো কিছু থাকে না আর গবাদি পশু তার আশে পাশে মল ত্যাগ করে ফলে বাতাস তা কুয়ায় ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকিদে অল্প পরিমাণকে মাফ করা হয়েছে। আর অধিক পরিমাণের মধ্যে যেহেতু প্রয়োজনের তাকিদ নেই তাই তাকে ক্ষমা করা হয়নি।

এখন অল্প বেশির পরিমাণ নিয়ে ওলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কারো কারো মতে অধিক হলো, এ পরিমাণ লাদি পড়া যা পানির এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ বা অধিক পানিও ছেয়ে ছড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, লাদি পুরো পানিতে ছড়িয়ে গেলে তা অধিক বলে গণ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কোনো বালতি লাদি বিনে তোলা যায় না। কারো কারো মতে যদি তিনটি লাদি পড়ে তবে তা অধিক বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দর্শক যা অধিক মনে করে তা-ই অধিক; নতুবা কম। আর এ মতই নির্ভরযোগ্য। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র.) এ ধরনের মাসায়িলের ক্ষেত্রে তর্কবিশয়ের বিশেষজ্ঞের উপর সোপান করে থাকেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উক্ত ইস্তিহসানের ভিত্তিতে তাজা ও শুষ্ক বিষ্ঠা, গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা, উটের লাদা, গরু বা ঘোড়ার গোবর প্রভৃতির হুকুম একই সমান। কেননা প্রয়োজন সবগুলোতেই পরিবাণ্ড। এ হিসাবে বন-জঙ্গল এবং শহরের কুয়ার মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে। কেননা বন-জঙ্গলের কুয়ার উপর যদিও বাধাদানকারী কোনো কিছু না থাকে কিন্তু শহরে কুয়ার উপর ঢাকনা থাকে যা খরকুটা পড়া থেকে বাধা দেয়। এ জন্য বন-জঙ্গলের কুয়ায় অল্প পরিমাণ নাজাসাত ক্ষমার যোগ্য; তবে শহরে কুয়ায় ক্ষমার প্রয়োজন নেই।

**দুই.** ইস্তিহসানের দ্বিতীয় কারণ হলো— ইনায় গ্রন্থকার বলেন, লাদি শক্ত জাতীয় জিনিস, তার সাথে অস্ত্রের অর্দ্রতা লেগেই থাকে। এজন্য লাঙ্গির ভিতর পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই নাজাসাতের প্রভাবও পানিতে পড়ে না। এ কারণে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য। ইস্তিহসানের উক্ত কারণের ভিত্তিতে মাঠের ও শহরে কুয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

হিদায়া গ্রন্থকার অন্য একটি মাসআলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, দুধ দোহনের সময় যদি বকরি দোহন পাড়ে দু'একটি বিষ্ঠা ত্যাগ করে তবে বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা এখানে প্রয়োজন রয়েছে। বকরির আদত হলো দুধ দোহনের সময় বিষ্ঠা ত্যাগ করা। আর যদি দুধ রাখা পাড়ে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তবে অল্প পরিমাণও ক্ষমার যোগ্য হবে না। কেননা এখানে কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পাত্র তেকে রাখা সম্ভব। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'এক গোটা বিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাত্রের হুকুমও কুয়ার অনুরূপ। অর্থাৎ দু'এক গোটা দ্বারা যেমনিভাবে কুয়া নাপাক হয় না এমনিভাবে পাত্রও নাপাক হবে না।

فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَرٌّ الْحَمَامِ أَوْ الْعُصْفُورُ لَا يَفْسِدُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) كَأَنَّهُ  
إِسْتَحَالَ إِلَى تَنْتِنٍ وَقَسَادٍ فَاشْتَبَهَ خَرَّ الدَّجَاجَةِ وَلَنَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اقْتِنَاءِ  
الْحَمَامَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ مَعَ وَرُودِ الْأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا وَاسْتِحَالَتِهَا لَا إِلَى تَنْتِنٍ رَائِحَةٍ فَاشْتَبَهَ  
الْحَمَاءَ -

অনুবাদ : যদি কুয়ায় কবুতর বা চড়ুই পাখির বিষ্ঠা পড়ে তাহলে পানি নষ্ট হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো— (বিষ্ঠা) পচা ও দূষিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তা মুরগির বিষ্ঠার অনুরূপ। আমাদের দলিল হলো— মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ সখলিত আয়াত থাকা সত্ত্বেও মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে মুসলমানদের সাধারণ একমত রয়েছে। আর তার রূপান্তর দুর্গন্ধযুক্ত পচা পদার্থের দিকে নয়। সুতরাং তা কালো কাদা সদৃশ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কবুতর আর চড়ুই পাখির বিষ্ঠা নিয়ে ওলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে। আমাদের মতে পাক। সুতরাং যদি তাহা কুয়ায় পড়ে তবে কুয়া নাপাক হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে নাপাক। কুয়ায় পড়লে কুয়া নাপাক হয়ে যাবে। কিয়ামের চাহিদাও তাই। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো— বাদ্য এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত হয় দু'ভাবে।

এক. দুর্গন্ধ ও পচা পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন— পেশাব, পায়খানা। এগুলো সর্ব সম্বন্ধিতক্রমে নাপাক।

দুই. ভালো ও উত্তম পদার্থের দিকে রূপান্তরিত হয়। যেমন— ডিম, দুধ, মধু প্রভৃতি। এগুলো সর্বসম্বন্ধিতক্রমে পাক। এখানে কবুতর ও চড়ুই পাখির বিষ্ঠা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই এগুলো মুরগির বিষ্ঠার অনুরূপ। আর মুরগির বিষ্ঠা সকলের মতে নাপাক, এ জন্য কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠাও নাপাক হবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে— সাহাবায়ে কিরাম ও তাবয়ীনগণ মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে একমত পোষণ করেছেন। অথচ মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ রয়েছে। যেমন— আল্লাহর বাণী **بَيْنَى أَنْ ظَهَرَ بَيْنَى** (আমার ঘর তথা মসজিদ পবিত্র রাখো)। রাসূলুল্লাহ **ﷺ** ইরশাদ করেন **جَبَّيْنَا مَسَاجِدَكُمْ صَبَانَكُمْ** (শিশুদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখবে) কেননা শিশুদের দ্বারা মসজিদ ময়লাযুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য আল্লাহর রাসূল **ﷺ** সম্ভাবনাময় দরজাও বন্ধ করে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস আছে **بَيْنَا الْمَسْجِدَ فِي** (শিশুদেরকে মসজিদ বানানো আর সেগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন)। (সহীহ ইবনে হিব্বান) আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে— **عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى بَنِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنَقْلِعَ صَنَعَتَهَا وَنَطْهَرَهَا** (হযরত সামুরা ইবনে হুদ্দাব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেরদেরকে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** আমাদেরকে নিজদের ঘরসমূহে মসজিদ নির্মাণ করতে আর মসজিদগুলোকে পরিষ্কার রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন)। উপরোক্ত দুই হাদীস (আয়েশা ও সামুরা (রা.)-এর) দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদগুলো পবিত্র রাখা জরুরি। মোক্ষাকথা, সাহাবায়ে কেরাম অবধে মসজিদে কবুতর বিচরণ করতে দিতেন। এমনকি মসজিদে হারামে কবুতরের মেলা জমে যেতো। কবুতরের বিষ্ঠা সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরাম অবগত ছিলেন। সুতরাং মসজিদে কবুতর অবাধে বিচরণ করার ইজাযত এ কথার দলিল যে, কবুতরের বিষ্ঠা পাক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো— নাপাক হওয়ার দু'টো কারণ রয়েছে। এক. দুর্গন্ধ, দুই. পচে যাওয়া, কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠার মধ্যে দুর্গন্ধ নেই। আর কাদা আছে যে, **انفناء جزء - انفناء كل**। অর্থাৎ নাজাসাতের দু'টো কারণের একটি না হওয়ার কারণে উভয় কারণেরই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কবুতরের বিষ্ঠা নাপাক হবে না। এখন যদি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে, শুধু পচে যাওয়াও নাপাক হওয়ার কারণ হতে পারে? এর জবাবে আমরা বলব বীর্য খাদ্যকে নষ্ট করে দেয় অথচ ইমাম শাফি'ঈ (র.) বীর্যকে পাক বলেন। অপরদিকে খাদ্য জাতীয় বস্তু গুলো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে পচে যায় কিন্তু নাপাক হয় না। বুঝা গেল, শুধু 'পচে যাওয়া' নাপাক হওয়ার কারণ হতে পারে না। মোটকথা, কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠা কালো মাটির অনুরূপ। আর কালো মাটি সর্ব সম্বন্ধিতক্রমে নাপাক নয়। তাই কবুতর ইত্যাদির বিষ্ঠাও নাপাক হবে না।

فَإِنْ بَالَتْ فِيهَا شَاءَ نَزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبْنَى يُوسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَنْزَحُ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ فَيُخْرَجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ نَجَسٌ عِنْدَهُمَا لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ الْعُرَيْنَيْنِ يَشْرَبُ آبِوَالِ الْأَيْلِ وَالْبَنَاهَا وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَنْزَهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَلَئِنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ فَصَارَ كَبُولًا مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمًا وَتَأْوِيلُ مَا رَوَى أَنَّهُ عَرَفَ شِفَاؤَهُمْ وَحَيًّا ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لَا يَجِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّائِدِ وَلَئِنَّهُ لَا يَتَبَقَّنُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ فَلَا يَبْعُضُ عَنِ الْحُرْمَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يَجِلُّ لِلتَّائِدِ لِلْقَصَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَجِلُّ لِلتَّائِدِ وَغَيْرِهِ لِبَهَارَتِهِ عِنْدَهُ -

অনুবাদ : যদি কূপে বকরি পেশাব করে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বটুকু পানি ফেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যতক্ষণ না পানির উপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বাৎ পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট না করে ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না। আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো— লাল পশুর পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পাক। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নাপাক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ উরায়নাবাসী একদল লোককে উটের দুধ ও শশাব পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— হালাল পশু ও রাম পশুর মাঝে কোনো পার্থক্যের নির্দেশ না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অধিকাংশ কবরের আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। তরাং তা এমন পশুর পেশাবের মতো গণ্য হবে, যার গোশত খাওয়া নিষেধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাদীসের পাখ্যা হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদের রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য মাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়। সুতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) টনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো— যদি কূপে বকরি পেশাব করে দেয়, তবে শায়খাইনের মতে সবটুকু পানি বের করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পানি বের করা জরুরি নয়। তবে যদি পেশাব পানির উপর গালিবি হয়ে যায় তাহলে পানি ত্রাহির (অন্যকে পবিত্রকারী) থাকবে না, শুধু নিজে পাক থাকবে। উপরোক্ত ইখতিলাফের ভিত্তি হচ্ছে— যে পশুর গোশত গওয়া হালাল, তার পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পাক। যদি অল্প পানিতে পড়ে তবে তা পানি নাপাক করবে না; বরং এর দ্বারা অজ্ঞ করা জায়েজ। হ্যাঁ, যদি পেশাব পানির উপর প্রবল হয়ে যায় তাহলে পানি طَاهِرٌ غَيْرُ مَطْهُرٍ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিজে পাক থাকবে কিন্তু অন্যকে পাক করবে না। শায়খাইনের (র.) মতে হালাল পশুর পেশাব নাপাক। যদি এক ফোটা পেশাব পানিতে পড়ে তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : হাদীসে উরায়না :

إِنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَبَوْا الْمَيْمَنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِلِقَاجِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ آبِوَالِهَا وَآلِبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَأْفَقُوا النَّعْمَ

فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ الْقَائِلَ قَارِئُ الْقُرْآنِ فِي أَثَرِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ الْقَهْلَ حَتَّى جَنَ وَبِهِمْ قَامَرُ بِهِمْ  
فَطُفِعَتْ أَيْهِمْ وَارْحَلَهُمْ وَسِيرَ أَعْيَبَهُمْ وَالْقَوْمَ فِي الْحَرِّ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ (ابن داود)

উকল বা উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মদীনায় আসে। (এবং মুসলমান হয়ে যায়) কিন্তু মদীনায় আবহাওয়া তাদের অনৈয়োগ্য হয়। (যার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কিছু দুধেলে উটনী দিলেন। আর সেগুলোর দুধ এ পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে তারা তথ্য) চলে গেল। কিছুদিন পর তারা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। (পরে তারা মুরতাদ হয়ে যায়, যার দরুন) তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের প্রথম দিকে উক্ত খবর সম্পর্কে অবহিত হন। পরে তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি দল তাদের বোঝে প্রেরণ করেন। দ্বি-প্রহরের সময় তারা তাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হলো, চক্ষুগুলো গরম শলাকা দিয়ে ফুঁড়ে দেওয়া হলো এবং তাদেরকে গরম পাখরের উপর নিক্ষেপ করা হলো তারা পানি চাইলে তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি।—(আবু দাউদ)

উপরোক্ত হাদীস এভাবে দলিল হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেছেন। হালাল পশুর পেশাব যদি নাপাক হতো তাহলে তিনি এ ধরনের নির্দেশ দিতেন না। কেননা পেশাব নাপাক হলে তা হারাম হয়ে যেতো, আর হারামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—**إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفَانَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** (আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শেফা রাখেনি।)

শায়খাইন (র.)-এর নকলী দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস **إِسْتَنْزَهُ** قَالَ: **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** قَالَ: **إِسْتَنْزَهُ** (র.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অধিকাংশ কবরের আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে।—(সুনানে কুতনী, মুসতাদরাকে হাকিম) উক্ত হাদীসের মধ্যে ব্যাপকভাবে পেশাব থেকে পরহেয করার কথা বলা হয়েছে। পেশাব হালাল পশুর হোক বা হারাম পশুর হোক। হাদীসের শব্দ **اسْتَنْزَهُ** শব্দটি **صَفِهَ** বা উজু্বের জন্য আসে। বুঝা গেল পেশাব নাপাক। না হয় তার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হতো না। এর সমর্থন অন্য হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। যেমন—

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَبَّحَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهِ عَلَى رُؤُوسِ أَصَابِعِهِ مِنْ زَجَامِ الْمَلَائِكَةِ أَلْبَسِي حَضْرَتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَمَّا وَضِعَ فِي الْقَبْرِ صَفْطُنُهُ الْأَرْضَ صَفْطَةً كَأَن تَخْتَلِفُ أَصْلَاعُهُ كَقِيلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَيِّبٍ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَنْزِيهِ مِنَ الْبَوْلِ**—

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযায় শরিক হয়েছিলেন। তিনি নামাজে জানাজায় শরিক হয়ে ফেরেশতাগণের ভিড়ের দরুন পায়ের আঙ্গুলের মাথার উপর ভর দিয়ে চাছিলেন। পরে যখন সা'আদকে কবরস্থ করা হলো তখন জমিন এমন জোরে তাকে চাপ দিল যে, তার পাজরের হাড় এপা ও পাশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সা'আদ পেশাব থেকে পরহেয করতো না। উক্ত হাদীস নকল করার পর ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে বর্ণিত পেশাব দ্বারা নিজের পেশাব উদ্দেশ্য নয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজের পেশাব থেকে পরহেয করে না তার নামাজ-ই জায়েজ হয় না; বরং এখানে উটের পেশাব উদ্দেশ্য। সা'আদ (রা.) উটের পালের সাথে থাকতেন, পেশাব থেকে সতর্ক থাকতেন না, যার দরুন তার কবরে সাজা হচ্ছে। উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, হালাল পশুর পেশাবও নাপাক।

শায়খাইন (র.)-এর আকলী দলিল হলো— হালাল পশুর পেশাবও পচে যায় ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এ গুলোর পেশাবও এমন পশুর পেশাবের ন্যায় গণ্য হবে যেগুলোর গোষ্ঠত খাওয়া নিষেধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে— রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, উটের পেশাবে তাদের আরোগ্য রয়েছে। তাই তাদেরকে পেশাব পান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এখন যেহেতু তা জানা যায় না তাই ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো— কোনো কোনো হাদীসে **إِهْوَال**-এর শব্দটি আসেনি বরং **الْبَان** শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে উটের দুধ পান করতে বলেছেন, পেশাব পান করতে বলেননি।

তৃতীয় জবাব হলো— উক্ত হাদীস **مَنْسُوح** হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পেশাব ঔষধ হিসাবেও পান করা জায়েজ নেই। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ করা নিশ্চিত নয়। তাই হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উরায়না গোত্রের ঘটনার প্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পেশাব পান করা জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে পান করা জায়েজ।

وَأَن مَّاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سَوْدَانِيَّةٌ أَوْ صَعُورَةٌ أَوْ سَامٌ أَبْرَصٌ يُنْزَحُ مِنْهَا  
عَشْرُونَ دَلْوًا إِلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغْرِهَا يَغْنَى بَعْدَ إِخْرَاجِ الْفَارَةِ  
لِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبَيْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهِ يُنْزَحُ مِنْهَا  
عَشْرُونَ دَلْوًا وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوُهَا تُعَادِلُ الْفَارَةَ فِي الْجَشَةِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا  
وَالْعَشْرُونَ بِطَرِيقِ الْإِنْبَابِ وَالثَّلَاثُونَ بِطَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ -

অনুবাদ : যদি কূপে ইদুর, চড়ুই, কোয়েল, দোয়েল, টিকটিকি ইত্যাদি মারা যায় (বাইরে মরে কূপে পড়লেও একই হুকুম) তবে যদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে তাহলে রক্তের কারণে সব পানি নাপাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সীমিত পানি উত্তোলন তখনই হবে, যখন মৃত প্রাণী ফেঁটে গলে না গিয়ে থাকে) তাহলে বালতির বড়ত্ব ও ছোটত্ব হিসাবে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ ইদুরটি বের করে নেওয়ার পর। এর প্রমাণ হলো, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ইদুর সম্পর্কে, তিনি বলেছেন যে, তা কুয়াতে পড়ে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। চড়ুই ও অনুরূপ পশু যেহেতু দৈহিক পরিমাণে ইদুরের সমান তাই এসবের ব্যাপারে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব। আর ত্রিশ বালতি পরিমাণ তুলে ফেলা মোস্তাহাব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত মাসআলাগুলোর হাসিল হলো— যে সকল পশু কুয়ায় পড়ে তার সাতটি সুরত হতে পারে। কেননা ঐ পশু হয়তো ইদুর বা তার অনুরূপ হবে অথবা মুরগি বা তার অনুরূপ হবে, অথবা বকরি বা তার অনুরূপ হবে। অতঃপর প্রত্যেকটি জীবিত বা মৃত অবস্থায় বের করা হবে। যদি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে তার দুই সুরত রয়েছে। ফুলে ফেটে গেছে অথবা যায়নি। যদি ঐ পশু জীবিত বের হয় তবে কূপ নাপাক হবে না। তবে শূকর *نَجَسَ اللَّعْنِ* হওয়ায় জীবিত বের হলেও কূপ নাপাক হয়ে যাবে। আর যাদের মতে কুকুর *نَجَسَ اللَّعْنِ* তাদের মতে কুকুর জীবিত বের হলেও কূপ নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি পশুটি মৃত অবস্থায় বের হয় তবে প্রথম সুরত অর্থাৎ ইদুর বা তার ন্যায় পশু হলে হুকুম হলো— ঐ মৃত পশুটি বের করার পর বিশ বালতি পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব; আর ত্রিশ বালতি মোস্তাহাব। উপরোক্ত হুকুমটি একটি ইদুর থেকে চারটি ইদুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে পাঁচটি থেকে নয়টি পর্যন্ত চল্লিশ বালতি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। আর দশটি হলে পুরো পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইদুর কুয়ায় পড়ে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মদীসীনে কেরাম উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য বলেছেন, আনাস (রা.)-এর হাদীস উজ্জ্বল উপর আর ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস মোস্তাহাব-এর উপর মাহমূল। এখানে বালতি দ্বারা মাঝারি ধরনের বালতি উদ্দেশ্য যা শহরে সাধারণভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। অথবা ঐ কূপে সাধারণভাবে ব্যবহৃত করা হয়। সুতরাং যদি বড় বালতি দ্বারা পানি বের করা হয় তাহলে সে হিসাবে বিশ বালতির কম পানি ফেলে দিতে হবে। আর যদি ছোট বালতি দ্বারা পানি বের করা হয় তাহলে সে হিসাবে বিশ বালতির বেশি পানি বের করতে হবে।

فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوَهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالشَّيْخُ رُنِزَحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ  
دَلْوًا إِلَى سِتِّينَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رَوَى عَنْ  
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض). أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الشَّيْخِ يُنْزَحَ مِنْهَا  
أَرْبَعُونَ دَلْوًا هَذَا لِإِبْيَانِ الْإِنْجَابِ وَالْخَمْسُونَ بِطَرْنِي الْإِسْتِحْبَابِ ثُمَّ الْمُنْتَبِرُ فِي كُلِّ  
بَيْتٍ دَلْوًا الَّذِي يُسْتَقْفَى بِهِ مِنْهَا وَقِيلَ دَلْوٌ يَسَعُ فِيهِ صَاعٌ وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ  
عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارَ عَشْرِينَ دَلْوًا جَازَ لِحَصُولِ الْمَقْصُودِ -

অনুবাদ : যদি কবুতর কিংবা তার মতো প্রাণী যেমন- মুরগি, বিড়াল ইত্যাদি কুয়ায় পড়ে মারা যায়, তাহলে চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। জামে সগীর গ্রন্থে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর কথা আছে। আর তাই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি মুরগি সম্পর্কে বলেছেন, তা কুয়ায় পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। এ পরিমাণ হলো ওয়াজিবের বিবরণ। আর পঞ্চাশ হলো মোস্তাহাব। প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সে বালতিই বিবেচ্য হবে যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এমন আকারের বালতি হতে হবে, যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ধরে। আর যদি এমন বড় বালতি দ্বারা পানি তুলে ফেলা হয়- যাতে একেবারেই বিশ বালতি পরিমাণ পানি ধরে- তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জায়েজ হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কুয়ায় কবুতর বা তার মতো কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায় যেমন- মুরগি, বিড়াল ইত্যাদি তবে তার হুকুম হলো : চল্লিশ থেকে ষাট বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। অর্থাৎ চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব, আর ষাট বালতি মোস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে' সগীরে গ্রন্থে লিখেছেন, চল্লিশ বালতি ওয়াজিব আর পঞ্চাশ বালতি মোস্তাহাব। হিদায়া গ্রন্থকার এ মতটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কেননা জামে' সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সর্বশেষ কিতাব। তাই এর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর (فَرَّقَ مَرْجُوعًا إِلَى) সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য অভিমত। দলিল হলো- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি মুরগি সম্পর্কে বলেছেন, যদি তা কুয়ায় পড়ে মারা যায় তবে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সে বালতিই বিবেচ্য হবে যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি দুর্বল মত পাওয়া যায় যে, বালতি এমন হতে হবে যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ধরে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুয়া পাক করার ক্ষেত্রে বালতির সংখ্যার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই। তবে এত এত পরিমাণ পানি বের করার গ্রহণযোগ্যতা আছে। যেমন কেউ যদি বড় বালতি দ্বারা একেবারেই বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলে দেয় তবে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবার কারণে তা যথেষ্ট এবং জায়েজ বলে বিবেচিত হবে।

وَأَنَّ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ أَدَمِيَ أَوْ كَلَبٌ نَزَحَ جَمِيعٌ مَّا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  
وَأَبْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَبَا يَنْزَجُ الْمَاءَ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بَيْرٍ زَمَزَمَ فَإِنْ انْتَفَخَ  
الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفْسَخَ نَزَحَ جَمِيعٌ مَّا فِيهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ لِانْتِشَارِ الْبَلَّةِ فِي  
أَجْزَاءِ الْمَاءِ . وَإِنْ كَانَتْ الْبَيْرُ مَعِينَةً يَحْيَتْ لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا أَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ  
فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ تُحْفَرَ حَفْرٌ مِثْلُ مَوْضِعِ الْمَاءِ مِنَ الْبَيْرِ يَصُبُّ  
فِيهَا مَا يَنْزَجُ مِنْهَا إِلَى أَنْ تَمْتَلِي أَوْ تُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ وَتُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ  
عَلَامَةٌ ثُمَّ يَنْزَجُ مِنْهُ مِثْلًا عَشْرَ دَلَاءٍ ثُمَّ تُعَادُ الْقَصَبَةُ فَتَنْظُرُكُمْ انْتَقَصَ فَيَنْزَجُ لِكُلِّ  
قَدْرٍ مِنْهَا عَشْرَ دَلَاءٍ وَهَذَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) نَزَحَ مَائُنَا دَلْوٍ  
إِلَى ثَلَاثِ مَائَةٍ فَكَانَتْهُ بَنَى قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) فِي  
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي مِثْلِهِ يَنْزَجُ حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ وَلَمْ يَقْدِرِ الْغَلْبَةَ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ  
دَائِبُهُ وَقِيلَ يُؤْخَذُ يَقُولُ رَجُلَيْنِ لُهُمَا بَصَارَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ وَهَذَا أَشْبَهَ بِالْفِقْهِ .

অনুবাদ : যদি কুয়ায় বকরি, মানুষ বা কুকুর (কুকুরের ক্ষেত্রে মৃত্যু শর্ত নয়)। জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসলেও একই হকুম হবে, যদি মুখ ভিজে গিয়ে থাকে। কেননা কুকুরের লালা নাপাক) পড়ে মারা যায়, তাহলে তাতে বিদ্যমান সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবারের (রা.) যমযম কূপে জনৈক নিগ্রোর মৃত্যুর কারণে সবটুকু পানি তুলে ফেলার ফতোয়া দিয়ে ছিলেন। যদি মৃত প্রাণী কুয়ার মধ্যে ফুলে বা পচে গলে যায়, তাহলে প্রাণী বড় বা ছোট হোক, কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা পানির সর্বাংশে মৃত দেহের নিঃসৃত রস ছড়িয়ে পড়েছে। কূপ যদি এমন প্রস্রবণ প্রকৃতির হয় যে, তার সবটুকু পানি তুলে ফেলা অসম্ভব তাহলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলে ফেলতে হবে। এর পরিমাণ জানার উপায় হলো — কূপের পানির সফল পরিমাণ অনুরূপ একটি গর্ত খনন করা হবে এবং পানি তুলে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাতে ফেলতে হবে। কিংবা একটি বাঁশ নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে তাতে দাগ কাটা হবে। তারপর ধরুন, দশ বালতি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখা হবে, কি পরিমাণ পানি হ্রাস পেল। এরপর প্রত্যেক এই পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি উত্তোলন করা হবে। এ দুটি উপায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দশ থেকে তিনশ বালতি তুলে ফেলেই হবে। সম্ভবত তিনি নিজ শহরের (বাগদাদে দেখা কুয়াগুলোর) উপরই তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। জামে' সগীরে গ্রন্থে এ ধরনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি অনবরত তুলতেই থাকবে, যতক্ষণ না পানি তাদেরকে পরাভূত তথা ক্রান্ত পরিশ্রান্ত করে দেয়। তবে পরাভূত করার নির্দিষ্ট সীমা তিনি নির্ধারণ করেননি। (এ ধরনের ক্ষেত্রে) এটাই তাঁর অনুসৃত নীতি। কারো হারো মতে পানির (গভীরতা) সম্পর্কে অভিক্ত দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ মত ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কুয়ায় বকরি, মানুষ অথবা কুকুর পড়ে মারা যায় তবে কুয়ায় বিদ্যমান সবটুকু পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব। দলিল হলো— একবার এক নিম্নো ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে মারা যায়। তখন হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যু'বায়ের (রা.) কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলে দেওয়ার ক্ষতোয়া দিয়েছিলেন।

**মাসআলা :** যদি কুয়ায় কোনো প্রাণী পড়ে মরে যায় এবং ফুলে বা পচে গলে টুকরা টুকরা হয়ে যায়, তাহলে সম্ভব হলে কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। প্রাণী ছোট বা বড় হোক। দলিল হলো প্রাণীটি ফুলে পচে গলে যাওয়ার কারণে তার নাপাক অংশের আর্দতা পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে এ জন্য পুরো পানি নাপাক হয়ে গেছে। যেমন, কুয়ায় রক্ত বা শরবের এক ফোঁটা পড়লে পুরো পানিতে ছড়িয়ে সবটুকু পানি নাপাক করে দেয়।

**وَلَنْ كَانَتْ الْبَيْرُ الْغ :** যদি কুয়া এমন প্রস্রবণ জাতীয় হয় যে, যার সমস্ত পানি তোলা অসম্ভব। এমতাবস্থায় হুকুম হলো, নাজাসাত পড়ার প্রাক্কালে যে পরিমাণ পানি বিদ্যমান ছিল তার সমপরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। পানির পরিমাণ জানার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে দু'টি উপায় বর্ণিত রয়েছে (১) কুয়ার পানির সমতল পরিমাণ অনুসরণ একটি গর্ত খোঁড়া হবে এবং কুয়া থেকে পানি বের করে ঐ গর্তে রাখা হবে যদি গর্ত ভরে যায় তবে বুঝতে হবে যে, কুয়ার সবটুকু পানি বেরিয়ে গেছে এবং কুয়া পাক হয়ে গেছে। (২) কুয়ার ভিতর একটি বাঁশ নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে দাগ কাটা হবে। অতঃপর ধরুন, দশ বালতি পানি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখতে হবে কি পরিমাণ পানি কমছে। তারপর প্রত্যেক এ পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি বের করতে হবে। যেমন— কুয়ায় দশ ফুট পানি আছে। এখন একবারে দশ বালতি পানি বের করার দ্বারা এক ফুট পানি কম গেছে। এতে বুঝা গেল যে, পুরো কুয়ায় একশ বালতি আছে। সুতরাং আরো নব্বই বালতি পানি বের করলে কুয়ার সব পানি বেরিয়ে যাবে। বুঝা গেল যে, নাজাসাত পড়ার সময় যে পরিমাণ পানি ছিল তা বেরিয়ে গেছে এবং কুয়া পাক হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, দু'শ থেকে তিনশ বালতি পানি বের করতে হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)—এর মতের ভিত্তি তার নিজ শহরের (বাগদাদের) দেখা কুয়া গুলোর উপর। কেননা বাগদাদের কুয়াগুলোতে সাধারণত দু'শ থেকে তিনশ বালতি পরিমাণ পানি হতো। তবে উপরোক্ত আন্দাজ সব জায়গার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। কেননা যে সকল জায়গায় পানি বেশি পরিমাণ থাকে সেখানে সে পরিমাণ পানি বের করতে হবে।

জামে' সগীর গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে প্রস্রবণ জাতীয় কুয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে যে, নাপাক কুয়াকে পাক করার জন্য এ পরিমাণ পানি বের করতে হবে যে, পানি তাদেরকে পরাভূত করে ফেলে। তবে ইমাম সাহেব (র.) স্বীয় নীতি অনুযায়ী পরাভূত করার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেননি। কোনো কোনো ফকীহ এর মতে পানির গভীরতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত লোকের মতামতের উপর আমল করা হবে। যদি তারা আন্দাজ করে দু'শ বালতির কথা বলে তবে কুয়া পাক করার জন্য দু'শ বালতি পানি বের করা ওয়াজিব। আর যদি তারা এর চেয়ে কম ফেলতে বলে তবে সে পরিমাণ পানি বের করা ওয়াজিব হবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, উক্ত মতটি ফিক্‌হী দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ। ফিক্‌হ দ্বারা মুরাদ হলো যা কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ভাবিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা শিকারি পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোকের শর্ত আরোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَجَزَا، وَمِثْلَ مَا قَبِلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ** এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক **وَتَكْمُ-** (তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহ পালিত পশু যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক।— ৫। মায়িদা - ৯৫) সাক্ষীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ** এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। (৬৫ তালাক, ২) পানির ক্ষেত্রে এ জন্য বিজ্ঞতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, নীতিমাল জ্ঞানবান লোকদের থেকেই জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানবান লোকদের জিজ্ঞাসা করো।) — (১৬ নাহুল, ৪৩)



وَأَنْ وَجَدُوا فِي الْبَيْرِ فَارَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يَدْرِي مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ يَنْتَفِخْ أَعَادُوا صَلَوةَ  
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا وَغَسَّلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاءُهَا وَأَنْ كَانَتْ قَدْ  
إِنْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعَادُوا صَلَوةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)  
وَقَالَ لَا يَسْ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقَّقُوا أَنَّهَا مَتَى وَقَعَتْ لِأَنَّ الْبَقِيْنَ لَا يَزُولُ  
بِالشَّكِّ وَصَارَ كَمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ التَّجَاسَةَ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ وَلَا بَنَى حَنِيفَةَ (رح)  
أَنَّ لِلْمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ فَيَحَالُ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ الْإِنْتِفَاحَ لِذَلِيلِ  
التَّقَادُمِ فَيَقْدَرُ بِالثَّلَاثِ وَعَدَمِ الْإِنْتِفَاحِ وَالتَّفَسُّخِ دَلِيلُ قُرْبِ الْعَهْدِ فَقَدَرْنَاهُ يَوْمٍ  
وَلَيْلَةٍ لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعَاتٌ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ  
الْمُعَلِّى هِيَ عَلَى الْخِلَافِ فَيَقْدَرُ بِالثَّلَاثِ فِي الْبَالِي وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِي وَلَوْ  
سَلِمَ فَالْثَّوْبُ بِمَرَأَى عَيْنِهِ وَالْبَيْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ فَيَفْتَرِقَانِ —

অনুবাদ : যদি লোকেরা ইঁদুর বা এ ধরনের অন্য কোনো প্রাণী কুয়াতে দেখতে পায় এবং কখন পড়েছে তা জানা না যায় আর তা ফুলে গিয়ে না থাকে তাহলে যদি তারা সে কুয়ার পানি দ্বারা অজ্ঞ করে থাকে, তাহলে একদিন এক রাতের নামাজ দোহরাবে এবং ঐ কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি (প্রাণী) ফুলে বা পচে গলে গিয়ে থাকে তাহলে তিন দিন তিন রাতের নামাজ দোহরাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পতিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের উপর কিছুই দোহরান জরুরি নয়। কেননা নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না। এটা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থার মতো যে তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেল, কিন্তু কখন লেগেছে তা সে জানে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— এখানে মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য সبب বা কারণ রয়েছে। তা হলো পানিতে পতিত হওয়া। সুতরাং এর সাথে মৃত্যুকে সম্পৃক্ত করা হবে। তবে যেহেতু ফুলে উঠা সময়ের দীর্ঘতার প্রমাণ, সেহেতু সময়সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হবে। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া যেহেতু সময়ের নৈকট্যের প্রমাণ, সেহেতু তার সময়সীমা আমরা একদিন একরাত্রি নির্ধারণ করেছি। কেননা এর নিচে হচ্ছে মুহর্তসমূহ, যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য (কাপড়ে) নাজাসাত (লেগে থাকার) বিষয়টি সম্পর্কে মু'আত্তার বক্তব্য হলো, এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর তাজা নাজাসাতের বেলায় একদিন এক রাতের। আর যদি মতভেদ না থাকার দাবি স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তাহলে যেহেতু কাপড় তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকে আর কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে, সুতরাং দুটোর মাসআলা আলাদা হবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি লোকেরা কুয়ার মৃত প্রাণী দেখে আর না জানে যে তা কখন পড়েছে এবং প্রাণীটি এখনো ফুলেনি এবং কাটেনি। এ অবস্থায় হুকুম হলো, যদি ঐ কুয়ার পানি দ্বারা অজু করে নামাজ পড়ে থাকে তবে এক দিন এক রাতের নামাজ দোহরাবে এবং কুয়ার পানি পেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলাবে। আর যদি প্রাণী ফুলে পচে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তিন দিন তিন রাতের নামাজ দোহরাবে। এ হুকুম ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে প্রাণী পতিত হওয়ার সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিছুই দোহরাতে হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো— নিশ্চিতভাবে কুয়ার পানি পাক ছিল। তবে তার মধ্যে মৃত প্রাণী পাওয়া যাওয়ায় বিগত দিনের পানি নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ এসে গেছে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে প্রাণীটি কুয়ার এখনি পড়েছে আর এখনো তার পানি ব্যবহার হয়নি। আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রাণীটি অনেক পূর্বেই পড়েছে আর তার পানি দ্বারা অজু করে নামাজ পড়া হয়েছে। মোদাক্কা, বিগত দিনে পানি নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর কায়দা আছে যে, নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জানা না যাবে যে, প্রাণীটি কখন পড়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিগত দিনে কুয়া নাপাক ছিল তার হুকুম দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি তার পড়ার সময় জানা যায় তবে পড়ার সময় থেকে নাপাক হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা এক নিশ্চিত অবস্থা অন্য নিশ্চিত অবস্থা দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ হুকুমটি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেলো তবে কখন লেগেছে তা সে জানে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— প্রাণীটি পানিতে পড়া তার মৃত্যুর প্রকাশ্য কারণ। কায়দা আছে যে, মুসাক্কাব যদি পুশিদা হয় তবে তার জাহেয়ী সববের উপর হুকুম দেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। সুতরাং ঐ প্রাণীটির মৃত্যুকে পানিতে পড়ার দিকে নিসবত করা হবে। অর্থাৎ এ কথা বলা হবে যে, প্রাণীটি পানিতে পড়েই মারা গেছে। যদিও এ ক্ষেত্রে ঐ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, প্রাণীটি অন্য কোনো কারণে মরে তারপর পানিতে পড়েছে। তবে এ সম্ভাবনাটি অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট জিনিস স্পষ্ট জিনিসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণে উক্ত সম্ভাবনাটিও গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারটি এমন— যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে ক্ষত করেছে, যার দরুন সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে এক পর্যায়ে লোকটি মারা গেছে। এখন বলা হবে লোকটি ঐ ক্ষতের কারণেই মারা গেছে। যদিও এখানে অন্য কোনো কারণ থাকারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রাণীটি ফুলে ফেটে যাওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, প্রাণীটি অনেক পূর্বেই মারা গেছে। আর বিলম্বের সর্বনিম্ন সময় হলো তিন দিন। তাই সময় সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন— যদি কোনো ব্যক্তিকে জানাযা ছাড়া দাফন করা হয় তবে তার কবরের উপর তিন দিন পর্যন্ত জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ। তিন দিনের পর জায়েজ নেই। কেননা তিন দিনের পর লাশ ফুলে পচে গলে যায়। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, প্রাণীটি নিকটবর্তী সময়ে পড়ে মরেছে। তাই তার সময়সীমা এক দিন এক রাত। কেননা এর নিচে হচ্ছে মুহূর্তসমূহ যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

وَمَا مَسَّنَةُ النَّجَاسَةِ  
(এক) কাপড়ে নাজাসাত লাগার মাসআলাটির মধ্যেও ইখতিলাফ রয়েছে। বিজ্ঞ ফকীহ মু'আল্লা ইবনে মানসুর বলেন, এ মাসআলার মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিন, তিন রাত, আর তাজা নাজাসাতের ব্যাপারে এক দিন এক রাতের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকি ঐ নাপাক কাপড় নিয়ে যদি নামাজ আদায় করা হয় তবে পরে দোহরানো ওয়াজিব।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে— যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, উপরোক্ত মাসআলায় কোনো মতভেদ নেই তবুও নাজাসাত লাগা কাপড়ের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না। কেননা কাপড় শরীরে থাকার কারণে সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। তাই নাজাসাত লাগার সাথে সাথেই দেখা যায় যে, এ মুহূর্তে নাজাসাত লেগেছে। কিন্তু কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে। তাই জানোয়ার কখন পড়ে মরেছে তা জানা যায় না। সুতরাং দু'টো মাসআলা আলাদা। তাই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَسُوْرُ الْاَدْمِي وَمَا يُؤْكَلُ الْخ : উক ইবারতে এসু'র চার প্রকারের প্রথম প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক, সে মুসলমান, কাফির, জুনু'বী, হামিয়া যা-ই হোক না কেন। এমনভাবে হালাল প্রাণীর উচ্ছিষ্টও পাক, যেমন- গরু, বকরি, উট ইত্যাদি। দিলল হলো— পানি বুঝের লাগায় সাথে মিশ্রিত হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়, আর লালা সূঁচ হয় গোশত থেকে- আর এ সকল প্রাণীর গোশত পাক, তাই লালাও পাক হবে, যেহেতু লালা পাক সেহেতু লাগায় সাথে মিশ্রিত জিনিসও

পাক হবে। মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দলিল **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُنِي يَقْدَحُ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ** (একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধের পেয়ালা হাতে নিয়েছেন নিজে দুধ পান করেছেন। অবশিষ্টগুলো ডান দিকের আরাবীকে দিয়েছেন। সে পান করে আবু বকর (র.)-কে দিয়েছে। তিনিও পান করেছেন। (উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক। তা ছাড়া যুক্তি হলো মানুষের (সত্তা) যেহেতু পাক, তাই তার উচ্ছিষ্টও পাক হবে। প্রশ্ন হয় যে, তবে মানুষের গোশত খাওয়া যায় না কেন? এর জবাব হলো, মানুষের গোশত খাওয়া যায় না তার সম্মানের কারণে, নাজাসাতের কারণে নয়।

জুনুবি মানুষের উচ্ছিষ্টও পাক। এর দলিল হলো **وَقَالَ لِيُصَانِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَمَدَّ يَدَهُ لِيُصَانِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَمَدَّ يَدَهُ لِيُصَانِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ** (বর্ণিত আছে যে, হযরত হযায়ফার (রা.) সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ সাক্ষাৎ হয় তিনি তার সাথে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। হযরত হযায়ফা (র.) নিজ হাত সংকুচিত করলেন আর বললেন (হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি জুনুবি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিন নাপাক হয় না।) উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, জুনুবি ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পাক।

হায়েযা মহিলার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার উপর দলিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস। **إِنَّ عَائِشَةَ (رَضِيَ) شَرِبَتْ مِنْ إِنَاءٍ** (হযরত আয়েশা (রা.) হায়েয অবস্থায় এক পাত্র থেকে পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও সে জায়গায় মুখ দিয়ে পানি পান করলেন।) বুঝা গেল যে, হায়েযা মহিলার উচ্ছিষ্টও পাক। তা না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশার (রা.)-এর উচ্ছিষ্ট পানি পান করতেন না। অথচ হযরত আয়েশা (রা.) হায়েযা ছিলেন।

কাফিরের উচ্ছিষ্ট পাক। তা-ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। **أَنْزَلَ وَفَدُ ثَقِيفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانُوا** (সকীফ গোত্রের এক জামাআত মুশরিক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করছেন।) যদি মুশরিকরা নাপাক হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মসজিদে আসতে ইজায়ত দিতেন না। আল্লাহর বাণী **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (মুশরিকরা নাপাক) দ্বারা ই'তিকাদী নাজাসাত মুরাদ, বাহ্যিক নাজাসাত মুরাদ নয়।

وَسُورُ الْكَلْبِ نَجَسٌ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وَلَوْغِهِ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُغْسَلُ  
 الْإِنَاءُ مِنْ وَلَوْغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا وَلِسَانُهُ يَلْقَى الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ فَلَمَّا تَنَجَّسَ الْإِنَاءُ  
 فَالْمَاءُ أَوْلَى وَهَذَا يُفِيدُ التَّجَاسَةَ وَالْعَدَدُ فِي الْغُسْلِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح)  
 فِي اشْتِرَاطِ السَّبْعِ وَلَآنَ مَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهَرُ بِالثَّلَاثِ فَمَا يُصِيبُهُ سُورُهُ وَهُوَ دُونُهُ  
 أَوْلَى وَالْأَمْرُ الْوَاردُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى إِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَسُورُ الْخِنْزِيرِ نَجَسٌ لِأَنَّهُ  
 نَجَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَسُورُ سَبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجَسٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِيمَا  
 سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ لِأَنَّ لَحْمَهَا نَجَسٌ وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللَّعَابُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي  
 الْبَابِ -

অনুবাদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। সে যে কোনো পায়ে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ  
 ﷺ বলেছেন, কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্র তিনবার ধৌত করতে হবে। (দারু কুতনী) সাধারণত কুকুরের  
 জিহ্বা পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায়, তখন পানি নাপাক হওয়া অনিবার্য। এ হাদীসে  
 নাপাক হওয়া এবং ধোয়ার সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর সাতবার ধোয়ার শর্ত  
 আরোপের বিপক্ষে দলিল। তা ছাড়া যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে, তা তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। কাজেই  
 যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ, তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। আর সাতবার ধোয়া  
 সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থায় প্রযোজ্য। শূকরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা  
 হয়েছে যে, শূকর সত্তাগতভাবেই নাপাক। হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। শূকর ও কুকুর ছাড়া অন্যান্য হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট  
 সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপরীত মত রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, হিংস্র পশুর গোশত নাপাক এবং তা  
 থেকেই লাল সৃষ্ট। আর লালের হুকুম গোশতের উপরই নির্ভরশীল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওপরে বর্ণিত ইবারতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট পানির হুকুম ব্যান করা হয়েছে। ইমাম মালিক (র.) ব্যতীত সকল ইমামের মতে  
 কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। যদি কুকুর কোনো পায়ে মুখ দেয়, তা তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। তবে ইমাম মালিক (র.)-এর মতে  
 কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাক। মোদাকথা, এখানে দু'টো জিনিস লক্ষণীয়। এক, কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাজাসাত হওয়া। দুই, কুকুরের মুখ  
 দেওয়া পাত্র তিনবার ধোয়া। এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি  
 কুকুর কোনো পায়ে মুখ দেয় তা তিনবার ধৌত করতে হবে। (দারু কুতনী) উক্ত হাদীস এভাবে দলিল হয় যে, কুকুরের  
 জিহ্বা সাধারণত পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায় তখন পানি তো অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে।  
 এ স্থানে কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, হতে পারে হাদীসের মধ্যে وَلَوْغٌ ঘারা লেহন মুরাদ। এ হিসাবে তো জিহ্বা পাত্রের  
 সাথে মিলে যায়, পানির সাথে নয়। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা কিভাবে দলিল দেওয়া যাবে?

জবাব হলো, وَلَوْغٌ-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কুকুরের জিহ্বার প্রান্ত দ্বারা পানি ইত্যাদি পান করা। আর কায়দা আছে যতক্ষণ  
 পর্যন্ত (معنى حقيقى) প্রকৃত অর্থের বিলাফ কোনো করীনা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অর্থই মুরাদ হবে।  
 মোটাকথা, হাদীস দ্বারা দু'টো জিনিস সাবিত হয়েছে। এক, কুকুরের লাল নাপাক। দুই, ধোয়ার সংখ্যা তিনবার। এ হিসাবে এ

হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হয়, কেননা তাঁর মতে সাতবার ধোয়া আবশ্যিক। তাঁর দলিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (র.)-এর বর্ণিত হাদীস—

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي إِيَّانِكُمْ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّانِيَةَ بِأَسْرَابٍ -

(রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কুকুর তোমাদের কোনো পাশে মুখ দেয় তবে তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করবে।) আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হয় ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে সাতবার ধোয়ার বিধান ছিল পরবর্তীতে তা মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়। আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের ব্যাপারে লোকদের উপর খুব কঠোরতা প্রদর্শন করতেন যাতে কুকুর থেকে পূর্ণভাবে পরহেয করে। পরবর্তীতে মানুষের আদতে পরিবর্তন আসায় পূর্বের বিধান রহিত হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে ইলযামী দলিল পেশ করেন যে, যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে তা তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। তাহলে যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, কুকুরের উচ্ছিষ্টকে তার পেশাবের চেয়ে সাধারণ বলা হয়েছে এ জন্যে যে, কুকুরের পেশাবকে কেউ পাক বলেনি আর তার উচ্ছিষ্টকে ইমাম মালিক (র.) পাক বলেছেন।

يَسُو الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ الْخ: আমাদের মতে হিংশ পশু, যেমন— সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে কুকুর ও শূকর ব্যতীত সকল হিংশ পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল নিম্নরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত হাউজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং এ-ও বলা হয়েছিল যে, ঐ হাউজ গুলোতে কুকুর ও হিংশ পশু পানি পান করার জন্য আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَا مَا أَخَذَتْ فِي بَطْنِهَا وَلَنَا سَابِعِي شَرَابٍ وَطَمْرُ (সেগুলোর পেটে যা গেছে তা তাদের জন্য। আর অবশিষ্ট যা রয়েছে তা আমাদের পান করার জন্য এবং সেগুলো পাক।) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

أَتَوْضًا يَمَّا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ فَقَالَ نَعَمْ يَمَّا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا -

(গাধার অবশিষ্ট পানি দ্বারা আমরা অজু করতে পারি কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, হ্যাঁ এবং হিংশ পশুর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও অজু করা জায়েজ।) উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, হিংশ পশুর উচ্ছিষ্ট পাক। আমাদের দলিল হলো—

إِنَّ عُمَرَ وَعُمَرَو بْنَ الْعَاصِ وَرَدَا حَوْضًا فَقَالَ عُمَرَوُ بْنُ الْعَاصِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرُدُّ السِّبَاعَ مَا يَكُ هَذَا فَقَالَ عُمَرُو بْنُ الْعَاصِ لَا تَخْشَيْنَا فَرَدَّ لَهُ إِذَا اخْتَبَرَ بِرُودِ السِّبَاعِ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهَا إِنِ شِئْنَا لَكُنَّا نَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ -

(হযরত ওমর ও হযরত আমরুবনুল আস (রা.) একবার এক হাউজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, হে হাউজের মালিক! তোমার এই পানির নিকট হিংশ পশু আসে কী? (তার জবাবের পূর্বে) হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওহে হাউজের মালিক। এ সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে অবহিত করো না। কেননা যদি আমাদেরকে হিংশ পশুর খবর দেওয়া হয় তবে তা ব্যবহার করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।) উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, হিংশ পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। আমাদের আকলী দলিল হিংশ পশুর গোশত নাপাক। আর তার লাল। তা থেকেই সৃষ্টি হয়। লাল। পাক-নাপাক হওয়া গোশত দ্বারা বিবেচিত। অর্থাৎ গোশত যদি নাপাক হয় তবে লাল।ও নাপাক হবে। আর গোশত পাক হলে লাল।ও পাক হবে। সুতরাং বুঝা গেল, হিংশ পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব : হিংশ প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুম দেওয়ার আগে এর উচ্ছিষ্ট পাক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত হুকুম রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় জবাব হলো, প্রশ্ন ছিল বড় হাউজের ক্ষেত্রে। আর বড় হাউজের ক্ষেত্রে আমরাও বলি যে, বড় হাউজ হিংশ পশুর উচ্ছিষ্ট দ্বারা নাপাক হয় না।

التَّحْرِيمُ -

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَتَوَصَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَنُصَابُ مِنْهُ الْهَرَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ  
(আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাত্রে অভ্যু করতাম। অথচ পূর্বে উক্ত পাত্রে বিভাল মুখ দিয়েছিল) এ  
হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, বিভালের উদ্ভিষ্ট মাকরুহ নয় বরং পাক।

তরফাইনের দলিল : রাসুল্লাহ عليه السلام বলেছেন, **المرء بدينه** বিভাল হিংস্র প্রাণী। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা। দৈনিক বিভাদের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিভাদেলের উচ্চিষ্টের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা রাসুল্লাহ عليه السلام -কে সৃষ্টিগত প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য সৃষ্টি করা হারানি, বরং শরয়ী হুকুম বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যখন বিভাল হিংস্র প্রাণীর অনুরূপ। তাই হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তার উচ্চিষ্ট ও নাপাক হওয়া উচিত। অথচ নাপাক বলা হয় না। এর জবাবে হিন্দায়া রহকার বলেন, কিসাসের চাহিদা এটা এটি ছিল। তার ঘরেরে অভ্যন্তরে সর্বস্ব। যুদ্ধাফি করার কারণে তার নাজাসতেরে বিধান রহকার বলে হয় যায়, আর মাকরুহ হওয়ার হুকুম বাকি থেকে যায়। **عليه السلام** (ঘুরাফেরে

কারণ) ঘাৱা হয়তো জরুরত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জরুরতের কারণে নাজাসাত রহিত হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর ইজাযত চাওয়াকে ওয়াজিব করেছেন, যে কারো ঘরে প্রবেশ করতে চায়। তবে জরুরতের কারণে দাসদাসী, নাবালিগ শিশুর জন্য তিন সময় ব্যতীত (অর্থাৎ ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে কায়লুলার সময় এবং রাতে ইশার নামাজের পর) অন্য সময়ের জন্য উক্ত হুকুমকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَرَبْعًا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ —

(হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং ইশার নামাজের পর।) এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনো দোষ নেই।—(২৪; নূর - ৫৮)

অথবা علن طواف ঘাৱা হয়ত আয়েশার হাদীসের দিকে ইশারা করা হয়েছে। হাদীসটি এই—

عَنْ عَائِشَةَ (رض الله) أَنَّهَا كَانَتْ تَصَلِّي وَفِي بَيْتِهَا تَصْعَةً مِنْ هَرَبَسَةٍ فَجَاءَتْ هَرَّةٌ وَأَكَلَتْ مِنْهَا نَكَارًا فَرَعَتْ مِنْ صَلَاتِهَا دَعَتْ جَارَاتِهَا لَهَا فَكُنَّ يَتَحَامِينَ مِنْ مَوْضِعِ فِيهَا فَمَدَّتْ يَدَهَا وَأَخَذَتْ مَوْضِعَ فِيهَا وَأَكَلَتْ وَقَالَتْ سَوَّغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْهَرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِفِ أَوْ الطَّوَائِفَاتِ عَلَيْكُمْ فَمَا لَكُنَّ لَا تَأْكُلْنَ —

(হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি নামাজ রত ছিলেন। তার ঘরে হারীসা (গোশত ও গম মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ) এর একটি পেয়ালায় রাখা ছিল। বিড়াল এসে তা থেকে খেতে লাগল। তিনি নামাজ থেকে ফারোগ হলেন, আশে-পাশের মহিলাদেরকে ডাকলেন। তারা বিড়ালের মুখ দেওয়া স্থান থেকে পরহেয করতে ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) হাত বাড়িয়ে সেখান থেকে খাওয়া আরজ করলেন। আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি বিড়াল নাপাক নয়। সে তো তোমাদের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করে। তোমাদের কি হলো তোমরা খাচ্ছ না? মোদাকথা, কিয়াসের চাহিদাও এই যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া উচিত। তবে উপরোক্ত হাদীসের কারণে তার নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর কারাহাতের হুকুম বাকি থেকে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসের জবাব হলো, ঐ হুকুম হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর محمول।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরুহে তাহরীমী হওয়ার উপর ইমাম তাহাবী (র.)-এর দলিল হলো, পানির মধ্যে যেহেতু বিড়ালের গোশত হারাম, তাই এর উচ্ছিষ্ট মাকরুহ হবে। আর হারামের কারণে যে কারাহাত হয় তা কারাহাতে তাহরীমীই হয় কারাহাতে তানবীহী নয়। অতএব বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরুহ তাহরীমী হবে।

ইমাম কারখী (র.)-এর দলিল (কারাহাতে তানবীহী হওয়ার উপর) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, সে নাজাসাত পরিহার করে না। সতর্কতা অবলম্বন করে না। আর অসতর্কতার কারণে যে কারাহাত আসে তা কারাহাতে তানবীহী-ই হয়, কারাহাতে তাহরীমী নয়।



وَلَوْ كَلَّتِ الْفَأْرَةُ ثُمَّ شَرِبَتْ عَلَى قَوْرِهِ الْمَاءِ يَتَنَجَّسُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَكَثَتْ سَاعَةً لِعَسَلِهَا  
فَمَهَا يُلْعَابُهَا وَالْإِسْتِثْنَاءُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَأَبْنَى يُوسُفَ (رح) وَيَسْقُطُ  
إِعْتِبَارُ الصَّبِّ لِلضَّرُورَةِ. وَسُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُحَلَّلَةِ مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ وَلَوْ  
كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا لَا يَكْرَهُ لَوْقُوعُ الْأَمْنِ عَنِ  
الْمُخَالَطَةِ وَكَذَا سُورُ سِبَاعِ الطَّيْرِ لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ فَاشْبَهَ الدَّجَاجَةَ الْمُحَلَّلَةَ وَعَنِ  
أَبْنَى يُوسُفَ (رح) أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً يَعْلَمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا قَدْرَ عَلَى مِنْقَارِهَا لِأَيَّكَرَهُ  
لَوْقُوعُ الْأَمْنِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ وَاسْتَحْسَنَ الْمَشَائِخُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ –

**অনুবাদ :** বিভাল যদি ইদুর খেয়ে সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কিছু সময় বিলম্ব করার পর হলে নাপাক হবে না। কেননা সে লাল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে ফেলে। এ ব্যতিক্রম শুধু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী। আর অনিবার্য প্রয়োজন বশতঃ পাক হওয়ার জন্য পানি ঢালার শর্তটি রহিত হয়ে যাবে। ছেড়ে দেওয়া মুরগির উচ্ছিষ্ট মাকরুহ। কেননা ছাড়া মুরগি নাজাসাত ঘাটে। তবে যদি এমনভাবে বাঁধা থাকে যে, তার পায়ের নিচ পর্যন্ত তার ঠোঁট পৌঁছে না, তাহলে নাজাসাতের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকার কারণে মাকরুহ হবে না। হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও তদ্রূপ নাপাক। কেননা এরা মরা খায়, সুতরাং ছাড়া মুরগির মতোই হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাখি যদি আবদ্ধ থাকে এবং মালিক জানে যে, পাখির ঠোঁটে ময়লা নেই, তাহলে (নাজাসাতের) সংস্পর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে (তার উচ্ছিষ্ট) মাকরুহ হবে না। মাশায়খগণ অবর্ণনাকে উত্তম বলে অভিযত ব্যক্ত করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** বিভাল যদি ইদুর খেয়ে সাথে সাথে পায়ে মুখ দিয়ে পানি পান করা আরম্ভ করে তবে এই পানি নাপাক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কিছু সময় বিলম্ব করার পর পানি পান করে তবে শায়খাইনের মতে পানি নাপাক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ সুরহতও পানি নাপাক হয়ে যাবে।

শায়খাইনের দলিল হলো— তাঁদের মতে প্রথম পবিত্র জিনিস থেকে নাজাসাত দূর করা জায়েজ আছে। সুতরাং বিভাল যখন ইদুর খেয়ে অল্পক্ষণ বিলম্ব করেছে। বুঝতে হবে সে তার জিহ্বা দ্বারা মুখকে সাফ করে নিয়েছে এবং নাজাসাত গিলে ফেলেছে। তারপর পায়ে মুখ দিয়ে পানি পান করেছে। বেশির থেকে বেশি এ কথা বলা যাবে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে অঙ্গ পাক করার জন্য পানি বহিয়ে দেওয়া শর্ত, যা এখনো পাওয়া যায়নি। এর জবাব হলো, জরুরতের কারণে পানি বহিয়ে দেওয়ার শর্ত সাকিত হয়ে গেছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু পানি ব্যতীত নাজাসাত দূরীভূত হয় না, তাই এ ধরনের বিভালের উচ্ছিষ্ট সর্বদা নাপাক থাকবে। সে লাল দ্বারা তার মুখ পরিষ্কার করুক বা না করুক।

**سُورُ الدَّجَاجَةِ الْمُحَلَّلَةِ :** নাজাসাত, পায়খানা ইত্যাদিতে ঘুরে এমন মুরগির উচ্ছিষ্ট মাকরুহ। কেননা এ মুরগি নাজাসাত ঘাটে। তাই তার উচ্ছিষ্ট কারাহাত থেকে খালি হবে না। তবে যদি মুরগি বাঁধা থাকে এবং তার ঠোঁট তার পায়ের নিচ পর্যন্ত না পৌঁছে তবে তার উচ্ছিষ্ট মাকরুহ হবে না। দলিল হলো— কারাহাত নাজাসাতের সাথে সংমিশ্রণের কারণে আসে, আর বাঁধা থাকার কারণে নাপাক থেকে নিরাপদ থাকে তাই তার উচ্ছিষ্ট মাকরুহ হবে না। শিকারি প্রাণীরও একই হুকুম। কারণ এগুলো মুরদার খায় তাই এগুলোও ছাড়া মুরগির অনুরূপ।

ইনশাা গ্রন্থকার বলেন, হিংস্র প্রাণীর উপর কিম্বাসের চাহিদাতো ছিল এই যে, শিকারি প্রাণীর উচ্ছিষ্টও নাপাক হওয়া। তবে ইস্তিহ্সানান তাকে নাপাক বলা হয়নি। ইস্তিহ্সাননের কারণ হলো— প্রাণী তার ঠোঁট দ্বারা পানি পান করে। আর ঠোঁটটি হলো ওঙ্ক হাড় বিশেষ। পক্ষাভূতের হিংস্র প্রাণী তার মুখ দ্বারা পান করে, যা তার লালার কারণে সিক্ত থাকে। তাই হিংস্র প্রাণী তার মুখে পানি নেওয়ার সাথে সাথেই তার লালার সাথে তা মিশ্রিত হয়ে যায়। এ কারণে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র প্রাণী যদি আবদ্ধ থাকে আর তার মালিকের বিশ্বাস যে, তার ঠোঁটে ময়লা নেই তবে এ অবস্থায় তার উচ্ছিষ্ট মাকরুহ হবে না। কেননা এ সুরতে নাজাসাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। মাশায়খগণ এ মত-ই উত্তম বলেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। ফকীহ আবুল লাইস (র.) বলেন, হাসান ইবনে মিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পাখি যদি মুরদার না খায়, তবে তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা মাকরুহ নয়।

وَسُورُ مَا يَسْكُنُ الْبُيُوتَ كَالْحَيَّةِ وَالْفَارَةَ مَكْرُوهَةً لَّأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أَوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّورِ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّرَافِ فَبَقِيََتِ الْكَرَاهَةُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْهَرَّةِ - وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ قِيلَ الشُّكُّ فِي الطَّهَارَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَكَانَ طَهُورًا مَالَمْ يَغْلِبِ اللَّعَابُ عَلَى الْمَاءِ وَقِيلَ الشُّكُّ فِي طَهْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ وَكَذَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ وَعِرْقُهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ فَحَشَ فَكَذَا سُورُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيُرْوَى نَصُّ مُحَمَّدٍ (رح) عَلَى طَهَارَتِهِ وَسَبَبُ الشُّكِّ تَعَارُضُ الْأَدْلَةِ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ أَوْ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ (رض) عَنْهُمْ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ (وعن أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ -

অনুবাদ : সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরুহ। কেননা (এগুলোর) গোশত হারাম হওয়ার অবশ্যাঙ্গারী চাহিদা হলো উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া। তবে সর্বদা গৃহে বিচরণের কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায়, মাকরুহ হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আর বিচরণের কারণটি বিভ্রালের (ব্যাপারে) উল্লেখ করা হয়েছে। গাধা ও খচ্ছরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। কারো মতে সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে। কেননা উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র হলে অবশ্যই পাবিত্রকারীও হবে যতক্ষণ না লাল পানির চেয়ে অধিক হয়। অন্যমতে সন্দেহটি পানির পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। কেননা সে যদি পানি পায়, তবে তার মাথা ধোয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ তার দুধ পাক। তার ঘাম নামাজের বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যদিও পরিমাণে তা বেশি হয়। সুতরাং তার উচ্ছিষ্টও অনুরূপ হবে। এ মতই সর্বাধিক বিদ্বৎ। গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়া সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্পষ্ট মত বর্ণিত রয়েছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে গাধার গোশত হালাল বা হারাম হওয়া দলিলগুলো পরস্পর বিরোধী। কিংবা তার উচ্ছিষ্ট পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হারাম ও নাপাক হওয়ায় অগ্রাধিকার দিয়ে গাধার উচ্ছিষ্টকে নাজিস বলেছেন। খচ্ছর যেহেতু গাধার প্রজননভুক্ত। সুতরাং সেও গাধার পর্যায়ে হবে। •

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী যেমন সাপ, ইঁদুর ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট পানিও মাকরুহ। দলিল হলো এগুলোর গোশত হারাম হওয়া এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, তার উচ্ছিষ্ট নাপাক হোক। তবে এগুলোর গৃহে ঘুরাফিরা কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে আর কারাহাত বাকি রয়ে গেছে।

النَّجَسَةُ عَلَى الْعِلَّةِ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত রহিত হওয়ার ইল্লাত طرأ (ঘুরাফেরা) তা কিভাবে বুঝা যায়? জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভ্রালের উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত রহিত হওয়ার ইল্লাত طرأ বয়ান করেছেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন إِنَّهَا مِنَ الطَّرَافَيْنِ عَلَيْكُم (ইহা মিন তত্ৰাফইন 'আলইকুম) আর এ ইল্লাত ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। কেননা ঘরের বাতি বা অন্যান্য ফাঁক বন্ধ করে দিলে বিভ্রাল আসতে পারে না। সাপ, ইঁদুর ইত্যাদির ঘুরার পথ বন্ধ করা যায় না তারা যে কোনো ভাবেই এসে যায়। সুতরাং ইল্লাতে তাওয়াফ দ্বারা যখন বিভ্রালের উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাত সাকিত হয়ে গেছে। তাহলে তো ঘরে অবস্থানকারী প্রাণী থেকে অবশ্যই নাজাসাত সাকিত হয়ে যাবে।

وَسُورَ الْجَمْرِ وَالْبَقْلِ الْخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে গাধা দ্বারা গৃহ পালিত গাধা আর খচ্ছর দ্বারা যার মা গাধী তা মুরাদ । সুতরাং যদি তার মা ঘুড়ি বা গরু হয় তবে তার উচ্ছিষ্ট পাক ।— (শরহে নিকায়)

এখন মূল মাসআলা হলো— গৃহ পালিত গাধা আর ঐ খচ্ছর যা গাধীর পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে উভয়ের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত । অধিকাংশ মাশায়েখের মতে এটাই হুকুম । শায়খ আবু তাহির দাব্বাস (র.) বলেছেন, এগুলোর উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত নয় । কেননা আহ্বাকামে খোদাওগীর কোনো হুকুমই সন্দেহযুক্ত নয়; বরং তার মতে গাধার উচ্ছিষ্ট পাক । যদি সে পানিতে কাপড় ডুবে যায় তবে ঐ কাপড় দ্বারা নামাজ জায়েজ । তবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । তাই এ পানি ছাড়া যদি অন্য কোনো পানি না পাওয়া যায় তবে অজ্ঞ এবং তায়ামুম উভয়টি করা উচিত ।

ইমাম শাফি'ই (র.) বলেন, এগুলোর উচ্ছিষ্ট তাহির ও মুতাহির উভয়টি । তার মতে যে প্রাণীর চামড়া উপকার যোগ্য তার উচ্ছিষ্ট পাক ।

সন্দেহটি পানির তাহারাভের মধ্যে নাকি পবিত্রকারী হওয়ার মধ্যে এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে । কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, গাধার লালার তাহারাভের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে অর্থাৎ তার লাল পাক না-কি নাপাক?

দলিল হলো— যদি গাধার লাল পাক হতো তবে তা যে পানিতে এ লাল মিশ্রিত হতো সে পানির পবিত্রতা বাকি থাকতো । যতক্ষণ না লাল পানির উপর গালিব হতো । যেমনটি পানিতে পাক জিনিস মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে । অথচ লালার প্রাধান্য ছাড়াও তার দ্বারা তাহারাৎ হাসিল করা যথেষ্ট নয় । বুঝা গেল যে, সন্দেহটি তার পাক হওয়ার মধ্যে ।

কোনো কোনো মাশায়েখের অভিমত হলো— গাধার লালার তাহর ও মুতাহির উভয়টির মাঝে সন্দেহ রয়েছে । অর্থাৎ গাধার লাল সত্তাগতভাবে পাক তবে সন্দেহ হলো তা পবিত্রকারী কি-না! দলিল হচ্ছে— যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে গাধার উচ্ছিষ্ট দ্বারা মাথা মাসাহ করে, পরে যদি সাধারণ পানি পাওয়া যায় তবে তার মাথা ধোয়া ওয়াজিব নয় । যদি গাধার উচ্ছিষ্টের তাহারাভের মাঝে সন্দেহ হতো তবে পুনরায় এ ব্যক্তির মাথা ধোয়া ওয়াজিব হতো । বুঝা গেল যে, গাধার উচ্ছিষ্ট তো সত্তাগতভাবে পাক । তবে অন্যকে পাক করবে কি-না এতে সন্দেহ । হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, গাধীর দুধও পাক । এ হুকুম ظاهر الرواي অনুযায়ী নয়; বরং ইমাম (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়াযত হলে গাধীর দুধ নাপাক ।

গাধার ঘাম-এর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে তিনটি রিওয়াযাত বর্ণিত আছে । এক, গাধার ঘাম পাক । নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয় । দুই, নাজাসাতে খফীফা । তিন, নাজাসাতে গলীয়া । তবে মাশহুর রিওয়াযাত অনুযায়ী পাক । সুতরাং ঘামের ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও পাক হবে । কেননা ঘাম ও লাল গোস্বত থেকেই সৃষ্টি হয় । তাই উভয়টির হুকুম একই হুকুম হবে । হিদায়া প্রণেতা বলেন, এটাই বিত্বক্ক মত যে, সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে নয়; বরং পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে । ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন । তিনি আরো বলেছেন চারটি জিনিসের মধ্যে কাপড় ডুবে গেলে কাপড় নাপাক হবে না । এ চারটি জিনিস হলো— গাধার উচ্ছিষ্ট, ব্যবহৃত পানি, গাধীর দুধ এবং হালাল প্রাণীর পেশাব ।

গ্রন্থকার আরো বলেন, গাধার উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত হওয়ার দু'টো কারণ : এক, তার হালাল ও হারাম হওয়ার দলিলের বিভিন্নতা, যেমন বর্ণিত আছে— **إِنْ غَالِبَ ابْنُ أَبَجْرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ يَبْقَ لِي مَالٌ إِلَّا حَمِيرَاتٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلٌّ مِنْ سَبِينِ مَالِكٍ** - (গালিব ইবনে আবজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমার নিকট গাধা ব্যতীত আর কিছুই নেই । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা মোটাতাজা তা খেয়ে নাও ।) এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল গাধার গোস্বত হালাল । অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে— **إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرٍ** (রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়বারের দিন পালিত গাধার গোস্বতকে হারাম করেছেন ।) এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝে যায় যে, গাধার গোস্বত হারাম । দ্বিতীয় কারণ এই যে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইখতিলাফ । যেমন— আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে নাপাক আর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে পাক হওয়ার বর্ণনা রয়েছে । শায়খুল ইসলাম (র.) বলেন, গাধার গোস্বত কোনো ধরনের সন্দেহ ব্যতীত হারাম এবং তার উচ্ছিষ্ট নাপাক । কেননা এখানে মুহাররিম ও মুবীহ একত্রিত হয়েছে এ অর্থময় মুহাররিমতা মুবীহ এবং উপর প্রাধান্য পায়, যেমন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলল এই গোস্বত মাজসীর যবীহ । আর অপর জন বলল, মুসলমানের যবীহ । এ অবস্থায় মুহাররিম প্রাধান্য পাবে, তাই এই গোস্বত হারাম হবে ।

ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে যে, গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক । কেননা হরমত ও নাজাসাত প্রবল । তা ছাড়া খচ্ছর যেহেতু গাধার প্রজননভূক্ত সেহেতু খচ্ছরের হুকুমও গাধার অনুরূপ হবে ।

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ إِلَيْهِمَا قَدَمٌ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الْأِسْتِعْمَالِ فَاشْبَهَ الْمَاءَ الْمَطْلُوقَ وَلَنَا أَنَّ الْمَطْهَرِ أَحَدُهُمَا فَيُفِيدُ الْجَمْعَ دُونَ التَّرْتِيبِ وَسُورَ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْكُولٌ وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِإِظْهَارِ شَرَفِهِ -

অনুবাদ : যদি গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম ও করবে এবং যে কোনোটা আগে করা জায়েজ। ইমাম যুফার (র.) বলেন, অজুকে অগ্রবর্তী না করলে জায়েজ হবে না। কেননা তা এমন পানি (শরিয়তের হুকুম মতে) যা ব্যবহার করা ওয়াজিব। সুতরাং তা সাধারণ পানি সদৃশ। আমাদের দলিল হলো—যেহেতু পবিত্রকারী হলো দু'টির যে কোনো একটি, ফলে উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর চাহিদা ক্রমবিন্যাস (ترتيب) নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার গোশত হালাল। বিদ্বৎ বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতও অনুরূপ। কেননা গোশত মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রকাশ করা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : অজুকারী ব্যক্তির নিকট যদি সন্দেহযুক্ত পানি ব্যতীত কোনো পানি না থাকে তবে হুকুম হলো, ঐ পানি দ্বারা অজু করবে এবং পরে তায়াম্মুমও করবে। উভয়টির যে কোনোটি আগে-পরে করা যায়, তবে ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু অজু অগ্রে করা জায়েজ। তাঁর দলিল হলো— সন্দেহযুক্ত পানি এমন পানি শরিয়তের হুকুম মতে যা ব্যবহার করা ওয়াজিব তাই তা সাধারণ পানির সদৃশ।

আমাদের দলিল হলো— সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা অজু ও তায়াম্মুমের মধ্য থেকে যে কোনো একটি পবিত্রকারী। অর্থাৎ দু'টির যে কোনো একটি দ্বারা তাহারাৎ অর্জন হয়ে যাবে। এখন যদি সন্দেহযুক্ত পানি দ্বারা তাহারাৎ হাসিল হয়েই যায়, তবে মাটি ব্যবহারে কোনো ফায়দা নেই, আগে করুক বা পরে করুক। আর যদি পবিত্রকারী শুধু মাটি হয় তবে আগ-পিছ দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। মোদাকথা, পবিত্রকারী যেহেতু দু'টির যে কোনো একটি, তাই উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ক্রমবিন্যাস দ্বারা কোনো ফায়দা নেই।

ঘোড়া নর বা মাদী হোক সাহেবাইনের মতে তার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা এর গোশত হালাল। আর যার গোশত হালাল তার উচ্ছিষ্ট পাক হয়। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে চারটি বর্ণনা রয়েছে। এক. তা ব্যতীত অন্য পানি দ্বারা অজু করা ভালো। দুই. তার গোশতের ন্যায় তার উচ্ছিষ্টও মাকরুহ। তিন. গাধার উচ্ছিষ্টের ন্যায় মাশকুক। চার. পাক, আর এটাই হলো বিদ্বৎ মত। প্রশ্ন হলো ইমাম সাহেবের নিকট ঘোড়ার গোশত মাকরুহ, তাহলে তার উচ্ছিষ্ট কিভাবে পাক হবে? জবাব হলো, গোশত মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রচার করা। কেননা ঘোড়া জিহাদের অস্ত্র। নাজাসাতের কারণে নয়। তাই তার গোশতের কারাহাত দ্বারা তার উচ্ছিষ্টে কোনো প্রভাব পড়বে না।

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَيْدَ السَّمَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِحَدِيثِ لَيْلَةَ الْجَنِّ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأُ بِهِ جِئْنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رح) يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) عَمَلًا بِأَيَّةِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهَا أَقْوَى أَوْ هُوَ مَنْسُوحٌ بِهَا لِأَنَّهَا مَدْنِيَّةٌ وَلَيْلَةُ الْجَنِّ كَانَتْ مَكِّيَّةً وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ اضْطِرَابًا وَفِي التَّارِيخِ جَهَالَةٌ فَوَجِبَ الْجَمْعُ إِحْطَابًا فَلَمَّا لَيْلَةُ الْجَنِّ كَانَتْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ وَيُمَثِّلُهُ بُرَادٌ عَلَى الْكِتَابِ وَأَمَّا الْإِغْتِسَالُ بِهِ فَقَدْ قَبِلَ يَجُوزُ عِنْدَهُ إغْتِسَابًا بِالْوَضُوءِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ —

**অনুবাদ :** যদি খুরমা ভিজানো পানি ছাড়া কোনো পানি পাওয়া না যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, তা দ্বারা অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। কেননা জিন সশুদায়েের সাথে সাক্ষাতের রাত্রি সম্পর্কীয় হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ পানি না পেয়ে খুরমা ভিজানো পানি দ্বারা অজু করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, তায়াম্মুম করবে, অজু করবে না। আবু হানীফা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-ও এ মত পোষণ করেন, তায়াম্মুমেয় আয়াতের উপর আমল করার পরিশ্রমিত। কেননা আয়াত অধিক শক্তিশালী। অথবা হাদীস আয়াতের দ্বারা রহিত। কেননা তায়াম্মুমেয় আয়াত মাদানী আর জিনের রাত্রির ঘটনা হলো মাকী। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অজু ও তায়াম্মুম দু'টোই করবে। কেননা হাদীসের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। আর (ঘটনাটির) তারিখ (সঠিক) জানা নেই। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে উভয়টির উপর আমল করা ওয়াজিব। আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, লাইলাতুল জিনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিল। সুতরাং রহিত হওয়ার দাবি সঠিক নয়। আর হাদীসটি মশহুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কেয়াম আমল করেছেন। এ ধরনের মশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহ (এর হুকুমে) বাড়ানো যায়। আর তা দ্বারা গোসল করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে, অজুর উপর কিয়াস করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোসল জায়েজ নয়। কেননা গোসল অজুর চেয়ে উপরের স্তরের।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি খেজুর ভিজানো পানি ছাড়া অন্য কোনো পানি পাওয়া না যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে তিন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। এক. জামে সগীর ও যিয়াদাত-এ বর্ণিত আছে যে, তা দ্বারা অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। দুই. ইমাম সাহেব বলেছেন, আমার নিকট তা দ্বারা অজু করা এবং পরে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা অধিক পছন্দনীয়। শায়খুল ইসলাম (র.) বলেন, ইমাম সাহেবের উপরোক্ত অভিমতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি শুধু নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু করে আর তায়াম্মুম না করে তবে তা জায়েজ। আর যদি তার উল্টো করে তাহলে জায়েজ নেই। তবে অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করা মোস্তাহাব। তিন. নূহ ইবনে আবী মারইয়াম ও হাসান ইবনে যিশদ (ইমাম সাহেব থেকে) বর্ণনা করে বলেন, প্রথমে তায়াম্মুম করবে তবে পরে নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু করবে না। এ মতটিই ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.) গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু ও তায়াম্মুম উভয়টি করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রথম রিওয়ায়াতের কারণ হলো হাদীসে লাইলাতুল জিন। হাদীসটি এই—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْعَمَ مَعِي مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَامَ ابْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمَلَهُ أَنْ أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ نَفْسِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ وَخَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَوْلِي خَطًّا وَقَالَ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْخَطِّ فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ عَنْهُ لَمْ تَنْفَعِنِي إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ ثُمَّ دَعَبَ يَدْعُو الْجِنَّ إِلَى الْإِنْسَانِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ رَجَعَ

بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَالَ لِي قُلْ بَقِيَ مَعَكَ مَا أَنْتَ صَاحِبُهُ فَقُلْتُ لَا أَلَا حَيْدَ الشَّمْرِ فِي إِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
نَمْرَةً طَيِّبَةً وَمَا ظَهَرَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ بِمِصْبَاحِهِ وَصَلَّى الْفَجْرَ - (عناية)

(হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কৃতক বর্ণিত আছে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, আর বলছিলেন, এমন এক ব্যক্তি আমার সাথে চলার জন্য দাঁড়িয়ে যাও যার অন্তরে যারারা পরিমাণ অহঙ্কার নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দাঁড়ালেন। তিনি তাকে সাথে নিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চতুর্দিকে একটি দাগ কাটলেন, আর বললেন, এ দাগের বাহিরে যাবে না। কেননা তুমি যদি এর বাহিরে চলে যাও তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পাবে না। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) জিনদেরকে ইমানের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলেন, এমনকি ফজরের সময় হয়ে গেল। ফজরের পর তিনি তাশরীফ আনলেন আর আমাকে বললেন, তোমার নিকট অবশিষ্ট পানি আছে কী? আমি তা দ্বারা অজু করব। আমি বললাম, না; তবে পাশে নাবীয়ে তামার আছে। তিনি বললেন, যেখুর পবিত্র এবং পানি ও পবিত্র। অতঃপর তা দ্বারা তিনি অজু করলেন।— (ইনায়)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি নাবীয়ে তামার ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকে তবে তা দ্বারা অজু করবে পরে তায়ামুমের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফ'ঈ (র.)-এর মতামতের কারণ হলো, তায়ামুমের আয়াত مَا تَجِدُوا مِنْ مَّاءٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ مَّاءٍ فَاتَّيَسَّرَ لَكُمْ تَطَهُّرٌ-এর মধ্যে সাধারণ পানি না থাকা অবস্থায় تَطَهُّرٌ-এর নিসবত মাটির দিকে করা হয়েছে আর নাবীয়ে তামার সাধারণ পানি নয়। সুতরাং উপরোক্ত হাদীস তায়ামুমের আয়াত দ্বারা বদ হয়ে যায়। কেননা আয়াতটি হাদীসের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, লাইলাতুল জিনের হাদীসটি তায়ামুমের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা তায়ামুমের আয়াতটি হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর লাইলাতুল জিনের ঘটনাটি মক্কায় অবস্থানকালে ঘটেছে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, পরের হুকুমটি পূর্বের হুকুমের জন্য নাসিখ হয়ে থাকে। তাই নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু করার হুকুম তায়ামুমের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— লাইলাতুল জিনের হাদীসের মধ্যে اضطراب (স্ববিরাধিতা) রয়েছে। কেননা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে লাইলাতুল জিনে ছিলেন। অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে মাসউদ (রা.) সাথে ছিলেন না। তা ছাড়া সঠিকভাবে জানা যায় না যে, লাইলাতুল জিন কখন সংঘটিত হয়েছে? সুতরাং সতর্কতার চাহিদা হলো উভয়টির উপর আমল করা অর্থাৎ নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু ও করবে পরে তায়ামুমও করবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে— (যা মূলত সকলের দলিলের জবাব) লাইলাতুল জিনের ঘটনা শুধু একবার ঘটেছিল; বরং কয়েকবার ঘটেছে। ইনায় প্রণেতা তাইসীর-এর হাওয়ালায় লিখেছেন যে, জিন সম্প্রদায় দু'বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসেছিল। সম্ভবত দ্বিতীয়বার মদীনায় আয়াতে তায়ামুম অবতীর্ণ হওয়ার পর এসেছিল। এমনভাবে ফাটল কাটারের গ্রন্থকার লিখেছেন। যাহিরে হাদীসের মধ্যে লাইলাতুল জিনের কথা ছয় বার এসেছে। একবার বাকীয়ে গারকাদে এ ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন। দু'বার মক্কায় ঘটেছে। চতুর্থবার মদীনার বাহিরে ঘটেছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) ছিলেন। সুতরাং লাইলাতুল জিনের ঘটনা যখন বারবার ঘটেছে, তখন হতে পারে, যে ঘটনায় নাবীয়ে তামার দ্বারা অজুর কথা রয়েছে, তা মদীনায় আয়াতে তায়ামুম নাজিল হওয়ার পর ঘটেছে। তাই এ সূরতে আয়াতে তায়ামুম দ্বারা ঐ হাদীস রহিত হওয়ার দাবি কিভাবে সঙ্গী হতে পারে। হিদায়া গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় জবাব হলো, এ হাদীসটি মাহশুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত আমল করেছেন। যেমন হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে إِنْ لَمْ يَجِدْ أَلَا حَيْدَ الشَّمْرِ فِي إِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَمْرَةً طَيِّبَةً وَمَا ظَهَرَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ بِمِصْبَاحِهِ وَصَلَّى الْفَجْرَ - (عناية) থেকে বর্ণিত তামার দ্বারা ঐ ব্যক্তি অজু করবে যে ব্যক্তি সাধারণ পানি না পায়।) আরো আন্যাবাভেও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, إِنْ لَمْ يَجِدْ أَلَا حَيْدَ الشَّمْرِ فِي إِدَاوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَمْرَةً طَيِّبَةً وَمَا ظَهَرَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ بِمِصْبَاحِهِ وَصَلَّى الْفَجْرَ - (عناية) (হযরত আলী (রা.) পানি না থাকা অবস্থায় নাবীয়ে তামার দ্বারা অজু করাকে কিছু মনে করতেন না।)

ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন—تَوَضَّأُوا بِمِصْبَاحِهِ وَلَا تَتَوَضَّأُوا بِأَلَا حَيْدَ الشَّمْرِ-এর সাথে তামার দ্বারা অজু করো দু'বার করো না। মোদাকথা, হাদীসে লাইলাতুল জিন হাদীসে মাহশুর এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের মামুল বিহাও। আর এ ধরনের হাদীসে মাহশুর দ্বারা কিতাবুল্লাহ-এর হুকুমে বাড়াণো যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট নাবীয়ে তামার দ্বারা গোসল করা জায়েজ কি না এ পর্যায়ে ওলামায়ে আহলানফের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, অজুর উপর কিয়ামত করে ইমাম সাহেবের নিকট গোসল করাও জায়েজ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নাবীয়ে তামার দ্বারা গোসল করা জায়েজ নয়। কেননা জানাবাতের হাদীস অজুর হাদীসের চেয়ে উপরের স্তরের এ জন্য অজুর উপর গোসলের কিয়ামত করা ঠিক হবে না।

وَالْتَّبِعْ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حُلُوءًا رَقِيقًا يَحِلُّ عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْمَاءِ وَمَا  
 اشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ وَإِنْ غَيَّرْتَهُ النَّارَ فَمَادَامَ حُلُوءًا عَلَى  
 الْخِلَافِ وَإِنْ اشْتَدَّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهُ عِنْدَهُ  
 وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا يَتَوَضَّعُ بِهِ لِحُرْمَةِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِمَا سِوَاهُ مِنَ  
 الْأَشْيَاءِ جَرِيًّا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ -

অনুবাদ : যে নাবীয সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, তা হচ্ছে ঐ নাবীয যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মতো তা শরীরে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে তা হারাম হবে, তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে না। আর যদি আগুনে জ্বল দেওয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে মিষ্ট থাকা পর্যন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা অজু করা যাবে না। নাবীযুত তামার ছাড়া অন্য সকল নাবীয দ্বারা কিয়াসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অজু জায়েজ হবে না। (অর্থাৎ কিয়াসের দাবি হিসাবে কোনো নাবীয দ্বারা ই অজু জায়েজ হবে না। কিন্তু নাবীযুত তামার সম্পর্কে হাদীস বিদ্যমান থাকায় কিয়াসের বিপরীতে বৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কিশমিশ, গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নাবীযের ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী অধৈতার হুকুম দেওয়া হয়েছে।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে যে নাবীযে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে তার হাকীকত বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) নাওয়াদির-এ উল্লেখ করেছেন যে, যে নাবীয দ্বারা অজু জায়েজ না জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে আইনাময়ে ছালাছার মতবিরোধ রয়েছে, তা হলো, যে, পানিতে খেজুর ঢালা হয়েছে। এমনকি পানি মিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তা এমন তরল যা সাধারণ পানির মতো অঙ্গে প্রবাহিত হয়। গাঢ় হয়নি এবং তাতে নেশাও আসেনি। যদি গাঢ় হয়ে যায় তবে তা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অজু জায়েজ নেই। কেননা তা নেশা করে এবং হারাম। আর যদি তাকে আগুনে পাকানো হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা মিষ্ট এবং তরল থাকবে। অঙ্গের উপর সাধারণ পানির ন্যায় প্রবাহিত হয়। তাতেও ইমাম সাহেব এবং সাহেবাইনের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর যদি পাকানো দ্বারা গাঢ় হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা তাঁর মতে তা পান করা হালাল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু তা পান করা হারাম সেহেতু তার দ্বারা অজুও জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নাবীযে তামার ছাড়া অন্যান্য নাবীয দ্বারা অজু করা জায়েজ নেই। যেমন- কিশমিশ, গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নাবীয। দলিল হচ্ছে— নাবীযে তামার দ্বারা অজু করা কিয়াসের বিপরীত হাদীস দ্বারা সাবিত। তাই অন্যান্য নাবীয কিয়াসের চাহিদা অনুযায়ী বাকি থাকবে। অর্থাৎ সেগুলো দ্বারা অজু করা জায়েজ হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম কুদুরী (র.) শরহে কুদুরীতে ওলামায়ে আহনাফ থেকে নকল করেছেন যে, তায়ামুমের মতো নাবীযে তামার দ্বারা অজু করার জন্যও নিয়ত শর্ত। দলিল হলো, নাবীযে তামার হলো পানির বদল। এ কারণেই তো সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় নাবীযে তামার দ্বারা অজু করা জায়েজ নেই। যদি তা দ্বারা অজু করা হয় এবং পরে সাধারণ পানি পাওয়া যায় তবে পূর্বের অজু বাতিল হয়ে যাবে। যেমন পানি পাওয়া যাওয়ার সুরতে তায়ামুম বাতিল হয়ে যায়।

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مَبْلٌ أَوْ أَكْثَرُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ التُّرَابُ طَهُورٌ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَالْمَبْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمِقْدَارِ لِأَنَّهُ يُلْحَقُهُ الْحَرَجُ بِدُخُولِ الْمِصْرِ وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً وَالْمُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ دُونَ خَوْفِ الْفَوْتِ لِأَنَّ التَّفَرُّطَ يَأْتِي مِنْ قِبَلِهِ -

অনুবাদ : মুসাফির কিংবা শহরের বাইরে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি পানি না পায় আর তার ও শহরের মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব হয়, তাহলে মাটি দ্বারা তায়ামুম করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন – আর যদি তোমরা পানি না পায়, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ামুম করবে। (৪ মায়িদা- ৬) তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—মাটি হলো মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমনকি যদি দশ বছরও হয়। দূরত্বের পরিমাপের ক্ষেত্রে ‘মাইল’-ই হলো গ্রহণযোগ্য। কেননা (এতটুকু দূরত্ব থেকে) শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে পানিতো অনুপস্থিত। দূরত্বই হলো বিবেচ্য বিষয়; নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বিবেচ্য নয়। কেননা ক্রটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

**মাসআলা :** পানি দ্বারা তাহারা হাশিল করা হলো আসল (اصل) আর মাটি দ্বারা তাহারা হাশিল করা হলো তার খলীফা। কায়দা হলো, খলীফা আসল (اصل)-এর পরে আসে। তাই হিদায়া গ্রন্থকার অজুর আলোচনার পর তাযাম্মুনের আলোচনা শুরু করেছেন।

**দ্বিতীয়ত :** এই ধরনের তারতীবে মূলত কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা কুরআনের আয়াত **إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** এর মধ্যে প্রথমে অজু তারপর গোসল এবং তারপর তায়াম্মুমের আলোচনা করা হয়েছে।

তায়ামুম-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : তায়ামুম -এর আভিধানিক অর্থ হলো- ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় তায়ামুম বলা হয়, তাহারাতে লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা, (ব্যবহার করা)। শায়খুল আদব (র.) শরহে নিকায়াম-এর টীকায় আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.)-এর বরাতে দিয়ে লিখেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় তায়ামুম বলা হয় পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করা।

তায়ামুম-এর সুবৃত্ত : কুরআন ও হাদীস দ্বারা তায়ামুম-এর সুবৃত্ত বা প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- **لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَلَاحٌ حَتَّى تُغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بِمَاءٍ فَارِغٍ** (যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়ামুম করবে।) (৪ মায়িদা-৬) রাসূলুল্লাহর **وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ فَارِغٌ فَتُغْسِلُ بِتُخَمٍّ أَوْ بِأَرْضٍ طَيِّبَةٍ** (জমিনকে আমার জন্য মসজিদ ও তুহর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানেই নামাজের সময় হয় তায়ামুম করে নামাজ পড়ে নেই।)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে—**طَهَّرَ الْمُسْلِمَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجَ مَا لَمْ يَجِدَ الْمَاءَ** মাটি মুসলমানকে পবিত্রকারী বস্তু যদিও দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর পানি না পাওয়া যায়।—(আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিযী)



হযরত আয়েশা (রা.)-এর যে ঘটনায় তায়ামুমের আলোচনা রয়েছে তার স্থান ও সময়ের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। সময়ের ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়, এক, এ ঘটনা ঘটেছে চতুর্থ হিজরি সনে, দুই, পঞ্চম হিজরি সনে, তিন, ষষ্ঠ হিজরি সনে। স্থানের ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়, এক, গায়ওয়ায়ে মুরায়সি যাকে গায়ওয়ায়ে বনী মুস্‌তালিকও বলা হয়। দুই, গায়ওয়ায়ে যাতুররিকা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন আলফায় দ্বারা বর্ণিত হয়েছে এখানে একটি হাদীস অর্থসহ নিবন্ধ করা হলো।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ سَفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْحِجَابِ انْقَطَعَ عَقْدِي لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَمَامِيَةِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَبَسُوا عَلَى مَا وَلَبَسَ مَعَهُمْ مَاءً فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ فَأَمَتَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَبَسُوا عَلَى مَا وَلَبَسَ مَعَهُمْ مَاءً فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَسَنَتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَبَسُوا عَلَى مَا وَلَبَسَ مَعَهُمْ مَاءً قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَنْتَعِنُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى مَا فَاَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ السَّجْمَ فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلَ بَرَكَتِكُمْ يَا أبا بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْوَعْدُ تَحْتَهُ -

(بخاری ج۲)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সফরে হিলাম যখন আমরা বায়দা বা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানেই থেমে গেলেন এবং হার তালাশ করতে লাগলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে থেমে গেলো। সে স্থানে পানি ছিল না এবং কারো নিকটও পানি ছিল না। কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করল যে, কি কাজ করল আয়েশা! তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং লোকেরা (এমন স্থানে) অবস্থান করল যেখানে কোনো পানি নেই এবং তাদের কারো কাছেও কোনো পানি নেই।

আবু বকর (রা.) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রানের উপর মাথা দিয়ে শায়িত ছিলেন। আর বললেন, (হে আয়েশা!) তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আর লোকদেরকে এমন স্থানে আটকে রেখেছ যেখানে না আছে কোনো পানি আর না আছে তাদের কাছে কোনো পানি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) আমাকে খুব ভাটলেন, আর আল্লাহ যা চাইলেন তা বললেন। তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে বারবার আঘাত করতে লাগলেন, আমি নড়াচড়া না করে চুপ থাকলাম এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা আমার রানের উপর ছিল। সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগলেন, তখনও পানি ছিল না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়ামুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন

হযরত উসাইদ ইবনে হযাইর (রা.) বললেন, হে আলো আবু বকর! এটি আপনাদের প্রথম বরকতের বিষয় নয় বরং এর আগেও আপনাদের মাধ্যমে আমরা বরকত প্রাপ্ত হয়েছি।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর যখন আমরা আমাদের উটটিকে দাড় করালাম তখন তার তলদেশে হারটি পাওয়া গেল — (বুখারী ২য়)

**মাসআলা :** যে ব্যক্তির নিকট এতটুকু পানি নেই যার দ্বারা নাপাকী দূর করা যায় অথচ সে ব্যক্তি মুসাফির। অথবা যে মুসাফির নয় তবে শহরের বাইরে অবস্থানরত এবং তার আর শহরের মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব। এ ধরনের

ব্যক্তির জন্য মাটি দ্বারা তায়ামুম করা জায়েজ। এর সপক্ষে দু'টো দলিল রয়েছে। এক, আল্লাহ তা'আলার বাণী—فَلَمْ تَجِدُوا لَئِبًا تَرَابَ طَهْرًا طَهَّرَ الْمُسْلِمَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَاءٍ يَجِدُ الْمَاءَ—দুই, রাসূলুল্লাহর বাণী—مَاءٌ يَجِدُ الْمَاءَ—এর সূত্রে বর্ণিত, যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে জুমুহী হয়ে যেরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে জুমুহী হয়ে যেতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন—المُعْبِدُ الطَّيِّبُ وَطَوَّءَ الْمُسْلِمَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ يَبْنِ (পবিত্র মাটি মুসলমানের অঙ্কু। যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। পরে যখন পানি পাওয়া যাবে। তখন শরীরের উপর পানি প্রবাহিত করে দেবে।)।—(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই)

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'-ই হলো গ্রহণযোগ্য। কেননা এতটুকু দূরত্ব থেকে শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। অথচ তায়ামুমের প্রবর্তন হলো কষ্ট, দূর করার জন্য। যেমন—আল্লাহ তা'আলার বাণী—وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।—(২২ : হাজ : ৭৮)

وَالْمَاءُ مَعْدُومٌ حَقِيقَةً দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্নটি হলো, আয়াতটি হলো মৃতলাক তাতে নির্ধারিত কোনো দূরত্বের উল্লেখ নেই। অথচ গ্রন্থকার 'এক মাইল'-এর নীতি লাগিয়েছেন, যা দ্বারা কিতাবুল্লাহকে "রায়" দ্বারা মুকায়াদ করা লাযিম আসে। অথচ তা জায়েজ নেই। জবাব হলো, প্রকৃতপক্ষে আয়াতের মধ্যে এ কথা নিহিত আছে যে, মূলত পানি না পাওয়া গেলে তায়ামুম জায়েজ। কিন্তু আমাদের ইয়াকীনের সাথে এ কথা জানা আছে যে, সর্বসম্মত মায়হাব হলো, দরজার সামনে দাঁড়ালে অবস্থায় যদি কেউ তায়ামুম করে আর বাড়ির ভিতরে পানি থাকে তাহলে তায়ামুম হবে না। কেননা সে সহজেই পানি লাভ করতে পারতো। সুতরাং বুঝা গেল যে, কষ্ট হওয়া না হওয়াই হলো মূলত-এর মাপকাঠি। আর এক মাইলের দূরত্ব হলে সাধারণত কষ্ট হয়ে থাকে। তাই এক মাইল দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তায়ামুম তখন জায়েজ হবে, যখন পানি দুই মাইল দূরত্বে থাকে। ফকীহ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ফযল উক্ত মতকেই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কারখী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন স্থানে অবস্থান করে যে পানি ধারণকারীদের আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে মনে করতে হবে যে, পানি নিকটে। তাই তার জন্য তায়ামুম জায়েজ হবে না। আর যদি পানি ধারণকারীদের আওয়াজ শুনতে না পায় তাহলে মনে করতে হবে যে, পানি দূরে তাহলে তায়ামুম জায়েজ হবে। অধিকাংশ মারশায়খ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যদি পানি সফরের দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে থাকে তবে দু'মাইল ধর্তব্য হবে। আর যদি ডানে বায়ে বা পিছনের দিকে হয় তবে এক মাইল ধর্তব্য হবে। এ অবস্থায় আশা যাওয়ায় দুই মাইল হয়ে যাবে।—(কিফায়া) ইমাম যুফার (র.) বলেন, যদি নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তায়ামুম জায়েজ, যদিও পানি এক মাইল থেকে কম দূরত্বে থাকে। হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত মতকে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, দূরত্বই হলো বিবেচ্য থাকে, নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বিবেচ্য নয়। কেননা ক্রটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। সুতরাং পানি নিকটে থাকা অবস্থায় তায়ামুম করার ক্ষেত্রে মাজুর মনে করা হবে না।

ফায়েদা : ইনায়্যা গ্রন্থকার বলেন, এক মাইল হলো তিন ফরসাখ। আর এক ফরসাখ হলো বারো হাজার কদম। ইবনে শুজা (র.) বলেন, এক মাইল হলো, সাড়ে তিন হাজার গজ থেকে চার হাজার গজ পর্যন্ত।

وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ أَنْ اسْتِعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ  
لِمَا تَلَوْنَا وَلَآنَ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ وَذَلِكَ  
بُيُوعُ النَّيَمِ فَهَذَا أَوْلَى وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحْرُكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ  
وَأَعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ (رح) خَوْفَ التَّلَفِ وَهُوَ مُرْدُودٌ بِظَاهِرِ النَّصِّ -

অনুবাদ : যদি পানি পেয়ে যায় কিন্তু সে অসুস্থ থাকে এবং আশঙ্কা হয় যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তবে তায়ামুম করবে ঐ আয়াতের ভিত্তিতে যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া অসুস্থতা বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি পানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে বেশি, অথচ এতে তায়ামুমের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং তাতে অনুমতি হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। আর রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানি ব্যবহারের কারণে হোক এতে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তায়ামুম জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে অঙ্গহানী বা প্রাণহানীর আশঙ্কার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা অগ্রাহ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তির নিকট পানি থাকে, অথচ সে অসুস্থ, পানি ব্যবহার দ্বারা তার রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। অথবা আরোগ্য লাভ করতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থায় তার জন্য তায়ামুম করা জায়েজ হবে। নকলী দলিল হলো, আল্লাহর বাণী - **وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ** আকলী দলিল, যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ তো নয় তবে পানি মূল্যের বিনিময়ে পায়। এখন পানি বিক্রোতা যদি পানির মূল্য সমমান মূল্যের অধিক মূল্য চায়, তাহলে এ সূরতে অধিক মূল্যের ক্ষতিকে দূর করার মানসে তার জন্য তায়ামুমকে জায়েজ করা হয়েছে। আর অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে অধিক। অথচ এতে তায়ামুমের ইজাযত রয়েছে। সুতরাং যেহেতু আদান ক্ষতিকে দূর করার জন্য তায়ামুমের ইজাযত আছে তাই বৃহৎ ক্ষতিকে দূর করার জন্য তায়ামুমের ইজাযত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা শরীরের নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানির ব্যবহারের কারণে হোক উভয়টি বরাবর অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তায়ামুম করা জায়েজ।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তায়ামুম তখন জায়েজ হবে, যখন পানির ব্যবহার দ্বারা অঙ্গহানী বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব আয়াতের (**وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ**) প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কেননা আয়াত মূল্যাক হওয়ার কারণে প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে তায়ামুম জায়েজ হওয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অঙ্গহানী বা প্রাণহানীর আশঙ্কার **فِيد** লাগানোর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধি করা লাযেম আসে, যা জায়েজ নেই। তবে যদি এ কথা বলা হয় যে, হানাফীগণও অসুস্থতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন অথচ আয়াতে তো এই **فِيد**-এর কথা উল্লেখ নেই? তখন এর জবাব হচ্ছে- আয়াতের পূর্বাপর দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, এখানে রোগ বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِحْرَجًا** আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্টে নিপাতিত করতে চান না। (৪ মায়িদা- ৬) এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কষ্ট তখনই হবে যখন রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়।

وَلَوْ خَافَ الْجَنْبُ أَنْ اغْتَسَلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يَمْرَضَهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَيِّ حَنِيفَةٍ (رح)  
 خَلَقًا لَهُمَا هُمَا يَقُولَانِ إِنَّ تَحَقُّقَ هَذِهِ الْحَالَةِ نَادِرٌ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلَهُ أَنْ الْعِجْزَ نَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ إِعْتِبَارِهِ —

অনুবাদ : জুনুবী ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে, সে গোসল করলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারবে। এ হুকুম ঐ অবস্থায় যখন সে শহরের বাইরে থাকবে। এর কারণ (ইতঃপূর্বে) আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি শহরেই থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একই হুকুম। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত রয়েছে। তারা বলেন, শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়। ইমাম সাহেবের যুক্তি হলো— অক্ষমতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জুনুবী ব্যক্তির যদি এ আশঙ্কা হয় যে, গোসল করার দ্বারা সে মারা যাবে অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। হিদায়া প্রণেতা বলেন, এ ধরনের ঘটনা শহরের বাইরে হলে সর্বসম্মতি ক্রমে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে। দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে শহরে ফিরে আসা কষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি শহরের বাইরে থাকা অবস্থায় জুনুবী ব্যক্তির উক্ত আশঙ্কা হয় তখনও ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে একই হুকুম। অর্থাৎ তার জন্যও তায়াম্মুম জায়েজ। সাহেবাইন (র.) বলেন, শহরে এ ধরনের আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। সাহেবাইনের দলিল হলো— শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ শহরে গরম পানি দ্বারা ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। তাই ধ্বংস হওয়া বা রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। তাই যদি শহরে তায়াম্মুমের অনুমতি দেওয়া হয় তবে সাধারণ লোকেরা সামান্য ঠাণ্ডাতেই (হীন) পথ খোজার চেষ্টা করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— এ ধরনের ভীতু জুনুবীর ক্ষেত্রে গোসল করা থেকে অপরাগতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরি।

وَالْتَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِأَحَدِهِمَا وَجْهَهُ وَيَاخُزِّي يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْقَمَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ وَتَنْفِصُ يَدَيْهِ بِقَدْرِمَا يَتَنَاثَرُ  
التُّرَابُ كَيْلًا بِصَبْرٍ مُثْلَةٍ - وَلَا يَدُ مِنَ الْاِسْتِيعَابِ فِي ظَاهِرِ الرَّايَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْوُضُوْءِ  
وَلِهَذَا قَالُوا يَخْلِلُ الْأَصَابِعَ وَيَنْزِعُ الْخَاتَمَ لِيَتِمَّ الْمَسْحُ -

অনুবাদ : তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) উভয় হাত দুইবার। একবারের দ্বারা মুখ মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয় বারের দ্বারা কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসাহ করবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) দু'বার হাত মারা একবারের দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয়বারের দ্বারা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে। (দারু কুতনী)। ইমাম উভয় হাত এমনভাবে ঝাড়া দেবে, যেন মাটি সরে যায়। যাতে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরি। কেননা তায়াম্মুম অজুর স্থলবর্তী। এ জন্যই ফকীহগণ বলেছেন যে, আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে এবং আংটি হলে তা খুলে নেবে। যাতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, তায়াম্মুম হলো মাটিতে দু'বার হাত মারা, একবার মুখ মাসাহের জন্য, আরেকবার উভয়হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহের জন্য। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, বগল পর্যন্ত মাসাহ করবে। ইমাম মালিকের (র.) একটি বর্ণনাও অনুরূপ। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় হাত কজা পর্যন্ত মাসাহ করবে। ইবনে সীরীন (র.)-এর মতে মাটিতে তিনবার হাত মারবে। এক বার শুধু চেহারার জন্য, দ্বিতীয় বার হাতের কজির পর্যন্তের জন্য। আরেকবার উভয় (ذراعين) বাহুর পর্যন্তের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, একবার চেহারার জন্য। আরেকবার বাহুর জন্য। আরেকবার উভয়টির জন্য। মাযহাবে মুখতারের দলিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-  
«التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ»-  
তায়াম্মুম হলো দু'বার হাত মাটিতে মারা। একবার হাত মারা হলো মুখমণ্ডলের জন্য, আরেকবার হাত মারা হলো উভয় হাতের জন্য।

গ্রন্থকার বলেন, জমিনের উপর উভয় হাত মেরে এমনভাবে ঝাড়া দেবে, যেন মাটি ঝরে যায় তবে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়। অর্থাৎ যেমনিভাবে **سَلَبٌ** দ্বারা অঙ্গ বিকৃত হয়ে যায় এমনিভাবে মাটি দ্বারাও যাতে চেহারা বিকৃত না হয়ে যায়। আশ্বার ইবনে ইস্যাসির (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত জমিনে মেরেছেন, পরে ফুঁক দিয়েছেন, তারপর তা দ্বারা নিজের চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করেছেন।

ইবনে ওমর ও জাবির (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, উভয় হাত জমিনের উপর হাতবে এবং এ পরিমাণ ঝাড়া দেবে যাতে মাটি ঝরে যায়। তারপর তা দ্বারা চেহারা মাসাহ করবে। তারপর পুনরায় জমিনে হাত মারবে, এবং ভালোভাবে ঝেড়ে নেবে। তারপর বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের বাহিরের অংশ এমনভাবে মাসাহ করবে এবং আঙ্গুলের মাথা থেকে আরম্ভ করে কনুই পর্যন্ত পূর্ণ করবে। পরে বাম হাতের পেট দ্বারা ডান হাতের ভিতরের অংশ কজা পর্যন্ত মাসাহ করবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটকে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরে ফিরাবে। বাম হাতের অনুরূপ ভাবে মাসাহ করবে।

**وَلَا يَدُ مِنَ الْاِسْتِيعَابِ** (তায়াম্মুমের মধ্যে استيعاب (পূরা অঙ্গ মাসাহ করা)। সুতরাং মাসাহ ব্যতীত যদি কিছু অংশও অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তায়াম্মুম হবে না। যেমনটি অজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ হকুমটি হলো যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ (اکثر) পূর্ণাঙ্গের (كل)-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। দলিল হলো মামসুহাতের (মাসাহ করার অঙ্গসমূহ) মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হওয়া শর্ত নয়। যেমন মোজা ও মাথা মাসাহের মধ্যে পূর্ণ অঙ্গ মাসাহ করা শর্ত নয়। যাহিরী রিওয়ায়েতের কারণ হলো- তায়াম্মুম হলো অজুর স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে এবং যদি আংটি থাকে খুলে নেবে যাতে মাসাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

অজুর মধ্যে استيعاب (পূর্ণ অঙ্গ দ্বীত করা) শর্ত। সুতরাং যা তার স্থলাভিষিক্ত (যেমন তায়াম্মুম) হবে তার মধ্যেও استيعاب শর্ত হবে। তায়াম্মুম যদি অজুর খলীফা না হতো তবে হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসাহ করা ওয়াজিব হতো। কেননা আত্মা হাত আলা তায়াম্মুমের আয়াত **وَجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَتَحْتِ** কে সীমা ব্যতীত উল্লেখ করেছেন।

وَالْحَدَّثَ وَالْجَنَابَةَ فِيهِ سِرَاءٌ وَكَذَا الْحَبِصُ وَالنَّفَاسُ لِمَا رَوَى أَنْ قَوْمًا جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا إِنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ هَذِهِ الرِّمَالِ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَفِينَا الْجَنْبُ وَالْحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِأَرْضِكُمْ -

অনুবাদ : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাস ও জানাবাত দু'টাই সমান। তদ্রূপ হায়েয ও নিফাসের তায়াম্মুমও। কেননা বর্ণিত আছে যে, এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে আরজ করল, আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে এক দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুন্বী এবং হায়েয নিফাসগ্ৰস্ত থাকে। তিনি ﷺ-ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের মাটির সাহায্য নেবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করবে। (মুসনাদে আহমদ)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন - جواز تيمم - كيفيت تيمم -এর মধ্যে হাদাস ও জানাবাত দু'টাই সমান। অর্থাৎ যেমনিভাবে হাদাসে আসগরের মধ্যে তায়াম্মুম শরিয়ত সমর্থিত, এমনিভাবে হাদাসে আকবরের মধ্যেও তায়াম্মুম শরিয়ত সমর্থিত। হাদাসে আসগরের তায়াম্মুমের যে পদ্ধতি, হাদাসে আকবরের তায়াম্মুমও তথৈবচ। একই হুকুম হায়েয ও নিফাসওয়ালীর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন, তায়াম্মুম শুধু হাদাসে আসগরের শরিয়ত সমর্থিত। জুন্বী, হায়েযা এবং নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য তায়াম্মুম مشروع নয়। এ মতটি ইহরত ওমর, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত। উভয় মতের মূল হলো তায়াম্মুমের আয়াত - وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ بِمِلَاسَةٍ نَسَاءٍ (মহিলাদের স্পর্শ) দ্বারা কী মুরাদ? প্রথম মতের প্রবক্তাদের মতে এর দ্বারা সহবাস (جماع) মুরাদ। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের মতে এর দ্বারা স্পর্শ (مس باليد) মুরাদ। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলিল হলো— আল্লাহ তা'আলা অজুহীন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম প্রবর্তন করেছেন, তাই জুন্বীর জন্য তা মুবাহ হবে না। তা ছাড়া জুন্বীকে অজুহীন ব্যক্তির উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। কেননা অজুহীন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমের হুকুম হলো কিয়াস বহির্ভূত। এমনিভাবে জুন্বীকে অজুহীন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করাও যাবে না। কেননা জুন্বীর হাদাস অজুহীন ব্যক্তির হাদাস থেকে বড়। অথচ সম্পৃক্ত করার জন্য সমান হওয়া শর্ত।

প্রথম মতের প্রবক্তাদের দলিল হলো— আয়াতের মধ্যে مِلَاسَةٍ (স্পর্শ) দ্বারা রূপক অর্থে সহবাস (جماع) মুরাদ নেওয়া হয়েছে। আয়াতের পূর্ণাঙ্গও তাই। ব্যাখ্যা হলো— অজুর আয়াতে হাদাস ও জানাবাত উভয়টির হুকুম বয়ান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ بِمِلَاسَةٍ نَسَاءٍ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (মহিলাদের স্পর্শ) এখানে জানাবাত তথা হাদাসে আকবরের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তারপর পানি না থাকা অবস্থায় হুকুমকে মাটির দিকে ফিরাণো হয়েছে। এবং وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ -এর মধ্যে হাদাসে আসগরের আলোচনা রয়েছে। সুতরাং মুনাসিব হলো কে হাদাসে আকবর তথা জানাবাতের উপর প্রযোজ্য বলা। তাহলে অজুর আয়াতের ন্যায় তায়াম্মুমের আয়াতেও وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ -এর মধ্যে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাসে আসগর বর্ণিত হয়েছে। এখন যদি لَسْتُمْ بِمِلَاسَةٍ -কেও উক্ত অর্থের জন্য বলা হয়, তখন খামাখা আয়াতের মধ্যে তাকবার লায়িম আসবে। আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুমকে বৈধ করেছেন, তখন আমরা বলব যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ জুন্বীর জন্যও তায়াম্মুমকে প্রবর্তন করেছেন। বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর খিদমতে এসে আরজ করল আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে একমাস দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুন্বী এবং হায়েয নিফাসগ্ৰস্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের জমিনের সাহায্য নেবে। অর্থাৎ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হাদাসে আকবরের জন্যও তায়াম্মুম مشروع আছে।

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يَمْسُ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهَاسَنِي جَنَابَةً وَلَا مَاءَ فَقَالَ ﷺ عَلَيْكَ بِالتَّصْبِيعِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে পৃথকভাবে লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নামাজ আদায় করছে। এ দেখে তিনি বললেন, ওহে ব্যক্তি! তোমাকে সবার সাথে নামাজ পড়তে কে নিষেধ করেছে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জানাবাত হয়েছিল, পানি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য মাটি জরুরি। কেননা এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। এ হাদীস দ্বারাও পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, জুন্বী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েজ।

وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) يَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جَنَسِ الْأَرْضِ كَالثَّرَابِ  
وَالرَّمْلِ وَالْحَبْرِ وَالْجَصِّ وَالتَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِجِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رح) لَا يَجُوزُ إِلَّا  
بِالثَّرَابِ وَالرَّمْلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالثَّرَابِ الْمُنَيَّبِ وَهُوَ رَوَابَةٌ عَنْ أَبِي يُونُسَ  
(رح) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا أَيْ تَرَابًا مُنَيَّبًا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَ أَنَّ  
أَبَا يُونُسَ زَادَ عَلَيْهِ الرَّمْلَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَلَهُمَا أَنَّ الصَّعِيدَ اسْمٌ لَوَجْهِ الْأَرْضِ  
سَمَّى بِهِ لِيَصْعُودَهُ وَالطَّيِّبُ بِحْتِمِلِ الطَّاهِرِ فَحَمِلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْبَقِيُّ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ أَوْ  
هُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ -

অনুবাদ ৪ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুক্তিকা জাতীয় যে কোনো বস্তু দ্বারা তায়ামুম জায়েজ। যেমন- মাটি, বালু, পাথর, সুরকি, চুনা, সুরমা ও হরিতাল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়ামুম জায়েজ হবে না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উৎপাদনকারী মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়ামুম জায়েজ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- তোমরা পবিত্র (অর্থাৎ উৎপাদনকারী) মাটি দ্বারা তায়ামুম করবে। এ কথা ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসের কারণে মাটির সাথে বালু বর্ধিত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো — صعيد - ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর طيب শব্দটি পবিত্র অর্থও বহন করা। সুতরাং সে অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। কেননা তাহারাতির ক্ষেত্রে এ অর্থই অধিক উপযোগী, অথবা ইজমার দ্বারা এ অর্থ গৃহীত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে কোন কোন বস্তু দ্বারা তায়ামুম জায়েজ, তার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মাটি জাতীয় তার দ্বারা তায়ামুম জায়েজ। মাটি জাতীয় বস্তু চিনার উপায় হলো, যে সকল বস্তু আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যায়, যেমন বৃক্ষ, আর যে সকল বস্তু গলে নরম হয়ে যায়, যেমন লোহা ও সকল বস্তু মাটি জাতীয় নয়। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু মাটি জাতীয় যেমন- মাটি, বালু, পাথর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা, হরিতাল, পাহাড়ী লবণ, ইয়াকুত, যামরাদ, যাবরজাদ ইত্যাদি। উপরোক্ত মত হলো তরফাইন (র.)-এর। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, শুধু মাটি আর বালু দ্বারা তায়ামুম জায়েজ। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, শুধু উৎপাদনকারী মাটি দ্বারা তায়ামুম জায়েজ। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا দলিল এভাবে যে, صعيد - মাটি, আর طيب - উৎপাদনকারী, এই তাফসীরটি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। সুতরাং এ তাফসীর দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়ামুম শুধু মাটি দ্বারা জায়েজ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসের কারণে (عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ) মাটির সাথে বালুও বর্ধিত করেছেন। তরফাইনের দলিল হলো- صعيد - ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মাটি দ্বারা তায়ামুম জায়েজ হবে তার দ্বারা তায়ামুম জায়েজ হবে। صعيد -এর উচ্চ অর্থ খলীল নাহবিদ থেকে বর্ণিত। আল্লামা যমবশরী (র.) যুজ্জ (র.) থেকে বর্ণনা করে তাফসীরে কাশাফে লিখেন যে, صعيد - ভূ-পৃষ্ঠের নাম। যুজ্জ (র.) মাআনিল কুরআনে লিখেন যে, আমার জানা মতে এ অর্থের ব্যাপারে কারো কোনো মতবিরোধ নেই। সিহাহ গ্রন্থগুলোতেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বাকি থাকল طيب -এর অর্থ যা ইমাম শাফিঈ (র.) উৎপাদনকারী বলেছেন। আমরা বলি طيب দ্বারা তাহির অর্থও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার বাণী طيب -এর মধ্যে طيب অর্থ তাহির তথা পাক। সুতরাং এখানেও طيب দ্বারা পাকই বুঝান হবে। কেননা এ স্থানটি হলো তাহারাতির স্থান। আর উপরোক্ত অর্থটিই মাকামে তাহারাতির অধিক সম্মানীয়। দ্বিতীয় দলিল طيب শব্দটি তাহির ও মুম্বিত তথা পাক ও উৎপাদনকারী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সর্ধসম্বতিক্রমে এর দ্বারা তাহির বুঝান। এ হিসাবে উৎপাদনকারী অর্থ হবে না। কেননা আমাদের নিকট عموم مشترك জায়েজ নেই।

ثُمَّ لَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ غُبَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لَا طَلَّاقَ مَا تَلَوْنَا وَكَذَا  
يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) لِأَنَّهُ تَرَابٌ  
رَقِيقٌ -

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাটির উপর ধূলা থাকা শর্ত নয়। কেননা আমাদের উল্লিখিত আয়াতটি নিশ্চিত। তদুপ ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধূলা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। কেননা তা মিহি মাটি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এহুকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাটির উপর ধূলা থাকা শর্ত নয়। কেননা কুরআনুল কারীমে صَفِيدًا শব্দটি হচ্ছে مَطْلُقٌ বালু হওয়া না হওয়ার কোনো তাফসীল এখানে নেই। সুতরাং সাধারণ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। তার উপর বালু হোক বা না হোক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বালু থাকা শর্ত। এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও। এবং ইমাম আহমদ (র.) ও এ কথা বলেন। এ সকল ফকীহগণের দলিল হলো আয়াতের বাণী- فَاسْفُحُوا بِرُجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَيُّ مِنَ التُّرَابِ (নিজেদের চেহারা ও হাত মাসাহে করো কিছু মাটি দ্বারা।) মোট কথা, منه -এর- من تعبيضية আঁর এর উপর আমল তখনই সম্ভব হবে যখন এর উপর বালু থাকবে। তবে এই দলিলের জবাব হলো— হতে পারে منه -এর- ضمير -এর দিকে হবে تراب এর দিকে হয়। এখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমাদের চেহারা এবং হাত মাসাহ করো হাদাস থেকে অর্থাৎ হাদাসের কারণে। তা ছাড়া এখানে من-টি ابتدائيه ও হতে পারে। অর্থাৎ তায়াম্মুমের শুরু মাটি দ্বারা হবে। এ হুকুম তরফাইনের মতে তখন হবে যখন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বালু দ্বারা তায়াম্মুম করে। এর সুরত হবে এমন যে, এক ব্যক্তি তার বালুযুক্ত কাপড় ঝাড়ল আর বালু গিয়ে তার হাতে ও চেহারায় লেগে গেল। পরে তায়াম্মুমের নিয়তে সে চেহারায় ও হাতে হাত বুলাল, এতে তার তায়াম্মুম হয়ে গেল। কেননা বালুও মিহি মাটি। সুতরাং যেমনিভাবে মোটা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ এমনিভাবে মিহি মাটি দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েজ।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার সুযোগ থাকা অবস্থায় বালু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। দলিল হলো বালু খালিস মাটি নয়; বরং আংশিক মাটি। আর কুরআনে তায়াম্মুমের আদেশ মাটিসহ এসেছে। তাই মাটি থাকা অবস্থায় অন্য বস্তুর দিকে ফিরা (عبر) জায়েজ হবে না। তবে মাটি না থাকা অবস্থায় তা দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ হবে। যেমন রুকু ও সিজদায় অপারগ হলে ইশারা করে নামাজ পড়া জায়েজ।



সহীহ মায়হাবের দলিল এই যে, তায়্যামুমই হলো একটি তাহারাৎ। তাই তার আসবাবের নিয়ত করা জরুরী নয় যেমন অজুর মধ্যে। অর্থাৎ অজু একটি তাহারাৎ, তাই তার আসবাবের নিয়ত করা জরুরি নয় বিধায় অজুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়।

فَإِنْ تَيْسَمَّ تَصْرَانِيَّ يَرْيَدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَيْسَى حَنِيفَةٍ وَمُحَمَّدٍ (رَح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رَح) هُوَ مُتَيَمِّمٌ لِأَنَّهُ تَوَيَّ قُرْبَةً مَقْصُودَةً بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمَصْحَفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ وَلَهُمَا أَنْ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهْرًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ لَاتَصَحُّ بِذَوْنِ الطَّهَارَةِ وَالْإِسْلَامَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً بِصَحِّ بِذَوْنِهَا بِخِلَافِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ لَاتَصَحُّ بِذَوْنِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ تَوَضَّأَ لِأَرْيَدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رَح) إِنَاءٌ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّيَمِّ -

অনুবাদ : কোনো খ্রিস্টান (বিধর্মী) যদি ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তায়াম্মুম করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুমকারী বলে গণ্য হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুমকারী বলে গণ্য হবে। কেননা সে একটি মুখ্য ইবাদতের নিয়ত করেছে। পক্ষান্তরে মসজিদে প্রবেশের এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা মুখ্য ইবাদত নয়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— তাহারা তাছাড়া বিশুদ্ধ হয়না এমন মুখ্য ইবাদতের নিয়ত করার অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে মাটিকে পরিষ্কারী সাব্যস্ত করা হয়নি। আর ইসলাম হলো এমন মুখ্য ইবাদত যা তাহারা তাছাড়া বিশুদ্ধ হয়। তিলাওয়াতে সিজদার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা এমন মুখ্য ইবাদত যা তাহারা তাছাড়া বিশুদ্ধ হয় না। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের নিয়ত না করেই অজু করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে অজুকারী বলে গণ্য হবে। নিয়ত শর্ত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণের নিয়তে তায়াম্মুম করেছে। তারপর মুসলমান হয়ে গেছে। তরফাইনের (র.) মতে তার এ তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে। তার দলিল হলো— সে একটি উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করেছে। কেননা ইসলাম হলো সবচেয়ে বড় উদ্দিষ্ট ইবাদত। আর উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হয় তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলাম গ্রহণের পর যদি সে (এ তায়াম্মুম দ্বারা) নামাজ পড়তে চায় তবে পড়তে পারবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো মুসলমান মসজিদে প্রবেশের অথবা কুরআন স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করে তবে তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যদি উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়তে চায় তবে নামাজ পড়তে পারবে না। কেননা মসজিদে প্রবেশ করা, কুরআন স্পর্শ করা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

তরফাইনের দলিল হলো— মাটি তখন পরিষ্কারী বলে বিবেচিত হবে যখন এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা হবে যা তাহারা ব্যতীত সহীহ হয় না। আর ইসলাম এমনটি নয়। কেননা ইসলাম তাহারা তাছাড়াও সহীহ হয়ে যায়। এর বিপরীত হলো সিজদায়ে তিলাওয়াত। কেননা সিজদায়ে তিলাওয়াত এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারা ব্যতীত সহীহ হয় না। সুতরাং যদি সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়তে তায়াম্মুম করা হয় তবে তা দ্বারা নামাজ আদায় করা সহীহ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার হিদায়া গ্রন্থের উদ্বোধিত তরফাইনের দলিলের উপর এ মর্মে সন্দেহ করেছেন যে, যদি কোনো কাফির নামাজ আদায়ের নিয়তে তায়াম্মুম করে এবং পরে মুসলমান হয়, তখন এ তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ জায়েজ হওয়া উচিত। কেননা নামাজ এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারা ব্যতীত সহীহ হয় না, অথচ কাফিরের উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ জায়েজ নয়, তাই তরফাইনের এ কথা বলা যে, মাটিকে এ সময় পরিষ্কারী ধরা হবে যখন তা দ্বারা এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা হবে যা তাহারা ব্যতীত সহীহ হয় না, ভুল। তবে উত্তম দলিল এভাবে হতে পারে যে, কাফির ব্যক্তি নিয়তের আহাল নয়। কেননা নিয়ত হলো ইবাদত, আর তায়াম্মুম নিয়ত ব্যতীত সহীহ হয় না। এ জন্য কাফিরের তায়াম্মুম সহীহ নয়।

(وَأَنْ تَرَضَا) যদি খ্রিস্টান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের নিয়ত না করেই অজু করে তারপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে এ ব্যক্তি অজুকারী বলে গণ্য হবে। এর দ্বারা যদি নামাজ পড়তে চায় তবে পড়তে পারবে। কেননা আমাদের মতে অজুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। সুতরাং তার আহাল না হলে কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তার অজু গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা তার মতে অজুর মধ্যেও নিয়ত শর্ত। আর খ্রিস্টান ব্যক্তি নিয়তের আহাল নয়। إِنَاءٌ শব্দ দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে যদিও এর দ্বারা আমাদের দলিলও বুঝে আসে।

فَإِنْ تَبَيَّنَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْلَمَ فَهُوَ عَلَى تَبَيُّهِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَبْطُلُ تَبَيُّهُ لَأَنَّ الْكُفْرَ يَنْفِيهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْإِبْدَاءُ وَالْإِنْتِهَاءُ كَالْمَحَرَّجَةِ فِي السَّكَّاجِ وَلَنَا أَنَّ الْبَقَايَ بَعْدَ التَّبَيُّهِ صَفَةٌ كَوْنِهِ طَاهِرًا فَأَعْتَاضَ الْكُفْرَ عَلَيْهِ لِيَنْفِيهِ كَمَا لَوْ اعْتَاضَ عَلَى الْوُضُوءِ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ إِبْتِدَاءٌ لِعَدِمِ التَّيَّةِ مِنْهُ -

অনুবাদ : কোনো মুসলমান যদি তায়াম্মুম করে তারপর আল্লাহ না করুন মুরতাদ হয়ে যায় তারপর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত ধর্মী বিষয়। সুতরাং এতে প্রথম অবস্থা ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। যেমন- বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপার। আমাদের দলিল এই যে, (তায়াম্মুম তো আর স্ব-সত্তায় বিদ্যমান থাকে না যাকে কুফর এসে দূর করে দেবে, বরং) তায়াম্মুমের পর ব্যক্তির মাঝে পবিত্র হওয়ার গুণই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তার উপর কুফর আরোপিত হলে তা পবিত্রতার বিপরীত ধর্মী নয়। যেমন- অজু উপর যদি কুফর আরোপিত হয়, উল্লেখ্য যে, কাফিরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তার তায়াম্মুম দুরন্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় তায়াম্মুম করেছে তারপর আল্লাহ না করুন সে মুরতাদ হয়ে গেছে; তারপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, এতে তার পূর্বের তায়াম্মুম অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর দলিল হলো:— কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত ধর্মী বিষয়। সুতরাং এতে প্রথম ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। অর্থাৎ যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত এমনিভাবে শেষ অবস্থায়ও বিপরীত। সুতরাং প্রথম অবস্থায় যখন কাফিরের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য নয় এমনিভাবে শেষ অবস্থায়ও তার তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হবে না। এ মাসআলাটি এমন- যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় বিবাহের পূর্বে হারাম হওয়ার কারণ সংঘটিত হলে বিবাহ বৈধ হয় না। তেমনি পরবর্তী অবস্থায় বিবাহের পর হারামের কারণ সংঘটিত হলেও বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম যুফার (র.)-এর মাহহাবের উপর একটি প্রশ্ন হয়। প্রশ্নটি হলো, কুফর তায়াম্মুমের বিপরীত তখন হবে- যখন তা ইবাদত হবে। আর ইবাদত নিয়ত ছাড়া কবুল হয় না। অথচ ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। সুতরাং কুফর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এমন- যেমন কুফর অজু ক্ষেত্রে। তাই যেমনিভাবে কুফরির কারণে অজু বাতিল হয় না এমনিভাবে তায়াম্মুমও বাতিল না হওয়া উচিত? জবাব হলো মুখতার মাহহাব অনুযায়ী ইমাম যুফার (র.)-এর মতেও তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত। দ্বিতীয় জবাব হলো, কুফর তায়াম্মুমের বিপরীতধর্মী এ কারণে যে, কাফির-এর মধ্যে আহলিয়াত নেই। কেননা তায়াম্মুমের প্রবর্তন হয়েছে নামাজের জন্য। আর কাফির নামাজের আহাল নয়। তাই কাফিরের তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে, নিয়ত করুক বা না করুক এবং তাতে প্রথম ও শেষ অবস্থা সমান। আমাদের দলিল হলো— তায়াম্মুম করার পর সত্তাগতভাবে তা আর বিদ্যমান থাকে না বরং ঐ তাহারাতি-ই বাকি থাকে যা তায়াম্মুম দ্বারা হাশিল হয়েছে। সুতরাং তাহারাতির উপর কুফর আরোপিত হলে তা তার বিপরীতধর্মী হয় না। যেমন- অজু করার পর যদি কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় তবে তার অজু বহাল থাকে। প্রশ্ন হলো, কাফিরের তায়াম্মুম প্রথম অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয় না কেন? এর জবাব হলো— যেহেতু কাফির নিয়তের আহাল নয় আর তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত শর্ত এ জন্য প্রথম অবস্থায় কাফিরের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আল বাতিল হয়ে যায়। যেমন- আদ্বাহর বাণী- وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ لِيَنْتَحِلْ أَثَرَهُ أَشْرَكَ أَشْرَكَ لِيَنْتَحِلْ عَمَلَهُ فَتَدَّ حَبْلَ عَمَلِهِ অথবা তায়াম্মুম বাতিল হলে যাবুদা উচিত? এর জবাব হলো, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা আ'মালের হওয়া বাতিল হয়ে যায়, আ'মাল বাতিল হয় না। তাই তায়াম্মুম বাতিল হবে না। যেমন- এক ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অজু করল এতে তার হাদাস দূর হয়ে যাবে কিন্তু এ অজু দ্বারা সে ছওয়াব পাবে না।

وَيَنْقُصُ التَّيَمُّمُ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُصُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ خَلَفَ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ وَتَنَقَّضَ أَيْضًا رُتْبَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَّرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ لَطَهْرُورَةِ التَّرَابِ وَخَائِفُ السَّيِّعِ وَالْعُدُوِّ وَالْعَطَشِ عَاجِزٌ حُكْمًا وَالتَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) قَادِرٌ تَقْدِيرًا حَتَّى لَوْ مَرَّ التَّائِمُ عَلَى التَّيَمُّمِ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ مَا يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرٌ بِمَا دُونَهُ إِبْتِدَاءً فَكَذَا انْتِهَاءً - وَلَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ لِأَنَّ الطَّيِّبَ أُرِيدَ بِهِ الطَّاهِرُ وَلِأَنَّهُ أَلَا التَّطَهِيرَ فَلَا يَدُّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ -

অনুবাদ : অজ্ঞ ভঙ্গকারী সকল বিষয় তায়ামুমকেও ভঙ্গ করে দেয়। কেননা তায়ামুম অজুর স্থলবর্তী। সুতরাং তা অজুর হুকুম গ্রহণ করবে। আর পানির দেখা পাওয়াও তায়ামুম ভঙ্গ করে দেয়, যদি পানি ব্যবহার করতে সে সক্ষম হয়। কেননা পানি পাওয়া দ্বারা ব্যবহার সক্ষমতাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যা মাটির পবিত্রকরণের সাব্যস্ত হয়েছে। হিফ্জ প্রাণী, শত্রু বা পিপাসার আশঙ্কায় শক্তি ব্যক্তি কার্যত অক্ষম। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঘুমন্ত ব্যক্তি বস্তুর সক্ষম। তাঁর মতে তায়ামুমকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তার তায়ামুম বাতিল হয়ে যাবে। (পানি দেখতে পাওয়ার) অর্থ হলো— ঐ পরিমাণ (পানি) যা অজুর জন্য যথেষ্ট হয়। (আর গোসলের ক্ষেত্রে গোসলের জন্য যথেষ্ট হয়) কেননা প্রথম অবস্থায় এর চেয়ে কম পরিমাণ ধর্তব্য নয়। সুতরাং শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য হবে না। পবিত্র মাটি ছাড়া তায়ামুম করবে না। কেননা আয়াতের মধ্যে طيب শব্দ দ্বারা পবিত্র মাটিতে বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া মাটি হলো পবিত্রকরণের উপাদান। সুতরাং পানির মতো তার পবিত্র হওয়াও জরুরি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ কুদুরী (র.) বলেন, যে সকল বস্তু অজ্ঞ ভঙ্গকারী সেগুলো তায়ামুমও ভঙ্গকারী। দলিল হচ্ছে— তায়ামুম হলো অজুর খলীফা। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আসল খলীফা থেকে শক্তিশালী হয়। সুতরাং যে সকল বস্তু শক্তিশালীর জন্য ভঙ্গকারী সেগুলো তায়ামুম ভঙ্গকারীও বটে।

قَوْلُهُ وَتَنَقَّضَ أَيْضًا : কুদুরী গ্রন্থকার বলেন, কিছু বস্তু এমনও রয়েছে যেগুলো দ্বারা অজ্ঞ ভাঙ্গে না তবে তায়ামুম ভেঙ্গে যায়। যেমন : তায়ামুমকারী ব্যক্তি যদি পানি দেখে, আর পানি ব্যবহারে সে সক্ষমও বটে, তবে এ পানি তার তায়ামুম ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার শর্ত আরোপ করার কারণ হলো, আশ্রাহর বাণী— لَمْ يَنْتَمِ التَّيَمُّمُ طَهْرُورَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ جِجَعٍ مَا لَمْ يَجِدْ أَلْمَاءَ আর হাদীসে রাসূল ﷺ قَالَ تَجِدُوا مَاءً দ্বারা পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া উদ্দেশ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি পানি বিদ্যমান থাকে; কিন্তু পানি ব্যবহারে হিফ্জ প্রাণীর আশঙ্কা হয়, কিংবা শত্রুর আশঙ্কা হয় কিংবা মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, কিংবা পানি এত স্বল্প পরিমাণ যে, ব্যবহার করলে তাকে পিপাসার্ত থাকতে হবে। এ সকল সুরতে তাকে পানি ব্যবহারে অক্ষম ধরা হবে। তাই তার জন্য তায়ামুম জায়েজ হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে পানি ব্যবহারে সক্ষম ধরা হবে। সুতরাং যদি তায়ামুমকারী ঘুমন্ত ব্যক্তি পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে তার তায়ামুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন ওজরের সম্মুখীন হয়েছে যা তার পক্ষ থেকে এসেছে, এ জন্য তাকে মাজুর ভাবা হবে না। গ্রন্থকার আরো বলেন, যে পানি দেখার দ্বারা তায়ামুম বাতিল হয়ে যায় তা দ্বারা এতটুকু পানি উদ্দেশ্য যা অজুর জন্য যথেষ্ট হয়। কেননা যখন প্রথম অবস্থায় স্বল্প পানির ইতিবার করা হয়নি তখন শেষ অবস্থায়ও ইতিবার করা হবে না।

نَيْتَمُّرًا : মাসআলা : তায়ামুম শুধু পাক মাটি দ্বারা জায়েজ। কেননা সুরআনের বাণী— صَعِيدًا طَيِّبًا -এর মধ্যে طيب দ্বারা সর্বসাম্প্রতিক্রমে তাহারাত উদ্দেশ্য। এ জন্য যার দ্বারা তায়ামুম করা হবে তারও পাক হওয়া জরুরি। দ্বিতীয় দলিল হলো, মাটি পাক করার মাধ্যম, তাই তার নিজেরও পাক হওয়া জরুরি। যেমন পানির নিজেরও পাক হওয়া জরুরি :

وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ بِرُجُوهِ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ وَجَدَ الْمَاءَ  
بِتَوْضًا وَلَا تَيْمَمَ وَصَلَّى لِبَقَعِ الْأَدَاءِ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ قَصَارَ كَالطَّامِعِ فِي الْجَمَاعَةِ  
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) وَأَبِي يُونُسَ (رحا) فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ الْأَحْوَلُ أَنْ السَّخِيرَ حَتْمٌ لِأَنَّ  
غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ وَجْهَ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعِجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةٌ فَلَا يُؤَدُّ حُكْمَهُ إِلَّا بِقَيِّنٍ  
مِثْلِهِ وَصَلَّى بِتَيْمَمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَانِضِ وَالْتَوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  
يَتَيْمَمُ لِكُلِّ فَرَضٍ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَلَنَا أَنَّهُ طَهْرٌ حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا  
بَقِيَ شَرْطُهُ -

অনুবাদ : পানি যে পাচ্ছে না, অথচ পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য আখেরী ওয়াক্তে পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। তারপর পানি পেয়ে গেলে অজু করবে, অন্যথায় তায়ামুম করে নামাজ আদায় করে নিবে। যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা নামাজ সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলে। মূল হয় এত্বের বহির্ভূত বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবত্ব। যাহিকুর রিওয়ায়াতের দলিল হলো — অপারগতা প্রকৃতই বর্তমান। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হয় না। তায়ামুমকারী তার তায়ামুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরজ, নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে প্রতিটি ফরজ নামাজের জন্য আলাদা তায়ামুম করতে হবে। কেননা তা জরুরি অবস্থার তাহারাতি। আমাদের দলিল হলো — পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি পানি বিদ্যমান না থাকে; কিন্তু আশা আছে যে, নামাজের আখেরী ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে। এ সূরতে নামাজকে আখেরী ওয়াক্তে মোস্তাহাব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার আশা না থাকে তবে অহতুজ নামাজ বিলম্ব করা দরকার নেই। তারপর যখন পানি পাওয়া যাবে অজু করবে, অন্যথায় তায়ামুম করে নামাজ আদায় করে নিবে। পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা নামাজ সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো। অর্থাৎ বিলম্ব নামাজ আদায় করলে জামাআতের সাথে পড়া যাবে। এরূপ আশাবাদী ব্যক্তির পক্ষে নামাজ শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব।

রিওয়ায়াতে উসুল বহির্ভূত বর্ণনামতে শায়খাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি পাওয়ার আশায় নামাজকে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবত্ব। সুতরাং পানি বিদ্যমান অবস্থায় যেমনিভাবে তায়ামুম জায়েজ নেই এমনিভাবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হলেও তায়ামুম করা যাবে না; বরং নামাজকে আখেরী ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করবে। যদি ওয়াক্তের ভিতরে পানি পাওয়া যায় তবে তো ভালো, অন্যথায় তায়ামুম করে নামাজ পড়ে নেবে।

যাহিকুর রিওয়ায়াতের দলিল হলো— যেহেতু পানি বিদ্যমান নেই তাই বাস্তবেই অপারগতা বিদ্যমান। আর অপারগতার হুকুম হলো তায়ামুম জায়েজ হওয়া। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হবে না। এ জন্য নামাজকে বিলম্ব করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ : আমাদের মতে এক তায়ামুম দ্বারা অনেক নামাজ আদায় করা যায়। নামাজগুলো ফরজ হোক বা নফল হোক। এক ওয়াক্তে আদায় করা হোক বা বিভিন্ন ওয়াক্তে আদায় করা হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত তায়ামুম ডসকারী কোনো কিছু না পাওয়া যায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে এক তায়ামুম দ্বারা এক ফরজ নামাজ আদায় করা যায়, দ্বিতীয় ফরজ আদায় করার জন্য দ্বিতীয়বার তায়ামুম করা জরুরি। তবে এক তায়ামুম দ্বারা অনেক নফল নামাজ আদায় করা যায়। তাও দলিল হলো— তায়ামুম দ্বারা জরুরি অবস্থার তাহারাতি। সুতরাং জরুরি অবস্থা (অর্থাৎ ফরজ নামাজের প্রয়োজন) অভাব দিলে হলে ফরজ নামাজের হুকুমে তার কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো— পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী যা হাদীস দ্বারা সাবিত। যেমন— رَأْسُ الْمَسْلُومِ ۞ -এর বাণী أَتَرَابٌ طَهَّرَ الْمُسْلِمَ অথবা جُمِلَتْ الْأَرْضُ لَنَا مَسْجِدًا وَطَهَّرًا সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

وَتَتَبَيَّنُ الصَّحِيحُ فِي الْمَصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ أَنْ اِشْتَغَلَ  
بِالظَّهَارَةِ أَنْ تَقُوتَهُ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى فَيَتَحَقَّقُ النِّعَازُ وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ  
فَخَافَ أَنْ اِشْتَغَلَ بِالظَّهَارَةِ أَنْ يَقُوتَهُ الْعِيدُ يَتَبَيَّنُ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ وَقَوْلُهُ الْوَلِيُّ غَيْرُهُ  
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَهُوَ رَوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رَج) هُوَ الصَّحِيحُ  
لِأَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْإِعَادَةِ فَلَا قُوتَ فِي حَقِّهِ -

অনুবাদ : শহর এলাকায় যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং (জানাযার) ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ হয়, আর অজু করতে গেলে জানাযা ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি তায়ামুম করতে পারবে। কেননা জানাযার কাজা নেই। সুতরাং অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের জামাআতে হাজির হয় এবং অজু করতে গেলে, ঈদের নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তবে তায়ামুম করতে পারে। কেননা ঈদের জামাআত দোহরানো হয় না। ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্য أَلْوَلِيُّ غَيْرُهُ "ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ" কথাটির উদ্দেশ্য হলো, ওয়ালীর জন্য তায়ামুম করা জায়েজ নয়। এটি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা এবং এটাই বিত্ব। কেননা ওয়ালীর অধিকার আছে নামাজ দোহরানোর। সুতরাং তার পক্ষে ফউত হওয়া প্রযোজ্য নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক সুস্থ ব্যক্তি শহরে তায়ামুম করতে পারে, যদি জানাযা উপস্থিত হয়, আর ওয়ালী সে ব্যতীত অন্য কেউ হয় এবং তার এ আশঙ্কা হয় যে, যদি সে অজু করা আরম্ভ করে তবে জানাযা ফউত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি ঈদের নামাজ পড়তে হাজির হলো এবং তার এ আশঙ্কা হয় যে, অজু করতে গেলে তার ঈদের নামাজ ফউত হয়ে যাবে, তখন এ ব্যক্তি তায়ামুম করে নামাজে শরিক হয়ে যাবে। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, কায়দা আছে যে, প্রত্যেক ঐ নামাজ যা إِلَى يَدٍ (যার বদলা নেই) ফউত হয়ে যায়, সে নামাজ পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তায়ামুম দ্বারা আদায় করা জায়েজ। আমাদের মতে জানাযার নামাজও এ পর্যায়ে। কেননা তার কাজা নেই। এমনিভাবে ঈদের নামাজেরও কাজা নেই।

গ্রন্থকার صحيح -এর فِي د বৃদ্ধি করে مريض থেকে احتراز করেছেন। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়ামুম জায়েজ। চাই সে শহরে হোক বা বাইরে হোক, ওয়ালী হোক বা না হোক, নামাজ ফউতের ভয় থাকুক বা না থাকুক। আর مصر -এর فِي د দ্বারা মাঠ থেকে احتراز করেছেন। কেননা মাঠে তায়ামুম জায়েজ। ওয়ালী হোক বা না হোক। কেননা সাধারণত মাঠে পানি পাওয়া যায় না।

কুদুরী (র.) যে বলেছেন, 'ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ' এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, ওয়ালীর উপর জানাযার জন্য তায়ামুম করা জায়েজ নেই। এটি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিত্ব। কেননা ওয়ালীর জানাযার নামাজ দোহরানোর অধিকার আছে। তাই তার ক্ষেত্রে ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। যাহিরুর রিওয়াযাতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীর জন্যও তায়ামুম করা জায়েজ। কেননা জানাযার মধ্যে অপেক্ষা করা মাকরুহ। ইবনে আক্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِذَا نَجَا تِلْكَ جَنَازَةً وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وَضُوٍّ فَتَبَيَّنْ وَصَلَ عَلَيْهِ -

যদি হঠাৎ জানাযা হাজির হয় আর তুমি অজুহীন হও, তবে তায়ামুম করে জানাযার নামাজ আদায় কর। ইবনে আক্বাস (রা.) ওয়ালী গায়রে ওয়ালীর কোনো তাফসীর করেননি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এ অবস্থায়ও মৃত্যুলাকান তায়ামুম করা জায়েজ। ওয়ালী সে হোক বা অন্য কেউ ওয়ালী হোক।

وَأَنَّ أَحَدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُقْتَدِرِ فِي صَلَوةِ الْعَبِيدِ تَيَسَّمُ وَبَنَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)  
وَقَالَ لَا يَتَيَسَّمُ لِأَنَّ اللَّاحِقَ يُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَلَا يَحَافُ الْفَوْتُ وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ  
بَاقٍ لِأَنَّهُ يَوْمَ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيهِ عَارِضٌ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَالْخِلَافَ فِيمَا إِذَا شَرَعَ  
بِالْوُضُوءِ وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّيَسُّمِ تَيَسَّمُ وَبَنَى بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْجَبْنَا الْوُضُوءَ يَكُونُ  
وَاجِبًا لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ فَيُفْسَدُ -

অনুবাদ : ইমাম কিংবা মুকতাদী যদি ঈদের নামাজের (মধ্যে) হাদাসগ্রস্ত হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুম করবে এবং বিনা করবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করতে পারবে না। কেননা لاحق ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ আদায় করতে পারে। সুতরাং তার ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আশঙ্কা বিদ্যমান আছে। কেননা সেদিন হলো ভিড়ের দিন। ফলে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভূত হতে পারে, যা তার নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে, যখন অজু দ্বারা নামাজ শুরু করে থাকে। আর তায়াম্মুম দ্বারা শুরু করে থাকলে সকলের মতেই তায়াম্মুম করে বিনা করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর অজু ওয়াজিব করি, তাহলে নামাজের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঈদের নামাজের মধ্যে যদি ইমাম অথবা মুকতাদী হাদাসগ্রস্ত হয় এবং সে অজু করে নামাজ শুরু করেছিল। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুম করে বিনা করবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করবে না; বরং অজু করে নামাজ পূরা করবে। তাঁদের দলিল হলো— এ ব্যক্তি লাহিক। আর লাহিক ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ আদায় করতে পারে। তাই তার নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই। আর যার নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা নেই তার পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার ইজাযত নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা এখনো বিদ্যমান আছে। কেননা ঈদের দিন ভিড়ের দিন, ফলে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা তার নামাজ নষ্ট করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন কোনো ব্যক্তি তাকে সালাম দিল এবং সে তার জবাব দিল। কিংবা কেউ তাকে মুবারকবাদ দিল আর সে তা কবুল করল। এতে তার নামাজ ফউত হয়ে যাবে। আর ঈদের নামাজের কাজাও নেই। কেননা ঈদের নামাজ জামাআতের সাথে مشروع হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায়ও নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা বাকি আছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের এ মতপার্থক্য তখন প্রযোজ্য হবে, যখন অজু দ্বারা নামাজ শুরু করা হয়। আর যদি তায়াম্মুম করে শুরু করা হয়, তবে সকলের মতেই তায়াম্মুম করে বিনা করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর অজু ওয়াজিব করি, তাহলে নামাজের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো তার নামাজই ফাসিদই হয়ে যাবে।

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ وَإِنْ خَافَ الْفُتُوتَ لَوُتَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّىهَا وَلَا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا لِأَنَّهَا تَفُوتُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الظُّهْرُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَكَذَا إِذَا خَافَ فُتُوتَ الْوَقْتِ لَوُتَوَضَّأَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْضِي مَا قَاتَهُ لِأَنَّ الْفُتُوتَ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ قَتِيَمٌ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ لَمْ يَعِيدْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رح) يَعِيدُهَا وَالْخِلَافُ فِيهَا إِذَا وَضَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَضَعَهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ لَهُ أَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي رَحْلِهِ تَوَبَّ فَنَسِيَهُ وَلَئِنْ رَحَلَ الْمُسَافِرُ مَعِينًا لِلْمَاءِ عَادَةً فَيَفْتَرِضُ الطَّلَبَ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تُذْكَرُ بِذُنُوعِ الْعِلْمِ وَهِيَ التَّمَرُّدُ بِالْوُجُودِ وَمَاءُ الرَّحْلِ مَعِينٌ لِلشُّرْبِ لَا لِلِاسْتِعْمَالِ وَمَسْأَلَةُ الشُّرْبِ عَلَى الْإِخْتِلَافِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ فَقَرُصُ السَّيْرِ يَفُوتُ لَا إِلَى خَلْفٍ وَالظُّهْرُ بِالْمَاءِ تَفُوتُ إِلَى خَلْفٍ وَهُوَ التَّيَمُّمُ -

অনুবাদ : জুমুআর নামাজের ব্যাপারে যদি আশঙ্কা করে যে, অজু করলে তা ফুটত হয়ে যাবে, তাহলে তায়াম্মুম করবে না; বরং (অজু করার পর) যদি জুমুআর নামাজ পায় তাহলে জুমুআ আদায় করবে। অন্যথায় চার রাকাত জোহর আদায় করবে। কেননা তা স্থলবর্তী রেখে ফুটত হয়। আর তা হলো জোহরের নামাজ। আর ঈদের নামাজ এর বিপরীত। তদ্রূপ যদি অজু করার ব্যাপারে নামাজের সময় ফুটত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারবে না; বরং অজু করবে এবং যে নামাজ ফুটত হয়েছে তা কাজা করবে। কেননা এ নামাজ স্থলবর্তী রেখে ফুটত হচ্ছে। আর তা হলো কাজা। মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে নেয়, এরপর পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত নামাজ দোহরায়ে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত নামাজ দোহরায়ে। এ মতপার্থক্য হলো ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। ওয়াক্তের ভিতরে এবং ওয়াক্তের পরে স্মরণ হওয়ার একই হুকুম। ইমাম আবু ইউসুফের (র.) দলিল হলো— সে পানি প্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং সে হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে তার বাহনে রাখা কাপড়ের কথা ভুলে যায়। তা ছাড়া মুসাফিরের বাহনে সাধারণত পানি মওজুদ রাখা হয়। সুতরাং পানির খোঁজ করা তার উপর ফরজ। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো— জানা না থাকলে সক্ষমতা বুঝা যায় না, আর পানির প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর বাহনে (সাধারণত) খাওয়ার পানি রাখা হয়, ব্যবহারের জন্য নয়। আর বস্ত্রের মাসআলায়ও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি এ মাসআলায় ঐকমত্য থাকে, তাহলে উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতরের ফরজ ফুটত হচ্ছে— স্থলবর্তীহীনভাবে। আর পানি দ্বারা তাহারাও হাসিল করার বিষয়টি ফুটত হচ্ছে একটি স্থলবর্তী রেখে, তা হলো তায়াম্মুম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি অজু করতে গেলে জুমুআর নামাজ ফুটত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলেও জুমুআর জন্য তায়াম্মুমে অনুমতি নেই; বরং তার জন্য অজু করা জরুরি। অতঃপর যদি সে জুমুআর নামাজ পায় তবে আলহামদুলিল্লাহ জুমুআর নামাজ আদায় করবে। অন্যথা জোহরের নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো— যদি জুমুআর নামাজ ফুটত হয়ে যায় তবে তার খলীফা



জোহর বিদ্যমান আছে। এ জন্য পানি থাকা অবস্থায় শুধু নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কায় তায়ামুম করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। তবে ঈদের নামাজ এর বিপরীত। যদি ঈদের নামাজ ফউত হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তায়ামুম করে নামাজ আদায় করবে। কেননা ঈদের নামাজের কাজা নেই।

**ফায়িদা :** হিদায়া গ্রন্থকার জোহরকে জুমার খলীফা বলেছেন। অথচ শায়খাইন (র.)-এর মতে জুমা হলো জোহরের খলীফা। এর জবাব হচ্ছে— হিদায়া গ্রন্থকার এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মায়হাব হলো মুখতার মায়হাব। কেননা তাঁর মতে জুমুআর দিন জুমা হলো আসল, আর জোহর হলো তার খলীফা। দ্বিতীয় জবাব হলো— জুমুআর দিনে যুহরের নামাজ **سورة** খলীফা। এ কারণে জুমার নামাজ ফউত হয়ে গেলে জোহরের নামাজ পড়া হয়। তার উদ্দেশ্য নয়। (অর্থাৎ জোহর ফউত হয়ে গেলে জুমুআ পড়া হয় না) এ জন্য হিদায়া গ্রন্থকার জোহরকে জুমুআর খলীফা বলেছেন।

**إِذَا خَافَ نَفْثَ الْوَسْوَاسِ** মাসআলা হলো, যদি অজু করার কারণে নামাজের ওয়াক্ত ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তায়ামুম করতে পারবে না; বরং অজু করতে হবে এবং যে নামাজ ফউত হয়ে গেছে তার কাজা করবে। কেননা এ নামাজ তার খলীফা রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাজা। তাই তায়ামুম করে তা আদায় করা জায়েজ হবে না। কেউ কেউ উক্ত ইবারতে তাকরার হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ ধরনের হুকুম পূবেও বর্ণিত হয়েছে? এর জবাব হচ্ছে, পূর্বের অধ্যায়ে হিদায়া প্রশ্নোত্তার বক্তব্য ছিল আর এ অধ্যায়ে ইমাম কুদুরীর বক্তব্য। সুতরাং তাকরার হলো না।

**وَالْكَافِرُ إِذَا نَسِيَ آتَاءَ الْخ** যদি মুসাফির তায়ামুম করে নামাজ পড়ে অথচ তার বাহনে পানি রক্ষিত ছিল। এর দুটো সূরত হতে পারে, হয়তো তার পানির কন্ডা ছিল এবং ঐ পানি হয়তো সে নিজ হাতে রাখছে অথবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রাখছে। কিংবা তার পানির কথা জানাই ছিল না। আর এ সূরত এভাবে যে, অন্য কেউ তার নির্দেশ ছাড়া পানি রাখছে। যদি দ্বিতীয় সূরত হয় (তার নির্দেশ ছাড়া পানি রাখা হয়) তবে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। কেননা মানুষ অন্যের কাজের দ্বারা কোনো হুকুমের মুখাতাব হয় না। আর যদি প্রথম সূরত হয় (অর্থাৎ সে বা তার নির্দেশে পানি রাখা হয়) এ অবস্থায় বাহনে পানি ছিল না ধারণা করে তায়ামুম করে নামাজ পড়ে, অথচ তার বাহনে পানি ছিল তাহলে কোনো ইমামের মতেই তার তায়ামুম জায়েজ হয়নি। তার অজু করে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। কেননা এ সূরতে অলসতা তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি এ ব্যক্তি বাহনে পানি রেখে ভুলে যায় এবং তায়ামুম করে নামাজ পড়ে, তারপর তার পানির কথা স্মরণ হয় তাহলে তরফাইনের মতে তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। ওয়াক্তের ভিতরে পানির কথা স্মরণ হোক বা ওয়াক্তের বাইরে হোক। ইমাম শাফি'ই (র.)-এরও একই মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো— এই মুসাফির ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর তায়ামুম এর প্রবর্তন হয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পানি না পায়। সুতরাং তার তায়ামুম জায়েজ হবে না। আর এ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে নিজের কাপড়ের কথা ভুলে যায়, আর উলঙ্গ হয়ে বা নাপাক কাপড় নিয়ে নামাজ আদায় করে। সুতরাং পাক কাপড়ের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। দ্বিতীয় দলিল হলো— সাধারণত মুসাফিরের বাহনে পানি মজবুদ রাখা হয়। তাই বাহনে পানির বেজ নেওয়া ওয়াজিব ছিল। অথচ সে তালাশ করেনি। তাই তাকে মাজুর ধরা হবে না বিধায় তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে।

তারফাইনের দলিল হলো— জানা ছাড়া পানির উপর সক্ষমতা বুঝা যায় না। আর পানি প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, পানির উপর সক্ষমতা লাভ করা। সুতরাং যখন তার পানির কথা জানাই নাই, তাই তার পানির উপর কুদরত হাসিল হলো না। এ অবস্থায় তার জন্য তায়ামুম জায়েজ এবং নামাজও সহীহ। সুতরাং তা আর দোহরানোর প্রয়োজন নেই। আর এ কথা বলা যে, মুসাফিরের বাহনে পানি রাখা হয়? তার জবাব হচ্ছে— বাহনে সাধারণত খাওয়ার পানি রাখা হয়, অজু ও গোসলে ব্যবহারের পানি রাখা হয় না।

**وَسَنَسَلُكَ النَّوْبَ** -এর দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো— কাপড়ের মাসআলাটিও অনুরূপ মুখতালাফহীই অর্থাৎ তারফাইনের মতে যখন পাক কাপড়ের কথা ভুলে গেছে তখন নামাজ উলঙ্গ বা নাপাক কাপড় দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। পাক কাপড়ের কথা স্মরণ হলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, কাপড়ের মাসআলায় ঐকমত্য রয়েছে, তারপরও পানির মাসআলাকে কাপড়ের মাসআলার উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না। কেননা উভয় মাসআলা মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য হলো— সন্তর ঢাকা ফরজ। সুতরাং যদি সন্তরের ফরজ ফউত হয়ে যায়, তবে তার কোনো স্থলবত্তী নেই। আর যদি পানির সাথে তাহারাতি হাসিল করার বিষয়টি ফউত হয়ে যায় তবে তা স্থলবত্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হচ্ছে তায়ামুম।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَسِيِّمِ طَلَبُ الْمَاءِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى طَنِّهِ أَنْ يَقْرُبَهُ مَاءٌ لِأَنَّ  
الْغَالِبَ عَدَمُ الْمَاءِ فِي الْفُلُوكَاتِ وَلَدَلِيلَ عَلَى الْوُجُودِ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِدًا وَإِنْ غَلَبَ عَلَى  
طَنِّهِ أَنْ هُنَاكَ مَاءٌ لَمْ يَجَزْ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ نَظَرًا إِلَى  
الدَّلِيلِ ثُمَّ يَطْلُبُ مِقْدَارَ الْغَلْوَةِ وَلَا يَبْلُغُ مِيلًا كَبِيرًا يَنْقَطِعَ عَنْ رَفْعِهِ۔

অনুবাদ : তায়াম্মুকারীর অন্তরে যদি প্রবল ধারণা না হয় যে, কাছেই পানি আছে তবে তার জন্য পানির খোঁজ নেওয়া জরুরি নয়। কেননা বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। আর পানির পাওয়ায় কোনো প্রমাণ ও বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত নয়। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সেখানে পানি আছে, তাহলে খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম করা তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা (প্রবল ধারণা জনিত) প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানি প্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে। তবে পানির অনুসন্ধানের ব্যাপার এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত (কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ তিনশ গজ) খোঁজ করবে অর্থাৎ নিষ্কেপের পর তা যতটুকু পর্যন্ত যায়। এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না, যাতে সে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে তায়াম্মুকারী ব্যক্তির জন্য পানির অনুসন্ধান করা ওয়াজিব নয়, শর্ত হলো যদি পানি কাছে হওয়ার প্রবল ধারণা না হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ডানে বায়ে পানি অনুসন্ধান করা শর্ত। কেননা قَتَبْتُمَا مَاءً فَتَيَسَّمَا -এর মধ্যে তায়াম্মুমের হুকুম হলো পানি না পাওয়ার সময়। আর পানি না পাওয়া তখনই বুঝে আসবে যখন অনুসন্ধান করা হবে। তাই তায়াম্মুম করার পূর্বে অনুসন্ধান করা জরুরি।

আমাদের দলিল হলো— আয়াতের মধ্যে না পাওয়া যাওয়া শব্দটি مَطْلَقٌ। এখানে তলব ও গায়রে তলব-এর কোনো ফিদ নেই। এ কারণে اِطْلَافٌ بِمَعْنَى عَلَى اِطْلَافٍ -এর উপর ভিত্তি করে আয়াতটিকে তলব ও গায়রে তলব-এর ফিদ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণত বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। আর পানির অস্তিত্বের উপর কোনো প্রমাণ ও বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানি প্রাপ্ত নয়। এ অবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। তাই অনুসন্ধান ছাড়াও তায়াম্মুম করাকে জায়েজ বলা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এ কথা বলা যে, তলব ব্যতীত অস্তিত্ব পাওয়া যায় না (عدم وجدان) কথাটি সহীহ নয়। অর্থাৎ وجود -এর জন্য طلب জরুরি এ কথাটি ঠিক নয়; বরং তলব ছাড়াও وجود হতে পারে। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- مَن وَجَدَ نَظْفَةً فَلْيَغْتَرِفْهَا (যে ব্যক্তি লুকাতা পাবে সে তার ঘোষণা করবে।) উক্ত হাদীসে ঐ ব্যক্তিকে واجد বলা হয়েছে যদিও তার পক্ষ থেকে তলব পাওয়া যায়নি। আর যদি “প্রবল ধারণা” হয় যে, এখানে পানি বিদ্যমান তাহলে তার তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না, যতক্ষণ না সে পানি অনুসন্ধান করবে। কেননা প্রবল ধারণা জনিত প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানি প্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে।

গ্রন্থকারের ইবারতে প্রবল ধারণা শব্দটি ইলম তথা জ্ঞানের স্থলবতী। সুতরাং যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, পানি নিকটে, তাহলে তায়াম্মুম জায়েজ হতো না। এমনভাবে যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলেও তায়াম্মুম জায়েজ হবে না। কতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত পানি অনুসন্ধান করবে? এ ব্যাপারে হিদায়া গ্রন্থকারের তাহকীক হলো, এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত পানি তালাশ করবে, এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না। অন্যথা সে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

ফায়িদা : غلوة লাম-এর যবরের সাথে পঠিত, তীরদাজ ব্যক্তি তার কামান থেকে তীর নিষ্কেপ করার পর তীর চালানোর স্থান এবং তার হবে। পঠিত হওয়ার স্থানের মাঝের ব্যবধানকেই গালাওয়াহ বলে। কেউ কেউ বলেন, তিনশ গজ থেকে চারশ গজের ব্যবধানকে গালাওয়াহ বলা হয়।

وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَسَّمَّ لِعَدَمِ الْمَنَعِ غَالِبًا فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَسَّمُّ لِيَحْقُقَ الْعَجْزَ وَلَوْ تَيَسَّمَّ قَبْلَ الطَّلَبِ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَالَا لَا يَجْزِيهِ لِأَنَّ الْمَاءَ مُنْذُولٌ عَادَهُ وَلَوْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِثْلِ وَعِنْدَهُ ثَمَنُهُ لَا يَجْزِيهِ التَّيَسُّمُّ لِيَحْقُقِ الْقُدْرَةَ وَلَا يَلْزَمُهُ تَحْمَلُ الْغَيْنِ الْفَاحِشِ لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

অনুবাদ : যদি তার সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে, তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার কাছে থেকে পানি চেয়ে নিবে। কেননা সাধারণত পানি দিতে অসম্মতি থাকে না। যদি সে তাকে পানি না দেয় তাহলে অপারগতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুম করে নেবে। যদি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে নেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা অন্যের মালিকানা থেকে চাওয়া জরুরি নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে না, কেননা পানি সাধারণত এমনিই দেওয়া হয়ে থাকে। যদি ন্যায্য মূল্য ছাড়া পানি দিতে অস্বীকার করে আর তার কাছে পানির মূল্য থাকে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তবে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য বহন করা তার জন্য জরুরি নয়। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুমকে রহিত করে দেয়। আল্লাহই অধিক জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি সফর সঙ্গীর কাছে পানি থাকে, তাহলে হুকুম হলো, তায়াম্মুম করার পূর্বে তার কাছে পানি চাইবে। যদি সে পানি দিয়ে দেয় তবে অজু করে নামাজ পড়ে নেবে। আর যদি না দেয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। দলিল হলো— সাধারণত কেউ পানি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে না; বরং চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয়। এ জন্য তায়াম্মুম করার আগে চাওয়া জরুরি। আর অস্বীকারের সুরতে যেহেতু মূলত অপারগতা পাওয়া গেছে তাই তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে।

কারো কারো মায়হাব হলো যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, 'চাইলে পানি দেবে তাহলে সঙ্গীর নিকট পানি চাওয়াও ওয়াজিব, অন্যথায় নয়।—(কিফায়া)

আর যদি সঙ্গীর নিকট পানি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উচ্চ তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যথেষ্ট হু. না। তাঁদের দলিল হলো— পানি এমন বস্তু যা দিতে সাধারণত অস্বীকার করা হয় না। তাই সঙ্গীর নিকট হওয়া মানে তার নিকটে থাকা এবং সে পানি ব্যবহারের সামর্থ্যবান হওয়া। আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো— অন্যের মালিকানা থেকে কোনো কিছু চাওয়া তার জন্য জরুরি নয়। তা ছাড়া চাওয়াও তো এক ধরনের হয়ত। এ কারণেও তার উপর সঙ্গীর কাছে পানি চাওয়া জরুরি নয়।

আর যদি তার সঙ্গী মূল্যের বিনিময়ে পানি দিতে চায়, এ ব্যক্তিও মূল্য দিয়ে পানি নিতে চায় তবে এর তিনটি অবস্থা হতে পারে।

এক. সে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে পানি বিক্রয় করতে চায়।

দুই. একেবারে কম মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চায়।

তিন. অধিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চায়। প্রথমও দ্বিতীয় সুরতে তায়াম্মুম জায়েজ নয়। কেননা এই দুই সুরতে পানি ব্যবহারের সামর্থ্য পাওয়া গেছে। কেননা মূল্য দিতে সক্ষম হওয়া মানে পানির উপর সক্ষম হওয়া। তাই এই দুই অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ নেই। আর তৃতীয় সুরতে তায়াম্মুম জায়েজ। কেননা অস্বাভাবিক অধিক মূল্য বহন করা তার জন্য ক্ষতিকারক। অথচ ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুমকে রহিত করে দেয়। কেননা মুসলমানের মাল তার নিকট এমন মর্যাদাপূর্ণ যেমন তার জ্ঞান মর্যাদাপূর্ণ। আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ততাকে রহিত করা হয়েছে সেহেতু মালের ক্ষতিগ্রস্ততাও রহিত হয়ে যাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْأَخْبَارِ فِيهِ مُسْتَفِيضَةٌ حَتَّى قِيلَ إِنَّ مَنْ لَمْ يَرَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا لَكِنَّ مَنْ رَأَاهُ ثُمَّ لَمْ يَمْسَحْ إِذَا بِالْعِزْمَةِ كَانَ مَاجُورًا -

### পরিচ্ছেদ : মোজার ওপর মাস্হ করার বিবরণ

অনুবাদ : উভয় মোজার ওপর মাস্হ করার বৈধতা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণ মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। এমনকি বলা হয় যে ব্যক্তি মোজার ওপর মাস্হ করাকে জায়েজ মনে করে না, সে বিদআত পছন্দী। তবে যে ব্যক্তি জায়েজ মনে করার পরও আযীমতের ওপর আমলের উদ্দেশ্যে মোজার ওপর মাস্হ করে না, সে ছওয়াব পাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) তায়াম্মুমের আলোচনা শেষ করার সাথে সাথে মোজার ওপর মাস্হ করার احكام উল্লেখ করেছেন কয়েকটি কারণে। যথা—

(১) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই মাস্হ মূলক পবিত্রতা।

(২) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই বদল। তায়াম্মুম হচ্ছে 'অজু'-এর বদল, আর মোজার ওপর মাস্হ করা হচ্ছে পা ধোয়ার বদল।

(৩) তায়াম্মুম এবং মাস্হ উভয়টিই رخصت مرقنه অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি ব্যবহারের পরিবর্তে বিকল্প অবলম্বনের অবকাশ।

(৪) এতদ উভয়ের প্রত্যেকটিই عارض (অর্থাৎ তাহারাৎ হাসিলের সাময়িক ব্যবস্থা)। কারণ স্থায়ী ব্যবস্থা বা আসল হচ্ছে ধৌত করা।

(৫) তায়াম্মুম এবং মোজার ওপর মাস্হ উভয়ের মাঝেই অজুর অঙ্গ সমূহের সবগুলো ব্যবহার করার পরিবর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি অঙ্গকে ব্যবহার করা যথেষ্ট।

حديث فعلى এবং حديث فولى এই দুই হাদীসে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে الحديث فعلى এবং الحديث فولى উভয় প্রকারের হাদীস বর্ণিত আছে।

حديث فعلى : হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবীগণের এক বিরাট জামাআত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মাস্হ করেছেন।

حديث فولى : হযরত ওমর, এবং হযরত আলী (রা.)সহ সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাআত বর্ণনা করেছেন যে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا۔

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত্র (মোজার ওপর) মাস্হ করবে, আর মুসাফির ব্যক্তি করবে তিন দিন তিনরাত্র। - (মুসলিম শরীফ)

وَقَالَ الْمُخْتَلِفَةُ بَرُّ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ أَصْبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيَةٌ صَبَّغْتُ الْكُمَيْنِ فَأَخْرَجَ بَذِيْعٍ مِنْ تَحْتِ ذَيْلِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ أَنْتَ بَرُّ الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

“হযরত মুগীরা ইবনে ত'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করছিলেন আর আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। ঐ সময় তিনি একটি শাম দেশীয় জুবা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, যার আন্তিন (জামা বা কোট ইত্যাদির হাতা) ছিল খুবই সংকীর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরে হাত মোবারক জুবার নিচের দিক দিয়ে বের-করে তাঁর মোজার ওপর মাসুহ করলেন। আমি বললাম, আপনি কি পা ধৌত করতে ভুলে গেছেন? তিনি বললেন- আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন”

হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا حُكِّمْنَا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا تَنْتَعِ خِفَافَتَا أَيْدِيهِمْ وَلِيَالِيَهُنَّ الْأَعْنَ جَنَابَهُ وَلَكِنْ مِنْ غَائِبَةٍ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى

“যখন আমরা মুসাফির থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত্র মোজা না খোলার কথা বলতেন। কিন্তু জানাবাতের অবস্থা এর থেকে ব্যতিক্রম অর্থাৎ এ অবস্থায় আমরা সোজা খুলে নিতাম; তবে পেশাব পায়খানা এবং নদ্রার কারণে মাত্র মোজা খুলতাম না।”

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন সন্তরজন সাহাবীকে পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই الْخُفَّيْنِ-এর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রা.) বলেন, বিদালোকের মতো পরিষ্কার হওয়ার পরই আমি মোজার ওপর মাসুহ করার কথা বলেছি। যে ব্যক্তি এর বৈধতায় বিশ্বাসী নয়, সে বিদ'আতী।

ইমাম কারখী (র.) বলেন এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আমার কুফরির আশঙ্কা হয়, কারণ মোজার ওপর মাসুহ সংক্রান্ত হাদীস সমূহ “তাওয়াতুর” এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আরো বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) কে আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন-

هُوَ أَنْ يُقْضَى الْخُفَّيْنِ وَأَنْ يُغَيَّبَ الْخُفَّيْنِ وَأَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিচয় হচ্ছে- শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত সাহাবীগণের তুলনায় আফযল মনে করা, খাতানাইন তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' জামাতা হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-কে ভাল বাসা আর মোজার ওপর মাসুহকে জায়েজ মনে করা।

কিফায়া নামক কিতাবের লিখক উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর এই উক্তিটি হযরত আনাস (রা.)-এর একটি বক্তব্য থেকে গৃহীত। হযরত আনাছ (রা.) বলেছিলেন-

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُقْضَى الْخُفَّيْنِ وَتُجَبَّ الْخُفَّيْنِ وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -

অর্থাৎ সুন্নাত হচ্ছে- শায়খাইনকে মর্দাদা দেওয়া, দু' জামাতাকে মুহাব্বত করা এবং মোজার ওপর মাসুহ করাকে জায়েজ মনে করা।

কেউ কেউ বলেছেন, মোজার ওপর মাসুহ করা আদ্বাহর কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত। আর তা এ ভাবে যে, সূরা মাইদা এর যে আয়াতে (৬ম অধ্যায়) অজু-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ارْجُلَكُمْ কথার ওপর عطف হওয়ার কারণে مجبور অর্থাৎ لا এর নিচে كسرة দিয়ে পাঠ করার উপযুক্ত। আর معطوف এবং معطوف عليه-এর হুকুম যেহেতু একই, তাই অজুর ক্ষেত্রে পা-এর বিধানও সেটাই থাকবে, যে বিধান রয়েছে মাথার। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অজুতে মাথা মাসুহ করা ফরজ। সুতরাং পা মাসুহ করাও ফরজ হওয়া উচিত। তবে كسرة-এর কিরাআতটি যেহেতু نصب যুক্ত কিরাআতের বিপরীত, সেহেতু উভয় কিরাআতের ওপর আমল বজায় রাখার নিমিত্তে এইভাবে সাযুজ্য বিধান করা হয়েছে যে, দু' কিরাআত দুই অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হবে। অর্থাৎ যখন পায়ে মোজা থাকবে না; তখন نصب যুক্ত কিরাআত (ارْجُلَكُمْ)-এর ভিত্তিতে অমুর সময় পা ধৌত করা ফরয বলে গণ্য হবে। আর যখন পায়ে মোজা থাকবে, তখন جر যুক্ত কিরাআত (ارْجُلَكُمْ) এর ভিত্তিতে পা মাসুহ করার বৈধতা প্রমাণিত হবে।

অবশ্য কিফায়া-এর গ্রন্থকার উপরোক্ত উক্তিকে নাকচ করে দিয়েছেন।

الخُفَّيْنِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : উপরোক্ত ইবরাতে শায়খ কুদূরী (র.) একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মোজার ওপর মাসুহ করা জায়েজ হলেও তার ওপর আমল করা বাধ্যতা মূলক নয়। বরং তা না করে পা ধৌত করা হচ্ছে অযীমত। এর জন্য আদ্বাহর কাছে অধিক ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে আইনুল হিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি মাসুহ না করার দরুন খারজী বা রাফেজী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সন্দেহ হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মাসুহ করাটাই উত্তম।

وَيَجْزِي مَنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَيْسَ هُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحَدَتْ  
خَصَّهُ بِحَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَا مَسَحَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
وَيَحَدِّثُ مُتَأَخِّرًا لِأَنَّ الْخُفَّ عُهُدٌ مَانِعٌ وَلَوْ جَوَزَتْهُ بِحَدَثٍ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ  
إِذَا لَيْسَتْ ثُمَّ خَرَجَ الرَّقْتُ وَالْمَتَّبِعُ إِذَا لَيْسَ ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ كَانَ رَافِعًا وَقَوْلُهُ  
إِذَا لَيْسَ هُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لِأَيِّفِيدَ اسْتِرَاطُ الْكَمَالِ وَقْتُ اللَّبْسِ بَلْ وَقْتُ الْحَدَثِ  
وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ أَحَدَتْ  
بُجْزِيهِ الْمَسْحَ وَهَذَا لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ حُلُولِ الْحَدَثِ بِالْقَدِيمِ فَيَرَاغَى كَمَالَ الطَّهَارَةِ  
وَقْتُ الْمَنْعِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ الْخُفُّ رَافِعًا وَيَجْزِي لِلْمُقِيمِ يَوْمًا  
وَلَيْلَةً وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِبَالِيهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا  
وَلَيْلَةً وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِبَالِيهَا - قَالَ وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبُ الْحَدَثِ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ  
سِرَايَةَ الْحَدَثِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ -

অনুবাদ : প্রত্যেক এমন হৃদয়ের জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ, যার কারণে অজু করা ওয়াজিব। যদি উভয় মোজা পূর্ণ তাহারাতে অবস্থায় পরিধান করে থাকে এবং এরপর হৃদহ গ্রস্ত হয়। ইমাম কুদূরী (র.) মোজার ওপর মাস্হ করা কে অজু ওয়াজিব করী হৃদহের সাথে খাছ করেছেন। কারণ জানাবাতের ক্ষেত্রে মাস্হ করা জায়েজ নেই। ইনশাআল্লাহ এ প্রসঙ্গে সামনে আলোচনা করব (এর ভিত্তিতেই এ কথা বলা হয়েছে)। তিনি মোজার ওপর মাস্হকে আরও খাছ করেছেন এমন হৃদহের সাথে যা (পূর্ণ তাহারাতে অবস্থায় মোজা পরিধানের) পরবর্তীতে হয়েছে। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে মোজা হৃদহ রোধকারী। যদি আমরা পূর্ববর্তী হৃদহের দরুন মাস্হ করা বৈধ বলি; যেমন মুত্তাহাযা নারি মোজা পরল, তারপর নামাজের সময় চলে গেল। অনুরূপভাবে তায়াম্মুৎকারী ব্যক্তি মোজা পরল, তারপর পানি দেখতে পেল, তাহলে মোজা হৃদহ দূরকারী হবে। ইমাম কুদূরীর বক্তব্য طَهَارَةُ عَلَى طَهَارَةٍ إِذَا لَيْسَ هُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ থেকে মোজা পরিধান করার সময় পূর্ণ তাহারাতে থাকা শর্ত হওয়ার কথাটি প্রতীয়মান হয় না; বরং হৃদহের সময়। এটাই আমাদের মায়হাব। এমনকি যদি কেউ প্রথমে উভয় পা ধৌত করে এবং মোজা পরিধান করে, অতঃপর তাহারাতে পূর্ণ করে এবং এরপর তার হৃদহ হয়, তাহলে তার জন্য মোজার ওপর মাস্হ করা জায়েজ আছে। আর এটা এ কারণে যে, মোজা পায়ের ভিতরে হৃদহ প্রবেশের জন্য প্রতিরোধক। সুতরাং প্রতিরোধ করার সময় থেকেই তাহারাতে পূর্ণতা লক্ষণীয় হবে। যদি সে সময় তাহারাতে অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে মোজা হৃদহ দূরকারী হবে। মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত (মোজার ওপর) মাস্হ করা জায়েজ আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—“মুকীম একদিন একরাত এবং মুসাফির তিনদিন তিন রাত মাস্হ করবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাস্হ-এর সময়সীমা শুরু হবে হৃদহ-এর পর থেকে। কারণ মোজা হৃদহ হৃদহ-এর অনুপ্রবেশ রোধকারী। সুতরাং রোধ করার সময় থেকে তা ধর্তব্য হবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাস্‌আলা :** হদছ গ্রন্থ ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যদি সে পূর্ণাঙ্গ তাহারাৎ অবস্থায় উভয় পায়ে মোজা পরিধান করে থাকে, তাহলে তার জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ আছে। আর যে ব্যক্তির ওপর গোসল করা ওয়াজিব, তার জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) মোজার ওপর মাস্‌হ বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে দু'টো জিনিসের সাথে খাছ করেছেন। (১) হদছটা এমন হতে হরে যার দ্বারা শুধু অজু ওয়াজিব হয়। কেননা যদি পূর্ণাঙ্গ তাহারাৎ লাভের পর মোজা পরিধান করে এবং এরপর এ ব্যক্তি এমন হদছের সন্মুখীন হয়, যার দরুন গোসল করা ওয়াজিব-সে ক্ষেত্রে মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ নেই।

(২) অজু করার পরে হদছ হতে হবে। কারণ মোজা পা পর্যন্ত হদছ প্রবাহিত হওয়াকে রোধ করে, হদছকে দূর করে না। যদি পূর্ববর্তী হদছের জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করাকে বৈধ করা হয়, যেমন মুস্তাহাযা মহিলা মোজা পরিধান করেছে, এরপর নামাজের সময় চলে গেছে। কিংবা তায়ামুমকারী ব্যক্তি যখন মোজা পরিধান করার পর পানি পায়, মোজা হদছ দূরকারী হয়ে যাবে। অথচ মোজা হদছ দূরকারী নয়, বরং রোধকারী।

ইমাম কুদূরীর বক্তব্য **إِذَا لَبَسَهَا**—এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, মোজা পরিধান করার সময় তাহারাৎের পূর্ণাঙ্গতা শর্ত। বরং এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে, যখন হাদছ হয় তখন পূর্ণ তাহারাৎ থাকা জরুরি। এটাই আমাদের মাহাযব। অতএব, কেউ যদি প্রথমে উভয় পা ধৌত করে মোজা পরিধান করে, অতঃপর অজু পূর্ণ করে আর এরপর তার হদছ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ আছে। কেননা যদিও মোজা পরিধানের সময় পূর্ণাঙ্গ তাহারাৎ পাওয়া যায়নি, কিন্তু তাহারাৎের সময় তা পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গেছে। এর দলিল হলো— মোজা পায়ের মধ্যে অপবিত্রতার প্রবেশকে রোধ করে। এ জন্য রোধ করার সময় পূর্ণ তাহারাৎের বিষয়টি লক্ষণীয় হবে। এমনকি এই সময় যদি তাহারাৎ অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে মোজা হদছ দূরকারী হয়ে যাবে।

**وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ يَوْمَ الْخ**—এ ইবারতে মোজার ওপর মাস্‌হ করার সময় সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় থাকে সে একদিন একরাত মোজার ওপর মাস্‌হ করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে পারবে তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত। ইমাম মালিক (র.) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য বর্ণিত আছে।

১। মুকীম ব্যক্তি মোজার ওপর মোটেও মাস্‌হ করবে না। আর মুসাফির ব্যক্তি অনির্দিষ্ট সময় ব্যাপী মাস্‌হ করতে পারবে। অর্থাৎ মুসাফির ব্যক্তির জন্য মাস্‌হ করার কোনো ধরা বাধা সময় সীমা নেই। সে যতদিন ইচ্ছা মাস্‌হ করতে পারে। ইমাম সারাস্বী (র.) বলেন— এটাই হাসান বসরী (র.)-এর বক্তব্য।

২। ইমাম মালিক (র.)-এর দ্বিতীয় মতটি হলো মুকীমের হুকুম মুসাফিরের হুকুম-এর মতো।

**ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল :** ইমাম মালিক (র.)-এর প্রথম রেওয়াযাতের দলিল হলো মোজার ওপর মাস্‌হকে শরিয়ত বৈধ করেছে জরুরতের কারণে। অথচ মুকীমের বেলায় এর কোনো জরুরত নেই, তাই মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করা জায়েজ নেই।

মুসাফিরের ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.) হযরত আয্মার ইবনে ইয়াসির (র.)-এর একটি হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তাহলো—

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ بَرَمَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى انْتَهَبْتُ إِلَى سَبْعَةِ آيَاتٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كُنْتُ فِي سَفَرٍ فَامْسَحْ مَا بَدَأَ لَكَ —

হযরত আয্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি একদিন মোজার ওপর মাস্‌হ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি আবার বললাম দু'দিন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এভাবে আমি (বলতে বলতে) সাতদিন পর্যন্ত পৌছলাম। তিনি বললেন, তুমি যখন সফর অবস্থায় থাকবে তখন যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মোজার ওপর মাস্‌হ করতে পার। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফির ব্যক্তির জন্য মোজার ওপর মাস্‌হ করার ব্যাপারে কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

আমাদের (আহনাফের) প্রথম দলিল হলো, নিম্নোক্ত **হাদীস** (শা.) বলেন— **يَسَحُّ النَّسِيفُ يَوْمًا**—মুকীমের (আহনাফের) প্রথম দলিল হলো, নিম্নোক্ত **হাদীস** (শা.) বলেন— **يَسَحُّ النَّسِيفُ يَوْمًا**—মুকীম ব্যক্তি মোজার ওপর মাস্‌হ করবে একদিন একরাত। আর মুসাফির ব্যক্তি করবে তিনদিন তিন রাত।

অধিকাংশ হানাফী ওলামায়ে কেরাম হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি দ্বারা দলিল দিয়েছেন,  
 قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ طَلَبُ الْعِلْمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ السَّلَاحَ تَضَعُ  
 أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَضًا بِمَا يَصْنَعُ فَذَاذَا جِئْتُ فَسَلِّهِ قَالَ فَسَلِّهِ عَنِ النَّسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ لِلْفَيْنِ  
 يَوْمَ وَكَيْلَةٍ وَلِلْمَسَاوِيرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِبَاسُهَا - (كَيْفَايَة)

তিনি বলেন, একদা “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমাকে বলেলেন, কি জিনিসে তোমাকে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম ইল্ম-এর তলব। তিনি বলেলেন, তালিবে ইলমের কাজে সতুষ্ট হয়ে ফিরিশতাগণ তালিবে ইল্মদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। যাহোক যে উদ্দেশ্যে এসেছ, সে সম্পর্কে প্রশ্ন কর। হযরত সফওয়ান (রা.) বলেন, আমি তাকে (সা.) মোজার ওপর মাস্হ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেলেন, মুকীমদের জন্য একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত।

ইমাম মালিক (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীসের জবাব : ইমাম মালিক (র.)-এর মতের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশকৃত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রকম আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে এই হাদীসটি “মাজহুল”।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে এর সকল رَجَالٌ مُعْرُوفٌ ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেন, এর সনদের ব্যাপারে اِخْتِلَافٌ আছে এবং সনদ ততটা মজবুত নয়। ইমাম দারে কুতনী (রা.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসের সনদটি সুপ্রমাণিত নয়। ইয়াহইয়া ইবনে মাস্ন (র.) বলেন, এই হাদীসের সনদের মধ্যে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। সুতরাং এই অপ্রসিদ্ধ (شَاذٌ) হাদীসটি দ্বারা মাস্হর হাদীসকে বর্জন করা যাবে না। তাছাড়া অত্র হাদীসটি দ্বারা হযরত ﷺ যা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলো— মোজার ওপর মাস্হ করার ব্যাপারটি রহিত হয়ে যায়নি, বরং এটি একটি স্থায়ী বিধান। এর অর্থ এই নয় যে, এই সময়ের মাঝে আর মোজা খুলবে না।

ইমাম মালিক (র.) “মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্হ করার কোন জরুরত নেই বলে যে উক্তি করেছেন এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই। কারণ তারও এর জরুরত আছে। মুকীম ব্যক্তি যখন নিজ কর্ম ও প্রয়োজন পূরা করার উদ্দেশ্যে সকালে মোজা পরিহিত অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হয়, তখন সন্ধ্যা বাড়িতে ফিরে আসার পূর্বে মোজা খোলা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় বৈকি? সুতরাং এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মুকীমের জন্য মোজার ওপর মাস্হ করাকে বৈধ করা হয়েছে।

قَالَ وَابْتِغَاءُ مَا لَحِقَ : মোজার ওপর মাস্হ-এর সময়সীমা কখন থেকে শুরু হবে বা কখন থেকে ধরা হবে তা নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে মাস্হ-এর সময়সীমা শুরু হবে হদছ -এর সময় থেকে। তবে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে মাস্হ-এর সময়সীমা শুরু হবে মোজা পরিধানের সময় থেকে। আর ইমাম আওযাই, আবু ছাত্তর এবং আহমদ (রা.) বলেন, যখন মাস্হ করা শুরু হয় তখন থেকেই এর সময়সীমা দর্ঘতাব্য হবে।

উক্ত তিন ধরনের মতামতের ফলাফল প্রকাশ পাবে এই উদাহরণটিতে যেমন- এক ব্যক্তি ফজরের সময় অজু করে মোজা পরিধান করেছে। এরপর সূর্যোদয়ের পরে তার হদছ হয়েছে এবং সূর্য হেলার পরে সে অজু করে মোজার ওপর মাস্হ করেছে। এ অবস্থায় অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাযহাব অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি মুকীম হলে পরদিন সূর্যোদয়ের পর পর্যন্ত মাস্হ করবে। আর হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী পর দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাস্হ করবে এবং ইমাম আওযাই-এর মাযহাব অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি পরদিন সূর্য হেলার পর পর্যন্ত মাস্হ করবে।

হাসান বসরী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, মাস্হ করার বৈধতা যেহেতু মোজা পরিধানের জন্যই, সেহেতু মাস্হ-এর সময়সীমাও মোজা পরিধানের সময় থেকেই ধরা হবে। ইমাম আওযাই (র.)-এর দলিল হলো—, মাস্হ-এর সময় সীমার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় মাস্হ-এর জন্য। তাই এর শুরু ও ধরা হবে মাস্হ শুরু করার সময় থেকেই আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের দলিল হলো— মোজা হচ্ছে পা পর্যন্ত হদছ পৌছার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক, অতএব সময়সীমা তখন থেকেই ধরা উচিত, যখন থেকে মোজার প্রতিবন্ধকতার কাজ শুরু হয়েছে। আর এ কাজ শুরু হয় হদছ হওয়ার পর থেকে। কারণ



وَالْمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ يُبْدَأُ مِنْ قَبْلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ  
لِحَدِيثِ مُغْبِرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ وَمَدَّهُمَا مِنَ الْأَصَابِعِ  
إِلَى أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الظَّاهِرِ حَتَّمٌ حَتَّى لَا يَجُوزَ عَلَى بَاطِنِ  
الْخُفِّ وَعَقِبِهِ وَسَاقِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ فَيَرَاغَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ  
وَالْبِدَايَةُ مِنَ الْأَصَابِعِ اسْتِحْبَابٌ إِعْتِبَارًا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ وَفَرَضُ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ ثَلَاثُ  
أَصَابِعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (رح) مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إِعْتِبَارًا  
لِلَّائَةِ الْمَسْحِ -

অনুবাদ : মাস্‌হ করা হবে উভয় পায়ের ওপর অংশে। (মাস্‌হ করা হবে) আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানা অবস্থায়। পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে শুরু করে সাক -এর দিকে নিয়ে যাবে। কেননা হযরত মুগীরা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে আছে মহানবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর নিজের দু' হাত রেখে পায়ের আঙ্গুল থেকে ওপরের দিকে একবার মাস্‌হ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) যেন এখনও আমি রাসূল ﷺ -এর মোজার ওপরে আঙ্গুলের রেখা রূপে মাস্‌হ-এর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। মোজার ওপর অংশে মাস্‌হ করা ওয়াজিব। অতএব, মোজার তলায়, গোড়ালিতে বা নলাতে মাস্‌হ করা জায়েজ হবে না। কেননা এটা (মোজার ওপর মাস্‌হ করা) কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং এ বিষয়ে শরিয়ত নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়ের অনুসরণ করতে হবে।

আঙ্গুল থেকে মাস্‌হ শুরু করা মোস্তাহাব। আসল তথা ধৌত করার অনুসরণে। মাস্‌হ-এর ফরজ হলো হাতের আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পায়ের আঙ্গুলের পরিমাণ। তবে মাস্‌হ-এর উপকরণের বিবেচনায় প্রথম মতটি অধিক শুদ্ধ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, আমাদের মতে মোজার ওপরের অংশে মাস্‌হ করা জরুরি। এর চিহ্নটা এমন-ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ডান পায়ের মোজার সামনের দিকের অংশে রাখবে এবং বাম হাতের আঙ্গুল গুলোও বাম পায়ের মোজার সামনের দিকের অংশে রাখবে। এরপর উভয় হাতকে টেনে গোড়ালির দিকে এনে নলীর দিকে নিয়ে যেতে থাকবে। এ সময় হাতের আঙ্গুল গুলোকে খোলা এবং প্রশস্ত অবস্থায় রাখবে। এটাই হচ্ছে সোচ্চার ওপর মাস্‌হ করার সুন্নত তৃত্বীকা।

যদি কেউ এক আঙ্গুল দিয়ে তিনবার মাস্‌হ করে এবং প্রতিবার নতুনভাবে পানি নিয়ে নতুন নতুন জায়গা মাস্‌হ করে, তাহলে মাস্‌হ বৈধ হবে অন্যথায় নয়।

ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মোজার ওপর এবং নীচ উভয় অংশে মাস্‌হ করা সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো এই হাদীস **سَمِعَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার ওপর ও নীচ উভয় অংশে মাস্‌হ করেছেন।

আমাদের দলিল হযরত মুগীরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত নিজের উভয় পায়ের মোজার ওপর রেখে একলোকে ওপরের দিকে টেনে নিয়েছেন। বর্ণনাকারী হযরত মুগীরাহ (রা.) বলেন, যেন আমি এখনও ছুঁয় ﷺ-এর মোজার ওপর তাঁর হাতের টানা সেই রেখা দেখতে পাচ্ছি। এই হাদীসে একথাও উল্লেখ আছে যে, তিনি একবার মাস্হ করেছেন। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, মোজার ওপর বারবার মাস্হ করা শরিয়ত বিধিত নয়। তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا

অর্থাৎ মুগীরাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় মোজার ওপরাত্বে মাস্হ করতে দেখেছি।

হিদায়ার মুসান্নিফ বলেন, মাস্হ-এর স্থান হচ্ছে মোজার ওপরাত্বে। নিচের অংশ নয়। তাই মোজার ওপরাত্বে মাস্হ করা ওয়াজিব। কেউ যদি মোজার ওপর ছাড়া অন্য কোনো অংশে মাস্হ করে তাহলে তা বৈধ হবে না। হযরত আলী (রা.)-এর একটি মাস্তুব্য থেকেও এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِ وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ دُونَ بَاطِنِهِمَا -

অর্থাৎ দীন যদি যুক্তি বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে মোজার ভিতরের অংশে মাস্হ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত হতো; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজার ওপরাত্বে মাস্হ করতে দেখেছি, ভিতরের অংশে নয়।

পায়ের আঙ্গুলী থেকে মাস্হ শুরু করা মোস্তাহাব। তবে কেউ যদি পায়ের গোড়ালির দিক থেকেও মাস্হ শুরু করে তবুও জায়েজ হবে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাস্হ করা ফরজ। তবে আঙ্গুল বলতে পায়ের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে নাকি হাতের আঙ্গুল? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মায়হাব হলো হাতের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। অপরদিকে ইমাম কারখী (র.)-এর মতে পায়ের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। তাঁর দলিল হলো মাস্হ সংগঠিত হয় পায়ের ওপর। সুতরাং মাস্হ করার পরিমাণের মাপ কাঠি পায়ের আঙ্গুলই হওয়া উচিত। হিদায়ার লিখক বলেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতটিই অধিক শুদ্ধ। তাঁরা মাস্হ-এর ১। তথা হাতের দিকটি বিবেচনা করেন। উল্লেখ্য যে, মোজা পরিধান কারীর জন্য উভয় মোজারই তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাস্হ করা ফরজ। অতএব, কেউ যদি এক মোজায় দুই আঙ্গুল এবং অপর মোজায় পাঁচ আঙ্গুল পরিমাণ মাস্হ করে। তাহলে তার মাস্হ শুদ্ধ হবে না।

وَلَا يُجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَخْتَمِنُ مِنْهُ قَدَرٌ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ (رحا) لَا يُجُوزُ وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجِبَ غَسْلُ الْبَادِي يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي وَلَنَا أَنَّ الْخِفَافَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ خَرْقٍ عَادَةً فَيَلْحَقُهُمُ الْحَرَجُ فِي النَّزْعِ وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ فَلَا حَرَجَ وَالْكَثِيرُ أَنْ يَنْكَشِفَ قَدَرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ أَصْغَرُهَا هُوَ الصَّحْبِيُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَدَمِ هُوَ الْأَصَابِعُ وَالْثَلَاثُ أَكْثَرُهَا فَتُقَامُ مَقَامَ الْكُلِّ وَاعْتِبَارُ الْأَصْغَرِ لِلِاخْتِطَاطِ وَلَا مُعْتَبَرٌ بِدُخُولِ الْأَنَامِلِ إِذَا كَانَ لَا يَنْفَرُجُ عِنْدَ الْمَشْيِ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْقَدَرُ فِي كُلِّ خُفٍّ عَلَى حِدَةٍ فَيَجْمَعُ الْخَرْقُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَجْمَعُ فِي خُفَيْنِ لِأَنَّ الْخَرْقَ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ قَطْعَ السَّفَرِ بِالْآخِرِ بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلْكُلِّ وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ —

অনুবাদ : এমন মোজায় মাসুহ করা জায়েজ হবে না যা এতো বেশি পরিমাণ ছেঁড়া যে, এর মধ্য দিয়ে পায়ের আঙ্গুল সমূহের তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা দেখা যায়। যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে জায়েজ হবে। ইমাম যুফার এবং শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য ছেঁড়া হলেও মাসুহ জায়েজ হবে না। কেননা প্রকাশ পাওয়া অংশটি ধোয়া যখন ওয়াজিব হয়ে গেছে, তখন অবশিষ্ট অংশও ধোয়া ওয়াজিব হবে। আমাদের দলিল হচ্ছে— মোজা সাধারণত সামান্য ছেঁড়া থেকে মুক্ত থাকে না। তাই (এ অবস্থায়) মোজা খোলাটা লোকদের জন্য কষ্ট কর। অবশ্য বেশি পরিমাণ ছেঁড়া থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে। তাই (এমন মোজা খোলার হুকুম) কষ্টকর হবে না। আর বেশি-এর পরিমাণ হলো পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খোলে যাওয়া। এটিই বিতুদ্ধ অভিমত। কারণ (قدم) পায়ের মধ্যে আঙ্গুলই হলো আসল। আর তিন হলো অধিকাংশ। তাই তিনকেই সমগ্রের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হবে। আর ছোট তিন আঙ্গুলকে বিবেচনা করা হয়েছে أَحْيَاطًا বা শতর্কতামূলক ভাবে। যদি হাঁটার সময় ছেঁড়াটা ফাঁক না হয় তাহলে শুধু মাত্র পায়ের আঙ্গুল ঢুকে যাওয়াটা ধর্তব্য হবে না। প্রতিটি মোজার আলাদা ভাবে এ ধরনের পরিমাণ হিসাব করা হবে। সুতরাং এক মোজার সব ক'টি ফুটো একত্রিত করা হবে। কিন্তু উভয় মোজার গুলো একত্রিত (করে হিসাব) করা হবে না। কারণ এক মোজার ফুটো অন্য মোজার দ্বারা সফর করাকে বাধা দেয়না। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে লেগে থাকা নাজাসাতের ব্যাপারটি এ বিষয়ের বিপরীত। কারণ সে তো পুরোটা বহনকারী। আর সতর খুলে যাওয়ার ব্যাপারটি (বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা) নাজাসাতের নথীর হিসাবে গণ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোজা যদি ছিড়ে বা ফেঁটে গিয়ে থাকে, তাহলে এর ওপর মাসুহ করা বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চারটি মতাবহ আছে।

১। আমাদের মতে ছেঁড়া কম-বেশি হওয়ার দরুন হুকুম-এর মাঝেও ব্যবধান হবে। অর্থাৎ যদি ছেঁড়া কম হয়, তাহলে তার ওপর মাসুহ করা বৈধ। আর যদি ছেঁড়া বেশি হয়, তাহলে তার ওপর মাসুহ করা বৈধ নয়।

২। ইমাম শাফি'ঈ এবং যুফার (র.)-এর মতে ছেঁড়া কম হউক বেশি হউক, সর্বাবস্থায়ই মাসুহ বৈধ হবে না।

৩। সুফয়ান সাওরী (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় মাসুহ বৈধ।

৪। ইমাম আওযাঈ (র.) বলেন, মোজার ফুটো দিয়ে পায়ের যে অংশ প্রকাশ পেয়েছে তা ধৌত করবে, আর বাকি অংশে মাস্হ করবে। তার দৃষ্টিতে যেহেতু ধোয়া এবং মাস্হ করা উভয়টা একই অঙ্গে একত্রিত করা যায়, সেহেতু তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন।

সুফইয়ান সাওরী (র.)-এর দলিল হলো— মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত হৃদহ পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিধান করেছে বলা যাবে ততক্ষণ এর ওপর মাস্হ করাও বৈধ হবে। তাতে ফাঁটা কম হোক বা বেশি হোক। ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো— মোজা ছেঁড়া হওয়ার কারণে পায়ের যে অংশ বের হয়ে গেছে, তা ধোয়া ওয়াজিব। আর ধোয়া এবং মাস্হ করা উভয়টা যেহেতু একই অঙ্গে একত্রিত করা জায়েজ নেই, সেহেতু মোজা খুলে পায়ের বাকি অংশ ধোয়াও ওয়াজিব। ইনায়্যা গ্রহকার বলেন, তাদের দলিল হলো, কিয়াসী দলিল অর্থাৎ তারা বলতে চান যে, যেহেতু অধিক ফাঁটা থাকা মাসাহ-এর জন্য প্রতিবন্ধক তাই স্বল্প পরিমাণও এর জন্য প্রতিবন্ধক বলে গণ্য হবে। যেমন حَدَّثَ مُطَلِّقٌ - نَافِثٌ مِّنْ (মাসাহ ভঙ্গকারী) তাই কম হোক বা বেশি হোক। আমাদের দলিল হলো— সাধারণত অল্প স্বল্প ছেঁড়া-ফাঁটা থেকে মোজা মুক্ত থাকে না। তাই এই হলকা কারণে যদি মোজা খুলে পা ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয়, তাহলে এটি মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। এজন্য মানুষী ছেঁড়া-ফাঁটার বিষয়টি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বেশি পরিমাণ ফাঁটা থেকে মোজা যেহেতু সাধারণতঃ মুক্ত থাকে, সেজন্য এ ক্ষেত্রে মোজা খুলে পা ধৌত করার হুকুম দেওয়াতে ব্যাপক হারে মানুষ কষ্টে পতিত হবে না। এজন্যই বেশি পরিমাণ ফাঁটা হলে তা মাফ করা হবে না।

বেশি ও কম ফাঁটার মাপকাঠি কি? কতটুকু ছেঁড়া হলে বেশি, এবং কতটুকু ছেঁড়া হলে কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে? এ ব্যাপারে হিদায়ার লিখক বলেছেন, যদি পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ পা মোজার ছোঁড়া অংশ দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলেই একে বেশি পরিমাণ ফাঁটা বলে গণ্য করা হবে। আর যদি তার চেয়ে কম পরিমাণ প্রকাশ পায়, তাহলে তা কম ছেঁড়া বলে গণ্য হবে। এটাই বিত্বক অভিমত। হাসান ইব্নে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ক্ষেত্রে হাতের আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। শামসুল আইহা সলওয়ানী (র.) বলেন, ফাঁটা যদি পায়ের বড় আঙ্গুলসমূহের উপর থাকে তাহলে বড় তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। আর যদি ছোট আঙ্গুলের উপর থাকে তবে ছোট তিন আঙ্গুল ধর্তব্য হবে। বিত্বকৃতম অভিমতটির দলিল হলো— পায়ের মধ্যে আঙ্গুলই আসল। তাই দিয়তের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ যদি অন্য কারো পায়ের আঙ্গুলগুলো কেটে দেয়, তাহলে তার ওপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়। এতেই বুঝা যায় যে পায়ের মাঝে আঙ্গুলই আসল। এর তিন আঙ্গুল যেহেতু পাঁচ আঙ্গুলের মাঝে পরিমাণে অধিক, তাই لَا تَكْفُرُ حَتْمَ الْكُلِّ এই মূল নীতির আলোকে তিনকে সমগ্র পায়ের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে। এ জন্যই তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খুলে যাওয়াকে পুরা পা খুলে যাওয়ার অবস্থায় ধরা হবে এবং মোজা খুলে পা ধৌত করা ওয়াজিব হবে।

যদি মোজা এমনভাবে ফেঁটে যায় যে, তার মধ্যে তিন আঙ্গুল ঢুকে যায় ঠিক, কিন্তু চলার সময় পা বের হয়ে যায় না, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এমন মোজার ওপর মাস্হ করা যাবে। হিদায়ার লিখক বলেন, ছেঁড়ার পরিমাণ প্রত্যেক মোজায় পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হবে। অতএব, যদি এক মোজায় পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ফুটো থাকে, তাহলে সবগুলোকে এমন ভাবে পরিমাণ করা হবে যে, যদি সবগুলো ফুটোকে একত্রিত করা হতো, তাহলে এর পরিমাণ কেমন হতো। যদি দেখা যায় পূর্ব বর্ণিত মাপ মতে সর্বসাকুল্যে অধিক পরিমাণ ফাঁটা তাহলে এর ওপর মাস্হ করা বৈধ হবে না। আর যদি এর বিপরীত তথা সব মিলিয়ে কম ফাঁটা বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মাস্হ করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ফাঁটাকে একসাথে করে পরিমাণ করা হবে না। কারণ উভয়টা মিলে অধিক পরিমাণ ফাঁটা হলেও মাস্হ জায়েজ হবে। কেননা এক মোজা ফাঁটা হওয়ার দরুন অপর মোজা দিয়ে পথ চলতে কোনো বাধা নেই। অবশ্য মোজার মাঝে নামাজস্ত লাগার ব্যাপারটি ভিন্ন। অর্থাৎ উভয় মোজায় যদি অল্প অল্প করে বিক্ষিপ্তভাবে নাপাকি লেগে থাকে, আর অবস্থা এমন হয় যে, এক মোজার বিক্ষিপ্ত নাপাকি গুলো একত্রিত করলে পরিমাণে এক দেহহামের চেয়ে কম হলেও উভয় মোজার গুলো একত্রিত করলে এক দেহহামের বেশি হবে। এ অবস্থায় এসব মোজা পরিধান করে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। কারণ এই ব্যক্তিই এ সব নাপাকী বহনকারী। আর বিধান হলো এক দেহহামের অধিক নাপাকী বহনকারী ব্যক্তির জন্য তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন করা) ওয়াজিব। পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তির নামাজ জায়েজ হবে না। এসব নাপাকি একত্রে থাকুক বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকুক। অনুপূর্ণভাবে সতর ঢাকার বিষয়টিও নাপাকী বহনের মতো। অর্থাৎ নামাজের সময় শরীহের যে সব অঙ্গ স্পর্শ করা ফরজ, যদি কারো সেসব অঙ্গের কিছু কিছু করে খুলে যায় যেমন মহিলাদের চুলের কিছু অংশ, পেটের কিছু অংশ, লজ্জাস্থানের কিছু অংশ সব মিলিয়ে যদি এমন পরিমাণ অঙ্গ খোলা থাকে যা এক অঙ্গের এক চতুর্থাংশ হয়ে যাবে, তাহলে এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামাজ জায়েজ হবে না।

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافُنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِهَا إِلَّا عَجَنَابِيَةً وَلَكِنْ عَنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نَوْمٍ وَلَإِنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ عَادَةً فَلَا حَرَجَ فِي النَّهْيِ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ وَيَنْقُضُ الْمَسْحُ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْحِفِّ لِسَرَايَةِ الْحَدِيثِ إِلَى الْقَدِيمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ وَكَذَلِكَ نَزْعُ أَحَدِهِمَا لَتَعْذِرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ فِي وَطِيفَةٍ وَاحِدَةٍ -

অনুবাদ : যার ওপর গোসল ওয়াজিব, তার জন্য মাস্হ করা জায়েজ নয়। কারণ হযরত সাফওয়ান ইবনে মুসাল (রা.) এক হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সফরের সময় আমাদের নির্দেশ দিতেন যাতে আমরা নাবাত ছাড়া পেশাব, পায়খানা ও ঘুম ইত্যাদি হৃদয়ের ক্ষেত্রে তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি। এর সুহ জায়েজ না হওয়ায় আরেকটি কারণ হলো— জানাবাত সাধারণত বার বার ঘটে না। তাই মোজা খোলার মন অসুবিধা নেই। অপর দিকে হৃদয়ের বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ তা বার বার ঘটে। প্রত্যেক ঐ জিনিস হৃদয়ে ভঙ্গ করবে, যা ভঙ্গ করে অজুকে। কারণ মাস্হহতো অজুইই অংশ বিশেষ। তাছাড়া মোজা খুলে ফেলার ১ও মাস্হ ভেঙ্গে যায়। কারণ প্রতিরোধ কারী (মোজা)-কে সরিয়ে ফেলার ফলে পায়ের পাতায় তখন হৃদয় প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে উভয় মোজার কোনো একটি খোলার দ্বারাও (মাস্হ ভেঙ্গে যায়)। কেননা একই দর্শনায় মাস্হ এবং ধোয়ার লুকুম উভয়টিকে একত্রিত করা অসম্ভব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত মাস্হআলাটির বিবরণ হলো— যার ওপর গোসল ওয়াজিব তার জন্য মাস্হ করা জায়েজ নেই। যেমন কোনো ঙ অজু করে মোজা পরিধান করল। এরপর সে জুনুবী হয়ে গেল। তারপর সে এতটুকু পানি সংগ্রহ করতে পারল যা দিয়ে অজু করা সম্ভব হবে গোসল নয়। এমনভাবেই এ ব্যক্তি জানাবাতের জন্য তায়ামুম করবে। আর উক্ত পানি দিয়ে অজু হবে এবং পা ধৌত করবে। তার জন্য মোজার ওপরে মাস্হ করা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো— হযরত সাফওয়ান ইবনে মুসাল (রা.) এর একটি হাদীস। যাতে উল্লেখ রয়েছে জানাবাতের অবস্থায় উভয় পায়ের মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে। ১য় দলিল হলো— জানাবাত সাধারণতঃ বারবার হয় না। অথচ হৃদয়ে আসগর বারবার হয়। তাই জানাবাত অবস্থায় মোজা ১ পা ধোয়াটা মানুষের জন্য অসুবিধা জনক হবে না। পক্ষান্তরে হৃদয়ের ক্ষেত্রে সেটা হবে। আর এটা সর্ব স্বীকৃত কথা যে, জার ওপর মাস্হকে বৈধই করা হয়েছে অসুবিধা দূর করার জন্য। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মোজা খোলাটা মানুষের জন্য অসুবিধা ক সে ক্ষেত্রেই কেবল মাস্হ জায়েজ হবে। আর যে ক্ষেত্রে অসুবিধা জনক নয় সে ক্ষেত্রে মোজা খোলা ফরজ। মাস্হ করা যজ্ঞ নেই।

نَوَافِيسُ وَوُضُوْءُ (অজু ভঙ্গ কারী) সে সব জিনিস জার মাস্হ ভঙ্গকারীও বটে। কারণ মোজার ওপর মাস্হ করাটা অজুইই অংশ বিশেষ। তাই كل (সমগ্র)-এর ভঙ্গ কারী যা, আরো উত্তমভাবে, جزء (অংশ) এরও ভঙ্গকারী হবে। আর মোজা খুলে ফেলাটাও মাস্হ ভঙ্গের একটি কারণ। কেননা জা ছিল পায়ের পাতা পর্যন্ত হৃদয় পৌছার পথে প্রতিরোধক। এখন মোজা খোলার মাধ্যমে যখন সেই প্রতিরোধক দূর হয়ে ছে, তখন হৃদয়ও অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে মাস্হও ভেঙ্গে গেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে— তিনি এক জিহাদের সফরে থাকা অবস্থায় মোজা খুলে উভয় পা ত করেছেন। তবে অজুর অবশিষ্ট অঙ্গগুলো ধৌত করেন নি। এমনিভাবে অপরাপর সাহাবাগণ থেকেও এমন বিষয়ের রণ বর্ণিত আছে।

যদি এক পায়ের মোজা খুলে যায় তবুও মাস্হ ভেঙ্গে যাবে। তখন পায়ের মোজা খুলে উভয় পা ধৌত করা ফরজ। রণ একই আমলে ধোয়া ও মাস্হ উভয়টি একত্রিত করা শরঈ ভাবে অসম্ভব।

وَكَذَا مَضَى الْمُدَّةَ لِمَارَوْنَا وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ حَقْمِيهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الرُّضْوَةِ وَكَذَا إِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرَى الْحَدُّ السَّابِقُ إِلَى الْقَدَمَيْنِ كَأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَحُكْمُ النَّزْعِ يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ فِي حَقِّ الْمَسْحِ وَكَذَا يَكْثُرُ الْقَدَمُ هُوَ الصَّحِيحُ -

অনুবাদ : অনুক্রপভাবে সময় উত্তীর্ণ হওয়াও (মোজার মাসাহ ভঙ্গকারী) ঐ হাদীসের কারণে, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সময়সীমা যখন পূর্ণ হবে, তখন উভয় মোজা খুলে ফেলেবে এবং উভয় পা ধুয়ে নামাজ আদায় করবে। অবশ্য অজুর্ অবশিষ্ট কাজ দোহরানো জরুরি নয়। সময় শেষ হওয়ার আগে মোজা খুলে ফেলারও একই হুকুম। কেননা মোজা খোলার সময় পূর্ববর্তী হদছ উভয় পায়ে পাতায় অনুপ্রবেশ করে। যেন সে এগুলো ধৌতই করেনি। মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সবা্যন্ত হবে পায়ে পাতা মোজার সাক (খাড়া অংশ) পর্যন্ত এসে গেলে। কারণ মাসহ-এর ব্যাপারে এ অংশটা ধর্তব্য নয়। পায়ে পাতার অধিকাংশ বের হয়ে গেলেও এই একই হুকুম। এটাই বিতদ্ধ অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাস্‌আলা :** মাসহ-এর নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও মাসহ ভেঙ্গে যায়। এর দলিল হলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস শরীফ। অর্থাৎ হযুর ﷺ -এর বাণী - **وَلَيْسَ بِهَا** - **يَسْعُ الْمُؤَمِّمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْسَ بِهَا** আবার কেউ কেউ বলেছেন **لِمَا رَوَيْنَا** বলে লিখক হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সালের ঐ হাদীসটিকে বুঝিয়েছেন **أَنَّ لَانْتِزَاعَ** অর্থাৎ আমরা যেন তিন দিন আমাদের মোজা না খুলি। আর যখন মাসহ-এর সময় সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন উভয় পায়ে মোজা খুলে শুধু মাত্র পা দুটি ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে। পূর্ণ অজু করতে হবে না। তবে এর জন্য শর্ত হলো অজু ভাঙ্গার অন্য কোনো কারণ না পাওয়া যেতে হবে। যদি মোজা খোলা ছাড়াও এমন কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে যার দরুন স্বাভাবিক ভাবেই অজু ভেঙ্গে যায়, সে ক্ষেত্রে পূর্ণ অজু করতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ওপরে বর্ণিত অবস্থায় পূর্ণ অজু করা ওয়াজিব। তাঁর যুক্তি হলো মাসহ-এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার মধ্যদ্বারা পায়ে তহরাত ভেঙ্গে গেছে। আর তাহরাত ভেঙ্গে যাওয়াটা **تَجَرَّى** (অংশে অংশে বিভক্ত হওয়া) হয়না। যেমন হদছের কারণে অজু ভাঙ্গাটা **تَجَرَّى** হয় না। সুতরাং পায়ে তাহরাত ভেঙ্গে যাওয়া মানেই হলো পুরো তাহরাত ভেঙ্গে যাওয়া। আর যেহেতু পুরা তাহরাত ভেঙ্গে গেছে সেহেতু স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পুনরায় অজু করা ওয়াজিব।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়া হয় এভাবে যে, হদছ আর মাসহ-এর সময়সীমা অতিক্রম হওয়া উভয়টা এক জিনিস নয়, তাই একটাকে অপরটার ওপর কিয়াস করাও যথার্থ হবে না। কারণ হদস বলা হয় নাজাসাত বের হওয়াকে অথচ মাসহ-এর সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ এটা নয়। অতএব, উক্ত কিয়াসটি **الْفَارَقُ** হয়েছিল।

**আমাদের দলিল :** এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের পক্ষ থেকে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঐ কাজ দ্বারাও দলিল পেশ করা হয়, যা তিনি কোনো এক জিহাদের সফরে করেছিলেন। তিনি মোজা খুলে শুধু উভয় পা ধুয়েছেন। পূর্ণ অজু করেননি।

এই হুকুম ঐ ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য যে সময় সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে নিজেই নিজের মোজা খুলে ফেলেছে। এর দলিল হলো— মোজা খোলার সময় উভয় পায়ে পাতায় পূর্ববর্তী নাজাসাত পৌছে গেছে। ফলে উভয় পায়ে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যেন, এগুলোকে ধৌতই করা হয়নি।

হিদায়ার লিখক বলেন, মোজা খোলার বিষয়টি তখন সবা্যন্ত হবে, যখন পায়ে পাতা মোজার নালা পর্যন্ত আসবে। কারণ মাসহ-এর ক্ষেত্রে মোজার নালা ধর্তব্য নয়। এমনকি কেউ যদি নালা বিহীন মোজা পরিধান করে এবং মাসহ করে, তবুও তা জায়েজ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো পায়ে টাখন ঢাকা যেতে হবে। তদ্রূপ যদি পায়ে পাতার অধিকাংশ মোজার নালীর ভিতর ঢুক যায়, তাহলে বিতদ্ধ মতানুসারে মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সবা্যন্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা মতে পায়ে গোড়ালির অধিকাংশ আপন স্থান থেকে সরে মোজার নালীর ভিতর ঢুক গেলেও মাসহ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ধোয়ার স্থান ব্যতীর্ণ পর্যন্ত মোজার ভিতর বিদ্যমান থাকবে, কেবল মাত্র ততক্ষণই মাসহ বাকি থাকবে। সুতরাং যখন পুরা গোড়ালী কিংবা তার অধিকাংশ মোজার খাড়া অংশের ভিতরে ঢুক গেছে, তখন ধোয়ার স্থান মোজার ভিতর বিদ্যমান থাকেনি। তাই মাসহ ও থাকবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পায়ে যে পরিমাণ অংশে মাসহ করা জায়েজ (তিন আঙ্গুল পরিমাণ) সে পরিমাণ অংশ মোজার ভিতর থাকলেই মাসহ করা শুদ্ধ হবে। কারণ যে পরিমাণের ওপর মাসহ করা জায়েজ, তা বের না হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে যে পা বেরই হয়নি।

وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرٌ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا عَمَلًا بِأَطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَلَئِنَّ حُكْمَ مُتَعَلِّقٍ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَمَرُ فِيهِ آخِرُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُدَّةَ لِلْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ لِأَنَّ الْحَدَّثَ قَدْ سَرَى إِلَى الْقَدَمِ وَالْخُفُّ لَيْسَ بِرَافِعٍ وَلَوْ أَقَامَ وَهُوَ مُسَافِرٌ إِنْ اسْتَكْمَلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ نَزَعَ لِأَنَّ رُخْصَتَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِذَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْ أَمَّتْ لِأَنَّ هَذِهِ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُقِيمٌ -

**অনুবাদ :** যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ শুরু করে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার আগেই সফরে বের হয়ে গেছে, সে তিন দিন তিন রাত মোজার ওপর মাস্‌হ করবে। নিঃশর্ততার (أَطْلَاقُ الْحَدِيثِ) ওপর আমল করার নিমিত্তে। তাছাড়া মাস্‌হ-এর হুকুম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সূতরাং এ বিষয়ে শেষ সময় বিবেচ্য হবে। তবে মুকীম অবস্থায় (মাস্‌হ-এর) সময়সীমা পূর্ণ করার পর সফর শুরু করার বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ (এ সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে) হদছ পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর মাস্‌হ হদছ দূর করী নয়। মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম হয়, আর ইতিমধ্যে সে মুকীম হওয়ার সময় সীমা (অর্থাৎ মোজা পরিধানের পর একরাত এক দিন) পূর্ণ করে ফেলে, তাহলে মোজা খুলে ফেলবে। কারণ সফরের রুখসত সফর শেষ হওয়ার পর অব্যাহত থাকে না। আর যদি সময় সীমা শেষ না করে থাকে, তাহলে তা শেষ করবে। কারণ এ হচ্ছে মুকীমের সময়সীমা। আর সে ব্যক্তিও মুকীম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই মাস্‌আলায় মোট তিনটি সূরত আছে। যথা-১। যে তাহারাতির ওপর মোজা পরিধান করেছে, তা ভাঙ্গার আগেই সফর শুরু করেছে এবং সফর অবস্থায় থাকা কালে কোনো কারণে তাহারাতি ভেঙ্গে গেছে। এই সূরতে সর্ব সমত রায় হলো উক্ত ব্যক্তি মাস্‌হ-এর সময়সীমা তিনদিন তিনরাত পূর্ণ করবে।

২। হদছের পর এবং ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর যদি সফর শুরু করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ইকামতের সময়সীমা সফরের সময়সীমায় রূপান্তরিত হবে না, অর্থাৎ এই সূরতে একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পর মোজা খুলবে।

৩। সফর শুরু করেছে ইকামতের সময় সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং হদছের পরে। এই সূরতে আমাদের নতে ইকামতের সময়সীমা সফরের সময় সীমায় রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত মাস্‌হ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) বিপরীত মত পোষণ করেন। তার মতে এক দিন একরাত মাস্‌হ করে মোজা খুলে মেন্‌লা জরুরি। তাঁর দলিল এই যে, মাস্‌হ একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক এমন ইবাদত যা মুকীম অবস্থায় শুরু করা হয়েছে তা সফরের কারণে পরিবর্তিত হয় না। যেমন কেউ যদি মুকীম অবস্থায় রোজা রাখে এবং এ অবস্থায় মুসাফির হয়ে যায়, তাহলে এই সফরের কারণে তা আজকের শুরু করা রোজা ভাঙ্গা জায়েজ হবে না। এমনভাবে কেউ যদি শহরে অবস্থান রত জাহাজে নামাজ শুরু করে এবং সে নামাজে থাকা অবস্থায় জাহাজ চলতে আরম্ভ করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি নামাজে থাকা অবস্থায় মুসাফির হবে না। বরং তার চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাজ চার রাক'আতই পূর্ণ করবে। কারণ ইকামতের অবস্থা হচ্ছে আযীমতের অবস্থা। আর সফরের অবস্থা হচ্ছে রুখসতের অবস্থা। অতএব, ইবাদতের মাঝে যখন উভয় অবস্থা একত্রিত হয়, তখন আযীমতকে রুখসতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

**হানাফী মাযহাবের দলিল :** এ প্রসঙ্গে আমাদের দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস **بَسَحَ السَّافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ** (মুসাফির তিন দিন তিনরাত মাস্‌হ করবে)-এর **أَطْلَاق** তথা শর্তহীনতা। এই **أَطْلَاق**-এর কারণে হাদীসের অর্থ ব্যাপকতা এসেছে। অর্থাৎ যে কোনো মুসাফির তিনদিন তিনরাত মাস্‌হ করবে। উক্ত ব্যক্তিও যেহেতু মুসাফির সেহেতু সেও তিন দিন তিন রাত মাস্‌হ করবে। আমাদের আরেকটি দলিল হলো মাস্‌হ-এর হুকুমটি সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে জিনিসের হুকুম সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাতে শেষ সময়ের ভিত্তিতে হুকুম লাগানো হয়। যেমন কোনো হায়েযা মহিলা যদি কোনো নামাজের শেষ ওয়াতে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ নামাজ তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, এমনভাবে কোনো মহিলা যদি নামাজের শেষ সময়ে হায়েযা হয়, তাহলে এ ওয়াক্তের নামাজ উক্ত মহিলার যিহাদানী থেকে বাদ হয়ে যাবে। তদ্রূপ মুসাফির যদি শেষ ওয়াক্ত মুকীম হয়, তাহলে সে পূর্ণ চার রাক'আত পড়বে। এমনভাবে মুকীম যদি শেষ ওয়াক্তে মুসাফির হয়, তাহলে সে কসর করবে। মোটকথা যেহেতু শেষ ওয়াক্তই ধর্তব্য, সেহেতু মুকীম ব্যক্তির ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি সফর শুরু করে, তাহলে সে মাস্‌হ-এর ঐ সময়সীমা পূর্ণ করবে যা মুসাফির অবস্থায় করা হয় (তিন দিন তিন রাত)। পক্ষান্তরে যদি ইকামতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি সফরের সূচনা করে, তাহলে সে আর এখন তিন দিন তিন রাতের সময়সীমা পূর্ণ করতে পারবে না। কারণ মুকীম অবস্থায় মাস্‌হ-এর যে সময়সীমা ছিল তা উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই পায়ের পাতায় হদছ পৌঁছে গেছে। আর মোজাও হদছ অপসারণকারী নয়। ফলে হদছ দূর করার জন্য উভয় পা ধোয়া আবশ্যকীয় হয়ে গেছে।

وَمَنْ لَيْسَ الْجَرْمُوقُ فَوْقَ الْخَفِّ مَسَّحَ عَلَيْهِ خَلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدَلُ  
لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَّحَ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ وَلَئِنَّ تَبَعَ لِلْخَفِّ  
اسْتِغْمَالًا وَغَرَضًا فَصَارَ كَخَفِّ ذِي طَائِقَيْنِ وَهُوَ يَدُلُّ عَنِ الرَّجُلِ لَأَعْنِ الْخَفِّ مَا إِذَا لَيْسَ  
الْجَرْمُوقُ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ لِأَنَّ الْحَدَّثَ حَلٌّ بِالْخَفِّ فَلَا يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْجَرْمُوقُ مِنْ  
كِرْيَاسٍ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَدَلًا لَأَعْنِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تَنْفِذَ الْبَلَّةُ إِلَى الْخَفِّ .

**অনুবাদ :** আর যে ব্যক্তি মোজার উপর “জরমুক” (আবরনী মোজা) পরেছে সে জারমুকের ওপর মাসহ করবে। ইমাম শাফিঈ (রা.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বদলের বদল হয়না। আমাদের দলিল হলো- নবী করীম ﷺ উভয় জারমুকের উপর মাসহ করেছেন। তাছাড়া ব্যবহার ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে জারমুক মোজার তাবে। তাই এটা দুই পর্বত (ভাজ) মোজার মতোই হয়ে গেছে। আর জারমুক হচ্ছে পায়ের বদল। মোজার নয়। অবশ্য হাদাছহু হওয়ার পর জারমুক পরার ব্যাপারটি এর বিপরীত, কেননা হাদাছ মোজায় পৌছে গেছে। সুতরাং অন্যকোনো কিছুর দিকে তা স্থানান্তরিত হবে না। আর জারমুক যদি সুতী কাপড়ের হয়, তাহলে তার উপর মাসহ জায়েজ হবে না। কারণ তা পায়ের বদল হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে যদি অর্দ্দতা মোজা পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে জায়েজ হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জারমুক বলা হয় এমন মোজাকে যা চামড়ার মোজার ওপর আবরনী হিসাবে পরিধান করা হয় যেন এর কারণে চামড়ার মোজাকে ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখা যায়। আর জারমুকের সাক (খাড়া অংশ) মোজার সাকের তুলনায় ছোট হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাব মতে জারমুকের উপর মাসহ করা জায়েজ আছে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো- মোজা হচ্ছে- পায়ের বদল। আর বদলের বদল হয় না। কারণ মোজার উপর মাসহ করাকে শরীআত বৈধতাই দিয়েছে পায়ের বদল হিসাব। অতএব, এখন যদি জারমুকের উপর মাসহা জায়েজ করা হয়, তাহলে তা হবে মোজার বদল হয়ে। অথচ, তা জায়েজ নেই। তাই জারমুকের উপর মাসহ করাকেও না জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের দলিল হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)-এর এই হাদীসটি- **مَسَحَ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ** -কে জারমুকের ওপর মাসহ করতে দেখছি। মুসনাদে ইমাম আহমাদ **أَرَّثَ** -হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জারমুকের ওপর মাসহ করতে দেখছি। মুসনাদে ইমাম আহমাদ এ হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **مَسَحَ عَلَى الْمَوْقَيْنِ** অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুক-এর উপর মাসহ করতে দেখছি। মুক জারমুকেরই একটি নাম। আমাদের আকলী (যুজিনর্ভর) দলিল হলো- জারমুক ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে মোজার তাবে (تابع) হয়ে থাকে ব্যবহারের দিক থেকে তো এ কারণে যে জারমুক সর্বদা মোজার সাথে সাথে থাকে। আর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে জারমুক মোজার তাবে এ কারণে যে, একে মোজার হিফাজতের জন্যই ব্যবহার করা হয়। যেমন মোজা ব্যবহার করা হয় পায়ের হেফাজতের জন্য। অতএব, জারমুকগণ একটি দু’ পাঠ বিশিষ্ট মোজা। দু’পাঠ বিশিষ্ট মোজার ওপরের পাঠে মাসহ করা যেমন সর্ব সম্বত তাবে জায়েজ তেমনি জারমুকের ওপর মাসহ করাও জায়েজ হবে।

আর জারমুক বদলের বদল এই উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ জারমুক বদল বটে, তবে মোজার নয় বরং তা পায়ের বদল। এর বিপরীত অবস্থা হল যদি জারমুক হাদাছের পর পরিধান করে, তাহলে তার ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে না। কারণ এতে হদছ মোজার ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। এখন তা স্থানান্তরিত হয়ে জারমুকের ওপর আসবেনা। যদি জারমুক সুতী কাপড়ের হয় তখনও তার ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে না। কারণ সুতী কাপড়ের জারমুক পায়ের বদল হতে সক্ষম নয়, কারণ সুতী কাপড়ের জারমুক পরিধান করা ক্রেমাগত চলাচল করা সম্ভব নয়। তবে জারমুক যদি এমন পাতলা কাপড় দ্বারা তৈরি হয়, যার ওপর পানি লাগলে এর অর্দ্দতা জারমুক দেখে করে মোজা পর্যন্ত পৌছতে পারে এ ধরনের জারমুকের ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, জারমুকের ওপর মাসহ করা হয়েছে; বরং এ মাসহ মোজার ওপরই করা হয়েছে। কারণ জারমুক অতি পাতলা হওয়ার কারণে মোজা পর্যন্ত পানি পৌছার জন্য তা বাধা দায়ক নয়।



وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم) إِلَّا أَنْ يَكُونَا مَجْلَدَيْنِ  
 أَوْ مُنْعَلَيْنِ وَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشْفَانِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 مَسَحَ عَلَى جُورَيْنِهِ وَلَئِنْ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ إِذَا كَانَ ثَخِينًا وَهُوَ أَنْ يَتَمَسَكَ عَلَى  
 السَّاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْبِطَ بِشَيْءٍ فَاشْبَهَ الْخُفَّ وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ لَأَنَّهُ  
 لَا يُمْكِنُ مُوَاطَئَةُ الْمَشْيِ فِيهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُنْعَلًا وَهُوَ مُحْمَلُ الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ رَجَعَ  
 إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقِ  
 وَالْقَفَازَيْنِ لَأَنَّهُ لَأَحْرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ  
 عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وَضَوْءٍ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ عَلَيْهِ بِهِ  
 وَلَإِنَّ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ فَكَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ وَيَكْتَفَى  
 بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ وَلَا يَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيفِ وَلَإِنْ  
 سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بَرٍّ لَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَائِمٌ وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا  
 كَالْفَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بَرٍّ بَطُلَ لَزْوَالِ الْعُذْرِ وَإِنْ  
 كَانَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ لَأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدْلِ.

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট জাওরাব (চামড়া ছাড়া অন্য কিছু) তৈরি মোজা) এর ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে জাওরাবের ওপরে নীচে কিংবা শুধু নীচে যদি চামড়া যুক্ত থাকে, তাহলে এর ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ বলেন জাওরাব যদি এমন পুরো কাপড়ের তৈরি হয় যে, এর অপর দিক প্রকাশ হয় না। তাহলে জাওরাবের ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর জাওরাবের ওপর মাসহ করেছেন। তাছাড়া জাওরাব মোটা হলে তা পরিধান করে হাটা সম্ভব। পুরো হওয়ার পরিমাণ হচ্ছে- কোনো কিছু ঘরা না আটকানো অবস্থায়ও পায়ে পোছার (ساق) সাথে আটকে থাকা। এমন জাওরাব মোজার সদৃশ। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো- এটি (জাওরাব) মোজার সম-মানের নয়। কারণ তা পরিধান করে অব্যাহতভাবে চলাচল করা সম্ভব নয় অবশ্য যদি তা যুক্ত হয়। আর এটাই হচ্ছে হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তাঁর থেকে এমন এক বর্ণনাও আছে যে, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর ওপরই ফাতওয়া। পাগড়ী, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ নয়। কারণ এগুলো খুলে (ধৌত করার মাঝে) বর্ণিত কোনো অসুবিধা হয় না। অবশ্য رخصة তথা সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র অসুবিধা দূর করার জন্যই। জখমের পট্টির উপর মাসহ করা জায়েজ। যদিও তা অজু ছাড়া অবস্থায় বাঁধা হয়ে থাকে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন এবং হযরত আলী (রা.)-কেও

তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে অসুবিধা মোজা খোলার অসুবিধার চেয়ে বেশি। সুতরাং এক্ষেত্রে মাসহ-এর বৈধতা অধিক যুক্তিযুক্ত। আর পট্টির অধিকাংশ স্থান মাসেহ করাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান (ইবনে যিয়াদ) তা উল্লেখ করেছেন। এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট সময় শরিয়তের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। যদি জখমের পট্টি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হবে না। কেননা, ওজর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ ওজর অব্যাহত আছে, ততক্ষণ তার উপর মাসেহ করা তার নীচের অংশ ধোয়ারই সমতুল্য। আর যদি নিরাময় হওয়ার পর পট্টি পড়ে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ওজর দূর হয়ে গেছে। আর যদি তখন সে নামাজের থাকে, তাহলে সে নামাজ নতুনভাবে আদায় করবে। কেননা বিকল্প দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্বেই সে আসল কর্মের ক্ষমতা লাভ করেছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুজান্নাদ (مجلد) বলা হয় এমন জাওরাব তথা চামড়া ব্যাভীত অন্য কোনো কিছুর তৈরি মোজাকে যার ওপর এবং নিচে চামড়া যুক্ত করা হয়েছে।

মুনা'আল (منعزل) বলা হয় ঐ জাওরাবকে যার নিচে চামড়া যুক্ত করা হয়েছে

জাওরাব -এর ওপর মাসহ করার ওটি সূরত হতে পারে (১) জাওরাব পুরো মোটা কাপড় দ্বারা তৈরি। এবং মুনা'আল (منعل) কিংবা মুজান্নাদ (مجلد) হবে। এমতাবস্থায় সর্বসম্মত রায় হলো এ ধরনের মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। (২) জাওরাব না মোটা কাপড়ের তৈরি না منعل এ ধরনের মোজার ব্যাপারে সর্বসম্মত রায় হলো, এর ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। (৩) জাওরাব তো মোটা কাপড়ের তৈরি, তবে তা منعل নয়। এ ধরনের মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ হয় না হওয়ার বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ওপরোদ্ভিখিত জাওরাবের ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে ইমাম মুহাম্মদ এবং আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তা জায়েজ আছে।

ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো- আবু মূসা আশ'আরী (র.) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি-  
 إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دُءِ جَاوَرَابَرِ وَ ٥٧ مَاسِ هِجْرِي ٥٧  
 اَرْثَا مَهَانَبِي ٥٧ مَسَّ عَلَى الْجَوْرَبِينَ

হাদীসটি যেহেতু মুতলাক, তাই মুতলাক জাওরাবের ওপরই মাসহ করা জায়েজ। তা মুনা'আল হোক অথবা না হোক।

**আকস্মী (এফলী) দলিল :** জাওরাব যদি এভটা মোটা এবং মজবুত হয় যে কোনো প্রকার বাঁধন ব্যতীত তা পায়ের নালাব সাথো স্ত্রিভাবে মিশো থাকো, তাহলে এটা পরিধান কওে ক্রমগত চলাচল করা সস্তব । এমতাবস্থায় তা মোজার সদৃশ বলে গণ্য হওে । স্তরাং মোজার ওপর মাসহ করা যেমনিভাবে জায়েজ, তেমনি জাওরাবের ওপর মাসহ করাও জায়েজ হওে ।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো- জাওরাবকে তখনই মোজার সদৃশ বলে গণ্য করা হবে, যখন সর্ব দিক থেকে জাওরাব মোজার অর্থ বহন করবে। অথচ বাস্তবে জাওরাব মোজার অর্থে নয়। কারণ মোজা পরিধান করে ক্রমাগত চলাচল করা যায়, কিন্তু **منعل** (নিচে চামড়া যুক্ত এমন জাওরাব) জাওরাব পরিধান করে তা করা যায় না। অবশ্য **منعل** জাওরাব দ্বারা যেহেতু এটা করা সম্ভব সেহেতু এর ওপর মাসহ করা জায়েজ হবে। হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত হাদীসটির **محمل** (প্রয়োগক্ষেত্র) ও এই **منعل** জাওরাবই।

ইমাম আবু হানীফা (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে (কারো মতে ওদিন পূর্বে, কারো মতে ৭ দিন পূর্বে) অসুস্থ অবস্থায় **غَيْر مُعَلِّمٍ** জাওয়ারের ওপর মাসহ করেছেন, যারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন **فَعَلْتُ سَكَنَتِ النَّاسُ أَمْنَعُ النَّاسِ** আমি এখন তাই করলাম এতোদিন মানুষকে যা করতে নিষেধ করেছি। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) তার মত পরিবর্তন করে সাহেবাইনের মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেন প্রত্যাবর্তিত মতের ওপরই হানাফী মাহাবের ফতওয়া।

وَلَا يَجُوزُ السَّجُّ عَلَى الصَّمَاةِ الخ : হানাফী মাযহাবের আলেমগণের মতে পাগড়ী, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসহ করা জায়েজ নেই। তবে ইমাম আওযাঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে পাগড়ীর ওপর মাসহ করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজা এবং পাগড়ীর ওপর মাসহ করেছেন বলে সাব্যস্ত আছে।

হানাফী ওলামাগণের দলিল হলো- মোজার ওপর মাসহ করার অবকাশ দেওয়াই হয়েছে অসুবিধা দূর করার জন্য কিন্তু উপরোক্ত জিনিসগুলো খোলা যেহেতু অসুবিধা জনক নয়, সেহেতু এগুলোর ওপর মাসহ করাও বৈধ নয়।

الجَبَانِ : جَبْرَة শব্দটি -এর বহুবচন। আর জবীর ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয় যা ভাসা হাড়ের উপর বাধা হয়। কাযীখান বলেছেন, জবীরার উপর মাসেহ করার অসুবিধা তখন দেওয়া হবে যখন যখনই উপর মাসেহ করা কষ্টসাধ্য হয়। আর যদি যখনই উপর মাসেহ করতে কোনো কষ্ট না হয় তবে জবীরার (পটি) উপর মাসেহ করবে না। মুদাককা হলো, পটির উপর মাসেহ করাটা শরিয়ত সম্মত। যদিও তা অজু ছাড়া অবস্থায় বাধা হয়। দলিল হলো, সাধারণ পটি বাধা হয় জঙ্করতের সময়। আর ঐ অবস্থায় তাহারাৎ এর শর্ত লাগানো দ্বারা কষ্টের দিকে ধাবিত করা হয়। তাই তাহারাৎের গর্তরোপ করা হয়নি। এ ব্যাপারে আসল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও পটির উপর মাসেহ করেছেন। উহুদের দিনে যখন হযরত আলী (রা.) -এর হাতের গিটু ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে পটির উপর মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইনায়্যা গ্রন্থকার পূর্ণ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা.) রাসূলুল্লাহর ﷺ কেতন উঁচু করে রাখছিলেন। যখন হযরত আলীর (রা.) হাত ভেঙ্গে গেল এবং হাত থেকে কেতন পড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলেছিলেন। পতাকা বাম হাতে ধারণ কর। কেননা হযরত আলী (রা.) ইহকালে পরকালে আমার পতাকার মালিক হবে। হযরত আলী (রা.) বললেন। مَا أَصْنَعُ بِالْجَبَانِ পটি দ্বারা আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَمْسَحْ عَلَيْهَا পটির উপর মাসেহ কর। উক্ত হাদীসের মধ্যে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, পটি তাহারাৎে উপর বাধা হয়েছিল না তাহারাৎ ছাড়া বাধা হয়েছিল। সুতরাং বুঝা গেল। মতলাকান পটির উপর মাসেহ করার বিধান রয়েছে তা তাহারাৎের উপর বাধা হোক বা তাহারাৎ হাড়া বাধা হোক।

আকলী দলিল হলো, মোজা খোলার মধ্যে যতটুকু অসুবিধা রয়েছে। পটি খোলা আর বাধার মধ্যে এর চেয়ে আরো অধিক অসুবিধা হয়। সুতরাং যখন অসুবিধা দূর করার জন্য মোজার উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে তো পটির উপর মাসেহ করার বৈধতা আরো অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কিছু পটির উপর মাসেহ করা হয় আর কিছু উপর না করা হয় তবে এর বিধানের ব্যাপারে যাহিহে রিওয়াযাতে কোনো বর্ণনা নেই, তবে হাসান ইবনে যিয়াদের "আমালীতে" রয়েছে যে, যদি প্রধিকাংশ পটির উপর মাসেহ করা হয় তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি অর্ধেক বা এরচেয়ে কম মাসেহ করা হয় তবে তা খেঁচট হবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, পটির উপর মাসেহ করার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। বরং ভালো হওয়া পর্যন্ত চার উপর মাসেহ করা জায়েজ। কেননা পটির উপর মাসেহের ওয়াস্ত সংক্রান্ত কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইবরাহত দ্বারা পটির উপর মাসেহ আর মোজার উপর মাসেহ এর মধ্যকার পার্থক্যের দিকেও ইশারা হয়ে গেল। কেননা (১) মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত নেই। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, পটির উপর মাসেহ ফরজ তাহারাৎ ছাড়াও জায়েজ। কিন্তু মোজার উপর মাসেহ করা তাহারাৎ ছাড়া জায়েজ নেই। তৃতীয় পার্থক্য এই যে, পটি যদি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে মোজা যদি খুলে পা বের হয়ে যায় তবে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, ওজর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত ওজর থাকবে ততক্ষণ পটির উপর মাসেহ করা এমন- যেমন তার নিচের অংশ ধোয়া। এমনকি যদি এক পায়ে পটি থাকে এবং তার উপর মাসেহ করা হয় তখন দ্বিতীয় পায়ে মোজা পরে তার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। যাতে ছকুমের দিক থেকে ধোয়া আর মাসেহ এর মাঝে একত্রিত না করতে হয়। আর যদি পটি যখন নিরাময়ের পর খুলে পাড়ে যায় তখন পটির উপর মাসেহ করা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে ওজরের কারণে পটির উপর মাসেহ করার বিধান দেওয়া হয়েছিল। সে ওজর এখন আর নেই; বরং দূরীভূত হয়ে গেছে। আর যদি পটি নামাজের মধ্যে খুলে পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সে যখনও ভালো হয়ে গিয়েছে তবে নামাজ শুদ্ধ থেকে পুনরায় পড়ে নিবে। কেননা এই ব্যক্তি বিকল্প দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিলের পূর্বেই আসলের উপর ক্ষমতা লাভ করেছে। যেমন তায়ামুমকারী ব্যক্তি যদি নামাজের মধ্যে পানির উপর ক্ষমতা লাভ করে তবে অজু করে পুনরায় শুদ্ধ থেকে নামাজ আদায় করবে।

## بَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ

أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إِسْتِحَاضَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ أَقْلُ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالشَّيْبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ  
وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحا) فِي التَّقْدِيرِ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ  
يَوْمَانِ وَالْأَكْثَرُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِقَامَةٌ لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ قُلْنَا هَذَا نَقَصٌ عَنْ تَقْدِيرِ  
الشَّرْعِ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ وَالزَّائِدُ إِسْتِحَاضَةٌ لِمَا رَوَيْنَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي  
التَّقْدِيرِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ إِسْتِحَاضَةٌ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ  
إِلْحَاقَ غَيْرِهِ بِهِ -

### পরিচ্ছেদ : হায়েয ও ইস্তিহাযা

অনুবাদ : হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন তিন রাত্র। এর চেয়ে কম যেটা সেটা হচ্ছে ইস্তেহাযা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন বাকেরাও ছাইয়েবা নারীর হায়েযের সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন তিন রাত্র, তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ একদিন একরাত্র নির্ধারণের বিপক্ষে দলিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর মেয়াদ দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। এটা অধিকাংশকে সমগ্রের স্থলবত্তী করার ভিত্তি অনুযায়ী। আমরা বলি এটা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদকে হ্রাস করার শামিল। حیض -এর সর্বোচ্চ সময় দশ দিন। তার চেয়ে অধিক দিন পরিমাণ (শ্রাব) হচ্ছে ইস্তিহাযা -এর দলিল এ হাদীস যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর এ হাদীসটি পনের দিন মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে একটি দলিল। এই মেয়াদের অতিরিক্ত বা এর চেয়ে কম রক্ত শ্রাব হচ্ছে ইসতিহাযা। কারণ শরিয়তের নির্ধারিত মেয়াদ অন্যকিছুকে এর সাথে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েয এবং নিফাস হাদাসের অন্তর্ভুক্ত নাকি (نجس) নাপাকির অন্তর্ভুক্ত? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে اختلاف আছে। কারো কারো মত হলো উভয়টি نجس -এর অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো মত হলো উভয়টি হাদাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষোক্ত মতটি যথোপযুক্ত। কারণ এ আলোচনার পরেই লিখক بَابُ الْأَنْجَاسِ উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় হায়েয এবং নিফাস بَابُ الْأَنْجَاس -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি ধরে নেওয়া হয় এ দু'টি انجاس-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে পরবর্তীতে আবার بَابُ الْأَنْجَاس -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। শিরোনামে অধ্যায় স্থাপন করাটা শুধুমাত্র تكرار বলেই গণ্য হবে।

এখানে প্রাধান্যযুক্ত যে, আলোচ্য অধ্যায় (بَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ) -এর نفاس সংক্রান্ত বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মূল শিরোনামে نفاس কথাটিকে উল্লেখ করা হয়নি এ কারণে যে, حیض ও نفاس -এর অর্থ বহনকারী। সুতরাং حیض -এর আলোচনা মূলত نفাস -এরই আলোচনা। তবে উভয়টি একই অর্থ বহনকারী হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে نفাস থেকে حیض -এর ব্যাপারটি যেহেতু অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়, তাই শুধু حیض (শিরোনাম)-এর কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

"حِض" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বহির্গমনকারী রক্ত। ফুকাহাদের পরিভাষায় حِض বলা হয় রোগ মুক্ত প্রাণ্ড বয়স্ক স্ত্রী লোকের رَحِم (বান্ধাদানী) থেকে নির্গত রক্তকে। এর সূচনা হয়েছিল আদিগাতা বিবি হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে এই অবস্থায় পতিত করেন। সেই থেকে নিয়ে তার সন্তানদের মাঝে এ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং ক্রমোন্নত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আমাদের মতে হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন তিন রাত, আর যে রক্ত এর চেয়ে কম সময়ে শ্রাব হয় তা হায়েয নয় বরং তা হচ্ছে استحاضة (ইস্তেহাযা)। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে পূর্ণ দু' দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু রক্তই হায়েয, চাই তার প্রবাহ এক ঘন্টাই হোক না কেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, حِض -এর সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে একদিন এক রাত।

আমাদের দলিল : এ বিষয়ে আমাদের দলিল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা হযরত আবু উমামাহ বাহেলী, আয়শা, ওয়াইলা, আনাস ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসখানা হচ্ছে-

إِنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ الْيَكْبَرُ وَالْيَكْبَرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْسَ لَهَا وَكَثْرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ -

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাকেরা ও সাইয়েবা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন তিনরাত; আর এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন।

এই মেয়াদের কথাই বর্ণিত আছে হযরত ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উসমান, ইবনে আবিল আস এবং আনাস ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণের পক্ষ থেকেও। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দ শুধোলে এরূপ- لَحِيضٌ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا حَيْضٌ نَزْوَى عَشْرَةَ أَيَّامٍ - অর্থাৎ তিন দিনের নিচেও কোনো حِض নেই এবং দশদিনের উপরেও কোনো حِض নেই। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) لَكَثْرُهُ حُكْمُ الْكُلِّ এই মূলনীতির ভিত্তিতে দলিল দিয়েছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, হায়েয হচ্ছে একটি হাদাছ। সুতরাং অন্যান্য হাদাছের ন্যায় এই حِض নামক হাদাছটিও কোনো কিছুর সাথে নির্ধারিত থাকবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রক্তের প্রবাহ যখন পূর্ণ একদিন একরাত ব্যাপী চলতে থাকে, তখন জানা হয়ে যাবে যে এ রক্ত বান্ধাদানী থেকে নির্গত। সুতরাং حِض -এর রক্ত সনাক্ত করার জন্য এর চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জবাব : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত ইমামগণের পেশ করা দলিলসমূহের জওয়াব দেওয়া হয় এই বলে যে, حِض -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে তিন দিন। এখন যদি কেউ তার চেয়ে কম মেয়াদকে হায়েযের জন্য যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে কম হয়ে যাবে। অথচ, শরিয়ত নির্ধারিত সময়সীমাহ্রাস, করা জায়েজ নেই।

আমাদের মতে حِض -এর সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এই মেয়াদ পনের দিন। ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর মতের পক্ষে দলিল হিসাবে ঐ হাদীসটি পেশ করেছেন, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রী লোকদের বীনি ক্রটির ব্যাপারে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন لَا تَصِلُنَّ تَعْدَادُهَا مِنْ شَطْرِ عَمْرٍأَ لَا تَصُومُ وَلَا تَصِلُنَّ অর্থাৎ স্ত্রী লোকেরা তাদের জীবনের অর্ধেক সময় বসে থাকে, নামাজ ও পড়ে না রোজা ও রাখে না। এই হাদীসে شَطْر শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেক। আর এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে হায়েযের সময়কে।

وجه استدلال এই হাদীসটি দ্বারা দলিল দেওয়া হয় এ ভাবে যে, মানুষের জীবন ও বয়স নির্ধারণ করা হয় বছসর গণনার মাধ্যমে। আর বছসর নির্ধারণ করা হয় মাস গণনার মাধ্যমে। আর এক মাসের অর্ধেক হচ্ছে পনের দিন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হয়ে যে, স্ত্রী লোকেরা হায়েযের কারণে পনের দিন নামাজ ও পড়েনা এবং রোজাও রাখে না।

আমাদের দলিল : এ বিষয়ে আমাদের দলিল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা পূর্ববর্তী মাসআলায় দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছিল (আক্রহে ঐ) স্ত্রী লোকেরা হায়েযের কারণে পনের দিন নামাজ ও পড়েনা এবং রোজাও রাখে না। বরং বলা হবে استحاضة কারণ শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো কিছু নির্ধারণ করে দেওয়া এই কথার প্রমাণ যে এই নির্ধারণ করাটাই এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে যুক্ত করতে বাধা দেয়। সুতরাং যে রক্ত এই নির্ধারিত মেয়াদের কম বা বেশি হবে, তা হায়েয হবে না; বরং এটাকে বলা হবে استحاضة।

وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَبْرَةِ وَالصَّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا  
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) لَا تَكُونُ الْكُدْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا بَعْدَ الدَّمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحِمِ  
لِتَأَخَّرَ خُرُوجُ الْكُدْرِ عَنِ الصَّافِي وَلَهُمَا مَا رَوَى أَنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْ مَا سَوَى الْبَيَاضِ  
الْخَالِصِ حَيْضًا وَهَذَا لَا يَعْرِفُ إِلَّا سَمَاعًا وَفَمِ الرَّحِمُ مَنْكُوسٌ فَيَخْرُجُ الْكُدْرُ أَوَّلًا  
كَالْجَرَّةِ إِذَا تُقَبِّبَ أَسْفَلُهَا وَأَمَّا الْخَضْرَاءُ فَالْصَّحِيجُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ  
الْأَقْرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيَحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ وَإِنْ كَانَتْ كَيْبَرَةً لَا تَرَى غَيْرَ  
الْخَضْرَاءِ تَحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْمَنْبَتِ فَلَا تَكُونُ حَيْضًا -

অনুবাদ : স্বচ্ছ শুভ্রতা দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঋতু গ্রহণকারী (حائضه) লাল, হলদেবর্ণা ঘোলা রঙ্গের যে কোনো শ্রাব দেখতে পাবে, তা হয়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, শুধু মাত্র রক্তের পরেই ঘোলা বর্ণের শ্রাবকে হয়েয বলে গণ্য করা হবে। অন্যথায় নয়। কারণ উক্ত রক্ত যদি জরায়ু থেকে নির্গত হতো তাহলে ঘোলা শ্রাব অবশ্যই স্বচ্ছ রক্তের পরে বের হতো। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীস যে, তিনি স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া সব কিছুকে হয়েয হিসাবে গণ্য করতেন। আর এ সব বিষয়ে একমাত্র শুনেই জানা যায়। জরায়ুর মুখ যেহেতু নিম্নমুখী সেহেতু খোলা রক্তটাই আগে বের হবে। কলসের নীচ দিক দিয়ে ফুটো করলে যেমন হয় (অর্থাৎ নিচের গাদা আগে বের হয়)। সবুজ রঙের শ্রাব সম্পর্কে বিতর্কিত মত হচ্ছে- স্ত্রী লোকটি ঋতুবতী হলে, তা হয়েয বলে গণ্য হবে। আর রঙের ব্যাপারটি খাদ্যের দোষের কারণে হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর যদি ঐ মহিলা অধিক বয়স্ক হয়, যে সবুজ রং ছাড়া আর কিছু দেখেনা, তাহলে তা উৎস (জরায়ু)-এর দোষ বলে ধরা হবে এবং এটা হয়েয বলে গণ্য হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েযের রঙ : ফুকাহা গণের মতে হায়েযের রঙ ছয় প্রকার- (১) কালো (২) লাল (৩) হলুদ (৪) গাদলা (৫) সবুজ এবং (৬) মেটে।

হিদায়া প্রণেতা তার কিতাবে কালো রঙ্গের উল্লেখ করেননি এ কারণে যে, এটি হায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- **دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ عَيْطٍ مُعْتَمِدٍ** অর্থাৎ হায়েযের রক্ত কালো তাজা গাড় লাল হয়ে থাকে। এই হাদীসে বর্ণিত **عَيْطٍ** শব্দটির অর্থ তাজা আর **مُعْتَمِدٍ** শব্দের অর্থ গাড় লাল। লাল রঙ যখন খুব বেশি গাড় হয়ে যায়, তখন কিছুটা কালো রঙ ধারণ করে, আর লিখক এ কারণে মেটো রঙেরও উল্লেখ করেন নি যে, গাদলা তথা ঘোলা রঙটা মেটো রঙ্গের অতি নিকবতী রঙ। তাই ঘোলা রঙ্গের উল্লেখ থাকাতো মেটো রঙ্গের উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনি। মেটিকথা কালো এবং লাল রঙ্গের রক্ত হায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই। আর গাড় হলুদ বিতর্কিত মতানুযায়ী হয়েয। বাকি আছে ঘোলা রঙ্গের রক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে **طرفين** -এর মত হলো এ রংও হায়েয বলে গণ্য। চাই তা হায়েযের প্রাথমিক দিন গুলোতে দেখা যাক অথবা শেষের দিকের দিনগুলোতে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ঘোলা

রক্তের রক্ত কেবল মাত্র তখনই হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে যদি তা স্বচ্ছ লাল রক্তের পরে দেখা দেয়। যদি প্রথমেই ঘোলা রং দেখা দেয়, তাহলে তাঁর মতে বুঝে নিতে হবে যে, এটা জরায়ু থেকে নির্গত হয়নি। বরং তা নির্গত হয়েছে অন্যকোনো রগ ইত্যাদি থেকে। আর যে রক্ত জরায়ু ছাড়া অন্য কোনো স্থান থেকে নির্গত হয়, তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হয়না। এ কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ঘোলা রংকে ততক্ষণ পর্যন্ত হায়েয বলেন না যতক্ষণ না তার পূর্বে লাল রক্ত দেখা দেয়।

صاحب عناية ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল এভাবে বিবৃত করেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর ঘোলা অবস্থাটা তার স্বচ্ছ অবস্থার অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং এখন যদি ঘোলা রক্তের স্বচ্ছ রক্তের প্রকাশ না ঘটা সত্ত্বেও ঘোলা রংকে হায়েয বলা হয়, তাহলে ঘোলা রংটাই মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। অনুগামী নয়। অথচ প্রত্যেক বস্তুর ঘোলা অবস্থাটা তার স্বচ্ছতার অনুগামী হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা এবং মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল-

এর দলিল হচ্ছে হলো- হয়রত আয়শা (রা.) স্বচ্ছ শুভ্রতা ছাড়া সবকিছুকে হায়েয হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) তাঁর মু'আত্তা নামক হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلَقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالزَّرْجَةِ فِيهَا الْكَرْسَفُ فَيَبِي الصَّفْرَةَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ لِيَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَنَقُولُ لهنَّ لَا تَجْعَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ -

হয়রত আবু আলকামার সন্তান আলকামা তাঁর মা যিনি হয়রত আয়েশা (রা.)-এর আজাদ করা বান্দি ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন মহিলাগণ হয়রত আয়েশা (রা.)-এর নিকট (হায়েযোত্তর) তাদের নামাজ সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য এমন কাপড়ের পোটলা পাঠাতেন যার মাঝে হায়েযের হলুদ রঙের রক্ত মাখা কুরছূপ (এক প্রকার কাপড়েরর টুকরা যা ক্রীণগ হায়েযের সময় পরিধান করে থাকে। যার বিকল্প হচ্ছে আধুনিক যুগের নেপকিন) থাকতো। হয়রত আয়েশা (রা.) তাঁদেরকে বলতেন তোমরা সাদা কিচ্ছা অর্থাৎ স্বচ্ছ শুভ্রতাব দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করা না।

এই হাদীসটি থেকে ও প্রমাণ হয় যে, সাদা রং ছাড়া হায়েয চলাকালের সব রঙের রক্তই হায়েযের রক্ত। আর এ কথা স্পষ্ট যে হয়রত আয়েশা (রা.) এ বিষয়ে যা কিছু বলেছেন সব হজুর ﷺ থেকে শুনেই বলেছেন।

وَمَنْ الرِّخْمُ مَنْكُوسٌ এই কথাটি বলে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর পেশ কৃত দলিলের জবাব দিয়েছেন। যার বিবরণ হচ্ছে হলো- “ঘোলা রং স্বচ্ছ রঙের পরে আসে” এই নীতি আমরা মানি। তবে এটা ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যে ক্ষেত্রে পাত্রের নিচে ছিদ্র না থাকে। অবশ্য যদি পাত্রের নিচ দিক দিয়ে ছিদ্র থাকে, তাহলে প্রথমে গাদ বা ঘোলা রঙের বস্তুই বের হয়ে আসবে তার পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু প্রকাশ পাবে। এখানের চিত্রটাও ঠিক তাই। কারণ জরায়ুর অবস্থান হচ্ছে নিম্নমুখী। তার মুখ হচ্ছে নিচ দিক দিয়ে। হায়েযের দিন শুভো ছাড়া অন্য সময়ে জরায়ুতে মুখ বন্ধ থাকে। সুতরাং হায়েয শুরু হওয়ার প্রকালে যখন জরায়ু মুখ খোলে, তখন সর্বপ্রথম তলানী তথা ঘোলা রংয়ের রক্তই বের হবে। সুতরাং এই রক্তের রক্তকে জরায়ু থেকে নির্গত হয় না বলাটা সঠিক নয়।

وَالْحَيْضُ يَسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَيَحْرِمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضَى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضَى الصَّلَاةَ يَقُولُ عَائِشَةُ (رض) كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضَى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضَى الصَّلَاةَ وَإِنْ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا لِيَتَضَاعَفَهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ —

অনুবাদ : হায়েয হায়েযগ্রস্থের জিম্মা থেকে নামাজকে রহিত করে দেয় এবং রোজা রাখাকে তার ওপর হারাম করে দেয়। তবে হায়েযা মহিলাকে রোজার কায্য করতে হবে। নামাজের কাজ্য করতে হবে না। কারণ হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আমাদের কেউ যখন হায়েজ থেকে পবিত্র হতো তখন সে রোজার কাজ্য করতো কিন্তু নামাজের কায্য করাটা মহিলাদের জন্য অসুবিধা জনক। কেননা তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রোজার কাজ্য করার ব্যাপারে এই অসুবিধাটা নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখান থেকে হায়েযের বিধানাবলির বিবরণ শুরু হয়েছে। নিহায়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হায়েযের মোট কয়টা বিধান আছে। এর মধ্যে আটটি বিধান এমন যার মাঝে حیض নিফাস উভয়টা शामिल। আর বাকি চারটা এমন যা শুধু হায়েযের সাথে নির্দিষ্ট।

প্রথম আটটির একটি হচ্ছে নামাজ রহিত হওয়া, তবে কায্য করতে হবে না, আর রোজা হারাম হওয়া তবে কথা করতে হবে। দলিল হচ্ছে হলো— হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন—

كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا تَقْضَى الصِّيَامَ وَلَا تَقْضَى الصَّلَاةَ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আমাদের কেউ যখন হায়েয থেকে পবিত্র হতো তখন সে রোজার কায্য করতো কিন্তু নামাজের কায্য করতো না।

হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজ গুলোর কাজ্য ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে দলিল :

নামাজ এমন আমল যা দায়েমী এবং বছরের প্রতিদিনই তা প্রত্যহ পাঁচবার করে ফরজ হয়, কোনো দিন তার ব্যত্যয় ঘটে না। এমতাবস্থায় হায়েজগ্রস্থ মহিলা যদি তার হায়েযের দিন গুলোর নামাজ কাজ্য করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক দিন নির্ধারিত নামাজ ছাড়াও অতিরিক্ত দ্বিগুণ নামাজ আদায় করতে হবে। যা তার পক্ষে অসুবিধা জনক এবং কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। পক্ষান্তরে রোজার ব্যাপারটি তার থেকে ভিন্ন। কারণ রোজা ফরজ হয় সারা বৎসরে মাত্র একমাস। এই এক মাসের মধ্যে যে ক্বীলোকের যত দিন ঋতুস্রাব চলতে থাকবে, ততদিন সে রোজা রাখবেনা ঠিক, কিন্তু এ মাস চলে যাওয়ার পর বাকি এগার মাসের যে কোনো সময় সে তার রোজাগুলোর কাজ্য করতে গেলে তাকে ডবল রোজা রাখার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছেনা। এ কারণেই হায়েযা ক্বীপণের জন্য নামাজের কাজ্য ওয়াজিব না করে রোজার কাজ্য ওয়াজিব করা হয়েছে। কারণ মহান দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা বান্দীদেরকে অসুবিধায় পতিত করেন না। ইরশাদ হয়েছে— رَسَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো অসুবিধা বা কাঠোরতা আরোপ করেননি।

— (সূরা হাঙ্ক, আয়াত ৭৮)

অবশ্য যদিও কায়াকারী রোজার কাজ্য ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরিয়ত তা خَلَا نِيسَ রোজা রাখা ওয়াজিব করা হয়েছে।



وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْجَنَّةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنِّي لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ  
لِحَائِضٍ وَلَا جَنِبٍ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (রূ.) فِي إِباحَةِ الدُّخُولِ عَلَى  
وَجْهِ الْعَبُورِ وَالْمُرُورِ وَلَا تَطَوُّفٌ بِالْبَيْتِ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا  
لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ -

অনুবাদ : হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোক মসজিদে প্রবেশ করবে না। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তিও। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমি কোনো হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোক এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ করাকে হালাল রাখিনি। এই হাদীসটির ব্যাপক ভাষ্য (اطلاق) ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দলিল যে, তিনি বলেন শুধু মাত্র পার হওয়া এবং অতিক্রম করার জন্য (উক্ত ব্যক্তিদের) মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ এবং সে ব্যতীতকার তওয়াফ করবে না। কারণ তওয়াফ মসজিদের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "আর তারা পরিস্কার পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এইটি হায়েয সংক্রান্ত তৃতীয় حكم বিধানটি হচ্ছে হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীলোকের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নেই। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির জন্যও মসজিদ প্রবেশ করা জায়েজ নেই। অবশ্য ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে حائضه এবং جنبی ব্যক্তি মসজিদের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়া বা পথ অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু তারা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করতে পারবে না। তিনি দলিল দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি দ্বারা-

وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا -

তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়োনা যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবে, তোমরা কি বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করা ব্যতীত। অবশ্য দলিল প্রদানের প্রক্রিয়াটি (وجه استدلال) হলো আয়াতে صلوٰة বলে مكان صلوٰة তথা মসজিদ বুঝানো হয়েছে। আর عابری سبیل -এর অর্থ হলো পথ অতিক্রমকারী। এতে আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের নিকটে যাওয়া জায়েজ নেই কিন্তু যদি মসজিদ অতিক্রম করে সেখানে অবস্থান না করে। তাহলে তা জায়েজ আছে।

আমাদের দলিল : আমাদের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهَذَا هِذِهِ الْبَيْتُ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جَنِبٍ -

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন এই গৃহগুলোর প্রবেশদার মসজিদের দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও, কারণ আমি হায়েয গ্রস্থ রমণী এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য হালাল রাখি না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব :

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকরা দলিলের প্রথম জবাব হচ্ছে- মুফাসিসগণ বলেছেন উক্ত আয়াতের يَا শব্দটি لا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের নিকট যাবে না এবং সে পথ অতিক্রম করার জন্যও মসজিদে প্রবেশ করবে না। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে- আয়াতে صلوٰة শব্দটি হাকীকতানই হলো : صلوٰة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর عابری سبیل দ্বারা মুসাফিরকে বুঝানো হচ্ছে। ফলে আয়াতের মর্ম হচ্ছে নামাজ না নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পড়বে না জুনুবী অবস্থায় পড়বে। তবে কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় জুনুবী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি গোসল করার আগে তায়ামুম দ্বারা নামাজ আদায় করতে পারবে।

মাওলানা নাজমুদ্দীন যাহেদী (র.) বলেন, উপরোক্ত দলিলটি দুর্বল। কারণ এ দলিলের দাবি হলো হায়েযগ্ৰন্থ মহিলাদের জন্য তওয়াফ করা নিষেধ এই জন্য যে, তওয়াফ করতে হলে মসজিদের প্রবেশ করতে হয়। আর মসজিদে প্রবেশ করা তাদের জন্য নিষেধ। তাই এই অবস্থায় তাদের জন্য তওয়াফ করাও নিষেধ। উপরোক্ত দলিলটি থেকে আরো যা বুঝা যায়, তা হচ্ছে- হায়েযগ্ৰন্থ মহিলারা যদি মসজিদের বাইরে থেকে তওয়াফ করে তা হলে জায়েজ হওয়া উচিত। অথচ প্রকৃত মাসআলা হলো হায়েযগ্ৰন্থদের জন্য তওয়াফ করাই জায়েজ নেই, চাই তা মসজিদের ভিতরে গিয়ে হোক অথবা বাইরে থেকে হোক। যদিও পবিত্র মহিলাদের জন্য মসজিদের বাইর থেকে তওয়াফ করা জায়েজ। এসব কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত হতো যদি দলিলটি এভাবে দেওয়া হতো যে, হায়েযগ্ৰন্থদের জন্য তওয়াফ জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো তওয়াফ নামাজের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ বলেছেন- الطَّوَّافُ يَنْتَبِطُ صَلَاةً অর্থাৎ বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা ও সালাতের মধ্যে शामिल। তাই হায়েযসমূহের জন্য নামাজ পড়া যেহেতু নিষেধ। সেহেতু তওয়াফ করাও নিষেধ।

—(সূরা বাকারা, আয়াত- ২২২)

হায়েযখাঃ অবস্থায় জীবর সাথে সঙ্গম না করে মিশা-মিশির মাধ্যমে মজা লাভ করা জায়েজে আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, শাফিঈ, মালিক (র.) প্রমুখ আইম্মাগণের মত হলো হাট্ট থেকে উপরের দিকে নাবী পর্যন্ত শরীরের এ অংশ থেকে মজা লাভ করা হারাম। আর ইমাম মুহাম্মদ এবং আহমদ (র.) বলেন, শুধুমাত্র যোনিদার বা লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে মজা লাভ করা হারাম নয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন **إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ** অন্য বর্ণনায় আছে **إِلَّا الْجَمَاعَ** অর্থাৎ শুধুমাত্র সঙ্গম ছাড়া সবই করতে পারো।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রসঙ্গ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার স্ত্রী হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় থাকা কালে তার সাথে আমার কি কি করা হালাল এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর উত্তরে তিনি বলেছেন **مَنْعُ الْإِذَا** অর্থাৎ চাদরের ওপর যা আছে।

وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالنَّفْسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ  
وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَا لَكَ فِي الْحَائِضِ وَهُوَ بِاطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ  
مَا دُونَ الْآيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِيِّ فِي إِباحَتِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا  
بِغَلَا فِيهِ وَلَا اخْتِذْ ذَرَمَهُ فِيهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِصُرَّتِهِ وَكَذَا الْمُحَدِّثُ لَا يَمَسُّ  
الْمُصْحَفَ إِلَّا بِغَلَا فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ثُمَّ الْحَدَّثُ وَالْجَنَابَةُ  
حَلًّا لِدَفْعِ فَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الْمَسِّ وَالْجَنَابَةُ حَلَّتِ الْقَمَّ دُونَ الْحَدَّثِ فَيَفْتَرِقَانِ فِي  
حُكْمِ الْقِرَاءَةِ وَغِلَا فِيهِ مَا يَكُونُ مُتَجَافِيًا عَنْهُ دُونَ مَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ كَالْجِلْدِ الْمَشْرُزِ  
هُوَ الصَّحِيحُ وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكَفِّ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ بِخِلَافِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ  
لِأَهْلِهَا حَيْثُ يَرْخُصُ فِي مَسِّهَا بِالْكَفِّ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً وَلِأَنَّهُ يَدْفَعُ الْمُصْحَفَ إِلَى  
الصَّبَّانِ لِأَنَّ فِي الْمَنَعِ تَضْيِيعَ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطَهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ وَهَذَا  
هُوَ الصَّحِيحُ -

অনুবাদ : হয়েজ, জানাবাত এবং নিফাসগ্রস্থদের জন্য কুরআন পাঠ বৈধ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হয়েজগ্রস্থ ও জুনুবী ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না। এই হাদীসটি হয়েজার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। আর এর ব্যাপক ভাষ্য (الطلاق) এক আয়াতের কম পরিমাণকেও শামিল করে। তাই এই পরিমাণ যে বৈধ বলে ইমাম তুহাবী (র.) যে মত পোষণ করেন এ হাদীসটি তার বিপক্ষেও দলিল। তাদের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয় এবং যে মুদ্রায় কুরআনের কোনো সূরা লিখিত আছে তাও খুতি ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির অজু নেই সেও গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। যেহেতু হাদাছ এবং জানাবাত উভয়টা হাতে অনুপ্রবেশ করে থাকে, সেহেতু স্পর্শ করার বিধান উভয়টাই সমান। আর জানাবাত যেহেতু মুখে অনুপ্রবেশ করে থাকে এবং হাদাছ মুখে অনুপ্রবেশ করে না সেহেতু পাঠের বিধান দু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আর গিলাফ হচ্ছে যা কুরআন থেকে আলাদা থাকে। তা নয় যা কুরআনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন বাঁধাই কৃত চামড়া এটাই বিতন্ক মত। আন্তিন দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরুহ। এটাই বিতন্ক অভিমত। কারণ অস্তিন ব্যক্তির তাবে শরিয়ত সম্পর্কিত কিতাবাদির বিধান এর বিপরীত। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আন্তিন দ্বারা স্পর্শ করা জায়েজ আছে। কারণ তাতে প্রয়োজন আছে। অবশ্য বান্দাদের হাতে কুরআন তুলে দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ যদি তাদের এ থেকে বারণ করা হয়, তাহলে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি বিনষ্ট হবে। আর পবিত্রতার নির্দেশ তাদের জন্য কষ্ট কর। এটাই সহীহ অভিমত।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েযগ্রন্থের ষষ্ঠ হুকুম হলো তারা কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারবে না। এমনভাবে জুনুবী ব্যক্তির। জুনুবী ব্যক্তি পুরুষ ইভক বা মহিলা কারো জন্যই কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েজ নেই। এক আয়াত কিংবা এক আয়াতের চেয়ে কম পড়াও জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (রা.) বলেন, হায়েযগ্রন্থ মহিলার জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েজ আছে। ইমাম তুহাবী (র.) হায়েযগ্রন্থ মহিলার জন্য কুরআন শরীফের এক আয়াতের চেয়ে কম পাঠ করাকে মুবাহ বলেছেন।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল : হায়েজ মহিলা মাযুর। আবার কুরআন পাঠের প্রতিও মুহতাজ। অথচ পবিত্রতা অর্জন অক্ষম এসব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই হায়েযা স্ত্রীগণের জন্য কুরআন পাঠ করাকে জায়েজ করা হয়েছে। অবশ্য জুনুবী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। কারণ যে গোসল অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। তবে নিফাস যেহেতু জীবনের খুব কম সময়ে সংঘটিত হয়, তাই এক্ষেত্রে এটাকে ওজর হিসাব ধরা হয়নি এবং নিফাসগ্রন্থের জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করাকে বৈধ করা হয়নি।

আমাদের দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجَنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ অর্থাৎ হায়েযগ্রন্থ ও জুনুবী কুরআনের কোনো অংশ পাঠ করবে না। এ হাদীসটি ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষে দলিল। কারণ এটি সরাসরি হায়েয গ্রন্থের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা না জায়েজ হওয়া অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং ইমাম মালিক (র.)-এর عَلَى دَلِيلٍ হাদিসের বিপক্ষে দলিল হতে পারে না। অপরদিকে এ হাদীসটি যেহেতু طَلُقَ (ব্যাপক), সেহেতু এ হাদীস কুরআনের এক আয়াত এবং তার চেয়ে কম অংশকেও শামিল করে নেয়। ফলে ইমাম তুহাবী (র.)-এর উক্তিটিও এর দ্বারা নাকচ হয়ে যায়।

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ الْكِتَابَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَهُوَ كَمَا كَانَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ الْكِتَابَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَهُوَ كَمَا كَانَ: সত্তম নব্বির বিধান হলো জুনুবী এবং নিফাস গ্রন্থের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নাজায়েজ। আর যে মুদার গায়ে কুরআনের আয়াত লিখিত আছে, তা স্পর্শ করাও নাজায়েজ যে খেলের মাঝে এ ধরনের মুদা আছে তা স্পর্শ করা জায়েজ আছে। এ হুকুম অজু বিহীন ব্যক্তির জন্যও। দলিল হচ্ছে হজুর ﷺ-এর বাণী- لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا بِطَهْرٍ অর্থাৎ শুধুমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারে।

হাকীম ইবনে হিয়াম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন বলেছিলেন, তুমি শুধুমাত্র পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।

কেউ কেউ এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম হওয়ার বিষয়টি সরাসরি কুরআনের আয়াত لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا بِطَهْرٍ দ্বারা ও প্রমাণিত হয় তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার এর দ্বারা দলিল না দিয়ে হাদীস দ্বারা দলিল দিলেন কেন?

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কারো কারো মতে এ আয়াতে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। এজন্য তিনি মানুষের বিধান বর্ণনার ব্যাপারে এ আয়াত দ্বারা দলিল দেননি।

হিদায়া লিখক বলেন, কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ব্যাপারে জানাবাত এবং হাদাছ উভয়ের বিধান এক। অর্থাৎ হাদাছের কারণে যেমন কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না, তেমনি জানাবাতের কারণেও পারে না। কিন্তু কুরআন শরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে এ দু'য়ের হুকুম ভিন্ন। তাই মুহদাছ হাদাছগ্রন্থের জন্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ হলেও জুনুবী ব্যক্তির জন্য তা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো হাদাছ এবং জানাবাত উভয়ের নাপাকী ব্যক্তির হাত পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে, তাই উভয় অবস্থায় হাত দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা নাজায়েজ। পক্ষান্তরে হাদাছ মুখ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে না। এ কারণেই হাদাছগ্রন্থের জন্য কুলি করাও ওয়াজিব নয় এবং কুরআন পাঠ করাও নিষিদ্ধ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার আরো বলেন, যে গিলাফ দ্বারা বা যে গিলাফের উপর দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ আছে। তা হচ্ছে এমন গিলাফ বা অন্য কিছু যা কুরআন শরীফের সাথে স্থায়ীভাবে জড়িত হয়ে থাকে না। অর্থাৎ যা স্পর্শকারী ও কুরআন শরীফের মাঝে একটি ব্যাবধানকারী হিসাবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে অনেক রকম মতামত থাকলেও বিদ্বৎমত মত হচ্ছে যে, গিলাফ বলা হয় এমন খলেকে যার মাঝে কুরআন শরীফ রাখা হয়। যাকে উর্দুতে জুযদান (جزدان) বলে।

অজু বিহীন ব্যাকদের হাতে কুরআন শরীফ দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ যদি এই হুকুম না দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো তাদেরকে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না, নয়তো তাদের তুহারাত লাভ করতে বলা হবে। প্রথম প্রস্তাবে হিফযে কুরআন বিনষ্ট হবে আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাদের জন্য অসুবিধা হবে।

وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لَاقِلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَحِلَّ وَطَبْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ لِأَنَّ الدَّمَ يَدُرُّ تَارَةً وَيَنْقُطِعُ أُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِغْتِسَالِ لِيَتَرَحَّجَ جَانِبُ الْإِنْقِطَاعِ وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَضَى عَلَيْهَا أَذْنَى وَقْتُ الصَّلَاةِ يَفْقِرُ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الْإِغْتِسَالِ وَالْتَحَرَّمَ حَلُّ وَطَبْهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَيْنَ فَيَ ذِمَّتِهَا فَطَهَّرَتْ حُكْمًا وَلَوْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ الثَّلَاثِ لَمْ يَفْرِنَهَا حَتَّى تَمْضَى عَادَتُهَا وَإِنْ اغْتَسَلْتَ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الْإِحْتِيَاظُ فِي الْاجْتِنَابِ وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ حَلَّ وَطَبْهَا قَبْلَ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيدَ لَهُ عَلَى الْعَشْرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ لِلْنَّهْيِ فِي الْفِرَاءِ بِالتَّشْوِيدِ

অনুবাদ : হায়েজের রক্তশ্রাব যদি দশদিনের কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েজ নেই। কারণ রক্ত কখনো চলতে থাকে আবার কখনো থেমে থাকে। সূতরাং থামার দিক টিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। যদি সে গোসল না করে আর তার ওপর দিয়ে নামাজের এই পরিমাণ আদান সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে, সে এসময়ে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। আর উক্ত নামাজ তার ওপর ঋণ হিসাবে আরোপিত হয়ে গেছে। সূতরাং বিধান মোতাবেক (حكما) সে পবিত্র বলে সাব্যস্ত। যদি তিন দিনের ওপরে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে রক্তশ্রাব বন্ধ হয়, তাহলে অভ্যস্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সঙ্গম করবেনা। যদিও সে গোসল করে থাকে। কারণ অভ্যস্ত সময়ে পুনরায় শ্রাব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল; সূতরাং পরিহার করার মাঝেই সতর্কতা। আর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়, গোসলের পূর্বেই তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কারণ হায়েজ দশদিনের অতিরিক্ত হতে পারে না। অবশ্য গোসলের পূর্বে সহবাস করাটা পছন্দনীয় নয়। তাশদীদ যুক্ত কিরাআতের পরিশ্রেক্ষিতে এ বহুটি নিষেজার মাঝে शामिल হওয়ার দরুন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অষ্টম হুকুমের বিবরণ হচ্ছে যে, যদি অভ্যাস মোতাবেক কোনো মহিলার হায়েজের রক্ত দশদিনের আগে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে গোসল করা ব্যতীত তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। দলিল হলো রক্ত কখনো প্রবাহিত হয় আবার কখনো থেমে থাকে। তাই থেমে থাকা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিক টিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। যদি এ মহিলা রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার গোসল না করে আর এ অবস্থায় এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যে এ সময়ে সে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো, তাহলে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কারণ এই নামাজ তার ওপর ঋণ স্বরূপ আরোপিত হয়েছে। তাই তাকে বিধি মোতাবেক (حكما) পবিত্র সাব্যস্ত করা হবে। কেননা শরিয়ত যখন তার ওপর নামাজ ফরজ করেছে, তখন তাকে (حكما) পবিত্রও সাব্যস্ত করেছে। কারণ হায়েজমাস্তুরের জন্য নামাজ পড়া জায়েজ নয়।

الخ : وَلَوْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ الْخ : উদাহরণত কোনো মহিলার হায়েজের অভ্যাস হচ্ছে সাত দিন কিন্তু পঁচাদিনের মাথায় এসে যদি তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় উক্ত মহিলা গোসল করা সত্ত্বেও ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পূর্ব অভ্যাসের সময় অতিক্রম করে। কারণ অভ্যাসের সময় থাকতে থাকতে অধিকাংশ সময়ে পুনরায় রক্তশ্রাব শুরু হয়ে যায়। সূতরাং তার সহবাস না করাটাই নিরাপদ এবং সতর্কতা। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার মাথায় রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করার আগেই এ মহিলার সাথে সহবাস করা জায়েজ আছে। কারণ হায়েজ দশদিনের চেয়ে বেশি হতে পারে না। অতএব, দশদিনের পরে আর হায়েজ থাকে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও গোসলের আগে সহবাস করা পছন্দনীয় নয়। তাশদীদ যুক্ত কিরাআতের নিষেধাজ্ঞার করানো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (এবং ১) - এর ওপর তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) এ কিরাআত অনুযায়ী পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রাবল্য অর্জনের বিষয়টি এখানে মুখ্য ও মতলব। আর পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রাবল্য (مبالغة) হচ্ছে রক্ত বন্ধ হওয়ার পরও গোসল করা। এই কিরাআতটি যদিও দশদিন এবং দশদিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া উভয় অবস্থায়কেই शामिल করে, কিন্তু এতটুকু ফরখ আছে যে, দশ দিনের কম সময়ে রক্ত বন্ধ হওয়া অবস্থায় শ্রাব শেষে গোসল ছাড়া সহবাস করা জায়েজ নয়। আর দশদিনের মাথায় বন্ধ হওয়ার সূরতে গোসল ছাড়া সহবাস করা জায়েজ তবে গোসল করা মোস্তাহাব।

وَالطَّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مَدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالِدَمِّ الْمُتَوَالِي قَالَ (ض)  
 هِذِهِ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَوَجْهُهُ أَنَّ اسْتِغْنَابَ الدَّمِ مَدَّةَ الْحَيْضِ  
 لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ كَالنِّصَابِ فِي بَابِ الزَّكُوفَةِ وَعَنْ أَبِي  
 يَوْسُفَ (رح) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الطَّهْرَ إِذَا كَانَ أَقْلَ  
 مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَفْصِلُ وَهُوَ كَالِدَمِّ الْمُتَوَالِي لِأَنَّهُ طَهْرٌ فَاسِدٌ فَيَكُونُ  
 بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ وَالْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْسَرُ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ وَأَقْلَ الطَّهْرِ  
 خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا وَلَا غَايَةً  
 لِكَثْرَتِهِ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سَنَةٍ وَسَنْتَيْنِ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيرٍ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ يُعْرَفُ  
 ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ -

অনুবাদ : হায়েজের মেয়াদ চলা কালে যদি দুই রক্তের মাঝখানে পবিত্রতা দেখা দেয়, তাহলে তা অব্যাহত রক্তস্রাব বলে গণ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন (এ বিষয়ে) এটি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়াজত সমূহের মধ্যে অন্যতম। এর কারণ হচ্ছে- সর্ব সম্মত মত অনুযায়ী হায়েজের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং মেয়াদের শুরু আর শেষটাই বিবেচ্যঃ যেমন- যাকাতের বিষয়ে নিসাবের হুকুম। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর একটি মত আছে যা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ও এক মত এবং বলা হয় এটা আবু হানীফা (র.) এর (এ বিষয়ে) সর্বশেষ মত আর তা হচ্ছে যে, যদি পবিত্রতা পনের দিনের কম হয়, তাহলে তা ফাসিল বা ব্যাবধানকারী হবে না; বরং পূর্ণ মেয়াদ অব্যাহত স্রাব বলে গণ্য হবে। কারণ এটি হচ্ছে তুহুরে ফাসিদ। সুতরাং এটি রক্তের স্থলবতী হবে। এ মতটি গ্রহণ করা অধিকতর সহজ। এর পূর্ণ বিবরণ (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিতাবুল হায়েজ এ জানা যাবে। তুহুর এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন। ইব্রাহীম নখসি থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। আর এ বিষয়ে তাওকীফ তথা অবহিত করণ ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তার সর্বোচ্চ মেয়াদের সীমানা নেই। কারণ তা এক বছর দুই বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। অতএব, তা কোনো মেয়াদ দ্বারা নির্ণয় কর। অবশ্য রক্তস্রাব যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, (তাহলে এমন মহিলার বিষয়ে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়) ১) এ বিষয়ের বিধি-বিধান কিতাবুল হায়েজে জানা যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

طَهْرُ (১) طَهْرُ দুই প্রকার। ১) طَهْرُ (কে পেশ দিয়ে) বলা হয়, দুই হায়েজের মধ্যবর্তী ব্যবধানকারী সময়কালকে। طَهْرُ (২) طَهْرُ (তুহুরে ফাসিদ) (তুহুরে কামিল) (২) طَهْرُ (তুহুরে কামিল)। শেযুক্ত প্রকারটি সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিল বা ব্যবধানকারী। তবে প্রথমোক্ত প্রকারটি (طَهْرُ فَاسِلٌ) ফাসিল কিনা এ বিষয় খোদ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে ছয়টি মত বর্ণিত আছে। এর মধ্য থেকে হিদায়া গ্রন্থকার শুধুমাত্র দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমে এই দুটি মতই উল্লেখ করা হলো।

১) طَهْرٌ نَافِلٌ অর্থ্যাৎ দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পরিষ্কৃতি যদি পনের দিনের চেয়ে কম হয়, তাহলে তা طَهْرٌ نَافِلٌ বা দুই হায়েজের মাঝে বাবধান সৃষ্টিকারী তুহুর বলে বিবেচিত হবে না। বরং আদ্যোপান্ত পুরা সময়টিকে হায়েজ বলে গণ্য করা হবে। যেমন প্রথমবার হায়েজ শুরু হয়েছে (مبدأ) এমন কোনো মেয়ে যদি একদিন রক্ত দেখার পর মাঝখানে আউটিন পরে পুনরায় একদিন রক্ত দেখে, তাহলে এই পূর্ণ দশদিনই হায়েজ। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বর্ণনা। দলিল হচ্ছে— হায়েজের সময় অব্যাহতভাবে রক্তস্রাব চলতে হবে কারো দৃষ্টিতেই এমন কোনো শর্ত নেই। সুতরাং প্রথম (হায়েজের স্রোতের) এবং শেষে রক্তস্রাব পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। যেমন জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ বৎসর অব্যাহতভাবে নেসাবের মালিক থাকা শর্ত নয়, বরং বৎসরের শুরু এবং শেষে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকাই যথেষ্ট।

(২) সাধারণত তুহুর নাকিস ব্যাবধানকারী (نافل) নয়, চাই তা দশদিন থেকেও বেশি হউক না কেন। এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর। আর এটিই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সর্ব শেষ মত। এই মাতানুযায়ী হায়েজের শুরু আর শেষ উভয়টা তুহুর দ্বারা সাব্যস্ত করা সম্ভব। যেমন এক মহিলার সাধারণ অভ্যাস হলো প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়। কিন্তু কোনো একবার সে যদি অভ্যাসের আগের দিন রক্ত দেখল, এর পর দিন থেকে আবার পবিত্র থাকল, এভাবে চলতে চলতে তার অভ্যাসের দশদিন পার হয়ে এগারতম দিনে আবার রক্ত দেখল, তাহলে, তার অভ্যাস মতোবক দশদিনকে হায়েজ বলে গণ্য করা হবে। আর এই রক্তবিহীন দশদিনের আগেও পরের রক্ত ইস্তিহাযা (استحاضة) বলে সাব্যস্ত হবে। মুফতী এবং মুস্তাফতী অর্থ্যাৎ ফতোয়া দাতা এবং ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী উভয়ের জন্য সহজার্ণে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি রক্তস্রাব মুদুতে হায়েজ বা ঋতুস্রাবের নির্ধারিত আদতকালের উভয় প্রান্তকে পরিবেষ্টন করে নেয় এবং উভয় রক্ত মিলে আকাল্লে হায়েয (হায়েজের সর্ব নিম্ন সময় সীমা) পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে এই ধরনের তুহুরও ফাসিল (نافل) হবে না। উদাহরণত কোনো এক স্ত্রীলোক দুই দিন রক্ত দেখার পর তা বন্ধ হয়ে একটানা সাতদিন আর রক্ত দেখেনি, এর পর পুনরায় একদিন রক্ত দেখল, তাহলে উক্ত দশ দিন পুরোটাই হায়েজ বলে গণ্য হবে।

(৪) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাহাব হলো উপরোক্ত মতামতের মধ্যে যে সমস্ত শর্ত ছিল। তার পাশাপাশি এটাই জরুরি যে, এই তুহুর উভয় পার্শ্বের রক্তের সমান হবে বা তার চেয়ে কম হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নীতিতে হুকমী (دم) ও প্রকৃত রক্ত বলে গণ্য। যেমন এক মহিলা প্রথমে দু'দিন রক্ত দেখল, এরপর তিন দিন পবিত্র থাকল, পুনরায় একদিন রক্ত দেখার পর আবার তিন দিন পবিত্র থেকে শেষে আরো একদিন রক্ত দেখল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এই দশদিনে দু'টি তুহুর সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রথম তুহুরটি তার উভয় পার্শ্বের রক্তের সমপরিমাণ হওয়ায় হুকমী (বিধিগতভাবে) রক্ত হয়ে গেছে। আর এখন হাকীকি এবং হুকমী উভয় রক্ত মিলে সাতদিন হয়ে গেছে। যা দ্বিতীয় তুহুরের চেয়েও বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় তুহুরও রক্ত বলে গণ্য হবে। এভাবে এই দশদিন পুরোটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী হায়েজ বলে বিবেচিত হবে।

(৫) আবু সুহাইল (র.)-এর মতও এটাই। তবে তার মতে হুকমী (دم) এর কোনো ধর্তব্য নেই। তাই তিনি বলেন, তুহুরটি দুই হাকীকি রক্তের সমান বা কম হতে হবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণের মাঝে প্রথম ছয়দিন হায়েজ বলে গণ্য হবে। বাকি চারদিন হবে না।

(৬) হাসান ইবনে হিয়াদ বলেন, তুহুর যদি তিন দিন অথবা ততোধিক হয়, তাহলেই তা ফাসিল (نافل) হবে অন্যথা নয়।

رَأَى الطَّهْرَ خَمْسَةَ الْيَوْمِ: তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নখঈ (র.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তুহুর এর সর্ব নিম্ন মেয়াদ পনের দিন। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ কথা সাহাবীর নিকট শুনে থাকবেন আর সাহাবী শুনে থাকবেন স্বয়ং রাবুদুদ্দাহ (রা.)-এর কাছ থেকে। কারণ এটা হচ্ছে পরিমাণ গত ব্যাপার। আর শরঈ ক্ষেত্রে পরিমাণ গত ব্যাপার শুনে শুনেই জানা যায়। এখানে কিয়াসের কোনোই দখল নেই।

শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী (র.) **طهر**-এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন হওয়ার ওপর দলিল দিয়েছেন এই ভাবে যে, আদ্বাহ তা'আলা নাবালিগা এবং বৃদ্ধাদের জন্য একমাস সময়কে তুহর এবং হায়েজ উভয়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর মূলনীতি হলে কোনো জিনিসকে যখন দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন তাকে উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, এই মূলনীতি অনুযায়ী মাসের অর্ধেক সময় তুহর আর অর্ধেক সময় হায়েজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হায়েজ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু দলিল বিদ্যমান আছে, সেহেতু হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ অর্ধেক মাসের চেয়ে কম হলেও তুহর এর সর্বনিম্ন মেয়াদ নীতি মোতাবেক অর্ধেক মাসই রয়ে গেছে। মা'বসুত নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তুহর হচ্ছে ইকাহতের অনুরূপ। সুতরাং ইকামতের সর্বনিম্ন মেয়াদ যেমন পনের দিন, তেমনি তুহর-এর সর্বনিম্ন মেয়াদও পনের দিন। অনুরূপভাবে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদের ওপর কেয়াস করে হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদও তিনদিন নিরূপণ করা হয়েছে।

**طهر**-এর সর্বোচ্চ মেয়াদের কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। অতএব, যতদিন যাবৎ তুহর দেখবে ততদিন নামাজ-রোজা চালিয়ে যেতে থাকবে। এমনি যদি এমন মহিলার সারা জীবন শুধু তুহরই চলতে থাকে, তবু সে নামাজ রোজা চালিয়ে যাবে। কারণ কখনও কখনও তুহরের মেয়াদ এক বৎসর দুই বৎসরও দীর্ঘ হয়ে যায়। বরং তার চেয়েও অধিক হয়ে থাকে। এজন্য **طهر**-এর কোনো নির্ধারিত সময় ধার্য করা যায়নি। হ্যাঁ! যদি কোনো স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ওলামাগণের মতে তার জন্য কোনো না কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। যদি মহিলার রক্ত স্রাবের সূচনাই হয় অব্যাহত ভাবে। অর্থাৎ জীবনের প্রথম রক্ত স্রব হওয়ার পর আর বন্ধ না হয়, তাহলে সে বালিগাই হয়েছে ইন্তিহাজার সাথে। এ ধরনের স্ত্রীলোকের জন্য প্রত্যেক মাসের দশদিনকে হায়েজ বলে নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তুহর।

আর যদি প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার তিন দিন রক্ত আসার পর বন্ধ হয়ে একাধারে এক বৎসর দুই বৎসর যাবৎ আর রক্ত না আসে এবং এরপর আবার রক্ত স্রব হয়ে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে প্রথম তিন দিনকে হায়েজ বলা হবে, আর রক্তবিহীন এক বৎসর বা দুই বৎসরকে বলা হবে তুহর। সুতরাং এমন মহিলাকে যদি তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়। তাহলে তার ইন্দত হবে তিন বা ছয় বৎসর এবং নয় দিন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা বলেন, উক্ত মহিলার তুহর হবে উনিশদিন। কারণ প্রত্যেক মাসে হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন, আর বাকিটা হয় তুহর। যদি মাসের দিনকে হায়েজের জন্য ধরা হয়, তাহলে তুহরের জন্য সন্দেহাতীতভাবে উনিশ নির্দিষ্ট থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। আর মুহাম্মদ ইবনে সালামা বলেন, এই মহিলার তুহর সাতাশদিন। কারণ হায়েজের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন। অতএব, অবশিষ্ট সাতাশ দিন তুহরের জন্যই অবধারিত থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল মাদানী বলেন, এমন মহিলার তুহর হবে এক ঘন্টা কম ছয় মাস। কারণ হায়েজ না আসার সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস। অর্থাৎ হামল বা গর্ভধারণের সর্ব নিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয় মাস। আর মূলনীতি হচ্ছে তুহরের মেয়াদ হামলের মেয়াদের চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ কারণে আমরা এক ঘন্টা কম ধরেছি। এই মতনুযায়ী উক্ত মহিলার ইন্দত তিন ঘন্টা কম উনিশমাস হবে। এর রূপ হবে এই যে, এমন মহিলাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে। তাই তার ইন্দত হবে তিন তুহর এবং তিন হায়েজ। আর তার এক তুহর হচ্ছে এক ঘন্টা কম ছয় মাস এবং এক হায়েজ হচ্ছে দশদিন। সুতরাং সব মিলিয়ে তিন ঘন্টা কম উনিশ মাস হবে।

হাকিম শহীদ বলেছেন, এই মহিলার তুহর দুইমাস। ইনায়া, কিফায়া এবং ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি কিতাবের লিখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাকীমের মতের উপরই ফতোয়া।



وَدَّمَ الْأَسْتِحَاظَةَ كَالرُّعَايَةِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الرُّطَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ تَوَضَّأَنِي وَصَلَّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ وَلَمَّا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ ثَبَتَ  
 حُكْمُ الصَّوْمِ وَالرُّطَى بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَاعِ وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ  
 مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا رَدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا وَالَّذِي زَادَ اسْتِحَاظَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 الْمُسْتَحَاظَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَلَآنَ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى  
 الْعَشْرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاظَةٌ فَحَبِصُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ  
 شَهْرٍ وَ الْبَاقِي اسْتِحَاظَةٌ لَآنَا عَرَفْنَاهُ حَبِصًا فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالسَّكِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

**অনুবাদ :** ইতিহাজার রক্তশ্রাব নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্তের মতো। যা রোজা, নামাজ এবং সহবাস কোনো  
 টাকেই বাধা দেয়না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি অজু কর এবং নামাজ আদায় কর যদিও রক্তের ফোঁটা  
 চাটাইয়ে পড়তে থাকে। আর নামাজের বিধান যখন জানা হলো তখন ইজমাই ফয়সালার ফল শ্রুতিতে রোজা ও  
 সহবাসের বিধানও সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর যদি রক্তশ্রাব দশদিনের বেশি হয় এমন অবস্থায় যে, মহিলার জানা অভ্যাস  
 হচ্ছে দশদিনের চেয়ে কম, তাহলে তার হয়েজকে অভ্যস্ত দিনগুলোর দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর অভ্যাসের  
 অতিরিক্ততা হবে ইতিহাযা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুস্তাহাযা নারী তার হয়েজের নির্দিষ্ট দিন গুলোতে নামাজ  
 বর্জন করবে। তাছাড়া অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো দেশের অতিরিক্ত দিনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূতরাং এগুলোর  
 সাথেই তা যুক্ত হবে। যদি কোনো মেয়ে মুস্তাহাজা হওয়ার মধ্য দিয়েই বালেগা হয়, (বালেগা হওয়ার আলামত  
 হিসাবে যে, রক্ত শ্রাব শুরু হয়েছে, তা আর বন্ধ হয়নি) তাহলে প্রতি মাসের দশদিন তার হয়েজের মধ্যে গণ্য হবে।  
 আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে ইতিহাজা। কারণ তার প্রারম্ভিক রক্তশ্রাবকে আমরা হয়েজ হিসাবে জেনেছি। সূতরাং  
 সন্দেহের কারণে তা হয়েজ থেকে বহির্ভূত হবে না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাকসীর তথা নাক থেকে ক্ষরণ হওয়া রক্ত যেমন রগ থেকে আসে, তেমনি ইতিহাজার রক্তও রগ থেকে আসে। তাই  
 নাকসীর-এর মতো اسْتِحَاظَةُ -এর রক্ত ও নামাজ রোজা এবং সহবাসের জন্য বাধাদায়ক নয়। এর দলিল হচ্ছে ইবনে মাজাহ  
 শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي جَبْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَتَدْعُ  
 الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مُحِضَتِكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى  
 الْحَصِيرِ -

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন একদা ফাতিমা বিনতে আবু জ্বায়শ (নাম্নী এক মহিলা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে  
 এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন মুস্তাহাজা মহিলা যে কখনও পবিত্র হইনা, অতএব, আমি কি নামাজ বর্জন  
 করব? (এ কথা শুনে) হজুর ﷺ বললেন, না, বরং তুমি হয়েজের দিনগুলোতে নামাজ বর্জন কর, অতঃপর গোসল করে  
 প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু কর এমন নামাজ পড়তে থাক, যদি রক্তের ফোঁটা চাটাইয়েও পড়তে থাকে।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি দ্বারা যখন নামাজে হুকুম প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন ইজমাদ ফয়সালার ফলশ্রুতিতে রোজা আর সহবাসের হুকুমও প্রমাণিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এমনিডেই রক্ত্রাব নামাজের জন্য বাধা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইস্তিহাজার রক্ত্র যখন নামাজের জন্য বাধা নয়, তখন রোজা আর সহবাস যেগুলোর জন্য রক্ত্র কোনো বাধা নয়, সে গুলোর জন্য ইস্তিহাজা অবশ্যই বাধা হবে না।

আলোচ্য মাসআলায় হানাকী-ওলামগণের সর্বসম্মত মতভিত্তিক হুকুমটিই হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মুখতালাফ ফীহি বা মতবিরোধপূর্ণ হুকুমটি হিদায়া গ্রন্থকার তার কিতাবে উল্লেখ করেন নি। এখানে সর্বাগ্রে এই মুখতালাফ ফীহি হুকুমটিই আলোচনা করা হলো—

মাসআলা : রক্ত্রাব যদি পূর্ব অভ্যাসের নির্দিষ্ট দিনের চেয়ে বেশি অথচ দশ দিনের কম হয় যেমন অভ্যাস হলো পাঁচ দিন রক্ত্র দেখা যাওয়া, কিন্তু কোনো একবার আট দিন রক্ত্রাব অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে যে, পূর্ব অভ্যাস মতো পাঁচদিনকেই হয়েজ ধরা হবে? নাকি অতিরিক্ত তিনদিনসহ আট দিন কে?

বলবী মাশাইখগণ এ মত পোষণ করেন যে, উক্ত মহিলা পূর্ব অভ্যাসের দিন অর্থাৎ পাঁচদিন অতিবাহিত করার পর তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন সে গোসল করে নামাজ পড়া শুরু করে। কারণ পাঁচের অতিরিক্ত দিন গুলো হয়েজ হওয়া এবং ইস্তিহাজা হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং সংশয়ের দরুন নামাজ বর্জন করা বৈধ হবে না। বুখারা বাসী ওলামাগণের মতে অভ্যাসের অতিরিক্ত রক্ত্রাবের দিনগুলো যদি দশদিনের কম হয়, তাহলে অভ্যাসের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত মহিলাকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। কারণ এ মহিলা হয়েজ গ্রন্থ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত সময় তখনই ইস্তেহাজার অন্তর্ভুক্ত হবে, যখন তা দশদিন অতিক্রম করবে। সুতরাং যেহেতু দশদিনের পূর্বে তা ইস্তিহাজা হওয়ার কোনো দলিল নেই, তাই তাকে গোসল করে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে তাদের মতে এই রক্ত্র যদি দশদিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর নামাজ ও কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় যে মাসআলাটি সর্ব সম্মত এবং যা হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে হলো— যদি কোনো মহিলার পূর্ব অভ্যাস থাকে দশদিনের চেয়ে কম রক্ত্রাবের, কিন্তু একবার তা বেড়ে গিয়ে দশদিন অতিক্রম করেছে। এমতাবস্থায় হুকুম হলো— পূর্ব অভ্যাসের পরিমাণ দিনে যে রক্ত্র এসেছে, তাকে হয়েজ ধরা হবে; আর অতিরিক্ত দিন গুলোকে বলা হবে ইস্তি হাজা। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী— **الْمَنْعَاضَةُ دَعْوُ الصَّلَاةِ أَبَامَ أَقْرَانِهَا** অর্থাৎ মুস্তাহাযা মহিলা তার হয়েজের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (অভ্যাস অনুযায়ী) নামাজ বর্জন করবে। অত্র হাদীসে **أَبَامَ أَقْرَانِهَا** দ্বারা হয়েজের অভ্যাসগত নির্দিষ্ট দিনকে বুঝানো হয়েছে। এর দাবি হচ্ছে অভ্যাস্তদিন গুলো ছাড়া অতিরিক্ত দিনে নামাজ বর্জন করবে না।

এ ব্যাপারে আকলী দলিল বা যুক্তি হলো— অভ্যাসের দিনগুলোর চেয়ে বেশি যে রক্ত্রটা দেখা গেছে, এটা দশদিনের পরে আসা রক্ত্রের মতোই। হানাকীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, দশদিনের অতিরিক্ত রক্ত্রাবকে ইস্তিহাজা বলেই গণ্য করা হবে।

যদি মেয়ের বালেগা হওয়ার সূচনাই হয় ইস্তিহাজার মাধ্যমে অর্থাৎ জীবনের প্রথম রক্ত্রাবই দশদিনের মধ্যে বন্ধ না হয়ে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য প্রত্যেক মাসের দশদিন হয়েজ বলে গণ্য হবে। আর অবশিষ্টগুলো হবে ইস্তিহাজা। কারণ একাধার দশদিন পর্যন্ত রক্ত্র এসে যদি তা বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে পুরোটাই নিশ্চিতভাবে হয়েজই হতো। কিন্তু যখন তা দশদিনের মধ্যে না থেমে আরো অতিরিক্ত হয়ে গেছে, তখনই এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, তিন দিনের চেয়ে বেশি দিনের রক্ত্রটা হয়েজ নাকি ইস্তিহাজা? অতএব, ইয়াকীনি বা নিশ্চিত বিষয় এ ধরনের সন্দেহের কারণে দূর হয়ে যায় না। আল্লাই উত্তম জানেন।

**فَصَلِّ : وَالْمُسْتَحَاضَةَ وَمَنْ يَه سَلَسُ النُّبُولِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرَحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ**  
**يَتَوَضَّعُونَ لِقَوْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيَصَلُّونَ بِذَلِكَ فِي الْقَوْتِ مَا شَاءُوا مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ**  
**وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح)** تَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 الْمُسْتَحَاضَةُ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَإِنْ اِغْتَبَارَ طَهَارَتُهَا ضَرُورَةٌ اَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبْقَى  
 بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَوَضَّأُ لِقَوْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهُوَ  
 الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّ اللَّامَ تُسْتَعَارُ لِلْقَوْتِ يُقَالُ اُنِيكَ لَصَلَاةِ الظُّهْرِ اَيَّ وَقْتِهَا وَلِأَنَّ الْقَوْتِ  
 اَوْقِمْ مَقَامَ الْاَدَاءِ تَيْسِيرًا فَيَدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ .

### অনুচ্ছেদ : মুস্তাহাযা

অনুবাদ : মুস্তাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রক্ষরণ ও সার্বক্ষণিক নাক থেকে রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্থ ব্যক্তি, যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থাকে না, এরা সকলে প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা অজু করবে। তারপর সে ওয়াক্তের ভিতরে ঐ অজু দ্বারা যত ইচ্ছা ফরজ ও নফল পড়বে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য অজু করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- الْمُسْتَحَاضَةُ (মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে)। তাছাড়া তার তাহারাতির গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে ফরজ আদায়ের প্রয়োজনে। সুতরাং ফরজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর তা বহাল থাকবে না। আমাদের দলিল হলো- নবী করীম ﷺ বলেছেন, الْمُسْتَحَاضَةُ تَوَضَّأُ لِقَوْتِ كُلِّ صَلَاةٍ (মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে)। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা لَا (লাম) অব্যাক্তে ওয়াক্তের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় اُنِيكَ لَصَلَاةِ الظُّهْرِ (আমি জোহরের নামাজের সময় তোমার কাছে আসব)। তা ছাড়া সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায়ের স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং তার উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েয যেহেতু ইস্তিহাযা ও নিফাসের তুলনায় كَثِيرُ الرُّقْعِ (অধিক পাওয়া যায়) তাই হায়েযের আলোচনা সর্বপ্রায়ে করা হয়েছে। হায়েযের আহকামের পর ইস্তিহাযার ছকুম বয়ান করা হয়েছে। কেননা ত্রীলোক কখনো এ কারণে মুস্তাহাযা হয়ে যায় যে, সে হামল অবস্থায় রক্ত দেখেছে আবার কখনো এ কারণে যে রক্তক্ষরণ দশ দিনের অধিক হয়েছে বা নির্ধারিত আদতের চেয়ে অধিক দিন এসেছে। আবার কখনো এ কারণে ও মহিলা মুস্তাহাযা হয়ে যায় যে, তুহরের মুদত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই রক্ত এসে গেছে। কিংবা নয় বছর বয়সের পূর্বেই রক্ত এসে গেছে তখন এটাও মুস্তাহাযার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে নিফাসের মাত্র একটি সবব অর্থাৎ সন্তান প্রসব করা।

**মাসআলা :** মুস্তাহাযা নারী, অব্যাহত মুদ্রক্ষণ ব্যক্তি, অব্যাহত নাক থেকে সার্বক্ষণিক রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তি যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থাকে না, এ সকল মাজুরের ব্যাপারে আমাদের মাযহাব অনুসারে হুকুম এই যে, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য আলাদা অজু করবে। তারপর সে অজু দ্বারা যত ইচ্ছা নামাজ পড়বে, সে নামাজ ফরজ, নফল, ওয়াজিব বা মানত যে নামাজই হোক না কেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে অর্থাৎ মাজুর ব্যক্তি এক অজু দ্বারা এক নামাজ আদায় করবে। একাধিক নামাজ আদায় করতে পারবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর দলিল, **الْمُسْتَعَاذَةُ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ** (মুস্তাহাযা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে)। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর উপর প্রশ্ন হয় যে, হাদীসের মধ্যে **صَلَاةٌ** শব্দটি **عام** فرض বা **غير فرض** -এর কোনো নেই। সুতরাং শুধু **فرض** -এর সাথে মফিদ করা কিভাবে দুরন্ত হবে? জবাব হচ্ছে হলো - **لِكُلِّ صَلَاةٍ** -এর মধ্যে **صَلَاةٌ** শব্দটি **مطلق** আর কায়দা আছে **الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ** আর নামাজের **كامل** ফরস হলো **فرض** নামাজ **فرض** নয়। এ জন্য **صَلَاةٌ** দ্বারা **فرض** নামাজ মুরাদ নেওয়া হয়েছে, **مطلق** নামাজ মুরাদ নেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় দলিল হলো- মাজুরের তাহারাভের গ্রহণযোগ্যতা হলো ফরজ আদায়ের কারণে। এ জন্য ফরজ থেকে ফারাগাতের পর তাহারাভ বাকি থাকবে না।

**আমাদের দলিল :** রাসুলুল্লাহ **ﷺ** -এর বাণী **الْمُسْتَعَاذَةُ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ** (মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে)। অন্য হাদীস, যা হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ** ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশকে বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করতে বলেছেন। উক্ত দুই হাদীসের মতলব হলো হলো- মুস্তাহাযা নারী প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য অজু করবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব এই যে, **لِكُلِّ صَلَاةٍ** -এর মধ্যে **صَلَاةٌ** অব্যাক্ত ওয়াক্তের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী - **اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ** -এর মধ্যে **صَلَاةٌ** ওয়াক্তের জন্য এসেছে। এমনিভাবে রাসুলুল্লাহ **ﷺ** -এর বাণী **وَأَجْرًا وَلَا لِلصَّلَاةِ إِلَّا** -এর মধ্যে **صَلَاةٌ** ওয়াক্তের জন্য এসেছে। অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্তের শুরুও আছে শেষও আছে। যেমন বলা হয়, **أَتَيْكَ لِبَلْوَةِ الظُّهْرِ** আমি তোমার কাছে জোহরের নামাজের সময় আসব। জবাবের হাসিল এই যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস **النَّصِ** **مِنْ قِبَلَةِ النَّصِ**। আর আমাদের বর্ণিত হাদীস **مِنْ قِبَلَةِ الْمَفْسَرِ** আর কায়দা আছে যে, **نص** আর **مفسر** -এর মধ্যে **تعارض** হলে **مفسر** প্রাধান্য পায়।

আমাদের পক্ষ থেকে আকলী দলিল হলো- সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায়-এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং ওয়াক্তের উপরই বিধান আবর্তিত হবে, আদায়ের উপর নয়। কেননা যখন একটি জিনিস অপর জিনিসের স্থলবর্তী হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء، لصلوة أخرى وهذا عند أصحابنا الثلثة وقال زفر (رح) واستأنفوا إذا دخل الوقت فإن توضؤوا حين تطلع الشمس اجزأهم حتى يذهب وقت الظهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد (رح) وقال أبو يوسف وزفر (رح) اجزأهم حتى يدخل وقت الظهر وحاصله أن طهارة المعذور تنتقص بخروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد (رح) ويدخل الوقت عند زفر (رح) وبأيتهما كان عند أبي يوسف (رح) وقائده الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس لزفر (رح) أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ولا أبي يوسف (رح) أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا يعتبر قبله وبعده ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت وخروج الوقت دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلوة العيود له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ولو توضأ مرة للظهر في وقتها وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق بطن وأنفلات رنج لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي تعم الكل.

অনুবাদ : যখন ওয়াস্ত শেখ হবে, তখন তাদের অজু বাতিল হয়ে যাবে এবং অন্য নামাজের জন্য নতুন অজু করবে। এ হলো আমাদের তিন ইমামের মায়হাব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন অজু করবে। সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় যদি তারা অজু করে তাহলে জোহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এ অজু তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, জোহরের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাদের জন্য অজু কার্যকর হবে। আলোচ্য মাসআলার সারমর্ম এই যে, ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পূর্ববর্তী হাদাস দ্বারা মাজুরের তাহারাতি হেঙ্গে যায় ওয়াস্ত শেষ হওয়ার কারণে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'টোর যে কোনো একটির কারণে। উপরোক্ত ইখতিলাফের ফায়দা যাহির হবে এমন মাজুরের ক্ষেত্রে যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে অজু করল, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অথবা (এমন মাজুরের ক্ষেত্রে যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে (অজু করেছে।) ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই

যে, যে জিনিস তাহারাতের বিপরীত এর সাথে তাহারাতের ইতিবার করা হয় ফরজ আদায়ের প্রয়োজনের নিমিত্তে। আর ওয়াক্তের পূর্বে কোনো حاجت বা প্রয়োজন নেই। (এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বে) তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো- তাহারাতের প্রয়োজন ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ওয়াক্তের পূর্বাপর তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো- তাহারাতকে ওয়াক্তের পূর্বে মুকাদ্দাম করা উচিত যাতে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করা সম্ভব হয়। আর ওয়াক্ত চলে যাওয়া প্রয়োজন (حاجت) মিটে যাওয়ার দলিল বহন করে। তাই ঐ সময় হাদাস معنبر হওয়া জাহির হলো। ওয়াক্ত দ্বারা وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ মুরাদ। এমনকি যদি মাজুর ব্যক্তি ঈদের নামাজের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তার ঐ অজু দ্বারা জোহর পড়ার ইখতিয়ার রয়েছে। এটিই বিত্বক্ক অভিমত। কেননা ঈদের নামাজ চাশতের নামাজের সাদৃশ্য। আর যদি মাজুর ব্যক্তি জোহরের ওয়াক্তে একবার জোহরের জন্য অজু করে, দ্বিতীয় বার জোহরের ওয়াক্তে আসরের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তার এ অজু দ্বারা আসরের নামাজ পড়ার ইখতিয়ার নেই। কেননা مَفْرُوضে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারা অজু ভেঙ্গে গেছে। মুস্তাহাযা নারী ঐ মহিলা যার উপর ফরজ নামাজের এমন কোনো সময় অতিক্রান্ত হয় না যে, সময়ে তার মধ্যে ঐ রোগ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সর্বদা তার মধ্যে হাদাছ বিদ্যমান থাকে। একই লুকুম ঐ মাজুরের ক্ষেত্রেও যা মুস্তাহাযার সমার্থক। আর তা হলো যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং সেও এর অন্তর্ভুক্ত পিটের পীড়ার কারণে যে কলেরায় আক্রান্ত এবং যার বে-ইখতিয়ারে বায়ু নিঃসরণ হয়। কেননা জরুরত এর মধ্যেও বিদ্যমান। আর উক্ত জরুরত এগুলোতেও পরিব্যাণ্ড।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ফরজ নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে মাজুরদের অজু বাতিল হয়ে যাবে। এখন যদি দ্বিতীয় কোনো ফরজ আদায় করতে চায় তখন তার জন্য নতুনভাবে অজু করা জরুরি। এটি আমাদের তিন ইমামের মতে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন অন্য নামাজের ওয়াক্ত হবে তখন নতুনভাবে অজু করবে। যেন ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অন্য ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী বলে গণ্য। প্রথম ওয়াক্ত চলে যাওয়া (অজু ভঙ্গকারী) নয়। সুতরাং যদি কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় অজু করে তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তার এ অজু যথেষ্ট হবে। এমনকি জোহরের সময় চলে যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ এ অজু দ্বারা জোহরের ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। কেননা এ সুরতে জোহরের ওয়াক্তের প্রবেশ তো পাওয়া গেছে কিন্তু কোনো ওয়াক্ত চলে চাওয়া পাওয়া যায়নি। অথচ তরফাইন (র.)-এর মতে ওয়াক্ত চলে যাওয়া অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত প্রবেশ করা (অজু ভঙ্গকারী) নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, এই অজু জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ জোহরের ওয়াক্ত আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ অজু বাকি থাকবে। জোহরের ওয়াক্ত আসার পর যদি নামাজ পড়তে চায় তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে।

উক্ত মাসআলার সারমর্ম এই যে, তরফাইন (র.)-এর মতে মাজুর ব্যক্তির অজু ভঙ্গকারী হলো ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া, ওয়াক্ত প্রবেশ করা নয়। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াক্ত প্রবেশ করা অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয়টি অজু ভঙ্গকারী, ওয়াক্ত প্রবেশ হোক বা ওয়াক্ত শেষ হোক। উভয় সুরতে মাজুরের তাহারাত চলে যাবে। উল্লেখ্য যে, প্রকৃতপক্ষে وَقْتُ دُخُولِ বা وَقْتُ خُرُوجِ কোনোটিই অজু ভঙ্গকারী নয়; বরং হাদাছ হলো প্রকৃত অজু ভঙ্গকারী। কিন্তু যেহেতু ওয়াক্ত বাহাদানকারী ছিল, এ জন্য যখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল তখন হাদাছের আসর যাহির হয়ে পড়ল এ জন্য রূপক অর্থে অজু ভঙ্গকে وَقْتُ دُخُولِ এবং وَقْتُ خُرُوجِ-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল দুই সুরতে বুঝা যাবে।

এক. কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে অজু করল, অতঃপর জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করল, অন্য কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হল না। এখন অবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু কোনো ফরজ ওয়াক্তের বের হওয়া পাওয়া যায়নি, তাই অজু ভঙ্গ হবে না।

দুই. কোনো মাজুর ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে অজু করল। সুতরাং সূর্যোদয়ের পর যেহেতু **خروج** পাওয়া গেছে তাই তরফাইন (র.) -এর মতে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতেও অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতানুযায়ী যেহেতু কোনো ফরজ নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করেনি তাই অজু ভঙ্গ হবে না।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হলো- তাহারাতেই বিপরীত জিনিসের সাথে তাহারাতে গ্রহণযোগ্য হওয়া ঠুপু ফরজ আদায়ের প্রয়োজনে হয়ে থাকে। আর ওয়াক্তের পূর্বে আদায়ে ফরজ আদায়ের যেহেতু কোনো জরুরত নেই এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বে তাহারাতে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং যখন ফরজ নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে তখন তাহারাতেই জরুরত দেখা দিবে। বুঝা গেল ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে তাহারাতে ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো- তাহারাতেই প্রয়োজন ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ। কেননা ফরজ নামাজের ওয়াক্ত আদায়ের স্থলবর্তী। এ জন্য ওয়াক্তের পূর্বাপর তাহারাতে গ্রহণযোগ্য হবে না। বুঝা গেল মাজুরের তাহারাতেই জন্য **خروج** ও **دخول** উভয়টি অজু ভঙ্গকারী। তরফাইন (র.) -এর দলিল এই যে, তাহারাতেই ওয়াক্তের পূর্বে মুকাদ্দাম করা জুকরি, যাতে ওয়াক্ত প্রবেশ হওয়ার সাথে সাথেই নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়। মোদাক্কা, ওয়াক্ত হলো আদায় (الاداء) স্থলবর্তী এবং তাহারাতেই নামাজ আদায়ের পূর্বে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। সুতরাং কিয়াসের চাহিদা তো এই ছিল আদায় -এর খলীফা অর্থাৎ ওয়াক্তের উপরও তাহারাতেই মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হওয়া। কিন্তু খলীফার মর্তবা আসলের মর্তবার চেয়ে কম করার জন্য খলীফার উপর তাহারাতেই মুকাদ্দাম করাকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং যখন ওয়াক্তের উপর তাহারাতেই মুকাদ্দাম করা জায়েজ হলো তখন **دخول** অজু ভঙ্গকারী হবে না। এ জন্য যে, যদি **دخول** -কে ভঙ্গকারী মেনে নেওয়া হয় তখন তাহারাতেই ওয়াক্ত -এর পূর্বে মুকাদ্দাম করা সম্ভব হয় না। আর **خروج** যেহেতু প্রয়োজন মিটে যাওয়ার দলিল, তাই ঐ সময়ের মধ্যে পূর্বের হাদিসের গ্রহণযোগ্য হওয়া বুঝা গেল। সুতরাং **خروج** -এর সাথে সাথেই অজু ভঙ্গে যাবে।

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ওয়াক্তের প্রবেশ এবং শেষ হওয়ার ইতিবার করা হয়, সে ওয়াক্ত দ্বারা ফরজ নামাজের ওয়াক্ত মুরাদ, নাওয়াফিল বা ওয়াজিবাতের ওয়াক্ত মুরাদ নয়। এমনকি যদি মাজুর ব্যক্তি ঈদের নামাজের জন্য অজু করে তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার এ অজু দ্বারা জোহর নামাজ পড়ার অনুমতি রয়েছে। আর এটাই বিতর্কিত অভিমত। কেননা ঈদের নামাজ-চাশতের নামাজ সাদৃশ্য। অর্থাৎ ফরজ না হওয়ার দিক থেকে ঈদ ও চাশতের নামাজ একই পর্যায়ের; যদিও ঈদের নামাজ ওয়াজিব। সুতরাং **مفروض** ওয়াক্ত শেষ না হওয়ার কারণে তার অজু ভঙ্গ হবে না। এজন্য তাকে এ অজু দ্বারা জোহরের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ফকীহর মতে এ অজু দ্বারা তার জোহরের নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। কেননা **صلاة واجبه** -এর ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে। কেননা ঈদের নামাজ ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হলো ফরজের পর্যায়ে। যদি মাজুর ব্যক্তি একবার জোহরের সময় জোহরের জন্য অজু করে অতঃপর দ্বিতীয়বার জোহরের সময় আসরের নামাজের জন্য অজু করে, তবে তরফাইন (র.) -এর মতে তার এ ইখতিয়ার নেই যে, উক্ত অজু দ্বারা আসরের নামাজ আদায় করা। কেননা ফরজ নামাজ অর্থাৎ জোহরের সময় শেষ হয়ে যাবার কারণে অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। এ হকুম সকল ইমামের মতে। কেননা এ **خروج** -এর সাথে **دخول** ও **عصر** জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়।

**الْمُسَاعَضَةُ هِيَ الَّتِي لَهَا** দ্বারা মুসতাহাযা নারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুসতাহাযা নারী ঐ মহিলা, যার উপর ফরজ নামাজের এমন কোনো সময় অতিক্রান্ত হয় না, যে সময়ে তার মধ্যে ঐ রোগ পাওয়া যায় না। একই হকুম এ সকল মাজুরের ক্ষেত্রেও যা মুসতাহাযার অনুরূপ যেমন এমন ব্যক্তি যার অব্যাহত গতিতে পেশাব নিষিদ্ধিত হয় এবং যার নামাজের রক্ত এবং যার ক্ষত স্থান থেকে নিঃসরণ ঘেমে না এবং সেও মাজুর যার পেটের অনুষং এবং যে-ইখতিয়ার বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে। কেননা এ সকল গুণেরও জরুরত বিদ্যমান এবং জরুরত এ সব অবস্থার সবগুলোতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তারা সকলেই মাজুরের অন্তর্ভুক্ত।

فَصَلِّ فِي النَّفَاسِ : وَالنَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ مَأْخُذٌ مِنْ  
 تَنْفُسِ الرَّحِمِ بِالدَّمِ أَوْ مِنْ خُرُوجِ النَّفْسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ أَوْ بِمَعْنَى الدَّمِ وَالَّذِي تَرَاهُ  
 الْحَامِلُ ابْتِدَاءً أَوْ حَالَ وَلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا وَقَالَ  
 الشَّافِعِيُّ (رح) حَيْضٌ اِغْتِبَارًا بِالنَّفَاسِ إِذَا هُمَا جَمِيعًا مِنَ الرَّحِمِ وَلَنَا أَنَّ بِالْحَبْلِ  
 يَنْسَدُ فَمُ الرَّحِمِ كَذَا الْعَادَةِ وَالنَّفَاسُ بَعْدَ انْفِتَاحِهِ بِخُرُوجِ الْوَلَدِ وَلِهَذَا كَانَ نَفَاسًا  
 بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ فِيمَا يُرَوَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) لِأَنَّهُ يَنْفِجُ  
 فَيَتَنَفَّسُ بِهِ وَالسَّقَطُ الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ حَتَّى تَصْنُرَ بِهِ نَفْسًا وَتَصِيرَ  
 الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ وَكَذَا الْعِدَّةُ تَنْقُضُ بِهِ وَأَقْلُ النَّفَاسِ لِأَحَدٍ لَهُ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْوَلَدِ عَلَّمَ  
 الْخُرُوجِ مِنَ الرَّحِمِ فَاعْنَى عَنْ امْتِدَادٍ جُعِلَ عَلَّمًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ  
 أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ اسْتِحَاضَةٌ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 وَقَّتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي اِغْتِبَارِ السِّتِينَ  
 وَلَوْ جَاوَزَ الدَّمُ الْأَرْبَعِينَ وَكَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النَّفَاسِ رَدَّتْ إِلَى أَيَّامِ  
 عَادَتِهَا لِمَا بَيَّنَّا فِي الْحَيْضِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ فَاِبْتِدَاءٌ نَفَاسِهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا لِأَنَّهُ  
 أَمَكَّنَ جَعْلُهُ نَفَاسًا .

### অনুচ্ছেদ : নিফাস

অনুবাদ : নিফাস ঐ রক্তকে বলা হয় যা বাচ্চা প্রসবের পর বের হয়। কেননা نفাস শব্দটি تَنْفَسُ الرَّحِمِ بِالدَّمِ থেকে নির্গত। অথবা خروج النفس نفাস থেকে নির্গত। (লজ্জাস্থান রক্ত বের করেছে) থেকে নির্গত। আর যে রক্ত হামেলা স্ত্রীলোক দেখে তা শুরুতে হোক বা প্রসব অবস্থায় বাচ্চা বের হওয়ার পূর্বে হোক, তা ইস্তিহায। যদিও এ রক্ত হায়েযের মুদতে পৌছে যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তা হায়েয, নিফাসের উপর কিয়াস করে। কেননা উভয়টি রেহেম থেকে বের হয়েছে। আমাদের দলিল এই যে, হামলের কারণে রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। আর এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চা বের হওয়ার সাথে রেহেমের মুখ খোলার পর (যে) রক্ত (আসে) তা হলো নিফাস। এ কারণে বাচ্চা অংশ বিশেষ বের হওয়ার পর (যে) রক্ত (আসে) তা নিফাস। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.), ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রিওয়ায়াত (যা তাঁদের থেকে বর্ণিত)। কেননা রেহেমের মুখ খুলে যায় এজন্যই তা নিফাস হবে। অসম্পূর্ণ বাচ্চা যার কিয়দংশ বের হয় তাও সন্তান এমনকি তার কারণে স্ত্রীলোক نفাস হয়ে যাবে এবং দাসী তার কারণে উমে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এমনভাবে ত



কারণে হামেলা স্ত্রীলোকের ইদ্দত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নিফাসের সর্বনিম্ন মুদতের কোনো সীমা নেই। কেননা বাচ্চা বের হওয়া- আলামত হলো (রক্ত) রেহেম থেকে বের হওয়ার। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এমন দীর্ঘ কোনো সময়ের প্রয়োজন নেই, যাকে এ বিষয়ের উপর আলামত সাব্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে হায়েযের বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতার নিফাসের সর্বোচ্চ মুদত চল্লিশ দিন। এর চেয়ে যা বেশি হয় তা ইস্তিহায়া। কেননা উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীস: রাসুলুল্লাহ ﷺ নিফাসওয়াবী নারীর জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারণ করেছেন। আর এ হাদীস ইমাম শাফিঈ (র.) -এর বিপরীত দলিল, ষাট দিনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে। যদি রক্ত চল্লিশ অতিক্রম করে, অথচ এ মহিলা পূর্বেও বাচ্চা প্রসব করেছে এবং নিফাসের ক্ষেত্রে তার আদতও রয়েছে, তখন সে তার আদতের দিনগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, এ দলিলের ভিত্তিতে যা আমরা হায়েযের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আর যদি এ মহিলার নির্দিষ্ট কোনো আদত না থাকে তবে তার নিফাসের শুরু চল্লিশ দিন হবে। কেননা চল্লিশ পর্যন্ত নিফাসের মুদত নির্ধারণ করা সম্ভব।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نفس শব্দের نون কে فتحة অথবা كسرة-এর সাথে জায়েজ যায়। স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্কিত রক্ত তিন ধরনের- (১) হায়েয (২) ইস্তিহায়া (৩) নিফাস। প্রসূকার হায়েয ও নিফাসের আলোচনা থেকে ফারিগ হওয়ার পর এ পরিচ্ছেদে তৃতীয় প্রকারের রক্ত তথা নিফাসের আলোচনা করছেন। نفس المرأة-এর مصدر আবার نفس কখনো نفس, نفس শব্দের বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফকীহদের পরিভাষায় নিফাস ঐ রক্তকে বলা হয় যা প্রসবের পর বের হয়। আদ্বামা ইবনুল হুলাম (র.) লিখেছেন, কুদূরীর ইবারত ঘারা বুঝা যায় স্ত্রীলোকের যদি বাচ্চা প্রসবের পর রক্ত না দেখে তবে তা নিফাস হবে না এবং তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। এটাই সাহেবাইন থেকে বর্ণিত। তবে ইমাম আযম (র.) বলেন, তার উপর সতর্কতা বশতঃ গোসল ওয়াজিব হবে। কেননা হতে পারে অল্প রক্ত বের হয়েছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে পড়েনি। উল্লেখ্য যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রক্ত বের হওয়ার সাথে, রক্ত দেখার সাথে নয়। আদ্বামা আইনী লিখেছেন, এটাই ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে বিতর্ক।

وَالَّذِي لَئِنْ تَرَأْتِ الْغَائِلَ الْخ: হামেলা স্ত্রী লোক যদি হামল অবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবের পূর্বে রক্ত দেখে, তবে এ রক্ত আমাদের মতে ইস্তিহায়া হিসাবে পরিগণিত হবে। যদিও এ রক্ত হায়েযের মুদত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ রক্ত হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো- কিয়াস ভিত্তিক। অর্থাৎ কোনো স্ত্রীলোক যদি এক উদরে দুই বাচ্চা বহন করে অতঃপর সে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পূর্বে রক্ত দেখে তবে ঐ স্ত্রীলোক দ্বিতীয় বাচ্চার ক্ষেত্রে এমনিভাবে হিসাবে গণ্য হবে। শায়খাইন (র.)-এর মতে এ রক্ত ইস্তিহায়া। সুতরাং যেমনভাবে এ রক্ত হামল অবস্থায় ইস্তিহায়া ছিল এমনিভাবে এখানে হামল অবস্থায় যে রক্ত বের হয়েছে তাও ইস্তিহায়া হবে। তাঁদের দলিল এই যে, হায়েয হলো রেহেমের রক্ত। আর রেহেমের রক্ত হামেলা স্ত্রীলোক থেকে সম্ভব নয়। কেননা عادت الله হলো হামলের কারণে রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যায় যাতে রেহেমের কোনো জিনিস বাইরে বের না হয়। সুতরাং যখন হামেলা অবস্থায় রেহেমের মুখ বন্ধ থাকে তখন হামল অবস্থায় যে রক্ত বের হবে তা রেহেম ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে হবে। আর রেহেম ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে যে রক্ত বের হয় তা হলো ইস্তিহাযার রক্ত। এ জন্য এ রক্ত ইস্তিহাযার রক্ত হবে। এ রক্তকে নিফাসের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা বাচ্চা প্রসব হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে গেছে। আর রেহেমের মুখ খোলার পর যে রক্ত বের হয় তা অবশ্যই নিফাস হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর এবং দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যে রক্ত দেখা যায় তা নিফাসের রক্ত হবে। এ কারণে যদি বাচ্চার অধিকাংশ বের হওয়ার কারণে রক্ত বের হয় তবে তরফাইন (র.)-এর বর্ণনা মতে এটা নিফাসের রক্ত হবে। কেননা বাচ্চা অধিকাংশ বের হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে।

وَالَّذِي لَئِنْ اسْتَبَانَ بَعْضُ الْخ: যদি অসম্পূর্ণ বাচ্চার কিছু অংশ বের হয়ে যায়, যেমন- আঙ্গুল, নখ, কিংবা চুল ইত্যাদি, তবে এ বাচ্চা পূর্ণ বাচ্চার হুকুমে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক তার কারণে নিফাস ওয়াবী বালগ গণ্য হবে। যদি কোনো দাসীর এমনটি হয় তবে সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি তালাকগ্রাণ্ড নারী হয় তবে এর কারণে তার ইদ্দত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হামেলা স্ত্রীলোকের ইদ্দত হলো وضع حمل তথা বাচ্চা প্রসব করা। আর যদি শুধু গেশ্বতের খণ্ড বিশেষ হয়

এবং তার কোনো আকৃতি যা বাহির না হয় তবে এ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে নিফাসের হুকুম দেওয়া হবে না। অতঃপর সে যদি রক্ত দেখে এবং এ রক্তকে হয়েয বলাও সম্ভব অর্থাৎ তার মুদত হয়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ পর্যন্ত পৌছে তবে তাকে হয়েয হিসাবে ধরা হবে। আর যদি হয়েয বলা সম্ভব না হয় তবে ইস্তিহাযা হবে।

أَقْلَ الْيَسَائِرِ لَأَحَدَ لَه الْخ  
নেই। সুতরাং যদি কোনো স্ত্রীলোক বাচ্চা প্রসব করে অতঃপর অল্পক্ষণ রক্ত এসে বন্ধ হয়ে যায়, তবে এ স্ত্রীলোক পাক হয়ে যাবে। সুতরাং এখন নামাজও পড়তে পারবে এবং রোজাও রাখতে পারবে। তবে আমাদের ওলামাদের মাঝে এ সূরতে মতবিরোধ রয়েছে যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে إِذَا وَلَدْتَ فَانْتِ طَالِقٌ (তুমি বাচ্চা প্রসব করলে তালাক)। অতঃপর স্ত্রী বলল, আমার ইদত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর তিন হয়েযের সাথে নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে নিফাসের সর্বনিম্ন মুদত পচিশ দিন ধর্তব্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে এগার দিন ধর্তব্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এক ঘণ্টা ধর্তব্য হবে। মোমদকথা এই যে, নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে নিফাসের সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নেই। তবে ইদত সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণের ইতিবার করা হবে, যার বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

নিফাসের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত না থাকার উপর দলিল এই যে, বাচ্চা প্রসব করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এ রক্ত রেহেম থেকে এসেছে। আর বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর যে রক্ত রেহেম থেকে আসে তাকে নিফাস বলা হয়। সুতরাং এখন আর কোনো প্রলম্ব আলামতের প্রয়োজন নেই। এর বিপরীত হলো হয়েয। তার মধ্যে একেবারে কম সময় তিন দিন হওয়া শর্ত। যাতে এ রক্ত রেহেম থেকে বের হওয়াটা বুঝে আসে। কেননা এর হয়েয হওয়ার উপর এছাড়া আর কোনো আলামত নেই।

নিফাসের সর্বোচ্চ মুদতের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। আমাদের মতে চল্লিশ দিন, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ষাট দিন, ইমাম শাফি'ঈ (র.) ইমাম আওয়ায়ী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ করেন। [ইমাম আওয়া'ঈ (র.)] বলেন, আমাদের জমানায় মহিলারা দু'মাস নিফাসের রক্ত দেখতো। রবী'আতুর রায় থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, মহিলাদের বেশির ভাগে বেশি ষাট দিন নিফাসের রক্ত আসতো। আমাদের দলিল উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর হাদীস- وَقَتَّ لِلنِّسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত আছে যে, قَالَتْ كَانَتْ النِّسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا বলে, নিফাসওয়ালী মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতো। আমাদের মাহহাবের সমর্থন উম্মে সালামা ব্যতীত ইবনে ওমর, আয়েশা, উম্মে হাবীবা এবং আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম এ সকল রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেই করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপরীত দলিল হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাহহাব না হাদীস দ্বারা সাবিত না সাহাবীর কাউল দ্বারা সাবিত বরং কতিপয় তাবিঈনে কিরামের কাউল দ্বারা সাবিত।

যুক্তির কথা হলো এই যে, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হয়েযের সর্বোচ্চ সময় সীমার চারগুণ বেশি হয়। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের মতে হয়েযের অধিক মুদত দশ দিন তাঁর নিফাসের অধিক মুদত তাঁর গুণ অর্থাৎ চল্লিশ দিন হবে। আর যেহেতু ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে হয়েযের অধিক মুদত পনের দিন তাই নিফাসের অধিক সময় তার চার গুণ তথা ষাট দিন হবে।

وَلَوْ جَارَ الدَّمُ لِأَرْبَعِينَ : যদি কোনো মহিলার প্রসবের পর চল্লিশ দিনের ভাগে অধিক রক্ত আসে, তাহলে দেখতে হবে এ মহিলার নিফাসের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট আদত রয়েছে কিনা? যদি নির্দিষ্ট আদত থাকে তবে আদত অনুযায়ী নিফাসের মুদত নির্ধারিত হবে, বাকি ইস্তিহাযা হবে। আর যদি তার কোনো নির্ধারিত আদত না থাকে তবে এ সূরতে চল্লিশ দিন নিফাসের মুদত হবে, বাকি দিনগুলো ইস্তিহাযা হবে। কেননা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিফাসের মুদত নির্ধারিত করা সম্ভবও বটে। এর ভাগে কম সন্দেহযুক্ত। এ জন্য নিফাসের মুদত চল্লিশ দিন হবে।

فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أُمِّي حَنِيفَةً وَأُمِّي  
يُوسُفَ (رح) وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) مِنَ الْوَلَدِ الْآخِرِ  
وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ (رح) لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَلَا تَصِيرُ نَفْسًا كَمَا أَنَّهَا  
لَا تَحْيِضُ وَلِهَذَا تَنْقُضِي الْعِدَّةَ بِالْآخِرِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَامِلَ إِنَّمَا لَا تَحْيِضُ  
لِإِسْدَادِ فِيهِ الرَّحِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ انْفَتَحَ بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ وَتَنَفَّسَ بِالدَّمِ فَكَانَ نَفْسًا  
وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقَتْ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعُ -

অনুবাদ : যদি মহিলার এক পেট থেকে দু-বাচ্চা প্রসব হয়, তবে তার নিফাস শায়খাইন (র.) -এর মতে প্রথম বাচ্চা থেকে শুরু হবে, যদিও উভয় বাচ্চার মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় বাচ্চা থেকে নিফাসের শুরু হবে। আর এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর মত। কেননা প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর সে হামেলা। এ জন্য নিফাসওয়ালী হবে না, যেমন হায়েযা নয়। এ কারণেই মহিলার ইদত সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসবের পর পূর্ণ হবে। শায়খাইন (র.) -এর দলিল এই যে, হামেলা মহিলার রেহেমের মুখ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে হায়েয আসে না, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আর এখানে প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার কারণে রেহেমের মুখ খুলে গেছে এবং তা রক্ত বের করে দিয়েছে। এ জন্য তা অবশ্যই নিফাস হবে। আর ইদতের সম্পর্ক এমন বাচ্চা প্রসবের সাথে যা মহিলার দিকে مضاف হয়। সুতরাং তা সবকে শামিল করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মহিলা এক পেট থেকে দু'বাচ্চা প্রসব করে তবে শায়খাইন (র.)-এর মতে নিফাসের শুরু প্রথম বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর থেকে হবে, যদিও উভয় বাচ্চার মাঝখানে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় বাচ্চা থেকে নিফাসের শুরু হবে। এটাই ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত। “এক পেট থেকে”-এর দ্বারা মুরাদ হলো উভয় বাচ্চার প্রসবের মাঝখানে ছয় মাসের কম ব্যবধান হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো- প্রথম বাচ্চা প্রসবের পরও এ মহিলা হামেলা থাকে। আর হামেলা মহিলার যেমনিভাবে হায়েয আসে না এমনিভাবে দু' নিফাসও হয় না। এ কারণেই মহিলা যদি তালাকপ্রাপ্ত হয় তবে তার ইদত সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় বাচ্চার প্রসব দ্বারা সম্পূর্ণ হবে। সুতরাং এটা থেকেই নিফাসও শুরু হবে। শায়খাইন (র.) -এর দলিল হলো- হামেলা মহিলার এ কারণে রক্ত আসে না যে তার রেহেমের মুখ বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন বাচ্চার প্রসব দ্বারা রেহেমের মুখ খুলে যায় এবং সে খুন টপকাতে থাকে তবে তো অবশ্যই এটা নিফাসের রক্ত হবে। কেননা প্রসবের পর রেহেমের থেকে বের হওয়া রক্তকেই নিফাস বলা হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব এই যে, ইদত সম্পূর্ণ হওয়া এমন হামলের وضع -এর সাথে যুক্ত যার সম্পর্ক হলো মহিলার সাথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَزْلَاجُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, আর হামল বলা হয় كل ما في البطن -কে, অর্থাৎ যাই পেটে থাকে একেই হামল বলা হয়। সুতরাং প্রথম বাচ্চার প্রসব দ্বারা পুরা হামল وضع হয় না; বরং কিছু হামল وضع হয়। আর হামেলার ইদত সম্পূর্ণ হয় পূর্ণ وضع حمل দ্বারা। এ জন্য ইদত পূর্ণ হবে দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব দ্বারা, প্রথম বাচ্চা দ্বারা নয়।

## بَابُ الْأَنْجَاسِ وَتَطْهِيرِهَا

تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَتَوْبُهُ وَالْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسَابِكْ فَطَهَّرَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَهُتُمْ أَقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالنِّعَامِ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ وَإِذَا وَجِبَ التَّطْهِيرُ فِي الثَّوْبِ وَجِبَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ فِي حَالِهِ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ الْكُلَّ وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالنِّعَامِ وَبِكُلِّ مَائٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالْحَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عَصَرَ انْعَصَرَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزَفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالنِّعَامِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمَلَقَاتِ وَالنَّجَسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ إِلَّا أَنْ هَذَا الْقِيَاسُ تَرَكَ فِي الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَنَاعَ قَالِعٌ وَالطَّهْرُوتَةُ يَغْلِيهِ الْقُلْعُ وَالْإِزَالَةُ وَالنَّجَاسَةُ لِلْمَجَاوِرَةِ فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاءُ النَّجَسِ بَقِيَ طَاهِرًا وَجَوَابُ الْكِتَابِ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَاحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) وَعَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجُوزْ فِي الْبَدَنِ يَغْيِيرُ الْمَاءَ —

### বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন

অনুবাদ : মুসল্লির শরীর, তার কাপড় এবং নামাজ আদায়ের স্থান নাজাসাত থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র করো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— প্রথমে তা চেছে নাও। তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও তার দাগ থেকে গেলে তোমার ক্ষতি হবে না। কাপড়ের ক্ষেত্রে যখন পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, তখন শরীর ও স্থানের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। কেননা নামাজের অবস্থায় সবগুলো ব্যবহারে আসছে। নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন জায়েজ হবে পানি দ্বারা এবং এমন সকল তরল পদার্থ দ্বারা, যার মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা সম্ভব। যেমন— সিরকা, গোলাপ জল ইত্যাদি এবং যা নিংড়ালে নিংড়ে পড়ে। (তা দ্বারা) এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, পানি ছাড়া জায়েজ হবে না। কেননা প্রথম স্পর্শেই তা নাপাক হয়ে যায়। আর নাপাক জিনিসে পবিত্রতা অর্জন হলো না। তবে পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশত এই কিয়াস পরিহার করা হয়েছে। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো— তরল পদার্থ (নাজাসাত) বিদূরকারী। আর বিদূরণ ও পরিস্কারণের কারণেই তাহারা অর্জিত হয়। আর মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাকীর হুকুম আসে। সুতরাং নাজাসাতের হুকুমগুলো যখন খতম হয়ে যাবে তখন তা পবিত্র থেকে যাবে। কুদীর বক্তব্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর তা ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রিওয়াযাতের একটি। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর রিওয়াযাত মতে উভয়ের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ শরীরের ক্ষেত্রে পানি ছাড়া জায়েজ বলেননি।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**প্রসঙ্গ কথা :** نَجَسٌ শব্দটি বহুবচন, তার একবচন হলো نَجَسٌ হবহ নাজাসাতকে (عين نجاست) বলা হয়। আর যদি نجس (بكسر الجيم) হয় তবে অর্থ হবে ঐ জন্তু যা পাক হয় না। গ্রন্থকার পূর্বে নাজাসাতে হুকমী এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান বর্ণনা করেছেন। উক্ত অধ্যায়ে নাজাসাতে হাকীকী এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধিমালা বর্ণনা করতেছেন। যেহেতু নাজাসাতে হুকমী নাজাসাতে হাকীকীর তুলনায় শক্তিশালী। তাই গ্রন্থকার নাজাসাতে হুকমীর আলোচনা আশ্রয় বর্ণনা করেছেন। আর নাজাসাতে হুকমী শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো, নাজাসাতে হুকমী যদি কমও হয়। তাও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয়। পক্ষান্তরে নাজাসাতে হাকীকী কম হলে নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয় এতে প্রতীয়মান হলো যে, নাজাসাতে হুকমী নাজাসাতে হাকীকীর চেয়ে শক্তিশালী।

ইবরাহীমের মধ্যে واجب শব্দটি فرض-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। تطهير শব্দটির দু'টো অর্থ রয়েছে। এক. তাহারাৎ সাবিত দ্বারা দুই. নাজাসাত দূর করা। প্রথম সূরতে অর্থ হবে নাজাসাতের স্থানকে পাক করা তার মধ্যে তাহারাৎ সাবিত করে। আর দ্বিতীয় সূরতে অর্থ হবে নাজাসাতকে দূর করা ফরজ। মোটকথা, মাসআলা হলো, মুসল্লির শরীর, তার কাপড় এবং নামাজ আদায়ের স্থান পাক করা ফরজ।

কাপড় পাক করার উপর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- نَبِّأَبَك فَطْهَر তোমার বন্ধাদি পবিত্র করো। طهر শব্দটি امر-এর صيغة আর وجوب صيغة আর-এর জন্য আসে। তাই কাপড় পাক হওয়ার উজ্ব নاص عبارة দ্বারা সাবিত হবে। কাপড় পাক হওয়া এ জন্য জরুরি যে, নামাজ হলো স্বীয় প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যম তাই মুসল্লির করণীয় হলো ভালো ও সুন্দর অবস্থার উপর থাকা। আর ভালো ও সুন্দর অবস্থা তখনই সাবিত হবে যখন মুসল্লি নিজে পাক হবে এবং যা তার সাথে সম্পর্কিত তাও পাক হবে। সুতরাং যখন কাপড় পাকরাখা ফরজ অথচ এ কাপড় মুসল্লীর শরীরের সাথে পূর্ণভাবে সম্পর্কিত নয় তখন শরীর ও স্থান যা মুসল্লীর সাথে পূর্ণভাবে সম্পর্কিত তা পাক রাখা অবশ্যই ফরজ হবে।

দ্বিতীয় দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস। তিনি বলেন, প্রথমে তা চেছে নাও, তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উক্ত হাদীস এ ভাবে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ، بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ) قَالَتْ جَاءَتْ أَمْرًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِيَّادَانَا يَصِيبُ ثَوْبَاهُمَا مِنْ دَمِ الْبَيْضِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِأَلْمَاءٍ ثُمَّ تَنْصَحُهُ ثُمَّ تَغْلِي فِيهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার হায়েমের রক্ত তার কাপড়ে লেগে যায় এ অবস্থায় আমরা কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রথমে তা খড়ি ইত্যাদি দ্বারা চেছে নাও, তারপর পানি দ্বারা রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা ধৌত করে নাও, তারপর তাতে নামাজ পড়ো। (বুখারী ও মুসলিম) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, খোয়ার পর যদি কাপড়ে নাজাসাতের দাগ থেকে যায় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এই দাগ নামাজের প্রতিবন্ধক নয়।

উল্লেখ্য যে, স্থানের পবিত্রতা দ্বারা পায়ের স্থান মুরাদ। অর্থাৎ দাড়াবার স্থান পাক হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি দাঁড়ানোর জায়গায় এক দিরহামের চেয়ে বেশি স্থান নাপাক হয়, তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সিজদার স্থান পাক থাকা জরুরি কিনা এ ব্যাপারে ওলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, সিজদার স্থানও পাক হওয়া জরুরি। কেননা সিজদাও কিয়াম-এর ন্যায় একটি রুকন। সুতরাং যেমনিভাবে কিয়াম-এর জায়গা পাক হওয়া শর্ত। এমনিভাবে সিজদার স্থানও পাক হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, সিজদার জায়গা পাক হওয়া জরুরি নয়। কেননা সিজদা শুধু নাক দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আর নাক যেভাবে রাখা হয় তা তো এক দিরহামের চেয়ে কম স্থানে রাখা হয় আর এক দিরহামের কম নাজাসাত নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। এজন্য সিজদার স্থানের তাহারাৎ শর্ত নয়। তরফাইন-এর মতে স্থান পাক হওয়া শর্ত। কেননা সিজদা কপাল দ্বারা আদায় করা ফরজ। আর সাধারণত কপালের জায়গা এক দিরহাম থেকে বেশি স্থান জুড়ে হয়। তাই তার পাক থাকা জরুরি।

وَسَجُوزَ تَطْهِيرَهَا بِالسَّاءِ الْخ : কোন কোন জিনিস দ্বারা নাজাসাত দূর করা জায়েজ বা না জায়েজ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, পানি এবং প্রত্যেক ঐ সকল জিনিস দ্বারা নাজাসাত দূর করা জায়েজ যা প্রবাহিত হয়, পাক এবং তার মাধ্যমে নাজাসাত দূর করা সম্ভবও বটে। যেমন সিরকা, গোলাবজল ইত্যাদি এবং এমন জিনিস যা নিংড়ানো দ্বারা নিংড়ে পড়ে, সুতরাং খাওয়া জায়েজ এমন জানোয়ারের পেশাব এবং তৈল ও ঘি ইত্যাদি দ্বারা তাহারাৎ হাসিল করা জায়েজ নয়। কেননা পেশাব নাপাক। আর তৈল ইত্যাদি যদিও পাক কিন্তু নিংড়ানো দ্বারা নিংড়ে না; বরং কাপড়ের সাথে লেগেই থাকে। ইমাম মুহাম্মদ, যুফার, শাফি'ঈ এবং ইমাম মালিক (র.) ও আম যুফাহাদের মায়হাব হলো, পানি ছাড়া অন্যান্য প্রবাহিত জিনিস দ্বারাও তাহারাৎ হাসিল করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো- পবিত্রকারী জিনিস নাজাসাতের সাথে মিলে প্রথম স্পর্শেই নাপাক হয়ে যায়। অর্থাৎ পানি বা পবিত্রকারী জিনিস যখন নাজাসাতের উপর পড়ে এবং নাজাসাতের কিছু অংশ তার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এটা নিজেই নাপাক হয়ে যায়। আর যে জিনিস নিজে, নাপাক তা অন্যকে পাক করতে পারে। এ জন্য কিয়াসের চাহিদা তো এটাই ছিল যে, পানি বা অন্য কোনো প্রবাহিত বস্তুও মুফীদে তাহারাৎ না হওয়া। কিন্তু জরুরতের ভিত্তিতে পানির ক্ষেত্রে এ কিয়াসকে তরক করা হয়েছে। এ জন্য শুধু পানিকে তাহারাৎতের জন্য মুফীদ ধরা হয়েছে। পানি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসকে ধরা হয়নি।

দ্বিতীয় দলিল হলো, আদ্বাহ তা'আলার বাণী- وَيُزِيلُ لَكُمْ مِنَ السَّاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য।

তৃতীয় দলিল হলো কিয়াস দ্বারা। অর্থাৎ যেমনিভাবে নাজাসাতে হুকমী পানি ছাড়া দূর হয় না এমনিভাবে নাজাসাতে হাকীকীও পানি ছাড়া দূর হবে না।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, প্রবাহিত জিনিস বিদূরণকারী অর্থাৎ নাজাসাতকে সমূলে দূর করে দেয়। আর পানির মধ্যে পবিত্রকারী গুণ এ কারণেই যে, সে নাজাসাতকে দূর করে দেয়। এ অর্থ যেহেতু অন্যান্য প্রবাহিত বস্তুর মধ্যেও বিদ্যমান, তাই পানির ন্যায় এগুলোও পবিত্রকারী এবং নাজাসাত বিদূরণকারী হবে। বরং পানিতো কখনো রসীন নাজাসাতের রং কে দূর করতে পারে না; কিন্তু সিরকা তার রং কেও দূর করে দেয়। তবে প্রথম মিশ্রণেই যে নাপাক হয়ে যায় তার জবাব হলো, পানি নাপাক হয় নাজাসাতের অংশের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে। আর নাজাসাতের অংশগুলো যখন প্রবাহিত হয়ে খতম হয়ে যাবে, তখন মহল তথা কাপড়ও পাক হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রথম দলিলের জবাব হলো- যে জরুরতের কারণে পানির ক্ষেত্রে কিয়াসকে তরক করা হয়েছে সে জরুরতের কারণে অন্যান্য প্রবাহিত এবং পবিত্রকারী জিনিসের মধ্যেও কিয়াসকে তরক করা উচিত।

দ্বিতীয় দিলের জবাব হলো- কোনো জিনিসের আলোচনা (ذكر) দ্বারা তার তাখসীস বুঝায় না অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় পানির (مطهر) পবিত্রকারী হওয়ার আলোচনা দ্বারা অন্যান্য জিনিসের غير مطهر হওয়া বুঝায় না। তৃতীয় দলিলের জবাব হলো- নাজাসাতে হাকীকীকে নাজাসাতে হুকমীর উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা হাদাস (حدث) একটি শরয়ী (مانع) প্রতিবন্ধক। সুতরাং ঐ ভাবেই দূর হবে যে, ভাবে শরিয়ত বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাজাসাতে হাকীকিয়া একটি মাহসূস জিনিস। তাই তাকে হাদাসের ওপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীর বক্তব্যে অর্থাৎ سَجُوزَ تَطْهِيرَهَا بِالسَّاءِ-এর মধ্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অর্থাৎ যেমনিভাবে পানি বা অন্যান্য প্রবাহিত পাক জিনিস দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যায় এমনিভাবে এগুলো দ্বারা শরীরও পাক হয়ে যায়। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত দুটি রিওয়ায়াতের একটি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত হলো- তিনি কাপড় ও শরীরের মাঝে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, শরীরকে শুধু পানি দ্বারা পাক করা জায়েজ। আর কাপড়কে পানি এবং অন্যান্য প্রবাহিত পাক জিনিস দ্বারাও পাক করা জায়েজ।

وَلَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِزْمٌ كَالرُّوثِ وَالْعِدْرَةُ وَالِدَمِ وَالْمِئْنَى فَجَعَلَتْ قَدْلَكُمْ  
بِالْأَرْضِ جَارَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ إِلَّا فِي الْمِئْنَى  
خَاصَّةً لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْخُفِّ لَا يُزِيلُهُ الْجَفَافُ وَالذَّلِكُ يَحِلُّ فِي الْمِئْنَى عَلَى مَا نَذَّرَهُ  
وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَذًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا  
طَهُورٌ وَلَئِنْ الْجِلْدَ لِيَصْلَابَتْهُ لَا يَتَدَاخِلُهُ أَجْزَاءُ النَّجَاسَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ يَغْسِئُهُ الْجِزْمُ إِذَا  
جَفَّ فَإِذَا زَالَ زَالَ مَا قَامَ بِهِ -

অনুবাদ : যদি মুজাতে স্থূল শরীর বিশিষ্ট কোনো নাজাসাত লাগে, যেমন- গোবর, পায়খানা, রক্ত ও বীর্য আর তা শুকিয়ে যায়, এরপর তা মাটি দ্বারা ঘষে নেয়, তাহলে জায়েজ হবে। এটা ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম ক্রিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। এ-ই হলো সাধারণ ক্রিয়াসের চাহিদা। তবে বিশেষভাবে মনী তথা শুক্ক-এর ব্যতিক্রম। কেননা মুজাতে যা প্রবেশ করে, তাকে তো শুক্কতা ও ঘসা দ্বারা দূর করতে পারে না। শুক্ক তথা বনী এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। শায়খাইনের (র.) দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুজাধয়ে কোনো নাপাক থাকে, তাহলে উভয় দিকে মাটি দ্বারা মুছে ফেলবে। কেননা মাটি মুজাধয়ের জন্য পবিত্রকারী। তাছাড়া মাটি শুক্ক হওয়ার দরুন তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে। পরে স্থূল নাজাসাত যখন শুকিয়ে যায়, তখন সেই অর্দ্রতাও শুষে নেয়। সুতরাং যখন স্থূল নাজাসাত দূর হবে, তখন তার সাথে যুক্ত সে অর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুজায় এমন নাপাক লাগে যার জিসিম বা শরীর আছে যেমন- গোবর, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত ও বীর্য। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। এরপর তাকে মাটিতে ঘসা হয় অথবা খড়ি ইত্যাদি দ্বারা খুচিয়ে পরিকার করা হয়, তাহলে মুজা পাক হয়ে যাবে। এ ধরনের মুজা পরিধান করে নামাজ পড়া জায়েজ। এটা ইস্তিহসানের হুকুম, যা ক্রিয়াসে জলীর মোকাবেলায় আসে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটা জায়েজ নয়। অর্থাৎ এমনটি করার দ্বারা মুজা পাক হবে না; বরং খোয়া জরুরি। বীর্যের হুকুম এর বিপরীত যা সামলে আলোচনা করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটি হলো সাধারণ ক্রিয়াস মুতাবিক। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মুজার ভিতর যা প্রবেশ করে তা শুক্ক ও ঘসা দ্বারা দূর হয় না। এমনকি শুক্ক হওয়ার পরও নাজাসাত বাকি থাকে। তবে বীর্যের হুকুম এর ব্যতিক্রম যা আমরা পরে আলোচনা করব।

فَانْتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ .

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র.)-এর হাদীস-  
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصْلِي فَيُخْلِعُ عَلَيْهِ  
نَخْلَ الْقَوْمِ نَعْلَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نَعْلَكُمْ فَقَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَكَ فَنَخَلْنَا  
فَقَالَ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ فِيهِمَا قِذَا إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ بَابَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَإِنَّ  
رَأَى فِيهِمَا قِذَا رَأَى فِيهِمَا قِذَا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ -

সাহাবায়ে কেরামও তাদের জুতা খুলে ফেলল। নামাজ আদায়ের পড় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো? যে তোমরা জুতা খুলে ফেললে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমাকে জিবরাঈল (আ.) বলেছেন যে, তাতে নাপাক রয়েছে সুতরাং তোমরা যখন মসজিদের দরজায় আসবে তখন জুতাগুলো উল্টে-জুতাট করে দেখবে। যদি নাপাক দেখা যায় তবে জমিনে ঘসে নিবে।

অন্য রিওয়াযেতের মধ্যে  
الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ শব্দও এসেছে। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, জমিন তাদের জন্য পবিত্রকারী। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুজায় যদি নাজাসাত লাগে তবে জমিনে ঘসা দ্বারা পাক হয়ে যায়, খোয়া জরুরি নয়।

দ্বিতীয় আকসী দলিল হলো, মুজা চামড়ার হওয়ায় শুক্ক হয় তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে, পরে তা যখন শুক্ক হয়ে যায় তখন তার স্থূল নাজাসাত তা শুষে নেয়। সুতরাং যখন স্থূল নাজাসাত দূর হবে তখন তার সাথে যুক্ত অর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

وَفِي الرُّطْبِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَفْسِلَهُ لَإِنَّ الْمَسَّحَ بِالْأَرْضِ يُكْثِرُهُ وَلَا يَطْهَرُهُ وَعَنْ أَبِي  
يُوسُفَ (رحا) أَنَّهُ إِذَا مَسَّحَ بِالْأَرْضِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ أَثَرُ النِّجَاسَةِ يَطْهَرُ لِعُمُومِ الْبَلَوَى  
وَأُطْلِقَ مَا يَرَوَى وَعَلَيْهِ مَشَائِخُنَا فَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ فَيَسَّ لَمْ يَجْزِ حَتَّى يَفْسِلَهُ وَكَذَا  
كُلُّ مَا لَاجِرَمَ لَهُ كَالْخَمْرِ لَإِنَّ الْأَجْزَاءَ تَتَشَرَّبُ فِيهِ وَلَا جَاذِبَ يَجْذِبُهَا وَقِيلَ مَا يَتَّصِلُ  
بِهِ مِنَ الرَّمْلِ جَرَمٌ لَهُ وَالشُّوبُ لَا يَجْزِي فِيهِ إِلَّا الْفَسْلُ وَإِنْ يَسَّ لَإِنَّ الشُّوبَ لَيَتَخَلَّلُهُ  
يَتَدَاخَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ أَجْزَاءِ النِّجَاسَةِ فَلَا يَخْرُجُهَا إِلَّا الْفَسْلُ -

অনুবাদ : ভিজা নাজাসাতের ক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া জায়েজ হবে না। কেননা ভিজা নাজাসাতকে মাটি দ্বারা মুছলে নাজাসাতকে (আরো) প্রসারিত করবে পাক করবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি দিয়ে এমনভাবে মুছে যে, নাজাসাতের চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে। এবং হাদীস মুতলাক হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। আর হাদীসটিও মুতলাক, তাতে কোনো ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর এ মতের উপর আমাদের ফকীহগণের ফতোয়া রয়েছে। আর যদি মুজায় পেশাব লাগে এবং শুকিয়ে যায় তাহলে তা ধোয়া ছাড়া জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এ সমস্ত নাজাসাত, যার স্থলতা নেই যেমন- মদ, কেননা নাজাসাতের অংশ মুজাতে শোষিত হয়ে যায়। আর তা চুষে ভুলে আনার মতো কোনো চোষণকারীও নেই। কারো কারো মতে তার সাথে লেগে থাকা ধূলাও তার স্থলতা হিসাবে গণ্য হবে। কাপড় শুকিয়ে গেলেও ধোয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কেননা কাপড় ফাক ফাক হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাতের অংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। সুতরাং ধোয়া ছাড়া তা বের হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুজায় ভিজা নাজাসাত লাগে যেমন- গোবর, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি। আর তা এখনো শুকায়নি। তবে মাটিতে ঘসা দ্বারা মুজা পাক হবে না; বরং ধোয়া জরুরি। কেননা ভিজা নাজাসাত মাটিতে ঘসা দিলে আরো প্রসারিত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, এতে মুজা আরো নাপাক হয়ে যায়, পাক হয় না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ভিজা নাজাসাতের সুরতের যদি মুজা এমনভাবে মাটিতে ঘসা হয় যে, নাজাসাতের চিহ্নও বাকি না থাকে তাহলে মুজা পাক হয়ে যাবে। তার পুনরায় ধোয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এর মধ্যে উম্মে বালওয়া রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা সাধারণত ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে। এখন যদি ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয় তাতে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। দ্বিতীয়ত এ হাদীসটি মুতলাক। ভিজা বা শুষ্ক এর কোনো ব্যবধান দেখানো হয়নি। তাই মাটিতে ঘসা দ্বারা মুজা পাক হয়ে যাবে। তার উপর ভিজা নাজাসাত লাগুক বা শুষ্ক নাজাসাত লাগুক আমাদের মাশায়িখের এটাই অভিমত। আর এর উপর ফাতোয়াও রয়েছে।

فَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلٌ যদি মুজায় এমন নাজাসাত লাগে যে, যার স্থলতা নেই। যেমন- পেশাব, মদ ইত্যাদি, এ অবস্থায় মুজা শুধু ধোয়ার দ্বারাই পাক হয়ে যাবে। শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি মাটিতে ঘসা হয় তবে পাক হবে না। কেননা নাজাসাতের অংশ মুজাতে শুষে গেছে। আর এখানে এমন কোনো চোষণকারীও নেই যা তা চুষে আনবে। এজন্য মুখিত অংশগুলো বের করে আনার জন্য পানি দ্বারা ধোয়া অভ্যাবশ্যিক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো মুজায় পেশাব লেগে যায়। অতঃপর এর উপর কোনো মাটি বা বালু লেগে যায় এবং শুকিয়ে যায়, তারপর মাটিতে ঘসা হয়। এতে মুজা পাক হয়ে যাবে। পানি দ্বারা ধোয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। শামসুল আইম্বা সরখসী (র.) বলেন, এ মতই বিতুদ্ধ। - (ইনশা'আল্লাহ)

নাজাসাত যদি কাপড়ে লেগে যায় তবে ধোয়া ছাড়া পাক হবে না, যদিও নাজাসাত শুকিয়ে যায়। দর্শন হলো, কাপড় সাধারণত পূর্ণ হয় না; বরং ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে যার দরুন নাজাসাতের অধিক অংশ তার মধ্যে লেগে যায়। তাই সমূহ নাজাসাতের অংশকে বের করার জন্য ধোয়া জরুরি। শুধু মাটির ওপর ঘসা মাঝা যথেষ্ট হবে না।



وَالْمَنِيِّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ رَطْبًا فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ أَجْزَأُ فِيهِ الْفَرْكُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ (رض) فَأَغْسِلِينِي إِنْ كَانَ رَطْبًا وَأَفْرِكِينِي إِنْ كَانَ يَابِسًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) الْمَنِيُّ طَاهِرٌ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا يَغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَنِيُّ وَلَوْ أَصَابَ الْبَدَنَ قَالَ مَشَانِيخُنَا (رح) يَطْهَرُ بِالْفَرْكِ لِأَنَّ الْبَلَوُ فِيهِ أَشَدُّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَطْهَرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ لِأَنَّ حَرَارَةَ الْبَدَنِ جاذِبَةٌ فَلَا يَعُودُ إِلَى الْجِرْمِ وَالْبَدَنُ لَا يُمْكِنُ فَرْكُهُ .

অনুবাদ : শুক্র নাপাক। অর্দ্র অবস্থায় তা ধোয়া ওয়াজিব। যদি কাপড়ে শুকিয়ে যায় তাহলে রগড়িয়ে ফেলেও যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন- অর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, শুক্র পাক। আমাদের বর্ণিত হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড় ধুয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে তিনি শুক্রও উল্লেখ করেছেন। শুক্র যদি শরীরে লাগে তাহলে আমাদের মাশায়িখগণ বলেছেন, রগড়ালে তা পাক হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা আরো অধিক ব্যাপক। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধোয়া ছাড়া তা পাক হবে না। কেননা শরীরের তাপ তা শোষণ করে নেয়। সুতরাং শোষিত অংশ শুষ্ক স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তা রগড়ানো সম্ভব নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুক্র পাক নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ওলামায়ে আহনাফ বলেন, মানুষের শুক্র নাপাক। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মানুষের শুক্র পাক। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্য থেকে কুকুর ও শূকরের শুক্র সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। এ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর শুক্রের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। এক, সব প্রাণীর শুক্রপাক **ماكول اللحم** হোক বা **غير ما**। **غير ما** **كول اللحم** হোক। দুই, সব প্রাণীর শুক্র নাপাক। তিন, **ماكول اللحم**-এর শুক্র পাক আর **كول اللحم**-এর শুক্র নাপাক।

[টীকা : মাওলানা আব্দুল হাই (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.)| শুক্র পাক হওয়ার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদীসটি হলো,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يَصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ أَوْ الْبَرَاثِ وَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخُرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرُوهُ .

ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাপড়ে লেগে থাকা শুক্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সেটাতো শ্লেষ্মা ও থুথু-এর মতো। তিনি আরো বলেন, তাকে কোনো কাপড় খও বা ইখবার ঘাস দ্বারা মুছে ফেললে যথেষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসে শুক্রকে শ্লেষ্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর শ্লেষ্মা হলো পাক। সুতরাং শুক্রও পাক। এমনিভাবে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, **أَمِمِي كُنْتُ أَتَوَكُّ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بَصَلِي**। তিনি নামাজে রত থাকতেন। উক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় শুক্র পাক। নতুবা শুক্র লাগা কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আদায় করতেন না।

আকলী দলিল হলো- শুক্র মানব সৃষ্টির সূচনা। তাই তা মাটির অনুরূপ। কেননা আখিয়ায়ে কেরামের সৃষ্টি নাপাক বস্তু দ্বারা হওয়া অসম্ভব। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলামায়ে আহনাফের অভিমত হলো শুক্র নাপাক। ইমাম মালিক (র.)-এরও একই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যে কাপড়ে শুক্র লেগে যায় তা পানি দ্বারা ধোয়া জরুরি। পানি ব্যতীত কাপড় পাক হবে না। আর আমাদের আইন্যয়ে ছালাছার মতে শুক্র যদি অর্ধ হয় তবে তা ধোয়া ওয়াজিব। আর যদি শুক্র হয় তবে ঘষা দ্বারাও পাক হয়ে যাবে। আমাদের দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন

فَإِذَا كَانَ رَطْبًا وَأَفْرَكِيهِ لَنْ كَانَ بَيَاسًا

অর্ধ হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুক্র হলে তা রগড়িয়ে ফেলো। দ্বারে কুতনী ও বাঘ্যার উক্ত হাদীস এ ভাবে নকল করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَفْرَكُ الْمِنَى مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ بَيَاسًا وَأَغْلِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا -

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়ের শুক্র শুক্র হলে খোঁচিয়ে উঠাতাম আর অর্ধ হলে তা ধুয়ে ফেলতাম।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন হযরত আছার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও হয়। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ-

إِنَّهُ ﷺ مَرِيْعَمَارَ بْنَ بَيَاسٍ وَهُوَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنَ النَّخَامَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا نَخَامَتُكَ وَدُمُوعَ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءَ الَّذِي فَمَى رُكُوتَكَ إِلَّا سَوَاءً وَإِنَّمَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبَوْلِ وَالْعَازِطِ وَالْدَّمِ وَالْمَنِيِّ وَالْقَيْ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত আছার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আছার নিজের কাপড় থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নাকের শ্লেষ্মা, চোখের পানি এবং চামড়ার পাত্তের পানি সবই সমান। অর্থাৎ সব পাক। তবে পাচটি জিনিসের কারণে কাপড় ধুইতে হয়। পেশাব, পায়খানা, রক্ত, শুক্র এবং বমি। অন্য এক বর্ণনায় বমির স্থলে শরাবের কথা এসেছে। মুদাক্কাহ, এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় শুক্র নাপাক।

হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীস যা ইমাম শাফি'ঈ (র.) দলিল হিসাবে পেশ করেছেন, তার জবাব হলো এই- এ হাদীসটি **حديث مرفوع** নয়; বরং ইবনে আক্বাসের উপর **موقوف** আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, **حديث مرفوع** - **حديث موقوف** (তথা হাদীসে আয়েশা ও হাদীসে আছার ইবনে ইয়াসির)-এর মোকাবেলায় দলিল হতে পারে না।

তা ছাড়া ইনায়্যা গ্রন্থকার লিখেছেন যে, ইবনে আক্বাস (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে শুক্রকে শ্লেষ্মা ও থুথুর সাথে তালীহ দেওয়া হয়নি; বরং তৈলাক্ততা ও কম প্রবেশ -এর মধ্যে তালীহ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমনিভাবে নাকের শ্লেষ্মার মধ্যে তৈলাক্ততা রয়েছে এমনিভাবে শুক্রের মধ্যেও তৈলাক্ততা রয়েছে। যেমনিভাবে শ্লেষ্মা কাপড়ের মধ্যে খুব কমই প্রবেশ করে এমনিভাবে শুক্রও কাপড়ের মধ্যে খুব কম প্রবেশ করে। এ সম্ভাবনাময় সুরত দ্বারা শুক্রের পাক হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল তথা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো- উক্ত হাদীসে **وَهُوَ بَصَلِي** -এর স্থলে **فَيَصْلِي** এসেছে। এখন হাদীসের মতলব এই দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড় থেকে শুক্র খোঁচিয়ে পাক করতাম তারপর তিনি নামাজ আদায় করতেন, এ সুরতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুক্র ওয়ালো কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করা লাজিম আসে না। তাঁদের আকলী দলিলের জবাব হলো- আমরা এ কথা তাসলীম করি না যে, মানব সৃষ্টির সূচনা সরাসরি শুক্র দ্বারা হয়েছে; বরং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্তনের পর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- শুক্র রক্তে পরিবর্তন হলো, তারপর জমাট রক্ত হলো, তারপর মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হলো। এ সকল অবস্থা অতিক্রম করে মানুষ সম্মানিত হলো এবং পরিপূর্ণ মানবরূপে সজ্জিত হলো। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শুক্র যদি শরীরের লাগে এবং শুকিয়ে যায়; তবে মাওরাউননহারের মাশাযিখগণের অভিমত হলো, এ সুরতেও যদি শরীর থেকে শুক্রকে খোঁচিয়ে উঠানো হয়, তাহলে শরীর পাক হয়ে যাবে। এ সুরতে কষ্ট বেশি। কেননা কাপড়কে তো শুক্র থেকে পৃথক করা সম্ভব কিন্তু শরীরকে তো পৃথক করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, শুধুমাত্র ধোয়া দ্বারা পাক হতে পারে, রগড়ালে পাক হবে না। কেননা শরীরের তাপ শুক্রকে শোধন করে নেয়, তাই শোধিত অংশ শুক্র স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়, তাই তার ধোয়া জরুরি।

وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمَرْأَةَ أَوْ السَّيْفَ اِكْتَفَى بِمَسْحِهَا لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُمَا  
النَّجَاسَةُ وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةً فَجَعَتْ بِالشَّمْسِ وَ  
ذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ لَمْ  
يُوجَدْ الْمَزِيلُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاءُ الْأَرْضِ بِنِسْبِهَا  
وَأَمَّا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ ثَبَتَ شَرْطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَدَاخَلُ  
بِمَا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ .

অনুবাদ : আয়না, তলোয়ার ইত্যাদিতে যদি নাজাসাত লেগে থাকে, তাহলে তা মুছে ফেলাই যথেষ্ট। কেননা নাজাসাত তাতে প্রবিষ্ট হয় না। আর তার উপরাংশে যা আছে তা মোছার মাধ্যমেই বিদূরিত হয়ে যায়। মাটিতে নাজাসাত লাগার পর যদি সে মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে যায় এবং তার চিহ্ন চলে যায়, তাহলে উক্ত স্থানে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.) বলেন জায়েজ হবে না। কেননা নাজাসাত দূরকারী কিছু পাওয়া যায়নি। এ জন্যই তো ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ নয়। আমাদের দলিল হলো- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুকতাই হলো ভূমির পবিত্রতা। তবে তায়াম্মুম জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, কিতাবুল্লাহর বাণী দ্বারা মাটির পবিত্রতার শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীস দ্বারা যে মাটির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, তা দ্বারা সে পবিত্রতা আদায় হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নাজাসাত যদি আয়না, ঝুলানো তলোয়ার এবং ছুরি ইত্যাদিতে লেগে থাকে তবে এগুলো মাটিতে মোছার দ্বারা ই পাক হয়ে যাবে। পানি ইত্যাদি দ্বারা ধোয়া শর্ত নয়। ইমাম মালিক (র.) ও এ অভিমত ব্যক্ত করেন। দলিল হলো- এ সকল জিনিসের মধ্যে নাজাসাত প্রবিষ্ট হতে পারে না। তাই এগুলোকে ভিতর থেকে বের করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এগুলোর উপরাংশে যা লেগে থাকে তা মোছার মাধ্যমেই দূর হয়ে যায়। এজন্য পানি দ্বারা ধোয়ার কোনো দরকার নেই। তবে যদি তলোয়ার ইত্যাদি খোঁদাই করা হয়, যাতে ময়লা ইত্যাদি লাগা আছে এবং পরে নাজাসাত লেগে যায়, তবে তো ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

وان اصابته الارض الخ : যদি মাটিতে নাজাসাত লাগে। তারপর সূর্যের তাপ বা রোদ বা বাতাস বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা শুকিয়ে যায় এবং নাজাসাতের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ইত্যাদিও চলে যায় তবে ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জায়েজ। তবে ঐ স্থান দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ঐ স্থানে নামাজ পড়াও জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো- এ স্থানে নাজাসাত লেগে থাকা অবশ্যজ্ঞাবী এবং নাজাসাত দূরকারী কোনো জিনিসও পাওয়া যায়নি এ জন্য ঐ স্থান নাপাকই থাকবে তার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। এ কারণেই তো তা দ্বারা তায়াম্মুম করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ। আমাদের দলিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী الْأَرْضُ بِنِسْبِهَا অর্থাৎ শুকতাই হলো ভূমির পবিত্রতা। একই অর্থের আরেকটি হাদীস হলো أَيْمًا أَرْضِي جَفَتْ نَقْدَ ذَكْتِ যে ভূমি শুকিয়ে যায় তা পাক হয়ে যায়।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, আপনাদের নাজাসাত দূরকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি কথটি ভুল। কেননা নাজাসাত দূরকারী জিনিস বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো, হারারাত তথা তাপ অর্থাৎ যেমনিভাবে আগুন দ্বারা পাক করা যায় এমনিভাবে হারারাত দ্বারা পাক করা যায়। হারারাত কম বা বেশি হোক।

বাক্যটি দ্বারা ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সার-নির্যাস হলো- তায়াম্মুমের জন্য মাটি পাক হওয়ার শর্ত কিতাবুল্লাহ তথা صَعِيدًا طَيِّبًا দ্বারা সাব্যস্ত। আর যে হুকুম কিতাবুল্লাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা অকটাই হয়ে থাকে এ কারণে তায়াম্মুমের জন্যও যে ঐ পবিত্র হওয়া শর্ত তা অকটাই হতে হবে। আর এ স্থানে মাটির তাহারাৎ সাব্যস্ত হয়েছে খবরে ওয়াহেদ তথা الْأَرْضُ بِنِسْبِهَا দ্বারা। আর যে হুকুম খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা ظمعي হয় না বরং ظني হয়। সুতরাং তায়াম্মুম যার জন্য মাটির তাহারাৎ ظمعي তা ঐ মাটি দ্বারা আদায় হবে না যার তাহারাৎ ظني (তথা অকটাতাবে প্রমাণিত নয়)।

وَقَدَّرَ الدِّرْهَمَ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمَغْلَظِ كَالدِّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخَرَّ الدَّجَاجُ  
وَبَوْلُ الْحِمَارِ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ تَجْزِ وَقَالَ زُهْرِي وَالشَّافِعِيُّ (رح) قَلِيلُ  
النَّجَاسَةِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ لِأَنَّ النَّصَّ الْمَوْجِبَ لِلتَّطَهُّرِ لَمْ يَنْفَصِلْ وَلَنَا أَنَّ الْقَلِيلَ  
لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخَذًا عَنْ مَوْضِعِ  
الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يَرَوْنَ إِعْتِبَارَ الدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَاحَةِ وَهُوَ قَدَرٌ عَرِضُ الْكَفِّ فِي  
الصَّحْنِجِ وَيَرَوْنَ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَثِيرُ الْمُثْقَلُ وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ  
مِثْقَالًا وَقِيلَ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى فِي الرَّقِيقِ وَالثَّانِيَةِ فِي الْكَثِيفِ وَإِنَّمَا  
كَانَتْ نَجَاسَةٌ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُغْلَظَةً لِأَنَّهَا ثَبَّتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ -

অনুবাদ : রক্ত, পেশাব, মদ, মূরগির পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি গলীয় নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহাম বা তার কম হলে তা সহ নামাজ জায়েজ হবে। কিন্তু এর বেশি হলে জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার ও শাফি'ঈ (র.) বলেন, অল্প নাজাসাতও অধিক নাজাসাত সমান। কেননা পবিত্রতা ও ওয়াজিবকারী শরিয়তের বাণী কোনো পার্থক্য করেনি। আমাদের দলিল হলো- অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ক্ষমার যোগ্য। (কেননা ইবনে ওমর (রা.) এ রকম ফাতোয়া দিয়েছেন। নিহায়া) আর নাজাসাত (মল) নির্গমন স্থলের উপর ভিত্তি করে দিরহামের পরিমাণ দ্বারা আমরা স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। (অর্থাৎ এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা যথেষ্ট, অথচ তাতে নাজাসাত সমূলে বিদূরিত হয় না। এ জন্য অল্প পানিতে বসলে পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এতটুকু পরিমাণ মাফ ধরা হয়েছে।) বিতুদ্ধ মতে দিরহামের হিসাব ধরা হয়েছে আয়তনের দিক থেকে। অর্থাৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। তবে ওজনের দিক থেকে বিবেচনা করার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ বড় দিরহাম, যার ওজন এক মিছকাল (প্রায় পঁচাশি গ্রাম)। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে। এ জিনিসগুলোর গলীয় নাজাসাত হওয়া কারণ হচ্ছে- তা অকাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাজাসাত দু' প্রকার-গলীজা, খফীফা। উভয়টির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নাজাসাতে গলীজা (গাঢ় নাপাক) এমন নাজাসাতকে বলা হয় যার সূরত তথা প্রমাণ এমন নস দ্বারা যার মোকাবেলায় অন্য কোনো নস তাহারাৎ সাব্যস্তকারী না থাকে। আর যদি দুটি নস পারস্পরিক বিপরীতমুখী হয় তথা এক নস নাজাসাতকে সাবিত করে পক্ষান্তরে অন্য নস তাহারাৎকে সাবিত করে, তবে এটাকে নাজাসাতে খফীফা বলা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে গলীযা ঐ নাজাসাতকে বলা হয় যার নাপাক হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর খফীফা ঐ নাজাসাতকে বলা হয় যার পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে।

উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল গোবরের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গোবর নাজাসাতে গলীয়া। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَبْلَةُ الْجَبِي -এর আসূলুন্নাহ ﷺ-এর ইস্তিনজার জন্য দু' টুকরা পাথর ও এক টুকরা গোবর আনা হয়েছিল। রাসূলুন্নাহ ﷺ স্থলাভিষিক্ত গোবরটিকে নিক্ষেপ করে ফেলে দিলেন, আর বললেন এটা নাপাক। এখানে লক্ষণীয় যে, অন্য কোনো নাম উপরোক্ত হাদীসের معارض নেই যা গোবরের তাহারাতেকে বুঝায়। অপর দিকে সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোবর নাজাসাতে খফীফা। কেননা ইমাম মালিক (রা.) গোবর পাক হওয়ার প্রবক্তা।

উপরোক্ত ভূমিকার পর লক্ষণীয় বিষয় হলো, হিদায়া গ্রন্থকারের মাকসাদ হলো এ কথা ব্যান করা যে, নাজাসাত কতটুকু পরিমাণ মাফ বা কতটুকু পরিমাণ মাফ নয়। তাই গ্রন্থকার বলেন, নাজাসাতে গলীয়া যেমন- রক্ত, পেশাব, মদ, মূরগির পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি এক দিরহাম বা তার কম পরিমাণ হলে মাফ তথা ক্ষমার যোগ্য। যদি এ পরিমাণ নাজাসাত নিয়ে নামাজ পড়া হয় তবে নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। এ পরিমাণ নাজাসাত কাপড়ে লাগুক বা শরীরে লাগুক, একই হুকুম। আর যদি এক দিরহামের অধিক পরিমাণ নাজাসাত হয় তবে ক্ষমার অযোগ্য। এমনকি তা দ্বারা নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, অল্প ও অধিক নাজাসাত সমান। অর্থাৎ মৃতলোকান নাজাসাত নিয়ে নামাজ জায়েজ হবে না। চাই নাজাসাত কম বা বেশি হোক। তাঁদের দলিল হলো- আব্দাহর বাণী- وَيَسَابِقُ فَطِيرٌ মিনি নাজাসাত থেকে পাক করাকে ওয়াজিব করেছেন তিনি কমবেশির কোনো পার্থক্য করেননি; বরং মৃতলোকান নাজাসাত থেকে পাক করার হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং কমবেশি সবগুলোর পাক করা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো- অল্প পরিমাণ নাজাসাত এমন যার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যেমন- মাছি নাজাসাতের উপর বসে তারপর এসে মানুষের শরীরে বসে। এমনভাবে মশার রক্ত চুষা থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং অল্প পরিমাণ নাজাসাত থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব হওয়ায় তাকে ক্ষমারযোগ্য ধরা হয়েছে। কেননা অল্প পরিমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া শররী দৃষ্টিকোণ থেকেও “প্রয়োজনকে” মুসতাহানা রাখা হয়েছে। এখন কথা হলো কম ও বেশি পরিমাণের ভিত্তি কি? এ ব্যাপারে আমাদের ওলামাগণ বলেন, এক দিরহাম পরিমাণ হলো কম, আর এক দিরহামের চেয়ে বেশি হলে বেশি। এখানে নাজাসাত নির্গমন স্থলের উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ নাজাসাত নির্গমণের স্থলে সর্বসম্মত মতে মাফ। তাই আমরা এ পরিমাণ অনুমান করে এক দিরহাম পরিমাণকে ক্ষমার যোগ্য বলেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিরহামের হিসাবের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক, দিরহামের হিসাব আয়তনের দিক থেকে অর্থাৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। দুই, দিরহামের হিসাব ওজনের দিক থেকে অর্থাৎ এমন বড় দিরহাম যার পরিমাণ এক মিছকাল (প্রায় আশি গ্রাম)।

ফকীহ আবু জা'ফর (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য হচ্ছে- প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি মানুষের পেশাব হয় তবে আয়তনের হিসাবে এক দিরহাম পরিমাণ হলে মাফ। এর চেয়ে বেশি হলে মাফ নয়। আর যদি মানুষের পায়খানা হয় তবে তখন হিসাবে এক দিরহাম পরিমাণ মাফ, এর চেয়ে বেশি হলে মাফ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মতনে উল্লিখিত জিনিসগুলো নাজাসাতে গলীয়া। কেননা এগুলো নাজিস হওয়া অকাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তার মোকাবেলায় অন্য কোনো দলিল নেই।

وَأَنَّ كَانَتْ مُحَقَّقَةً كَبُولُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَهُ جَازِبُ الصَّلَاةِ مَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ رُبْعَ الشَّوْبِ يَرُوى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لِأَنَّ التَّقْذِيرَ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاجِشِ وَالرُّبْعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَعَنْهُ رُبْعُ أَذْنَى ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْمِيزِ وَقَبْلَ رُبْعِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ كَالذَّلِيلِ وَالْذَخِيرِصِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) شِبْرٌ فِي شِبْرِ وَلَئِنَّمَا كَانَ مُحَقَّقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رح) لِمَكَانِ الْإِخْتِلَافِ فِي نَجَاسَةٍ أَوْ لِتَعَارُضِ النَّصْنِ عَلَى إِخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبُ مِنَ الرُّوثِ أَوْ مِنْ أَخْشَاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الذَّرْهِمِ لَمْ تَجْزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لِأَنَّ النَّصَّ الْوَاردَ فِي نَجَاسَةٍ وَهُوَ مَا رُوى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمَى بِالرُّوثِ وَقَالَ هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِجْسٌ لَمْ يُعَارِضْ غَيْرُهُ وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّغْلِيظُ عِنْدَهُ وَالتَّخْفِيفُ بِالتَّعَارُضِ وَقَالَ بِجُزْئِهِ حَتَّى يَفْحَشَ لِأَنَّ الْجُتْهَادَ فِيهِ مَسَاعًا وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّخْفِيفُ عِنْدَهُمَا وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً لِامْتِلَاءِ الطَّرْقِ بِهَا وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي التَّخْفِيفِ بِخِلَافِ بَوْلِ الْجِمَارِ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَنْشِئُهُ قُلْنَا الضَّرُورَةُ فِي النِّعَالِ وَقَدْ أَثَرَتْ فِي التَّخْفِيفِ مَرَّةً حَتَّى تَطْهَرَ بِالْمَسِّحِ فَتَكْفِي مُؤْتَتَاهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا كُورِلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَا كُورِلِ اللَّحْمِ وَزَفَرُ (رح) فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَوَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ مَا كُورِلِ اللَّحْمِ وَوَافَقَهُمَا فِي الْمَاكُولِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرَّيَّ وَرَأَى الْبَلَوَى أَفْتَى أَنَّ الْكَثِيرَ الْفَاجِشَ لَا يَمْنَعُ أَيْضًا وَقَاسُوا عَلَيْهَا طَيْنَ بُخَارًا وَعِنْدَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ فِي الْخُفِّ يَرُوى -

অনুবাদ : আর নাজাসাত যদি লঘু হয়, যেমন হালাল পশুর পেশাব, তাহলে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে নামাজ জায়েজ হবে। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা এ ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় অনেক বেশি দ্বারা। আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নামাজ জায়েজ হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লেগেছে তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন- আঁচল, কলি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এক বর্গ বিঘত পরিমাণ হলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে (হালাল পশুর পেশাব) লঘু নাপাক হওয়ার কারণ হলো- এক, এর নাপাকি হওয়া সম্পর্কে মতভেদ থাকা, দুই, কিংবা দুই হাদীসের বিপরীতমুখী হওয়া। দুই নীতির ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে। (অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মূলনীতি হলো,

শরিয়তের দুটি বাণীর মাঝে বিরোধ দেখা দিলে বিধানটি লঘু হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মূলনীতি হলো মুজতাহিদগণের পরস্পর মতভেদ<sup>(১)</sup> লেন্দা বা গরুর গোবর যদি এক দিরহামের বেশি কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা গোবরের নাপাকী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সাথে অন্য কোনো হাদীসের বিরোধ নেই। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খও গোবর ছুড়ে ফেলে বলেছিলেন (هَذَا رَجَسٌ أَوْ رَجَسٌ بَخَارِي) (এটা নাপাকী)। আর ইমাম সাহেবের মতে এতেই গলীয় নাজাসাত প্রমাণিত হয়। আর বাণী বিরোধ দ্বারা লঘুত্ব প্রমাণিত হয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, অনেক বেশি পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জায়েজ হবে। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে। আর তাদের মতে এতেই লঘুত্ব প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া রাক্তা-ঘাট গোবর ভরা থাকার কারণে তাতে (সম্পৃক্ত হওয়া) প্রয়োজন রয়েছে। আর লঘুত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অভাব স্বীকৃত। গাধার পেশাবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ভূমি তা শুষে নেয়। (সুতরাং তাতে প্রয়োজন নেই) আমরা বলি প্রয়োজন (মূলত) জুতার মধ্যে। আর হুকুম লঘু হওয়ার ব্যাপারে একবার তা ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং জুতা মুছে নিলেই পাক হয়ে যায়। এতেই প্রয়োজনের দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হালাল পণ্ড ও হারাম পণ্ডর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন, অর্থাৎ হারাম পণ্ডর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে এবং হালাল পণ্ডর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন রায় শহরে প্রবেশ করলেন এবং ব্যাপকভাবে তাতে লিপ্ততা দেখতে পেলেন, তখন তিনি অনেক বেশি পরিমাণও নামাজ আদায়ে বাধা হবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন। মাশায়িখগণ এর উপর বুখারার (গোবর মিশ্রিত) কাদা মাটিকে কিয়াস করেছেন। (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত ফতোয়ার ভিত্তিতে তারা বলেছেন, বুখারার কাদা মাটি প্রচুর পরিমাণে লাগলেও নামাজে অসুবিধা হবে না। যদিও তা গোবর মিশ্রিত, কেননা এটা এমন ব্যাপক সমস্যা যা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই) এখন থেকে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব শর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ মোজা সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ অভিমত ছিল এই যে, তা মাটিতে ঘষে নিলে পাক হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, গোবর তার দৃষ্টিতে নাপাক, কিন্তু রায় শহরের ফাতোয়া থেকে মনে হয় তিনি তাঁর অভিমত পরিবর্তন করে এটাকে পাক সাব্যস্ত করেছেন।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নাজাসাতে খফীফার (লঘু নাপাকী) “ক্ষমার যোগ্য পরিমাণ”-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাই গ্রহকার বলেন, নাজাসাতে খফীফা যেমন— হালাল পণ্ডর পেশাব কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ থেকে কম হলে মাফ। চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে মাফ হবে না। অর্থাৎ যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কমে নাজাসাতে খফীফা লাগে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ। আর যদি কাপড়ের চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশি অংশে লাগে, তবে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। দলিল হলো, নাজাসাতে খফীফার ক্ষেত্রে “অনেক বেশি” দ্বারা আদ্যাক্ত করা হয়। অর্থাৎ নাজাসাতে খফীফা যদি অনেক লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ নেই। আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন— মাথার এক-চতুর্থাংশের মাসাহকে পুরো মাসাহ-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এক-চতুর্থাংশ সতর খোলা পুরো সতর খোলার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ইহরাম অবস্থায় মাথার এক-চতুর্থাংশের হলক করাকে পুরো মাথা হলক করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়। মুদাককা, এক-চতুর্থাংশ ¼ তথা সমগ্রের স্থলাভিষিক্ত। আর ¼ দ্বারা নাজাসাতে খফীফা অনেক বেশি হাসিল হয়ে যায়। সুতরাং যা তার স্থলাভিষিক্ত তথা এক-চতুর্থাংশ তার দ্বারাও অনেক বেশি হাসিল হয়ে যায়। আর যেহেতু নাজাসাতে খফীফার অনেক বেশি মাফ নয় তাই আমরা বলেছি যদি কাপড়ের এক চতুর্থাংশে নাজাসাত লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। এখন এক-চতুর্থাংশ দ্বারা কি মুরাদ?

ব্যাপারে ফুকাহাগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো পুরো কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ যদিও কাপড় বড় হয়। আদ্যম্মা ইবনুল হুমায়দ (র.) এ মতটি পছন্দ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর আরেকটি বর্ণনা হলো **مَا يَجُوزُ بِوَالصَّلَاةِ** -এর এক-চতুর্থাংশ। অর্থঃ এ পরিমাণ কাপড় যার দ্বারা নামাজ হয়ে যায় তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন- লুঙ্গি। কেউ কেউ বলেছেন, কাপড়ের যে অংশে নামাজাতে লেগেছে তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন- আঁচল, কলি। সুতরাং যদি আঁচলের এক-চতুর্থাংশ নামাজাতে খফীফা লেগে যায় তবে তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নামাজাতে খফীফা যদি একবর্গ বিঘত হয়, তা অনেক বেশি তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। যদি তার থেকে কম হয় তবে ক্ষমারযোগ্য তা দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হালাল পতর পেশাব ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উভয়ের মতে নামাজাতে খফীফা। ইমাম সাহেবের মতে এর কারণ হলো, হালাল পতর পেশাবের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের নস রয়েছে যেমন- উরায়নার হাদীস দ্বারা পেশাবের তাহারাত বুঝা যায়, আর **إِسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَاصِمَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ** দ্বারা মুতলাকান পেশাব নাপাক বুঝা যায়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এর কারণ হলো হালাল পতর পেশাব পাক নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদীনের ইখ্তিলাফ রয়েছে, যেমন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) পাক বলেন আর অন্যান্য ইমামগণ নাপাক বলেন। এ জন্য এগুলোর পেশাব নামাজাতে খফীফা হবে।

**وَأَذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرُّوْثِ الْخ** : যদি কোনো কাপড়ে লেদা বা গরুর গোবর এক-দিরহামের অধিক লেগে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ হবে না। আর সাহেবাব্বিনের মতে জায়েজ হবে। ইমাম সাহেব (র.) দলিল হলো- লেদা ও গোবর নামাজাতে গলীয়া। কেননা তার নাপাক হওয়ার ওপর নস বিদ্যমান। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ **ﷺ** কাযয়ে হাজাতের জন্য তাশরীফ নিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, তিনটি পাথর নিয়ে আসো। কিন্তু পাথর পাওয়া গেল দুটি, তৃতীয়টি পাওয়া যায়নি। তাই আমি একখণ্ড গোবর নিয়ে আসলাম। তিনি দু'টো পাথর তো নিলেন কিন্তু গোবরকে এ বলে নিক্ষেপ করে দিলে **هَذَا رَجَسٌ** এটি নাপাকী। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা লেদা যে নাপাক তা বুঝা গেল। আর যেহেতু অন্য কোনো হাদীস এর বিরোধ নেই যা লেদার তাহারাতকে বুঝায়, তাই প্রতীয়মান হলো যে, লেদা ও গোবর নামাজাতে গলীয়া। কেননা ইমাম সাহেবের মতে দু'টো নস-এর মাঝে বিরোধ না থাকলে নামাজাতে গলীয়া প্রামাণিত হয়ে যায়। আর বিরোধ দ্বারা নামাজাতে খফীফা সাব্যস্ত হয়। মোটকথা, লেদা ও গোবর নামাজাতে গলীয়া। আর নামাজাতে গলীয়া এক-দিরহামের অধিক মাফ নয়; তাই এ পরিমাণ লেদা-গোবর দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে না। সাহেবাব্বিন (র.)-এর দলিল হলো- লেদা, গোবর ইত্যাদি নামাজাতে খফীফা। কেননা এগুলোর পাক-নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে মতনৈকতা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) এগুলোকে পাক বলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা নাপাক বলেন। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহেবাব্বিনের মতে কোনো জিনিসের পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদীনের মতনৈকতা দ্বারা তার নামাজাতে খফীফা হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আর নামাজাতে খফীফা নামাজের জন্য তখন অন্তরায় হবে যখন তা কাপড়ের এক-চতুর্থাংশে লেগে যায়। সুতরাং এ নামাজাত যদি এক-দিরহামের চেয়ে অধিক হয় কিন্তু কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে তা সহ নামাজ জায়েজ হবে।

সাহেবাব্বিনের দ্বিতীয় দলিল হলো- লেদা ইত্যাদির মধ্যে জরুরতও রয়েছে আবার উমূমে বালওয়াও বিদ্যমান। কেননা সাধারণত রাস্তা-ঘাট গোবর ভরা থাকে। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, জরুরত ও উমূমে বালওয়ার সময় সহজতর পন্থা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং লেদা, গোবর ইত্যাদির মাঝেও উমূমে বালওয়ার কারণে তাখফীফ এসে গেছে। সহজ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

**يَخْلُفُ بَوْلُ الْجَسَارِ** দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো- যেমনিভাবে লেদা ইত্যাদির মধ্যে জরুরত রয়েছে এমনিভাবে গাধার পেশাবেও জরুরত এবং **عموم بولرى** সুতরাং যেমনিভাবে লেদা ইত্যাদিকে নামাজাতে খফীফা বলা হয় এমনিভাবে গাধার পেশাবকেও নামাজাতে খফীফা বলা উচিত, অথচ আপনারা গাধার পেশাবকে নামাজাতে গলীয়া বলেন? জবাব হলো- পেশাবের মধ্যে **عموم بولرى** নেই। কেননা পেশাব এমন জিনিস যাকে ভূমি চুষে নিয়ে যায়। এখন ভূমিতে এমন আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই যার দ্বারা পথচারীদের কষ্ট হয়। কিন্তু লেদা, গোবর এর বিপরীত। কেননা ভূমি এগুলো চুষে নিতে পারে না।



সাহেবাইনের উপরোক্ত দলিলের উপর প্রশ্ন জাগে যে, عموم بلوى আর জরুরতের কারণে তো নাজাসাত দূর হয়ে যায়। যেমন- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় অথচ নাপাক হওয়া উচিত। কেননা বিড়ালের গোশত হারাম এবং নাপাক। কিন্তু জরুরত এবং عموم بلوى -এর কারণে নাজাসাত দূর হয়ে গেছে। এর জবাব হচ্ছে- বিড়ালের উচ্ছিষ্টের তুলনায় লেদা ও গোবর ইত্যাদির মধ্যে জরুরত ও عموم بلوى কম। কেননা বিড়ালের উচ্ছিষ্টের মধ্য থেকে নাজাসাত দূর হয়ে গেছে। আর লেদা ও গোবরের নাজাসাতের মধ্যে তাখফীফ হয়েছে সুতরাং উভয়টির পার্থক্য প্রকাশ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইনের দলিলের জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, লেদা ও গোবরের মধ্যে জরুরত রয়েছে তা আমরাও জানি, তবে এ জরুরত শুধু জুতার মধ্যে প্রযোজ্য- অন্য কিছুর মধ্যে নয়।

সুতরাং যা জুতার মধ্যে প্রযোজ্য তা আর অন্য কোনো দিকে ধাবিত হবে না। আর জুতার মধ্যে জরুরত একবার ভূমিকা রেখেছে। জুতা ভূমিতে ঘসা দ্বারা পাক হয়ে যায়। এতেই জরুরতের দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয়বার তার নাজাসাতের মধ্যে তাখফীফ করা যাবে না। কারণ এক জরুরত দ্বারা একবারই তাখফীফ করা হয় বারবার তাখফীফ করা যায় না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের ওলামায়ে কেরামের মতে হালাল পশু ও হারাম পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ যেমনিভাবে হারাম পশুর লেদা, গোবর ইত্যাদি হারাম এমনিভাবে হালাল পশুর লেদা, গোবর ইত্যাদিও নাপাক। তবে এগুলোর গলীয়া ও খফীফা হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে যা উপরে আলোচিত হয়েছে। তবে ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন, অর্থাৎ হারাম পশুর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো নাজাসাতে গলীয়া। আর হালাল পশুর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন এগুলো নাজাসাতে খফীফা।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন রায় শহরে প্রবেশ করলেন, তখন লোকদেরকে ব্যাপকভাবে এর মধ্যে লিপ্ততা দেখতে পেলেন। কেননা সেখানের রাস্তাঘাট সবকিছু গোবরে ভরা ছিল। তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে, অধিক বেশি পরিমাণ নাপাকীও যদি কাপড় অথবা শরীরে লাগে তা নামাজ আদায়ে বাধা হবে না। উক্ত মাসআলার উপর মশায়িখগণ বুখারার গোবর মিশ্রিত কাদামাটিকে কিয়াস করেছেন। তারা বলেছেন এগুলোও যে পরিমাণ লাগবে তা নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করবে না।

উক্ত ঘটনার প্রাক্কালে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্বশর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রথমে বলেছিলেন যে, মোজা ভূমিতে ঘসা দ্বারা পাক হবে না, কিন্তু উক্ত ঘটনার পর তিনি তাঁর পূর্ব মতামত প্রত্যাহার করেছেন এবং শায়খাইনের মতামত অনুযায়ী মতামত পেশ করেছেন।

وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يَفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحَشَ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَابْنِ يُونُسَ (رح)  
 وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لَا تَمْنَعُ وَإِنْ فَحَشَ لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ مُخَفَّفُ  
 نَجَاسَةٍ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ (رح) وَلَحْمُهُ مَا كُوِلَ عِنْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ  
 اللَّهُ فَالتَّخْفِيفُ لِمَتَعَارِضِ الْأَثَارِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَرٌّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ أَكْثَرُ  
 مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ أَجْزَاءُ الصَّلَوةِ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَابْنِ يُونُسَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ  
 (رح) لَا يَجُوزُ فَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي النِّجَاسَةِ وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ  
 هُوَ يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ لِعَدَمِ الْمُخَالِطَةِ فَلَا يُخَفَّفُ وَلَهُمَا أَنَّهَا  
 تَذَرُّقٌ مِنَ الْهَوَاءِ وَالتَّحَامِي عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَتَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ قِيلَ  
 يَفْسِدُهُ وَقِيلَ لَا يَفْسِدُهُ لِمَتَعَذَّرِ صَوْنِ الْأَوَانِي عَنْهُ .

অনুবাদ : যদি কাপড়ে ঘোড়ার পেশাব লেগে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বেশি পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা কাপড় নষ্ট করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বেশি পরিমাণ হলেও তা (নামাজ আদায়ে) বাধা সৃষ্টি করবে না। কেননা তাঁর মতে, হালাল পশুর পেশাব পাক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তা নাজাসাতে খফীফা (লঘু নাপাক) আর উভয়ের মতে তার গোশত হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে তাতে লঘুত্ব এসেছে হাদীসের পরস্পর বিরোধের কারণে। হারাম পাখির পায়খানা যদি কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি লেগে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে নামাজ জায়েজ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। কারো কারো মতে এ মতপার্থক্য হলো নাজাসাতের ব্যাপারে। (অর্থাৎ শায়খাইনের মতে উক্ত পাখির পায়খানা পাক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাপাক) আর কারো কারো মতে পরিমাণের ব্যাপারে (অর্থাৎ সকলের মতেই নাপাক, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা নাজাসাতে খফীফা, পক্ষান্তরে অন্য দুই ইমামের মতে নাজাসাতে গলীয়া) এটাই বিতর্ক অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) যুক্তি দিয়ে বলেন, লঘুত্ব আরোপ করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণত এদের সাথে মেলামেশা না থাকার কারণে এখানে প্রয়োজন নেই। সুতরাং লঘুত্ব আরোপিত হবে না। শায়খাইনের যুক্তি হলো- পাখিরা শূন্য থেকে বিষ্টা ত্যাগ করে। আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। সুতরাং এ শ্রেফিক্তে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তা (হারাম পাখির পায়খানার) পাত্রে পড়ে, তাহলে কোনো কোনো মতে তা পাত্রকে নষ্ট করে দিবে, আর কোনো কোনো মতে নষ্ট করবে না। কেননা পাত্রটি তা থেকে রক্ষা করা দুষ্কর।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাবের ব্যাপারে ওলামায়ে আহ্নাফের মতানৈক্য রয়েছে। শায়খাইনের মতে ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাব নাপাক, তবে নাজাসাতে খফীফা। যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ লেগে যায় তবে কাপড় নাপাক এবং নামাজে বাধাদানকারী হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঘোড়া ও হালাল পশুর পেশাব নামাজের বাধাদানকারী নয়। তা অনেক বেশি হোক বা কম হোক। তার দলিল হলো- হালাল পশুর পেশাব পাক। পাক জিনিস যত পরিমাণই লাগুক না কেন

নামাজে বাধ্যদানকারী নয়। এ জন্য হালাল পশুর পেশাব নামাজে বাধ্যদানকারী নয়। যদিও অধিক পরিমাণই হোকনা কেন। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, হালাল পশুর পেশাব নাপাক তবে লঘু নাপাক। উপরে বর্ণিত হয়েছে নাজাসাতে খফীফা যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ হয় তবে পাক, নামাজে বাধ্যদানকারী নয়। আর যদি অধিক পরিমাণ হয়, তাহলে নামাজে বাধ্যদানকারী কিন্তু তাখফীফ-এর কারণ ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে হালাল পশুর পেশাব এ জন্য নাজাসাতে খফীফা যে এর নাজাসাতে এ তাহারাতেব ব্যাপারে মুজ্তাহিদীনে উম্মতের ইখতিলাফ রয়েছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পরস্পর বিরোধী নস হওয়া নাজাসাতে খফীফার কারণ। কেননা উরায়নার হাদীস পেশাবের পবিত্রতা আর *اِسْتَنْزَاةٌ مِنَ الْبَوْلِ* পেশাবের নাজাসাতের উপর দালালাত করে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহেবাইনের মতে ঘোড়ার গোশত হালাল। আর ইমাম আবু হানীফার (র.)-এর মতে হারাম। তবে হুরমতটি সর্বদা এবং জেহাদের বাহন হওয়ার কারণে নাজাসাতের কারণে নয়।

*وَأَنَّ أَصَابَةَ خِرَانِعٍ*: হারাম পাখির পায়খানা যদি এক দিরহাম বা তার অধিক পরিমাণ কাপড় বা শরীরে লেগে যায় তবে শায়খাইনের মতে তাতে নামাজ জায়েজ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। শায়খাইন ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত মতভেদে তার তাহারাৎ ও নাজাসাত -এর ব্যাপারে নাকি তার পরিমাণের ব্যাপারে? এ ব্যাপারে ইমাম কারখী (র.) বলেন, তাঁদের মতভেদে তাহারাৎ ও নাজাসাতের ব্যাপারে অর্থাৎ হারাম পাখির পায়খানা শায়খাইনের মতে পাক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাপাক। ফকীহ আবু জা'ফর (র.) বলেন, এ মত পার্থক্য তার পরিমাণের ব্যাপারে। অর্থাৎ সকলের মতেই তা নাপাক। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নাজাসাতে খফীফা। আর সাহেবাইনের মতে নাজাসাতে গলীয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিদায়ার ইবারত দ্বারা বুঝা যায় ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উপরোক্ত বর্ণনা গুলোতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে আছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং ইমাম কারখীর বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফার সাথে আর ফকীহ আবু জা'ফরের বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদের সাথে আছেন। (যার বর্ণনা অধম উপরে করেছে।) হিদায়া গ্রন্থকার বলেন এ মতটি বিভুল্লভত। অর্থাৎ তাদের মতবিরোধ পরিমাণের ব্যাপারে।- (ইনায়ী)

হিদায়া প্রণেতার বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো- নাজাসাতের ব্যাপারে লঘুত্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে আয়োজ করা হয়। কিন্তু এখানে পাখির সাথে মানুষের মেলামেশা না থাকার কারণে কোনো প্রয়োজন নেই। তাই লঘুত্ব আরোপ করা হয়নি। শায়খাইনের দলিল হলো, পাখিরা শূন্য থেকে বিষ্টা ত্যাগ করে, আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুস্কর। এ কারণে এখানে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল হাই (র.) লিখেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে লঘুত্বের ভিত্তি হলো দুই নস-এর বিরোধের উপর যা এখনো প্রকাশ পায়নি। তাহলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে লঘুত্বের ওয়াজুদ-এর উপর কিভাবে দলিল হবে?

এর জবাব হলো, এই ওয়াজুদ লঘুত্বের দলিল নয় বরং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের জবাব। আর যদি হারাম পাখির পায়খানা পাড়ে পড়ে, তবে এ সম্পর্কে দু'টো মতামত রয়েছে। এক. ঐ পায়খানা পাতকে নাপাক করে দিবে। এ মতটি আবু বকর আ'মশ (র.) গ্রহণ করেছেন। দুই. পাতকে নাপাক করবে না। এ মতটি ইমাম কারখী (র.) গ্রহণ করেছেন। আবু বকর আ'মশ বলেন, পাতগুলোকে এর থেকে রক্ষা করা জরুরত সাব্যস্ত সম্ভব। তাই পাতের ক্ষেত্রে কোনো জরুরত সাব্যস্ত নেই। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পাতাদি এর থেকে রক্ষা করা দুস্কর। তাই পাতের ক্ষেত্রেও জরুরত সাব্যস্ত হবে।

وَأَن أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ أَوْ الْجِمَارِ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ أَجْزَاتِ  
 الصَّلَاةِ فِيهِ أَمَّا دَمُ السَّمَكِ فَلَاتَهُ لَيْسَ يَدِمُ عَلَى التَّحْقِيقِ فَلَا يَكُونُ نَجَسًا وَعَنْ أَبِي  
 يُوسُفَ (ر) أَنَّهُ إِغْتَبَرَ فِيهِ الْكَثِيرُ الْفَاحِشَ فَاعْتَبَرَهُ نَجَسًا وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ  
 وَالْجِمَارِ فَلَاتَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ فَإِنْ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلُ  
 رُؤُوسِ الْإِبْرِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطَاعُ الْإِمْتِنَاعُ عَنْهُ .

**অনুবাদ :** যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লাল দিরহামের বেশি পরিমাণও লেগে যায়, তাহলে তাতে নামাজ দুরন্ত হবে। মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ হলো, প্রকৃতপক্ষে তা রক্তই নয়। সুতরাং তা নাপাক হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটাকে তিনি নাজাসাত গণ্য করেছেন। গাধা ও খচ্চরের লাল সম্পর্কে কেননা, তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং কোনো পাক বস্তু তা দ্বারা নাপাক হতে পারে না। যদি কাপড়ে সূচের মাথার মতো পেশাবের ছিটা এসে পড়ে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লাল এক দিরহামের বেশি পরিমাণ লেগে যায়, তাহলে ঐ কাপড়ে নামাজ জায়েজ আছে। মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ হলো, মাছের রক্ত প্রকৃত পক্ষে কোনো রক্তই নয়। কেননা মাছের রক্ত রোদের তাপে শাদা হয়ে যায় অথচ অন্যান্য রক্ত রোদের তাপে কালো হয়ে যায়। এ কারণেই জবাই ছাড়াও মাছ খাওয়া জায়েজ। মোট কথা যখন মাছের রক্ত কোনো রক্তই নয় তখন তা নাপাকও হবে না। আর যখন নাপাক নয় তখন নামাজ জায়েজ হওয়াতেও কোনো বাধাদানকারী নয়। ইমাম আবু ইউসুফের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মাছের রক্ত নাজাসাতে খফীফ। সুতরাং কোনো কাপড়ে যদি অধিক পরিমাণ লেগে যায় তবে তাতে নামাজ জায়েজ হবে না। গাধা ও খচ্চরের লাল সম্পর্কে কেননা এগুলোর লালার সন্দেহ রয়েছে। তাই পাক কোনো বস্তু তা দ্বারা নাপাক হবে না।

উক্ত মাসআলার সূরতে মাসআলার দলিল প্রকাশ্য। তাই তা আর পুনরায় বয়ানের কোনো দরকার নেই।

وَالنَّجَاسَةُ ضَرَبَانِ مَرْيَبَةٌ وَغَيْرُ مَرْيَبَةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْيَبًا فَطَهَارُهَا يَزَوَالُ عَنْهَا لِأَنَّ النَّجَاسَةَ حَلَّتِ الْمَحَلَّ بِإِعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَتَزُولُ يَزَوَالِهِ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتَهُ لِأَنَّ الْحَرَجَ مَذْفُوعٌ وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْغَسْلُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِيهِ كَلَامٌ۔

অনুবাদ : নাজাসাত দু' প্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য। (অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখা যায়, তা দৃশ্য নাজাসাত, যেমন- পায়খানা। আর যা দেখা যায় না, তা অদৃশ্য নাজাসাত, যেমন- পেশাব।) সুতরাং যে নাজাসাত দৃশ্য হয়, তা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে নাজাসাতের মূল পদার্থ দূর হওয়া দ্বারা। কেননা নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত বিদূরিত হবে, তবে দূর করা কষ্টকর এমন দাগ লেগে গেলে দোষ নেই। কেননা (শরিয়তে) কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এ হুকুম ইঙ্গিত করে যে, একবার ধোয়ার দ্বারাও যদি নাপাক পদার্থ দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ধোয়ার (তিনবার ধোয়ার) শর্ত নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে (মাশায়িখদের) মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খ কুদুরী (র.) বলেন, নাজাসাত দু' প্রকার। দৃশ্য ও অদৃশ্য। কেননা শুকিয়ে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখাও যায় তা হলো দৃশ্য নাজাসাত। আর যার পদার্থ দেখা যায় না তা অদৃশ্য নাজাসাত। দৃশ্য নাপাক থেকে তাহারাতি হাসিল করার তরীকা হলো, তার মূল সত্তা দূর করে দিতে হবে যদিও তার কোনো রং ঘ্রাণ ইত্যাদি থেকে যায়। দলিল হলো- নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। তাই তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত দূর হয়ে যাবে। তবে এ ধরনের দূর করা খুবই কষ্টকর। তাই কোনো দাগ ইত্যাদি লেগে থাকলে কোনো দোষ নেই। কেননা শরিয়তে কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এর সমর্থন খাওলা বিনতে ইয়াসার-এর হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ- .

أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ثَوْبًا وَاجِدًا وَإِنِّي أَجِئُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَشِيهِ وَأَقْرِصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالسَّاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَبْقَى لَهُ أَثَرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْفِيكَ السَّاءُ فَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ۔

খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট মাত্র একটি কাপড় আছে। এতেই আমি মাসিক এর কাজ সমাধা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এর উপর পানির ছিটা দাও তারপর মলো তারপর তা পানি দ্বারা ধৌত করো। খাওলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তারপরও তো তার দাগ অবশিষ্ট থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার জন্য পানিই যথেষ্ট। অর্থাৎ পানি দ্বারা ধোয়া। এরপরও কোনো দাগ ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকলে কোনো অসুবিধা নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদুরীর কথা এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, মূল নাজাসাত চলে যাবার পর পুনরায় ধোয়া শর্ত নয়। যদিও মূল নাজাসাত একবার ধৌত করলেই চলে যায়। অর্থাৎ দৃশ্য নাজাসাত একবার ধোয়ার দ্বারা দূর হয়ে গেলে এটাই যথেষ্ট। আর যদি তিনবার ধুলেও দূর না হয় তাহলে মূল নাজাসাত না যাওয়া পর্যন্ত ধুইতেই থাকবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি দৃশ্য নাজাসাত একবার ধৌত করলেই দূর হয়ে যায় তবে এতে মাশায়িখগণের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে মূল নাজাসাত দূর হয়ে যাবার পর পুনরায় তিনবার ধুইবে। কেননা মূল নাজাসাত দূর হয়ে যাবার পর তা অদৃশ্য নাজাসাতের ন্যায় হয়ে গেছে। আর অদৃশ্য নাজাসাতকে তিনবার ধোয়া শর্ত।

ফকীহ আবু জা'ফর (র.) বলেন, একবার ধোয়ার পর পুনরায় দু'বার ধুইবে। তাহলে তিনের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত হলো যা বিজ্ঞ গ্রন্থকার দিয়েছেন। (একবার ধোয়ার দ্বারা নাজাসাত দূর হলে পুনরায় তিনবার ধোয়ার শর্ত নেই)

وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ فَطَهَّرْتَهُ أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَائِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهَّرَ  
لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلإِسْتِخْرَاجِ وَلَا يَقْطَعُ بِزَوَالِهِ فَاعْتَبِرْ غَالِبَ الظَّنِّ كَمَا فِي أَمْرِ  
الْقُبْلَةِ وَأَتَمَّا قَدَرُوا بِالثَّلَاثِ لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ فَيُقِيمُ السَّبَبَ الظَّاهِرَ  
مَقَامَ بَسِيرٍ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَقِظِ مِنْ مَنَامِهِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصْرِ فِي  
كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَخْرَجُ -

অনুবাদ : আর যে নাজাসাত দৃশ্য নয় (যেমন- পেশাব ও মদ) তা থেকে তাহারা হাঙ্গিলের উপায় হলো ধোয়া, যাতে ধৌতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা নাপাকির নিষ্কাশনের জন্য (ধোয়ার ক্ষেত্রে) বারংবারতা অপরিহার্য। আর নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং ধারণাই বিবেচ্য হবে। যেমন কিবলার মাসআলা রয়েছে। (অর্থাৎ যদি কিবলা জানা না থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মতো উপযুক্ত লোকও না থাকে, তাহলে নিজস্ব প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে কিবলা নির্ধারণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।) ফকীহগণ তিনবারের সীমা নির্ধারণ করেছেন এ কারণে যে, তাতে (নিষ্কাশনের) প্রবল ধারণা লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। নিন্দা থেকে জাহায্য হওয়া সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। (কেননা তাতে তিনবার ধোয়ার কথা রয়েছে) যাহিরী বর্ণনা মতে প্রতিবার ধোয়ার পর নিংড়ানো জরুরি। কেননা নিংড়ানোই (নাসাজাত) নিষ্কাশনকারী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নাজাসাতের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ অদৃশ্য নাজাসাতের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- পেশাব মদ ইত্যাদি তার হুকুম হলো- কাপড় এ পরিমাণ ধুইতে হবে যে, ধৌতকারী ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয়ে যায় পাক হয়ে গেছে। দলিল হলো- নাজাসাত বের করার জন্য বারবার ধোয়া জরুরি। আর যেহেতু ঐ নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয় তাই প্রবল ধারণাই বিবেচিত হবে। যেমন কিবলার দিক নির্ধারণ করার মাসআলায় রয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির কিবলা কোন দিকে তা জানা না থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মতো উপযুক্ত কোনো লোকও না থাকে তবে এ অবস্থায় সে তাহাররী করবে। যেদিকে তার প্রবল ধারণা হয় তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। এমনকি তাহাররী করে নামাজ আদায়ের পর যদি কিবলা অন্য দিকেও সন্ধ্যায় হয় তবে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফকীহগণ প্রবল ধারণার ক্ষেত্রে তিনবারের সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেননা এর দ্বারা প্রবল ধারণা লাভ হয়ে যায়। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণ তথা তিনের সংখ্যাকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনবার ধুইলেই পাক হয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হবে। এ মতামতের সমর্থন হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো-

إِذَا اسْتَقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْسِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْلِبَ ظَنُّهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

উক্ত হাদীসে অস্পষ্ট নাজাসাতের কারণে তিনবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর যাহিরী বর্ণনা মতে কাপড় প্রতিবার নিংড়ানো জরুরি। কেননা নিংড়ানোই অদৃশ্য নাজাসাত নিষ্কাশনকারী। গায়ের যাহিরী বর্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তৃতীয়বার নিংড়ানোই যথেষ্ট, প্রত্যেকবার নিংড়ানো জরুরি নয়।

فَصَلِّ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ : الْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاطَّبَ عَلَيْهِ  
وَجُوزَ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسُحُهُ حَتَّى يَنْقِصَهُ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِنْقَاءُ  
فَيُغْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا بُدَّ مِنَ  
الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَتْ بَيْنَكُمْ ثَلَاثَةٌ أَحْبَابٌ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحْرَجَ وَمَا رَوَاهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ  
لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَحْرَفٍ جَازٍ بِالْإِجْمَاعِ وَغَسَلَهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلَ لِقَوْلِهِ  
تَعَالَى فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا نَزَلَتْ فِي أَقْوَامٍ كَانُوا يَتَّبِعُونَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ  
ثُمَّ هُوَ آدَبٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ فِي زَمَانِنَا وَتُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ إِلَى أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبٍ ظَنِمَ أَنَّهُ قَدْ  
طَهَّرَ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُوسِسًا فَيُقَدَّرُ لثَلَاثٍ فِي حَقِّهِ وَقِيلَ بِالسَّبْعِ -

### পরিচ্ছেদ : ইস্তিনজা

অনুবাদ : ইস্তিনজা হলো সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সর্বদা করেছেন। তার তাতে পাথর এবং পাথরের  
ন্যায় জিনিস ব্যবহার করা জায়েজ আছে। এর দ্বারা (এ পরিমাণ) মুছে ফেলবে যাতে নাজাসাতের স্থানটি পরিষ্কার হয়ে  
যায়। কেননা পরিষ্কার হওয়াই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য, সেটাই বিবেচ্য হবে। এতে কোনো  
(নির্দিষ্ট) সংখ্যা মাসনুন নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ  
বলেছেন- তোমাদের প্রত্যেকে যেন তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করে। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ  
বলেছেন- যে ব্যক্তি ইস্তিনজায় পাথর ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় (অর্থাৎ তিন) সংখ্যা ব্যবহার করে। যে তা  
করল, সে ভালো করল আর যে করল না, তার কোনো ক্ষতি নেই।-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) শাফি'ঈগণ যে  
হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ তিন কোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার  
করলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা যথেষ্ট হবে। (সুতরাং বুঝা গেল তিন সংখ্যা আসলে উদ্দেশ্য নয়।) (পাথর বা টিলা  
ব্যবহার করার পর) পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-সেখানে এমন কিছু লোক  
রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাতি লাভ করা পছন্দ করে। আলোচ্য আয়াত ঐ সকল লোকদের শানে নাজিল হয়েছিল  
যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতে। মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইস্তিনজার আদব। কারো কারো মতে  
আমাদের যুগে এটা সুন্নত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করবে, যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে  
গেছে। কতবার হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুঁত খুঁতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং  
মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে।

\_\_\_\_\_

‘‘نحو’’ শব্দটি ‘نحو’ থেকে নির্গত হয়েছে। ‘نحو’ এমন জিনিসকে বলা হয় যা পেট থেকে নির্গত হয়। উঁচুস্থানকেও ‘نحو’ বলা হয়। আমাদের মতে ইত্তিন্জা সুনুতে মুয়াক্কাদা। ইমাম মালিক ও ইমাম মুযানীও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ (র.)-এর মতে ফরজ।

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْنُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

فَالْتَمَارَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَانِطٍ قَطْلًا ۖ قَالَ لَا ۖ

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, ﷺ মুমিনীনা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে পায়খানা থেকে পানি ব্যবহার না করে বের হতে দেখিনি উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদা (পানি দ্বারা) ইস্তিনজা করতেন।

إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الرَّأْيِ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدِيرُهَا يَغَائِطُ وَلَا يُولُ وَلَا يَسْتَنْجُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. (بخاری)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট পিতৃত্ব। যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পায়খানাযা যাবে, তখন পায়খানা পেশাবের সময় কিবলামুখী ও কিবলার দিকে পিঠ করে বসবে না। তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করবে।-(বুখারী) উক্ত হাদীসে امر-এর صيف এসেছে, যা وجوب-কে চায়। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা ইস্তিনজার ওয়াজিব হওয়ার এবং পাথরের মধ্যে তিনটি হওয়া সাব্যস্ত হলো। আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُؤَيِّرْ مِنْ فَعَلٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحِرْ وَمَنْ اسْتَحْمَرَ فَلْيُؤَيِّرْ مِنْ فَعَلٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحِرْ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيُلَظْ وَمَا لَاكَ يَلْسَانُهُ فَلْيَتَلَعْ مِنْ فَعَلٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحِرْ وَمَنْ أَتَى الْغَائِظَ فَلْيَسْتَحِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمَلٍ فَلْيَسْتَحِرْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْمُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مِنْ فَعَلٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحِرْ - (ابو داود)



হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় (তিন) ব্যবহার করে। যে তা করল সে ভালো করল। আর যে করল না তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি পাথর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিনজা করবে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। যে তা করল সে ভালো করল। আর যে করল না তার কোনো ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি খানা খায় (দাঁত লাগা) যা সে খেলাল দ্বারা বের করে তা নিক্ষেপ করে ফেলে দিবে। আর যা জিহ্বা দ্বারা বের করে তা খেয়ে ফেলবে। যে তা করল, সে ভালো করল, আর যে করল না তার কোনো গুনাহ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন পর্দা করে, যদি পর্দা না পায় তবে বালুর স্তূপ বানাবে। তারপর বালুর দিকে পিঠ করে বসবে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের লজ্জাস্থান দ্বারা খেল-তামাশা করে। তা করলে সে ভালো করল, আর যে তা করবে না তার কোনো ক্ষতি নেই।—

(আবু দাউদ)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, বেজোড় তো একও হয়। হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে বেজোড় তরক করলে কোনো ক্ষতি নেই। বুঝা গেল ইস্তিনজা তরক করলেও কোনো ক্ষতি নেই। আর যে জিনিস তরক করল কোনো গুনাহ বা ক্ষতি নেই। তা ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না। এতে প্রতীয়মান হলো ইস্তিনজা ফরজ নয় বরং সুন্নত। আর বেজোড় যেমনভাবে তিন সংখ্যা পাওয়া যায় এমনিভাবে তা এক, পাঁচ, সাত সংখ্যাতেও বিদ্যমান। এজন্য তিন সংখ্যা হওয়া জরুরি নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, এ হাদীস **متروك الظاهر** তথা তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ যদি তিন কোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা যথেষ্ট হবে। বুঝা গেল তিন সংখ্যা আসলে শর্ত নয়। দ্বিতীয় জবাব হলো, হাদীসে বর্ণিত **امر**—এর **استحباب** টি **صيف**—এর জন্য প্রয়োজ্য। তৃতীয় জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ইস্তিনজার জন্য পাথর চেয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দু'টি পাথর এনেছিলেন। তৃতীয় পাথর না পাওয়ায় এক খণ্ড গোবর এনেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর দুটো গ্রহণ করেছিলেন। আর গোবর খণ্ডটি নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, এটা নাপাক। এখন তিনটি পাথর যদি ওয়াজিব হতো তবে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় আরেকটি পাথর অবশ্যই তলব করতেন। অথচ তিনি তৃতীয় আরেকটি পাথর তলব করেননি। যেমন— বুখারীতে এসেছে। এ ঘটনা দ্বারাও বুঝা গেল তিনের সংখ্যা শর্ত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা ধোয়া উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী— **يَسِّرْ رَحْمَةً لِّعِبَادِهِ**—আমাদের সজ্ঞানী কুবাবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। আর কুবাবাসীদের আদত ছিল যে, তারা ঢিলা ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতো। মোটকথা ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা মোস্তাহাব বা আদব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পানি ব্যবহার করতেন আবার মাঝে মাঝে ছেড়েও দিতেন। এতো মোস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের যুগে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা সুন্নত। এটা হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। দলিল হলো হযরত আলী (র.)—এর হাদীস— **قَالَ إِنْ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَوَضَّعُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ تَتَلَطَّأُونَ تَلَطَّأً فَأَتَيْتُمَا الْحِجَابَةَ الْمَاءَ . (البیهقي)**

হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমাদের পূর্বের লোকেরা বিষ্টা ত্যাগ করতো। আর তোমরা পায়খানা করো তাই তোমরা পাথরের পর পানি ব্যবহার করো।— (বায়হাকী)

গ্রন্থকার বলেন, পানি ততক্ষণ ব্যবহার করবে যতক্ষণ তার প্রবল ধরণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। তিন বা পাঁচবারের কোনো বাধ্যবাদকতা নেই। তবে কোনো ব্যক্তি যদি ঝুঁত ঝুঁতে স্বাভাবের হয় তার ক্ষেত্রে তিনবার নির্ধারণ করা হবে। যেমনটি ছিল অদৃশ্য নাজাসাতের ক্ষেত্রে। পায়খানা যদিও দৃশ্য নাজাসাত; কিন্তু ইস্তিনজাকারী যেহেতু তা দেখতে পায় না, তাই সেও এ ব্যাপারে পেশাব তথা অদৃশ্য নাজাসাত অনুন্নত হবে। কেউ কেউ সাতবারকে নির্ধারণ করেছেন। এদের দলিল হলো, পায়ে কুকুরের মুখ লাগলে সাতবার ধোয়ার হাদীস।

وَلَوْ جَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجْزِ إِلَّا الْمَاءُ وَفِي بَعْضِ النَّسِخِ إِلَّا الْمَائِعِ  
وَهَذَا يَحْقِيقُ اخْتِلَافَ الرَّوَايَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ بِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهَذَا  
لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرَ مُزِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ اكْتَفَى بِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ فَلَا يَتَعَدَّاهُ ثُمَّ يُعْتَبَرُ  
بِالْمِقْدَارِ لِلْمَائِعِ وَرَاءَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَأَبِي يُوسُفَ (رح)  
لِسُقُوطِ إغْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) مَعَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ إغْتِبَارًا  
بِسَائِرِ الْمَوَاضِعِ —

অনুবাদ : নাজাসাত যদি নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পানি ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কুদূরীর কোনো কোনো সংস্করণে لا المائِع -এর পরিবর্তে لا الماء রয়েছে। অর্থাৎ তরল পদার্থ ছাড়া যথেষ্ট হবে না। উভয় নুসখার এ পার্থক্য পানি ছাড়া (অন্য তরল পদার্থ দ্বারা) অঙ্গ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শুধু মোছা (নাজাসাত) দূরীভূত করে না। তবুও নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাজে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। (অর্থাৎ এক দিরহামের পরিমাণ হলে তা নামাজের জন্য বাধাদানকারী হয়। তবে তাদের মতে নাজাসাতের মূল স্থানকে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে।) কেননা (শরিয়তের বিধান মতেই) উক্ত স্থান ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্য সকল স্থানের উপর কিয়াস করে এখানেও নাজাসাতের স্থানসহ হিসাব করা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি নাজাসাত নির্গমন স্থান থেকে দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়ে তা শুধু পানি দ্বারা দূরীভূত করা যাবে। পাথর ইত্যাদির দ্বারা মোছার কোনো প্রয়োজন নেই। কুদূরীর কোনো কোনো নুসখায় لا المائِع -এর পরিবর্তে لا الماء রয়েছে। অর্থাৎ সে নাজাসাত নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তা শুধু প্রবাহমান বস্তু দ্বারা দূরীভূত করা যায়। প্রবাহিত জিনিস তা পানি বা পানি ছাড়া অন্য কোনো জিনিসও হতে পারে। যেমন- সিরকা ইত্যাদি। উভয় নুসখার এ পার্থক্য পানি ছাড়া অন্য কোনো তরল পদার্থ দ্বারা অঙ্গ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে। যেমন- আমরা باب النجاس -এর শুরুতে বয়ান করে এসেছি। অর্থাৎ لا الماء নুসখা দ্বারা বুঝা যায় শরীর থেকে নাজাসাতে হাকীকিয়াকে একমাত্র পানি দ্বারা দূর করা জায়েজ। আর لا المائِع নুসখা দ্বারা বুঝা যায় যত জিনিস দ্বারা নাজাসাতে হাকীকিয়াকে দূর করা সম্ভব তত জিনিস দ্বারা দূর করা। আর তা পানি দ্বারা হোক বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা হোক। নাজাসাত নির্গমন স্থান অতিক্রম করলে তা ধোয়া ফরজ। এর দলিল হলো- পাথর ইত্যাদি দিয়ে মোছা দ্বারা নাজাসাত দূর হয় না; বরং ছড়িয়ে পড়ে। তবুও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না। বুঝা গেল পানি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা পাক করলে তা জায়েজ হবে না। প্রকাশ থাকে যে, যতটুকু নাজাসাত নামাজকে বাধাদানকারী, এ সম্পর্কে শাযখাইদের মতে নাজাসাতের মূল স্থান ব্যতীত এক দিরহামের অধিক। কেননা নাজাসাতের স্থানতো পরিহারযোগ্য তাই তা ব্যতীত এক দিরহাম থেকে বেশি হলে তা ধোয়া ফরজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজের স্থানসহ যদি এক দিরহামের অধিক হয়, তাহলে নামাজকে বাধাদানকারী বলে বিবেচিত হবে। অন্য সকল স্থানের ওপর কিয়াস করে তিনি উপরোক্ত মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ অন্যান্য স্থানে যেমনিভাবে এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাত মাফ এক দিরহামের অধিক মাফ নয় এমনিভাবে নাজাসাতের স্থানের ক্ষেত্রেও যদি এক দিরহাম হয় তাহলে মাফ হবে, আর যদি বেশি হয় তাহলে মাফ হবে না।

খাদ্দ্রব্য ঘারাও ইস্তিনজা করবে না। কেননা এটা খাদ্দ্রব্য নষ্ট করা ও অপচয়ের শামিল। আর এ দুটোই হারাম। স্বীয় ডান হাত ঘারাও ইস্তিনজা করবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ ডান হাত ঘারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হাদীস, لَا يَسْتَنْجِي بِمِيمِنِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِدَمَانِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِأُخْرَى وَلَا يَسْتَنْجِي بِأُخْرَى وَلَا يَسْتَنْجِي بِأُخْرَى وَلَا يَسْتَنْجِي بِأُخْرَى (بخار ومسلم)। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পেশাব করে তবে সে যেন ডান হাত ঘারা স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে, ডান হাত ঘারা ইস্তিনজা না করে এবং পায়ে স্নান নিক্ষেপ না করে। উক্ত হাদীস ঘারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, ডান হাত ঘারা ইস্তিনজা করা নিষেধ।

# كِتَابُ الصَّلَاةِ

## নামাজ অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : নামাজ সকল প্রকার ইবাদতের উৎস এবং সমূহ নেক আমলের ভিত্তি। এ জন্য একে সমস্ত বিধানের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্রতা নামাজের পূর্ব শর্ত। বস্তৃত কোনো বস্তুর শর্ত ঐ বস্তুর পূর্বে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ জন্য পবিত্রতার অধ্যায়কে নামাজের অধ্যায়-এর পূর্বে উল্লেখ করেছে।

অভিধানে সালাতের অর্থ- 'দোয়া, যেমন- ইরশাদ হয়েছে **وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** অর্থ- আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, আপনার দোয়া তাদের জন্য অবশ্যই প্রশান্তি স্বরূপ। — [৯ তাওবা; ১০৩] অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন- **وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ** অর্থ- ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করেন। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন- **إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ** অর্থ- যদি তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত প্রদান করা হয় তাহলে সে যেন তা গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় যদি সে রোজা না রাখে তাহলে খাবার খেয়ে নেবে এবং যদি সে রোজাদার হয় তাহলে বরকতের দোয়া করবে।

শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলা হয় সু-নির্দিষ্ট কর্ম এবং রোকনের সমষ্টিকে। নির্দিষ্ট কর্ম এবং নির্দিষ্ট রোকনকে এ জন্য সালাত বলে যে, এতেও দোয়া বিদ্যমান রয়েছে।

সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ : সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ ওয়াক্ত। আর সালাত আদায় আবশ্যিক হওয়ার কারণ আল্লাহর নির্দেশ। সালাতের শর্ত পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেলামুখী হওয়া, ওয়াক্ত হওয়া, তাকবীরে তাহরিমা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ওয়াক্ত সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ, অতএব তা সালাতের শর্ত কিভাবে হয়? উত্তর ওয়াক্ত সালাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং সালাত আদায় করা আবশ্যিক হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াক্ত শর্ত বিধায় আর কোনো আপত্তি বিদ্যমান থাকবে না।

সালাতের রোকন : দাঁড়ানো, কিরাত পড়া, রুকু করা, সেজদা করা, আততাহিয়াতু পড়ার সমপরিমাণ সময় শেষ বৈঠক করা।

সালাতের হুকুম : দুনিয়াতে দায়িত্বমুক্ত হওয়া, আখেরাতে প্রতিশ্রুত ছওয়াব হাসিল হওয়া। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা সালাতের ফরযিয়াত প্রমাণিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, **اقْبِرُوا الصَّلَاةَ** তোমরা নামাজ কয়েম রাখবে। — (বনী ইসরাঈল; ৭৮) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا** অর্থ- নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মু'মিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। — (নিসা; ১০৩)

হাদীসে প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ** অর্থ- মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এ মর্মে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সালাত আদায় করা ফরজ, এটাতে কারো দ্বিমত নেই। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে- **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى** অর্থ-তোমরা সমস্ত নামাজ এবং মধ্যবর্তী নামাজের পাবন্দি করবে। — (২-বাকারা-২৩৮) এ 'আয়াত দ্বারা নামাজের ফরযিয়াত এবং (নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা মহান আল্লাহ সমস্ত নামাজের পাবন্দি করার হুকুম দিয়েছেন এবং তার উপর মধ্যবর্তী নামাজকে আতফ (عطف) করেছেন, এখানে সালাওয়াত (صلوات) শব্দ বহুবচন হিসাবে

এনেছে। তার মধ্যবর্তী হওয়ার জন্য ন্যূনতম চার ওয়াক্ত নামাজ হওয়া আবশ্যিক। অতএব আ'সসালাওয়াত (الصلوات) -এর মধ্য চার ওয়াক্ত নামাজ এবং সালাতে ওস্তা বা মধ্যবর্তী নামাজ দ্বারা এক নামাজ, মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রমাণিত হয়। সূরা ত্বাহ-হাতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ** -এর সংকলক উল্লেখ করেছেন যে, **سَبِّح** শব্দ দ্বারা **صَل** বা নামাজ পড়, বুঝানো হয়েছে। উক্ত আয়াতে **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ** (সূর্যোদয়ের পূর্বে) দ্বারা ফজরের নামাজ, **قَبْلَ غُرُوبِهَا** (সূর্যাস্তের পূর্বে) দ্বারা আসরের নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। **أَنَاءِ اللَّيْلِ** (রাত্রের মধ্যখান) দ্বারা মাগরিব এবং ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে এবং **أَطْرَافَ النَّهَارِ** (দিনের প্রান্তসমূহ) দ্বারা জোহরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। উহা এভাবে যে, জোহরের নামাজের সময় আরাঙ্ক হয় দিনের প্রথম অর্ধেকের শেষ প্রান্তে এবং দিনের দ্বিতীয় অর্ধেকের প্রথম প্রান্তে সূর্য হলে গেলে দিনের প্রথম অর্ধেকের সমাপ্তি হয় উহাই মূলত জোহরের নামাজের সময়ের সূচনা। সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে দিনের দ্বিতীয় অর্ধেকের সূচনা হয়, পরিণামে জোহরের সময়ে দিনের দু' প্রান্ত একত্রিত হয়। অতএব আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে যে, দিনের দু' প্রান্ত একত্রিত হওয়ার সময়ও (জোহরের) নামাজ পড়ো।

নামাজ কখন ফরজ (فرض) হয়েছে এবং নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে রাসূলে ﷺ-এর ইবাদত করার পদ্ধতি কি ছিল? সীরাতে এবং হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিরাজের রাতে ফরজ হয়েছে তবে হাঁ; শবে মিরাজের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য রয়েছে যে, তা কোন বছরে সংঘটিত হয়েছে নববী পঞ্চম বছর হতে দশম বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন মতামত আছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে নবুয়তের পঞ্চম সনে নামাজ ফরজ হয়েছে। শবে মিরাজের পূর্বে কোনো নামাজ ফরজ ছিল কিনা? অধিকাংশ আলিমদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। তবে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। এর দলিল সূরা মুযাখিলের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ; ইরশাদ হয়েছে **ثُمَّ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا** অর্থ- রাতে জাগরণ করে ইবাদত করো, কিছু সময় ব্যতীত। —[৭-মুযাখিল; ৭৩] এ সূরাটি পবিত্র মাক্কায় প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, সূরা মুযাখিলে নামাজের হুকুমটি মাদানী। উহার দলিল এই যে, এ সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে **وَأَخْرَجُوا بِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** অর্থ- এবং অপর দল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। প্রকাশ থাকে যে, যুদ্ধের বিধান পবিত্র মদীনায়া অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত জবাব সঠিক নয়, কারণ হচ্ছে- এখানে যুদ্ধের কথা ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- **إِن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرَجُوا بِضِرَاطٍ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا** [মুযাখিল; ২০] আয়াতের মধ্যে ইসতেকবাল (ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত) সীগাহ বিদ্যমান আছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এ হুকুম পূর্বে দেওয়া হইছে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যুদ্ধ ছিল না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে সাধারণ মুসলমানরা কোনো নামাজ পড়ত কিনা? এক জামাত আলিমদের মতে ফজর এবং ইশার নামাজ মিরাজের পূর্বে ফরজ হয়েছিল। এর দলিল হচ্ছে **رَسَّيْخَ وَالْعَنَشِي وَالْإِبْكَارِ** অর্থ- তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো রজনী ও প্রভাতে। —[৩-আল ইমরান; ৪১] এ আয়াতটি মিরাজের ঘটনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে উক্ত দু'নামাজ (ফজর ও ইশা)-এর উল্লেখ আছে তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো যে, বিস্তুক রেওয়ামতের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ মিরাজের পূর্বে ফজর এবং ইশার নামাজ পড়তেন, যেমন সূরা জিনে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করার ঘটনা ফজরের নামাজের মধ্যে ঘটেছিল এবং উহা মিরাজের

ঘটনার পূর্বেকার ঘটনা ছিল, তবে ঐ দু'নামাজ মহানবী ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল, না কি তিনি তা নফল হিসাবে পড়তেন? এর কোনো দলিল হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান নেই।

নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত কেন ফরজ করা হলো, উহার থেকে কমবেশি হলো না কেন? উত্তর এর কয়েকটি হিক্মত (উপকার) নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(১) মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক জিনিস জানার জন্য মানুষের মাঝে পাঁচটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন। ১. দৃষ্টি শক্তি, ২. শ্রবণ শক্তি, ৩. ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি, ৪. স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ৫. স্পর্শ করার শক্তি। উক্ত পাঁচ শক্তির মোকাবেলায় মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম দিয়েছেন।

(২) জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যখন মানুষকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, তখন সর্বপ্রথম মানুষকে প্রাণ দান করেছেন, অতপর মানুষের প্রয়োজনীয় পাঁচটি বড় নিয়ামত দান করেছেন।

১. খাবার এবং পানীয় বস্তু; ২. গরম এবং শীতের পোশাক; ৩. বসবাসের জন্য গৃহ; ৪. সেবার জন্য স্ত্রী ও সেবক ইত্যাদি; ৫. ভ্রমণের জন্য আরোহী। জীবনের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ-কলেমায়ে তাযোবা, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ -এর স্বীকৃতি দেওয়া। উক্ত পাঁচটি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে, যাতে একেক নামাজের দ্বারা একটি বড় নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা যায়।

(৩) মানুষের পূর্ণ জীবন পাঁচ অবস্থায় অতিবাহিত হয়-১. শায়িত অবস্থায়, ২. বসা অবস্থায়, ৩. দাঁড়ান অবস্থায়, ৪. নিন্দ্রা অবস্থায়, ৫. জাগ্রত অবস্থায়। উক্ত পাঁচ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার ওপর অগণিত রহমত এবং নিয়ামত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়ে থাকে যা গণনা করা অসম্ভব, মহান আল্লাহ উক্ত পাঁচ অবস্থার সমূহ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ল সে উক্ত সময়ে আল্লাহর প্রত্যেক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

(৪) পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পরে মানুষের ওপর পাঁচটি বিপদ আসে, ১. মৃত্যু, ২. কবর, ৩. পুলসিরাত, ৪. আমলনামা বাম হাতে পাওয়া, ৫. জান্নাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। মহান দয়ালু আল্লাহ ঐ পাঁচটি বিপদ দূর করার নিমিত্তে এ পাঁচ নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (র.) বলেছেন,  
 مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَخْمِسُ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيِّقَ الْمَوْتِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيَهُ اللَّهُ كِتَابَهُ يَمِينُهُ وَيُزِيلُ عَلَى الصُّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ- যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে, মহান আল্লাহ তাকে পাঁচটি পুরস্কার দিবেন- ১. তাকে মৃত্যুর কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, ২. কবরের সংকীর্ণতা এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, ৩. আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করবেন, ৪. বিজলির ন্যায় পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, ৫. বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## بَابُ الْمَوَاقِيتِ

أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَفْقِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جَدًّا وَكَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَثَقُّ لَكَ وَلَا مَتِّكَ وَلَا مُعْتَبَرٍ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طَوَّلًا ثُمَّ يَعْقِبُهُ الظَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَغْرُتُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ أَى الْمُنْتَشِرُ فِيهَا .

### প্রথম পরিচ্ছেদ : নামাজের সময়সমূহ

অনুবাদ : ফজরের নামাজের ওয়াক্তের সূচনা হয়, যখন ভোরের দ্বিতীয় আলো উদিত হয়, দ্বিতীয় আলো বলতে ঐ আলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ত হলো, সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। কেননা হযরত জিব্রীল (আ.)-এর ইমামতি সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম দিন ফজরের নামাজে রাসূল ﷺ-এর ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন, যখন আলো উদিত হয়, এবং দ্বিতীয় দিন (নামাজ আদায় করেন) যখন খুব ফরসা হয়ে গেল, এমনকি সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হলো। হাদীসের শেষে রয়েছে, হযরত জিব্রীল (আ.) বলেন, “এ দু’সময়ের মধ্যবর্তী সময়টি হলো আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য সময়”। ফজরে কাযিব (فجر كاذب) ধর্তব্য নয়, ফজরুল কাযিব হচ্ছে লম্বা-লম্বিতে উদ্ভাসিত আলো, এর পর অন্ধকার থেকে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “বিলালের আযান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, তদ্রূপ লম্বালম্বি আলো (যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে)। দিগন্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলোই হলো ফজরের সময়।”

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) বা কারণ। আর সবব মুসাব্বাব (مسبب) -এর ওপর مقدم হয়। এ কারণে নামাজের ওয়াক্তের বর্ণনা পূর্বে আনা হয়েছে। মাওয়াকীত (مواقيت) শব্দটি মীকাত (ميكات) -এর বহুবচন। মীকাত ঐ সময় বা স্থানকে বলে যার দ্বারা কোনো জিনিসের সীমানা নির্ধারণ করা হয় যেমন মাওয়াকীতে সালাত (مواقيت صلوة) এবং মাওয়াকীতে ইহরাম (مواقيت احرام)।

ব্যাখ্যা : হাদীস শরীফে যদিও জোহরের নামাজের সময় আগে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখানে ফজরের নামাজের সময় আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ : ফজরের প্রথম এবং শেষ ওয়াক্তের ক্ষেত্রে সকল ইমাম একমত বিধায় একে প্রথমে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

দ্বিতীয় কারণ : সর্ব প্রথম ফজরের নামাজ দুনিয়ার প্রথম মানুষ-হযরত আদাম (আ.) পড়েছেন। যেহেতু ফজরের নামাজ, প্রথম নামাজ এ জন্য আলোচনার মধ্যে তাকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।





أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ  
 حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ  
 يَسُوَّى فِي الزَّوَالِ وَقَالَ إِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِي  
 الزَّوَالِ هُوَ الْفَنَى الَّذِي يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ وَقَتَ الزَّوَالِ لَهُمَا إِمَامَةُ جِبْرِيلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ  
 لِلْعَصْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَا يَبْقَى حَنِيفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ  
 شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْجٍ جَهَنَّمَ وَأَشَدُّ الْحَرِّ فِي دِيَارِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَنْوَارُ  
 لَا يَنْقُضِي الْوَقْتُ بِالشَّكِّ -

অনুবাদ : জোহরের নামাজের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হলে পড়ে। কেননা হযরত জিব্রাইল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হলে পড়ার পর ইমামতি করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জোহরের শেষ সময় হলো যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। ইহাও ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণিত একটি মত। **فِي الزَّوَالِ** (মধ্যাহ্ন ছায়া) হলো ঠিক মধ্যাহ্ন কালে কোনো বস্তুর যে ছায়া হয় তাই। সাহেবাইনের দলিল হলো, হযরত জিব্রাইল (আ.) প্রথম দিন এ সময় আসরের ইমামতি করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো রাসূল ﷺ বলেছেন— জোহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো। কেননা গরমের প্রগুণতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকে আসে। আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার) এ সময়টাতেই গরম তীব্রতম হয়। সুতরাং হাদীস যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো, তাই সন্দেহ বশতঃ সময় শেষ হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনায়্যা প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে শুজা (র.)-এর বরাতে **زوال** **فِي** বা মধ্যাহ্ন ছায়া অবগত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন—প্রথমে জমিনকে এমন সমতল করতে হবে, যেন একচুল পরিমাণও উঁচু নিচু না থাকে। অতঃপর সেখানে একটি লাকড়ী স্থাপন করে যে পর্যন্ত এর ছায়া পৌঁছে সেখানে একটি চিহ্ন দিতে হবে, যেখান থেকে ছায়া কমবে একে **زوال** -এর পূর্বের সময় জ্ঞান করতে হবে, যখন এ লাকড়ীর ছায়া স্থির হবে অর্থাৎ কমবেও না বাড়বেও না তখন ঐ সময়কে **استرا** (বরাবর) এবং **نِصْفُ النَّهَارِ** (দিনের মধ্য ভাগ) ধরা হবে। মোট কথা ঐ সময় যে ছায়া হয় উহাকে **زوال** **فِي** (মধ্যাহ্ন ছায়া) বা মূল ছায়া বলা হয় এবং যখন ছায়া বড় হতে থাকবে, তখন মনে করতে হবে যে, সূর্য হলে গিয়েছে এবং জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়েছে।

মোটকথা জোহরের প্রথম সময় সূর্য হলে যাবার পর থেকে আরম্ভ হয়, এর দলিল হলো— হযরত জিব্রাইল (আ.) প্রথম দিন জোহরের নামাজ ঐ সময়ই (পূর্বেক্ত সময়ই) পড়িয়েছেন। জোহরের শেষ সময়ে হানাকী আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে এ ব্যাপারে তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, প্রথম রেওয়ায়েত ইমাম মুহাম্মদ (র.) আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, মূল ছায়া বা মধ্যাহ্নকালের ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়, তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হবে। এটিই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহহাব।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত, হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় এবং আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়। সাহেবাইন, ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মাহহাব এরূপই।

তৃতীয় রেওয়াজে আসাদ ইবনে ওমর এবং আলী ইবনে জাদ ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন প্রত্যেক বন্ধুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় মূল ছায়া ব্যতীত। তখন জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। তবে আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় না; বরং আসরের নামাজের সময় ঐ সময় আরম্ভ হবে যখন মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বন্ধুর ছায়া দ্বিগুণ হবে। এই রেওয়াজেদের ভিত্তিতে জোহর এবং আসরের মধ্যখানে বেকার সময় (وَقْتٌ مُهْلٌ) বিদ্যমান থাকছে। যেমন ফজর এবং জোহরের মধ্যখানে বেকার সময় আছে।— (ইনয়া)

এখানে ইমাম কুদুরী (র.)-এর ইবারতে সামান্য ক্রটি আছে। তা হচ্ছে নিম্নরূপ— ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট জোহরের শেষ সময় হচ্ছে ঐ সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হয় এবং সাহেবাইনের মতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সময়ে জোহরের সময় শেষই হয়ে যায়। অতএব তাকে আখিরী ওয়াক্ত বা শেষ সময় বলার কোনো মর্ম হতে পারে না।

উত্তর : আখির (শেষ) সময় দ্বারা মুরাদ ঐ সময় যখন জোহরের সময় শেষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে— জিবরাঈল প্রথম দিন আসরের নামাজ এ সময় পড়িয়েছেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐ সময় আসরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় এবং জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস: **أَبْرَدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شَيْئًا يَسِيرُ** অর্থ— জোহরের নামাজ শীতল করে পড়ো কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসে। এ হাদীস দ্বারা দলিল এ ভাবে হবে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ শীতল সময়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আরব দেশের শহরগুলোতে সূর্যের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার সময় প্রচণ্ডগরম বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, রাসূল ﷺ সূর্যের ছায়া এক মিছিল (পরিমাণ) হওয়ার পর জোহরের নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যখন এক মিছিলের পর জোহরের সময় বিদ্যমান থাকে তাহলে এক মিছিলের পর আসরের সময় কিভাবে আরম্ভ হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) জিবরাঈল কর্তৃক ইমামত সম্পর্কিত হাদীসের জবাব এভাবে দিয়েছেন, নামাজের সময়ের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রথম দিকের, আর উক্ত হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ সব হাদীস পরের দিকের। প্রকাশ থাকে যে, পরের হাদীস আগের হাদীসের জন্য নাসিখ বা রহিতকারী হিসাবে গণ্য হয়। অতএব বুঝা গেল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক বর্ণিত ইমামত সম্পর্কিত হাদীসটি মনসূখ বা রহিত। অতএব ঐ হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না।

‘হিদায়া প্রণেতা এভাবে এর জবাব দিয়েছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত হাদীস এবং জোহরের নামাজ শীতল করে পড়, উক্ত হাদীসদ্বয়ের মাঝে বিরোধ। কেননা জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, এক মিছিলের সময় জোহরের সময় শেষ হয়ে যায় আর “জোহরের নামাজ শীতল করে পড়” এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে এক মিছিলের সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় না; বরং সময় বিদ্যমান থাকে। মোট কথা এক মিছিলের সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত। অথচ ছায়া এক মিছিল হওয়ার পূর্বে জোহরের সময় বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত। সর্বজনমান্য মূলনীতি হলো, যে জিনিস প্রত্যয়ের সাথে সুপ্রমাণিত তা সন্দেহের দ্বারা বিলীন হয়ে যাবে না। যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের ছায়া এক মিছিল হওয়ার সময় জোহরের নামাজের সময় শেষ হওয়াটা সন্দেহযুক্ত অতএব জোহরের সময় শেষ হবে না।

**ফায়দা :** আসরের নামাজ সর্ব প্রথম হযরত ইউনুস (আ.) পড়েছেন, যখন আল্লাহ তাঁকে চারটি অঙ্কার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ১. ডুলাহকের অঙ্কার, ২. রাতেজের অঙ্কার, ৩. পানির অঙ্কার, ৪. মাছের পেটের অঙ্কার। হযরত ইউনুস (আ.) চার রাকআত নামাজ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নফল হিসাবে আদায় করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ উক্ত চার রাকআত নামাজ এ উচ্চতর ওপর ফরজ করে দিয়েছেন।

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا حَرَجَ وَقْتُ الظَّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .

অনুবাদ : আসরের প্রথম ওয়াক্ত যখন উভয় মতানুযায়ী যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর আশরের শেষ ওয়াক্ত যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকআত পায় সে তা (আসর) পেল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসরের প্রথম ওয়াক্ত জুহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়। চাই জুহরের ওয়াক্ত দুই মিল (দ্বিগুণ) -এর উপর শেষ হয়। যা ইমাম সাহেবের মায়হাব। কিংবা এক মিল (একগুণ) এর উপর শেষ হয়। যা সাহেবাইন (র.)-এর মায়হাব। আর আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

দলিল হল, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে সকালের এক রাকআত পেল, সে তা পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল, সে তা পেল। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, আসরের সময় সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন যে, আসরের সময় সূর্য হলে বর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। এরপর আর থাকে না। তার দলিল হল আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আসরের ওয়াক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না সূর্য হলে বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জওয়াব হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে মধ্যে মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা বর্ণিত হয়েছে। জায়েজ ওয়াক্তের কথা বর্ণনা করা হয়নি। তাই এই হাদীসের সাথে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংঘাত হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পেল অতঃপর সালাম ফিরাবার পূর্বে ওয়াক্ত চলে গেল তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। এর উপর সকলে একমত। আর যদি সকালের নামাজে এক রাকআতের পর সূর্য বেরিয়ে আসে তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর কাযা আদায় করবে। ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নামাজ বাতিল হবে না। বরং ঐ নামাজ-ই পূর্ণ করবে। তাদের দলিল উপরে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জওয়াব শায়খুল আদব (র.) এভাবে দিয়েছেন যে, فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ -এর অর্থ হল অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নামাজের আহাল ছিল না। পরে এমন সময় নামাজের আহাল হল যে, যখন মাত্র এক রাকআতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। তবে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে গেছে। যেমন- কাকির মুসলমান হল, শিশু বালিগ হল, হায়িযা স্ত্রীলোক পাক হল, উন্মেষা যে, এক রাকআতের বর্ণনা শুধু বুঝার জন্য। না হয় চাই এক রাকআতের ওয়াক্ত পায় কিংবা এর চেয়ে কম ওয়াক্ত পায় উভয় অবস্থায় তার উপর উক্ত নামাজ অবধারিত হয়ে যাবে।

ফায়দা : আসরের নামাজ সর্ব প্রথম হযরত ইউনুস (আ.) পড়েছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে আসরের সময় চারটি অঙ্কার থেকে নামাজ দিয়েছিলেন। (১) অপরাধের অঙ্কার (২) রাতের অঙ্কার (৩) পানির অঙ্কার (৪) মাছের পেটের অঙ্কার। হযরত ইউনুস (আ.) চার রাকআত নফল নামাজ শুকরিয়া হিসাবে আদায় করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) مَقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ فِي يَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَمَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ الشَّفَقُ هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا هُوَ الْحُمْرَةُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا أَسْوَدَ الْأَفْقُ وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُثْمَرَ (رض) ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِإِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ الصَّحَابَةِ .

অনুবাদ : মাগরিবের প্রথম সময় হলো, যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শাফাক (শفق) অদৃশ্য না হয়। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, তিন রাকআত নামাজ পড়ার পরিমাণ সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিব্রাইল (আ.) দু'দিন এই একই সময়ে মাগরিবের ইমামতি করেছেন। আমাদের দলিল হলো-রাসূল ﷺ বলেছেন, মাগরিবের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো, যখন শাফাক (শفق) অদৃশ্য হয়। ইমাম শাফেঈ (র.) যে হাদীস পেশ করেছেন, তাতে বিলম্ব না করার কারণ হলো মাকরুহ থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শাফাক (শفق) -এর অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো, যা লালিমার পরে দেখা যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে লালিমাটিই হলো শাফাক (শفق)। এরই অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে পাওয়া যায়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর (পূর্ববর্তী) অভিমতও এই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, وَآخِرُ وَقْتِ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ শাফাক হলো দিগন্ত লালিমা। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, وَآخِرُ وَقْتِ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ -এর অর্থ- মাগরিবের শেষ সময় হলো, যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইবনে ওমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এবং এ সম্পর্কে (শাফাক এর অর্থ সম্পর্কে) সাহাবীদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাগরিবের সময় সূর্য ডুবার পর থেকে আরম্ভ হয় এবং শাফাক (শفق) ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে মাগরিবের সময় শুধু এতটুকু, যার মধ্যে তিন রাকআত নামাজ পড়া যায়। এটা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দু'টি মতের একটি। ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন, মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (র.) হতে দু'টি অভিমত বর্ণিত আছে- ১. মাগরিবের সময় শাফাক অন্ত যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও। ২. সূর্য ডুবে যাওয়ার পর অজু, আযান, একামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ পড়ার সময় অতিবাহিত হলে মাগরিবের সময় শেষ হবে।

অর্থাৎ মাগিরিদের নামাজের সময় শুধু এতটুকু যার মধ্যে অজু, আযান, একামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ আদায় করতে পারে। হিলয়া (حلب) নামক গ্রন্থে রয়েছে, মাগিরিদের সময় শুধু এতটুকু যাতে তিন রাকআত নামাজ পড়তে পারে। হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা এটিই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হলো **حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ** অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) মাগরিবের নামাজ দু'দিন একই সময়ে পড়িয়েছেন। অতএব যদি মাগরিবের নামাজের সময় লগ্না হত, যার শুরু এবং শেষ থাকত, তাহলে জিবরাঈল দু'দিন একই সময়ে নামাজ পড়াতেন না। আমাদের দলিল হচ্ছে- হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস **أَنَّ الْمَغْرِبَ جِنِّ السَّحَابِ** অর্থ- মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায় এবং শেষ সময় হচ্ছে যখন শাফাক (شفق) ডুবে যায়। হযরত জিবরাঈল (আ.) উভয় দিন একই সময় নামাজ পড়িয়েছেন, মাকরুহ থেকে বাঁচার জন্য, কেননা মাগরিবকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরুহ।

প্রকাশ থাকে যে, শাফাক এর সীমা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে শাফাক এ আলোকে বলে যা লালিমার পরে দিগন্তে বিস্তৃত হয়। এরূপ মত আবু বকর সিদ্দীক (র.), মুয়ায (রা.), আনাস (রা.), ইবনু যু'বাইর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। সাহেবাইনের মতে শাফাক লালিমাকে বলে, এরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (রা.) থেকে নকল করা হয়েছে। এটাই ইমাম শাফেঈ (র.) -এর অভিমত।

সাহেবাইনের দলিল- রাসূল ﷺ-এর বাণী শাফক (شفق) লালিমাকে বলে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল  
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفُقُ.

অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন, মাগরিবের শেষ সময় যখন দিগন্ত কালো হয়। প্রকাশ থাকে যে, দিগন্তে আলোর পরই অন্ধকার আসে, অতএব প্রমাণ হলো যে দিগন্তে আলো বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের সময় থাকবে। হাদীসে শাফাক দ্বারা আলোই উদ্দেশ্য **حِدْثُ الشَّفَقِ الْحُمْرِ** অর্থ- শাফাক হচ্ছে লালিমা। ইহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর ওপর মওকুফ (موقوف), এ কথা ইমাম মালিক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মওকুফ হাদীস প্রমাণ্য দলিল নয় বিধায় উক্ত হাদীসটি দলিল হওয়ার যোগ্য হবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত হাদীসটি মারফু' (مرفوع) তাহলে আমরা জবাব দেব যে, ঐ হাদীসের মর্মের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো সাহাবীদের মতে শাফাক-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আলো। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবীদের মতে শাফাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালিমা। যদি মারফু' হাদীসের মধ্যে সাহাবীদের মতানৈক্য থাকে তাহলে তা দলিল হওয়ার যোগ্য থাকে না।

ফায়দা : হযরত ইসা (আ.) সর্ব প্রথম মাগরিবের নামাজ পড়েছেন-মহান আল্লাহ যখন তাঁকে সন্ধানন করে বললেন— اَنْتَ كُنْتَ لِثَلَاثٍ اَتَّخَذْنٰنِيْ وَاَمْرِي الْهُيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ— তুমি কি লোকদেরকে বলেছ যে, তোমরা আমাকে এবং আমার মাকে মাদুদ হিসাবে গ্রহণ করো আল্লাহ ব্যতীত।— (৫-মায়িদা-১২৬) তিনি এ নামাজ সূর্য অস্ত যাবার পর পড়েছিলেন, প্রথম রাকআত নিজের অস্তিত্ব থেকে উল্লেখিয়াত (الرُّوْحِيَّة)-মাবুদ হওয়া কে নিষেধ করার জন্য ছিল। দ্বিতীয় রাকআত নিজের মাতা থেকে উল্লেখিয়াত (الرُّوْحِيَّة)-মাবুদ হওয়া নিষেধ করার জন্য ছিল। তৃতীয় রাকআত আল্লাহর জন্য উল্লেখিয়াত (الرُّوْحِيَّة) সাবিত করার জন্য ছিল।

وَأَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَآخِرَ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ وَآخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي  
 تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ. وَأَوَّلَ وَقْتِ الْوُتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ  
 لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوُتْرِ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ (رض)  
 هَذَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقْتُهُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ عِنْدَ  
 التَّذَكُّيرِ لِلتَّرْتِيبِ -

অনুবাদ : ইশার প্রথম সময় হলো যখন শাফাক (শفق) অদৃশ্য হয় এবং এর শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত  
 ফজর বা সুবহি সাদিক উদয় না হয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন- ইশার শেষ সময় হলো যতক্ষণ ফজর উদয় না  
 হয়। রাতের তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা ইশার সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর  
 বিপক্ষে দলিল। বিতরের প্রথম সময় হলো ইশার পরে এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক উদয়  
 না হয়। কেননা রাসূল ﷺ বিতর সম্পর্কে বলেছেন, “ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা (বিতর) আদায়  
 করে।” হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এটা সাহেবাইনের মত। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইশার সময়ই  
 হচ্ছে বিতরের সময়। তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে স্মরণ থাকা অবস্থায় বিতরকে ইশার আগে  
 আদায় করা যাবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইশার প্রথম সময় শাফাক অন্ত যাওয়ার পর হতে আরম্ভ হয় এবং এর শেষ সময় হলো, যতক্ষণ না সুবহি সাদিক উদিত  
 হয়। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- ইশার শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক না হয়। ইমাম শাফেঈ (র.)  
 বলেছেন- রাতের তৃতীয়াংশ অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত ইশার সময় বিদ্যমান থাকে।

আমাদের দলিল হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস,

أَنَّكَ قَالَ وَآخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

অর্থ- রাসূল ﷺ বলেছেন- ইশার শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক উদয় না হয়।

এ হাদীস ইশার সময় সুবহি সাদিক পর্যন্ত বিদ্যমান থাকার প্রমাণ বহন করে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হচ্ছে-  
 জিব্রাঈলের ইমামত সম্পর্কিত হাদীস, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার শেষ সময় রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। আমাদের পক্ষ  
 হতে তার জবাব জোহরের সময়ের বিবরণে প্রদান করা হয়েছে। সেখানে দেখুন।

ফায়দা : ইশার নামাজ সর্ব প্রথম হযরত মুসা (আ.) পড়েছেন। — (ইনশাআ)

ং : বিতরের প্রথম সময় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সাহেবাইনের মতে ইশার  
 নামাজের পর থেকে বিতরের সময় আরম্ভ হয় এবং সুবহি সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র.)  
 -এর মতে ইশার নামাজের সময়ই বিতরের সময়।

সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে- ঋরিজা ইবন হযাফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস,

فَإِذَا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصَابَ بِصَلَاةٍ مِنْ خَيْرِ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعِيمِ وَهِيَ الْوَرَقُ نَجَعَلَهَا لَكُمْ نَيْمًا بَيْنَ الْبُعْثَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

অর্থ : হযরত ঋরিজা ইবনে হযাফা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি নামাজ বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উষ্ট্রী হতে উত্তম। আর তা হচ্ছে বিতরের নামাজ, অতঃপর তিনি একে 'ইশা এবং সুব্হি সাদিক এর মাঝে রাখেন।— (ফত্বুল কাদির)

হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

অর্থ : ইশা এবং সুব্হি সাদিক-এর মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো বিতর আমলের দিক থেকে ফরজ। যদি সময় দু'ওয়াজিব নামাজকে একত্রিত করতে পারে তাহলে দু' নামাজের জন্য একই সময় হবে যেমন কাজা নামাজ এবং ওয়াজিয়া নামাজ। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর কথার উপর প্রশ্ন হবে যে, যদি দু' নামাজের একই সময় হয় তাহলে বিতরের নামাজ 'ইশার আগে পড়া জায়েজ হওয়া চাই। অথচ তা জায়েজ নেই।

উত্তর : স্বরণ থাকা অবস্থায় বিতর 'ইশার আগে পড়া এ জন্য জায়েজ নেই যে, 'ইশা এবং বিতরের নামাজের মধ্যে তরতীব ওয়াজিব। অতএব যদি কেউ 'ইশার নামাজের পূর্বে বিতরের নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বিতরের নামাজ পুনরায় পড়া আবশ্যিক। পক্ষান্তরে যদি 'ইশার নামাজ ভুলে যায় এবং বিতরের নামাজ পড়ে অতঃপর 'ইশার নামাজ স্বরণ হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিতরের নামাজ পুনরায় পড়বে না। ভুলে যাওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়।

তবে সাহেবাইনের মতে বিতরের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কেননা সাহেবাইনের মতে বিতরের নামাজ 'ইশার নামাজের সুন্নত। যেমন-'ইশার পরে অন্য দু'রাকআত সুন্নত আছে। যদি ঐ দু'রাকআত সুন্নত 'ইশার নামাজের পূর্বে পড়ে তাহলে তা জায়েজ নেই। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুক বা ভুলে পড়ুক অনুরূপ ভাবে বিতরের নামাজকে 'ইশার পূর্বে পড়া জায়েজ নেই; চাই ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ুক বা ভুলক্রমে পড়ুক।

فَضْلٌ : وَسُتَحَبَّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْفُرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحه) يُسْتَحَبُّ التَّعْجِيلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا تَرَوْنَاهُ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقْدِيمُهُ فِي الشِّتَاءِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِرِوَايَةِ أَنَسٍ (رضه) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبَدَّ بِهَا وَتَأَخَّرَ الْعَصْرَ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ التَّوَائِلِ لِكِرَاهَتِهَا بَعْدَهُ وَالْمُعْتَبَرُ تَغْيِيرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الْأَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ وَالتَّأَخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ .

### অনুচ্ছেদ ৪ নামাজের মোস্তাহাব সময়

অনুবাদ : ফজরের নামাজ ফরসা হওয়ার পরে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের নামাজ ফরসা হয়ে যাওয়ার পর আদায় করবে। কেননা, এতেই রয়েছে অধিক ছওয়াব। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। আমাদের বর্ণিত এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল, এবং পরবর্তী আসন্ন হাদীসটিও তার বিপক্ষে দলিল। গ্রীষ্ম কালে জোহরের সালাত সূর্যের তাপ কমে আসলে এবং শীতকালে প্রথম সময়ে আদায় মোস্তাহাব। প্রমাণ ইতিপূর্বে যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি এবং হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যে, রাসূল ﷺ শীতকালে জোহর অবিলম্বে আদায় করতেন এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কমে আসলে আদায় করতেন। শীত গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে সূর্য বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাজ বিলম্ব করা মোস্তাহাব। যেহেতু আসরের পরে নফল নামাজ মাকরুহ। সুতরাং আসর বিলম্বে পড়লে অধিক নফল আদায়ের অবকাশ পাওয়া যায়। আর ধর্তব্য হলো সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া। অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়া যাতে চোখ না ধাঁধায়। এটাই বিতুদ্ধ অভিমত। এ (বিবরণ) পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরুহ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে নামাজের মতলক বা সাধারণ সময়ের বিবরণ ছিল, এখন নামাজের উত্তম সময় এবং ক্রটিযুক্ত সময়ের আলোচনা হবে। উভয়টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নামাজের উত্তম সময় বা মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামাজের ক্রটিযুক্ত (মকরুহ) সময়ের বর্ণনা করেছেন।

আহনাফ (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ ফরসা করে পড়া মোস্তাহাব। ফরসা হওয়ার সীমা হলো যে, সকালের আলো (ফরসা) বিস্তৃত হবার পর সুনত তরীকায় কিরাত আরম্ভ করবে অতঃপর যদি কারো কোনো কারণ বশত আবার অজু করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুনঃ অজু করে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে নামাজ সুনত কেরাতের মাধ্যমে পড়া সম্ভব হয়। সারকথা হলো ফরসার মধ্যে নামাজ আরম্ভ করা হবে এবং ফরসার মধ্যেই নামাজ শেষ করা হবে। তাহলে মোস্তাহাবের ওপর আমল হবে। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে মোস্তাহাব হলো যে, নামাজ অন্ধকারে আরম্ভ করবে এবং ফরসার মধ্যে শেষ করবে, মোটকথা দীর্ঘ কেরাত দ্বারা অন্ধকার এবং ফরসাকে সমন্বয় করবে। ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ফজর অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব-অবিলম্বের সীমা হলো যে, ফজরের সময়ের প্রথমার্ধে নামাজ আদায় করবে। ইমাম শাফেঈ হযরত আয়েশা (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ প্রদান করেন,

قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَعَجِّبَاتٍ بِمُرُورِ طَيْفٍ مَا يَبْرَحْنَ مِنَ الْغُلَسِ (بخاری ومسلم)



অর্থ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ পড়ে ফারিগ হতেন। তখন মহিলাগণ খীয় উরনীতে পেঁচানো অবস্থায় (নিজ গৃহে) প্রত্যাবর্তন করতেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চিনা যেতো না; এ হাদীসের দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ অন্ধকারে নামাজ পড়ে ফারিগ হতেন। দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর বাণী **عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ وَرِثَانِهِ** অর্থ- প্রথম সময়টি আত্মাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময়টি তাঁর মার্জনার সময়। **عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ وَرِثَانِهِ** অর্থ- কোন আমল আত্মাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। রাসূল ﷺ উত্তর দিয়েছেন **الْصَّلَاةُ لِوَلَدِهَا** অর্থ-প্রথম সময়ে নামাজ আদায় করা।

হানাফী ফকীহদের দলিল-হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রা.)-এর হাদীস **أَشْفَرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلَّاحِظِ** অর্থ- ফজর ফরসা করে পড়ো। কেননা তাতে অধিক ছওয়াব রয়েছে। এ হাদীস থেকে এভাবে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে যে, এখানে **أَشْفَرُوا** বা ফরসা করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমর (امر)-এর ন্যূনতম স্তর হলো মোস্তাহাব। এ জন্য বলা হয়েছে যে, ফজরের নামাজ ইসফারে (إسفار) পড়া মোস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি **فَعَلَى** পক্ষান্তরে **أَشْفَرُوا بِالْفَجْرِ** হাদীসটি **فَوَلَّى** যখন ও **فَعَلَى**-এর মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তখন **فَوَلَّى** হাদীস প্রাধান্য পায়, **فَعَلَى** হাদীস প্রাধান্য পায় না।

গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ শীতল করে পড়া এবং শীতকালে অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। তাঁর দলিল পূর্বোক্ত হাদীসটি অর্থাৎ **بِالظَّهِرِ** হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও দলিল, বুখারী শরীফে পূর্ণ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খালিদ ইবনে দীনার বলেন, আমাদের আমীর আমাদের জুমার নামাজ পড়িয়েছেন অতঃপর হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন-

**كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الظُّهْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَرَدَ بِالصَّلَاةِ**

অর্থ ঃ রাসূল ﷺ কিতাবে জোহরের নামাজ পড়তেন, তিনি [আনাস (রা.)] বললেন, যখন প্রচণ্ড শীত হয় তখন জোহরের নামাজ অবিলম্বে পড়েন। আর যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে তখন (জোহরের নামাজ) শীতল করে পড়েন।

আসরের নামাজ প্রত্যেক মৌসুমে বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো, সূর্য যেন বিবর্ণ না হয়। এটার দলিল এই যে, আসর বিলম্ব করার দ্বারা অধিক নফল পড়ার অবকাশ থাকে। কেননা আসরের পরে নফল পড়া মাকরুহ। অতএব আসরের নামাজ বিলম্ব করে পড়া হবে। যাতে আসরের পূর্বে বেশি করে নফল পড়ার অবকাশ থাকে। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে আসর অবিলম্বে পড়া উত্তম, দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস,

**إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي الْمَصْرَ فَيَذْبُ الذَّاهِبِ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ**

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রাসূল ﷺ আসরের নামাজ পড়তেন এবং পথিক মদীনার আওয়ালী (عوالي)-এর দিকে চলে যেতেন এবং ঐ সময় সূর্য উচ্চত থাকতো। ইহা ঐ সময়ই সম্ভব যখন আসর অবিলম্বে আদায় করা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের জবাবে আহমাদেফের পক্ষ থেকে বলা হয়,

আওয়ালী (عوالي) মদীনা থেকে দু' তিন মাইল পরিমাণ দূরে অবস্থিত। মাইল দ্বারা ঐ মাইলকে বুঝানো হয়েছে যা তায়ামুম (تيمم)-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তা তেমন বেশি দূর নয়। এবং আসরের নামাজ বিলম্ব করে পড়ার পরও ঐ পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব। অতএব এ হাদীসটি আমাদের বিপক্ষে দলিল হবে না।

হিন্দীয়া প্রণেতা বলেছেন, সূর্য বিবর্ণ হওয়ার দ্বারা সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া গড়ব্য। তা হচ্ছে- সূর্য এমন অবস্থায় পৌছা যে, এর প্রতি যদি কেউ নজর করে তবে এতে তার চোখে ঝাঁঝবোনা; বরং তার উপর দৃষ্টি স্থির থাকবে এবং টোটে বিস্তৃত অভিমত।

ইব্রাহীম নাখঈ (র.) বলেন যে, সূর্য বিবর্ণ হওয়া দ্বারা তার আলো বিবর্ণ হওয়া, যা প্রাচীরের উপর পড়ে। এ মতটি বিস্তৃত নয়। কেননা সূর্যের আলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে বিবর্ণ হওয়া আরম্ভ করে। ইনাদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা লিখেছেন যে, সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া এই যে, সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ থেকে কম হবে। পক্ষান্তরে যদি এক বর্ষা পরিমাণ হয়, তাহলে গোলাকৃতি বিবর্ণটি হয়নি বলে মনে করতে হবে। হিন্দীয়া প্রণেতার মতে সূর্যের আলো বিবর্ণ হওয়া পর্যন্ত নামাজ বিলম্ব করা মাকরুহ, এর পূর্বে আদায় করা মোস্তাহাব।

وَسْتَخَبْتُ تَعْجِيلَ الْمَغْرِبِ لِأَنْ تَأْخِيزَهَا مَكْرُوهٌ لِّمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنَّهْرِ  
 وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزَالُ أُمْتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَآخَرُوا الْعِشَاءَ وَتَأْخِيزُ  
 الْعِشَاءَ إِلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمْتِي لَأَخَّرْتُ  
 الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَإِنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمْرِ الْمَنْهِي عَنْهُ بَعْدَهُ وَقِيلَ فِي الضَّيْفِ  
 تُعَجَّلُ كَيْلًا تَتَقَلَّلُ الْجَمَاعَةُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ لِأَنَّ دَلِيلَ الْكَرَاهَةِ  
 وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَارِضٌ دَلِيلُ النَّدْبِ وَهُوَ قَطْعُ السَّمْرِ بِوَاحِدٍ فَيَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ  
 إِلَى النِّصْفِ وَإِلَى النِّصْفِ الْآخِرِ مَكْرُوهٌ لِّمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ  
 السَّمَرُ قَبْلَهُ وَاسْتَخَبْتُ فِي الرُّتْرِ لِمَنْ يَأْتِ صَلَوةَ اللَّيْلِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَثِقْ  
 بِالِاتِّبَاءِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ  
 أَوَّلَهُ وَمَنْ طِمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ غَيْمٌ فَالْمُسْتَحَبُّ  
 فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهَا لِأَنَّ فِي  
 تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى إِعْتِبَارِ الْمَطَرِ وَفِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوْهُمُ  
 الْوُقُوعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وَلَا تَوْهُمُ فِي الْفَجْرِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مَدِيدَةٌ وَعَنْ أَبِي  
 حَنِيفَةَ (رح) أَلْتَأْخِيرُ فِي الْكُلِّ لِإِحْتِبَاطِ الْأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَدَاءُ بَعْدَ  
 الْوَقْتِ لَا قَبْلَهُ .

অনুবাদ : মাগরিবের নামাজ প্রথম সময়ে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা বিলম্বে পড়লে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় উহা মাকরুহ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে আদায় করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে। ইশাকে রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি ইশার নামাজ রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। তা ছাড়া তা ইশার পরে হাদীসে নিষিদ্ধ আলাপ করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারা মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বেধ। কেননা মাকরুহ হওয়ার দলিল হলো জামাত ছোট হওয়া এবং মোস্তাহাব হওয়ার দলিল

হলো-আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত মাকরুহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জামাত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তাহাজ্জদের নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য বিতরের ক্ষেত্রে রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি জাহ্রত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ঘুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, শেষ রাতে জাহ্রত হতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথম দিকে বিতর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাহ্রত হওয়ার আশা করে সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। মেঘলা দিন হলে ফজর জোহর এবং মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও ইশা অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে ইশা বিলম্ব করায় জামাত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মাকরুহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা ফজরের সময় দীর্ঘ। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল নামাজে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অতিক্রম হওয়ার পরে (কাজা হলেও) নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে সময়ের আগে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رُسْتُعَبِّ تَعَجِّلُ الْمَغْرِبِ الخ : মাগরিবের নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব অর্থাৎ আযান এবং ইকামতের মাঝে কোনো ব্যবধান করবে না, শুধু হালকা বৈঠক বা সামান্য বিরত থাকা ব্যতীত। কেননা ইহুদিরা মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করে পড়ে। দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস- لَا يَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ -

অর্থ : আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে পড়বে ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

ব্যাখ্যা : ইশার নামাজ রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। শরহে নিকায় (شرح نكايه)-এর মধ্যে আছে যে, তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস- لَوْلَا أَنِ اسْتُعْ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ - অর্থ- যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি ইশার সালাত রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। দ্বিতীয় দলিল হলো যে, ইশার নামাজের পর শরিয়তের দৃষ্টিতে আলাপচারিতা নিষিদ্ধ। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَسَمَرٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ - অর্থ- ইশার পর আলাপচারিতা নেই।

তৃতীয় দলিল, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرِهُ التَّوَمُّ قَبْلَهَا وَالْعِدْبَتِ بَعْدَهَا - অর্থ- রাসূল ﷺ ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পরে আলাপচারিতাকে অপসন্দ করতেন। মোট কথা ইশার পর আলাপচারিতা, গল্প করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইশার নামাজ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করার দ্বারা আলাপচারিতার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা যখন বিলম্বে নামাজ পড়বে তখন ইশার পর পরই ঘুমানোর চিন্তা করবে, গল্পওজবে নয়। এ জন্য রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে গ্রীষ্মকালে ইশার নামাজ অবিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। কেননা গ্রীষ্মকালে ইশার নামাজ বিলম্ব করলে জামাতে লোক কম হবে। এর কারণ হচ্ছে যে, গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হয় এবং মানুষ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

হিদায়া প্রণেতা বলেছেন, ইশার নামাজ অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ আছে। দলিল এই যে, বিলম্বের কারণে জামাতে লোক কম হলে মাকরুহ হবে। অন্য দিকে বিলম্বের কারণে গল্পওজব বন্ধ হওয়ার কারণে মোস্তাহাব হবে। এখানে মুত্তাহাব এর দলিল এবং মাকরুহের দলিলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে উভয়টি রহিত হয়ে বৈধতা সাবিত হবে। শোবার্ধেক পর্যন্ত ইশার নামাজ বিলম্ব করা মাকরুহ। কেননা মাকরুহ-এর দলিল এবং জামাতে লোক কম হওয়া বিদ্যমান। মোত্তাহাবের দলিল এর জন্য মুআরিয (معارض) বা বিপরীত বিষয় নয়। কেননা গল্পওজব পূর্বেই খতম হয়ে গিয়েছে। বিধায় এখানে মোত্তাহাবের দলিল পাওয়া যাচ্ছে না।

حُجَّتِ الْوُجُوهُ فِي الْوُجُوهِ ۝ ৪ মাসআলা যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ-এর নামাজে অভ্যস্ত এবং শেষ রাতে জাম্বুত হওয়ার বিশ্বাস আছে, তার ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হলো বিতরের নামাজ শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া। পক্ষান্তরে যদি শেষ রাতে জাম্বুত হওয়ার বিশ্বাস না থাকে অথবা তাহাজ্জুদ-এর নামাজ পড়ার অভ্যস্ত না হয়, তা হলে সে ব্যক্তি ঘুমের পূর্বেই বিতর পরে নেবে। হিদায়া প্রণেতা রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ- পূর্বে মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা ছিল, যখন সূর্য উদয়ের স্থান পরিষ্কার থাকে। পক্ষান্তরে যদি উদয়ের স্থান পরিষ্কার না থাকে বরং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এমতাবস্থায় ইনায়া প্রণেতা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, الْعَيْنُ مَعَ الْعَيْنِ অর্থাৎ যে নামাজের প্রথম অক্ষরে আইন (عين) আছে যেমন- আসর (عصر) এবং ইশা (عشاء) তাহলে উক্ত নামাজদ্বয়ে নামাজ উজ্জলত (عجلت) বা জলদী পড়তে হবে অর্থাৎ তড়িৎভাবে পড়তে হবে। ঐ দুই নামাজ ব্যতীত অবশিষ্ট নামাজ বিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। মেঘের দিনে ইশার নামাজ অবিলম্বে পড়ার কারণ হচ্ছে যে, এমতাবস্থায় যদি ইশার নামাজ বিলম্ব করা হয় তাহলে জামাতে লোক কম হবে। বৃষ্টির কারণে লোকেরা অলসতা করবে এবং রোহসতের (رخست)-এর উপর আমল করবে। কেননা রাসূল ﷺ বৃষ্টির দিনে আযানের পর ঘোষণা করাতেন لَا صَلَاةَ فِي رَحَالِكُمْ অর্থ- সাবধান নিজ নিজ বাসস্থানে নামাজ পড়ো। আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার কারণ হচ্ছে যে, আসর বিলম্ব করে পড়লে নামাজ মাকরুহ সময়ে আদায় করার সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। কেননা আসরের শেষ সময় মাকরুহ। এ জন্য আসরের নামাজ অবিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে ফজরের নামাজে এ সন্দেহ বিদ্যমান নেই। কেননা ফজরের নামাজের সময় সুবহি সাদিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব ফজরের নামাজ বিলম্ব করা সত্ত্বেও সূর্য উদয় হওয়ার সময় নামাজ আদায় করার সন্দেহ হবে না। এ কারণে মেঘের দিনে ফজরের নামাজ বিলম্বে আদায় করা মোস্তাহাব। জোহর এবং মাগরিব এ জন্য বিলম্ব করা মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে যদি মেঘের দিনে উক্ত নামাজদ্বয় আগেভাগে পড়ে, তাহলে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করার সম্ভাবনা থাকে। আর সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এ কারণে ঐ নামাজদ্বয় বিলম্ব করে পড়া মোস্তাহাব।

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, মেঘের দিনে সকল নামাজ বিলম্ব করে পড়ার মাঝেই সাবধানতা। কেননা আগেভাগে পড়ার মাঝে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে নামাজ বিলম্ব করে পড়লে সময়ের পরে নামাজ আদায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সময়ের পরে নামাজ পড়া জায়েজ আছে, যদিও তা কাজা হয়। পক্ষান্তরে সময়ের পূর্বে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। আদা বা ওয়াক্ফিয়া হিসাবে জায়েজ নেই এবং কাজা হিসাবেও জায়েজ নেই।

فَصَلِّ : فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبِرَ فِيهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبَ وَالْمَرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنْ نَقْبِرَ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الدَّفْنَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَالْحَدِيثُ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي تَخْصِصِ الْفَرَائِضِ بِمَكَّةَ وَحُجَّةٌ عَلَى إِبْنِ يُونُسَ (رح) فِي إِبَاحَةِ النَّفْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ -

### অনুচ্ছেদ ৪ নামাজের মাকরুহ সময়

অনুবাদ : সূর্যদোয়ের সময়, মধ্যাহ্নে সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। দলিল উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামাজ পড়তে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন, সূর্যোদয়কালে সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত, আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। লেখকের বক্তব্য ان نفي و এর দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার নামাজ। কেননা (ইজমা দ্বারা প্রমাণ যে, উক্ত সময়ে) দাফন করা মাকরুহ নয়। আলোচ্য হাদীসটির অর্থ ব্যাপক হওয়ার কারণে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল, ফরজসমূহ মক্কাত্তে খাস বা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষেও দলিল, জুমার দিন মধ্যাহ্নকালে নফল জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যাখ্যা : পূর্বে নামাজের সময়ের দুই প্রকারের মধ্য হতে মোস্তাহাব সময়ের বর্ণনা ছিল। এ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মাকরুহ সময়ের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এখানে كراهت বা মাকরুহ হওয়া ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। মাকরুহ এর সাথে জায়েজ এবং সম্পূর্ণ নাজায়েজ উভয়কে বুঝায়। মোটকথা হচ্ছে আমাদের নিকটে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন কাল ও সূর্যাস্ত কালে ফরজ পড়া জায়েজ নেই নফল পড়া জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, উক্ত সময়গুলোতে সকল শহর এবং সকল স্থানে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ আছে এবং পবিত্র মক্কায় উক্ত সময়গুলোতে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে।— (ইনায়্যা)।

ফতহুল কাদীর প্রণেতা লিখেছেন যে, উক্ত সময়গুলোতে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পবিত্র মক্কায় যে কোনো নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। ফরজ হোক বা নফল হোক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেছেন, জুমার দিনে মধ্যাহ্ন কালে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

অর্থ— রাসূল ﷺ মধ্যাহ্ন কালে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হেলে না পড়ে। তবে হা জুমার দিন এর ব্যতিক্রম। ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল—

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَفَتْهَا .

অর্থ— যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামাজ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে ঐ নামাজ পড়ে নেবে যখন তা স্মরণ হয়। কেননা উহাই তার সময়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সময়গুলোতেও ফরজ পড়া জায়েজ আছে। উক্ত সময়ে পবিত্র মক্কা নফল নামাজ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে হয়রত আবু যর (রা.) -এর নিব্বাতি হাদীসটি দলিল। হয়রত আবু যর (রা.) বলেন, উক্ত সময়ে পবিত্র মক্কা ব্যতীত নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যদ্য রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فَيَأْتِيَ سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .

অর্থ : হে বনি আবদে মানাফ! তোমরা কোনো ব্যক্তিকে এ গৃহে তওয়াফ করতে এবং নামাজ পড়তে বাধা দিও না রাত্রি দিনে যখনই নামাজ পড়তে চায়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র মক্কায় সর্বদা নামাজ পড়া জায়েজ আছে। আমাদের দলিল ওক্বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস -

قَالَ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبِرَ فِيهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتِفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضِيفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَقْرَبَ .

হয়রত ওক্বা ইবনে আমির (রা.) -এর হাদীসে নামাজের দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, ফরজ হোক বা নফল হোক এবং ঝান দ্বারা জানাযার নামাজ উদ্দেশ্য। কেননা ঐ সময়ে মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করা মাকরুহ নয়। এখন মর্ম এই দাঁড়াল যে, রাসূল ﷺ ঐ সময় সাধারণ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন; চাই ফরজ হোক বা নফল হোক এবং জানাযার নামাজ পড়তেও নিষেধ করেছেন। অতএব এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে (আমাদের) দলিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব الْجُمُعَةُ এটা استثناء (অসম গোষ্ঠীয় ব্যত্যয়)। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে يَوْمَ الْجُمُعَةِ -এর অর্থ হবে يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا সূতরাং হাদীসের মর্ম হবে রাসূল ﷺ মধ্যাহ্নকালে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করছে এবং জুমার দিনেরও নামাজ পড়বে না। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বর্ণিত হাদীস مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْخ -এর জবাব-এ হাদীস দ্বারা ঐ তিন সময়ে নামাজ আদায়ের বৈধতা সাবিত হয় এবং ওক্বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস দ্বারা নামাজ পড়া হারাম সাবিত হয়। উসূলে ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, বৈধ এবং অবৈধ (হারাম) একত্রিত হলে অবৈধ প্রাধান্য পায়। এ কারণে এখানে ওক্বা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীসের প্রাধান্য হবে। হয়রত আবু যর (রা.)-এর হাদীসের উত্তর হলো بِمَكَّةَ -এর অর্থ হবে بِمَكَّةَ وَلَا যেমন আদ্বাহর বাণী وَالْأَخْطَا -এর অর্থ وَالْأَخْطَا -এর অর্থ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ অতএব এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হবে না।

قَالَ وَلَا صَلَوةُ جَنَازَةٍ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا سَجْدَةٌ تِلَاوَةٍ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الصَّلَوةِ إِلَّا عَصَرَ  
يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَانِمُ مِنَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلِّ  
أَوْجَبَ آدَاءَ بَعْدَهُ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِي فَالْمُؤَدَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَاضٍ وَإِذَا كَانَ  
كَذَلِكَ فَقَدْ آدَاهَا كَمَا وَجِبَتْ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَواتِ لِأَنَّهَا وَجِبَتْ كَامِلَةً  
فَلَا تَتَدَاوَى بِالنَّاقِصِ قَالَ (رض) وَالْمُرَادُ بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَوةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةُ  
التِّلَاوَةِ الْكَرَاهَةُ حَتَّى لَوْ صَلَّاهَا فِيهِ أَوْ تَلَا سَجْدَةً فِيهِ وَسَجَدَهَا جَازَ لِأَنَّهَا أُؤَيِّتُ  
نَاقِصَةً كَمَا وَجِبَتْ إِذَا لَوْجِبَ بِحُضُورِ الْجَنَازَةِ وَالتِّلَاوَةِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে জানাযার নামাজ জায়েজ হবে না, আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এবং সাজদায়ে তেলাওয়াতও জায়েজ হবে না। কেননা তা নামাজের অংশ বিশেষ। তবে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসর আদায় করা যাবে। নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সبب বা হেতু হচ্ছে সময়ের সেই অংশ যা বিদ্যমান আছে অর্থাৎ নামাজ আরম্ভের পূর্ব মুহূর্ত। কেননা সبب বা হেতুর সম্পর্ক যদি পূর্ণ সময়ের সাথে হয়, তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর সময়ের বিগত অংশের সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে শেষ সময়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি নামাজ কাজাকারী হিসাবে গণ্য হয়। বিষয়টি যখন এমনই হলো, তবে তো তার ওপর যেমন ওয়াজিব হয়েছে, সে তেমনই আদায় করেছে। আর অন্যান্য নামাজ-এর ব্যতিক্রম। কেননা সেগুলো পূর্ণাঙ্গ সময়ে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং অপূর্ণাঙ্গ সময়ে তা আদায় করতে পারে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ এবং তেলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে উল্লিখিত নাজায়েজের অর্থ হলো মাকরুহ হওয়া। সুতরাং যদি কেউ ঐ সময়ে জানাযার নামাজ আদায় করে কিংবা সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতঃ উক্ত তেলাওয়াতের সাজদা আদায় করে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা যেমন নাকিস (نافس) সময়ে তা ওয়াজিব হয়েছে তেমন নাকিস সময়ে তা আদায় করা হয়েছে। কেননা জানাযা উপস্থিত হওয়া এবং তেলাওয়াত করার মাধ্যমে তা ওয়াজিব হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেছেন, উক্ত তিন সময়ে জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করবে না। দলিল পূর্বোক্ত হাদীস অর্থাৎ **ثَلَاثَةٌ أَنْ تَقْرَأَ سُبْحَانَ** এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো যে, সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ, তা এ ভাবে যে, নামাজের মধ্যে যেমন পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি শর্ত অনুরূপভাবে ঐগুলো সিজদায়ে তেলাওয়াতের মধ্যেও শর্ত।

সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ বিধায় তা উক্ত তিন সময়ে নামাজের ন্যায় নিষিদ্ধ হবে। এ মর্মে নবী করীম **ﷺ** বলেছেন, - **ثَلَاثَةٌ أَرْقَابَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصَلِّيَ فِيهَا** - এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে-সিজদায়ে তেলাওয়াত নামাজের অংশ বিশেষ। তবে অই হাসির দ্বারা যেমন অজু এবং নামাজ বাতিল হয় অনুরূপভাবে অইহাসি দ্বারা সিজদায়ে তেলাওয়াতও বাতিল হওয়া চাই। অথচ সিজদায়ে তেলাওয়াত অইহাসি দ্বারা বাতিল হয় না। উত্তর- যে নামাজে অই হাসিকে অজু ভঙ্গের কারণ ধরা হয়েছে, তার দ্বারা তাহরীমা, ককু এবং সিজদা বিশিষ্ট নামাজকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে

সিজদায়ে তেলাওয়াত এমন নয়, বিধায় অটহাসি দ্বারা তা ভাঙ্গে না। উক্ত তিন সময়ে নামাজ পড়তে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে যেন সূর্য উপাসনাকারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য না হয়ে যায়।

শাইখ আবুল হাসান কদুরী (র.) বলেছেন, তিন সময়ে সবধরনের নামাজ পড়া নিষেধ। তবে ঐ দিনের আসরের নামাজ উক্ত হুকুম থেকে ব্যতিক্রম, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েনি। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় ঐ দিনের আসরের নামাজ পড়ে নেবে। তবে অন্য কোনো নামাজ বা অন্য দিনের আসরের নামাজ ঐ সময় পড়া জায়েজ নেই। দলিলের পূর্বে কতিপয় জিনিস আশ্রয় করতে হবে।

(১) সময় নামাজ ওয়াজিব হওয়ার কারণ। (২) সবব (سبب) বা কারণ মুসাব্বাব (مسبب) হতে পূর্বে হয়। (৩) সবব যেমন হবে মুসাব্বাবও তেমন হবে। অর্থাৎ সবব যদি কামিল (كامل) হয়, তাহলে মুসাব্বাবও কামিল ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সবব যদি নাকিস (ناقص) বা অসম্পূর্ণ হয় তাহলে মুসাব্বাবও নাকিস ওয়াজিব হবে। (৪) নামাজ যদি কামিলভাবে ওয়াজিব হয়, তাহলেতো কামিলভাবে আদায় করা জরুরি। পক্ষান্তরে যদি নামাজ নাকিসভাবে ওয়াজিব হয় তাহলে নাকিসভাবে আদায় করার দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে। দলিলের সারকথা হলো যে, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময় আসরের নামাজ আদায় করে তার সবব (سبب) -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা আছে-এক পূর্ণ সময়কে সবব (سبب) ধরা হবে। দুই ওয়াক্তের অতিবাহিত অংশ সবব। তিন-নামাজ আদায় করার অংশটি সবব (سبب) হবে। প্রথম সম্ভাবনা দু'টি বাতিল, কেননা যদি পূর্ণ সময়কে সবব (سبب) ধরা হয় তাহলে সময় শেষ হওয়ার পর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হওয়া চাই। কেননা মুসাব্বাব (مسبب) টি সবব (سبب) -এর পরে হয়। অথচ নামাজ সময়ের মধ্যে ওয়াজিব হয়। সময়ের পরে হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, পূর্ণ সময় নামাজ ওয়াজিবের সবব (سبب) নয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনা এ জন্য বাতিল যে, যদি ওয়াক্তের অতিবাহিত অংশকে সবব ধরা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি ওয়াক্তের শেষ মুহূর্তে নামাজ পড়বে সে ব্যক্তিকে কাজা নামাজ আদায়কারী হিসাবে জ্ঞান করা উচিত। অথচ তাকে কাজা নামাজ আদায়কারী হিসাবে জ্ঞান করা হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, ওয়াক্তের যে অংশ নামাজ আদায় করেছে তাই নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব। উক্ত মাসআলায় যে অংশ নামাজ আদায় করেছে তা নাকিস সময়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সময় যদি নাকিস হয় তাহলে নামাজ নাকিস হিসাবে ওয়াজিব হবে, যেমন ওয়াজিব হয়েছে এমনই আদায় করেছে। এ ভিত্তিতে আমরা বলেছি যে, ঐ দিনের আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময় পড়া জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে ঐ দিনের আসর ব্যতীত অন্যান্য নামাজ সূর্যাস্তের সময় আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। কেননা ঐ নামাজগুলো পূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে, বিধায় নাকিস সময়ে আদায় হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত যে নিষেধ করা হয়েছে, তার দ্বারা মকরুহ হওয়া বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এ দু'টি আমল উক্ত সময়ে মাকরুহ (مكروه)। এমনকি যদি মাকরুহ সময়ে জানাযা আসে এবং মাকরুহ সময়ে জানাযার নামাজ আদায় করে অথবা মাকরুহ সময়ে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং মাকরুহ সময়ে তা আদায় করে, তাহলে জায়েজ হবে। তার দলিল হলো- জানাযার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) হলো জানাযার উপস্থিতি এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) হলো সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করা। যেহেতু এ দু'টি সবব (سبب) নাকিস সময় অর্থাৎ মাকরুহ সময়ে পাওয়া গিয়েছে, এ কারণে জানাযার নামাজ এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত নাকিসভাবে ওয়াজিব হয়েছে, অতএব এ দু'টি সেভাবে ওয়াজিব হয়েছে ঐ ভাবে আদায় হয়েছে, বিধায় দু'টির আদায় জায়েজ হয়েছে, পক্ষান্তরে ফরজসমূহ উক্ত তিন সময়ে জায়েজ হবে না।



وَبُكْرَهُ أَنْ يَتَنَقَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلَابَّاسُ بَأَنَّ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتِ وَسَجْدَ لِلتَّلَاوَةِ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرَضِ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ لَا يَمْنَعُنِي فِي الْوَقْتِ فَلَمْ تَظْهَرْ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ وَظَهَرَ فِي حَقِّ الْمُنْذُورِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وَجُوبُهُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَ فِي حَقِّ رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِعَيْنِهِ وَهُوَ خَتَمَ الطَّوَافَ وَصَيَانَةَ الْمُؤَدَّى عَنِ الْبُطْلَانِ وَبُكْرَهُ أَنْ يَتَنَقَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرٍ مِنْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ جَرِّصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرَضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ تَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشْتَغَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ.

অনুবাদ : ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরুহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তবে এ দু সময়ের কাজা নামাজ এবং তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করতে পারে এবং জানাযার নামাজ আদায় করতে পারে। কেননা এ মাকরুহ হওয়াটা ছিল ফরজের মর্যাদার ভিত্তিতে। যেন সম্পূর্ণ সময়টা সালাতে মাশগুল তুল্য হয়ে যায়। এ (মাকরুহ হওয়াটা) সময়ের নিজস্ব কোনো প্রকৃতির কারণে নয়। সুতরাং ফরজসমূহের ক্ষেত্রে এবং যে সব ইবাদত স্বকীয়ভাবে ওয়াজিব হয়, যেমন তেলাওয়াতের সিজদা, সেগুলোর ক্ষেত্রে সময়ের মাকরুহ হওয়ার হুকুম প্রকাশ পাবে না। সিজদায়ে তেলাওয়াতে ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। নামাজ (মানতকৃত নামাজ)-এর ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে। কেননা উক্ত ইবাদতে আবশ্যিকতা তার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারণের সাথে সম্পৃক্ত এবং তওয়াফের রাকআতদ্বয়ের ক্ষেত্রেও মাকরুহ হওয়া প্রকাশ পাবে এবং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাকরুহ হওয়া প্রকাশ পাবে যে নফল নামাজ আরম্ভ করে ভেঙ্গে দেয়। কেননা উক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়া তার নিজস্ব কারণে নয়, অন্য কারণে। আর তাহলে তওয়াফ খতম করা এবং শুরু করা নামাজকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। ফজর উদয়ের পর ফজরের দু রাকআতের অধিক, নফল আদায় করা মাকরুহ। কেননা নামাজের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও উক্ত দু রাকআতের অতিরিক্ত নামাজ নবী করীম ﷺ আদায় করেন নি। সূর্যাস্তের পর, ফরজের পূর্বে কোনো নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে মাগরিবকে বিলম্ব করা হয়। অদ্রুপ জুমার দিন ইমাম যখন খুৎবার জন্য (হজরা থেকে) বের হবেন তখন থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে খুৎবা শ্রবণ করা থেকে অন্য-মনস্ক হওয়া লায়িম আসে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা হলো, ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ। দলিল হযরত ইবনে আক্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مَرِيضٌ وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عَمْرٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, আমার সন্তোষভাজন হক প্রসঙ্গ ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে হযরত ওমর সর্বাধিক সন্তোষভাজন ব্যক্তি। (তিনি বলেন, আমাকে) রাসূল ﷺ ফজরের পরে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।— (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের বিপরীত,

رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অর্থ : দু' রাকআত নামাজ রাসূল ﷺ গোপন ও প্রকাশ্য কোনো অবস্থায়ই ছাড়েননি। ফজরের নামাজের পূর্বে দু' রাকআত এবং আসরের নামাজের পরে দু' রাকআত। অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, يَا نَبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيَنِي فِي نَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ আমার নিকট আসরের পর আসলেই দু' রাকআত নামাজ পড়তেন। উক্ত হাদীসঘয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূল ﷺ আসরের পর দু' রাকআত নামাজ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পড়তেন। তার জবাব হলো, আসরের পর দু' রাকআত নামাজ পড়া রাসূল ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব উহা রাসূল ﷺ-এর উম্মতের জন্য জায়েজ হবে না। তার দলিল হলো যে, একদা জোহরের পর আবদুল কায়সের কতিপয় লোক রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন, রাসূল ﷺ তাঁদের সঙ্গে দীনি আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়ে যাওয়ায় জোহরের পরের দু' রাকআত সুলত পড়তে পারেননি, বিধায় উক্ত ক্ষতিপূরণ করার নিমিত্তে আসরের পর দু' রাকআত নামাজ পড়লেন। রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোনো আমল আরম্ভ করতেন, তা সর্বদা আমল করে যেতেন। এ জন্য রাসূল ﷺ আসরের পরে সর্বদা দু' রাকআত নামাজ পড়তেন এবং অন্যদেরকে তা পড়তে নিষেধ করতেন। আল্লামা ইবনে হুমায় বুখারী এবং মুসলিম শরীফের বরাতে দিয়ে পূর্ণ ঘটনা এভাবে লেখেছেন—

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَمِسْرَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا إقرأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلَامًا عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ بَلَّغْنَا أَتَيْكَ لِنُصَلِّيَ بِهَمَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَرَعَتْ إِلَيْهِمْ فَاخْبَرْتُهُمْ فَرَوَدُونِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتَهُ بُصَلِّيَ بِهَمَا فَيَقْبَلُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ النَّبِيسِ بِالرُّسُلِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهَما هَاتَانِ -

অর্থ— কুরাইব (রা.) (ইবনে আক্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আবদুর রহমান ইবনে আযহার এবং মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা.) আমাকে (কুরাইব (রা.) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে পাঠালেন এবং বললেন আমাদের সকলের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে সালাম পেশ করো এবং আসরের পরে দু' রাকআত নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। আমাদের নিকট সংবাদ আসছে যে, আপনি এ দু' রাকআত নামাজ পড়েন, অথচ রাসূল ﷺ উহা হতে নিষেধ করেছেন। হযরত কুরাইব (রা.) বলেন, -এর

পর আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে গিয়ে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে, হযরত উম্মে সালমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করো। তাকে বলবে তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়ে সংবাদ দিলাম। অতঃপর তারা আমাকে উম্মে সালমা (রা.)-এর নিকটে পাঠালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি যে, তিনি আসরের পর নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, অতঃপর আমি দেখেছি যে, তিনি ঐ দু' রাকআত নামাজ পড়েছেন। তখন এতদ্ সম্পর্কে তাকে (রাসূলকে) জিজ্ঞাসা করা হলো। রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, আমার নিকট আবদুল কায়েসের কতিপয় লোক স্থায়ী গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে আসলেন। জোহরের পর দু' রাকআত সুন্নত নামাজ বাস্তবতার কারণে পড়া সম্ভব হয়নি। এটা সেই দু' রাকআত নামাজ। — (বুখারী শারীফ; মাগাযী অধ্যায়)

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ঐ দু' সময়ে অর্থাৎ ফজরের পরে এবং আসরের পরে কাজা নামাজ, সিজদায়ে তেলাওয়াত এবং জানাযার নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই, দলিল হলো যে, ফজর এবং আসরের পর নামাজ মাকরুহ হওয়াটা ফজর এবং আসরের নামাজের কারণে ছিল। যাতে ব্যক্তি পূর্ণ ওয়াক্ত ঐ ওয়াক্তের ফরজের মধ্যে রত থাকে।

মাকরুহ হওয়াটা ফরজের মর্যাদার ভিত্তিতে ছিল, বিধায় প্রকৃত ফরজের ক্ষেত্রে মাকরুহ হবে না। কেননা প্রকৃত ফরজ নামাজের মধ্যে সময়কে মশগুল রাখা উত্তম ফরজের মর্যাদার সাথে মশগুল রাখার তুলনায়। অতএব ফরজ এবং এর সম পর্যায়ের জিনিসের ক্ষেত্রে মাকরুহ হওয়াটা প্রকাশ পাবে না, যেমন সিজদায়ে তেলাওয়াত। কেননা তা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি ওয়াজিব। কেননা সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার দলিল হচ্ছে— সিজদায়ে তেলাওয়াত যেভাবে সিজদার আয়াত পাঠ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়, অনুরূপভাবে সিজদার আয়াত শ্রবণ করার দ্বারাও ওয়াজিব হয়। যদিও শ্রবণের ইচ্ছা না করে। অতএব সিজদায়ে তেলাওয়াত সরাসরি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ফরজের সমতুল্য হলো।

এরূপ অবস্থা জানাযার নামাজেরও। কেননা জানাযার নামাজের ওয়াজিব হওয়াটা বান্দার কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। অবশ্য ফজর এবং আসরের পর মানতের নামাজ মাকরুহ হবে। কেননা মানতের নামাজ সরাসরি (প্রত্যক্ষ) ভাবে ওয়াজিব হয় না; বরং মানতকারী ব্যক্তির মানত করার কারণে ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে তওয়াফের দু' রাকআতের মধ্যেও কারাহাত (كراهت) আসবে। যেমন ফজর এবং আসরের পরে এর নিয়ত করাও মাকরুহ। কেননা ঐ দু' রাকআত নামাজ তওয়াফের কারণে ওয়াজিব হয়। তওয়াফ করা তার নিজস্ব কর্ম। অতএব তওয়াফের দু' রাকআত নামাজ প্রত্যক্ষভাবে ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ঐ নামাজের ক্ষেত্রেও মাকরুহ হবে, যা শুরু করার পর ফাসিদ (فاسد) বা নষ্ট করে দেয় যেমন নফল নামাজ আরম্ভ করার পর নষ্ট করে দিল, অতঃপর যদি ফজর এবং আসরের পর তা কাযা করতে চায় তাহলে মাকরুহ হবে। কেননা ইহা সরাসরি ওয়াজিব নয়। বরং শুরু করে নষ্ট করা নামাজকে রক্ষা করার জন্য ওয়াজিব হয়েছে।

وَكُرْهُ أَنْ يَنْتَقِلَ الْحَجُّ: দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে যে, সূর্যাস্তের পর ফরজ আদায় করার পূর্বে নফল পড়া মাকরুহ। কেননা এর দ্বারা মাগরিব বিলম্ব হয়। অথচ মাগরিবের নামাজ তাড়া তাড়ি পড়া মোস্তাহাব। ইমাম খুৎবার জন্য যখন বের হন তখন থেকে নিয়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরুহ। দলিল হচ্ছে— এর দ্বারা খুৎবা শ্রবণের থেকে বিমুখ থাকা লাযিম আসে। অথচ খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব।

# بَابُ الْأَذَانِ

الْأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَاةِ الْخَمْسَةِ وَالْجُمُعَةِ لَا سَوَاهَا لِلتَّنْفِيلِ الْمُتَوَاتِرِ وَصِفَةُ الْأَذَانِ  
مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ كَمَا أَذَّنَ الْمَلِكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ -

## পরিচ্ছেদ : আযানের বর্ণনা

অনুবাদ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য আযান দেওয়া সুন্নত; অন্যকোনো সালাতের জন্য নয়। এ বিধান  
মুতাওয়াতির (অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক ধারাবাহিক ও নিশ্চিত সূত্রে প্রাপ্ত) হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আযানের বিবরণ  
সুপরিচিত। (আর তা হলো, আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতার দেওয়া আযান।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আযান যেহেতু নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা, এ জন্য প্রথমে নামাজের সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর  
আযানের আলোচনা করা হয়েছে। আযানের আভিধানিক অর্থ- জানানো এবং ঘোষণা দেওয়া। অতঃপর উহাকে নামাজের  
ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখনই আযানের শব্দ শুনা যায়, তখন এর দ্বারা নামাজের ঘোষণাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।  
নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে আযান শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

وَإِذَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ - (سورة الحج ২৭)

وَإِذَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (তওবা; ৩) আয়াতদ্বয়ে আযান এবং আযান শব্দদ্বয় ঘোষণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শরিয়তের পরিভাষায় আযান বলা হয়, নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজের সময় দাখিল হওয়ার সংবাদ দেওয়া।  
আযান শব্দের সুবূত (স্বীকৃত) আয়াত এবং হাদীসে বিদ্যমান। তবে আযানের পূর্ণ শব্দ হাদীসে বিদ্যমান আছে। আয়াত  
যেমন- وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَيْبَ ذَالِكِ يَأْتُهُمْ يَوْمَ لَا يَفْقَهُونَ -

অর্থ : যখন তোমরা নামাজের জন্য ঘোষণা করো তখন তারা একে ঠাট্টা এবং ক্রিড়া কৌতুকের বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে  
এটা এ কারণে যে, তারা বুঝে না। এ আয়াতে নামাজের দিকে ডাকা এর দ্বারা আযানই উদ্দেশ্য। কেননা এর শানে নযূল  
সম্পর্কে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (র.) লিখেছেন যে, মদীনায় এক খ্রিস্টান ছিল, যখন আযানের মধ্যে  
فَدَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল] উচ্চারণ করা হতো তখন সে বলত  
حُرُّ الْكَأَذِبِ (মিথ্যাক জ্বলে যাক)। এক রাতে এ রকম ঘটনা ঘটে গেছে যে, সে এবং তার পরিবারের সব লোক ঘুমিয়ে ছিল  
জৈনক খান্দেম আন্তন নিয়ে আসল, একটি স্ক্রিন্স পড়ে গেল, তখন সে, তার ঘর এবং ঘরের সব মানুষ পুড়ে গেল।

আয়াতের শানে নযূলের আরো একটি কাহিনী আছে-যখন আযান হতো তখন মুসলমান নামাজ আরম্ভ করে দিতো, তখন  
ইহুদিরা বলতো فَامَّا زَانِمًا وَفَلَمَّا وَصَلُوا لَأَصْلَحُوا অর্থ- মুসলমানগণ (নামাজে) দাঁড়ালে, আল্লাহ যেন তাদেরকে দাঁড়ানোর  
তৌফিক না দেন এবং তারা নামাজ শুরু করলে, আল্লাহ যেন তাদের নামাজ পড়ার তৌফিক না দেন। উক্ত ঘটনাদ্বয় দ্বারা বুঝা  
গেল যে, নামাজের দিকে আহ্বান করার দ্বারা আযানকে বুঝানো হয়েছে।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

আল্লামা বণগী (র.) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, এ আয়াত মুযাজ্জিনদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত  
ইকরীমা (রা.) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ - এর দ্বারা মুযাজ্জিন উদ্দেশ্য। আবু উমামা বাহেলী (র.) বলেছেন, এ আয়াত-এর

মধ্যে আমলে সালেহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আযান এবং ইকামতের মধ্যে দুরাক'আত নামাজ পড়া। মোট কথা উক্ত মতামতগুলো দ্বারা এ কথা সাবিত হয় যে, আযাতের মধ্যে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** দ্বারা আযান উদ্দেশ্য। অতএব এ আযাতের দ্বারা আযান সাবিত হবে।

তৃতীয় আযাত- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের (নামাজে জুম্মা ও বুতবা) প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং বেচাকেনা (এবং যা চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়) ছেড়ে দাও। যেসব হাদীস দ্বারা আযান সাবিত হয় এবং আযানের শব্দ নির্দিষ্ট হয়, তা বিভিন্ন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

আযানের হুকুম কখন এসেছে? মোদ্রা আলী কারী (র.) এ সম্পর্কে শরহে নিকায় গ্রন্থে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত হলো যে, প্রথম হিজরিতে আযানের হুকুম এসেছে। দ্বিতীয় মত হলো যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে এসেছে। দ্বিতীয় মতের দলিল হলো, ইবনে সা'দ (র.), নাফি' ইবনে জুবাইর, ওরওয়া ইবনে যু'বাইর এবং সাঈদ ইবনে মুসায়ির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

**إِنَّهُمْ قَالُوا كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَوْمَرُوا بِالْأَذَانِ بِنَادِي مُنَادٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَتَجْمَعُ النَّاسُ فَلَمَّا صُرِفَتِ الْقِيْلَةُ أُمِرَ بِالْأَذَانِ**

উক্ত তিন সাহাবী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর যুগে আযানের বিধান আসার পূর্বে একগুণ নিয়ম ছিল যে, রাসূল ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি **جَامِعَةً الصَّلَاةَ** বলে ঘোষণা দিতেন, ফলে এ আহ্বান শ্রবণ করে লোকেরা একত্রিত হতো। কিন্তু যখন কেবলা পরিবর্তন হলো তখন আযান দেওয়ার বিধান আসল। এ কথায় সকলে একমত যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে দেওয়া হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, আযানের বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত ফকীহ মাওলানা আবদুল হাই (র.) আসসিয়ায়াহ (السعيه) নামক গ্রন্থে ইবনে হাজার আসকালী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, আযানের বিধান পবিত্র মক্কায় হিজরতের পূর্বে দেওয়া হয়েছে। যেমন "তবরানী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, **أَرْثَ أَنَّهُ لَمَّا أَسْرَى بِالنَّبِيِّ ﷺ أَوْحَى إِلَيْهِ الْإِذَانُ فَتَنَزَّلَ بِهِ فَعَلَّمَهُ بِأَلَا** - মিরাজের রাতে মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর প্রতি আযান সম্পর্কে ওহী নাজিল করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ আযানের শব্দসমূহ হযরত বিলাল (রা.)-কে শিক্ষা দেন। "দারা কুত্বী" নামক গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, **إِنْ جَبُرْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ** - **يَا أَذَانُ جِئْنِي بِرَضِيتِ الصَّلَاةَ** - অর্থ- যখন নামাজ ফরজ হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ-কে আযানের হুকুম দিলেন। উক্ত রেওয়াজেত্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কায় আযানের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উক্ত হাদীসগুলো সহীহ না হওয়ার দাবি করেছেন। মাওলানা আবদুল শাকুর লক্ষৌবী (র.) "ইলমুল ফিকহ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর পূর্বে নামাজ আযানবিহীন পড়া হতো, ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। এ জন্য ঘোষণা ছাড়াই জামাতের জন্য সমবেত হওয়াটা তেমন কঠিন ছিল না। যখন মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে লাগল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল, তখন প্রয়োজন দেখা দিল যে, নামাজের সময় এবং জামাত কয়েম করার ব্যাপারে অবগতি প্রদান করা। যাতে তারা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বাড়ি হতে জামাতের জন্য মসজিদে একত্রি হতে পারে। আযানের এই নিয়ম ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আযান এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য, পূর্বের উম্মতের মধ্যে এর বিধান ছিল না।

আযানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : যখন সাহাবীদের নামাজ এবং জামাতের সময় জানানোর প্রয়োজন হলো, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, ইহুদিদের ন্যায় ঘণ্টা বাজানো হক। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন যে, আগুন জ্বালানো হোক। কিন্তু রাসূল ﷺ তা পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর (রা.) প্রস্তাব দিলেন যে, নামাজের সময়ে **صَلَاةُ جَامِعَةٍ** বলা হোক। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ফেরেশতা আযানের নিয়ম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। ঐ নিয়মে নামাজের সময় এবং জামাতের অবগতি প্রদান করা হবে।

কোনো কোনো রেওয়াজেতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যয়েদ (রা.) বলতেন যদি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার আশংকা না হতো তাহলে আমি বলতাম যে, ষপ্প দেখার সময় আমি সম্পূর্ণ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম না। এ কারণে কোনো আলিম এ ঘটনাকে হাল এবং কাশফের অবস্থা হিসাবে জ্ঞান করেছেন— যা বাতেন পন্থী বুজুর্গ লোকদের জাম্বত অবস্থায় হয়ে থাকে। মোটকথা সকালে আবদুল্লাহ ইবনে যয়েদ (রা.) এ ঘটনা রাসূল ﷺ-এর বেদমতে পেশ করলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এ ঘটনা সত্য হযরত বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এ ভাবে আযান প্রদান করো। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে স্বীয় ষপ্প বর্ণনা করলেন। কোনো কোনো রেওয়াজেতে আছে যে, এ ঘটনার পূর্বে আযান সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর নিকট ওহী এসেছে। আবদুর রাযযাক (র.), মুসান্নাফে এবং আবু দাউদ (র.) মারাসীলে এ রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মিরাজের রাতে রাসূল ﷺ-কে জিবরাঈল (আ.) আযান শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এ হাদীস সহীহ নয়। যদি সহীহ ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মক্কার জাফ্রাতাবস্থায় সংঘটিত মিরাজের রাতে উদ্দেশ্য নয়। কেননা আধ্যাত্মিকভাবে রাসূলের কয়েকবার মিরাজ হয়েছে। এ জন্য এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রাত্র, যে রাত্রে রাসূল ﷺ-কে ষপ্প দেখানো হয়েছে।

আযানের গুরুত্ব ও মহত্ব : আযান আদ্বাহর জিকিরের মধ্য হতে সর্বাধিক বড় জিকির, এতে তাওহীদ রিসালাতের সাক্ষ্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। এর দ্বারা ইসলামের প্রভাব এবং শক্তি প্রকাশ পায়। অনেক হাদীসে আযানের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

১. আযানের ধ্বনি যে পর্যন্ত পৌছে এবং যারা তা শ্রবণ করে জিন হোক বা মানুষ হোক, তারা কিয়ামতের দিন আযান প্রদানকারী ঈমানের সাক্ষ্য দেবে। —(বুখারী, নাসাই, ইবনে মাজাহ)

২. রাসূল ﷺ বলেছেন, নবী এবং শহীদগণের পর আযানদাতা জান্নাতে দাখিল হবে। কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, মুয়াজ্জিনের মর্যাদা শহীদের সমান হবে।

৩. আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাত বছর ধারাবাহিকভাবে আযান দেবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে ছওয়াব অর্জনের, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে। —(আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪. রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি লোকেরা জানতো যে, আযানে কত বেশি পুণ্য। তাহলে লটারী দিয়ে হলেও তারা আযান দেওয়ার এ সুযোগ লাভ করার চেষ্টা করত। —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই।)

সাহাবীদের যুগে এ রকম হয়েছে যে, আযানের সুযোগ গ্রহণের নিমিত্তে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাম্য ছিল যে, এ বরকতময় পদ যেন আমি পাই। এমনকি এর জন্য লটারী দেওয়া হয়েছে। —(তায়ীখে বুখারী)

৫. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক মিশকের টিলার ওপর থাকবে, তাঁদের হিসাব দিতে হবে না এবং তারা অস্তিরও হবে না। এক. যে ব্যক্তি আদ্বাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন পড়েছে। দ্বিতীয়. যে ব্যক্তি কৃতঙ্গা থাকা সত্ত্বেও পরকাল থেকে গাফেল হয়নি। তৃতীয় মুয়াজ্জিন। —(আল মুশলিদুল আমীন)

৬. কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনদেরকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে। সে স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু এবং তার মনোনীত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

৭. আযান দেওয়ার সময় শয়তানের উপর ভয়ভীতি সঞ্চারিত হয়। সে বেদিশা হয়ে পালাতে থাকে এবং যে পর্যন্ত আযানের ধ্বনি পৌছে সে পর্যন্ত সে স্থির থাকতে পারে না। —(বুখারী ও মুসলিম)

৮. কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় উঁচু হবে অর্থাৎ তারা সম্মানিত এবং মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন, কিয়ামতের ভয় এবং বিপদ থেকে সংরক্ষিত থাকবেন।

৯. যে স্থানে আযান দেওয়া হয় সেখানে আদ্বাহর রহমত নাজিল হয়। আজাব-গজব হতে সে স্থান সংরক্ষিত থাকে।

১০. রাসূল ﷺ মুয়াজ্জিনদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন।

اللَّحُ الْاَلَاَنَّ سَتَ لِلْمَلَرَاتِ  
শায়খের মতে ওয়াজিব। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, যদি শহরবাসী সকলে আযান বর্জন করার ওপর ঐকমত্য হয়, তাহলে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে। প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ওয়াজিব বর্জনের কারণে হয়; সুন্নত বর্জনের

কারণে নয়। অতএব বুঝা গেল যে, আযান ওয়াজিব। এর জবাবঃ আযান মূলত সুন্নতই। তবে আযান বর্জনের ওপর একমতের কারণে দীনের অবমাননা হয়। আর দীন অবমাননার অবস্থায় জিহাদ ওয়াজিব হয়। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাদের সাথে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। আযান সুন্নত এর পক্ষে নকলে মুতাওয়াতির (متواتر) দলিল। রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমার জন্য আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তবে বিতর, দুই ঈদ, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ইস্তেস্কা, জানাযা, সুন্নত এবং নফল নামাজের জন্য আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।

জাবির ইবনে সামুরা (রা.) সূত্রে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে –

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ يَغْيِرُ أَذَانُ وَلَا أَقَامَةٌ.

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ-এর পিছনে একাধিকবার ঈদের নামাজ আযান এবং ইকামত ছাড়াই পড়েছি।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً.

অর্থ : রাসূল ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ লাগত, তখন রাসূল ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে পাঠাতেন, তিনি الْصَّلَاةُ বলে ঘোষণা দিতেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, দুই ঈদ, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য আযানের বিধান নেই।

বিত্তর যদিও ওয়াজিব; কিন্তু ইশার নামাজের আযানই তার জন্য যথেষ্ট। কেননা ইশার ওয়াক্তেই বিতরের ওয়াক্ত। আর ইশার সুন্নত ও নফল, ইশার ফরজের তাবে (تابع)। অতএব ওগুলোর জন্য স্বতন্ত্র আযানের প্রয়োজন নেই। জুমার আযান সুন্নতের পক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাযিব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দলিল।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আযান দেওয়ার বিবরণ সু-পরিচিত। তা এভাবে যে আকাশ থেকে আগত ফেরেশতা আযান দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা.)-এর হাদীসে গিয়েছে। ঐ হাদীসের শব্দসমূহ নিম্নরূপ–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ بَرْدَانِ أَخْضَرَانِ أَنْزَلَ عَلَى جِزْمٍ حَاطِطٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَادَّانَ مَقْنَى مَثْنَى ثُمَّ جَلَسَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى نَحْوِ مِنْ أَذَانِ الْيَوْمِ قَالَ عَلَيْهَا يَلَالًا فَقَالَ عُمَرُ وَ رَأَيْتُ وَمِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي.

বদর উদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে উক্ত ফেরেশতা হলেন হযরত জিব্রাইল (আ.) তবে অন্যান্যদের মতে অন্য কোনো ফেরেশতা।

وَلَا تَرْجِعْ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يُرْجَعَ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَمَا خَفَضَ بِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) فِيهِ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُ بِالْتَّرْجِيعِ وَلَنَا أَنَّهُ لَا تَرْجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَكَانَ مَارَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا وَزَيْدٌ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لَأَنَّ بِلَالًا (رض) قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ جِئْنَا وَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاقِدًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِلَالُ اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ وَخُصَّ الْفَجْرَ بِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ هَكَذَا فَعَلَّ الْمَلِكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي قَوْلِهِ إِنَّهَا قُرْأَتُ فُرَادَى إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ -

অনুবাদ : আযানের মধ্যে তারজী (تَرْجِيعُ বা কলেমায়ে শাহাদাতের পুনঃ উচ্চারণ) নেই। তারজী (تَرْجِيعُ) অর্থ উভয় কলেমায়ে শাহাদাতকে (প্রথমে দু'বার করে) অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করার পর পুনরায় উচ্চঃস্বরে (দু'বার করে) উচ্চারণ করা। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, আযানে তারজী (تَرْجِيعُ) আছে। আবু মাহযুবা (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের কারণে যে, রাসূল ﷺ তাঁকে তারজী (تَرْجِيعُ) -এর নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দলিল হলো, প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোতে তারজী (تَرْجِيعُ) নেই। ইমাম শাফেঈ (র.) যে হাদীস (দলিল স্বরূপ) বর্ণনা করেছেন, তা ছিল (কলেমায়ে শাহাদাত) শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, সেটাকে তিনি তারজী (تَرْجِيعُ) ধারণা করেছেন। ফজরের আযানে (تَرْجِيعُ) -এর পরে দু'বার التَّوْمِ বৃদ্ধি করবে। কেননা একবার যখন হযরত বিলাল (রা.) রাসূল ﷺ -কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তখন التَّوْمِ বলেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ বলে ছিলেন, হে বিলাল! কতনা সুন্দর কথা এটা। একে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর সাথে ফজরের আযানকে শ্রদ্ধা করার কারণ হলো- এটা ঘুম এবং অলসতার সময়। ইকামত আযানের মতো। তবে তাতে (تَرْجِيعُ) -এর পর দু'বার الصَّلَاةُ যোগ করবে। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা এমনই করেছিলেন এবং এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। এ হাদীস ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বিপরীতে দলিল। কেননা তিনি বলেন যে, ইকামত হচ্ছে-এক এক শব্দ বিশিষ্ট التَّوْمِ ব্যতীত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আযানে তারজীর রূপ এভাবে اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এবং مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ চার বার উচ্চারণ করবে। প্রথম দু'বার মৃদুস্বরে অতঃপর দু'বার উচ্চঃস্বরে। আমাদের মতে আযানে তারজী নেই। ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে তারজী (تَرْجِيعُ) আছে।



ইমাম শাফেঈ (র.) আবু মাহযুরা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেন—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ يَعُوذُ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

উক্ত হাদীসে শাহাদাতাইন (শহাদতিন) চার বার বলা সাবিত আছে। সেই সাথে শুরুতে অক্বর আল্লাহ দু'বার বলাও সাবিত আছে। ইমাম মালিক (র.) শুরুতে আল্লাহ আকবার দু'বার বলার পক্ষে উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তবে ইমাম আবু দাউদ (র.) এবং ইমাম নাসাঈ (র.) আল্লাহ আকবার চার বার বলার পক্ষে রেওয়ায়েত এনেছেন। এগুলো আমাদের দলিল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়েতের জবাবঃ আল্লাহ আকবার দু'বার এক স্থানে পড়া এক শব্দের ন্যায়। অতএব মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতের মর্ম দাঁড়াবে যে, রাসূল ﷺ আবু মাহযুরা (রা.)-কে আযান শিক্ষা দিয়েছেন এবং দু' বার আল্লাহ আকবার বলেছেন, অর্থাৎ দু'স্থানে চার বার আল্লাহ আকবার বলেছেন। এ ব্যাখ্যার পর উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। আমাদের দলিল হলো যে, আযানের বিবরণে যেসব হাদীস প্রসিদ্ধ, সেগুলোতে তারজী (ترجیع) নেই। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রক্বিহি (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসদ্বয়, যাতে তারজী (ترجیع) নেই। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের শব্দ নিম্নরূপ—

قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً.

দলিলে আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলিল হলো, আযানের মূল উদ্দেশ্য হলো الصَّلَاةُ এবং عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ এর উদ্দেশ্য আর এ দু'কালেমার মধ্যে যেহেতু তারজী (ترجیع) নেই। অতএব এই দু' কলেমা ব্যতীত অন্য কলেমায় অবশ্যই তারজী হবে না। হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-কে ঐ কলেমাগুলো বারবার বলানো তালীম বা শিক্ষা দানের জন্য ছিল। কিন্তু আবু মাহযুরা (রা.) সেটাকে তারজী ধারণা করেছেন। অর্থাৎ আবু মাহযুরা (রা.) প্রথমে শাহাদাতাইনের (শহাদতিন) (شهادتين) এর পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়েননি, যে পরিমাণ রাসূল ﷺ-এর কামা ছিল, এ জন্য উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ উচ্চারণ করিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবু মাহযুরা (রা.) ধারণা করেছেন যে, সর্বদা আমাকে মৃদুস্বরে বলার পর উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম তাহাবী (র.) এ ব্যাখ্যা করেছেন। ইনশায়া গ্রন্থকার লেখেছেন যে, রাসূল ﷺ আবু মাহযুরা (রা.)-কে বিশেষ হিকমতের প্রেক্ষিতে তারজীর নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো যে, আবু মাহযুরা (রা.) প্রথমে রাসূল ﷺ-এর প্রতি কঠোর বিবেচ্য পোষণ করতেন। অতঃপর যখন আবু মাহযুরা (রা.) মুসলমান হলেন, তখন আল্লাহর নবী ﷺ তাঁকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, আবু মাহযুরা (রা.) যখন শাহাদাতাইনে পৌছলেন তখন স্বীয় জাতির প্রতি লজ্জা-শরমের কারণে আযানের ধনিক মৃদু বা নিচু করলেন, তখন রাসূল ﷺ হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-কে ডাকলেন এবং তার কান মর্দন করলেন এবং বললেন যে, এ কালিমাগুলো পুনঃ উচ্চারণ করো এবং উচ্চ ধ্বনিতে পড়ো। এখন এই পুনঃ উচ্চারণের উদ্দেশ্য হয়তো এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সত্য কথা বলতে কোনো লজ্জা নেই। অথবা এ উদ্দেশ্য যে কলেমায় শাহাদত বারবার পড়ার দ্বারা রাসূলের প্রতি হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-এর ভাল বাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন যে, তবরানী শরীফে হযরত আবু মাহযুরা (রা.) সূত্রে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে-যার মধ্যে তারজী (ترجیع) নেই। অতএব হযরত আবু মাহযুরা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত দু' রেওয়ায়েতের মধ্যে বিরোধ। বিধায় বিরোধের কারণে উভয় রেওয়ায়েত রহিত বা অগ্রাহ্য হবে।

ইবনে ওমর (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাদীস বিরোধ থেকে মুক্ত, বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে। তারজী না হওয়াটা এ জন্য প্রাধান্য পাবে যে, আযানের অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রক্বিহি (রা.)-এর হাদীস মূল এবং তার মধ্যে তারজী নেই।

حَيَّ عَلَى : কুদুরী প্রণেতা বলেছেন যে, ইকামত আযানের মতো। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ -এর পর قَامَتِ الصَّلَاةُ দু'বার বৃদ্ধি করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন যে, قَامَتِ الصَّلَاةُ -এর দলিল হলো যে, ব্যতীত অন্যান্য শব্দ এক এক বার বলবে এবং قَامَتِ الصَّلَاةُ দু'বার পড়বে। ইমাম শফিঈ (র.)-এর দলিল হলো যে, হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীস- হযরত   হযরত বিলালকে নির্দেশ দিলেন আযানে জোড়া জোড়া বলবে এবং ইকামত বেজোর বলবে, قَامَتِ الصَّلَاةُ ব্যতীত। আমাদের দলিল হলো, যে ফেরেশতা আসমান থেকে এসেছিলেন, তিনি আযানের মতো ইকামত ও দু' দু' বার বলেছেন। যেমন ইবনে আবী শায়বা (র.) ওসমান ইবনে আবী লায়লা (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। আমার (ওসমান) নিকট রাসূল  -এর সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন যে, ওসমান ইবনে যায়েদ আনসারী (রা.) এসে রাসূল  -এর নিকট বর্ণনা করেছেন মনে হয় যেন দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি প্রচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আযান দু' দু' বার এবং ইকামত দু' দু' বার বলেছেন। হযরত আনাস (রা.) -এর জবাব হলো যে, আযানে দু'টি শব্দ দু'ধ্বনিতে বলেছেন এবং ইকামতে দু'টি শব্দ একই ধ্বনিতে বলেছেন।

وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَدْنَتْ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدَرْ وَهَذَا بَيَانُ الْإِسْتِجَابِ وَنَسْتَقِيلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ لِأَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ أَذَّنَ مُسْتَقِيلَ الْقِبْلَةِ وَلَوْ تَرَكَ الْإِسْتِجَابَ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَيُحَوَّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يُمْنُهُ وَنِسْرُهُ لِأَنَّهُ خُطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُؤَاجِهُهُمْ وَإِنْ اسْتَدَارَ فِي صُومِعَتِهِ فَحَسَنٌ وَمُرَادُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَ تَحَوُّلَ الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَعَ ثُبَاتٍ قَدَمِيهِ مَكَانَهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ بِأَن كَانَ الصُّومِعَةُ مُتَّسِعَةً فَأَمَّا مَنْ غَبِرَ حَاجَةٌ فَلَا وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ إصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ بِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِلَاءٍ (رض) وَلَئِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْأَعْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ.

অনুবাদ : আযান ধীরলয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে, আর ইকামত না থেমে দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন আযান দেবে, তখন ধীরলয়ে দেবে। আর যখন ইকামত দেবে, তখন দ্রুতলয়ে বলবে। এ হলো মোস্তাহাবের বর্ণনা। কেবলামুখী হয়ে আযান ও ইকামত উভয় দিবে। কেননা আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা কেবলামুখী হয়ে আযান দিয়েছেন। তবে কেবলামুখী না হয়ে আযান দিলেও মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জায়েজ হবে। তবে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে তা মাকরুহ হবে এবং বলার সময় মুখমণ্ডল যথাক্রমে ডানে-বামে ফিরাবে। কেননা তা লোকদের উদ্দেশ্যে সন্ধান। সুতরাং তাদের দিকে মুখ করেই সন্ধান করবে। আর যদি আযান খানায় প্রদক্ষিণ করে তাহলে, তবে তা উত্তম হবে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো যে, মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে যদি সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফিরাতে না পারে, তবে বিনা প্রয়োজনে পদদ্বয় স্বস্থান হতে সরানো ভাল নয়। মুয়াজ্জিনের জন্য উত্তম হলো তার উভয় কানে দু' আঙ্গুল স্থাপন করা। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া এটা প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। আর যদি তা না করে তাহলেও ভাল। কেননা এটা মূলত সুন্নত নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারাসুসুল (ترسل) -এর অর্থ দু' শব্দের মাঝখানে পৃথক করে থেমে থেমে উচ্চারণ করা। হদর (حدر) বলা হয়, দু' শব্দ মিলিয়ে উচ্চারণ করা। আযানের মধ্যে তারাসুসুল (ترسل) উত্তম এবং ইকামতের মধ্যে হদর (حدر) উত্তম। দলিল, রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে এ ভাবে হুকুম করেছেন। যদি ইকামতের মধ্যে তারাসুসুল (ترسل) করে তাহলে কারো কারো মতে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মাকরুহ হবে। তবে হিদায়া গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মাকরুহ না হওয়া সাবিত হয়। তিনি বলেছেন هَذَا بَيَانُ اسْتِجَابِ بَرْجَانِ করলে মাকরুহ হয় না। ইবনে হুমাম বলেছেন যে, প্রথম মতই হক অর্থাৎ আযানে তারাসুসুল, ইকামতে হদর করা সুন্নত।

ইনায়্যা গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, আযান এবং ইকামতে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, তবে عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ব্যতীত। দলিল : যে ফেরেশতা আসমান থেকে এসেছিলেন, তিনি কেবলার দিকে মুখ করে আযান দিয়েছেন। কেউ যদি কেবলামুখী না হয়ে আযান দেয় তাহলে জায়েজ আছে, তবে সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে মাকরুহে তানযীহী হবে। عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় মুখ যথাক্রমে ডানে এবং বামে ফিরাবে। কেননা এ দু' শব্দ দ্বারা মুসলমানদেরকে সন্মোদন করা হয়। সুতরাং এ সন্মোদন তাঁদের দিকে ফিরে করতে হবে। যার মর্ম হলো তোমরা নামাজ এবং উভয় জগতের কল্যাণের দিকে এসো। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমান যেরূপ ডানে এবং বামে আছে অনুরূপভাবে পিছনের দিকেও আছে; অতএব ডানে এবং বামে যেমন মুখ ফিরানোর হুকুম আছে, অনুরূপ পিছনের দিকেও মুখ ফিরানোর হুকুম হওয়া চাই। জবাব হচ্ছে যে, ঐ সূরতে কিবলার দিকে পিঠ হবে। অথচ মুয়াজ্জিন লোকদেরকে কেবলার দিকে মুখ করার আহ্বান করছে। এ জন্য ডানে এবং বামের দিকে মুখ ফিরানোই যথেষ্ট। কেননা তার দ্বারা আহ্বানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

সওমআজ (صومعه) “বাহরুর রাইক” নামক গ্রন্থে আছে যে, সওমা মিনারাকে বলে। আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী হিদায়ার ভাষ্যে লিখেছেন যে, সওমাআজ ঐ উঁচু স্থানকে বলে, যেখানে মুয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে আযান দেয়। মোট কথা হলো, মুয়াজ্জিন যদি মিনারায় ঘুরে যায় তাহলে উত্তম, শর্ত হলো মিনারা প্রশস্ত হতে হবে। ডানে মাথা ঘুরিয়ে দু'বার حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ বলবে এবং বামে মাথা ঘুরিয়ে দু'বার حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যে বক্তব্য মতনে উল্লেখ আছে তার উদ্দেশ্য হলো মিনারায় ফিরা। তা ঐ সূরতে যখন মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফিরাতে না পারে। মোট কথা হলো যে, যদি পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে আযানের পূর্ণ ঘোষণা না দিতে পারে (যা আযানের উদ্দেশ্য) তাহলে মুখ ফিরানোর প্রয়োজন হলে কোনো অসুবিধা নেই। প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান হতে পদদ্বয় সরানো ভাল নয়।

وَالْأَنْفَضِلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ الْغ : আযান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জিনের জন্য উত্তম হলো যে, দু' কানে স্বীয় দু' আঙ্গুল দাখিল করা। দলিল রাসূল ﷺ : হযরত বিলাল (রা.)-কে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাকেম (র.) মুসতাদারাক নামক গ্রন্থে সাদ আল-কুরয (কুবার মুয়াজ্জিন) (র.)-এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِهَا أَنْ يَجْعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لَصَوْتِكَ .

রাসূল ﷺ : হযরত বিলাল (রা.)-কে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি যেন স্বীয় দু'কানে নিজের দু'আঙ্গুল দাখিল করেন এবং বললেন যে, এটা তোমার ধ্বনিকে উঁচু করবে। আল্লামা ভবরানী (র.) উক্ত হাদীসকে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন—

إِذَا أَذَنْتَ فَاجْعَلْ إصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لَصَوْتِكَ .

অর্থ : যখন তুমি আযান দেবে তখন স্বীয় দু' আঙ্গুল নিজ দু' কানে দাখিল করবে। কেননা এটা তোমার ধ্বনি উঁচু করবে। যুক্তি ভিত্তিক দলিল, জানানো এবং ঘোষণা যা আযানের মূলত উদ্দেশ্য, তা এর দ্বারা পূর্ণ হয়, যদি মুয়াজ্জিন এরূপ না করে তাহলেও আযান সহীহ হবে। কেননা এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদার (سنن الهدى) অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সুন্নতে যায়িদার অন্তর্ভুক্ত। “ইনায়্যার” গ্রন্থকার লেখেছেন যে, ঐ অবস্থায় আযান দেওয়া ভালো। তা বর্জন করা উত্তম নয়। আযানের সময় মুয়াজ্জিনের কানে আঙ্গুল দাখিল করা যদিও মূলত সুন্নত নয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে স্বপ্নে যে আযান দেখানো হয়েছে, তাতে কানে আঙ্গুল দাখিল করার কথা উল্লেখ নেই। অথচ আযানের অধ্যায়ে তাতে মূল ধরা হয়। এতদসন্দেহে মোহেত্ব রাসূল ﷺ : এটা সূরতে বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন তাই এটা বর্জন করাকে ভাল ধরা সমীচীন নয়।

মোট কথা আযানে কানে আঙ্গুল দাখিল করা আহসান (أحسن) বা সর্বোত্তম, আর তা না করা হাসান (حسن) বা ভাল।

ফায়দা : সাদ আল-কুরয (রা.) ব্যতীত রাসূল ﷺ :-এর আরো তিন জন মুয়াজ্জিন ছিলেন। (১) বিলাল (রা.); (২) আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.); (৩) আবু মাহযূরা (রা.)। কুরয (قُرط) বলা হয়, বরই পাতা যার দ্বারা চামড়া দাবাগাত করা হয়। সা'দ (রা.) যেহেতু তিনি ঐ তেজারত করতেন এ জন্য তাঁকে সা'দ আন্-কুরয বলা হতো। আইনুল হিদায়া গ্রন্থে লেখেছে মুয়াজ্জিনের জন্য নিম্নোক্ত গুণগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়। পুরুষ, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত, সুস্থ, পরহেজগার সুন্নত সম্পর্কে অবগত, নামাজের সময় সম্পর্কে অবগত, সর্বদা পাঁচ ওয়াক্তের আযান প্রদানকারী হওয়া এবং আযানের বিনিময়ে কিছু না নেওয়া।

وَالْتَّوْبُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَسَنَ لَاتِهِ وَقَدْ تَوَمَّ وَغَفْلَةٍ وَكَرِهَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَمَعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ وَهُوَ عَلَى حَسْبٍ مَا تَعَارَفُوهُ وَهَذَا تَثْوِيبٌ أَخَذَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ (رض) لِتَغْيِيرِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَخَصُّوا الْفَجْرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِيُظْهِرَ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ وَقَالَ أَبُو نُؤْسُفٍ (رح) لَا رَأْيَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِيَلَامِي فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ بَرَحْمِكَ اللَّهُ وَاسْتَبَعْدَهُ مُحَمَّدٌ (رح) لِأَنَّ النَّاسَ سَوَاسِمَةً فِي أَمْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَبُو نُؤْسُفٍ (رح) خَصَّهُمْ بِذَلِكَ لِزِيَادَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ كَيْلَا تَفُوتَهُمُ الْجَمَاعَةُ وَعَلَى هَذَا الْقَاضِي وَالْمُفْتِي .

**অনুবাদ :** ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার عَلَى الصَّلَاةِ এবং عَلَى الْفَلَاحِ বলে তাসবীব (বা পুনঃ ঘোষণা দান) করা উত্তম। কেননা এটা ঘুম ও গাফলতের সময়। অন্যান্য সালাতে তা মাকরুহ। তাসবীব অর্থ পুনঃ ঘোষণা দান এবং তা লোকদের মধ্যে প্রচলিত পন্থায় করতে হবে। এই তাসবীব প্রথমবারের মতো কুফার আলিমগণ সাহাবীদের যুগের পরে মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে উদ্ভাবন করেছেন এবং তারা এটাকে ফজরের সাথেই খাস করেছেন। তবে পরবর্তী আলিমগণ দীনের সকল বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় সকল সালাতেই তাসবীব উত্তম মনে করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন প্রত্যেক নামাজের সময়ে আমীর ও শাসককে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলায় কোনো দোষ নেই। হে আমীর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ- নামাজে আসুন, কল্যাণের দিকে আসুন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মতকে দুর্বোধ্য মনে করেছেন। কেননা জামাআতের ব্যাপারে সকল মানুষ সমান। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) মুসলমানদের বিষয়াদিতে অধিক ব্যস্ততার কারণে এ ব্যাপারে তাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন। যেন তাদের জামাআত ছুটে না যায়। এ ব্যাপারে কাজি ও মুফতিদের জন্য একই হুকুম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাসবীবের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন ও ফিরে আসা, এর থেকে ছওয়াব (ثواب) শব্দটি নির্গত হয়েছে। কেননা মানুষের আমলের ফায়দা তার দিকে ফিরে আসে এবং -এর থেকে মাসাবা (مساباة) যার অর্থ আস্তানা শব্দটি উৎকলিত। কেননা লোকেরা বারবার স্বীয় আস্তানায় ফিরে আসে। শরিয়তের পরিভাষায় তাসবীব বলা হয় اِلْعَلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ বা ঘোষণার পর ঘোষণা দেওয়া। মোদ্দা আলী কারী (র.) বলেছেন যে, আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামাজের ঘোষণাকে তাসবীব বলে।

তাসবীব- দু' প্রকার এক পুরাতন তাসবীব, তা হচ্ছে الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা। ফখরুল ইসলামের মতে ছহীহ হলে যে, এটা আযানের পরে ছিল। কিতাবুল আসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের ঘারাও এটিই বুঝা যায়। কিন্তু লোকেরা এই তাসবীবকে আযানের মধ্যে عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে দাখিল করে দিয়েছে। তবে বিতন্মত হলো যে, উহা حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরেই আযানে দাখিল ছিল, যা মতনে (مَنْ) উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৭ অনুযায়ী আমল চলে আসছে। হযরত বিলাল (রা.) -এর হাদীস اِنْجَعِدْ فَيَا بِلَالُ اِنْجَعِدْ فَيَا بِلَالُ হে বিলাল, উহাকে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করো। এ কথা উক্ত দাবির উপর সুশীল দলিল।

দুই. তাসবীবে মুহদাস (محدث) বা সুই তাসবীব। তা হচ্ছে যে আযান ও ইকামতের মধ্যে দু'বার **مَرْ عَلَى الصَّلَاةِ** অথবা তার সমার্থবোধক সমাজে প্রচলিত কোনো শব্দ বলা। তাসবীবের জন্য শব্দ নির্দিষ্ট নেই এবং আরবি ভাষায় হওয়াও শর্ত নয়। যেমন কেউ **الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ** বলল অথবা **فَافَتْ فَافَتْ** বলল। তাহলে এটা ঠাণ্ডা তাসবীব হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে নামাজ তেরি, নামাজ হচ্ছে অথবা অন্য কোনো শব্দ বলল, তাহলেও দৃষ্টান্ত হবে। যদি কাশি দেওয়ায় দ্বারা লোকেরা বুঝে তাহলে তাসবীব হবে। মোট কথা হলো যে, যেখানে যে নিয়ম আছে, এ মুতাবিক সেখানে তাসবীব করা হবে। এটাকে তাসবীবে মুহদাস (تشریب محدث) এ জন্য বলে যে, এটা না রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল; না সাহাবীদের যুগে ছিল; বরং তাবেরুনদের যুগে যখন মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হলো এবং লোকেরা দীন কাজে অলসতা করতে লাগল তখন কুফার আলিমগণ উহা আবিষ্কার করেছেন। ধরা যায় যে এটা বিদআতে হাসানা (بدعت حسنة)। হাসানা (حسنة) এ জন্য যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ফকীহগণ উহাকে ভাল মনে করেছেন। আর মুসলমানরা যেটাকে ভাল মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও ভাল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَرَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ.

অর্থঃ মুসলমান যেটাকে ভাল মনে করবে, সেটা আল্লাহর নিকটও ভাল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যেটাকে খারাপ মনে করে সেটা আল্লাহর নিকটও খারাপ।

তাসবীবে মুহদাস শুধু ফজরে জায়েজ না সব নামাজে জায়েজ? এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমদের মত হলো যে, তাসবীব শুধু ফজরের নামাজে জায়েজ অন্য নামাজে জায়েজ নয়। কেননা এ সময় ঘুম ও অলসতার সময়। এর সমর্থন তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ-এর হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়।

عَنْ بِلَالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَتَوَبَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.

অর্থঃ হযরত বিলাল (রা.) বলেন যে, রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, ফজর ছাড়া অন্য কোনো নামাজে যেন তাসবীব না করি। এক রেওয়াজে আছে যে, হযরত আলী (রা.) এক মুয়াজ্জিনকে ইশার নামাজে তাসবীব করতে দেখেছেন, তখন বলেছেন, **أَخْبَرَنَا هَذَا الْمُبْدِعُ مِنَ السَّجِدِ** এ বিদ্আতীকে মসজিদ হাতে বের করে দাও।

পরবর্তী আলিমদের মতে সকল নামাজে তাসবীব জায়েজ। আইনুল হিন্দা নামক গ্রন্থে শরহে নিকায়ার বরাতে দিয়ে লেখছেন যে, পরবর্তী আলিমদের মতে মাগরিব ব্যতীত সকল নামাজে তাসবীব উত্তম। দলিল মানুষেরা দীন কাজে অলসতা করে। যেহেতু ফজরে ঘুমের আলস্যের কারণে তাসবীব জায়েজ। অতএব অলসতা এবং কাজের গাফলতের কারণেও অনায়াসে তাসবীব জায়েজ হবে। তবে পরবর্তী আলিমদের এ মত সঠিক নয়, কেননা ঘুমের কারণে যে গাফলত আসে তা ইখতিয়ারী (اختياري) বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং উহাতে মানুষের কোনো অবহেলা ও অবাধ্যতা নেই। যেমন লায়লাতুহ তারীসের (ليلة التمرس) এর- হাদীসে আছে যে, যখন সকলে ফজরের নামাজে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন সাহাবীদের অস্থিরতা সৃষ্টি হলো যে, আমরা বড় অবহেলা করেছি, তখন রাসূল ﷺ বলেন, **لَا تَنْرِيظُ فِي النَّوْمِ** ঘুমের অবস্থায় অবহেলা ধর্ভব্য নয় বরং মার্জনীয়। কেননা আশ্বাসমূহ আল্লাহর কবজায়, আল্লাহ যখন চান, তখন কহুক ছেড়ে দেন। অবহেলা যা জাম্বাত অবস্থায় হয়, তা আপত্তিকর। অতএব ফজরের মধ্যে তাসবীব অবহেলা ব্যতীত গায়ের ইখতিয়ারী বা অনিচ্ছার অবস্থায় ছিল। সুতরাং তাকে অন্যান্য নামাজের ওপর (যাতে অবহেলা ইচ্ছাকৃত) তুলনা করা ঠিক হবে না। কেননা উভয় নামাজের গাফলত এক ধরনের নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, আমার মতে বিচারক এবং শাসকদের জন্য ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজেও তাসবীব জায়েজ। অতএব মুয়াজ্জিন শাসকদেরকে এই শব্দ দ্বারা তাসবীব করবে,

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ مَرْ عَلَى الصَّلَاةِ مَرْ عَلَى الصَّلَاةِ مَرْ عَلَى الصَّلَاةِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ.

ইমাম মুহাম্মদ (র.) উহাকে দুর্বোধ মনে করেছেন। দুর্বোধের কারণ হচ্ছে-শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল মুসল্লি সমপর্যায়ের। রাজা হোক প্রজা হোক অতএব বাদশার কোনো অতিরিক্ত বেশিষ্টা থাকবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বাদশা এবং শাসকদেরকে তাসবীবের সাথে খাস করেছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা জনসাধারণের কাজে ব্যস্ত থাকে। এ জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে পুনঃ ঘোষণা দেবে। যাতে তাঁদের জামাআত ছুটে না যায়। এরপন্থ হকুম এই সব লোকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে যারা জনগণের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেমন মুফতি, বিচারক ইত্যাদি।

ফায়দা : আযানের পর চল্লিশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় বিরত থাকবে। অতঃপর তাসবীব করবে।

وَجَلَسَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ  
 يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا جَلَسَةً خَفِيفَةً لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَصْلِ إِذَا وَصَلَ مَكْرُوهٌ وَلَا  
 يَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْنَةِ لِوُجُودِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فَيَفْصَلُ بِالْجَلَسَةِ كَمَا بَيْنَ  
 الْخُطْبَتَيْنِ وَلَا بِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّ التَّأخيرَ مَكْرُوهٌ فَيَكْتَفِي بِأَذْنَى الْفَصْلِ اخْتِرَازًا  
 عَنْهُ وَالْمَكَانَ فِي مَسْأَلَتِنَا مُخْتَلِفٌ وَكَذَا التَّغْنَةُ فَيَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْنَةِ وَلَا كَذَلِكَ  
 الْخُطْبَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يُفْصَلُ بِرُكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْفَرْقُ قَدْ  
 ذَكَرْنَاهُ قَالَ يَعْقُوبُ رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ (رح) يُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَ  
 الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَهَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَاهُ وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسَّنَةِ لِقَوْلِهِ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارَكُمْ -

অনুবাদ : মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আযান ও ইকামতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন বলেন যে, মাগরিবের সময় ও স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। কেননা আযান ও ইকামতে ব্যবধান করা আবশ্যিক। আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া মাকরুহ। আর স্বর-বিরতি বা নীরবতা ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো আযানের কলমাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং স্বল্পক্ষণ বসা দ্বারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই খুতবার মাঝখানে হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো যে, মাগরিবে বিলম্ব করা মাকরুহ। সুতরাং তা পরিহার করার জন্য ন্যূনতম ব্যবধানেই যথেষ্ট হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং স্বরও ভিন্ন। সুতরাং স্বল্প বিরতি দ্বারাই ব্যবধানগণ্য হবে। পক্ষান্তরে খুতবা সেক্ষণ নয়। ইমাম মাফেঈ (রা.) অন্যান্য নামাজের ওপর কিয়াস করে বলেন যে, দুই রাক'আত নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে (অন্য নামাজ থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করছি) ইমাম ইয়াকুব (আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে আযান ও ইকামত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি, এটি তার সমর্থন করে। আর এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুয়াজ্জিনের শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যিক। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارَكُمْ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আযান দেবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত যে, আযান ও ইকামতকে একত্রে মিলানো মাকরুহ। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে হুকুম দিয়েছেন, لَا كَلِمَةَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ تَدْرِمَا بَعْرًا অর্থাৎ হে বিলাল! তুমি আযান ও ইকামতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি দাও, যাতে একজন খাবাররত ব্যক্তি খাবার খেয়ে অবসর হতে পারে। দ্বিতীয় দলিল—আযানের উদ্দেশ্য মানুষকে সময় দাখেল হওয়ার সংবাদ দেওয়া। যাতে সে নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে নামাজের জন্য মসজিদে যেতে পারে। আযান ও ইকামত মিলানোর দ্বারা এ উদ্দেশ্য ফুটত হয়ে যায়। এ জন্য আযান এবং ইকামত মিলানো মাকরুহ তাই ব্যবধান করা উচিত। যদি নামাজ এমন হয়, যার পূর্বে সুন্নত বা মোত্তাহাব নামাজ আছে, তাহলে আযান এবং ইকামতের মধ্যে (ঐ) নামাজের দ্বারা ব্যবধান করবে। যেমন ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত সুন্নত এবং জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত মসনুন। আসরের পূর্বে চার রাক'আত এবং ইশার পূর্বে চার রাক'আত মোত্তাহাব। দলিলঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেছেন, **كَلَّا أَذَانَيْنِ** প্রত্যেক আযান এবং ইকামতের মাঝে নামাজ রয়েছে। রাসূল ﷺ এ কথা তিন বার বলেছেন। তৃতীয় বার বলেছেন **يَنْصِلُ يَنْصِلُ يَنْصِلُ** যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যদি নামাজ না পড়ে তাহলে হালকা বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবধান করবে। মোট কথা ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাগরিব ব্যতীত, সকল নামাজে আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। মুয়াজ্জিনের জন্য ঐ সময়ে সুন্নত বা নফল পড়া উত্তম। মাগরিবের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা থেকে দু'টি রেওয়ায়েত আছে।

এক. মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝখানে নীরবভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ পরিমাণ ব্যবধান করা মোস্তাহাব, যে সময়ের মধ্যে তিনটি ছোট আয়াত বা বড় একটি আয়াত পড়া যায়।

দুই. এ পরিমাণ ব্যবধান করবে যাতে তিন কদম চলতে পারে। সাহেবাইনের মতে মাগরিবের মধ্যে অপেক্ষা করবে। তবে অতি অল্প সময় অপেক্ষা করবে। যেমন দু' খুতবার মধ্যে ব্যবধান হয়। সাহেবাইনের দলিল এটা সর্ব সম্মত কথা যে, আযান ও ইকামতের মধ্যে মিলানো মাকরুহ এবং ব্যবধান করা জরুরি। বা ভূমিকায় গিয়েছে। এ কথা প্রায় সর্বসম্মত যে, শুধু নীরব থাকার দ্বারা ব্যবধান সংঘটিত হয় না। কেননা নীরবতা তো আযানের শব্দের মাঝখানেও পাওয়া যায়। এ জন্য বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবধান করবে, যদিও তা সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন— জুমার দিনের দু' খুতবার মাঝে বসে ব্যবধান করা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল মাগরিবের নামাজে বিলম্ব করা মাকরুহ। আমরা পূর্বে এর কারণ বর্ণনা করেছিলাম যে, সূর্যাস্তের পর ফরজের পূর্বে কোনো নফল পড়বে না স্বল্প বিরতি দেবে যাতে অধিক বিলম্ব করা হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং আযান ও ইকামতের মধ্যেও বিরতি হয়ে যায়। সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব হলো— আযান ও ইকামতের মাঝখানের বিরতিতে দু'খুতবার মাঝখানের বিরতির উপর কিয়াস করা জায়েজ নেই। কেননা উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল সম পার্থক্য। আযান ও ইকামতের স্থান বিভিন্ন হয় এবং উভয়ের ধ্বনি বিভিন্ন হয়। যেমন— আযান তারাসসুল করা হয় বা ধীরলয়ে থেমে থেমে তা দেওয়া হয়, পক্ষান্তরে ইকামত হদর বা দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করা হয়। উভয়ের মধ্যে মুয়াজ্জিনের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেননা আযানের সময় স্থায়ী আসুলুয দু'কানে দাখেল করে। পক্ষান্তরে ইকামতে হাত ছেড়ে দেয়। এর বিপরীত হলো খুতবা। কেননা উভয় খুতবার স্থান এক, উভয় খুতবার ধ্বনি ও স্বর এক, উভয় খুতবায় খতীবের অবস্থা এক। অতএব এতবড় পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে একটিকে অপরটির ওপর কিয়াস করা কিভাবে জায়েজ হবে? ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দু'রাকআতের দ্বারা ব্যবধান করবে। দলিল হলো— মাগরিবকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাগরিব এবং অন্যান্য নামাজের পার্থক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাগরিবকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা কিয়াস মাআল ফারিক (قياس مع الفارق) বা অসম বস্তুর উপর কিয়াস করার ন্যায় বলেছেন। কেননা মাগরিবের নামাজে বিলম্ব করা মাকরুহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য নামাজে বিলম্ব করা মাকরুহ নয়। অতএব মাগরিবের নামাজকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা কিভাবে সহীহ হবে?

হিদায়া গ্রন্থকারের উপর বিশ্বাস যে, সময়ের অধ্যায়ে মাগরিবের সময় সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাগরিবের সময় এতটুকু, যার মধ্যে অজু, আযান এবং ইকামতের পর তিন রাকআত আদায় করা যায়। আর এখানে লেখেছেন যে, আযান ও ইকামতের মধ্যে দু'রাকআতের দ্বারা ব্যবধান করবে। এ দু'মত কিভাবে একত্রিত হতে পারে? জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাগরিবের সময়ের ব্যাপারে দু'টি মত, খাদিম (র.) ইমাম গাযালী (র.)-এর বরাত দিয়ে সময়ের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার সময়ের অধ্যায়ে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর একটি মত উল্লেখ করেছেন এবং এখানে (আযান অধ্যায়ে) দ্বিতীয় মত উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে, মাগরিবের সময় এতটুকু যার মধ্যে অজু, আযান এবং ইকামতের পর পাঁচ রাকআত নামাজ পড়তে পারা যায় অর্থাৎ তিন রাকআত ফরজ এর এবং দু'রাকআত— যার দ্বারা আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, আমি ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে দেখিছি যে, তিনি আযান এবং ইকামত দিয়েছেন এবং আযান ও ইকামতের মাঝে বসেননি।

আবু ইউসুফ (র.)-এর উক্তি দ্বারা দু'টি বস্তু বুঝা গেল। এক. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে আযান ও ইকামতের মধ্যে অপেক্ষা করবে না। দুই. আযান প্রদানকারীকে আহকামে শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হতে হবে। দলিল রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন **وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيارَكُمْ وَلِيُؤْمَرَكُمْ اَقْرانَكُمْ** অর্থ-তোমাদের জন্য তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আযান দেবে এবং তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে অধিক জ্ঞাতা ব্যক্তি ইমামতি করবে।



وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةً لَيْلَةَ التَّغْرِيسِ بِأَذَانٍ  
وَإِقَامَةٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ فَإِنْ قَاتَتْهُ صَلَوَاتُ أَذْنٍ  
لِلْأَوَّلَى وَأَقَامَ لِمَارَوَيْنَا وَكَانَ مُحْخِرًا فِي الْبَاقِي إِنْ شَاءَ أَذْنٌ وَأَقَامَ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ  
عَلَى حَسْبِ الْأَدَاءِ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُورٌ  
قَالَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ يَقَامُ لِمَا بَعْدَهَا قَالُوا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا -

অনুবাদ : কাজা নামাজের জন্যও আযান এবং ইকামত দেবে। কেননা রাসূল ﷺ সফর থেকে ফিরার পথে  
রাতে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পরবর্তী সকালে আযান ও ইকামত দিয়ে ফজরের নামাজ কাজা করেছেন। শুধু  
ইকামতকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে এ হাদীস ইমাম শাফে'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। যদি কারো কয়েক ওয়াক্ত  
নামাজ ছুটে যায় বা কাজা হয়, তাহলে প্রথম নামাজের জন্য আযান দেবে ও ইকামত বলবে। দলিল, আমাদের পূর্ব  
বর্ণিত হাদীসটির কারণে। অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামত দেবে, যাতে  
কাজা নামাজ আদা নামাজের মতো হয়। আর ইচ্ছা করলে শুধু ইকামতের উপর নির্ভর করতে পারবে। কেননা আযান  
দেওয়া হয় মুসল্লিদের উপস্থিত করার জন্য। আর এখানে তারা উপস্থিত (আগে থেকেই) আছে। হিদায়া গ্রন্থকার  
বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী নামাজসমূহের জন্য ইকামতই দেওয়া হবে। মাশায়েখ  
কিয়াসও বলেন যে এটা তাঁদের (আবু হানীফা (র.) আবু ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.) সর্বসম্মত মত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাজা নামাজের জন্যে আযান দেবে এবং ইকামত দিবে, চাই নামাজ একাকি পড়ুক বা জামাত বন্দী হয়ে পড়ুক। ইমাম  
শাফে'ঈ (র.)-এর মতে ইকামতই যথেষ্ট, আযানের প্রয়োজন নেই। আমাদের দলিল, রাতে ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা, একে  
লায়লাতুত তারীসের ঘটনা বলে। তারীস (تعريس) বলা হয় শেষ রাতে ঘুমানো। এ ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন  
শব্দে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ইমাম আবু দাউদ (র.)-এর বরাত দিয়ে এ শব্দে নকল করেছেন।

إِنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِإِلَّا بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حِينَ تَأْمُرُوا عَنِ الصُّبْحِ وَصَلَوْهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ -

অর্থ-রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন সাহাবারা সকালের নামাজের  
সময়ে ঘুমিয়ে ছিলেন এবং সূর্য উদয় হবার পর তা কাজা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ ঘটনা এভাবে নকল করেছেন।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَذَ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ يَلَالٌ أَنَا أَوْطَيْكُم فَاظْطَجِعُوا وَاسْتَنْدِ يَلَالٌ ظَهَرُوا إِلَى  
رَاجِلَيْهِ فَعَلَبْتُهُ عَيْنًا فَنَامَ فَاسْتَبَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا يَلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ  
مَا أَفْقَيْتَ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ يَا يَلَالُ فَمَ فَإِنَّ  
النَّاسَ بِالصَّلَاةِ قَتُومًا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْتَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً -

উভয় রেওয়াজেই দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ লাইলাতুত তারীসের সকালের নামাজ বেলা উদয় হবার পর আযান ও ইকামতের সাথে কাজা করেছেন। ইমাম শাফেঈ (র.) মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তা হচ্ছে **أَمَرَ بِإِلَّا نَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ** অর্থ- রাসূল ﷺ বিলাল (রা.)-কে ইকামত দিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের (সাহাবীদের)-কে নিয়ে নামাজ পড়লেন। এ হাদীসে আযানের কথার উল্লেখ নেই। অতএব বুঝা গেল যে, কাজা নামাজের জন্য ইকামতই যথেষ্ট। জবাব হলো, অন্যান্য সহীহ রেওয়াজেতে আযানের কথার উল্লেখ আছে। অতএব যে রেওয়াজেতে উভয়ের উল্লেখ আছে তার ওপর আমল করাই উত্তম। আমাদের মতের সমর্থন এ রেওয়াজেত দ্বারাও হয় যে, খন্দকের যুদ্ধে যখন রাসূল ﷺ -এর নামাজ কাজা হলো, তখন রাসূল তা আযান ও ইকামতসহ আদায় করেছিলেন। অতএব এতগুলো হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতনৈক করা সমীচীন মনে হচ্ছে না।

**فَإِنْ نَافَتْهُ صَلَوَاتُ النَّح** যদি কোনো ব্যক্তির কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়, তাহলে প্রথম নামাজের জন্য আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। দলিল লায়লাতুত তারীসের হাদীস। অবশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে আযান দেবে এবং এ ইকামতও বলবে, যাতে কাজাটা আদায় বা ওয়াক্তিয়ার মতো হয়ে যায়। ইবনে হুমাম (র.) কর্তৃক আবু ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়াজেতে দ্বারা উহার সমর্থন হয়

**أَنَّهُ ﷺ حِينَ شَفَلَهُمُ الْكَفَّارَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَضَاهَنَ عَلَى الْوَلَاءِ وَأَمَرَ بِإِلَّا أَنْ يُؤَدَّنَ وَيُقِيمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ -**

অর্থ- আহ্যাবের যুদ্ধের সময় কাফিররা রাসূল ﷺ -কে চার ওয়াক্ত নামাজ (জোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা) হতে বিরত রেখেছে। রাসূল ﷺ সেগুলো ক্রমান্বয়ে আদায় করেছেন। বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য আযান এবং ইকামত বলো। আর ইচ্ছা করলে শুধু ইকামতের ওপর যথেষ্ট করতে পারো। দলিল হলো যে, আযান দেওয়া হয় মানুষকে একত্রিত করার জন্য। এখানে সকলে উপস্থিত আছে বিধায় আযানের প্রয়োজন নেই। যাহিরুর রেওয়াজেতের (ظاهر الرواية) বাহিরে ইমাম মুহাম্মদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যদি কতিপয় নামাজ কাজা হয় তাহলে প্রথম নামাজটি আযান এবং ইকামতের সাথে আদায় করবে। অবশিষ্ট নামাজগুলো শুধু ইকামতের সাথে আদায় করবে। মাশাইখগণ বলেছেন, হতে পারে এটা ইমাম মুহাম্মদ (রা.) ইমাম আবু ইউসুফ (রা.) এবং আবু হানীফা (রা.) সকলের মত।

وَيُغْنِي أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى طَهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ - وَكَرَّهَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ وَيُرْوَى أَنَّهُ لَأَكْرَهَ الْإِقَامَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ وَيُرْوَى أَنَّهُ يَكْرَهُ الْأَذَانَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا لَا يَجِبُ بِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ رَوَايَةً وَاحِدَةً وَوَجْهَ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ هُوَ أَنَّ لِلْأَذَانَ شَبَهًا بِالصَّلَاةِ فَيَسْتَرْطِ الطَّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدِيثَيْنِ دُونَ أَخْفَاهُمَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِذَا أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَقَامَ لِابْعِيدَ وَالْجُنُبُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَاءَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِخِفَةِ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ رَوَايَتَانِ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْأَذَانَ دُونَ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ تَكَرَّرَ الْأَذَانَ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ وَقَوْلُهُ إِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَاءَهُ يَغْنِي الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ بِدُونِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ -

অনুবাদ : পবিত্র অবস্থায় আযান ও ইকামত দেওয়া উচিত। তবে অজু ছাড়া আযান দিলে জায়েজ হবে। কেননা এটা (আল্লাহর) জিকির, নামাজ নয়। সুতরাং তাতে অজু মোস্তাহাব মাত্র। যেমন কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে। অজু ছাড়া ইকামত বলা মাকরুহ হবে। কেননা তাতে ইকামত ও নামাজের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্ণিত আছে যে, ইকামত মাকরুহ হবে না। কেননা এটাতো দু' আযানের মধ্য হতে একটি। অন্য এক রেওয়াজেও মুতাবিক আযানও (অজু ছাড়া) মাকরুহ হবে। কেননা সেতো এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, যার প্রতি সে নিজেও সাড়া দেয়নি। জুনুবী অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরুহ। এ সম্পর্কে মাত্র একটি বর্ণনা আছে। মুহুদিছের আযান সম্পর্কীয় দু'টি রেওয়াজেতের মধ্যে থেকে মাকরুহ না হওয়ার রেওয়াজেতটির সাথে পার্থক্য হলো, নামাজের সাথে আযানের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের উপর আমল হিসাবে দুই হৃদয়ের যেটি সবচেয়ে কাঠোর, তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের শর্ত আরোপ করা হবে, যেটি হালকা তা থেকে পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হবে না। আল্ জামেউস সগীর নামক গ্রন্থে আছে অজু ছাড়া আযান ও ইকামত দিলে তা দোহরাতে হবে না আর জানাবাতের বেলায় দোহরানোই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তবে না দোহরালেও চলে। প্রথমটির কারণ হাদাসের লঘুতা। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জানাবাতের কারণে দোহরানের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তবে অধিতর যুক্তিপূর্ণ এটি যে, আযান দোহরানো উচিত। কিছু ইকামত দোহরাতে হবে না। কেননা পুনঃ আযান শরিয়ত অনুমোদিত। পুনঃ ইকামত অনুমোদিত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নামাজ আদায় হয়ে যাবে। কেননা নামাজ তো আযান ও ইকামত ছাড়াও জায়েজ হয়।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোস্তাহাব হলো আযান ও ইকামত অঙ্গুর সাথে দেওয়া। কিন্তু যদি অঙ্গু ছাড়া আযান দেয় তাহলে যাহিরুর রেওয়ায়েত (ظاهر الرواية) অনুযায়ী আযান জায়েজ হবে। মাকরুহ হবে না। দলিল, আযান আদ্বাহর জিকির, নামাজ নয়। আদ্বাহর জিকিরের জন্য অঙ্গু মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। অতএব আযানের জন্য অঙ্গু মোস্তাহাব হবে, যেমন- কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অঙ্গু মোস্তাহাব। ইমাম গামালী (র.)-এর মতে আযানের জন্য অঙ্গু শর্ত। ইমাম তিরমিযী (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন لَا تَوُضُّنَ إِلَّا مَتَوَصِّينَ অঙ্গু ছাড়া আযান দেবে না। আমরা জবাব দেব যে. এখানে আমরা (امر) টি ইসতেহাব (استحباب)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَكُرِّهَ أَنْ يُقِيمَ الْخُ: অঙ্গু ছাড়া ইকামত বলা মাকরুহ। কেননা এতে মুয়াজ্জিনের ইকামত ও নামাজের মধ্য ব্যবধান হয়ে যায়। অথচ ইকামত নামাজের সাথে আরম্ভ করা হয়েছে। ইমাম কারখী (র.)-এর বর্ণনা মুতাবিক তা মাকরুহ নয়। কেননা ইকামত দু' আযানের মধ্য হতে একটি। আযান অঙ্গু ছাড়া মাকরুহ নয়। অতএব ইকামতও মাকরুহ হবে না। কারখী (র.)-এর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, আযান অঙ্গু ছাড়া মাকরুহ হবে। কেননা সে আযানের মাধ্যমে লোকদেরকে নামাজের প্রকৃতি গ্রহণের জন্য আহ্বান করছে। অথচ সে নিজে এর জন্য প্রকৃতি নয়নি। বিধায় তা এ আযাতের আওতায় পড়বে - أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِطَاعِهِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ -

وَكُرِّهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْخُ: জানাবাতের অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরুহ। এ সম্পর্কে মাত্র একটি রেওয়ায়েত আছে। মাকরুহ না হওয়ার কোনো রেওয়ায়েত নেই। তবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অঙ্গু ছাড়া আযান দিলে, দুটি রিওয়ায়েত আছে, একটি মাকরুহ হওয়ার, অপরটি মাকরুহ না হওয়ার। জুনুবীর আযান মাকরুহ হওয়ার রেওয়ায়েত এবং মুহদিছ ব্যক্তির আযান মাকরুহ না হওয়ার রিওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো যে, আযান নামাজের সাদৃশ্য এদিক থেকে যে, উভয়টি তাকবীরের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। উভয়টি কেবলার দিক মুখ করে আদায় করা হয়। আযানের শব্দ নির্দিষ্ট যেমন নামাজের আরকান নির্দিষ্ট। উভয়টি সময়ের সাথে নির্দিষ্ট এবং উভয়টির মাঝে কথা বলা নিষেধ। উক্ত দিক থেকে আযান নামাজের মতো, তবে আযান প্রকৃতপক্ষে নামাজ নয়। মোটকথা আযান একদিক থেকে নামাজের সাদৃশ্য, অন্য দিক থেকে সাদৃশ্য নয়। যদি সাদৃশ্যতার দিক লক্ষ্য করা হয় তা হলে অঙ্গু ছাড়া আযান না জায়েজ হওয়া চাই। অনুরূপভাবে জানাবাতের অবস্থায়ও আযান না জায়েজ হওয়া চাই। পক্ষান্তরে যদি অসাদৃশ্যতার দিক লক্ষ্য করা হয় তাহলে উভয় (অঙ্গু ছাড়া এবং জানাবাত) অবস্থায় আযান কারাহাত (كراهت) ছাড়াই জায়েজ হওয়া চাই। আমরা উভয় সাদৃশ্যতার উপর আমল করছি। জানাবাতের অবস্থায় নামাজের সাদৃশ্যতার ইতিবার (اعتبار) করে বলেছি যে, আযানের জন্য পবিত্রতা শর্ত। অতএব জানাবাতের অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরুহ। এবং হদস (حدث) বা অঙ্গুবিহীন অবস্থায় নামাজের সাথে অসাদৃশ্যতার ইতিবার (اعتبار) করে আমরা বলেছি যে, আযানের জন্য তাহারাত (طهارت) শর্ত নয়। অতএব হদস বা অঙ্গু ছাড়া অবস্থায় আযান দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামিউস সগীর" নামক গ্রন্থে বলেছেন, যদি অঙ্গু ছাড়া আযান ও ইকামত বলে, তাহলে আযান ও ইকামত দোহরাতে (র.) "জামিউস সগীর" নামক গ্রন্থে বলেছেন, যদি অঙ্গু ছাড়া আযান ও ইকামত বলে, তাহলে আযান ও ইকামত দোহরাতে হবে না। তবে যদি জুনুবী ব্যক্তি আযান ও ইকামত বলে তাহলে আমার মতে উহা দোহরানো মোস্তাহাব। তাহাবী শরীফের ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে. চার শ্রেণীর মানুষের আযান দোহরানো মোস্তাহাব, ১. জুনুবী ব্যক্তি, ২. মহিলা, ৩. (নিশা করে) মাতাল ভাষ্যে উল্লেখ আছে যে. চার শ্রেণীর মানুষের আযান দোহরানো মোস্তাহাব, ১. জুনুবী ব্যক্তি, ২. মহিলা, ৩. (নিশা করে) মাতাল ৪. এবং ব্যক্তি পাগল। কিন্তু যদি জুনুবীর আযান ও ইকামত না দোহরায় তবুও যথেষ্ট হবে। সর্বাবস্থায় মুহদিছ (محدث)-এর আযান ও ইকামত দোহরাতে না। কেননা হদস (حدث) হালকা নাপাক। তবে জুনুবীর আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে দুটি রেওয়ায়েত আছে। ১. দোহরাতে ২. দোহরাবেনা। অধিক যুক্তি সঙ্গত হলো যে জুনুবীর আযান দোহরাতে, তবে ইকামত দোহরাতে না। কেননা পুনঃ আযান শরিয়ত অনুমোদিত, যেমন জুমার নামাজে দু'বার আযান দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃ ইকামত শরিয়তে অনুমোদিত নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য أَنْ لَمْ يَبْدَأْ أَجْزَاءً -এর উদ্দেশ্য হলো শরিয়তে অনুমোদিত হবে, কেননা আযান ইকামত ছাড়াও নামাজ জায়েজ হয়। অতএব দোহরানো ছাড়াই অনায়াসে জায়েজ হবে।

قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَدِّنُ مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَادَ لِحَقِّعَ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ وَلَا يُؤَدِّنُ لِمَلُولَةٍ قَبْلَ دُخُولِ قُبُورِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النَّيْصِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ لِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَالْحُجَّةِ عَلَى الْكُلِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَالٍ (رض) لَا تُؤَدِّنُ حَتَّى يَسْتَسِينَنَّ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا وَالْمَسَافِرُ يُؤَدِّنُ وَيَقِيمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ إِذَا سَافَرْتُمْ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا فَإِنْ تَرَكَهُمَا جَمِيعًا يَكْرَهُ وَلَوْ اكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ جَازٍ لِأَنَّ الْأَذَانَ لَا يَسْتَحْضِرُ الْغَائِبِينَ وَالرَّفَقَةَ حَاضِرُونَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الْإِفْتِتَاحِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُخْتَاجُونَ فَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ بَصَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِيَكُونَ الْأَذَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَازٍ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا -

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, স্ত্রীলোক যদি আযান দিয়ে থাকে তাহলেও এরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ তাহলে আযান দোহরানো মোস্তাহাব। যাতে আযান সুন্নত মুতাবিক হয়ে যায়। সময় হওয়ার পূর্বে কোনো নামাজের আযান দেওয়া বৈধ নয়, এরূপ করলে সময় হওয়ার পর পুনঃ আযান দিতে হবে। কেননা আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার শামিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন এবং এটি ইমাম শাফেঈ (র.)-এর অভিমতও বটে যে, ফজরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষার্ধে আযান দেওয়া বৈধ। কেননা হারামাইন শরীফের অধিবাসীদের যুগ পরস্পরায় তা চলে আসছে। এ সকলের বিপক্ষে দলিল হলো হযরত বিলাল (রা.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর এ নির্দেশ, অর্থ-ফজর এরূপ ফরসা হওয়ার পূর্বে আযান দিবে না। একথা বলে তিনি উভয় হাত আড়াআড়িভাবে প্রসারিত করলেন। মুসাফির আযান ও ইকামত দেবে। কেননা রাসূল ﷺ আবু মুলাইকার দুই পুত্রকে বলেছিলেন, إِذَا سَافَرْتُمْ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং ইকামত বলবে। যদি আযান ও ইকামত দুটোই তরক করে, তাহলে তা মাকরুহ হবে। আর যদি শুধু ইকামত বলে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কেননা (হুলত) আযান অনুপস্থিতদের উপস্থিত করার জন্য। অথচ সফরসঙ্গীরা তো উপস্থিতই আছে। পক্ষান্তরে ইকামত হলো নামাজ আরম্ভের ঘোষণার জন্য। আর উপস্থিতদের জন্য এর প্রয়োজন আছে। যদি নগরীতে স্থায়ী গৃহে নামাজ আদায় করে, তাহলে আযান-ইকামত দিয়েই নামাজ আদায় করবে, যাতে জামাআতের নিয়ম অনুসারে নামাজ আদায় হয়। আর যদি তরক করে, তাহলেও তা জায়েজ আছে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, মহত্মার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জুনুসী ব্যক্তির আযান যেরূপ দোহরাত হইয় অনুরূপভাবে মহিলারা আযান দিলে তাও দোহরাত হইবে। কেননা আযান সুন্নত তরীকায় দেওয়া চাই, আর সুন্নত তরীকা হইলো মুয়াজ্জিন পুরুষ হওয়া, মহিলার আযান দেওয়া সুন্নত নয় বরং বিন্দআত। কেননা যদি মহিলা উষ্ট্রেখরে আযান দেয় তাহলে সে হারাম কাজ করল। কেননা মহিলার ধর্মইও সতরের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের সতর

ঢাকার ন্যায় আওয়াজকে গায়ের মাহরামের নিকট প্রকাশ না করা ওয়াজিব। কেননা সে আযানের ধ্বনি বুলন্দ করলে আযানের উদ্দেশ্য ফুটত হয়ে যাবে। এজন্য মহিশার আযান সোহরানো মোস্তাহাব। খিতীয কথা হলো, মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত নেই। কেননা এ দু'টি জামাআতের নামাজের জন্য সুন্নত। আর মহিলাদের জন্য জামাআতে যাওয়ার হুকুম মনসুখ (منسوخ) বা রহিত হয়ে গেছে। তবে যদি তারা জামাআতের সাথে নামাজ পড়তে চায় তাহলে আযান ও ইকামত ছাড়াই নামাজ পড়বে।

দলিল রয়েছে (الإنطة) -এর হাদীস - **فَالْتَمَسْنَا جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ أَمْتُنَا عَائِشَةُ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ** -

রায়েতা (রা.) বলেন, আমরা মহিলাদের জামাআত করেছি, হযরত আয়শা (রা.) আযান ও ইকামত ব্যতীত ইমামতি করেছেন।

নামাজের সময় দাখিল হওয়ার পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কেউ সময়ের পূর্বে আযান দিল তাহলে সময় আসলে পুনঃ আযান দিতে হবে। কেননা আযানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নামাজের সময় দাখিল হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আর সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শামিল। তাই সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেনছেন, যা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতও বটে যে, ফজরের ক্ষেত্রে রাতের শেষার্ধে আযান দেওয়া বৈধ। তাঁদের থেকে অন্য একটি রেওয়ায় আছে পূর্ণ রাত ফজরের আযানের সময়। তাঁদের দলিল হলো মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের নিকট ইহা যুগ পরম্পরায় চলে আসছে, যে তাঁরা ফজরের জন্য রাতের শেষার্ধে আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

**إِنَّ بِلَا يُؤَدِّنُ يَلِيلٍ مَكَلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ إِبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ -**

অর্থ- রাতে বিলাল (রা.) আযান দেন, তোমরা খাবার খাও এবং পান করো, ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত বিলাল (রা.) ফজরের পূর্বে রাতে আযান দিতেন। চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এ হাদীস আমাদের দলিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল নয়। কেননা হযরত বিলাল (রা.)-এর আযান তাহাজ্জুদের নামাজ এবং সাহরী খাওয়ার জন্য ছিল, ফজরের নামাজের জন্য ছিল না। ফজরের নামাজের জন্য ছিল ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান। তিনি ফজরের নামাজের সময় দাখিল হওয়ার পর আযান দিতেন।

অন্যথা **حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ إِبْنِ مَكْتُومٍ** ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত-এর কোনো অর্থ হয় না। তাঁদের বিপক্ষে এ হাদীস আমাদের দলিল। রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, আযান দিবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ বীয হস্তদ্বয় চওড়াভাবে প্রসারিত করে ইঙ্গিত করলেন, এ দ্বারা সুবহি সাদিক এর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। ইবনে আব্দিল বার ইব্রাহীম (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

**فَالْكَانُوا إِذَا أَدْنَى الْمُؤَذِّنُ يَلِيلٍ قَالُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ وَاعِدَ أَذَانَكَ -**

অর্থ-ইব্রাহীম (র.) বলেন যে, সাহাবীদের এই রীতি ছিল যে, যখন মুয়াজ্জিন রাতে (সুবহি সাদিকের পূর্বে) আযান দিতেন, তখন সাহাবীরা তাকে বলতেন যে, আযানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা এবং আযান দোহরিয়া দাও।

প্রশ্ন ৪ : হাদীসে আসছে **لَا تَغْرِزُكُمْ أَذَانُ يَلِيلٍ** অর্থ- বিলালের আযান তোমাদেরকে যেন ধোঁকায় না ফেলে এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বিলাল (রা.) সময়ের পূর্বে রাতে আযান দিতেন।

জবাব : এ হাদীস আমাদের দলিল, কেননা রাসূল ﷺ বিলাল (রা.)-এর আযান গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; বরং লোকদের ধোঁকা না খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

الح : মুসাফিরের জন্য আযান ও ইকামত বলা উচিত। দলিল রাসূল ﷺ আবু মুলাইকার দুই পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছে **وَإِذَا سَفَرْتُمْ فَأَذِّنَا وَأَقِمْنَا** অর্থ- যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং ইকামত বলবে। নিহায়া গ্রন্থকার লিখেছেন যে, মবসূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ এ হাদীসে আবু মুলাইকার দু'পুত্র ব্যতীত অন্যকে সন্মোদন করে বলেছেন।

رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِمَالِكِ ابْنِ الْحَوَرِثِ وَأَبْنِ عِمٍ لَهُ إِذَا سَأَرْتُمَا فَاذْنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤْمِمَا أَكْثَرَ كَمَا قُرَأْنَا  
وَرَوَى فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَلْيُؤْمِمَا أَكْبَرَ كَمَا سَيَأْ

রাসূল ﷺ, মালিক ইবনে হুয়াইরিস এবং তার চাচাতো ভাইকে বললেন, তখন তোমরা সফর করার বৈশিষ্ট্য আযান দেবে এবং ইকামত দেবে। আর তোমাদের দুজনের মধ্য হতে যে অধিক কুরআন পড়েছে সে ইমামতি করবে। ফখরুল ইসলাম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে। আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরীফে আছে

بُعِيبٌ رَأَى مِنْ رَأْيِي غَنِيَةً فِي رَأْيِ شَيْطَانِي بِوَدْنِ الصَّلَاةِ وَيَصَلِّي فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْظِرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا بِوَدْنِ وَيُؤْمِمُ لِلصَّلَاةِ بِخَافٍ مَتَى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ -

অর্থ- তোমার প্রতিপালকের নিকট বকরির ঐ সব রাখালগণ গ্নিয়। যারা পাহাড়ের চূড়ায় আযান দেয় এবং নামাজ আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার প্রতি নজর কর যে, সে আযান দেয় এবং নামাজের জন্য ইকামত দেয়, আমাকে ভয় করে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবো। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে,

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُضُ فَلَاةً فَحَاتَتِ الصَّلَاةَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتِمِّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلًى مَعَهُ مَلَكَانِ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلًى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يَرَى طَرَفَاهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) -

অর্থ-সালমান ফার্সী (র.)-এর সূত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত আছে। যখন কোনো মানুষ ময়দানে একাকীভাবে থাকে অতঃপর যখন নামাজের সময় আসে, তখন সে যেন অজু করে। যদি পানি না পায়, তাহলে যেন তায়ামুম (تيمم) করে। অতঃপর সে যদি সে ইকামত বলে তাহলে দু' ফেরেশতা তার সাথে নামাজ পড়ে। আর যদি সে আযান দেয় এবং ইকামত বলে তাহলে তার পিছনে আল্লাহর সৈনিকদের বড় দল নামাজ পড়ে যার প্রান্তের দুরুতুকে সে দেখতে সক্ষম হয় না। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, আযানের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু নয় যে, মুযাজ্জিন লোকদের উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দেবে; বরং এটাও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর ধীন জমিনে বুলন্দ হওয়া। তার পিছনে এবং ময়দানে জিন এবং ইনসানকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া- যাদেরকে মুযাজ্জিন দেখতে সক্ষম হয় না।- (ফতুহুল কাদির) গ্রন্থকার বলেন যে, মুসাফির যদি আযান ও ইকামত উভয় ছেড়ে দেয়, তাহলে মাকরুহ হবে। কেননা এটা মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত। আর যদি ইকামত বলে এবং আযান ছেড়ে দেয় তাহলে জায়েজ হবে। দলিল, আযানের উদ্দেশ্য হলো অনুপস্থিত লোকদেরকে নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া, যাতে তারা নামাজের তৈরি নিয়ে নামাজের জন্য আসতে পারে। যেহেতু সফরে সফরসঙ্গীরা সর্বদা উপস্থিত থাকে তাই এখানে আযানের বেশি প্রয়োজন নেই। ইকামত বলা হয় নামাজ আরম্ভের ঘোষণা দেওয়ার জন্য। আর উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যও এর প্রয়োজন আছে। যদি নগরীতে স্বীয় গৃহে নামাজ পড়তে চায় তাহলেও আযান ও ইকামতের সাথে নামাজ পড়বে। চাই নামাজ একাকি পড়ুক বা জামাতের সাথে পড়ুক। যাতে নামাজ জামাআত অনুযায়ী আদায় হয়। পক্ষান্তরে যদি উভয়টা তরক করে তাহলেও জায়েজ আছে। দলিল, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আলকামা (রা.) এবং আসুওয়াদ (রা.)-কে নিয়ে আযান এবং ইকামত ছাড়াই নামাজ পড়িয়েছেন। জৈনেক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে প্রশ্ন করল যে, আপনি আযান ও ইকামতের মধ্য হতে কোনোটাই দিলেন না ব্যাপার কী? তখন তিনি বললেন, اَذَّنَ اَلْحَيُّ يَكْفِيْنَا মহত্বার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর কারণ হচ্ছে যে, মুযাজ্জিন আযান ও ইকামতে মহত্বাবাসীর প্রতিনিধি হয়। কেননা মহত্বাবাসীরা তাঁকে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করেছে। অতএব যে ব্যক্তি মহত্বার মধ্যে আযান এবং ইকামত ছাড়া নামাজ আদায় করবে, ধরে নেওয়া হবে যে, সে আযান ও ইকামতের সাথে নামাজ আদায় করেছে। তাই তার নামাজ মাকরুহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি মুসাফির আযান ও ইকামত ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে আযান এবং ইকামত তরককারী হিসাবে জ্ঞান করা হয়। সে প্রকৃতপক্ষে জামাআত তরককারী এবং জামাআত তরককারীদের সাদৃশ্য পূর্ণ হলো। আর জামাআতের নামাজ তরক করা মাকরুহ। অনুরূপভাবে জামাআতের সাদৃশ্যতা বর্জন করাও মাকরুহ।

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَتَقَدَّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ عَلَى مَا قَدَّمَناه  
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَاسْتَغْرُ  
عُورَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَيْ مَا يَوَارِي عُورَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ  
صَلَاةٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْلَوَةِ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ أَيْ لِبَالِغَةٍ - وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ  
مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ  
وَيُرَوَّى مَا دُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ وَهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ  
خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ (رحا) وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لَهُ أَيْضًا وَكَلِمَةُ إِلَى  
نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةٍ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَةٍ حَتَّى وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرُّكْبَةُ مِنَ  
الْعَوْرَةِ -

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নামাজের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ

অনুবাদ : মুসল্লির জন্য যাবতীয় হাদাস ও নাজাসাত বা নাপাকি থেকে পাক-পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। সে পদ্ধতিতে, যা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার কাপড় পূর্ণ পাক রাখবে। — (সূরা মুদদাসসির ৪ আয়াত)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। এবং সতর ঢাকবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, অর্থ- তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় এমন পোশাক পরিধান করবে যাতে তোমাদের সতর ঢাকে। রাসূল ﷺ বলেছেন, যার ঋতু হয়েছে এমন (বালেগা) নারীর নামাজ ওড়না ছাড়া সহীহ হবে না। পুরুষের সতর হলো নাভির নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরুষের সতর হলো নাভির থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় আছে, তার নাভির নিচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম শাফেঈ (র.) এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন যে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ও ইমাম শাফেঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হাদীসের الى -কে আমরা (সহ)-এর অর্থে গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হাদীসের حتى শব্দের উপর আমল করার এবং রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে, الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : এখানে شروط (শরতুন) শব্দটির আরো দু'টি বহুবচন ব্যবহার হয়, একটি شرائط (শরাইত) অপরটি اشرط (আশরাতুন)। সাধারণ গ্রন্থসমূহেই شروط (শরতুন) ব্যবহার হয়েছে। شروط শব্দটি শারতুন (شرط) -এর বহুবচন। শরতুনের রা (ر) সাকিন হবে। এর আভিধানিক অর্থ-আলামত বা চিহ্ন। পরিভাষায় ঐ বস্তু যার উপর অন্য জিনিসের অস্তিত্ব



নির্ভর করে। তবে তা অন্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। নামাজের শর্ত তিন প্রকারঃ এক. شرط انعقاد বা সংঘটিত হওয়ার শর্ত যেমন নিয়ত, তাহরীমা, সময়, জুমার খুতবা। দুই. شرط دوام বা সর্বাক্ষণিক শর্ত। যেমন- পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া। তিন. شرط بقاء (নামাজ) বিদ্যমান থাকার শর্ত। যেমন- কিরাআত (কিফায়া)। পূর্বে নামাজের সব (سبب) অর্থাৎ সময়ের আলোচনা হয়েছে। অতঃপর সময়ের আলামত অর্থাৎ আয়ানের আলোচনা হয়েছে। এখানে নামাজের পূর্ববর্তী শর্ত সম্পর্কে আলোচনা হবে।

এখানে ওয়াজিব শব্দটি ফরজের অর্থে ধর্তব্য হবে। নামাজি ব্যক্তির জন্য নামাজের পূর্বে যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ। **وَيَاكُلُ فَطَهُرًا** দ্বিতীয় শর্ত হলো সতর ঢাকা। অর্থাৎ এ পরিমাণ শরীর ঢাকা শর্ত যা খুলে রাখা নিন্দনীয় বা দূষণীয় এবং লজ্জাহীনতার মধ্যে গণ্য। এটা আমাদের এবং ইমাম শাফেঈ (র.) ইমাম আহমদ (র.) এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে শর্ত। দলিল **عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** এ আয়াতে **زِينَتٍ** (যীনাতুন) দ্বারা সতর ঢাকা বুঝানো হয়েছে এবং মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ। অতএব আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে যে, নামাজের মধ্যে সতর ঢাকা ফরজ। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফকারীদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। নামাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। অতএব এ আয়াত দ্বারা সতর ঢাকার ফরজ কিভাবে সাবিত হবে?

জবাব : শব্দের ব্যাপকতা ধরা হবে, আয়াতকে শানে ন্যূনের সঙ্গে নাম করা যাবে না। **عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ**-এর মর্ম ব্যাপক ধরা হবে। এ হকুম মসজিদে হারামের সঙ্গে নির্দিষ্ট থাকবে না। দ্বিতীয় দলিল রাসূল **ﷺ** ইরশাদ করেছেন **لَا يَغْتَلِبُ إِلَّا يَخْبِرُ** বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলার নামাজ গুড়া ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

প্রশ্ন : হিদায়ার গ্রন্থকার সতর ফরজ হওয়ার পক্ষে যে আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। কেননা **عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** আয়াতটি দ্বারা তাওয়াফের ক্ষেত্রে সতর ঢাকা ওয়াজিব সাবিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে, উলঙ্গ তওয়াফ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যদি তা নামাজের ক্ষেত্রে ফরজ হওয়া বুঝায় তাহলে **خَلَا** শব্দটি ওয়াজিব ও ফরজ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হবে। এটা জায়েজ নেই। কেননা তা দ্বারা হাকীকত (**حَقِيقَتٌ**) এবং মাজাজ (**مَجَازٌ**) একত্রিত হওয়া লায়িম আসতেছে যা জায়েজ নেই। সর্বোপরি উক্ত হাদীস হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ (**خَبَرٌ وَاحِدٌ**) আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। সুতরাং তা দ্বারা ফরজ সাবিত হবে না।

জবাব : আয়াতটি যদি **الدَّلَالَةُ** নয়; কিন্তু **طَعْمِي الثَّبُوت** অবশ্যই। আর হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে যদিও **طَعْمِي الثَّبُوت** তবে **حَصْرٌ** এ-এর কারণে **طَعْمِي الثَّبُوت** তা হয়ে গেছে। অতএব উভয়ের সমন্বয়ে ফরজ সাবিত হবে।

**وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَعْتَ الْخ** এ ইবারতে পুরুষের সতরের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের তিন ইমামের নিকট পুরুষের সতর নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মত এর বিপরীত অর্থাৎ নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের দলিল রাসূল **ﷺ** **عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سَرَبِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ** অন্য বর্ণনায় আছে **حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ** সতর তার নাভির নিচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, প্রথম বর্ণনায় **الْخ** শব্দটি **غَايَتُ**-এর জন্য এবং **غَايَتُ** টি **مُنَى**-এর মধ্যে দাখিল হয়না। অতএব হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। জবাব : আমরা **الْخ** শব্দটিকে **مَعَ** (সহ)-এর অর্থে গ্রহণ করব। এর দলিল হলো **حَتَّى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ** শব্দটি **مَعَ** এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আলামত হলো এ হাদীস **إِلَى أَمْرَالِكُمْ** হাঁটু **إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ**, অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, **إِلَى** শব্দকে **مَعَ**-এর অর্থে ধরা হয়।

وَيَذَنُ الْحَرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةً إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لِعَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ  
مَسْتُورَةٌ وَاسْتَفْتِنَا الْعُضُرَيْنِ لِلْإِبْتِلَاءِ بِأَبْدَانِهِمَا قَالَ وَهَذَا تَنْصِصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ  
عَوْرَةٌ وَيُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ صَلَّتْ وَرُبِعَ سَاقُهَا مَكْشُوفٌ  
أَوْ ثُلُثُهَا تَعِيدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنَ الرُّبُعِ لَا تَعِيدُ  
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) لَا تَعِيدُ إِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ  
بِالْكَثَرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلُّ مِنْهُ إِذَا هُمَا اسْمَاءُ الْمُقَابَلَةِ وَفِي النِّصْفِ عَنْهُ  
رَوَايَتَانِ فَاعْتَبَرَ الْخُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ أَوْ عَدِمَ الدَّخُولَ فِي ضِدِّهِ وَلَهُمَا أَنْ الرُّبُعَ  
يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ كَمَا فِي مَسْجِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِحْرَامِ وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ  
يُخَيَّرُ عَنْ رُؤْيِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ -

অনুবাদ ৪ স্বাধীন নারীর মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কবজি ছাড়া সমস্ত শরীর সতর। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, স্ত্রীলোক আগরত, যা ঢেকে রাখা কর্তব্য। দুটি অঙ্গকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো তা প্রকাশ করা অনিবার্য। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ ব্যতিক্রম স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পায়ের পাতা সতর। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তা সতর নয়। এটিই বিতর্ক অভিমত। যদি কোনো মহিলা পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ খোলা অবস্থায় নামাজ আদায় করে তাহলে সে তার নামাজ দোহরাবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর যদি তা এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে নামাজ দোহরাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, যে অর্ধেকের কম হলে দোহরাবে না। যেহেতু কোনো কিছুকে তখনই অধিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কেননা কমবেশি শব্দ দুটি তুলনামূলক। অর্ধেক সম্পর্কে তাঁর (আবু ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা আছে এক বর্ণনায় কম এর গণি বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অপর বর্ণনায় বেশি এর গণিভূক্ত না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো- চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়ে থাকে যেমন মাথা মাসাহের ক্ষেত্রে এবং ইহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ানোর ক্ষেত্রে এবং যে ব্যক্তি কারো কারো চেহারা দেখেছে সেই ব্যক্তিকে দেখেছে বলে খবর দেয়। যদিও সে উক্ত ব্যক্তির চার পাশের এক পাশ মাত্র দেখেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বাধীন মহিলার পূর্ণ শরীর সতর। তবে মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। দলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে السُّطْرَانِ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْفَرَتْهَا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ। মাওলানা আব্দুল হাই (র.) বলেন যে, مسْتُوْرَة শব্দ আমি কোনো রিওয়ায়েতে পাইনি। কেউ কেউ উক্ত রেওয়ায়েতের মর্ম বর্ণনা করেছেন যে, মহিলার দায়িত্ব হলো নিজেকে ঢেকে রাখা। মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এ দুটি অঙ্গ সাধারণভাবে বিভিন্ন কাজের জন্য বের করার প্রয়োজন। এ দুটি অঙ্গ ছাড়া কাজকাম লেনদেন করা সম্ভব নয়। তার সমর্থন আবু দাউদে বর্ণিত মুরসাল হাদীসে পাওয়া যায়। إِنَّ الْجَارِيَةَ

প্রশ্ন : অর্ধেক কমেব বিপরীত বটে, কিন্তু বেশির গতিভুক্ত নয়। কেননা তার মোকাবেলায় অন্য অর্ধেক (نصف اخر) বিদ্যমান যা এর থেকে কম নয়। অতএব অর্ধেক বেশির গতিভুক্ত হবে না। বিধায় তা কমেব গতিভুক্ত হবে। আর অর্ধেকের কম খুলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় না। অতএব প্রত্যভাবস্থায় (অর্ধেক খুলে গেলে) নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর দলিল বিভিন্ন আহাকাম এবং বাক্যের ব্যবহারে এক চতুর্থাংশকে পূর্ণাংশের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়, যেমন মাথা মাশাহ করা ক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশকে পূর্ণ মাথার হুকুমে ধরা হয়। অনুরূপভাবে যদি ইহরাম অবস্থায় মাথা নেড়ে কয়ে তাহলে কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর যদি মাথার এক চতুর্থাংশ নেড়ে কয়ে তা হলেও কুরবানি ওয়াজিব হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাথার এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ মাথার স্থলাভিষিক্ত। পরিভাষায়ও একই অবস্থা যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তির চার দিক হতে শুধু এক দিক দেখে বলে যে আমি তাকে দেখেছি তখন এ কথাতে সহীহ মনে করা হয়। অতএব যখন এক-চতুর্থাংশকে পূর্ণ অঙ্গের হুকুমে ধরা হয়, তাহলে পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ খুলে গেলে মনে করা হবে যে পায়ের পূর্ণ গোছা খুলে গেছে। আর পায়ের পূর্ণ গোছা খুলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয়। বিধায় এক চতুর্থাংশ খুলে গেলেও নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে।

وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخْدُ كَذَلِكَ يَغْنَى عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَضْوٍ عَلَى جِدَةٍ وَالْمَرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيفُ وَأَمَّا وَضْعُ غَسْلِهِ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ وَالْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ وَالذِّكْرُ يُغْتَبَرُ بِإِنْفِرَادِهِ وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيفُ دُونَ الضِّمِّ -

অনুবাদ : চুল, পেট ও উরুও অনুরূপ অর্থাৎ এতেও উক্ত মতভেদ রয়েছে। কেননা প্রতিটি আলাদা অঙ্গ। চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এটিই বিতর্ক অভিমত। তবে জানাবাতের গোসলে এটা ধোয়া মাফ। মাফ হওয়ার কারণ হলো কষ্ট হওয়া। লজ্জাস্থান দু'টিতেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে অবশ্য পুরুষ লিঙ্গকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। তদ্রূপ অণুকাশ দু'টিও আলাদা ভাবে বিবেচ্য হবে। উভয়টিকে এক গণ্য করা হবে না। এটিই বিতর্ক অভিমত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চুল, পেট এবং উরুর ছকুমও অনুরূপই। অর্থাৎ, এখানেও পূর্বের ন্যায় মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি এক-চতুর্থাংশ ঝুলে যায় তাহলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মুতাবিক অর্ধেক ঝুলে গেলে নামাজ জায়েজ হবে না। আর অর্ধেকের বেশি ঝুলে গেলে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ জায়েজ হবে না। দলিল, ওগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা অঙ্গ। অতএব পায়ের গোছার ন্যায় প্রত্যেকটির মধ্যে মতানৈক্য হবে। চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এটিই বিতর্ক মত। যে চুল মাথার সঙ্গে মিলিত তা উদ্দেশ্য নয় বরং তা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّمَا وَضَعَ غَسْلَهُ الْخ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। যদি মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল সতর হয় তাহলে তা তার শরীর হওয়ার কারণে সতর হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা জানাবাতের গোসলে তা ধৌত করা জরুরি নয়। অথচ জানাবাতের গোসলে শরীরের প্রত্যেকটি অংশ ধৌত করা আবশ্যিক। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল সতরের অঙ্গ নয়। অর্থাৎ চুল যেহেতু শরীর নয় তাই তা সতরও নয়।

জবাব : জানাবাতের গোসলে মাথা থেকে ঝুলে থাকা চুল ধৌত করা জরুরি নয়। তা এ কারণে নয় যে, সেটা তার শরীরের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা তার শরীরের অংশ সৃষ্টিগতভাবে। কেননা তা তার শরীরের সাথেই সংযুক্ত। তবে জানাবাতের গোসলে কষ্টের কারণে তা ধোয়া মাফ।

খাছ সতর যেমন পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাস্থান এবং পুরুষ ও মহিলার নিতম্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ ঝোলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন যে, (ذكر) বা পুরুষাঙ্গ একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ এবং তদ্রূপ দু'টি অণুকাশ ও দু'টি আলাদা অঙ্গ। ওগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির এক-চতুর্থাংশ ঝোলে গেলে নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হবে। দু'টি মিলে একটি অঙ্গ নয়, এটিই বিতর্ক মত। কারো কারো মতে দু'অন্তকোষ এবং পুরুষাঙ্গ মিলে একটি অঙ্গ। কেননা অন্তকোষ দু'টি পুরুষঙ্গের তাহে, বিধায় এসবগুলোর সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ ঝোলে গেলে নামাজ দোহরাত হেবে। ফায়দা এই ব্যাখ্যা আমাদের মতে। শাফেঈ (র.)-এর মতে নয়।

وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْأَمَةِ وَيَظْهَرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سَوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِقَوْلِ عُمَرَ (رض) أَلْقَ عَنْكَ الْخِمَارَ يَا وَفَارُ اتَّشَبَّهْتُمُ بِالْحَرَائِرِ وَلَا تَنْتَهَى تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مَهْنَتِهَا عَادَةً فَاعْتَبِرْ حَالَهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ - قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ التَّحَاسُّةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعَذِّ وَهَذَا عَلَى وَجْهِينِ إِنْ كَانَ رُبْعُ الثَّوْبِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ طَاهِرًا يُصَلِّي فِيهِ وَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يَجْزِيهِ لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ (رح) لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكُ فَرْضٍ وَاحِدٍ وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ الْفَرُوضِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَأَبِي يُوسُفَ (رح) يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا وَيَنْ أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ جَوَازُ الصَّلَاةِ حَالَةَ الْإِخْتِيَارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ النِّمْقَادِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرَكًا وَلَا فَضْلِيَّةً لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بِالصَّلَاةِ وَاخْتِصَاصِ الطَّهَارَةِ بِهَا -

অনুবাদ : পুরুষের যতটুকু অংশ সতর, দাসীরও তাই সতর। তার পেট এবং পিঠও সতর। এ ছাড়া তাঁর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ সতর নয়। কেননা হযরত ওমর (রা.) জনৈক দাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এই মেয়ে মাথা থেকে গুঁড়না সরিয়ে নে। স্বাধীন মহিলার মতো হতে চাস বুঝি। তাছাড়া তাকে তার মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বাহিরে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে সকল পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরামের ন্যায় গণ্য করা হবে। যদি নাজাসাত দূর করার মতো কিছু না পায়, তাহলে তা সহই নামাজ আদায় করবে। এবং নামাজ দোহরাতে হবে না। এর দুই সূত্র- যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ বা তার চাইতে বেশি অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পড়েই নামাজ আদায় করবে। যদি বিবস্ত্র হয়ে নামাজ আদায় করে তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ বস্তুর স্থলবত্তী হয়। যদি এক-চতুর্থাংশের কম পাক হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম (তা সহই নামাজ পড়বে)। আর এটা ইমাম শাফেঈ (র.)-এরও দুটি মতের একটি। কেননা ঐ কাপড়ে নামাজ আদায়ে একটি ফরজ তরক হয়, আর উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে একাধিক ফরজ তরক হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ আদায় করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে নাপাক কাপড় পরেও নামাজ আদায় করতে পারবে। তবে দ্বিতীয়টাই উত্তম। কেননা সাক্ষম অবস্থায় উভয়টি নামাজের প্রতিবন্ধক। এবং মা'ফ হওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে দুটোই সমান। সুতরাং সালাতের হুকুমেও দুটোই সমান। তা ছাড়া কোনো কিছু কে স্থলবত্তী রেখে তরক করলে তাকে তরক হিসাবে গণ্য করা হয় না। (কাপড় পরে নামাজ আদায় করা) উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সতর নামাজের সাথে নির্দিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে তাহারাও নামাজের সাথে নির্দিষ্ট।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই ইবারতে দাসীর সতর বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষের যেকোনো নাবির নিচ হতে হাঁটু পর্যন্ত সতর অনুরূপ দাসীরও। তা ছাড়া দাসীর পেট এবং পিঠও সতর। কেননা এ দুটি খাশি সৃষ্টিকারী স্থান বিধায় এগুলো ঢেকে রাখা ফরজ। অবশ্য এ দুটি অংশ ছাড়া তার শরীর সতর নয়। দলিল, হযরত ওমর (রা.) ওড়না পরিহিতা এক দাসীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যে মেয়ে! মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে নাও। তুমি কি স্বাধীন মহিলাদের মতো হতে চাও? অন্য একটি রেওয়াজেও বর্ণিত আছে **كَيْسِيْنِ**! **رَأْسُكَ وَلَا تَنْسَبِيْهِ بِالْحَرَائِرِ** অর্থ- তোমার মাথা খোলে দাও, স্বাধীন মহিলার মতো হয়ো না। দ্বিতীয় দলিল, সাধারণ রীতি-নীতি হলো যে দাসীকে স্বীয় মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহারামের ন্যায় গণ্য করা হবে। অর্থাৎ দাসী পর্দার ব্যাপারে পুরুষদের ক্ষেত্রে মাহারামের ন্যায় হবে। মায়ের নিজ ছেলের সাথে যে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব এবং বোনের নিজ ভায়ের সাথে যে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব ঐ পরিমাণ পর্দা প্রত্যেক পুরুষের জন্য দাসীর সাথে করা ওয়াজিব।

**قَالَ وَزَوْنُ يَجِدُ الْخ** : যদি কোনো ব্যক্তির নিকট নাপাক কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে এবং এমন কোনো বস্তুও নেই যার দ্বারা নাপাকী দূর করা যায়, তাহলে ঐ নাপাক কাপড় পড়ে নামাজ পড়বে। ঐ নামাজকে আর দোহারাতে হবে না। এ মাসআলাটির দু'টো সূরত- এক, যদি এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়বে। উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে, জায়েজ হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ বস্তুর স্থলবতী হয়। অতএব এক-চতুর্থাংশ পাক হলে সম্পূর্ণ পাক হওয়া ধরা হবে। আর পাক কাপড় রেখে উলঙ্গ নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এ জন্য ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়বে। দুই, যদি কাপড় এক-চতুর্থাংশের কম পাক হয়, তাহলে এতে মতানৈক্য আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ কাপড় পরে নামাজ পড়া ওয়াজিব, উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। এটি ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত এবং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দুটি মতের একটি। তার দ্বিতীয় মত হলো, উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের যুক্তি হলো যে, নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়লে একটি ফরজ তরক হয় (কাপড় পবিত্র হওয়া)। পক্ষান্তরে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়লে একাধিক ফরজ তরক হয়। যেমন সতর ঢাকা, কিয়াম করা, রুকু করা, সিজদা করা। কেননা উলঙ্গ ব্যক্তি ইঙ্গিতে নামাজ আদায় করে। ফলে সতর ঢাকা ছাড়াও কিয়াম, রুকু এবং সিজদা তরক হয়ে যায়। এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, একটি ফরজ তরক করা উত্তম, একাধিক ফরজ তরক করার তুলনায়। এই জন্য ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার ইখতিয়ার, ইচ্ছা করলে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়তে পারবে, আর ইচ্ছা করলে ঐ নাপাক কাপড় পরেও নামাজ পড়তে থাকবে। তবে ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ আদায় করাই উত্তম। দলিল, সতর খোলা এবং নাপাকী উভয়টিই সক্ষম অবস্থায় নামাজের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ যদি সতর ঢাকা এবং নাপাক কাপড় ধোয়া সম্ভব হয়, তাহলে সতর খোলে এবং নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়টির মধ্যে কম মা'ফ, বেশি মা'ফ নয়। যখন পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়টি সমান হলো, তাহলে নামাজের ক্ষেত্রেও উভয়টি সমান হবে। অর্থাৎ যেমন ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া জায়েজ আছে তেমন উলঙ্গ হয়ে নামাজ আদায় করাও জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তির জবাব, কোনো কিছুকে তার স্থলবতী রেখে তরক করলে তা তরক হিসাবে গণ্য হয় না। কেননা উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ আদায় করলে যদিও কিয়াম, রুকু এবং সিজদা তরক হয়ে যায়, কিন্তু এর স্থলবতী ইশা'রা বিদ্যমান আছে।

**প্রশ্ন :** উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়ার তুলনায় ঐ নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া উত্তম কেন?

**জবাব :** সতর বা শরীর ঢাকা নামাজের সাথে খাস নয়; বরং সতর ঢাকা নামাজের ভেতরেও বাইরে উভয় অবস্থায় ওয়াজিব, তবে পবিত্রতা নামাজের সাথে বাছ। মোটকথা সতরের ফরজ পবিত্রতার ফরজের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উলঙ্গ হয়ে নামাজ আদায় করার তুলনায় ঐ কাপড়ে নামাজ পড়া উত্তম।

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَوْبًا صَلَّى غُرَبَانًا قَاعِدًا يَوْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هُكَذَا فَعَلَهُ  
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ لَأَنَّ فِي الْقُعُودِ سِتْرَ الْعَوْرَةِ  
الْغَلِيظَةَ وَفِي الْقِيَامِ آدَاءُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيَمِيلُ إِلَى إِلَيْهِمَا شَاءَ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ لَأَنَّ  
السَّتْرَ وَجِبَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ وَلَائِهْ لَاخْلَفَ لَهُ وَالْإِيْمَاءُ خَلْفَ عَنِ الْأَرْكَانِ -

অনুবাদ : যদি কেউ সতর ঢাকার কাপড় না পায় তাহলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামাজ পড়বে। কেননা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ এরূপ করেছেন। যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবে তাও জায়েজ হবে। কেননা বসার মধ্যে লজ্জা স্থানের সতর হয়, আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে উল্লিখিত রুকনগুলো আদায় হয়। সূত্রাং দু'টোর যে কোনো একটি সে গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রথমটিই উত্তম। কেননা সতর ঢাকা ফরজ হয়েছে নামাজের হক হিসেবে এবং মানুষের হক হিসেবে। তা ছাড়া এর কোনো স্থলবর্তী নেই। আর ইশারা হয়েছে রোকনের স্থলবর্তী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট পাক বা নাপাক কোনো ধরনের কাপড় না থাকে তাহলে সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামাজ আদায় করবে। দলিল, রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.) এরূপ আমল করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা কোনো এক কশ্ঠীতে আরোহণ করেছিলেন অতঃপর কিশতী ডুবে গেল : **أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ** যখন তিনি বলেছেন, **وَسَلَّمَ رُكْبَتًا فِي سَفِينَةٍ فَانْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَخَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ عُرَاءَ فَصَلُّوا مُرَدِّدًا** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, **إِلَّا بِإِيْمَاءٍ** অর্থ- তারা দু'জন বলেছেন, যে উলঙ্গ ব্যক্তি বসে ইশারার নামাজ আদায় করবে। **إِنَّمَا** : রাসূল ﷺ ইমাম ইবনে হুসাইন (রা.) কে বলেছেন, **صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَايِدًا** (উলঙ্গ অবস্থায়) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর যে, যদি সম্ভব না হয় তাহলে বসে আদায় করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উলঙ্গ অবস্থায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। জবাব, উলঙ্গ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম নয়। কেননা ঐ অবস্থায় রুকু, সিজদা এবং কিয়াম তরক করা ছাড়া তার জন্য ষাছ সতর ঢাকা সম্ভব নয়, বিধায় ধরা হবে যে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম নয়, কাজেই তার জন্য বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। যদি উলঙ্গ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তাহলেও নামাজ জায়েজ হবে। কেননা বসে নামাজ আদায় করলে ষাছ সতর ঢাকা সম্ভব হয়, অন্য দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলে নামাজের আরাকন যেমন রুকু, সিজদা, এবং কিয়াম আদায় করা যায়। অতএব দু'সুরভের মধ্যে যেটি পছন্দ হয় সেটি গ্রহণ করবে। তবে প্রথম সুরত অর্থাৎ বসে নামাজ আদায় করাই উত্তম। কেননা সতর ঢাকা ফরজ নামাজের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে পরিত্রা শুধু নামাজের হক হিসাবে ফরজ হয়েছে। এ ছাড়া সতর ঢাকার ফরজটি অধিক গুরুত্ব পূর্ণ চকুম রুকু এবং সিজদার ফরজের তুলনায়। দলিল হলো যে, নফল নামাজ সওয়াবীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় বসে ইশারায় আদায় করা জায়েজ আছে। তবে কাপড় থাকা অবস্থায় সতর না ঢেকে নামাজ পড়া কোনো অমেই জায়েজ নেই। যেহেতু উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া সতরের জন্য ভাল দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তুলনায়। তাই ফরজ বলেছি যে, উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া উত্তম। দ্বিতীয় দলিল হলো, সতরের কোনো স্থলবর্তী নেই। পক্ষান্তরে ইশারা হচ্ছে রোকন বা রুকু এবং সিজদার স্থলবর্তী। মূলনীতি হলো, যে জিনিসের স্থলবর্তী আছে তা তরক করা উত্তম এমন জিনিস তরক করার তুলনায় যার স্থলবর্তী নেই। অতএব উলঙ্গ ব্যক্তি বসে নামাজ আদায় করার কারণে যদি রুকু, সিজদা তরক হয় কিন্তু এর স্থলবর্তী (ইশারা) আছে। পক্ষান্তরে যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তাহলে সতর তরক হচ্ছে যার কোনো স্থলবর্তী নেই। অতএব উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার তুলনায় বসে নামাজ পড়াই উত্তম।

وَقَالَ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَيَسِّنُ التَّخْرِيمَ  
يَعْمَلُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلَآنَ ائْتِذَاءُ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ  
وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَا يَقَعُ التَّمْيِيزُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْمُقَدِّمُ عَلَى التَّكْنِيفِ  
كَالْقَائِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يَقْطَعُهُ وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ وَلَا مُعْتَبَرٌ  
بِالْمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ لِأَنَّ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ وَفِي الصَّوْمِ جُوزَتْ  
لِضُرُورَةٍ وَالنِّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيْ صَلَاةٍ يُصَلِّي أَمَّا الذِّكْرُ  
بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرٌ بِهِ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزْمَتِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا  
يَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ وَكَذَا إِذَا كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَتْ فَرَضًا فَلَا بُدَّ مِنْ  
تَعْيِينِ قَرَضٍ كَالظُّهْرِ مَثَلًا لِاخْتِلَافِ الْفُرُوضِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুসল্লী যে নামাজ শুরু করতে যাচ্ছে এর এমনভাবে নিয়ত করবে যে নিয়ত এবং তাহরীমার মাঝে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। দলিল, যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া নামাজের শুরু হয় কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থা দ্বারা। আর তা অভ্যাস এবং ইবাদত উভয়ের মাঝে দোদুল্যমান। সুতরাং নিয়ত ছাড়া এতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। আর যে নিয়ত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। যদি তাকে বিচ্ছিন্নকারী কোনো কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যা নামাজের উপযোগী নয়। আর তাকবীরের পরবর্তী নিয়ত গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা নিয়তের পূর্বে যা বিগত হয়েছে, তা নিয়তহীনতার কারণে ইবাদত হবে না। অবশ্য রোজার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কারণে তা জায়েজ রাখা হয়েছে। নিয়ত অর্থ ইচ্ছা, তবে শর্ত হলো, নিজ অন্তরে জ্ঞাত হতে হবে যে, কোন নামাজ আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করা ধর্তব্য নয়। তবে উচ্চারণ করা উত্তম, কেননা তা ইচ্ছাকে সংহত করে। উল্লেখ্য যে, সে যদি নামাজ নফল হয় তাহলে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। বিপদকমতে সুন্নত নামাজেরও এ হুকুম। আর যদি নামাজ ফরজ হয় তাহলে ফরজ নামাজ নির্ধারিত হওয়া জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ যেমন জোহর। কেননা ফরজ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসল্লী যে নামাজ পড়তে চায় ঐ নামাজের নিয়ত করবে। শর্ত হলো নিয়ত এবং তাহরীমার মাঝে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করবে না, এমন জিনিসের দ্বারা যা নামাজের প্রতিবন্ধক। যেমন নিয়তের পর খাওয়া, পানকরা অথবা কথা বলার মধ্যে রত হয়ে অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাজ আরম্ভ করা, তাহলে এ নিয়ত ধর্তব্য হবে না। হিদায়ার গ্রন্থকার এখানে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন, ১. নিয়ত, ২. যে দলিলের দ্বারা নিয়ত ওয়াজিব হয়, ৩. নিয়তের সময়, ৪. নিয়তের অবস্থা বা নিয়ম। বিজ্ঞ গ্রন্থকার প্রথমে নিয়ত শর্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন بِالنِّيَّاتِ যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এর ব্যাখ্যা হলো যে, নামাজ একটি আমল যা নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। অতএব যে নামাজ নিয়ত ছাড়া হবে, তা মূলত নামাজ হিসাবেই গণ্য হবে না। প্রশ্ন, উক্ত হাদীসে আমাল (اعمال)-এর পূর্বে হুকুম (حكم) শব্দটি মুকাদদার (مقدمات) মানা হবে, এবং হুকুমের দ্বারা পারলৌকিক হুকুম (حكم اخروي) অর্থাৎ ছওয়াব উদ্দেশ্য হবে। অতএব হাদীসের মর্ম দাঁড়াবে, আমাদের পারলৌকিক হুকুম অর্থাৎ ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল, মূল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। কারো কারো মতে আমাদের পূর্বে ছাওয়াব (ثواب) মুকাদদার মানা হবে, অর্থাৎ نَوَافِلُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ অর্থ যাবতীয় আমাদের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মোটকথা নিয়ত ছাড়া মূল নামাজ জায়েজ হবে কিন্তু ছওয়াব হাসিল হবে না। জবাব, হুকুম (حكم) দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক তা ইহলৌকিক হোক বা পারলৌকিক হোক। হুকুমকে পারলৌকিক বিষয়ের



সাথে বিশিষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই। যদি যেমন নেওয়া হয় যে পারলৌকিক হুকুম উদ্দেশ্য অর্থাৎ ছওয়াব তাহলে হয়ত ছওয়াব (تَوَاب) শব্দ মুকাদদার মানা হলেও নিয়ত ছাড়া ইবাদত সহীহ না হওয়া সার্বিত হয়। কেননা মুখ্য ইবাদতে (عِبَادَات) (مَحْضَةً) ছওয়াবই উদ্দেশ্য। মূলনীতি (مَبْدَأُ) আছে যে, উদ্দেশ্য ফউত হয়ে গেলে মূল জিনিস ফউত হয়ে গেছে বলে গণ্য হয়ে থাকে। অতএব নিয়ত না করার কারণে ছওয়াব হাসিল হয়নি, তাই ধরা হবে যে, নামাজই হয়নি। এজন্য নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য নিয়তকে শর্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল, নামাজ আরম্ভ হয় কিয়াম বা দাঁড়ানোর অবস্থা দ্বারা। আর তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে দোদুলমান, অর্থাৎ মানুষ কখনো অভ্যাস হিসাবে দাঁড়ায় এবং কখনো আল্লাহর দরবারে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়। উভয় দাঁড়ানো বার্বিকভাবে একই ধরনের। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়তের দ্বারা হবে বিধায় নামাজের জন্য নিয়তকে শর্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ثَلَاثُونَ عَلَى التَّكْبِيرِ এখানে নিয়তের সময় সম্পর্কে আলোচনা। যে নিয়ত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। সারকথা হলো নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলার নিয়ম। তবে যদি তা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে করে এবং নিয়ত ও তাহরীমার মাঝে নামাজ বিচ্ছিন্নকারী, বা নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কর্ম না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ নিয়ত জায়েজ হবে। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে কোনো ব্যক্তি অজু করার সময় নিয়ত করল যে, আমি জোহরের নামাজ ইমামের সাথে পড়ব। অজুর পর নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কাজে লিপ্ত হয়নি। সে মসজিদে গেল এবং নামাজ আরম্ভ করল। অতঃপর নামাজ আরম্ভ করার সময় তার অন্তরে নিয়ত বিদ্যমান ছিল না, তাহলে ঐ (অজুর) নিয়তের দ্বারা তার নামাজ জায়েজ হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যদি নিয়ত এবং তাকবীরে তাহরীমার মাঝে নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো কর্ম পাওয়া যায়, তাহলে ঐ নিয়ত যথেষ্ট হবে না। যেমন অজুর সময় ইমামের সাথে জোহরের নামাজ পড়ার নিয়ত করল অতঃপর খাবার এবং পান করার কাজে লেগে গেল, তাহলে তার জন্য নতুন নিয়ত করা জরুরি, প্রথম নিয়ত যথেষ্ট নয়। যদি নিয়ত তাকবীরের পরে করে তাহলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে ধর্ভব্য হবে না। কেননা যে অংশ তাকবীরের পর এবং নিয়তের পূর্বে অভিবাহিত হয়েছে, তা নিয়ত না থাকার কারণে ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। যেহেতু নামাজের পরবর্তী অংশগুলো পূর্বের অংশের ওপর নির্ভরশীল, এজন্য পরবর্তী অংশগুলোও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। এ জন্য আমরা বলেছি যে, তাহরীমার পর নিয়ত করলে, নামাজ জায়েজ হবে না। তবে ইমাম কারশী (র.) বলেছেন যে, তাহরীমার পর নিয়ত করলেও তা ধর্ভব্য হবে। তাহরীমার পর কতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত ধর্ভব্য হবে? কারো কারো মতে ছানা (ثَنَاءٌ) শেষ হওয়া পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। কারো কারো মতে তায়্যাবুয (تَعْوِذٌ) শেষ হওয়ার পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। কারো কারো মতে রুকু হতে মাথা উঠানো পর্যন্ত নিয়ত করতে পারবে। রোজা এর থেকে ব্যতিক্রম। এর প্রথম অংশে নিয়ত পাওয়া শর্ত নয়। অতএব যদি কেউ সুবহে সাদেকের পরে নিয়ত করে তাহলে রোজা জায়েজ হবে। কেননা সুবহে সাদেকের সময় নিন্দা এবং অলসতার সময়। অতএব যদি প্রথম সময়ে নিয়ত করার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে তা মানুষের জন্য জটিল ও কঠিন হবে। শরিয়তে জটিলতা ও কঠোরতা দূরীভূত করা হয়েছে। এ জন্য রোজার জন্য প্রথম অংশে নিয়তকে শর্ত হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে নামাজ জামাত অবস্থায় আরম্ভ হয় এ জন্য তাকবীরে তাহরীমার সময় নিয়তকে শর্ত হিসাবে আখ্যা দিতে কোনো জটিলতা বা সংকীর্ণতা নেই।

الَّتِي هِيَ مِنَ الْإِرَادَةِ এখানে নিয়তের বিবরণ পেশ করা হয়েছে। নিয়তের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো কিছুর ইচ্ছা করা। এখানে আল্লাহর জন্য নামাজের ইচ্ছা করাকে বুঝানো হয়েছে। নিয়তের জন্য শর্ত হলো অন্তরে ঐ উপলব্ধি থাকতে হবে যে, সে কোনো এক নামাজ পড়তেছে। এর চিহ্ন হলো, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন সে নির্বিধায় বলতে সক্ষম হবে যে আমি অমুক নামাজ পড়তেছি পক্ষান্তরে যদি জবাব দিতে দেবী করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে জানে না, কোন নামাজ পড়ছে। নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য মুখে উচ্চারণ করা শর্ত নয় তবে উহা ভাল। কেননা এটি হৃদয়ের ইচ্ছাকে সংহত করে।

ثُمَّ إِنَّ كَاتِبَ الصَّلَاةِ نَفَرَ উক্ত ইবারতের দ্বারা নিয়তের নিয়ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মোটকথা হলো মুসল্লী যে নামাজ শুরু করতে চায়, তা ফরজ হবে বা ফরজ হবে না। যদি ফরজ না হয় চাই নফল হয় বা সুন্নত হোক তাহলে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট হবে। এটি বিতর্ক মত। কেননা নিয়ত অভ্যাস এবং ইবাদতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য আসে। আর এ উদ্দেশ্য সাধারণ নিয়তের দ্বারাই হাসিল হয় বিধায় এক্ষেত্রে সাধারণ নিয়তই যথেষ্ট। কারো কারো মতে যদি সুন্নত পড়তে চায় তাহলে রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের নিয়ত করা জরুরি। কেননা সুন্নতের মধ্যে সাধারণ নফলের তুলনায় একটি অতিরিক্ত গুণ বিদ্যমান আছে। অতএব ঐ অতিরিক্ত গুণটির নিয়ত করা জরুরি, সাধারণ নিয়ত যথেষ্ট নয়। আর যদি ঐ নামাজ ফরজ হয় তাহলে এর দু'সুত। এক, একা আদায় করবে, দুই, ইমামের অনুসরণে আদায় করবে। যদি একা আদায় করে তাহলে যে নামাজ পড়বে সেটির নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করতে হবে। যেমন জোহর পড়তে চাইলে জোহরকে নির্দিষ্ট করা জরুরি। শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি ফরজের নিয়ত করলাম। কেননা ফরজ বিভিন্ন প্রকারের আছে। এই জন্য এগুলোর মাঝে ব্যবধান করা জরুরি।

وَأَنْ كَانَ مُفْتَدِيًا بِغَيْرِهِ بَنَى الصَّلَاةَ وَمَتَابَعَتْهُ لَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فُسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جَهْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّزَامِ قَالِ وَسَتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَقَرَضَهُ إصَابَةُ عَيْنِهَا وَمَنْ كَانَ غَائِبًا فَقَرَضَهُ إصَابَةُ جَهْتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَمَنْ كَانَ خَائِفًا يُصَلِّيَ إِلَى أَى جَهَةٍ قَدَّرَ لِنَحَقِّقِ الْعُذْرَ فَاشْبَهَ حَالَةَ الْإِشْبَاهِ -

অনুবাদ : আর যদি অন্য কারো মুক্তাদী হয় তাহলে নামাজের এবং ইমামের অনুসরণের নিয়ত করবে। কেননা ইমামের দিক থেকেও মুক্তাদীর নামাজে ফসাদ সৃষ্টি হয়। সূতরাং তার পক্ষ থেকে এই বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করা অবশ্যক। গ্রন্থকার বলেন যে, সে কেবলামুখী হবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মসজিদুল হারাম অভিমুখী কর। — (বাকারা: আয়াত নং ১৪৪) তবে যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে, তার জন্য স্বয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরজ। আর মক্কায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ফরজ হলো কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা। এটিই নিশ্চিন্তমত। কেননা দায়িত্ব অর্পিত হয় সাধ্য অনুযায়ী। যে ব্যক্তি ভীতগ্রস্ত হয়, সে যেদিকেই সক্ষম হয় সে দিকেই মুখ করে নামাজ আদায় করবে, ওজর বিদ্যমান থাকার কারণে। সূতরাং কেবলা অজ্ঞাত হওয়ার অনুরূপ হুকুম হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَنْ كَانَ مُفْتَدِيًا الْغ এখানে দ্বিতীয় সূরতের বিবরণ অর্থাৎ যদি ফরজ নামাজ ইমামের পিছনে পড়ে তাহলে উক্ত নিয়তের সাথে ইক্তেদা বা অনুসরণেরও নিয়ত করবে। কেননা ইমামের নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণে মুক্তাদীর নামাজও ফাসেদ হয়। বিধায় অনুসরণের নিয়ত করা জরুরি। তাহলে ইমামের নামাজের ফাসাদের ক্ষতি মুক্তাদীর উপর আসবে অনুসরণের কারণে।

কিবলামুখী হওয়া নামাজের শর্তের মধ্য হতে একটি দলিল : قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ দলিল এভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, فَكَلِمَاتُكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا আমি আপনাকে আপনার মনোনীত কিবলার প্রতি ফিরিয়ে দিব। —

(বাকারা আয়াত-১৪৪) এখানে মসজিদুল হারামের প্রতি মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ ব্যক্তির দু' সূরত। এক, মক্কা মুকাররামায় নামাজ আদায় করবে অথবা মক্কা মুকাররমা থেকে অনুপস্থিত হয়ে অন্য স্থানে নামাজ আদায় করবে। প্রথম সূরতে স্বয়ং কা'বার প্রতি মুখ করা আবশ্যক। কেননা রাসূল ﷺ যখন মসজিদুল হারামে নামাজী পড়তেন তখন স্বয়ং কা'বার দিকে মুখ করতেন, সাহাবা তাবেঈদের আমলও অনুরূপ ছিল। এর ওপর ইজমা (اجماع) সংগঠিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় সূরতে কাবার দিকের প্রতি মুখ করা ফরজ। দলিল, রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগণ পবিত্র মদীনায় ছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করার হুকুম দিয়েছেন, কাবার দিকে নয়। এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, যে ব্যক্তি পবিত্র মক্কা হতে অনুপস্থিত তার জন্য স্বয়ং কা'বার দিকে মুখ করা জরুরি নয়। কেননা মহান আল্লাহ বান্দাকে সাধ্য অনুযায়ী বিধান দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে اَللّٰهُ نَفْسًا اَوْ وُجْهًا اَوْ اَلْاُخْرٰى اَللّٰهُ نَفْسًا اَوْ وُجْهًا অর্থ-আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব আরোপ করেন না। — (বাকারা: আয়াত নং ২৮৬)

وَأَنْ كَانَ مُفْتَدِيًا الْغ যদি কোনো ব্যক্তি ভয়ের কারণে কেবলার দিকে মুখ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেদিকে সক্ষম সেদিকে মুখ করবে। জানের ভয় থাক বা মালের ভয় থাক, শত্রু হিংস্র প্রাণী হোক বা ডাকাত হোক। যেমন কোনো ব্যক্তির এই অশঙ্কা হয় যে, নড়াচড়া করলে এবং কেবলার দিকে মুখ করলে শত্রু অবগত হবে, তাহলে সে বসে বা ভয়ে যেভাবে সম্ভব হয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। এ হুকুম ঐ অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যে কেবলার দিকে ঘুরতে সক্ষম নয় এবং তাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত নেই। অনুরূপভাবে যদি কিশতী ভুবে যায় এবং এক ব্যক্তি কিশতীর তথ্যের উপরিস্থ থাকে আর সে অশংকা দেখে করে যে, সে যদি কেবলার দিকে মুখ করে তাহলে পানিতে ডুবে যাবে, তাহলে তার জন্য জায়েজ হবে যেদিকে সক্ষম সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা। দলিল: কিবলা অজ্ঞাত বা সংশয় যুক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় তার ওজরকেও গ্রহণ করা হবে। তার জন্য প্রকৃত কিবলার দিকে মুখ করা জরুরি নয়।

فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَحَرَّوْا وَصَلُّوْا وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ وَالْإِسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرُّيِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَمَا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ لِيَقْبِنَهُ بِالْخَطَا وَتَحَنُّنُ نَفْسٍ لَيْسَ فِيهِ وَسُعْبٌ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرُّيِ وَالتَّكْلِيفُ مُقْبَدٌ بِالْوُسْعِ -

অনুবাদ : যদি কারো জন্য কেবলা অজ্ঞাত বা সন্দেহ পূর্ণ হয়ে পড়ে এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে, যাকে কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে সে সাধ্য অনুযায়ী তَحَرُّی বা চিন্তা-ভাবনা করে কিবলা স্থির করবে। কেননা সাহাবীগণ চিন্তা করে (কিবলা নির্ধারণ করে) নামাজ আদায় করেছেন। আর রাসূল ﷺ তাঁদের কাজ প্রত্যাখ্যান করেননি। তা ছাড়া অধিকতর শক্তিশালী দলিলের অবর্তমানে প্রকাশ্য দলিলের ওপর আমল করাই ওয়াজিব। আর সংবাদ জিজ্ঞাসা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে। নামাজ আদায় করার পর সে জানতে পারল যে, সে ভুল করেছে তাহলে নামাজ দোহরাতে হবে না। আর ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন, যদি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে থাকে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে নামাজ দোহরাতে হবে। আমাদের দলিল হলো, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকের অভিযুগ্ম হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তার মাধ্যে ছিল না। আর হুকুম অর্পণ সাধ্যের ওপরই নির্ভরশীল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি সেখানে কেবলার দিক সম্পর্কে অবগত কোনো লোক উপস্থিত থাকে তাহলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। তাকে জিজ্ঞাসা না করে চিন্তা-ভাবনা করে কেবলা স্থির করলে জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় যদি চিন্তাভাবনা ছাড়া নামাজ আদায় করে, তাহলেও নামাজ জায়েজ হবে না। দলিল: একদা সাহাবাদের কিবলার দিক সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলো, তখন সাহাবাগণ চিন্তা ভাবনা করে নামাজ আদায় করলেন, এবং এ কাহিনী রাসূলের সামনে আলোচনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ -এর কোনো প্রতিবাদ করেননি। পক্ষান্তরে যদি কিবলার দিক সম্পর্কে অবগত কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। দলিল: অধিকতর শক্তিশালী দলিলের অবর্তমানে প্রকাশ্য প্রমাণের ওপর আমল করাই ওয়াজিব। আর জিজ্ঞাসাবাদ করা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।

فَإِنْ عَلِمَ الخ কিবলার দিক সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণে চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আদায় করার পর জানতে পারল যে, সে কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় তার নামাজ দোহরানো ওয়াজিব নয়। দলিল, কেননা তার জ্ঞান চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকই কেবলা। আর সে চিন্তা-ভাবনা করেই নামাজ আদায় করেছে। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, যদি কেবলার দিকে পিঠ করে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে নামাজ দোহরাতে হবে।

وَأَنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ لَمَّا سَمِعُوا يَتَحَوَّلُ الْقِبْلَةَ اسْتَدَارُوا كَهَيَأَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَحْسَنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَوْجُوبِ الْعَمَلِ بِالْإِجْتِهَادِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدَّى قَبْلَهُ وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبْلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشْرِقِ وَتَحَرَّى مَنْ خَلْفَهُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ أَجْزَاهُمْ لَوْجُودِ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَةِ التَّحَرَّى وَهَذِهِ الْمَخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطَا وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ لِتَرْكِهِ فَرَضَ الْمَقَامِ -

অনুবাদ : আর যদি সে নামাজের মধ্যে তা জানতে পারে, তাহলে কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। কেননা কুবাবাসীরা যখন কেবলা পরিবর্তনের খবর পেলেন তখন তাঁরা নামাজের অবস্থায় ঘুরে গেলেন এবং মহানবী ﷺ তা পছন্দ করেছেন। তদ্রূপ যদি তার সিদ্ধান্ত অন্য দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সে সেদিকে অভিমুখী হবে। কেননা পরবর্তী ক্ষেত্রে নতুন ইজতেহাদের ওপর আমল করা আশ্যক। তবে তাতে ইতঃপূর্বে আদায় কৃত অংশ ভংগ হবে না। যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে কোনো জামাআতের ইমামতি করল এবং চিন্তা-ভাবনা করে কেবলা নির্ধারণ করল এবং পূর্বের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করল। আর তার পিছনে যারা আছে তারাও চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ আরম্ভ করেছে এবং প্রত্যেকে একে দিকে নামাজ আদায় করল। এমতাবস্থায় তারা প্রত্যেকেই ইমামের পশ্চাতে আছে এবং ইমাম কী করছেন, তা তাদের জানা নেই, তাহলে সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ নামাজ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। যেমন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের মাস্আলা। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানতে পারে, তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আপন ইমাম ভুলের ওপর আছে বলে সে বিশ্বাস করে। এই হুকুম যদি সে ইমামের সম্মুখে হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম হবে। কেননা সে তার স্থান গত ফরজ তরক করেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে নামাজ শুরু করেছে অতঃপর নামাজের মধ্যে অবগত হলো যে, সে কিবলার দিকের ক্ষেত্রে ভুল করেছে, তাহলে সে নামাজের মধ্যেই কিবলার দিকে ঘুরে যাবে। দলিল, কুবাবাসীরা যখন নামাজের মধ্যে জানতে পারল যে, কেবলা পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ এসেছে, তখন নামাজের মধ্যে রুকু অবস্থায় পবিত্র কা'বার দিকে ঘুরে গিয়েছেন। যখন রাসুল ﷺ এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তা পছন্দ করলেন, কোনো প্রতিবাদ করেননি। এ-ই হুকুম এ সময়ও যখন নামাজের মধ্যে তার মত পরিবর্তন হয়ে অন্য দিকে স্থির হয়, যে দিকে মত স্থির হয়, সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে। যদি ঘুরতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে, তাহলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা নামাজের পরবর্তী অংশে নতুন ইজতেহাদের ওপর আমল করা ওয়াজিব। পূর্বে আদায়কৃত অংশ নতুন করে পড়তে হবে না।

وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فِي لَيْلَةِ الْغَيْثِ هোক বা ময়দানে হোক অথবা কিবলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির উপস্থিত বিহীন হোক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমুখী হয়ে নামাজ আদায় করেছে। আর তার পিছনে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে প্রত্যেকে একে দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছে এমন অবস্থায় যে, তারা প্রত্যেকে ইমামের পশ্চাতে আছে, কেউ ইমামের সম্মুখে নেই এবং ইমাম কি করছেন তাও তাদের জানা নেই। এমন অবস্থায় সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়াতো পাওয়া গিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ নামাজ তো রাতের নামাজ। রাতের নামাজে তো কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়। এর মাধ্যমে তো জানা যেতে পারে যে, ইমাম কোন্ দিকে মুখ করে আছেন; কাজেই এখানে ইমামের অবস্থা অজ্ঞাত থাকবে কেন? জবাব, হতে পারে কাজা নামাজ অথবা আওয়াজের সহিত কিরাআত পড়তে ভুলে গিয়েছে অথবা আওয়াজের দ্বারা জানা গেছে যে ইমাম সম্মুখে আছে কিন্তু এটা জানতে পারেনি যে, কোন দিকে আছে অথবা শত্রু বা ডাকাতের ভয় ইমাম আওয়াজের সাথে কিরাআত পড়েনি এবং সকলে কিরাআত আওয়াজবিহীন ভাবে পড়ার চেষ্টা করেছে বিধায় সকলের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ নামাজ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না। যেমন কা'বার অভ্যন্তরের মাসআলা। কেননা আমাদের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে।

যদি লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ে এবং ইমামের ইকতেদা করে এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তির পিঠ ইমামের পিঠের দিকে করবে অথবা নিজের মুখমণ্ডল ইমামের পিঠের দিকে করবে, তার নামাজ জায়েজ হবে। তবে যে ব্যক্তি স্বীয় মুখ ইমামের মুখের দিকে করবে তার নামাজ মাকরুহের সাথে আদায় হবে। শর্ত হলো তার এবং ইমামের মাঝে কোনো সূতরা না থাকতে হবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় পিঠ ইমামের মুখের দিকে করবে, তাঁর নামাজ জায়েজ হবে না। যে ব্যক্তি ইমামের ডানে এবং বামে থাকবে তার নামাজ জায়েজ হবে, তবে শর্ত হলো, যে প্রাচীরের দিকে ইমাম মুখ করেছে সে দিকের কাতারের কোনো মুসল্লী ইমামের তুলনায় প্রাচীরের অধিক নিকটবর্তী না হতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে যেদিকের চিন্তা-ভাবনা করছে সেটিকেই সহীহ মনে করেছে এবং অন্য দিককে ভুল মনে করেছে, বিধায় ইমামের পিছনে ইকতেদা সহীহ হবে না। কেননা সে আপন ইমাম ভুলের ওপর আছে বলে বিশ্বাস করে। অনুরূপভাবে যদি মুকতাদী ইমামের সম্মুখে যায় তাহলেও নামাজ ফাসিদ হবে। কেননা সে তার স্থান গত ফরজ তরক করেছে।

## بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

فَرَأَيْتُ الصَّلَاةَ سِتَّةَ التَّحْرِيمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَالْمُرَادُ بِهِ تَكْبِيرُهُ  
الْإِفْتِتَاحَ الْقِيَامَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَالْقِرَاءَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا  
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَالْقَعْدَةَ فِي  
آخِرِ الصَّلَاةِ وَمَقْدَارَ التَّشَهُّدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ  
إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ عَلَّقَ التَّحَامَ بِالْفِعْلِ قَرَأَ أَوْ لَمْ يَقْرَأَ -

### নামাজের ধারাবাহিক বিবরণ

অনুবাদ : নামাজের ফরজ ছয়টি- (প্রথমত) তাহরীমা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে তাকবীর বলো ..... ) আর (মুফাসসিরগণের সর্বসম্মতিক্রমে) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা। (দ্বিতীয়ত) কিয়াম, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (তোমরা একত্রিটিও আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হও)। (তৃতীয়ত) কেয়াত, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয় তোমরা পড়ো)। রুকু ও সিজদা করা, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا তোমরা রুকু করো এবং সিজদা করো। নামাজের পর তাশাহুদ পরিমাণ বৈঠক। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে তাশাহুদ শিক্ষাদান কালে বলেছেন- إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (তুমি যখন এ বললে বা এ করলে তখন তোমার নামাজ সমাপ্ত হলো) এখানে নামাজের সম্পূর্ণতাকে তিনি বসার কাজের সাথে যুক্ত করেছেন (তাশাহুদ পাঠ করুক বা না করুক)।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকথা : এ পর্যন্ত নামাজের ভূমিকার আলোচনা ছিল। এখন থেকে মূল উদ্দেশ্য তথা নামাজের আলোচনা করা হবে।  
أعدة এবং وعد - যেমন- مصدر উভয়টি এবং مترادف উভয়টি صفت এবং وصف গণের মতে أهل اللغة মুতাকাল্লিমগণের মধ্য থেকে আমাদের ওলামাদের মতে وصف হলো واصف -এর কালাম। আর صفت হলো যা মাওসুফ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন- زيد. زيد. زيد عالم -এর صفت নয়। আর তার ইল্ম যা তার সাথে সম্পৃক্ত صفت দ্বারা , তার وصف নয়। তবে এখানে صفت দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, صفت দ্বারা মুরাদ হলো নামাজের ঐ অবস্থা যা তার আরকান ও আওয়ারিয দ্বারা অর্জন হয়। কারো কারো মতে صفت দ্বারা মুরাদ হলো নামাজের ওয়াজিবাত, ফারায়িয, সুনান এবং মুস্তাহাবসমূহ! এ সূরতে صفت -এর اضافত -এর দিকে হবে। এবং بَابُ صِفَةِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ হতে প্রত্যেকটি সীফত নামাজের জুয এ তথা অংশ বিশেষ। কেউ কেউ বলেন, এখানে صفت উহ্য আছে। মূলত ইবারত হবে এভাবে الصَّلَاةِ أَجْزَاءِ হতে সূরতে সীফত দ্বারা কাইফিয়ত মুরাদ হবে। অর্থাৎ উক্ত অধ্যায় নামাজের আজয্যার কাইফিয়ত তথা উযুব, ফরযিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে।

এখানে কিয়াসের তাকাযা হলো ইমাম কুদ্দীর (র.)-এর **فَرَأَيْضُ الصَّلَاةِ** বলা কিন্তু তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহারের নিয়ম হলো **معدود** যদি **مذكر** হয় তাহলে **عدد** টা **مؤنث** হবে, আর **معدود** টা **مؤنث** হলে **عدد** টা **مذكر** হবে। এখানে **فرائض** - **معدود** যা **فريضة**-এর বহুবচন। আর **فريضة** হলো **مؤنث** তাই **عدد** -কে **مذكر** নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এর জবাব হলো এখানে **فرائض** -কে **فروض** -এর ব্যাখ্যা নেওয়া হয়েছে। **فروض** হলো **فرض** -এর বহুবচন। আর **مذكر** -এর **مؤنث** তাই **عدد** লওয়ায় ফায়দা অনুসারে হয়েছে। এ দিকে ইনশা'য়াল্লাহু লিখেন কোনো কোনো মুসখায় **فرائض** **الصلوة** রয়েছে। এ হিসাবে তো শুরু থেকেই কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

**প্রশ্ন :** গ্রন্থকার **الصلوة** **فرائض** বলেছেন, **الركان** কেন বলেননি? **فرائض** শব্দটি **عام** যা **اركان** ও **غير اركان** সব কিছুকে শামিল করে। যেমন- এখানে যে **تحريم** -এর কথা বলা হয়েছে তা নামাজের **ركن** নয়; বরং নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত। আর **اخيره** যদিও **ফরজ** তবে **اصلی** নয়। আর **ركن اصلی** না হওয়ার দলিল হলো, **فعدد** **প্রথম** **রাকআতে** **প্রবর্তিত** নয়। মুদ্বাকথা, গ্রন্থকার যদি **فرائض** -এর স্থলে **اركان** বলতেন, তাহলে **تحريم** ইত্যাদি তাতে শামিল হতো না। তাই এমন শব্দ উল্লেখ করেছেন যা সব কিছুকে শামিল করে।

**ফরজ ও রুকন**-এর সংজ্ঞা : **ফরজ** : যা অকাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং যা করা অবধারিত, তা **ركن** হোক বা শর্ত হোক। আর **ركن** বলা হয়, যা নামাজের ভিতরের অংশ বিশেষ হয়। (বাহরুররায়িক) আবার কখনো **ফরজ** ঐ বিষয়কেও বলা হয় যা **রুকন**ও নয় আবার শর্তও নয়।

নামাজের **ফরজ**সমূহের প্রথমটি হলো- তাহরীম। আভিধানিক অর্থে তাহরীম বলা হয় **جَعَلَ الشَّيْءَ مُحَرَّمًا** কোনো কিছুকে হারাম করা। এখানে তাহরীম দ্বারা **تكبير** মুরাদ। কেননা তাকবীরে উলা দ্বারা ঐ সমস্ত জিনিসকে হারাম করা হয় যা ইতঃপূর্বে হালাল ছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাকবীরের উক্ত শান নেই।

আল্লাহা ইব্নুল হুমাম (র.) বলেন, তাকবীরকে **রুকন** অর্থে তাহরীম বলা হয়। কেননা তাহরীম সঙ্গতগতভাবে তাহরীম নয়; বরং তার দ্বারা তাহরীম সাবিত হয়। এদিকেই ইশারা করা হয়েছে হাদীস শরীফে  
**مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ** .

নামাজের চাবি হলো তাহর, আর তাহরীম হলো তার তাকবীর এবং তার তাহলীল হলো তাসলীম। (আবু তাউদ, তিরমিযী) তাকবীরে তাহরীম ফরজ হওয়ার উপর কয়েকটি দলিল : এক. রাসুলুল্লাহ **ﷺ** তাকবীরে তাহরীম সম্পর্কে দায়েমীভাবে বলে গেছেন, রাসুলুল্লাহ **ﷺ** -এর এভাবে বলা ওয়াজিব হওয়ার আলামত। দুই. ইজমা, কেননা রাসুলুল্লাহ **ﷺ** -এর জমা'না থেকে অদ্যবধি তাকবীরে তাহরীমার ওজুবে ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তিন. আল্লাহ তা'আলার বাণী- **وربك فكبر** এর মধ্যকার **فكبر** দ্বারা আল্লাহ আকবার বলা উদ্দেশ্য। কেননা বর্ণিত আছে যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রাসুলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন আল্লাহ আকবার। হযরত খাদীজা (রা.) ও বলেছেন আল্লাহ আকবার এবং খুব খুশি হলেন আর ইয়াকীন করলেন যে, এটা একমাত্র আল্লাহর প্রত্যাদেশ বৈ কি? এ জন্য মুফাস্সিরীনে কেবলম একমত যে, এর দ্বারা তাকবীরে তাহরীম মুরাদ। তা ছাড়া **كبر** শব্দটি **امر** -এর **صيغة** যা **وجوب** -কে চায়। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নামাজের বাইরে কোনো তাকবীর ওয়াজিব নয়। সুতরাং বুঝা গেল এর দ্বারা নামাজের তাকবীর মুরাদ। তাকবীরে তাহরীম ব্যতীত নামাজের কোনো তাকবীর ওয়াজিব নয়। তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, **فكبر** দ্বারা তাকবীরে তাহরীম মুরাদ।

দ্বিতীয় **ফরজ** কিয়াম। **ফরজ** নামাজ, বিতর এবং যা **ফরজের** সাথে সম্পর্কিত যেমন মান্নুতের নামাজ। এগুলো দাঁড়িয়ে আদায় করা **ফরজ**। তবে শর্ত হলো কিয়াম ও সিজদা করার শক্তি থাকতে হবে। যদি কিয়াম করতে সক্ষম হয় কিন্তু সিজদা করতে না পারে তবে তার জন্য বসে ইশারা করে নামাজ পড়া উত্তম। কিয়াম **ফরজ** হওয়ার দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী **وَقَوْمًا لِّلَّو قَانِيْنَ**

কনূত অর্থ- ইতা'আত করা। কারো মতে বুণু এবং কারো মতে চুপ থাকা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, কনূত-এর অর্থ হলো নামাজে দীর্ঘ সময় কেয়াম করা। আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা কিয়াম-এর امر (আদেশ) দিয়েছেন। আর امر (আদেশ) ওজুবের জন্য আসে। কারো মতে নামাজের বাইরে কিয়াম ওয়াজিব নয়। সুতরাং বুঝা গেল নামাজের মধ্যে কিয়াম ফরজ।

তৃতীয় ফরজ কেরাত। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-فَارُؤُوا مَا تَسِرُّ مِنَ الْقُرْآنِ- উক্ত আয়াতে কেরাতের হুকুম দেওয়া হয়েছে আমার-এর صِيفে দ্বারা। আর আমার ওজুবের জন্য আসে। আর নামাজের বাইরে কোনো কেরাত ফরজ নয়। সুতরাং বুঝা গেল নামাজের মধ্যে কেরাত ফরজ। কতটুকুন কেরাত ফরজ এ সংক্রান্ত আলোচনা: فصل القرآن-এর মধ্যে করা হবে।

চতুর্থ ফরজ রুকু করা এবং পঞ্চম ফরজ সিজদা করা। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী-وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا উক্ত আয়াতে রুকু ও সিজদার আদেশ امر দ্বারা করা হয়েছে যা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে কিছু কিছু লোক সিজদা করতো কিন্তু রুকু করতো না, আবার কিছু কিছু লোক রুকু করতো কিন্তু সিজদা করতো না। তাই সকলকে আদেশ দেওয়া হলো যে, রুকু ও সিজদা দ্বারা নামাজ আদায় করো। ষষ্ঠ ফরজ তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক। অর্থাৎ এ পরিমাণ সময় বসা যাতে النحيات থেকে وَرَسُولُهُ পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়। দলিল হলো, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তাহাবী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) কর্তৃক বর্ণনা করেন যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَعَلَّمَ التَّشَهُدَ

অতঃপর হাদীসের শেখাংশে রয়েছে

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَعَمَّ وَأَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীসের সমার্থবোধক শব্দ এভাবে নকল করেন-

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাত ধরে তাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন যখন তুমি তা বললে বা করলে তাতে তুমি নামাজ পূরা করে ফেললে। এখন তুমি দাঁড়াতে চাইলে দাঁড়িয়ে যাও অন্যথায় বসতে চাইলে বসে যাও। উক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের সম্পূর্ণতাকে বসার কাজের সাথে মেলন যুক্ত করেছেন। এতে সে তাশাহুদ পড়ুক বা না পড়ুক। বুঝা গেল তাশাহুদ পড়া পরিমাণ বসা ফরজ।

এ ছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে,

إِنَّهُ قَالَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন সে আখেরী সাজদা থেকে মাথা উঠাল এবং তাশাহুদ পরিমাণ বসল তারপর তার হাদাস হলো এতে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল তাশাহুদ পরিমাণ বসা ফরজ। (حاشية شرح نفاية)।



قَالَ وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَهُوَ سَنَةٌ أَطْلَقَ اسْمَ السَّنَةِ فِيهَا وَاجِبَاتٌ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَصَمِّ السُّورَةِ مَعَهَا وَمَرَاعَاتُ التَّرْتِيبِ فِيمَا شَرَعَ مَكْرَرًا مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاءَةِ الشَّهَادَةِ فِي الْآخِرَةِ وَالْقُنُوتُ فِي الْوُتْرِ وَتَكْسِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَالْمَخَافَتَةُ فِيمَا تَخَافَتْ فِيهِ وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السُّهُورِ بِتَرْكِهَا هَذَا هُوَ الصَّحِیحُ وَتَسْمِيَّتُهَا سَنَةً فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وَجُوبُهَا بِالسَّنَةِ

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এ ছাড়া আর যা কিছু রয়েছে, তা সুন্নত। ইমাম কুদুরী (র.) এখানে সুন্নত শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব বিষয়ও রয়েছে। যেমন ফাতিহা পাঠ, তার সাথে সূরা যোগ করা, যে কাজ শরিয়ত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা। প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ, বিতরের কুনূত, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা সে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ এবং যে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা হয়, সে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ। এ জন্যই এগুলোর কোনো একটি তরক করলে তার উপর দু'টি সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়, এটা-ই বিতুদ্ধ অভিমত। কুদুরীতে এগুলোকে সুন্নত বলার কারণ হলো, এগুলোর ওয়াজিবত্ব সুন্নাহ দ্বারা সাবিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শায়খে কুদুরী (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত ফরজগুলো ছাড়া সবগুলো সুন্নত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদুরী (র.) সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব রয়েছে। তাই এখানে সুন্নত শব্দটির ব্যবহার ঠিক হয়নি?

হিদায়া প্রণেতা উপরোক্ত ইবারতের শেষে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, এখানে সুন্নত দ্বারা ثَابِتٌ بِالسَّنَةِ মুরাদ, আর ওয়াজিবও সুন্নত দ্বারা ই সাব্যস্ত। তাই ওয়াজিবসমূহের উপর সুন্নতের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকারের এ জবাব সহীহ নয়। কেননা এ অবস্থায় جَمَعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ লায়িম আসে। কেননা সুন্নত দ্বারা سنن মুরাদ নেওয়া হলো (حَقِيقَتٌ) হাকীকত। আর واجبات মুরাদ নেওয়া হলো হাল্লা তাই এখানে যেহেতু উভয়টি মুরাদ, এ কারণে حَقِيقَتٌ ও مجاز একসাথে হওয়া লায়িম আসে। এর জবাব হলো, ইমাম কুদুরী (র.)-এর ثَابِتٌ بِالسَّنَةِ দ্বারা ثَابِتٌ بِالسَّنَةِ মুরাদ। আর واجبات ও سنن যা উক্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো উক্ত সকলের (ثَابِتٌ بِالسَّنَةِ)-এর অধীনে হাকীকাতান দাখিল তথা মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। তাই جَمَعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ-এর প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার ওয়াজিব বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়ে গিতে বলেছেন যেমন- সূরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, ফাতিহার সাথে অন্য সূরা যোগ করা ওয়াজিব। যে সকল কাজ এক রাকআতে একাধিকবার করার নির্দেশ রয়েছে সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করাও ওয়াজিব। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে প্রথম রাকআতের খিতীয়া সিজদা ছেড়ে দেয় এবং দাড়িয়ে নামাজ পূরা করে, তারপর তার স্বরণ হয়। এখন সে তার অনাদায়ী সিজদা আদায় করবে এবং তারতীব রক্ষা না করার কারণে সিজদায়ে সাহব দিয়ে। তার এ স্বরণ সালামের আগে হোক বা পরে হোক। তবে শর্ত হলো নামাজ ভঙ্গকারী কোনো কাজ তার থেকে না হওয়া। প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ, বিতরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় সে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা। আর যে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা হয় সে সকল নামাজে অনুচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা ও ওয়াজিব। এ কারণেই এগুলোর কোনো একটি যদি ছুটে যায় তবে সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

ফায়িদা : এখানে ওয়াজিব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেগুলো ব্যতীত নামাজ সহীহ হয়ে যায়। তবে ভুলক্রমে তরক করার দ্বারা সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। আর সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো। যেগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন, ওজর ব্যতীত কখনো তরক করেননি। যেমন- হানা, আউযুল্লাহ পড়া, রুকু তাকবীরসমূহ ইত্যাদি। নামাজের কিছু আদাবও রয়েছে। আর নামাজের আদাব হলো, যেগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো করেছেন তবে সর্বদা করেননি। যেমন- রুকু সিজদায় তিনের অধিক তাসবীহ পড়া, কেরাতে মাস্নুনীর অধিক কেরাত পড়া।

وَإِذْ أَسْرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبِيرًا لِمَا تَلَوْنَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَهُوَ شَرْطُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) حَتَّى أَنْ مَنْ يَحْرِمُ لِلْفَرِضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهَا التَّطَوُّعَ وَهُوَ يَقُولُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ لَهَا مَا يَشْتَرِطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَهَذَا آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ وَلَنَا أَنَّهُ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَمُقْتَضَاهُ الْمَغَايِرَةُ وَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ كَتَكَرَّرِ الْأَرْكَانِ وَمَرَاعَاةُ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ وَتَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سَنَةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاطَّبَ عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّفْظُ يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُقَارِنَةِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِيِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَكْبِرُ لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفَى الْكِبَرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّنْفِي

وَرَدَّ  
مقدم -

অনুবাদ : যখন নামাজ শুরু করবে তখন তাকবীর বলবে। ইতঃপূর্বে আমাদের পঠিত আম্মাতের কারণে। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—তাকবীর হলো নামাজের তাহরীম। আমাদের মতে তাকবীরে তাহরীমা হলো নামাজের শর্ত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (তার মতে এটা রুকন) (আমাদের মতে শর্ত হওয়ার কারণেই) যে ফরজের তাহরীমা বাঁধবে, সে ঐ তাহরীমা দ্বারা নফল নামাজ আদায় করতে পারবে। তিনি (ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, অন্যান্য রুকনের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তাহরীমার জন্যও সে সব শর্ত রয়েছে। আর এটি রুকন হওয়ার আলামত। আমাদের যুক্তি হলো, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (সে তার প্রতিপালকের নাম নিল অতঃপর নামাজ আদায় করল) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকবীরের উপর সালাতকে আত্বফ করেছেন। আর আত্বফ-এর দাবি হলো বৈপরীত্য। আর এ কারণেই অন্যান্য রুকনের তাকরারের মতো এটি তাকরার হয় না। (রুকন সমূহের) যাবতীয় শর্ত এখানে বিবেচনা করার কারণ হচ্ছে, কিয়াস রুকনটি তার সংলগ্ন। তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করবে। এটি সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিয়মিত করেছেন। আর এই (مع) শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তাকবীর ও উভয় হাতের উত্তোলন একত্রে হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে এ মতামত বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তাহাবী (র.) এ আমল করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, প্রথমে উভয় হাত উঠাবে, তারপর তাকবীর বলবে। কেননা তার এ কাজ গায়রুল্লাহ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। আর অস্বীকৃতি স্বীকৃতির উপর অগ্রবর্তী হয়ে থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যখন নামাজ আরম্ভ করবে, নামাজ ফরজ বা নফল হোক। তখন দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলবে। সুতরাং কেউ যদি বসে তাকবীর বলে পরে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সে নামাজ আরম্ভকারী হবে না। যদি কোনো কোনো ব্যক্তি নামাজে শরিক হওয়ার আশায় এসে ইমামকে রুকুতে পায় এবং সে পিঠ ঝুকানো অবস্থায় তাকবীর বলে। এ অবস্থায় সে যদি তাকবীর বলার সময় কিয়ামের নিকটবর্তী হয়, তবে তার তাকবীর বলা জায়েজ হবে, অন্যথায় জায়েজ হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায়। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু তাকবীর বলে তাও জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় তার দাঁড়ানোকেই তাকবীরে তাহরীমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিতৃপ্তমত মায়হাব হলো প্রথমে উভয় হাত উঠানো তারপর তাকবীর বলা। সাধারণ মশায়িখগণ এ মতটিই ব্যক্ত করেছেন। দলিল হলো, নামাজির **فعل** -এ **نفي** -এ **قول** এবং **نفي** -এ **اثبات** -এর অর্থ পাওয়া যায়। আর তা এভাবে যে, যখন সে হাত উঠায় তখন গায়রুল্লাহ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি বুঝায়। আবার যখন আল্লাহ আকবার বলে তখন আল্লাহর বড়ত্ব বুঝায়। আর কায়দা আছে যে, **نفي** ও **اثبات** -এর মধ্যে **نفي** টি **اثبات** -এর উপর মুকাদ্দাম হয়। যেমন কালিমায়ে শাহাদাতের মধ্যে **نفي** মুকাদ্দাম। এ কারণে উম্ম হলো প্রথমে হাত উঠাবে, তারপর তাকবীর বলবে। বিতৃপ্ত মতামতটির সমর্থন ওয়ায়েল ইবনে হুজরের হাদীস দ্বারাও পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো এই- **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بَرَقَ** -এই- **أَرْثَاهُ** রাসূলুল্লাহ **ﷺ** যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন তারপর তাকবীর বলতেন। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেননি। কেননা যহরত আনাস (রা.)-এর হাদীস এর বিরোধী। হাদীসটি হলো **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَرَّرْتُ رَفَعَ يَدَيْهِ** (যা **أَفْتَحَ** **الصَّلَاةَ** **كَرَّرْتُ** **رَفَعَ** **يَدَيْهِ** যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তাকবীর বলতেন তারপর উভয় হাত উঠাতেন) - (শরহে নিকায়)

وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَاضِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَرْفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَى هَذَا تَكْثِيرُ الْفَنَوْتِ وَالْأَعْيَادِ وَالْعِنَازَةِ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَلَنَا رِوَايَةٌ وَأَبْنُ حُجْرٍ وَالْبَرَاءُ وَأَنَسُ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ جَذَاءً أَذُنَيْهِ وَلَئِنْ رَفَعَ الْبَيْدَ لِأَعْلَامِ الْأَصِمِّ وَهُوَ يَمَّا قُلْنَا وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ وَالْمَرَأَةِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا جَذَاءً مَنْكِبَيْهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ اسْتَرَّ لَهَا -

অনুবাদ : উভয় হাত এতটা উঠাবে, যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টো কানের লতিকার বরাবর হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কনুতের তাকবীর ঈদের তাকবীর ও জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো আবু হুমাইদ সাঈদী বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। আমাদের দলিল হলো, উয়ায়েল ইবনে হুজর, বারা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কান পর্যন্ত উঠাতেন। তা ছাড়া হাত উঠানোর উপকারিতা হলো বধিরদেরকে অবহিতকরণ। আর তা ঐ ভাবেই সম্ভব, যেভাবে আমরা বলেছি। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসকে অপরগতার উপর আরোপ করা হবে। স্ত্রীলোক তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এটাই বিত্বক্ক অভিমত। কেননা এটা তার সতর রক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত এতটা উঠাবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টো উভয় কানের লতিকার বরাবর হয়। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.) বলেন, কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এমনটি বর্ণনা রয়েছে। কনুতের তাকবীর, দু ঈদের তাকবীর এবং জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, আবু হুমাইদ সাঈদী বর্ণিত হাদীস-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ إِنَّا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِمَصْلُوحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْنَاهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَايِهِ جَذَاءً مَنْكِبَيْهِ (بخاری)

মুহাম্মদ ইবনে আতা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের এক জামা'আতের সাথে বসছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আমর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম, তখন আবু হুমাইদ সাঈদী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজকে আপনাদের তুলনায় বেশি হিফজ করেছি (মনে রেখেছি)। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী) হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন- **تَكَبَّرَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ** - উভয় হাদীস দ্বারা বুখা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.), বারা ইবনে আযিব এবং হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন- **كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ جَذَاءً أَذُنَيْهِ** (হাকিম) - যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। - (হাকিম)

দারে কুতনী উক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা.) সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ ذِي إِبْهَامَيْهِ أَدْنَى .

অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আরম্ভ করতেন, তাকবীর বলতেন। তারপর উভয় হাত এতটা ঠীঠাতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টো কানের লতিকার বরাবর হয়ে যেতো।

আমাদের মায়হাবের সমর্থনে আকবী দলিল হলো, তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো হয় বধিরদেরকে অবহিত করানোর জন্য। আর তা এ ভাবেই সম্ভব যেভাবে আমরা বলেছি। অর্থাৎ কান পর্যন্ত হাত উঠানোর সাথে। কেননা ইমাম যখন কান পর্যন্ত হাত উঠাবে তখন বধির লোকেরা বুঝতে পারবে যে, তাকবীর বলা হয়েছে। তখন তারাও তাকবীর বলে নামাজ আরম্ভ করে দিবে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাকবীরের সময় হাত উঠানো যদি বধিরদেরকে অবহিতকরণ হয় তাহলে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি তো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। কেননা তার ব্যাপারে তো এ কারণ পাওয়া যায় না? এর জবাব হলো, আসল তো হলো জামা'আতের সাথে আদায় করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী—وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ—একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির নামাজ তো হলো نادر আর نادر -এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা ফায়দা আছে, একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির নামাজ তো হলো نادر তারপর অপর প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তো মুকতাদীরও কান পর্যন্ত হাত উঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই? জবাব হলো, বধির লোকেরা সর্বশেষ কাতারে দাঁড়াবে, তাই তারা ইমামকে দেখতে পায় না। এ অবস্থায় তারা তাদের সামনের মুকতাদীদেরকে দেখেই নামাজ আরম্ভ করবে। এ কারণে মুকতাদীদেরও কান পর্যন্ত হাত উঠানো জরুরি। গ্রন্থকার বলেন, (ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাবে) তার বর্ণিত হাদীসকে অপারগতার অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। যেমন ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত—

إِنَّهُ قَالَ قِيمَتِ الْمَدِينَةِ فُوجِدَتْهُمْ بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَذْنَيْنِ ثُمَّ قِيمَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ قَائِلٍ وَعَلَيْهِمُ الْآكِيْبَةُ وَالْبَرَانِسُ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ فُوجِدَتْهُمْ بِرَفْعِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْمَنَاطِبِ .

ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় গেলাম তখন দেখলাম যে, লোকেরা (তাকবীরে তাহরীমার সময়) স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। পরবর্তী বছর আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে) হাজির হলাম। লোকেরা প্রচণ্ড শীতের কারণে, কাপড়-চোপড় এবং এমন পোশাক পরে আছেন যার কিছু অংশ টুপির কাজে আসে। তখন দেখলাম তারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাচ্ছেন। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) উক্ত হাদীসে স্মৃষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ সকল লোকদের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো তাদের পোশাকের কারণে ছিল। সুতরাং حَدِيثُ إِلَى الْمَنَاطِبِ অপারগতার উপর আরোপ করা হবে।

শরহে নিকায়ার গ্রন্থকার উভয় হাদীসে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, يد ঘারা হাতের তালু এবং তার উপরিভাগ মুরাদ। সুতরাং হতে পারে হাতের তালুর কিনারা এবং গোড়ালি কাঁধ বরাবর ছিল আর শুধু হাতের তালু কান বরাবর ছিল। এতে উভয় হাদীসের মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না।

ওয়াইল ইবনে হুজর এর ঘারা বলতেছেন যে, স্বীলোক তাকবীরে তাহরীমার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। এটাই বিতুদ্ধ অন্মিত। হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, স্বীলোকেরা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। কারণ হলো, رَفَعَ يَدَيْهِ হাতের তালু ঘারা হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বীলোকদের হাতের তালু সতর নয়। তাই কান পর্যন্ত হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা বরাবর।

বিতুদ্ধ মতের কারণ হলো, কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর সময় মহিলাদের জন্য অধিক পর্দা নিহিত। তাই তাদের কাঁধ পর্যন্তই হাত উঠানো অধিক সমীচীন।

فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلٌ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) إِنْ كَانَ يَحْسِنُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَجْزِ إِلَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَوَّلَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) لَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَوَّلٍ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّوْقِيفُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) يَقُولُ إِذْ خَالَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ أَبْلَغُ فِي الثَّنَاءِ فَقَامَ مَقَامَهُ وَأَبُو يُوسُفَ (رح) يَقُولُ إِنْ أَفْعَلَ وَفَعِلًا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ لَا يَحْسِنُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الْمَعْنَى وَلَهُمَا أَنْ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لُغَةً وَهُوَ حَاصِلٌ -

অনুবাদ : যদি তাকবীরের পরিবর্তে اللَّهُ أَجَلٌ বা اللَّهُ أَعْظَمُ বা الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ বা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম (ও গুণ) উচ্চারণ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীর শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয়, তাহলে اللَّهُ الْأَكْبَرُ বা اللَّهُ الْكَبِيرُ অথবা اللَّهُ أَكْبَرُ ছাড়া অন্য কিছু জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, প্রথম দুটি ছাড়া (اللَّهُ أَكْبَرُ) অন্য কিছু জায়েজ হবে না। আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রথমটি ছাড়া (অর্থাৎ اللَّهُ أَكْبَرُ) অন্য কিছু জায়েজ হবে না। কেননা (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর আমল রূপে এটিই বর্ণিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল। ইমাম শাফি'ঈ (র.) (নীতিগতভাবে ইমাম মালিকের যুক্তি স্বীকার করে) বলেন, اللَّهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ। সুতরাং এটিই তার স্থলবত্তী। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে أَفْعَلَ ও فَعِلٌ উভয় মাপের শব্দ সমার্থক। (সুতরাং اللَّهُ أَكْبَرُ ও اللَّهُ الْكَبِيرُ উভয় শব্দই তাকবীর বৈধ হবে) তবে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ তখন অন্যান্য শব্দে তাকবীর বলার সুযোগ দেওয়া হবে।) কেননা তখন তো সে মর্ম প্রকাশেই শুধু সক্ষম। (সুতরাং যে কোনো ভাবে মর্ম প্রকাশই তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণে বাধ্যবাধকতা তার উপর থেকে তুলে নেওয়া হবে।) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি হলো, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ। আর তা প্রকাশিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে নামাজ আরম্ভ করার শব্দসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তরফাইন (র.)-এর মতে প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ যা আল্লাহর তা'জীম বা মর্যাদা প্রকাশ করে। যেমন-سُبْحَانَ اللَّهِ বা اللَّهُ الْأَكْبَرُ বা اللَّهُ الْكَبِيرُ বা الْحَمْدُ لِلَّهِ বা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বা الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ বা اللَّهُ أَعْظَمُ বা اللَّهُ أَجَلٌ বা اللَّهُ الْكَبِيرُ বা كَبِيرٌ

কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম বা গুণের কোনো শব্দ। এগুলোর যে কোনো শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা হোক সব জায়েজ। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয় তবে শুধু তিন শব্দের তথা **اللَّهُ أَكْبَرُ** - **اللَّهُ أَكْبَرُ** - **اللَّهُ أَكْبَرُ** -এর মধ্য থেকে কোনো একটি শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ। এগুলো ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দ্বারা জায়েজ নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, শুধু **اللَّهُ أَكْبَرُ** ও **اللَّهُ أَكْبَرُ** দ্বারা আরম্ভ করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু **اللَّهُ أَكْبَرُ** দ্বারা জায়েজ। ইমাম আহমদ (র.) ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুধু **اللَّهُ أَكْبَرُ** ই বর্ণিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল। তাই অন্যকোনো শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে **اللَّهُ أَكْبَرُ** বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু **اللَّهُ أَكْبَرُ** কে **الف** ও **لام** এর দ্বারা যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বহু। সুতরাং এটিও **اللَّهُ أَكْبَرُ** -এর স্থলবর্তী।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ক্ষেত্রে **أَفْعَلُ**-এর ওয়ানে **اسم تفصيل** এবং **فَعِيلٌ يَمَعْنِي فَاعِلٌ** সমার্থবোধক। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে বেশি সাবিত করা মুরাদ নয়। কারণ, আসল বড়ত্বের মধ্যে আল্লাহর সামকক্ষ কেউ নেই। এজন্য আল্লাহর গুণাবলিতে **أَفْعَلُ** ও **فَعِيلٌ** বরাবর। তবে সে ব্যক্তি যদি ভালোভাবে শুদ্ধ করে তাকবীর বলতে সক্ষম না হয়, তখন যেভাবে পারে তা'যীমের মর্ম আদায় করে দিবে। কেননা তখন তো সে শুধু মর্ম প্রকাশেই সক্ষম।

তরফাইনের দলিল হলো, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ করা। আল্লাহর বাণী- **وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** অর্থাৎ **عظمته** -এর অর্থে এসেছে। আর মর্যাদার অর্থ ঐ সকল শব্দ দ্বারা হাসিল হয়ে যায় যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ জন্য ঐ সকল শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করলে আদায় হয়ে যাবে, যা আল্লাহর তা'যীমকে বুঝায়।

فَإِنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَعَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ  
وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا فِي الذَّبْحِ وَإِنْ  
لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَاهُ أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْإِفْتِتَاحِ فَمُحَمَّدٌ (رح) مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)  
فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ (رح) فِي الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَرْبَةِ مَا  
لَيْسَ بِغَيْرِهَا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَفَوَجَّهَ قَوْلَهُمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ  
كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ الْعَجِزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ بِخِلَافِ التَّسْلِيمِ  
لِأَنَّ الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلِّ لِسَانٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَفِي زُرِّ الْأَوَّلِينَ وَلَمْ  
يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللَّغَةِ وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعَجِزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسَبِّحًا لِمُخَالَفَةِ  
السُّنَنِ الْمَتَوَاتِرَةِ وَجُوزُ بَيِّ لِسَانٍ كَانَ يَسُوَّى الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا تَلَوْنَا  
وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَالْخِلَافُ فِي الْإِعْتِدَادِ وَلَا خِلَافٌ فِي أَنَّهُ  
لَا فُسَادَ وَيُرْوَى رَجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ وَالْخُطْبَةُ  
وَالْتَّشَهُدُ عَلَى هَذَا الْإِخْتِلَافِ رَفَى الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ .

অনুবাদ : যদি ফারসিতে নামাজ শুরু করে, কিংবা ফারসি ভাষায় কেরাত পাঠ করে, কিংবা জবাই করার সময় ফারসি ভাষায় বিসমিল্লাহ পড়ে অথচ সে শুদ্ধ আরবি বলতে পারে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশু জবাই ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি শুদ্ধ আরবি বলতে সক্ষম হয়, তাহলে যথেষ্ট হবে। নামাজের প্রারম্ভ (তথা তাকবীর) প্রসঙ্গে কথা হলো, তা আরবি ভাষায় হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত। (অর্থাৎ আরবি ভাষায় হলে তায়ীম জ্ঞাপক যে কোনো বাক্য যথেষ্ট হবে।) পক্ষান্তরে ফারসি ভাষায় হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সঙ্গে একমত। (অর্থাৎ ফারসি ভাষায় তাকবীরে তাহরীম বৈধ হবে না।) কেননা আরবি ভাষায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ভাষায় নেই। কেরাত প্রসঙ্গে সাহেবাইনের বক্তব্যের দলিল হলো, কুরআন আরবি শব্দ সমষ্টির নাম, যেমন কুরআনের আয়াতে তা বলা হয়েছে। (কেননা কুরআন রয়েছে قُرْآنًا عَرَبِيًّا) তবে অপারগতার সময় শুধু ভাব ও মর্মকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন- (রুকু সিজদা আদায়ে অপারগতার সময়) ইশারাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। (তবে জবাইয়ের সময়) বিসমিল্লাহর বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহর জিকির যে কোনো ভাষায় হতে পারে। (অর্থাৎ সেখানে আল্লাহর জিকিরই হলো মূল উদ্দেশ্য। শব্দ বা ভাষা মুখ্য নয়।) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী- وَإِنَّهُ لَفِي زُرِّ الْأَوَّلِينَ নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে



বিদ্যমান ছিল। আর সেখানে তা এ ভাষায় অবশ্যই ছিল না। এ কারণেই অপারগতার সময় অন্য ভাষায় জায়েজ রয়েছে। ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহগার হবে। আর আমাদের পেশকৃত আয়াতের আলোকে ফারসি ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষায়ও জায়েজ হবে। এটাই বিতর্কিত মত। কেননা ভাষার ভিন্নতর কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না। (উপরোক্ত) মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। নামাজ ফারসি না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। বর্ণিত আছে যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব উক্ত ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তা-ই নির্ভরযোগ্য। (কেননা ইমাম সাহেবের প্রথম বক্তব্য দৃশ্যত কিতাবুল্লাহর সাথে বিরোধপূর্ণ, কেননা কুরআন নিজেকে الْقُرْآنُ الْعَرَبِيُّ আখ্যায়িত করেছে।) খুতবা ও তাশাহুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর আযানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে। (অর্থাৎ আযানের ভাষারূপে যা প্রচলিত এবং মানুষের কাছে আযান রূপে যা পরিচিত, সেটাই হবে আযানের ভাষা। সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভীষণ গুনাহ হবে।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফারসি ভাষায় নামাজ আরম্ভ করা, নামাজের মাঝখানে ফারসিতে কেরাত পড়া, জবাই করার সময় ফারসি ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা যেমন— بسمِ خدائے بزرگ বলা। ইমাম আযম (র.)-এর মতে জায়েজ। চাই সে শুদ্ধভাবে আরবি বলতে পারুক বা না পারুক। সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি সে আরবি বলতে সক্ষম হয় তাহলে ফারসি দ্বারা জায়েজ হবে না। তবে জবাই করার সময় ফারসি ভাষা এমনকি প্রত্যেক ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা জায়েজ আছে। আর যদি সে আরবির উপর সক্ষম না হয় তবে সবকিছু জায়েজ।

**তাকবীরে তাহরীমা প্রশ্ন :** তাকবীরে তাহরীমা আদায়ের ক্ষেত্রে আরবি ভাষা হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফার (র.) সঙ্গে একমত। অর্থাৎ যেমনিভাবে ইমাম সাহেবের মতে প্রত্যেক ঐ শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ যা আদ্বাহ তা'আলার বড়ত্ব বুঝায়, এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও ঐ সকল শব্দ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ। আর ফারসি ভাষা হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সঙ্গে একমত। অর্থাৎ আরবি ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা বলা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও নাজায়েজ। মোট কথা, আরবির উপর সমর্থ থাকা অবস্থায় অন্য ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা বলা সাহেবাইনের মতে নাজায়েজ। এর দলিল হলো, আরবি ভাষায় এমন বিশেষত্ব রয়েছে যা অন্য কোনো ভাষায় নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী— تَفْخِيزُ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى سَائِرِ الْأَلْسِنَةِ أَنَا عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَرَبِيٌّ আরবি ভাষায় ফজিলত সকল ভাষার উপর রয়েছে। কেননা আমি আরবি, কুরআন আরবি এবং জান্নাতীদের ভাষাও আরবি।

ভিন্ন ভাষায় কেরাত সম্পর্কে সাহেবাইনের দলিল হলো, নামাজের মধ্যে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো কুরআনের কেরাত। আর কুরআন এমন আরবি শব্দসমষ্টির নাম যা অর্থকে বুঝায়, মাসহাফে লিখিত এবং আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। আদ্বাহর বাণী قُرْآنًا عَرَبِيًّا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে عِوَج মোট কথা হলো مامور হ'লো কুরআনের কেরাত, আর তা হলো আরবি। এ জন্য আরবি ভাষায় কেরাত পড়া ফরজ হবে। এর তাক্বাযা তো হলো, অপারগতার সময়ও আরবি তরক করা যাবে না। তবে অপারগতার সময় অর্থকে এ কারণে যথেষ্ট বলা হয়েছে যে, যাতে তাক্বাযা তার জন্য ইশারা করে রুকু সিজদা করা জায়েজ। হুবহু রুকু সিজদা জরুরি নয়। তবে জবাইয়ের সময় বিস্মিল্লাহ বলার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ জবাইয়ের সময় ফারসি ভাষায় বিস্মিল্লাহ বলা জায়েজ। যদিও সে আরবির উপর সমর্থ হয়। কেননা বিস্মিল্লাহ বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদ্বাহর জিকির করা। আদ্বাহর বাণী— وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ— আর আদ্বাহর জিকির সব ভাষা দ্বারাই হতে পারে। চাই সে আরবির উপর সমর্থ হোক বা না হোক।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আদ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **وَلَمْ يَلْفِ زَيْرُ الْأَرَيْنِ** নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, সে এ কুরআন অবশ্যই ছিল না। বুঝা গেল, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তার মর্ম বিদ্যমান ছিল। এতে প্রতীয়মান হলো কুরআন মর্মের নাম, অর্থের নাম নয়। তা ছাড়া কুরআন ফারসিতে অনুবাদ করে পড়া জায়েজ। কেননা তাতে তার মর্ম বিদ্যমান। অধিকন্তু কিরাআতে কুরআনও পাওয়া গেছে। আর যেহেতু কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আরবি শব্দের সাথে ছিল না। এ জন্য আরবি ভাষায় সক্ষম না হলে ফারসি ভাষায় কেয়াত করা জায়েজ। কিন্তু ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধচারণের কারণে সে সুনাহগার হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, পারস্যের লোকেরা হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাছে চিঠি লিখল, যাতে তিনি ফারসি ভাষায় সূরায় ফাতিহা লিখে তাদের জন্য পাঠান। হযরত সালমান ফারসী (রা.) ফারসি ভাষায় সূরায় ফাতিহা লিখে তাদের জন্য পাঠালেন। তারা তা নামাজে পাঠ করতো। এক পর্যায়ে তারা আরবি ভাষায় শিখে নেয়। এদিকে হযরত সালমান ফারসি (রা.) তা শিখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোনো বিরোধিতা করেননি। এর দ্বারাও বুঝা গেল নামাজের মধ্যে ফারসি ভাষায় কেয়াত পড়া জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যেমনিভাবে নামাজের ভিতরে কেয়াত পড়া জায়েজ এমনিভাবে ফারসি ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও জায়েজ। আর এ-ই হলো বিতর্ক মত। আবু সাঈদ বলেন, ইমাম সাহেব শুধু ফারসি ভাষায় কেয়াত পড়াকে জায়েজ বলেছেন ফারসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার অনুমতি তিনি দেননি। এর কারণ হলো আরবি ভাষার সাথে ফারসি ভাষার নৈকট্যতা অধিক। এ কারণে ফারসি ভাষায় কেয়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য ভাষায় যেহেতু এ ধরনের নৈকট্যতা নেই তাই তা দ্বারা কেয়াতও জায়েজ নেই।

বিতর্ক মতের প্রথম দলিল হলো, আয়াতে কারীমা **وَلَمْ يَلْفِ زَيْرُ الْأَرَيْنِ** কেননা কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবে যেমনিভাবে আরবি ভাষায় ছিল না এমনিভাবে ফারসি ভাষায়ও ছিল না। দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআনকে যখন অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা হয় তখন দৃষ্টি থাকে মর্মের উপর। তা ছাড়া ভাষার ভিন্নতার কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না। যেমন তুর্কী হিন্দী ইত্যাদি সব ভাষায়ই জায়েজ।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের মধ্যকার অনারবি ভাষায় কেয়াত জায়েজ নাজায়েজ হওয়ার যে মতবিরোধ তা এ সম্পর্কে যে, অনারবি ভাষায় কেয়াত গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তাদের মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। এমনকি ইমাম সাহেবের মতে যদি অনারবি ভাষায় কেয়াত পড়া হয় তবে কেয়াতের ফরজ আদায় হয়ে যাবে, আর সাহেবাইনের মতে আদায় হবে না। নামাজ ফাসাদ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। অর্থাৎ যদি অনারবি ভাষায় কেয়াত পড়া হয়, তবে সকলের মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। আব্বাস ইবনুল হুমাম (র.) লিখেন যে, নাজমুদ্দীন নাসাফী ও কাযী খান লিখেছেন যে, সাহেবাইনের মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আবু বকর রাযী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব সাহেবাইনের মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন অর্থাৎ ইমাম সাহেব (র.)ও সর্বশেষ এ মত পেশ করেছেন যে, নামাজের ভিতর অন্য ভাষায় কেয়াত পড়া জায়েজ নেই। আর তা-ই হলো নির্ভরযোগ্য।

খুতবা ও তাশাহুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে অন্য ভাষায় জায়েজ। সাহেবাইনের মতে জায়েজ নেই। আর আজানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে। মাযসূত গ্রন্থে ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারসি ভাষায় আজান দিলে যদি লোকেরা বুঝে যে, এটা আযান তবে জায়েজ আর যদি লোকেরা আজান সম্পর্কে অবহিতই না হয়, তবে জায়েজ নেই। কেননা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহবান করা। লোকেরা না বুঝলে এ উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

وَأَنْفَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهِمْ أَغْفِرْ لِي لَا تَجُوزُ لَنِّي مَشْرُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا وَإِنْ افْتَتَحَ يَقُولُهُ اللَّهُمَّ فَقَدْ قَبِلَ يُجْزِيهِ لَنْ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ وَقَدْ قَبِلَ يُجْزِيهِ لَنْ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ أَمَّا بَخِيرٌ فَكَانَ سَوَالًا قَالَ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى عَلَى الْيَسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِنَ السُّنَنِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ (رحا) فِي الْأَرْسَالِ وَعَلَى الشَّافِعِيِّ (رحا) فِي الْوَضْعِ عَلَى الصُّدْرِ وَلَنْ الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ثُمَّ الْإِعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ يَوْسُفَ (رحا) حَتَّى لَا يُرْسِلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ وَالْأَصْلُ إِنْ كَانَ قِيَامٌ فِيهِ ذَكَرَ مَسْنُونٌ يَعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا هُوَ الصَّحِيحُ فَيَعْتَمِدُ فِي حَالَةِ الْقُنُوتِ وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ وَيَبْنِ تَكْمِيلَاتِ الْأَعْيَادِ -

অনুবাদ : যদি اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي বলে নামাজ আরম্ভ করে, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের মিশ্রণ রয়েছে। সুতরাং তা খালিস তাযীম থাকেনি। আর যদি শুধু اللَّهُم্ম বলে আরম্ভ করে তাহলে কারো কারো মতে তা জায়েজ হবে। কেননা-এর অর্থ হলো يَا اللَّهُ তবে অন্য এক মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা এর অর্থ হলো, يَا اللَّهُ أَمَّا بَخِيرٌ (হে আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন) সুতরাং এটা প্রার্থনা হলো। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, সে তার নাজীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন নাজীর নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন সন্নতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে হাত ছেড়ে রাখার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল এবং হাত বুকের উপর রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। তা ছাড়া হাত নাজীর নিচে রাখা তাযীম প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা-ই হলো উদ্দেশ্য। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে হাত বাধা হচ্ছে কিয়ামের সন্নত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় তা ছেড়ে রাখবে না। (কথিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা কেরাতের সন্নত। সুতরাং কেরাত শুরু করার সময় হাত বাঁধবে।) মূলনীতি, যে কিয়ামের মধ্যে কোনো জিকির সন্নত রয়েছে তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে, অন্যথায় নয়। এটা ই বিতর্ক অভিমত। সুতরাং কুনুতের অবস্থায় এবং জানাযার নামাজ হাত বেঁধে রাখবে। পক্ষান্তরে রুকুতের পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং ঈদের তাকবীর সমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي বলে নামাজ আরম্ভ করে তা জায়েজ হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের মিশ্রণ রয়েছে। তা ছাড়া যেহেতু এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব বুঝায় না তাই এর দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। এমনভাবে ঐ সকল শব্দ দ্বারাও জায়েজ হবে না যা খালিছ তাযীম বুঝায় না; বরং কোনো কোনো ভাবে প্রার্থনাকে বুঝায়। যেমন- اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ - اِنَّا لِلّٰهِ - اِنَّا اِلَيْهِ - اِنَّا لِلّٰهِ - اِنَّا اِلَيْهِ এবং بِسْمِ اللَّهِ (এগুলো দ্বারাও জায়েজ হবে না) আর যদি শুধু اللَّهُম্ম দ্বারা নামাজ শুরু করে তবে এতে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে জায়েজ, কেননা اللَّهُম্ম -এর অর্থ হলো يَا اللَّهُ যা শুধুই আল্লাহর জিকির। এতে স্বার্থের কোনো মিশ্রণ নেই। এ মতটি হলো বসরাবাসীদের। আর কারো কারো মতে اللَّهُম্ম দ্বারা নামাজ শুরু করা জায়েজ হবে না। কেননা এর অর্থ হলো يَا اللَّهُ أَمَّا بَخِيرٌ হে আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন। এর দ্বারা নাকিস তাযীম বুঝা যায় না। তাই এর দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা জায়েজ হবে না। এ মতটি হলো ক্ফাবাসীদের।

চতুর্থ মাসআলা : নামাজি ব্যক্তি কখন হাত বাঁধবে? এ সম্পর্কে শায়খাইনের মায়হাব হলো, হাত বাঁধা কিয়ামের সূন্নত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কেরাতের সূন্নত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় শায়খাইনের মতে হাত বাঁধা সূন্নত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছানার সময় হাত ছাড়া থাকবে। আর কেরাতের সময় হাত বেঁধে নিবে। হিদায়া গ্রন্থকার হাত বাঁধা ও ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ঐ কিয়াম, হাকীকী বা হুকমী হোক যার মধ্যে যিকরে মাসনুন রয়েছে, তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে। আর যে কিয়াম এ ধরনের নয় তাতে হাত বেঁধে রাখা সূন্নত নয়। এই হলো বিতুদ্ধ মত। এর উপরই শামসুল আইহা আসসারাত্বী, সাদরুল কাবীর বুরহানুল আইহা এবং সাদরুশশাহীদ হুসাইনুল আইহা ফাতওয়া দিয়েছেন। উপরোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে কুনুত অবশ্যই এবং নামাজে জানোয়াত হাত বেঁধে রাখা সূন্নত হবে এবং কাওয়া (রুকু ও সিজদার মাঝে) এবং ঈদের তাকবীর সমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখা সূন্নত হবে।

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ (رح) أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهِ قَوْلَهُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَىٰ آخِرِهِ لِرَوَايَةِ عَلِيِّ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَهَا رَوَايَةُ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَلَى التَّهَجُّدِ وَقَوْلُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ لَمْ يُذَكَّرْ فِي الْمَشَاهِيرِ فَلَبَّائِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْأَوَّلَىٰ أَنْ لَبَّائِي بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِيَتَّصِلَ النَّبِيُّ بِهِ هُوَ الصَّحْبُوعُ وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالْأَوَّلَىٰ أَنْ يَقُولَ اسْتَعِينُ بِاللَّهِ لِيُؤَافِقَ الْقُرْآنَ وَيَقْرُبَ مِنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ التَّعَوُّدُ تَبَعٌ لِقِرَاءَةِ دُونَ الثَّنَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) لِمَا تَلَوْنَا حَتَّىٰ بَأْتَىٰ بِهِ الْمَسْبُوقُ دُونَ الْمُقْتَدِي وَيُؤَخَّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ خِلَافًا لِأَبِي يُونُسَ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا نَقَلَ فِي الْمَشَاهِيرِ -

অনুবাদ : তারপর সُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত ছানা পড়বে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর সাথে إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ থেকে শেষ পর্যন্ত দোয়াটি যোগ করবে। কেননা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তা করতেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন নামাজ আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। এর অতিরিক্ত কিছু পাঠ করতেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মশহুর হাদীসগুলোতে جَلَّ ثَنَاءُكَ বাক্যটি নেই। সুতরাং ফরজ নামাজে তা বলবে না। তাকবীরের পূর্বে إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ বলবে না, যাতে নিয়ত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। এটাই বিস্তৃত অভিমত। আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে) এর অর্থ হলো যখন তুমি কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে। বিলাই বলাই হলো উত্তম, যাতে কুরআনের শব্দের সাথে মিল হয়। أَعُوذُ بِاللَّهِ শব্দটি ও এর কাছাকাছি যা হোক। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে تعوذ হচ্ছে- কেরাতের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে নয়। আমাদের পেশকৃত আয়াত এর দলিল। তাই মাসবুক تعوذ বলবে, কিন্তু মুক্তাদী বলবে না এবং ঈদের নামাজের তাকবীর সমূহের পরে বলবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এবং بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়বে। মশহুর হাদীস গুলোতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কদুরী (র) বলেন, নামাজি ব্যক্তি হাত বাঁধার পর হানা পড়বে। আর হানা হলো، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ কোনো কোনো গায়রে মাশহুর রিওয়াযাতের মধ্যে تَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ কোনো কোনো গায়রে মাশহুর রিওয়াযাতের মধ্যে নেই, এ জন্য স্বরজ নামাজে এটা বলবে না। এখন হানার সাথে অন্য কোনো দোয়া মিলানো হবে কিনা? এ ব্যাপারে তারফাইনের মাযহাব ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত হলো হানার সাথে অন্য কোনো দোয়া মিলানো হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর আরেকটি মত হলো মুসলী হাশির সাথে এ দোয়াটিও মিলাবে

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِذْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَمَعْبَايَ وَمَعَانِيَ لِلرَّبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

কোনো কোনো বর্ণনায় **مِنَ الْمُسْلِمِينَ**-এর পর এ শব্দগুলোও বর্ণিত রয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِیْ فَاعْفِرْ لِیْ ذُنُوبِیْ جَمِیْعًا لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِیْ اِلْخَسْنَ الْاَخْلَاقَ لَا یَهْدِیْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّیْ سَیِّئَهَا لَا یَصْرِفْ عَنِّیْ سَیِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبِیکَ وَسَعْدُکَ وَالْخَیْرُ کُلُّهُ فِیْ یَدِیْكَ وَالشَّرُّ لَیْسَ اِلَیْكَ اَتَاکَ وَاِلَیْكَ تَبَارَکْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَیْكَ -

ফুকাহাগণের পরিভাষায় এ দোয়ার নাম হলো **دعائے توبه** ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল, হযরত আলী (রা.)-এর আছর যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছানার সাথে এ দোয়াও পড়তেন।

তরফাইন (র.)-এর দলিল, হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَى آخِرِهِ .

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আনাস (রা.) এর অতিরিক্ত আর কিছু বলেননি। সুতরাং বুঝা গেল ছানার পর **ترجہ** তথা **انی وجہ الخ** পড়ার বর্ণনা সারিত নেই। গ্রন্থকার আরো বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ **ﷺ** নফল নামাজে তা পড়তেন, ফরজে ছালা ব্যতীত অন্য কোনো দোয়া পড়তেন। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, উত্তম হলো নিয়তের পর এবং তাকবীরের পূর্বে **انی وجہ الخ** পড়বে না। তাহলে নিয়ত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে, এটাই বিতর্ক অমিত। কোনো কোনো মুতায়্যখ্বিরীন, তাদের মধ্য থেকে ফকীহ আবুল লাইসও বলেছেন, নিয়ত ও তাকবীরের মধ্যে বারতী সময় তা পড়া জায়েজ।

تعوذ بِسْمِ اللّٰهِ : উপরোক্ত ইবারতে চারটি আলোচনা করা হয়েছে। (১) নামাজের প্রারম্ভে تعوذ بِسْمِ اللّٰهِ পড়ার শর'য়ী দৃষ্টিকোণ কি? (২) تعوذ -এর স্থান (৩) تعوذ -এর শব্দাবলি এবং (৪) بِسْمِ اللّٰهِ সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আমাদের মতে নামাজের শুরুতে تعوذ সন্নত। (ফাতহুল কাদীর) শরহে নিকায়। গ্রন্থকার লিখেছেন عامة السلف দেব মতে تعوذ মোস্তাহাব। و এই-ই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নামাজের শুরুতে تعوذ পড়বে না।

সুফিয়ানে সাওরী এবং আতা (র.)-এর মতে نَعُوذُ পড়া ওয়াজিব। তাদের দলিল হলো, আব্রাহাম তা'আলা ইরশাদ করেছেন إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (উক আয়াতে استعذ শব্দটি امر -এর صيغة যা ওজ্বকে চায়। এ দলিলের জবাবে আমরা বলি যে, وجوب -এর বক্তব্যটি ইজমা-এর বিরোধী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থ আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, তাস্মিয়া সন্থকে কয়েক ধরনের আলোচনা রয়েছে। যেমন- (১) সূর্যায় নামল-এর আয়াত الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَرَآءَهُ بِسْمِ اللّٰهِ নামল-এর আয়াতটির সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের এবং সূর্যায় নামল উভয়টির جزء তথা অংশ বিশেষ। কিন্তু দুই সূরার মাঝখানে যে بِسْمِ اللّٰهِ আছে তা কুরআনের جزء কি না? এ সম্পর্কে মতাবিরোধ রয়েছে। আমাদের ওলামায় আহনাফের মতে কুরআনের جزء ইমাম মালিক (র.)-এর মতে جزء না। (২) আমাদের মতে بِسْمِ اللّٰهِ সূর্যায় ফাতিহাও جزء না এবং অন্য কোনো সূরারও না; বরং সূরার মাঝে ব্যবধানকারী হিসাবে নাজিল হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে সূর্যায় ফাতিহার جزء তবে অন্য সূরার جزء হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দু'টো মত। (৩) بِسْمِ اللّٰهِ জোরে পড়া হবে না আস্তে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে।

وَيَسِّرُ بِهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَرَعَ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا التَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ وَأَمِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَهَرَ فِي صَلَاتِهِ بِالتَّسْمِيَةِ قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيصِ لِأَنَّ أَنَسًا (رض) أَخْبَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا ثُمَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ كَالْتَّعَوُّذِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا اخْتِطَاطًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي صَلَوةِ الْمَخَافَةِ .

অনুবাদ : (আউযুল্লাহ ও বিস্মিল্লাহ) দু'টোই অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন- চারটি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে। তন্মধ্যে তিনি আউযুল্লাহ বিস্মিল্লাহ ও আমীন উল্লেখ করেছেন। (ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা মতে চতুর্থটি হলো রাব্বানা লাকাল হাম্দ) ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়ার সময় বিস্মিল্লাহ ও উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর নামাজে বিস্মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। এর জবাবে আমরা বলি যে, তা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ছিল, কেননা হযরত আনাস (রা.) অবহিত করেছেন যে, মহানবী ﷺ বিস্মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, تعوذ -এর ন্যায় বিস্মিল্লাহ প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে বলবে না, (বরং শুধু নামাজের শুরুতে বলবে) তবে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, সতর্কতামূলক প্রত্যেক রাকআতে বিস্মিল্লাহ পড়বে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতও তাই। সূরা ও ফাতিহার মাঝে বিস্মিল্লাহ পাঠ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নীরব কেরাত বিশিষ্ট নামাজে তা পড়বে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, تعوذ ও تسبیح নিম্নস্বরে পড়বে। তাঁর দলিল হলো, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস- রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়তেন। যেমন- সহীহ ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান এবং নাসাঈ শরীফে নু'আইম মুজামির (রা.) সূত্রে বর্ণিত الْقُرْآنَ ثُمَّ قَرَأَ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى رَأً. اَيُّ هَرِيرَةٍ قَرَأَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي تَغْيِي بِسْمِ اللَّهِ إِنَّ لَا شَبَهَكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَلْعَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ أَمِينَ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي تَغْيِي بِسْمِ اللَّهِ إِنَّ لَا شَبَهَكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ নু'আইম মুজামির (রা.) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি (প্রথমে) আবু হুরায়রা (রা.) বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন। তারপর উম্মুল কুরআন তথা সূরায় ফাতিহা পড়লেন এমনকি وَالضَّالِّينَ পর্যন্ত পৌঁছে আমিন বললেন। অতঃপর সালামের পর বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আমি নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। উক্ত হাদীস ঘারা বুঝা যায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বিস্মিল্লাহ, সূরায় ফাতিহা এবং আমীন সবগুলো উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যদি উচ্চৈঃস্বরে না পড়তেন তবে নু'আইম মুজামির কিভাবে জানলেন? আর যেহেতু হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমার নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, এতে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এগুলো উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। আদ্রামা দারু কুত্বনী সাঈদ ইবনে যুবারের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আবু عَاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে بِسْمِ اللَّهِ উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। আমাদের দলিল ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, চারটি বাক্য এমন, যা ইমাম নীরবে পড়বে। ঐ চারটি বাক্য হলো, তা'আউয, তাসমিয়া, তাহমীদ এবং আমীন।



শরহে নিকায় গ্রন্থকার তাহমীদ-এর পরিবর্তে ছানার কথা বলেছেন। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) كتاب الآثار -এ লিখেছেন: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَرَبَعٌ يَخْفِيَنَّ الْأَمْرَ الْقَعْدَرُ وَيَسْمَعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ আমাদের দ্বিতীয় দলিল হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস- صَلَبَتْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمَّ أَسْمَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এবং আবু বকর, ওমর এবং ওসমান (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি. (কিতু) তাদের কাউকেও الله بِسْمِ الله উচ্চের পড়তে শুনি।

ইমাম শাক্ষি (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো লোকদেরকে শিক্ষা দানের জন্য بِسْمِ الله -কে উচ্চের পড়তেন। না হয় সাধারণভাবে তিনি بِسْمِ الله নীরবে পড়তেন। যেমন- হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজে بِسْمِ الله আস্তে আস্তে পড়তেন উচ্চের পড়তেন না। দ্বিতীয় জবাব হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসুলুল্লাহ ﷺ উচ্চের পড়তেন। কিন্তু তَا دَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ঘাৱা মানস্ব হয়ে যায়। শরহে নিকায় গ্রন্থকার মোল্লা আলী কারী (র.) নসখ হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে বয়ান করেছেন- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْضُرُونَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا قُرِئَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ يَذْكُرُ رَحْمَنَ الْيَمَامَةِ يَعْنُونَ مَسِيلَةَ الْكَذَّابِ فَأَمَرَ أَنْ يَخَافَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَزَلَتْ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا . (ابن داود)

সাইদ ইবনে যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার মুশরিকরা মসজিদে হারামে উপস্থিত থাকতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কেৱাত পড়তেন, তখন তারা বলতেন এই মুহাম্মদ! ইয়ামার রহমান অর্থাৎ মুসায়লামা কাযাবের আলোচনা করতছে। সুতরাং তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -কে নীরবে পড়তে এবং তখন لَا تَجْهَرُ আয়াত অবতীর্ণ হয়। উক্ত ঘটনা ঘাৱা বুঝা যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে بِسْمِ الله এবং কুরআনের কেৱাত উচ্চের পড়তেন; কিন্তু এরপর তা মানস্ব হয়ে যায়। আবু দাউদ শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে فَخَفِضَ النَّبِيُّ ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -কে নিচু আওয়াজে পড়তেন। এ রিওয়াযাতটিও উচ্চের পড়া যে منسوخ হয়ে গেছে, তার ওপর দালালাত করে। আত্মা ইবনুল হুমাম (র.) ন'আইম মুজামিরের রিওয়াযাতের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, হতে পারে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আস্তে পড়া সত্ত্বেও ন'আইম মুজামির শুনে গেছে। কেননা মুক্তাদী যদি ইমামের একবারে সন্নিহিত হয় আর ইমাম যদি ইখফার মধ্যে মুবালাগা না করে, তখন ইমামের আওয়াজ শুনাও যায়।

এখন بِسْمِ الله প্রত্যেক রাকআতে সূর্যয়ে ফাতিহার পূর্বে পড়বে না শুধু প্রথম রাকআতে পড়বে? এ ব্যাপারে ইমাম আযম (রা.)-এর দু'টো রিওয়াযাত রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদের রিওয়াযাত হলো বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকআতে পড়বে না; বরং নামাজের শুরুতে মাত্র একবার পড়াই যথেষ্ট। যেমন تَعَزُّوْهُ শুধু প্রথম রাকআতে পড়াই যথেষ্ট। দলিল হলো, বিসমিল্লাহ সূর্যয়ে ফাতিহার جزء বা অংশ নয়; বরং নামাজ শুরু করার জন্য পড়া হয়। আর صلوٰۃ واحدة -এর অনুরূপ। তাই بِسْمِ الله একবার পড়াই যথেষ্ট। সুতরাং صلوٰۃ واحدة -এর জন্যও একবার পড়াই যথেষ্ট হবে। ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর দ্বিতীয় রিওয়াযাত ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেন, আর তা হলো, প্রত্যেক রাকআতে بِسْمِ الله পড়বে। আর এরই মধ্যে সতর্কতা। কেননা بِسْمِ الله সূর্যয়ে ফাতিহার جزء হওয়ার ক্ষেত্রে ওলামাণের মতবিরোধ রয়েছে। সূর্যয়ে ফাতিহা প্রত্যেক রাকআতে পড়া জরুরি। তাই بِسْمِ الله ও প্রত্যেক রাকআতে পড়া জরুরি হবে, তাহলে মতবিরোধ থেকে বাঁচা যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক রাকআতে বিসমিল্লাহ পড়া সাহেবাইন (রা.)-এর মত। গ্রন্থকার আরো বলেন, সূর্যয়ে ফাতিহা ও অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সিররী নামাজে সূর্যয়ে ফাতিহা এবং অন্য সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়বে তবে জাহরী নামাজে পড়বে না।



(র.) বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়া রুকন। ইমাম মালিক (রা.) বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং অন্য কোনো সূরা মিলানো উভয়টি রুকন। তাঁর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- **فَاتِيحَةُ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ مَعَهَا** -এর বাণী- **أَرْثَاهُ فَاتِيحَةُ** ও অন্য কোনো সূরা মিলানো ছাড়া নামাজ হবে না। উল্লেখ্য যে, নামাজ হবে না এটাতো ফরজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়। একই ধরনের হাদীস ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

**يُفْتَحُ الصَّلَاةُ الطَّهَرُ وَتَعْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .**

অর্থঃ নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা অর্জন, তাহরীম হলো তাকবীর, তাহলীল হলো তাসলীম, আর যে ব্যক্তি ফরজ বা অন্য কোনো নামাজে আলহামদুলিল্লাহ এবং অন্য কোনো সূরা না পড়ে তার নামাজ হবে না। - (তিরমিযী)

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- **فَاتِيحَةُ الْكِتَابِ** ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত নামাজ হবে না। আমাদের দলিল হলো আব্দাহ তা'আলার বাণী **مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** উক্ত আয়াতে **مَنْ قَارَأَهُ** শব্দটি সূতরাং **مَنْ قَارَأَهُ** -এর ভিত্তিতে যা আদান পরিমাণের কুরআন সাদিক আছে তা পড়াই ফরজ হবে। কেননা এ পরিমাণই মামুুববী বা আদিত। আর যেহেতু নামাজের বাহিরে কুরআন পড়া ফরজ নয় তাই নামাজের ভিতরে কুরআন পড়াই নির্ধারিত হয়ে গেল। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, তাদের পেশকৃত রিওয়াযাতগুলো **خبر واحد** আর **خبر واحد** টা **طعن** হয়। **اصول** -এর কায়দা আছে যে, **রুকন** **دليل قطعي** দ্বারা সাব্যস্ত হয়, **دليل ظني** দ্বারা নয়। তবে **دليل ظني** দ্বারা আমল ওয়াজিব হয়। এ জন্য আমাদের ওলামাগণ বলেন, উভয়টি ওয়াজিব। আর যেহেতু **خبر واحد** দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়, তাই এ সকল হাদীস দ্বারা **له كتاب الله** তথা **فَاتَرَوُا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** -এর সাথে অতিরিক্ত বিষয়ও যোগ করা যাবে না।

**وَالصَّالِّينَ** বলবে তখন ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে আমীন বলবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে ইমাম আমীন বলবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো এই হাদীস- **إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَالصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ** ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন-

**إِنِّي جَعَلْتُ الْإِمَامَ لِيُؤْتِمَ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذَا قَالَ وَالصَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ .**

অর্থঃ ইমাম তো এ কারণে বানানো হয়েছে যে, তার ইকতিদা করা হবে। সুতরাং তোমরা তার সাথে মতবিরোধ করো না। সে যখন তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলা, সে যখন (কেরাত) পড়ে তোমরা চুপ থাকো। সে যখন **وَالصَّالِّينَ** বলে তোমরা আমীন বলা। ইমাম মালিক (র.) উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বটন করেছেন, তাই ইমামের অংশ হলো কিরাআত পূর্ণ করা আর মুক্তাদীর অংশ হলো আমীন বলা। আর যেহেতু তাকবীর শিরকাত-এর মুনাফী তাই আমীন বলার সময় ইমাম মুক্তাদী শরিক থাকবে না; বরং শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে।

**إِذَا آمَنَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاظَنَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ السَّلَاحَةِ غُفِرَ لَهُ مَا** আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- **يُخْبِرُ** যখন ইমাম আমীন বলে তোমরাও আমীন বলা। কেননা যার আমীন ফেরেশতের আমীনের মুতাবিক হয়ে যায় তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইমাম মালিক (র.) পেশকৃত হাদীসের জবাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ **هَذَا** এ হাদীসের শেষে বলেছেন **بِقَوْلِهَا** ইমামও আমীন বধে। বুঝা গেল এ হাদীসের মধ্যে কর্ম বটন করা হয়নি।

আমাদের মাহযাবের সমর্থন এ হাদীসে দ্বারাও হয় যা হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَقْبُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ رَأَى تَأْمِينَ تَأْمِينَ الصَّلَاةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه عبد الرزاق في مصنفه)

ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়ত এমন আছে যে, ইমাম আমীন বলবে না শুধু মুক্তাদী আমীন বলবে। দলিল হলো, ইমাম হলো داعی আর মুক্তাদী হলো سامع আর আমীন সাধারণত سامع বলে থাকে داعী নয়। যেমন- নামাজ ব্যতীত অন্যান্য দোয়ার ক্ষেত্রে। রাসূলুলাহ ﷺ বাণী-إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَيُّتُوا-এর মধ্যে ইমামকে আমীন-এর ফায়েল এ কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি (ইমাম) সুরায়ে ফাতিহা পড়ে আমীন-এর সবব পয়দা করে দিয়েছে। আর مسبب-কে مباشر-এর নামে স্বরণ করা জায়েজ। যেমন-بنی الامير المدينة-এর মধ্যে بناء-এর নিসবত আমীরের দিকে مسبب হওয়ার কারণে করা হয়।

ফায়দা : প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, هزم শব্দটির امين কে কেউ কেউ ممدود পড়েছেন, আবার কেউ কেউ مقصورও পড়েছেন। ممدود পড়ার সুরতে তো امين-ই থাকবে। مقصور পড়ার সুরতে তো امين থাকবে। তবে উভয় অবস্থায়-ই فعيل-এর وزن এ-হবে। তবে মদود হওয়ার সুরতে টা اشباع-এর জন্যে হবে। মদود হওয়ার সুরতে মাজনু-এর নিম্নোক্ত شعر দলিল হিসাবে পেশ করা হয়। وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ। উক্ত শের-এ امين-এর মদود ব্যবহৃত হয়েছে। শেষের الف টিও اشباع-এর জন্য হয়েছে। উক্ত شعر-এর প্রেক্ষাপট হলো, যখন মাজনু লাইলীর প্রেমে বিভোর, লাইলীর প্রেমে আসক্ত হয়ে সে দিক-বিদিক ছুটে চলতে লাগল তখন মাজনুর পিতা খুব পেরেশান হয়ে গেল। লোকেরা তাকে পরামর্শ দিল যে তাকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে নিয়ে যান। যেমন কথা তেমন কাজ। মাজনুর পিতা মাজনুকে নিয়ে হজের ইরাদায় মক্কায় নিয়ে গেল। মানাসেকে হজ তাকে দেখাল এবং মাজনুকে বলল কা'বার গিলাফ জড়িয়ে ধরে বেলো, اللَّهُمَّ ارْحِنِي مِنْ لَيْلِي, হে আল্লাহ আমা হতে লাইলীর মহব্বত সরিয়ে নিন আমাকে আরাম দিন। মাজনু আরো পাগলপাড়া হয়ে উপরোক্ত شعر-এর পরিবর্তে বলতে লাগল- اللَّهُمَّ مِّنْ عَلَيَّ لَيْلِي وَوَقْرِيهَا হে আল্লাহ আমাকে লাইলীর নৈকট্য দান করে আমার উপর ইহসান করো। মাজনুর বাবা একথা শুনেই তাকে প্রহার করতে লাগল। আর বলল, আমি তোমাকে লাইলীর প্রেম দূরীকরণের কথা বলছি আর তুমি প্রেম হাসিলের দোয়া করতেছ। তখন মাজনু নিম্নোক্ত شعر বলতে লাগল

يَا رَبِّ لَا تَسْلِبْنِي حُبَّهَا أَبَدًا \* وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ -

হে আমার রব! আমার থেকে তার মহব্বতকে কখনো দূর করবেন না।

আর আমার এ দোয়ার উপর যে আমীন বলবে তার উপর রহম করুন। এ-তো ছিল মদ-এর দোয়ার দলিল। আর এর সাথে قصر-এর الف টি মদ-এর মধ্যে উক্ত شعر-এর মদ-এর ফাৎহাল নামক এক ব্যক্তির কাছে উট চাইল। কিন্তু সে তাকে উট দেয়নি। তখন কবি নিম্নোক্ত شعر বলে,

تَبَاعَدَ عَيْنِي فَطَحَلْتُ دَعْوَتَهُ \* آمِينَ فَرَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا وَبَعْدًا -

ফাৎহাল আমার থেকে দূরে সরে গেছে যখন আমি আমার প্রয়োজনের জন্য তাকে ডেকে ছিলাম আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যকার দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিন। এখানে امين শব্দটি প্রথমে এবং দোয়া পরে এসেছে। অথচ বাস্তব তরতীব অনুযায়ী দোয়া আগে ও امين পরে আসার কথা ছিল। এর কারণ হলো কবির নিকট দোয়া কবুল হওয়ার ইহতিতাম অধিক, তাই হওয়ার কারণে امين-কে আগে আনা হয়েছে।

قَالَ وَيَخْفُونَهَا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْرُودٍ (رض) وَلَا تَدْعَاءَ فَيَكُونُ  
مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْهَانِ وَالتَّشْدِيدُ فِيهِ خَطَأٌ فَاجْتَنِبْ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুক্তাদীরা তা (আমীন) অনুচ্চৈঃশ্বরে পড়বে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসে এরূপ আছে। তা ছাড়া এটা দোয়া বিশেষ। সুতরাং গোপন করার উপরই ভিত্তি হবে (আমীন) শব্দটিতে দীর্ঘ الف ও হ্রস্ব আলিফ দু'টো উচ্চারণই রয়েছে। শব্দে (মীমের) উপর তাশদীদ প্রয়োগ মারাত্মক ভুল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে ইমাম মুক্তাদী সবার জন্য আমীন অনুচ্চৈঃশ্বরে পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) উচ্চৈঃশ্বরে পড়ার প্রবক্তা। عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلَا الصَّالِينَ قَالَ - তাঁর দলিল হলো, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلَا الصَّالِينَ قَالَ - বলতেন, وَلَا الصَّالِينَ যখন ১১: যখন ১২: বলতেন, তখন আমীন বলতেন এবং উচ্চৈঃশ্বরে বলতেন। আমাদের দলিল ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস যা উপরে বর্ণিত হয়েছে- অন্য রিওয়ায়াতে আছে قَالَ أَرَبَعٌ يَخْفِيْنَهُنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَيَسْمِي اللّٰهُ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَمِيْن - এরও উল্লেখ রয়েছে। এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল আমীন অনুচ্চৈঃশ্বরে পড়বে। দ্বিতীয় দলিল হলো আমিন শব্দটি استجب-এর অর্থে আসে, যা দোয়া বিশেষ। আর দোয়া গোপনই হয়ে থাকে। কেননা আব্দুল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَخَفِيَةً وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً এ কারণে আমীন অনুচ্চৈঃশ্বরে বলা মাসনূন হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদীসের জবাব হলো, আলকামা ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে وَخَفِيَةً بِهَا صَوْتَهُ -এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং রিওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় ওয়াইল ইবনে হুজরের উভয় রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস যা আমাদের দলিল তা গ্রহণযোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, -এর الف -এর মধ্যে مد এবং قصر উভয় ভাবেই পড়া জায়েজ। যার আলোচনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আমিন-এর মীমকে تشدید দিয়ে পড়া মারাত্মক ভুল। কারো কারো মতে এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো ফকীহদের মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ ধরনের নজীর কুরআনে বিদ্যমান। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ।

قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَرَكَعَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَبِيرٍ مَعَ الْإِنْحِطَاطِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفِضٍ وَرَفِعٍ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ لِيَكُونَ إِسْتِفْهَامًا وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ وَيَقْتَضِي بِبَيْدِيهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفْرِجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَسِي (رض) إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ وَلَا يَنْدُبُ إِلَى التَّفْرِيجِ إِلَّا هَذِهِ الْحَالَةُ لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْآخِذِ وَلَا إِلَى الصِّمِّ إِلَّا فِي حَالَةِ السُّجُودِ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يُتْرَكُ عَلَى الْعَادَةِ وَيَسْطُ ظَهْرُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يَنْكِسُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يَصْرِبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُهُ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا ذَلِكَ أَذْنَاهُ أَيْ أَذْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তারপর তাকবীর বলবে ও রুকু করবে। الجامع الصغير গ্রন্থে রয়েছে যে, নত হওয়ার সঙ্গে তাকবীর বলবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজে প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন। তাকবীরকে খাটোভাবে উচ্চারণ করবে। কেননা তাকবীরের প্রথম্যাংশে লম্বা করা দীনের দৃষ্টিতে ভুল। কেননা তা প্রশ্নোৎসাহক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শেষ্যাংশে লম্বা করা ভাষাগত দিক থেকে ভুল। উভয় হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করবে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বলেছেন, যখন তুমি রুকু করবে তখন তোমার দু' হাত হাঁটুতে রাখবে এবং তোমার আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক করবে। এ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় আঙ্গুল ফাঁক রাখা মোস্তাহাব নয়, যেন শক্ত করে ধরা হয়। তদ্রূপ সিঁজদার অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা মোস্তাহাব নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে। আর পিঠকে সমতলভাবে রাখবে। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন। এবং নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুকাবেও না। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন। এবং নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুকাবেও না। কেননা মহানবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তিনি মাথা উপরের দিকে উঠাতেন না এবং ঝুকিয়েও রাখতেন না। আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্ব নিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তার রুকুতে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলে। আর এটা হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। অর্থাৎ বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

রুকু অবস্থায় তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্বনিম্ন পরিমাণ। না হয় পাঁচবার, সাতবার বা তার চেয়ে অধিকও পড়া জায়েজ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহর **وَإِذَا رَكَعَ أَدَّكُمْ فَلْيَقُلْ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** বাণী—তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তার রুকুতে তিনবার **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** বলে। আর তিনবার বলা হলো বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمِرُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَقُولُهَا إِلَّا إِمَامٌ عِنْدَ ابْنِ حَنْبَلَةَ (رح) وَقَالَ يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ وَلَا تَهْ حَرَضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ وَلَا ابْنَ حَنْبَلَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ هَذِهِ قِسْمَةٌ وَإِنَّهَا تُنَافِي الشِّرْكََةَ وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمِرُ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَلَا تَه يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي وَهُوَ خِلَافٌ مَوْضُوعُ الْإِمَامَةِ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ يُرَوَى الْإِكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ وَيُرَوَى بِالتَّحْمِيدِ وَالْإِمَامُ بِالذَّلَالَةِ عَلَيْهِ أَتَى بِهِ مَعْنَى -

অনুবাদ : তারপর মাথা তুলবে এবং বলবে। আর মুক্তাদী **لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا** বলবে। ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে ইমাম তা বলবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম তা মনে মনে বলবেন। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী ﷺ উভয় জিকিরকে একত্র করতেন। তা ছাড়া ইমাম অন্যকে (তা বলতে) উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনি নিজে তা ভুলতে পারেন না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- **لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا** ইমাম যখন **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলেন তখন তোমরা **لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا** বলা। এ হলো বটনি, যা শরিকির পরিপন্থী। এ জন্যই তো আমাদের মতে মুক্তাদী **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলবে না। অবশ্য ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমতে পোষণ করেন। তা ছাড়া ইমামের তাহমীদ মুক্তাদীর তাহমীদের পরে হয়ে যাবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী। আর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিতর্ক মতে মুনফারিদ উভয়টিকে একত্রিত করবে। যদিও শুধু **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলা এবং অপর রিওয়াযাতে **لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا** বলায় কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম মুক্তাদীকে তাহমীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা পালন করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বাক্যটির অর্থ **قِيلَ اللَّهُ حَمْدُ مَنْ حَمِدَهُ** যে ব্যক্তি আল্লাহর হামদ করে আল্লাহও তার হামদ কবুল করেন। মোট কথা, এ বাক্যটি হলো কবুলিয়তে হামদের দোয়া। আর **سَمِعَ** শব্দটি কখনো কখনো **قِيلَ** এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- কোনো হাকিম যদি কারো দরখাস্ত কবুল করে তখন বলা হয় **سَمِعَ الْأَمِيرُ كَلَامَ فُلَانٍ**। **حَمِدَهُ** এর শব্দটি **سَمِعَ** এর জন্য না **كُنِيَ** এর জন্য। এ সম্পর্কে দু'টো মতামত পাওয়া যায়। তবে **سَمِعَ** এর জন্য এ বক্তব্যটি মজবুত বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত।

মাসআলাটির সার সংক্ষেপ হলো, ইতমিনানের সাথে রুকু করার পর মাথা উঠানো অবস্থায় **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا** বলবে। যদি ইমাম হয় তবে সর্বশ্রুতিক্রমে তা বলবে এবং উল্লেখ্যের বলবে। আর যদি মুক্তাদী হয় তাহলে **لَكَ الْحَمْدُ**



ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** এ সম্পর্কে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ইমাম তা বলে না। আর সাহাবাইন (র.) বলেন ইমাম তা বলে এবং আস্তে বলে। সাহাবাইন (র.)-এর দলিল হলো হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস -

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ جِئْنَ بِقَوْمٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ جِئْنَ بِرُكْعَةٍ ثُمَّ يَقُولُ سَبِّحْ لِحَمْدِهِ جِئْنَ رَفَعَ صَوْنَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ جِئْنَ بِهَوِي سَاجِدًا -

দ্বিতীয় দলীল হলো, যদি ইমাম **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলে তাহলে তার এই তাহ্মীদ মুক্তাদীর তাহ্মীদের পরে বলতে হবে। কেননা মুক্তাদী **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** তখন বলবে, যখন ইমাম **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলে। সুতরাং অবস্থায় ইমামকে অবশ্যই মুক্তাদীর পর তাহ্মীদ বলতে হবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী। কেননা ইমামের প্রথমে বলা উচিত আর মুক্তাদীর পরে বলা উচিত। অথচ এখানে তাকে উল্টো হচ্ছে। সাহেবাইন (র.)-এর পেশকৃত যহরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হচ্ছে, এ হাদীস মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিতুদ্ধতম ও মতে মুনফারিদ তাসমী ও তাহ্মীদ উভয়টিকে একত্র করবে। এ ছাড়া আরো দু'টো রিওয়ায়ত রয়েছে যে, একে, **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** ও **رَبَّنَا** হাদীস, দু'টি **وَهُ** **رَبَّنَا** **لَكَ** **الْحَمْدُ** বলবে। প্রথমটির কারণ হলো ইমাম **وَهُ** **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলে আর মুনফারিদও তো নিজের ব্যাপারে ইমাম। কেননা ইমামের উপর যেমনিভাবে কেরাত ওয়াজিব, এমনিভাবে মুনফারিদ-এর উপরও কেরাত ওয়াজিব। দ্বিতীয়টির কারণ হলো, মুনফারিদ যদি তাসমী ও তাহ্মীদ উভয়টিকে একত্র করে তখন তাহ্মীদ ইতিদাল তথা কাওমা অবস্থায় বলতে হবে অথচ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ইতিদাল অবস্থায় কোনো মাসনুন জিকির নেই। যেমন- দু' সিদ্ধদার দ্বিতীয় সময় কোনো মাসনুন জিকির নেই। এ জন্য বলা হয়েছে মুনফারিদ তাসমী বলবে না; বাহ্যে ও শুধু তাহ্মীদ বলবে। দ্বিতীয় রিওয়ায়তের সমর্থন ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর এ বক্তব্য দ্বারাও হয়। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোনো কী ব্যক্তি ফরজ নামাজে ক্বুফু থাকে মাথা উঠার সময় **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** বলতে পারে? তিনি বলেন, **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** বলবে এবং চুপ থাকবে। এমনিভাবে দু' সিদ্ধদার মাঝেও চুপ থাকবে। বিতুদ্ধতম মতের দলিল হলো সহীহ হাদীস দ্বারা যে, রাসুলুল্লাহ **ﷺ** ছানা জিকির তথা তাসমী ও তাহ্মীদকে একত্র করতেন।

সাহেবাইন (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব হচ্ছে, যখন মুজাদী **سَمِعَ الدُّلَيْمَنَ حَيْدَ** বলেছেন, তখন তিনি মুজাদীদেবকে **رَبَّنَا لَكَ الْحُكْمُ** বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং **كَفَاعِلِهِ** অনুযায়ী যেমন ইমামও পরোক্ষভাবে তা বলেছেন, এ জন্য ইমাম **تَمَرُّونَ النَّاسَ بِالْحَيِّ وَتَسْتَرْشِدُونَ أَنْفُسَكُمْ**-এর ভয়বহতার অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

قَالَ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ أَمَّا التَّكْبِيرُ وَالسُّجُودُ فَلِمَا بَيْنَنَا وَأَمَّا  
الِاسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرَضٍ وَكَذَا الْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطَّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ  
وَالسُّجُودِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رح) يَفْتَرِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ  
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رح) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ قَالَهُ لِأَعْرَابِيٍّ  
حِينَ أَخَفَّ الصَّلَاةَ وَلَهُمَا أَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الْإِنْجِنَاءُ وَالسُّجُودُ هُوَ الْإِنْخِفَاضُ لِفَعْلٍ فَيَتَعَلَّقُ  
الرُّكْنِيَّةُ بِالْأَذْنَى فِيهِمَا وَكَذَا فِي الْإِنْتِقَالِ إِذَا هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَفِي آخِرِهَا رُويَ  
تَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ صَلَاةً حَيْثُ قَالَ وَمَا نَقَضَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَضَتْ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ  
الْقَوْمَةُ وَالْجَلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا وَكَذَا الطَّمَانِينَةُ فِي تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِيِّ (رح) وَفِي  
تَخْرِيجِ الْكَرْخِيِّ (رح) وَاجِبَةٌ حَتَّى تَجِبَ سَجْدَتَا السُّهُورِ يَتَرَكُهَا عَنْدهُ –

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলেবে এবং সিজদায় যাবে। তাকবীর ও সিজদার কারণ তা যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবশ্য ফরজ নয়। তদ্রূপ দুই সিজদার মাঝে বসা এবং রুকু ও সিজদায়ে সুস্থির হওয়াও ফরজ নয়। এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এগুলো সবই ফরজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও এই মত। কেননা দ্রুততার সাথে নামাজ আদায়কারী জনৈক বেদুইন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন — দাঁড়াও এবং (পুনঃ) নামাজ আদায় করো, কেননা তুমি নামাজ আদায় করানি। (বুঝা গেল যে, যাবতীয় রুকন ধীরস্থিরতার সাথে আদায় না করলে নামাজ জায়েজ হবে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের আলোকে ধীরস্থিরতা একটি ফরজ বলে প্রমাণিত হলো।) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রুকু, -এর আভিধানিক অর্থ— মাথা ঝুঁকানো এবং সজদ -এর আভিধানিক অর্থ—মাথা পূর্ণ অবনত করা। সুতরাং রুকু ও সিজদার সর্বনিম্ন পরিমাণের সাথে রুকনের সম্পর্ক হবে। তদ্রূপ (রুকু থেকে সিজদায় বা সিজদা থেকে সিজদায়) গমনের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন পরিমাণ বিবেচ্য হবে। কেননা তা উদ্দেশ্য নয়। (রুকু ও সিজদা হলো উদ্দেশ্য। সিজদায় গমনকালে যে অঙ্গ সঞ্চালন, সেটা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ঐ পরিমাণ অঙ্গ স্থাননির্ভর হতে হবে, যা দ্বারা রুকু সিজদা থেকে এবং এক সিজদা অন্য সিজদা থেকে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।) আর বর্ণিত হাদীসের শেষার্শ্বে বেদুইন সাহাবীদের আমলকে নামাজ (সালাত) আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন وَمَا نَقَضَتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَضَتْ مِنْ صَلَاتِكَ তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে, মূলত তুমি তোমার নামাজ থেকে সেই পরিমাণ ক্ষতি করলে। (অর্থাৎ “সুস্থিরতা” বর্জন করা যদি নামাজ নষ্টের কারণ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে নামাজ আখ্যায়িত করতেন না।) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তারপর কাওয়া ও জালসা সুন্নত। তদ্রূপ ইমাম (আবু আবদুল্লাহ) জুরজানী (র.)-এর তাখরীজ (মাসআলা বিশ্লেষণ) মুতাবিক ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাও সুন্নত। আর ইমাম কারখী (র.)-এর তাখরীজ মুতাবিক তা ওয়াজিব। সুতরাং তাঁর মতে ধীরস্থিরতা বর্জন করলে সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : নামাজি ব্যক্তি যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলে সিজদায় চলে যাবে। দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে وَرَنِعَ وَكَبَّرَ عِنْدَ كُلِّ خَفِضٍ وَرَنِعَ আর সিজদার ব্যাপারে দলিল প্রথমে অধ্যায়ে আদ্বাহর বাণী— وَكَبَّرُوا وَاسْجُدُوا দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাকে কাওয়া বলে, দু' সিজদার মাঝে বসা এবং রুকু ও সিজদার সুস্থির হওয়া তরফাইন (র.)-এর মতে ফরজ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তা'দীলে আরকান ফরজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)ও একই মত পোষণ করেন। উক্ত মতবিরোধের ফলাফল হলো, তা'দীলে আরকান ব্যতীত তরফাইন (র.)-এর মতে নামাজ জায়েজ হবে কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। তাঁর দলিল, এক আ'রাবীর হাদীস, আ'রাবীর নাম হলো খাদ্দাদ ইবনে রাফে। বুখারী মুসলিমে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنْ أَرَبِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعُ فَوَلَّى فَتَلَّ فَرَأَتْهُ لَمْ تَصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ فَتَلَّ فَرَأَتْهُ لَمْ تَصَلِّ فَتَلَّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَ غَيْرَهُ تَعْلِمُنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ أَرِّقْ مَا تَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْأَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْأَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا حَتَّى تَقْبُضَهَا -

এক আ'রাবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ আদায় করল। তারপর এবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও পুনঃ নামাজ পড়ো কেননা তুমি নামাজ পড়নি। তারপরে তিনি নামাজ পড়লেন। তারপরে সে ফিরে গিয়ে পুনরায় পূর্বের ন্যায় নামাজ পড়ল এবং এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিল। রাসুলুল্লাহ আবাবারো তাকে বললেন, যাও পুনরায় নামাজ পড়ো কেননা তুমি নামাজ পড়নি। আ'রাবী তৃতীয়বার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলল এ সত্তার পশত যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। এটা ব্যতীত অন্য আর কোন সূরত উত্তম আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলে, তারপর সাহজুরে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করো, তারপর ইতমিনানে রুকু করো। এরপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, তারপর ইতমিনানে সিজদা করো। তারপর সিজদা থেকে ইতমিনানে বসে যাও। তারপর এমনটি পুরো নামাজে করো এমনকি নামাজ শেষ হয়ে যাবে। উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল দেওয়া হয় যে, তা'দীলে আরকান তরক করার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَأَنْتَ لَمْ تَصَلِّ তুমি নামাজ পড়নি, তোমার নামাজ হয়নি। বুঝা গেল তা'দীলে আরকান ফরজ। কেননা ফরজ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এমনটি বলা হয় না। তরফাইন (র.)-এর দলিল আগ্রাহ তা'আলার বাণী-وَأَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا-দলিল হলো এভাবে যে, রুকু বলা হয় মাথা ঝুঁকানোকে আর সিজদা বলা হয় মাথা পূর্ণভাবে অবনত করাকে। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা রুকু ও সিজদা নামাজের অংশ বা রুকন স্যাব্যত হয়েছে। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ দ্বারা রুকু ও সিজদা সম্পন্ন হবে, ততটুকুই রুকন হবে। আর আয়াত দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য। আর যেহেতু এ আয়াত রুকু ও সিজদার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারে খাঙ্। আর যা খাঙ্ হয় তা বয়ানের মুখাপেক্ষী হয় না। এ কারণে আ'রাবীর হাদীসটি এ আয়াতের জন্য বয়ান হতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, হাদীসে আ'রাবী উক্ত আয়াতের জন্য নানিখ আর আয়াতটি মানসূখ? তখন আমরা বলব এটা সম্ভব নয়। কেননা এ হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে মানসূখ করা যায় না। সুতরাং বুঝা গেল মুতলাকান মাথা ঝুঁকানো বা পূর্ণ মাথা নত করাই ফরজ। — (নুসুল আনওয়ার)

وَقَى مَارَوِي দ্বারা হাদীসে আ'রাবীর জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, আ'রাবী ব্যক্তি নামাজের সূরতে যা কিছু করেছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ সেগুলোকে নামাজ নামে অভিহিত করেছেন। তাহিহতো উক্ত হাদীসের শোষণে বর্ণিত হয়েছে وَمَا تَقَصَّتْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَقَدْ تَقَصَّتْ مِنْ صَلَاتِكَ তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে মূলত তোমার নামাজ থেকে সে পরিমাণ ক্ষতি করলে। এখন তা'দীলে আরকানকে তরক করা যদি নামাজ উল্লংঘ্য হতো। তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নামাজকে নামাজ নামে আখ্যায়িত করতেন না। যেমন রুকুও সিজদা তরক করা হলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় অথচ তাকে নামাজ বলা হয় না। বুঝা গেল তা'দীলের তরক দ্বারা নামাজ ক্ষতি হয় কিন্তু নামাজ ফাসিদ হয় না। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের শানতো ফরজের নয়। তাই হাদীসে আ'রাবী দ্বারা তা'দীলে আরকানের ফরযিয়ত সাব্যত হয় না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কাওয়া ও দু' সিজদার মধ্যকার জালাসা তরফাইন (র.)-এর সর্বসম্মতিক্রমে সন্নত। তবে রুকু ও সিজদার ধীরস্থিরতার হুকুম-এর তাখরীজ এর ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জুরজানী (র.)-এর তাখরীজ অনুযায়ী ধীরস্থিরতা সন্নত। ইমাম কারবী (র.)-এর তাখরীজ অনুযায়ী ওয়াজিব। এমনকি ইমাম কারবী (র.)-এর মতে ধীরস্থিরতার তরক দ্বারা সাহ সিজদা ওয়াজিব। আব্দুল্লাহ জুরজানী (র.)-এর বক্তব্যের কারণ হলো, এই সুস্থিরতা তাকমীলে রুকন-এর জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। আর যে জিনিস তাকমীলে রুকন-এর জন্য প্রবর্তন করা হয় তা সন্নত হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধীরস্থিরতাও সন্নত হবে। ইমাম কারবী (র.)-এর বক্তব্যের কারণ হলো, এই ধীরস্থিরতা মূলত হুবহু রুকন, এর জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে আর যা এমন হয় তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং এই ধীরস্থিরতাও ওয়াজিব হবে

وَبَعْتِمُدُّ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ لَأَنَّهُ حَجَرٌ (رض) وَصَفَ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
 فَسَجَدَ وَادَّعَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفْيَيْهِ وَيَدَيْهِ جَذَاءً  
 أَذْنَيْهِ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ كَذَلِكَ قَالَ وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ لَأَنَّهُ  
 النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاطَّابَ عَلَيْهِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  
 (رح) وَقَالَ لَا يَجُوزُ الْإِفْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عَذْرِ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ إِمْرُتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ وَلِأَبْنِ حَنِيفَةَ أَنَّ  
 السُّجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ بَعْضِ الْوَجْهِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا أَنَّ الْخَدَّ وَالذَّقْنَ خَارِجٌ  
 بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَذْكُورُ فِيمَا رَوَى الْوَجْهُ فِي الْمَشْهُورِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ سُنَّةٌ  
 عِنْدَنَا لِيَتَحَقَّقَ السُّجُودُ دُونَهُمَا وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ (رح) أَنَّهُ  
 فَرِيضَةٌ فِي السُّجُودِ -

অনুবাদ : আর উভয় হাত মাটিতে রাখবে। কেননা ওয়াইল ইবনে হজর (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের  
 স্বরূপ দেখাতে গিয়ে সিজদা করেছেন, উভয় হাতের তালুর উপর ভর দিয়েছেন এবং নিতম্ব উঁচু করে রেখেছেন। আর  
 মুখমণ্ডল দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেছেন এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর রেখেছেন। কেননা  
 বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ এরূপ করেছেন। ইমাম কুদরী (র.) বলেন, আর নিজের নাক ও কপালের উপর সিজদা  
 করবে। কেননা মহানবী ﷺ নিয়মিত এরূপ করেছেন। তবে যদি দু'টির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তা  
 ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ওজর ছাড়া শুধু  
 নাকের উপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েজ হবে না। আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত আরেক রিওয়ায়েত।  
 কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَمْرُتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظَمٍ আমাকে সপ্ত প্রত্যঙ্গের উপর সিজদা করার  
 নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কপালকেও তিনি গণ্য করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে— ভূমিতে  
 মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ স্থাপন দ্বারাই সিজদা সম্পন্ন হয়। আর তাই আদিষ্ট বিষয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে গণ্ডদেশ ও  
 চিবুক এর থেকে বহির্ভূত। আর আলোচ্য হাদীসের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় (وجهه-এর স্থলে) وجه মুখমণ্ডল শব্দটি রয়েছে।  
 (সুতরাং কপাল ও নাক উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু মাটিতে স্থাপন করা আমাদের নিকট  
 সুন্নত। কেননা এ দু'টো ছাড়াও সিজদা সম্পন্ন হয়। আর দুই পা মাটিতে রাখা সম্পর্কে ইমাম কুদরী (র.) বলেছেন  
 যে, সিজদায় তা ফরজ। [কেননা সিজদা সম্পন্ন হয় মাটিতে মাথা রাখা এবং মাটি থেকে মাথা তোলার মাধ্যমে। আর  
 পায়ের পাতা মাটিতে রাখা ছাড়া এ কাজ দু'টো পালন করা সম্ভব নয়। আর যা ব্যতিরেকে সহজে ফরজ আদায় করা  
 যায় না, তা ফরজের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং কেউ যদি সিজদায় গিয়ে পা মাটি থেকে আলগা করে রাখে, তাহলে তার  
 সিজদা হবে না। অবশ্য একপা উঠিয়ে রাখলে জায়েজ হবে কিন্তু মাকরুহ হবে। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, ফরজ না  
 হওয়ার ব্যাপারে হাতের তালু ও পায়ের পাতা দু'টোই সমান।—(মাবসূত)]

র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, সি

اِبْنُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَضَعَ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلَّى قَالَ بَيْنَ كَفْيِهِ -

قَالَ وَسَجَدَ عَلَىٰ أَنفِهِ الْ إনায়া গ্রন্থকার বলেন, সিজদার কাইফিয়ত ও সিজদা থেকে দাঁড়ানোর কাইফিয়তের

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- কুরআনে কারীমে মুত্লাকান সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সিজদা মুখমগলের অংশ বিশেষ স্থাপন ঘাৱাই সম্পন্ন হয়ে যায়। কেননা পুরো চেহারা জমিনে রাখা অসম্ভবও বটে। কারণ, নাক এবং কপালের হাড় এমন ভাসমান উথিত যা পুরো চেহারাকে জমিনে রাখার ক্ষেত্রে প্রতি ষড়্ধক। এ কারণে পুরো চেহারা জমিনে রাখা অসম্ভব। তাই চেহারার অংশ বিশেষ জমিনে রাখাটাই আদিত বিষয় বলে পরিগণিত হবে। তবে গওদেশ ও চিবুক সর্বসমভিত্তিক এ হকুমের বহির্ভূত। অবীং আয়াতে মুত্লাক হওয়ার যদিও এগুলো শামিল কিন্তু সর্ববিদিত মতে আয়াত ঘাৱা একসো মুরাদ নয়। কেননা সিজদা ঘাৱা উদ্দেশ্য হসো তাহীম প্রদর্শন করা। আর গওদেশ ও চিবুক জমিনে রাখা ঘাৱা

তাহীম আদায় হয় না। এ জন্য এগুলো সিজদার বহির্ভূত হবে। তবে নাক ও কপাল উভয়টি সিজদার মহল বা স্থান; এ জন্য এগুলোর উপর সিজদা করা জায়েজ। আর যেহেতু কপালের উপর সীমাবদ্ধ করা জায়েজ তাই নাকের উপরও সীমাবদ্ধ করা জায়েজ হবে।

وَاللَّكُورُ نَيْمًا رَوَى উক্ত বাক্যের দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সার হচ্ছে—মশহুর রিওয়াযাতের মধ্যে جبهه-এর স্থানে وجه এসেছে যেমন সুনানে আরবা'আতে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব সূত্রে বর্ণিত—

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدَ سَبْعَةِ أَرْبَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন যে, বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজদা করে। তার চেহারা, তার উভয় হাতের তালু, তার উভয় হাঁটু এবং তার উভয় পা। উক্ত হাদীসে وجه-এর কথা এসেছে। আর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, وجه দ্বারা নাক ও কপাল উভয়টি মুরাদ। এ জন্য আমরা বলেছি সিজদার ক্ষেত্রে নাক ও কপাল উভয়টি বরাবর। হিদায়া প্রণেতা বলেন, আমাদের মতে হাত ও হাঁটু জমিনের উপর রাখা সুন্নত। ইমাম যুফার, ইমাম শাফি'ঈ এবং ফকীহ আবুল্লাইস (র.) বলেন ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস—أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ الْوَجْهَ دَلِيلُ এভাবে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার امر (নির্দেশ) দেওয়া হয়েছে। আর امر-কে চায়। বুঝা গেল যে, সাত অঙ্গ জমিনের উপর রাখা ওয়াজিব। আর এ সাত অঙ্গের মধ্যে হাত এবং উভয় হাঁটুও রয়েছে। এর কারণে উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হলো উভয় হাত ও উভয় হাঁটু জমিনের উপর রাখা ছাড়াও সিজদা করা সম্ভব। এ জন্য এগুলো জমিনের উপর রাখা সিজদার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর হাদীসের জবাব হচ্ছে—এ হাদীস শুধু এ কথা বুঝায় যে, এ সাত অঙ্গ সিজদার মহল বা স্থান। কিন্তু এগুলো যে জমিনের উপর রাখা জরুরি এর উপর কোনো দলিল নেই। বাকি হাদীসে যে امرت শব্দটি এসেছে তার জবাব হচ্ছে—امر যেমনিভাবে وجوب-এর জন্যে আসে তেমনিভাবে نَدْب-এর জন্যেও আসে। এখানে امر-এর জন্য আসেনি। সিজদায় উভয় পা জমিনের উপর রাখার ক্ষেত্রে ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, সিজদায় উভয় পা জমিনে রাখা ফরজ। সুতরাং সিজদার সময় পা জমিন থেকে আলাদা হলে নামাজ জায়েজ হবে না। ইমাম কারখী ও আবু বকর জাস্সাস (র.)ও এ মতই পোষণ করেন। আর যদি এক পা জমিনের মধ্যে এবং অপর পা জমিন থেকে আলাদা হয় তা জায়েজ। ফকীহ কাযীখানের মতে কারাহাতের সাথে জায়েজ। ইমাম তামারতানী বলেন, عدم فرضيت-এর ক্ষেত্রে উভয় হাত এবং উভয় পা বরাবর।

فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلٍ ثَوْبِهِ جَازٍ لَّانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ  
يَسْجُدُ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ وَيُرَوِّى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي  
يَفْضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَيَرْدَهَا وَيَبْدِي ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبْدِي ضَبْعَيْكَ وَيُرَوِّى  
وَأَبْدِي مِنَ الْإِنْدَادِ وَهُوَ الْمَدُّ وَالْأَوَّلُ مِنَ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ وَيَجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ  
لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى أَنْ بُهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ  
لَمَرَّتْ وَقِيلَ إِذَا كَانَ فِي صَفٍّ لَا يُجَافِي كَيْلًا يُؤْذَى جَارَهُ وَيُوجِّهَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ  
الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ فَلْيُوجِّهْ مِنْ  
أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ -

অনুবাদ : আর যদি পাগড়ীর প্যাচের উপর বা বাড়তি কাপড়ের উপর সিজ্দা করে তবে তা জায়েজ হবে। কেননা মহানবী ﷺ তাঁর পাগড়ীর প্যাচের উপর সিজ্দা করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ এক কাপড়ে নামাজ আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভূমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেন এবং নিজের উভয় বাহু খোলা রাখবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন- তুমি তোমার উভয় বাহু খোলা রাখবে। কোনো কোনো বর্ণনায় ید (এর স্থলে) ید রয়েছে। এটা یدাদ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ- প্রসারিত করা। আর প্রথমটি یداء থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ- প্রকাশ করা এবং তার পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। কেননা মহানবী ﷺ সিজ্দা করার সময় এতটা পৃথক রাখতেন যে, বকরির ছোট বাচ্চা ইচ্ছা করলে তাঁর নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, কাতারে নামাজ আদায়ের সময় বাহু বেশি ছড়িয়ে রাখবে না, যাতে পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়। আর পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মুমিন যখন সিজ্দা করে তখন তার প্রতিটি অঙ্গ সিজ্দা করে। সুতরাং সে যেন তার অঙ্গগুলোকে যতদূর সম্ভব কিবলামুখী করে রাখে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : আমাদের মতে পাগড়ীর প্যাচ বা বাড়তি কাপড়ের উপর সিজ্দা করা জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পাগড়ীর প্যাচের উপর সিজ্দা করা জায়েজ নেই। কেননা তাঁর মতে সিজ্দার সময় কপাল খোলা রাখা ওয়াজিব। আমাদের দলিল হচ্ছে- ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ তার পাগড়ীর প্যাচের উপর সিজ্দা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ -

তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর পাগড়ীর প্যাচের উপর সিজ্দা করতেন। দ্বিতীয় দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي يَفْضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَيَرْدَهَا -

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড়ে নামাজ আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভূমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

অন্য এক রিওয়ায়েত হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে—

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَدِ الْخَيْرِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِيعْ أَحَدًا أَنْ يُمْكِنَ رُجْلَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ  
فَسَجَدَ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রচণ্ড গরমে নামাজ পড়তাম। যখন জমিনের উপর চেহারা রাখা অসম্ভব হতো তখন কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করতাম।

وَيُبَيِّنُ ضَعْفَهُ لِقَوْلِهِ النَّبِيِّ : سِجْدًا كَرَامًا أَوْ بَدَلًا : সিজদা করা অবস্থায় নামাজি ব্যক্তি তার বাহু খোলা রাখবে। হিংস্র প্রাণীর ন্যায় জমিনের উপর বিছিয়ে দিবে না। দলিল হলো নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত—

عَنْ أَدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ قَالَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَآتَا أَصْلَى لَا تَجَافَى عَنِ الْأَرْضِ يَذْرَأَعَى فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبْسُطْ  
بَسَطَ السَّيِّعُ وَادْعِمَ عَلَى رَأْسِكَ وَإِيْدَ ضَعْفِكَ فَلَئِنْ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَصْرٍ مِنْكَ

আদাম ইবনে আলী আল বকরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমাকে ইবনে ওমর এ অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছেন যে, আমি জমিন থেকে হাত উপরে উঠাচ্ছিলাম না। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! হিংস্র প্রাণীর ন্যায় জমিনে হাত বিছিয়ে দিয়ো না এবং নিজের হাতের তালুর উপর ভর করবে এবং নিজের বাহুকে খোলা রাখবে। কেননা যখন তুমি এমনটি করবে তখন তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদায় রত হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, অন্য একটি রিওয়ায়াতে (তশদীদ)-এর সাথে এসেছে। إِبْدَاءُ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো— প্রসারিত করা। অর্থাৎ নিজের বাহুকে প্রসারিত করে রাখবে। আর প্রথমটি إِبْدَاءُ থেকে নির্গত যার অর্থ হলো— প্রকাশ করা অর্থাৎ নিজের বাহুকে প্রকাশ করে রাখা খুলে রাখা।

وَرَجَائِي بَطْنَهُ অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি সিজদার সময় নিজের পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। দলিল হচ্ছে— রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন পেটকে উরু থেকে পৃথক রাখতেন। কনুইগুলো জমিনে থেকে আলাদা রাখতেন এমনকি যদি বকরির ছোট বাচ্চা তাঁর নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইতো অতিক্রম করতে পারতো।

ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, কাতারে নামাজ আদায়ের সময় বাহু বেশি প্রসারিত করে রাখবে না, যেন পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়।



وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوُتْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوُتْرِ وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهِ يَحِلُّ الْقَوْمُ حَتَّى لَا يَبْزُدَ إِلَى التَّنْفِيرِ ثُمَّ تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَنَةً لِأَنَّ النَّصَّ تَنَابُلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاتِهِمَا فَلَا يَزَادُ عَلَى النَّصِّ وَالْمَرَأَةُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا وَتَلْزُقُ بَطْنَهَا بِفَخْذَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا -

অনুবাদ : আর সিজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলবে। আর এ হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আর তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলে। আর এটি হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। রুকু ও সিজদার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করাসহ তিনবারের অধিক বলা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বেজোড় সংখ্যায় শেষ করতেন। আর কেউ যদি ইমাম হয় তাহলে সংখ্যা এত বৃদ্ধি করবে না যা মুসল্লীগণের ক্রান্তির কারণ হয় এবং অবশেষে (জাম'আতের প্রতি) তা বিরক্তি সৃষ্টি করে। রুকু ও সিজদায় তাসবীহ পাঠ করা সুন্নত। কেননা আয়াতে উভয়টি তাসবীহ ব্যতিরেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না। আর ত্রীলোক নিচু ও জড়সড় হয়ে সিজদা করবে এবং তার পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটি তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, সিজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলবে। আর তিনবার বলা হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ। তাই ওলামায়ে কেরাম লিখেন, এ তাসবীহ তরক করা বা এর থেকে কম করা মাকরুহ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا আর তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার সিজদায় তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলে। রুকু ও সিজদায় তিনবারের অধিক বলা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হলো বেজোড় হতে হবে। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলোকে বেজোড় সংখ্যার শেষ করতেন। তা ছাড়া হাদীসে মশহুর الْوُتْرُ يُجِبُّ الْوُتْرَ দ্বারাও দলিল দেওয়া হয়েছে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন তিনের অধিক না বলে, যা মুসল্লীগণের ক্রান্তির কারণ হয় এবং জামাআতের প্রতি তাদের বিরক্তি সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলো সুন্নত। কেননা আয়াতে কারীমায় وَأَسْجُدُوا আর রুকু ও সিজদার কথা তাসবীহ ব্যতিরেকেই এসেছে। কাজেই এতে বুঝা গেল যে, রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলো ফরজ নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ফরজ না হওয়ার দ্বারা এ কথা কিভাবে বুঝে আসে যে, সুন্নত হবে? বরং এখানে তো ওয়াজিব দেখা যাচ্ছে- (১) কেননা রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পাঠ করেছেন। যা ওয়াজিব হওয়ার দলিল (২) রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন أَجْعَلُهَا আর সিজদার তাসবীহের ব্যাপারে বলেছেন لَا يَنْفِلُ যা أَمْرٌ-এর সীগাহ। আর رُجُوبٌ-কে চায়। সুতরাং রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলোকে ওয়াজিব বলা উচিত। এর জবাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বেদুদীন সাহাবীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এ তাসবীহগুলোর কথা বলেননি। এতে বুঝা গেল যে, রুকু ও সিজদার তাসবীহের নির্দেশ ওয়াজিব হিসাবে ছিল না; বরং ইস্তিহাব হিসাবে ছিল।

وَالْمَرَأَةُ تَنْخَفِضُ উক্ত ইবারতের মধ্যে মহিলাদের সিজদার তরীকা বয়ান করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, মহিলা নিচু হয়ে সিজদা করবে। অর্থাৎ একেবারে জমিনের নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। দলিল হলো, এ ধরনের সেজদা করা তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সতরই হলো মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

قَالَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَكْبِرُ لِمَا رَوَيْنَا فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ فِي حَبِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ثُمَّ أَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا  
وَكَبَّرَ وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) وَمُحَمَّدٍ (رحا) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَتَكَلَّمُوا فِي  
مَقْدَارِ الرَّفْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَعْدُ سَاجِدًا وَإِنْ كَانَ إِلَى  
الْجُلُوسِ أَقْرَبَ جَازَ لِأَنَّهُ يَعْدُ جَالِسًا فَتَحَقَّقِ الثَّانِيَةَ -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর সে তার মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস; যখন সৃষ্টির হয়ে বসবে তখন তাকবীর বলবে ও সিজদায় যাবে। কেননা বেদুঈন সাহাবীকে (নামাজ শিক্ষাদান) সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসবে। যদি সোজা হয়ে না বসে তাকবীর বলে আরো এক সিজদায় চলে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। মাথা তোলার পরিমাণ সম্পর্কে মাশায়িখগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে বিত্বক্ৰমত হলো, যদি সে সিজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা এটাকে (পূর্ববর্তী) সিজদায় রয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয় তাহলে জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় তাকে উববিত গণ্য করা হবে। তাতে দ্বিতীয় সিজদা হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবরতে দ্বিতীয় সিজদার তরীকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। দলিল হলো এ রিওয়ায়াত যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তথা **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْبِرُ** তারপর যখন স্থির হয়ে বসবে তখন তাকবীর বলবে এবং দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। বেদুঈন সাহাবীকে নামাজ শিক্ষাদানের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন- **ثُمَّ أَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا** তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসে যাবে। আর যদি নামাজি ব্যক্তি প্রথম সিজদা থেকে সোজা হয়ে না বসে এবং তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা করে, তবে তরফাইন (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। পূর্বেই আমরা তাদীলে আরকানের আলোচনায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি। গ্রন্থকার বলেন মাশায়িখগণের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। দ্বিতীয় সিজদা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রথম সিজদা থেকে কতটুকু পরিমাণ মাথা তোলা জরুরি? কোনো কোনো ফকীহ বলেন, যখন কপাল দ্বিতীয় সিজদা থেকে সরে যায় এবং পুনরায় সিজদায় চলে যায় তখন উভয় সিজদা আদায় হয়ে যাবে। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) বলেন, যখন সে জমিন থেকে মাথা এতটুকু পরিমাণ উঠায় যে, সেখান দিয়ে বাতাস চলাচল করবে পারে এ অবস্থায় উভয় সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এ বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যের কাছাকাছি। মুহাম্মদ ইবনে সালামা (র.) বলেন, যদি সে এতটুকু পরিমাণ মাথা তোলে যে, দর্শক দেখলে বুঝে যে সে দ্বিতীয় সিজদার জন্য মাথা তুলেছে তবে তার উভয় সিজদা আদায় হয়ে যাবে। নতুবা এক সিজদা আদায় হবে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে পরিমাণ মাথা তোলা দ্বারা **رَفَعَ** শব্দটি ব্যবহার করা যায় সে পরিমাণ মাথা তোলা গ্রহণযোগ্য। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিত্বক্ৰমত মত হলো, যদি সে সিজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা জায়েজ হবে না। কেননা এ অবস্থায় সে প্রথম সিজদাতেই রয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয় তাহলে দ্বিতীয় সিজদা জায়েজ হবে। কেননা তাকে উপবিত বলে গণ্য করা হবে। তাই দ্বিতীয় সিজদা হয়ে যাবে।

প্রত্যেক রাকআতে এক রুকু এবং দুই সিজদা কেন? এ ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামাদের অভিমত হলো, এটা **تَرْبِيعِي** তথা খোদা প্রদত্ত জিনিস যেখানে আকলের কোনো স্থান নেই। আবার কেউ কেউ এই দর্শন বলেছেন যে, দু' সিজদা শয়তানকে অপদস্ত করার জন্য। কেননা আদম সৃষ্টির পর আদ্বাহ শয়তানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু সে আদমকে সিজদা করেনি। এ জন্য আমরা শয়তানকে লাঞ্চিত করার জন্য দু' সিজদা আদায় করি। যেমন- সিজদায়ে সাহর কেউ রাবুল্লাহ এদিকে ইশারা করছেন **لِلشَّيْطَانِ** সিজদায়ে সাহব শয়তানকে হেয় করার জন্য। কেউ কেউ বলেন, প্রথম সিজদা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় সিজদা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের পুনরায় মাটিতেই ফিরে যেতে হবে। আদ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ .

قَالَ فَإِذَا أَطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ  
وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَتَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحم) يَجْلِسُ جَلْسَةً خَفِيفَةً  
ثُمَّ يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَنَا حَدِيثُ أَبِي  
هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ وَمَا  
رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِهِ الْكَبِيرِ وَلَإِنْ هَذِهِ قَعْدَةٌ اسْتِرَاحَةٌ وَالصَّلَاةُ مَا وَضَعَتْ لَهَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদরী (র.) বলেন, যখন সিজদায় গিয়ে সুস্থির হবে তখন তাকবীর বলবে। এর দলিল আমরা পূর্বে বলে এসেছি। আর উভয় পায়ে অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বসবে না এবং উভয় হাত দ্বারা জমিনের উপর ভরও দিবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। কেননা মহানবী ﷺ এরূপ করেছেন। আমাদের দলিল হলো হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, মহানবী ﷺ নামাজে তাঁর উভয় পায়ে সমুখ ভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বার্বকোর অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া এটি হল বিশ্রাম বৈঠক, আর নামাজ তো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, যখন সিজদায় গিয়ে স্থির হবে তখন দাঁড়াবার জন্য তাকবীর বলবে। দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ خَفِيزٍ وَرَفْعٍ। ইনায়্যা গ্রন্থকার বলেন, গ্রন্থকারের নিজস্ব অভ্যাস অনুযায়ী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের দিকে ইশারা করার জন্য مَا رَوَيْنَا বলা উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবত পূর্বের মাসআলায় ঐ হাদীসের দিকে ইশারা করার জন্য رَوَيْنَا বলেছিলেন। এখন এখানে ঐ رَوَيْنَا-এর দিকে ذَكَرْنَاهُ ঘারা ইশারা করলেন। ইমাম কুদরী (র.) বলেন, দ্বিতীয় সিজদা থেকে ফারিগ হওয়ার পর উভয় পায়ে অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা দাড়িয়ে যাবে। বসবে না এবং উভয় হাত দ্বারা জমিনের উপর ভরও দিবে না। ওজর না হলে এটাই মোস্তাহাব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর জমিনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। তাঁর দলিল মালিক ইবনে হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীস كَانَ إِذَا رَفَعَ الرَّفْعَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ الرَّفْعَ هَادِيَةً رَأْسَهُ رَاسُلُهَا (সা.) যখন সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন সামান্য বসতেন তারপর إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ قَدَمَيْهِ।-এর হাদীস। وَنَهَضُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُذُورِ أَعْدَائِهِمْ (রা.) এবং رَاسُلُهَا-এর সাহাবীগণ নামাজের মধ্যে তাদের পায়ে অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হচ্ছে- হাদীসটি বার্বকোর অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বার্বকোর সময় তিনি এমনটি করেছেন।

আমাদের আকসী দলিল হচ্ছে- এ বৈঠকটি হলো বিশ্রামের বৈঠক। আর নামাজতো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি। এ জন্য এ বৈঠক করবে না।

وَيَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَكَرَّرَ الْأَرْكَانُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي الرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِيَ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةِ الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَذَكَرَ الْأَرْبَعُ فِي الْحِجِّ وَالَّذِي يُرَوَّى مِنَ الرَّفْعِ مُحْمُولٌ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ كَذَا نَقَلَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) -

অনুবাদ : প্রথম রাকাতাতে যা করেছে, দ্বিতীয় রাকাতাতে তাই করবে। কেননা দ্বিতীয় রাকাতাতে হচ্ছে রুকনসমূহের পুনরাবৃত্তি। তবে ছানা পড়বে না এবং আউযুবিল্লাহ পড়বে না। কেননা উভয়টি একবারই পাঠ করা শরিয়তে প্রমাণিত। প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনো হাত উঠাবে না। রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হচ্ছে— মহানবী ﷺ বলেছেন, সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তাকবীরে তাহরীমা, কুনূতের তাকবীর ও ঈদের তাকবীরসমূহ। বাকি চারটির কথা হজ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম রাকাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর নামাজি ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাত শুরু করবে। আর দ্বিতীয় রাকাততে তা-ই করবে যা প্রথম রাকাততে করা হয়েছিল। দলিল হলো, দ্বিতীয় রাকাত হলে রুকনসমূহের পুনরাবৃত্তি। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় রাকাততে প্রথম রাকাততের ন্যায়ই কাজগুলো করবে। তবে পার্থক্য হলো এতটুকু যে দ্বিতীয় রাকাততে ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে না। কেননা এগুলো একবারই পাঠ করা শরিয়তে প্রমাণিত। এ জন্য যে, সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের রিওয়ায়াত করেছেন, তারা এগুলোর কথা একবারই রিওয়ায়াত করেছেন।

মাসআলা : তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীরের সময় হাত উঠাবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য দুই তাকবীরের সময়ও হাত উঠাবে। এক. রুকুতে যাওয়ার সময়। দুই. রুকু থেকে মাথা তোলার সময়। তাঁর দলিল ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত উঠানোর সময় রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়।

আমাদের দলিল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস رَأْسُ مَوَاطِنَ الْخِ رَأْسُ مَوَاطِنَ الْخِ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছে, সাতটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও হাত উঠানো হবে না (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় (২) কুনূতের তাকবীর (৩) ঈদের তাকবীরসমূহের সময় (৪) আরাফার তাকবীরসমূহের সময় (৫) উভয় জামরাহ [কঙ্কর নিক্ষেপ]-এর তাকবীরসমূহের সময় (৬) সাফা ও মারওয়ার তাকবীরের সময় (৭) হাজের আসওয়াদকে চুষন করার সময়। আর হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরূপ হাদীস ইবনে যুবাইর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে—

إِنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَصَلِّي فِي السَّيِّدِ الْحَرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যু'বায়ের (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে মাসজিদুল হারামে নামাজ পড়তে দেখলেন। সে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তুলছিল। লোকটি নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর হযরত ইবনে যু'বায়ের (রা.) তাকে বললেন, এটা করো না। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে এটা করেছেন কিন্তু পড়ে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।—(নিহায়)

**ফায়দা :** প্রকাশ থাকে যে হিন্দায়ার ব্যাখ্যাভাগণ (ইনায়্য ফাতহুল কাদীর, কিফায়্য) উক্ত মাসআলার একটি আকর্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। তা হলো হলো, একবার মসজিদে হারামের মধ্যে ইমাম আওয়ায়ী (র.)-এর সাথে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাক্ষাৎ হয়। ইমাম আওয়ায়ী (র.) বলেন, কি ব্যাপার ইরাকের লোকেরা রুকু করার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তোলার সময় হাত উঠায় না। অথচ আমার নিকট عمر بن سالم عن زهري এর সূত্রে এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এ সকল স্থানে হাত উঠাতেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন—

حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرِهِ الْإِفْتِاحَ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দিয়েছেন, ইমাম আওয়ায়ী (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে আমার আশ্চর্য লাগছে যে, আমি হাদীস বয়ান করতেছি عمر بن سالم عن زهري এর সূত্রে আর তিনি হাদীস বয়ান করতেছেন حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود এর সূত্রে, তখন ইমামে আ'যম (র.) বলেন, أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ لَقُلْتُ يَا أَبَا عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْهُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَعَبْدُ اللَّهِ .

অর্থাৎ হাম্মাদ যুহরীর মোকাবেলায় বড় ফকীহ আর ইব্রাহীম সালিম থেকে অফে (বড় ফকীহ) আর যদি ইবনে ওমর পূর্বের না হতেন অর্থাৎ সাহাবী না হতেন, তবে আমি বলতাম আলকামাহ ইবনে ওমরের মোকাবেলায় বড় ফকীহ। আর আব্দুল্লাহ তো আব্দুল্লাহ-ই অর্থাৎ তার কোনো নযীরই নেই। মেটকথা, ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়াযাতকে ترجیح দিয়েছেন। উক্ত ঘটনা ঘারা এতটুকু বুঝা গেল যে, রফ'এর ক্ষেত্রে ইবনে ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী তাই উভয় হাদীস বাদ পড়ে যাবে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِيَ إِلَّا فِي سَمْعِ مَوَاطِنَ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। অধিকন্তু এ হাদীসটি হাদীসে মাসহুর। এছাড়া ইবনে ওমরের হাদীস এ কারণেও বাদ পড়ে যায় যে প্রসিদ্ধ তাবেরী মুজাহিদ (র.) বলেছেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا لِإِفْتِاحِ الصَّلَاةِ .

আমি দু' বছর ইবনে ওমরের পিছনে নামাজ পড়েছি; কিন্তু তাকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও হাত উঠাতে দেখিনি। আর কায়দা আছে রাবী যখন তার নিজ রিওয়ায়েতের খিলাফ আমল করে তখন তার পূর্বের বর্ণিত রিওয়াযাত সাকিত তথা বাদ পড়ে যায়।—(নুফল আনওয়ার)

وَلَا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى  
فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيَمْنَى نَصْبًا وَجَهَ أَصَابِعَهُ تَحَوُّ الْقِبْلَةِ هَكَذَا وَصَفَتْ  
عَائِشَةُ (رض) قُعُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ  
عَلَى فَخْذَيْهِ وَسَطَ أَصَابِعِهِ وَتَشَهَّدَ بِرُؤْيِ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ وَائِيلَ لِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ  
أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ جَلَسَتْ عَلَى إِلَيْتِهَا الْيُسْرَى وَأَخْرَجَتْ  
رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِأَنَّهُ اسْتَرُّ لَهَا -

অনুবাদ : দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজ্জদা থেকে যখন মাথা তুলবে, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণ দাঁড় করিয়ে রাখবে আর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বসার এক্রপ বিবরণই হযরত আয়েশা (রা.) দিয়েছেন। আর উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে, আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে এবং তাশাহুদ পড়বে। ওয়াইল (রা.)-এর হাদীসে এক্রপই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এতে হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়। আর যদি নামাজ আদায়কারী মহিলা হয়, তবে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে দেবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে বসার পদ্ধতি ও নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, নামাজি যখন দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজ্জদা থেকে নিজের মাথা উঠাবে তখন সে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণরূপে দাঁড় করিয়ে রাখবে আর উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজে বসার এক্রপই বর্ণনা দিয়েছেন। বসার পর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দিবে। মিলিয়ে রাখবে না এবং হাত দ্বারা হাঁটু ধরবে না। দলিল- হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের হাদীসে এক্রপই বর্ণিত হয়েছে। আর আকলী দলিল হলো, এ ধরনের রাখা দ্বারা হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকে। আর যতটুকু সম্ভব প্রত্যেক অঙ্গকেই কিবলামুখী করা উত্তম।

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। তাই আমরাও এভাবে করব। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা (র.) ও আমাদের বক্তব্য। ইশারা করার পদ্ধতি এভাবে যে, ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং মধ্যমা দ্বারা গোলাকার বানাতে তারপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। ইমাম হুলওয়ানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহুদের মধ্যে ১-এর সময় শাহাদাত আঙ্গুল দাঁড় করাতে এবং ২-এর সময় ২-এর বলায় সময় নিচু করবে। যাতে আঙ্গুল দাঁড় করাবার দ্বারা গায়রুন্নাহ থেকে নফী আর নিচু করার সময় আঙ্গুলের যাতে ৩-এর সময় হয়ে যায়।

জীলোকদের বসার তরীকা হলো, সে বাম নিতম্বের উপর বসে যাবে এবং উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে দিবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

وَالْتَّشَهُدُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَى  
 آخِرِهِ وَهَذَا تَشَهُدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) فَإِنَّهُ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدِي  
 وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنِي سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ قُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى  
 آخِرِهِ وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوَّلَى مِنْ الْآخِذِ بِتَشَهُدِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَهُوَ قَوْلُهُ التَّحِيَّاتُ  
 الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 سَلَامٌ عَلَيْنَا إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ وَأَقْلَهُ الْإِسْتِحْبَابِ وَالْأَلْفُ وَاللَّامُ وَهُمَا  
 لِلْإِسْتِغْفَارِ وَزِيَادَةِ الْوَأْوِ وَهِيَ لِتَجْدِيدِ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْقِسْمِ وَتَاكِيدِ التَّعْلِيمِ -

অনুবাদ : আর তাশাহুদ হলো- যাবতীয় মৌখিক ইবাদত আল্লাহর জন্য এবং যাবতীয় দৈহিক ইবাদত আল্লাহরই জন্য এবং যাবতীয় আর্থিক ইবাদতও আল্লাহরই জন্য। হে নবী আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক [শেষ পর্যন্ত] বলা। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহুদ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন, যেমন তিনি আমাকে কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন বলা আতাহিয়াতুল লিলাহি ..... শেষ পর্যন্ত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ গ্রহণ করা উত্তম ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহুদ থেকে। তাঁর তাশাহুদ হচ্ছে التَّحِيَّاتُ - الْمُبَارَكَاتُ الْخ কেননা, ইবনে মাসউদের হাদীসে قال آদেশবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যার ন্যূনতম চাহিদা হলো মোস্তাহাব হওয়া। তা ছাড়া السلام ও الف ও لام যুক্ত রয়েছে, যা استغفار যাব সামগ্রিকতা বুঝায়। আর এর মধ্যে যে واو অতিরিক্ত রয়েছে, তা বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তা ছাড়া এতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, প্রথম বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ পড়া বিতর্ক মত অনুযায়ী ওয়াজিব। এমন তাশাহুদ-এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে, যেমন- হযরত ওমর (রা.)-এর তাশাহুদ, হযরত আলী (রা.)-এর তাশাহুদ, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহুদ, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ, হযরত আয়েশা (রা.)-এর তাশাহুদ এবং হযরত জাবির (রা.)-এর তাশাহুদ। এছাড়াও আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাশাহুদের বর্ণনা রয়েছে। ওলামায়ে আহুনাফ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদকে ইখতিয়ার করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাশাহুদটি হলো-  
 التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا  
 وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ হলো-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى  
 عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

ওলামায়ে আহনাফের হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও বিবিধ কারণ নিহিত আছে। যেমন- (১) ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন **قَالَ التَّحِيَاتُ لِلَّهِ** উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্যে **قَالَ** শব্দটি امر-এর সীগাহ। আর امر এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো ইসতিহ্বাব হওয়া। (২) এতে বর্ণিত **عليك سلام** বা **عليك السلام** এর মধ্যে **استغراق** তথা সামগ্রিকতা রয়েছে (৩) ইসতিহ্বাব হওয়া। (৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরা এবং কুরআনের সূরার ন্যায় **الصلوات** শব্দটি **واو**-এর সাথে বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। (৫) **التَّحِيَاتُ** ও **غیر صلوٰة** সবগুলোকে শামিল করে। কিন্তু ইবনে আব্বাসের তাশাহুদে **الصلوات** শব্দটি **واو** ছাড়া এসেছে যার মধ্যে তাশাহুদ এসে গেছে। তাই **التَّحِيَاتُ** দ্বারা শুধু **صلوات** বুঝাবে। **غیر** ও **صلوة** যখন **واو** সহ হয় যেমন ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদের মধ্যে রয়েছে তখন তা **صلوة** ও **غیر** সবকিছুকে শামিল করে। আর যেহেতু **كلمة عام** দ্বারা প্রশংসা করা **ابح** সেহেতু ইবনে মাসউদের তাশাহুদই উত্তম হবে। (৬) **عمامة المحدثين** বলেছেন, ইবনে মাসউদের তাশাহুদটি **سند**-এর দিক থেকে **احسن**। (৭) সাহাবায়ে কেরামও ইবনে মাসউদের তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বরে ইবনে মাসউদের তাশাহুদের তালীম দিতেন। একই বর্ণনা সালমান ফারসী, হযরত জাবির এবং হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকেও পাওয়া যায়। (৮) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদে রয়েছে **وَرَسُولُهُ** আর **عَبْدُ مُحَمَّدٍ** আবার পরিপূর্ণতা বুঝানো হয়। যেমন মিরাজের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামালিয়তকে বুঝাবার জন্য **عبد** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ** (৯) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদটি যবত তথা মুখস্থ করার ক্ষেত্রেও সহজ এবং ভালো। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত-

إِنَّهُ قَالَ اخْذْ أَبُو يَوْسُفَ يَبْدِي وَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ اخْذْ أَبُو حَنِيفَةَ يَبْدِي فَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ اخْذْ حَمَادُ يَبْدِي فَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ حَمَادُ اخْذْ إِبْرَاهِيمَ يَبْدِي فَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اخْذْ عَلْقَمَةَ يَبْدِي وَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ عَلْقَمَةُ اخْذْ ابْنُ مَسْعُودٍ يَبْدِي وَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اخْذْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَبْدِي وَعَلِمَنِي الشَّهْدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْذْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبْدِي فَعَلِمَنِي الشَّهْدَ .

তিনি বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, হাখ্বাদ (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। হাখ্বাদ (র.) বলেন, ইব্রাহীমে নাখখী (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইব্রাহীমে নাখখী (র.) বলেন, আলকামা (র.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা



দিয়েছেন। আলকামা (র.) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিলের জবাব : ১মটির জবাব হলো- কোনো কালিমা *زِيَادَتِي* যদি *أُولَى* হওয়ার সবব হয় তবে তো হযরত জাবির (রা.)-এর তাশাহুদটি তারজীহ পাবে এবং *أُولَى* হবে। কেননা তাঁর তাশাহুদে *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*-এর *زِيَادَتِي* রয়েছে। আর ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহুদের মধ্যে *وَأَمَّا الْفَوَاقِ* এবং *عَبْدُ* রয়েছে। এতে তো বুঝা যায় যে, ইবনে মাসউদের তাশাহুদটিই উত্তম হবে। ২য়টির জবাব হলো, শুধু কুরআনের মুয়াফিক হওয়াই *أُولَى* হওয়ার কারণ নয়? কেননা বসী অবস্থায় কুরআন পড়া মাকরুহ। তাহলে কিরাআতে কুরআনের সাদৃশ্য হওয়া কিভাবে মোস্তাহাব হলো। ৩য় কারণের জবাব হলো, *سَلَام* শব্দটি যেমনিভাবে *وَأَمَّا الْفَوَاقِ* ছাড়া কুরআনে এসেছে এমনিভাবে *وَأَمَّا الْفَوَاقِ* সহও কুরআনে এসেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- *وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ - وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ الْهُدَى* ৪র্থ কারণের জবাব হলো, তাশাহুদের ক্ষেত্রে হাদীসে ইবনে আব্বাস *مُؤَخَّر* এমনটি নয়; বরং হাদীসে ইবনে মাসউদ-ই *مُؤَخَّر*। যেমন- ইমাম কারখী (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে *السَّجِيَّاتُ الطَّاهِرَاتُ* ইবনে মাসউদের হাদীস ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে *مُؤَخَّر*।

**ফায়েরদা :** উল্লেখ্য যে, *التَّحِيَّات* দ্বারা মুরাদ *عِبَادَاتُ قَوْلِهِ* আর *صَلَوَات* দ্বারা মুরাদ *عِبَادَاتُ بَدَنِهِ* দ্বারা মুরাদ *عِبَادَاتُ مَالِهِ* এবং *السَّلَامُ عَلَيَّ* এটা ঐ সালাম যা মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিন জিনিসের সাথে প্রশংসার জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন। যেমন- *السَّلَامُ* হচ্ছে- *التَّحِيَّات*-এর মোকাবেলায়, *رحمت* হচ্ছে- *صَلَوَات*-এর মোকাবেলায় এবং *بركت* হচ্ছে- *التَّحِيَّات*-এর মোকাবেলায় বরকত অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া। মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাহিয়া পেশ করলেন *التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ* তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সালাম হাদিয়া দিলেন এবং বললেন *وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ* অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের নেক বান্দাদেরকেও তাঁর সেই সালামের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এবং বললেন *السَّلَامُ عَلَيْنَا* এর পর আল্লাহ ও রাসূলের বাক্যালাপ শুনে ফেরেশ্তাকুল বলে উঠলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

وَلَا يَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَأَخِيرَهَا فَإِذَا كَانَ وَسْطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحَدَّثَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرَضَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ عَلَيَّ مَا يَأْتِيكَ مِنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔

অনুবাদ : প্রথম বৈঠকে এর থেকে কিছু অতিরিক্ত করবে না। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নামাজের মাঝের এবং নামাজের শেষের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যখন নামাজের মধ্যবর্তী তাশাহুদ হতো, তখন তিনি তাশাহুদ শেষ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর যখন নামাজের শেষ দিকের তাশাহুদ হতো তখন তিনি (এরপর) নিজের জন্য যা ইচ্ছা তা দোয়া করতেন। শেষ দুই রাকআতে শুধু সূরায় ফাতিহা পড়বে। কেননা আবু কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মহানবী ﷺ শেষ রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়েছেন। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো একথা প্রমাণ করা যে, ফাতিহা পাঠ উত্তম। (অর্থাৎ শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহার পাঠ ওয়াজিব নয়; বরং উত্তম মাত্র) এটাই বিপুল মত। কেননা প্রথম দুই রাকআতের কিরাআত ফরজ, যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের সাথে আর কিছু বাড়াবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর قول جديد হলো, **فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَشَهُدٌ** (রা.)-এর হাদীস- **عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَأَخِيرَهَا فَإِذَا كَانَ وَسْطُ الصَّلَاةِ نَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ آخِرَ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ** (ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নামাজের মাঝের এবং নামাজের শেষের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। নামাজের মধ্যবর্তী তাশাহুদ হতো। তখন তিনি তাশাহুদ শেষ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর নামাজের শেষ দিকের তাশাহুদ হলে (এরপর) নিজের জন্য যা ইচ্ছা দোয়া করতেন) উম্মে সালামার হীসের জবাব হচ্ছে— **وَالْعَصْرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** - متفق عليه নয়; বরং **سلام** মুরাদ। অর্থাৎ এ সালাম যা তাশাহুদে রয়েছে— **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ**۔

মাসআলা : জোহর, আসর এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে এবং মাগরিবের শেষ এক রাকআতে শুধু সূরায় ফাতিহা পড়বে। দলিল হলো, হযরত আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদীস **الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِতَابِ** - متفق عليه। রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তেন আর শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়তেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো উত্তম অর্থাৎ শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়া ও মোস্তাহাব। সুতরাং যদি শেষের উভয় রাকআতে সূরায় ফাতিহা ও তাসবীহ তরক করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। এতে সিজদায় সাহব ও ওয়াজিব হবে না। তবে সূরায় ফাতিহা পড়া ভালো, এটাই হলো বিপুল মত। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়ত এমনও বর্ণনা করেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সুতরাং যদি ভুলক্রমে তরক করে তবে সিজদায় সাহব দিতে হবে। দলিল হলো শেষ দুই রাকআতে দাঁড়ানো হলো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ দাড়ানোকে জিকির ও কিরাআত থেকে খালি রাখা মাকরুহ। যেমন- রুকু ও সিজদাকে জিকির থেকে খালি রাখা মাকরুহ। বিপুল মতের দলিল হলো- কিরাআত শুধু প্রথম দুই রাকআতে পড়া ফরজ। এর বিবরণ পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

وَجَلَسَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ (رض) وَلَا تَهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ فَكَانَ أَوَّلَى مِنَ التَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَا لِكَ وَالَّذِي يُرَوَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا ضَعْفَهُ الطَّحَاوِيُّ (رحا) أَوْ يُحْمَلُ عَلَى حَالِهِ الْكِبَرِ وَيَتَشَهَّدُ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجُ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ إِمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ أَوْ كَحُلْمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فَكُفِينَا مَوْنَةَ الْآمِرِ وَالْفَرْضُ الْمَرْيُ فِي التَّشَهُدِ هُوَ التَّفْذِيرُ -

অনুবাদ : আর শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থাতেই বসবে যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিল। কেননা ওয়াইল (রা.) ও আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপই আছে। তা ছাড়া এরূপ বসা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক। সুতরাং তা উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা, যা ইমাম মালিক (র.) গ্রহণ করেছেন, তার তুলনায় উত্তম হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিতম্বের উপর বসেছেন বলে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তাহাবী (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা তা বার্বাকোর অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। আর তাশাহ্‌হদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব। আর মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফরজ নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলিল) কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তুমি এটা বলবে বা করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো; আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো। আর নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারখী (র.) -এর মতে শুধু একবার আর ইমাম তাহাবী (র.) -এর মতে যখনই মহানবী ﷺ -এর আলোচনা হয়। এভাবেই আমাদের উপর অবতীর্ণ আদেশের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠের যে নির্দেশ রয়েছে, তার দাবিতো হলো জীবনে মাত্র একবারের জন্য ওয়াজিব হওয়া, সে দাবিতো পূরণ হয়ে গেছে। সুতরাং নামাজের ভিতরেও একই আয়াতের প্রেক্ষিতে দরুদ ওয়াজিব করার অবকাশ নেই।) আর তাশাহ্‌হদের ক্ষেত্রে فرض শব্দটি যে বর্ণিত রয়েছে। (তার উত্তর হলো,) এখানে এ শব্দটি তফদীর এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থায়ই বসবে যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিল। ইমাম মালিক (র.) বলেন, উভয় বৈঠকে নিতম্বের উপর বসা সুন্নত। অর্থাৎ মহিলার ন্যায় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। ইমাম মালিক (র.) দলিল পেশ করেন এ হাদীস দ্বারা إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا আর আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা আমরা ওয়াইল ইবনে হজর ও ইয়সত আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি। দ্বিতীয় দলিল হলো আকলী দলিল, অর্থাৎ এরূপ বসা শরীরের

জন্য কষ্টদায়ক। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে যা নফসের উপর কষ্টকর হয় তাই হওয়া উত্তম। এতে হওয়াব বেশি হয়। এ জন্য আমরা বলেছি যে, এ অবস্থায়ই বসা উত্তম। ইমাম মালিক (র.)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা হয়। ইমাম তাহাবী (র.) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা হাদীসটির মধ্যে **عبد الحميد بن جعفر** নামক এক রাবী আছেন। যিনি মুহাজ্জিসীনে কোরামের দৃষ্টিতে দুর্বল রাবী। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি ঐ হাদীসকে সহীহও মেনে নেওয়া হয় তখন জবাব হবে ঐ ধরনের বসা বার্বাক্য অবস্থার ক্ষেত্রে আরোপ করা হবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ **ﷺ** যখন বার্বাক্যে উপনীত হয়েছিলেন তখন ঐভাবে বসেছেন।

الخ **وَشَهِدَ وَهُوَ وَاجِبُ الْخ** শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া আমাদের মতে ওয়াজিব। আর দরুদ শরীফ পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে তাশাহুদ পড়া এবং রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) তাশাহুদ পড়ার ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

إِنَّهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ التَّشَهُدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ النَّبِيُّ **ﷺ** قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الْخ.

অতঃপর সবিশেষ বললেন **إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ** উক্ত হাদীস দ্বারা তিনভাবে দলিল দেওয়া যায়। এক. রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন- **قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ التَّشَهُدُ** অর্থাৎ তাশাহুদের ক্ষেত্রে **فَرَض** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা তাশাহুদ পড়া ফরজ। দুই. রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন- **قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ**-এর মধ্যে **قُولُوا** শব্দটি **قُولُوا**-এর সীগাহ যা **جَرَب**-এর জন্য আসে। বুঝা গেল **التَّحِيَّاتُ** পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ফরজ ও ওয়াজিব উভয়টি একই পর্যায়ের। এ জন্য **التَّحِيَّاتُ** পড়া ওয়াজিব হলে ফরজও হবে। তিন. রাসূলুল্লাহ **ﷺ** নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহুদের সাথে **مَعْلُق** করেছেন। বুঝা গেল তাশাহুদ ব্যতীত নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। আর যা ছাড়া নামাজ পূর্ণ হয় না তা-তো ফরজই হয়। বুঝা গেল তাশাহুদ পড়া ফরজ।

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের সবগুলো তরীকার জবাব দেওয়া হচ্ছে- প্রথম তরীকার জবাব হলো; রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর বাণী **قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ التَّشَهُدُ**-এর মধ্যে **فَرَض**-এর আভিধানিক অর্থ মুরাদ অর্থাৎ নির্ধারণ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী-**فَرَضْنَا مَا فَرَضْنَا** এখন হাদীসের মতলব হবে তাশাহুদ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে আমরা **مَعْلُق** বলতাম। দ্বিতীয় তরীকার জবাব হলো, এখানে **أَمْر**-এর সীগাহটি **تَعْلِيم** ও **تَلْفِين**-এর জন্য এসেছে। সুতরাং এর দ্বারা ফরযিয়ত সাবিত হয় না।

তৃতীয় তরীকার জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে নামাজ পূর্ণ হওয়া তাশাহুদ পড়া এবং শেষ বৈঠক উভয়টির যে-কোনো একটির উপর **مَعْلُق** করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, নামাজ পূর্ণ হওয়া শেষ বৈঠকের সাথে **مَعْلُق** কেননা যদি শেষ বৈঠক ছুটে যায় তবে নামাজই জায়েজ হবে না। এতে বুঝা গেল যে, নামাজ পূর্ণ হওয়া যখন শেষ বৈঠকের সাথে **مَعْلُق** হয়ে গেল তখন তা আর তাশাহুদ পড়ার সাথে **مَعْلُق** হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) দরুদ শরীফ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে আদ্বাহর বাণী **سَلَامًا عَلَيْكُمْ** দ্বারা দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ **سَلَامًا** শব্দটি **أَمْر**-এর সীগাহ। আর **أَمْر**-এর চাহিদা হলো ওয়াজিব হওয়া। আর নামাজের বাইরে দরুদ পড়া ওয়াজিব নয় বিধায় নামাজের ভিতরেই দরুদ ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন- **لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَسَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ** যে ব্যক্তি তার নামাজের মধ্যে আমার উপর দরুদ পড়ল না তার নামাজই হল না। উল্লেখ্য যে, নামাজ না হওয়া তা তো ফরজ তরক করার কারণে হয়ে থাকে, সুন্নত তরক করার কারণে নয়। বুঝা গেল দরুদ পড়া ফরজ। নামাজ না হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আলিমগণ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর তা হলো এভাবে যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-কে তাশাহুদের তা'লীম দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ **ﷺ** ইরশাদ করেছেন **إِذَا**

قُلْتُ هَذَا أَوْ فَعَلْتُ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহুদ পড়া এবং শেষ বৈঠক-এর মধ্য থেকে যে কোনো একটির সাথে معلق করেছেন। সুতরাং যিনি صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ -এর সাথে معلق করেছেন, তিনি نص तथा ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের পরিপন্থী করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্য “নামাজের বাইরে দরুদ পড়া ওয়াজিব নয়” কথাটি আমরা মানি না। কেননা ইমাম কারখী (র.) বলেন, জীবনে কমপক্ষে একবার নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা صلوا হলো امر-সীগাহ, যা তাকরার তথা বার বার কে চায় না। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উচ্চারণ করবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম তখনই পাঠ করা ওয়াজিব। তবে বারবার দরুদ পাঠ করা এ কারণে ওয়াজিব নয় যে, امر তাকরারকে চায় বরং দরুদদের উজ্ব সبب متكرر -এর সাথে সম্পৃক্ত। আর سبب متكرر হলো যিকরে নবী। তাই তাকরারে যিক্র দ্বারা দরুদও মুকাররার হবে। যেমন আওকাতের তাকরার দ্বারা নামাজের উজ্ব মুকাররার হয়ে যায়। মোটকথা, নামাজের বাইরে যখন দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে গেল তাই صلوا-এর সীগাহে আমাদের উপর আমল হয়ে গেল। কাজেই নামাজের ভিতর দরুদ ওয়াজিব হওয়াকে সাবিত করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পেশকৃত হাদীস نَفِيَّ اَصْلٍ لَاصِلَةٍ لِمَنْ لَمْ يَصِلْ اِلَيْهِ -এর জবাব হলো হলো, এখানে نَفِيَّ اَصْلٍ মুরাদ নয় বরং نَفِيَّ দ্বারা نَفِيَّ কمال মুরাদ। অর্থাৎ দরুদ ব্যতীত নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। যেমন- لَاصِلَةٌ لِجَارِ الْمَسْجِدِ -এর মধ্যে نَفِيَّ দ্বারাও কمال মুরাদ। আর এর উপর করীনা হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বেদুঈন ব্যক্তিকে নামাজের তালীম দিয়েছিলেন তখন তিনি صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ -এর কথা উল্লেখ করেননি। যদি صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ ফরজ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন।

কায়েনা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কিভাবে দরুদ পড়া হবে? এ পর্যায়ে ঈসা ইবনে আবান (র.) الْحَجُّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, একবার ইমাম আবু হানীফা (র.)-কে صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেন, দরুদ শরীফ এভাবে পড়বে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

কিফায়া গ্রন্থকার লিখেন এ দরুদটি কা'ব ইবনে উজরা-এর হাদীসের অনুরূপ।

হযরত আলী, ইবনে আব্বাস এবং জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের তো আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের তরীকা জানা আছে কিন্তু দরুদ আমরা কিভাবে প্রেরণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এভাবে বলা-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর কুরআনের শব্দাবলি ও হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দোয়া করবে। প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পছন্দনীয় দোয়া নির্ধারণ করে নাও। আর এ দোয়ার আগে মহানবী ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করবে, যাতে দোয়া কবুলিয়াতের অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

মাসআলা : শেষ বৈঠকে **صلوة على النبي** -এর পর আরবিতে দোয়া পড়বে। কেননা নামাজের মধ্যে আরবি ভাষা বাতীত অন্য কোনো ভাষায় দোয়া করা মাকরুহ তাহরীমী। উল্লেখ্য যে, দোয়ার শব্দাবলি কুরআনুল কারীমের শব্দাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ . رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي . رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (الاية) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا الْحَقَّ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ الْحَقَّ .

অথবা দোয়ার শব্দাবলি রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত শব্দাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া চাই। হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّهٗ قَالَ لِرَسُولِي ﷺ عَلِمْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَاۤءُ ادْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে দোয়া করতেন  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ -

দলিল হলো যখনই ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস إِذَا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ وَعَمَّا يَنْفِيهِ يَمَّا شَاءَ অতঃপর হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলেছিলেন، اَعْجَبُكَ وَأَعْجَبَهُ وَاطْبَهُ إِلَيْكَ এখানে اَعْجَبَهُ ও اَعْجَبَهُ -এর ضَمِير দ্বয় مذكر - যা সুনানের রিওয়াযাত অনুযায়ী আছে। কিন্তু হিদায়ার কোনো কোনো ছাপায় اَعْجَبَهُ -এর ضَمِير রয়েছে যা সহীহ নয়। আর যদি مَوْثِق ضَمِير -কে সহীহও বলা হয় তখন دَعَا বা دَعَاوَاتُ -এর کَلِمَاتُ সাথে تَارِيلُ করেই সহীহ করতে হবে। হিদায়ী এছকার বলেন, প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর দরুদ পাঠ করবে তারপর দোয়া করবে, তাহলে দোয়া কবুলিয়াডের বিঘটিত অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হবে। দলিল হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য দোয়া করা হলো অবশ্যই কবুল হবে। আর আয়াহ তা'আলায় কখন এটা অসম্ভব, তিনি কোনো দোয়া কবুল করবেন আর কোনো দোয়া কবুল করবেন না। বরং পুরো দোয়াই কবুল করে নিবেন:

وَلَا يَدْعُو بِمَا يَشْبَهُ كَلَامَ النَّاسِ تَحَرُّزًا عَنِ الْفَسَادِ وَ هَذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ  
وَالْمَحْفُوظِ وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤْلُهُ مِنَ الْعِبَادِ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فَلَانَةَ يَشْبَهُ  
كَلَامَهُمْ وَمَا يَسْتَحِيلُ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي  
مِنْ قَيْلٍ الْأَوَّلِ لِاسْتِفْعَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ يُقَالُ رَزَقَ الْأَمِيرُ الْجَيْشَ ثُمَّ يَسْلَمُ  
عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ  
مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ  
الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ وَ تَوَى بِالتَّسْلِيمِ الْأَوَّلَى مَنْ عَلَى  
يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةُ وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَلَا  
يَنْوِي النِّسَاءُ فِي زَمَانِنَا وَلَا مَنْ لَا شُرْكَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْخُطَابَ  
حَظُّ الْحَاضِرِينَ -

অনুবাদ : মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষায় দোয়া করবে না যাতে নামাজ নষ্ট না হয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত ও সংরক্ষিত শব্দ দ্বারা দোয়া করা উচিত। আর যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয়, সেগুলোই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন- এ কথা বলা, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। পক্ষান্তরে যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়, তা মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন- এ কথা বলা اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।) আর اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।) বলাটা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। কেননা মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলা হয় زَوِّجْنِي الْجَيْشَ শাসক বাহিনীকে বেতন বা রেশন দিলেন। এরপর اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي শাসক বাহিনীকে বেতন বা রেশন দিলেন। এরপর اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي اللَّهُمَّ ارْজُقْنِي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي বলে নিজের ডান দিকে সালাম ফিরাবে এবং বাম দিকেও অনুরূপভাবে সালাম ফিরাবে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁর ডান দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর ডান গওদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো। এবং তাঁর বাম দিকে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর বাম গওদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো। প্রথম সালাম দ্বারা তাঁর ডান দিকের নারী, পুরুষ ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। তদুপর দ্বিতীয় সালামও। কেননা আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তবে বর্তমান জমানায় স্ত্রীলোকদের নিয়ত করবে না। (কেননা জমানা খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং নারী প্রসঙ্গ চিন্তা করে সেদিকে মনোযোগী হওয়া ইমামের পক্ষে সমীচীন হবে না।) এবং তাদেরও নিয়ত করবে না, যারা তার শরিক নয়। এটাও বিতর্কিত মত। কেননা সন্ধান উপস্থিতদের প্রাপ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : صَلَوَةُ عَلَى النَّبِيِّ এর পর এমন শব্দাবলি দ্বারা দোয়া করবে না যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যাতে নামাজের ঐ অংশ যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সম্পৃক্ত তা ফাসিদ হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, নামাজের উচিত বর্ণিত দোয়াসমূহ পড়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাশাহুদদের পর যদি এমন শব্দাবলি দ্বারা দোয়া করা হয় যা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তার দ্বারা পুরো নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা তাশাহুদদের পর যদি বাস্তবই কলামুল্লাস পাওয়া যায় তার দ্বারা নামাজ ফাসিদ

হয় না। তাহলে তো কালামুল্লাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কালাম পাওয়া গেলেও নামাজ ফাসিদ হবে না। এ হুকুমটি সাহেবাইনের মতে যাহির। এমনিভাবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও ফাসিদ হবে না। কেননা কালামুল্লাস মুস্তদীর পক্ষ থেকে **خُرُوجُ** **يُصْنَعُ**-এর অনুরূপ। তাই এর দ্বারা নামাজ পুরো হয়ে যাবে। আর ঐ দোয়া যা তাশাহহদের পর কালামুল্লাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলির মাধ্যমে করা হয়েছে তাতো নামাজের বাইরে হয়েছে, তাই নামাজ নষ্টকারী হবে না। — (ইনায়া)

কোন কোন দোয়া মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোন কোন দোয়া মানুষের কথা বার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এ পর্যায়ে গ্রহণকার বলেন। যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয় যেমন এ কথা বলা **اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فَلَانَةَ** হে আল্লাহ! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। এটা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব, যেমন এ কথা বলা **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। এটা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর যদি মুস্তদী বলে **اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي** হে আল্লাহ আমাকে রিজিক দাও। তখন এটা প্রথম তথা মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আর এটাই হলো সহীহ। দলিল হলো হলো, মানুষের ক্ষেত্রে এগুলো বহুল প্রচলন রয়েছে যেমন, বলা হয় **رَزَقَ الْأَمِيرَ الْجَيْشَ** আমীর সৈন্যদেরকে রিজক দিয়েছেন।

**كَمْ يَسْلَمُ عَنْ يَمِينِهِ الْخ** উপরোক্ত ইবারতের সারমর্ম হলো, তাশাহুদ, সালাত আলাদান্বী এবং দোয়ার পর উভয় দিকে সালাম ফিরাবে। প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে। আর সালামের শব্দাবলি হলো—**وَحَمَّ**—**السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** তোমাদের উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। জমহুর ওলামা, কিবারে সাহাবা, হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের এটাই মাযহাব। দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْلَمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَيْرِهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَيْرِهِ** হে ইমাম মালিক (র.) বলেন, শুধু সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাবে। তাঁর দলিল হলো, হযরত আয়েশা এবং সাহল ইবনে সা'দ আসসায়িদী (রা.) বর্ণিত হাদীস **كَذَلِكَ** হতে এমনটিই করেছেন। অর্থাৎ নামাজ থেকে বের হবার জন্য এক সালাম করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, কিবারে সাহাবাদের কাউলকে গ্রহণ করা উত্তম ইমাম মালিক (র.)-এর কাউল গ্রহণ করার তুলনায়। হযরত আয়েশা ও সাহল ইবনে সা'দ আসসায়িদী-এর এক সালাম ওয়াল্লা রিওয়াযাতের জবাব হলো, হযরত আয়েশা (রা.) মহিলাদের কাভারে থাকতেন, আর সাহল (রা.) থাকতেন শিতদের কাভারে। হতে পারে তাঁরা উভয়ে দ্বিতীয় সালাম শুনেনি। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের তুলনায় নিচু আওয়াজে হতো। সুতরাং এ সম্ভাবনাময় অবস্থার কারণে হযরত আয়েশা ও সাহল (রা.)-এর হাদীস দলিলযোগ্য হতে পারে না।

গ্রহণকার বলেন, প্রথম সালাম ফিরাবার সময় ঐ সমস্ত লোকদের নিয়ত করবে যারা তার ডান দিকে থাকে। তারা পুরুষ বা মহিলা হোক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাদেরও নিয়ত করবে। এমনিভাবে বাম দিকে সালাম ফিরাবার সময় তাদের নিয়ত করবে যারা তার বাম দিকে থাকে। দলিল হলো, আমাল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, যার বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। হিদায়া গ্রহণকার বলেন, আমাদের জমানায় স্ত্রীলোকদের নিয়ত করবে না। কেননা এ জমানার মহিলাদের জামাআতে উপস্থিত হওয়া মুতায়্যিখরীন ফুকাহায়ে কেরামের একমতের মাত্রারূপে তথা বর্জনীয়। আর যে সকল মুসলমান নামাজে শরিক নয় তাদেরও নিয়ত করবে না। এটাই বিতর্ক অভিজাত। হাকিম শহীদ (র.) বলেন, সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ত করবে, চাই তারা নামাজে শরিক হোক বা না হোক। যাতে নিয়ত সালামে তাশাহুদ তথা **وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ**-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। কাউলে সহীহ-এর দলিল হলো, সালাম হলো তাহীলীলে খেতাব তথা সন্মোদনকে হালালকারী। আর খেতাব হলো উপস্থিতদের প্রাপ্য। এ জন্য যারা নামাজে শরিক নয় তারা এই সালামে शामिल হবে না। এর বিপরীত হলো সালামে তাশাহুদ। কেননা তা হলো তাহিয়্যায়ে আখ্বাহ যা সর্বজন ব্যাপ্ত। আল্লাহর সকল নেক বান্দাদেরকে शामिल করবে চাই তারা উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত হোক। তাইতো রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেন,

**إِذَا قَالَ الْمُصَلِّيُ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** অর্থাৎ নামাজি যখন **وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ** বলে তখন তা আসমান ও জমিনের অধিবাসী আল্লাহর সকল নেক বান্দার নিকট পৌঁছে যায়।



وَلَا يَدَّ لِلْمُفْتَدِي مَنْ نَبَّهَ إِمَامِهِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الْجَانِبِ الْآئِمِنِ وَالْآئِسِرِ نَوَاهُ  
 فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ يَحْذَرُهُ نَوَاهُ فِي الْأُولَى عِنْدَ أَبِي يُونُسَ (رح) تَرْجِيحًا لِلْجَانِبِ الْآئِمِنِ  
 وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) نَوَاهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ ذُو حَظٍّ مِنَ  
 الْجَانِبَيْنِ وَالْمَنْفَرْدُ يَنْوِي الْحَفَظَةَ لَا غَيْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاهُمُ وَالْإِمَامُ يَنْوِي  
 بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَدًا مَحْضُورًا لِأَنَّ الْأَخْيَارَ فِي  
 عَدَدِهِمْ قَدْ اخْتَلَفَتْ فَاشْبَهَ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ إصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ  
 وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِفَرَضٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 تَحْرِيمُهَا التَّكْثِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  
 (رض) وَالتَّخْيِيرُ يَنْفِي الْفَرْضِيَّةَ وَالْوُجُوبَ إِلَّا إِنَّا اثْبَتْنَا الْوُجُوبَ بِمَا رَوَاهُ اخْتِطَاطًا  
 وَيَمْنُهُ لَا يَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

অনুবাদ : (সালামের সময়) মুক্তাদীর জন্য তার ইমামের নিয়ত করা জরুরি। সুতরাং ডানে বা বামে থাকলে তাদের সাথেই তার নিয়ত করে নিবে। আর যদি তার বরাবরে থাকেন, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ডান দিকে অধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সালামের সময় তার নিয়ত করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি মত; উভয় সালামে তার নিয়ত করবে। কেননা তিনি উভয় দিকের অংশীদার। আর একা একা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাদের নিয়ত করবে; অন্য কারো নিয়ত করবে না। কেননা তার সাথে তারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর ইমাম উভয় সালামে উক্ত (মুক্তাদী ও ফেরেশতাদের) নিয়ত করবে। এটি-ই বিতর্কিত মত। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করবে না। কেননা তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং তা আখিয়ায়ে কেরামের প্রতি ঈমান আনয়নের সদৃশ। (কোনো বর্ণনায় দু'জন, কোনো বর্ণনায় পাঁচজন, কোনো বর্ণনায় ষাটজন এবং কোনো বর্ণনায় একশ' ষাটজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নবী-রাসুলগণের প্রতি ঈমান পোষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করি না, তেমনি এখানেও ফেরেশতাদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করব না।) আমাদের মতে 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'য়ী (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা দলিল পেশ করেন- নামাজ শুরু করবে তাকবীর দ্বারা, আর তা থেকে বের হবে সালাম দ্বারা। আমাদের দলিল হলো, ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (যাতে শেষ বৈঠকের পর বসে থাকার কিংবা উঠে পড়ার ইচ্ছা প্রদান করা হয়েছে)। আর এ ইচ্ছা প্রদান ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। তবে আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করেছি। আর এ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্-ই অধিক জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাস্আলা : সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদীর জন্য জরুরি হলো, সে তার ইমামের নিয়ত করবে। ইমাম যদি ডান দিকে হয়, তাহলে ডানদিকে সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত করবে। আর যদি বাম দিকে হয়, তাহলে বাম দিকে সালাম ফেরানোর সময় ইমামের নিয়ত করবে। আর যদি মুক্তাদী ঠিক ইমামের বরাবরে থাকে, তখন এ সুরতে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মাযহাব হলো, মুক্তাদী ডান দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মাযহাব হলো, মুক্তাদী উভয় দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও একটি মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ডান দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ হলো, শরিয়তের মধ্যে ডান দিকটিই হলো অধিক গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলিল হলো, 'বরাবর' দাড়াণো ব্যক্তি উভয় দিকের অংশীদার। তাই উভয় দিকের সালামের সময় ইমামের নিয়ত করবে। তা ছাড়া তাআকুযের সময় যদি জমা করা সম্ভব হয়, তবে তো তারুজী-এর দিকে রুজু করা হয় না। এ কারণেও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, উভয় দিকের সালামের সময়ই ইমামের নিয়ত করবে।

وَالْإِمَامُ بَيِّنُ الْبَيِّنَاتِ : ইমাম তার উভয় সালাম ফিরানোর সময় রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশতা এবং মুসন্নী উভয়ের নিয়ত করবে। এটা ই বিত্বক্ক মত। কেউ কেউ বলেন, ইমাম নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এক সালামের সময় নিয়ত করা-ই যথেষ্ট। 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার নিয়ত করবে না; বরং স্বাভাবিকভাবেই ফেরেশতার নিয়ত করবে। কেননা তাদের সম্পর্কে হাদীস বিভিন্নভাবেই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّهٗ قَالَ مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ خَمْسَةٌ مِنَ الْحَفَظَةِ وَاحِدٌ مِنْ بَيْنِهِمْ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَآخَرُ عَنْ بَسَّارٍ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ وَآخَرُ أَمَامَهُ يَلْقَاهُ الْخَيْرَاتِ وَآخَرُ وَرَاءَهُ يَدْفَعُ عَنْهُ الشَّرَّ وَآخَرُ عِنْدَ نَاصِيئِهِ يَكْتُبُ مَا بَصُلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের সাথে রক্ষণা-বেক্ষণকারী পাঁচজন ফেরেশতা থাকে। একজন ডান দিকে, যিনি নেকীসমূহ লিখেন। আরেকজন বাম দিকে, যিনি খারাবিশুলো লিখেন। আরেকজন সামনের দিকে, যিনি তাকে নেকী করার জন্য তাল্কীন দেন। আরেকজন পেছনের দিকে, যিনি তাকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখেন। পঞ্চমজন তার কপালের দিকে, যিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপর প্রেরিত দরুদসমূহ লিখেন এবং তা আশ্রাহুর রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অন্য রিওয়াযাতে আছে- مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ سِتُّونَ مَلَكًا (একশ' ষাটজন ফেরেশতা থাকেন)। যেহেতু রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশতাদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই, সেহেতু অনির্ধারিত রেখেই নিয়ত করবে। আর এ মাসআলাটি আখিয়ায়ে কেরামের উপর ঈমান রাখার সদৃশ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ছাড়াই সকল নবীর উপর ঈমান রাখা জরুরি। প্রকাশ্যে থাকে যে, আমাদের মতে, 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব; ফরজ নয়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে, 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা রুকন এবং ফরজ। তাঁর দলিল হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- تَعْرِضُهَا التَّكْبِيرُ وَتَعْلِيهَا التَّسْلِيمُ। দলিল এভাবে যে, যেমনিভাবে তাকবীর ব্যতীত নামাজে দাখিল হওয়া সহীহ নয়, তেমনিভাবে সালাম ব্যতীতও নামাজ থেকে বের হওয়া সহীহ নয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা ফরজ। তাই নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য 'সালাম' শব্দটি উচ্চারণ করাও ফরজ হবে।

আমাদের দলিল হলো হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুউদ (রা.)-কে তাশাহুদ-এর তালীম দিয়েছিলেন, তখন তিনি ইবনে মাসুউদ (র.)-কে বলেছেন-

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ -

দলিল এভাবে যে, আব্দুল্লাহ রাসুল ﷺ সালাম দ্বারা নামাজ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বসা ও দাঁড়ানোর মাঝে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর ইখতিয়ার দেওয়া কোনো জিনিসের ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। বুখা গেল, তাশাহুদ পরিমাণ পড়ার পর সালাম ইত্যাদি কোনো জিনিস-ই ফরজ নয়। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, ইখতিয়ার দেওয়া তো উজ্জ্বলের পরিপন্থী, তাহলে তো সালাম বলা ওয়াজিবও হয় না। অথচ ওলামায়ে আহুনাক সালামকে ওয়াজিব বলেন। জবাব হলো, আমরা সতর্কতা অবলম্বন ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাবিত করেছি। আর এ হাদীসটি হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ওয়াজিব তো সাবিত হয়, কিন্তু ফরযিয়াত সাবিত হয় না। আব্দুল্লাহ-ই সম্যক অবহিত।

فَصَلِّ فِي الْقِرَاءَةِ : قَالَ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَالرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ  
وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيَخْفِي فِي الْأُخْرَيْنِ هَذَا هُوَ الْمُتَوَارُثُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ  
مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهْرٌ وَاسْمَعُ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ لِأَنَّهُ لَيْسَ  
خَلْفَهُ مَنْ يَسْمِعُهُ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْجَهْرُ لِيَكُونَ الْآدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ وَيَخْفِيهَا  
الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ  
أَي لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ وَفِي عَرَفَةِ خِلَافٌ لِمَالِكٍ (رح) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا  
رَوَيْنَاهُ -

## কিরাআত অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : ইমাম হলে ফজরে এবং মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে: শেষ দুই রাকআতে অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটাই পরম্পরায় চলে এসেছে। আর যদি মুন্ফরিদ হয়, তাহলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজকে শোনাবে। (অর্থাৎ মুন্ফরিদও এক হিসাবে ইমাম। কেননা সে অন্য কারো জন্য না হলেও নিজের জন্য তো ইমামের দায়িত্ব পালন করছে। আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত হলো ইমামতির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাকে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার অধিকার দেওয়া হবে। তবে ন্যূনতম পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। অর্থাৎ শুধু নিজেকে শুনিতে পড়বে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে চিন্তার জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করা। আর তার ক্ষেত্রে শুধু নিজেকে শুনিতে পড়লেই তা হাসিল হয়ে যায়। তবে ইমাম না হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে ইচ্ছা করলে অনুচ্চৈঃস্বরেও পড়তে পারবে।) কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা তার পেছনে এমন কেউ নেই, যাকে সে শোনাবে। তবে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করাই উত্তম, যাতে জামাআতের অনুরূপ আদায় হয়ে যায়। জোহর ও আসরে ইমাম কিরাআত চুপে চুপে পড়বে, এমনকি আরাফাতে হলেও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দিবসের নামাজ নির্বাক অর্থাৎ তাতে এমন কিরাআত নেই যা শোনা যাবে। আরাফা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর আমাদের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর বিপক্ষে দলিল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাসঙ্গিক কথা : গ্রন্থকার নামাজের সীফাত, কাইফিয়াত, আর্কান, ফারায়েয, ওয়াজিবাত এবং সুনান-এর আলোচনা থেকে ফারিগ হয়ে এ অনুচ্ছেদে কিরাআতের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছেন। অথচ কিরাআতও নামাজের আরকানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য আরকানের তুলনায় কিরাআতের আহকাম যেহেতু আরো অধিক, তাই গ্রন্থকার কিরাআতের আহকামকে আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসল্লী যদি ইমাম হয়, তাহলে ফজরের দুই রাকআত, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট রাকআতগুলো, অর্থাৎ মাগরিবের তৃতীয় রাকআত এবং ইশার শেষ দুই রাকআতে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী এবং তাবীয়ীন থেকে বর্ণিত। উল্লেখ্য, জোহরের নামাজে জোহর, আর আস্তের নামাজে আস্তে পড়া ওয়াজিব। আর এ ওয়াজিব হাদীস দ্বারা সাবিত। যেমন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত- **لَمَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْمَعُنَا وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِمْ** (রা.) সূত্রে বর্ণিত-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, প্রত্যেক নামাজে কুরআন পাঠ করা হতো। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়েছি। আর যেখানে গোপন করেছেন (শোনাননি), আমরাও গোপন করেছি। অর্থাৎ যেসব নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ জেহের করেছেন আমাদেরকে শুনিয়েছেন, সেগুলোতে আমরাও জেহের করেছি এবং তোমাদেরকে শুনিয়েছি। আর যেসব নামাজে ইখ্ফা করেছেন, সেগুলোতে আমরাও ইখ্ফা করেছি। বোঝা গেল, জেহেরী নামাজে জেহের করা, আর সিররী নামাজে ইখ্ফা করা হাদীস দ্বারা সাবিত। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে উম্মতের ইজমাও অন্যতম দলিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জেহরী নামাজে জেহের, আর সিররী নামাজের ইখ্ফা-এর উপর পুরো উম্মতের ইজমা রয়েছে।

আকলী দলিল হলো, কিরাআত নামাজের অন্যান্য রোকনের ন্যায় একটি রোকন। সুতরাং যেমনিভাবে সকল রোকনের ইহ্রার জরুরি, তেমনিভাবে কিরাআতেরও ইহ্রার জরুরি হবে। এ কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন। এদিকে মুশরিকরা কিরাআত শুনে শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিতো এবং বেহুদা বকাবকি করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন- **وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا** (আপনি সকল নামাজে জেহের করবেন না এবং সকল নামাজে ইখ্ফাও করবেন না; বরং **بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا**) (উভয়ের মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করবেন)। অর্থাৎ রাতের নামাজে জেহের করবেন, আর দিনের নামাজে ইখ্ফা করবেন। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর এবং আসরের নামাজে ইখ্ফা তথা আন্তে পড়া শুরু করে দেন। কেননা সাধারণত কাফিররা এ দুই ওয়াক্তে তাঁকে কষ্ট দিতো। আর যেহেতু কাফিররা মাগরিবের সময় খাওয়ায় লিপ্ত থাকতো, আর ইশা ও ফজরের সময় মুমিন ঘোরে বিভোর থাকতো, তাই সেসব নামাজে তিনি জেহের করতেন। আর জুমা ও দুই ইদের নামাজে জেহের করার কারণ হলো, এ নামাজগুলো মদীনায় প্রবর্তিত হয়েছিল। আর মদীনায় কষ্ট পৌঁছানো কাফিরদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আর এ ওজর তথা কাফিরদের পক্ষ থেকে কষ্ট পৌঁছানো যদিও মুসলমানদের আধিক্যের কারণে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, তথাপিও সিররী নামাজে ইখ্ফার হুকুম অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কেননা **حُكْمُ بَقَاءِ نَسَبِ** থেকে **مُسْتَفْنًى** হয়ে থাকে। যেমন- তওয়াফের মধ্যে রমলের হুকুম এখানে অবশিষ্ট আছে যদিও এর সবব এখন আর অবশিষ্ট নেই।

আর মুসন্নী যদি মুনফারিদ হয়, তখন সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজেই শুনাবে। কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা তার পিছনে এমন কোনো লোক নেই যাকে সে শুনাবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো প্রত্যেকের আন্তে-জোরে, সবকিছুই শুনে। মোটকথা, মুনফারিদের উপর জেহেরও ওয়াজিব নয় এবং ইখ্ফাও ওয়াজিব নয়। তবে জেহের করা উত্তম, যাতে মুনাফিকদের নামাজ জামাআতের অনুরূপ হয়ে যায়।

**وَعَنْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ** জোহর ও আসরের নামাজে ইমামের চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। সুতরাং জামাআতের হালাতে যখন ইখ্ফা করা ওয়াজিব তখন মুনফারিদের জন্য জোহর ও আসরে ইখ্ফা করা অবশ্যই ওয়াজিব হবে। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী **صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمًا** দিবসের নামাজে এমন কিরাআত নেই যা শুনা যায়। মোটকথা, দিবসের নামাজে কিরাআত তো আছে তবে বিসিসির আছে বিলজেহের নয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাকসীর হলো **فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ** দিবসের এই দুই নামাজে কিরাআত নেই। বিল জেহেরও না বিসিসিরও না। তবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরোক্ত তাকসীর সহীহ নয়। সহীহ না হওয়ার উপর দলিল হলো হলো, একবার হযরত খাবাব ইবনে আরাত (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, **فِي صَلَوةٍ** **يَمْعُرْتُمُ فِرَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ** কিখনো কিখনো আমাদেরকে জোহরের নামাজে দু' এক আয়াত শুনাতে। এতে বুঝা গেল যে, দিবসের নামাজের কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হবে। আমাদের মতে জোহর ও আসরের নামাজে সাধারণভাবেই চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব। আর নামাজ আরাফার পড়া হোক বা অন্য কোথাও পড়া হোক ততো কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফার ময়দানে এ দুই নামাজে জোহর জোরে কিরাআত করে পড়া ওয়াজিব। তাঁর দলিল হলো হলো, আরাফার ময়দানে বিশাল জামাআত নিয়ে নামাজ আদায় করা হয়। তাই জুমার উপর কিয়াস করে তিনি বলেন, এখানেও জোরে জোরে কিরাআত পড়বে। তবে আমাদের বর্ণিত হাদীস **صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمًا** ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে।

وَنَجْهَرُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِرُؤُودِ النَّفْلِ الْمُسْتَفْضِ بِالْجَهْرِ وَفِي  
التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ يُخَافَتْ وَفِي اللَّيْلِ يُتَخَيَّرُ اعْتِبَارًا بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ  
وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكْمَلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهْرٌ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ  
لَيْلَةِ التَّغْرِيْسِ بِجَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتْ حَتْمًا وَلَا يُتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحْبُ  
لِأَنَّ الْجَهْرَ يَخْتَصُّ بِالْجَمَاعَةِ حَتْمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى  
وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا -

অনুবাদ : আর জুমা ও দুই ঈদে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করবে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠের  
ব্যাপারে মশহুর হাদীস রয়েছে। দিবসে নফল নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করবে। আর ফরজ নামাজের উপর  
কিয়াস করে রাতের নামাজে মুনফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা নফল নামাজ হলো ফরজের সম্পূরক। সুতরাং  
(কিরাআতের বেলায়) নফল ফরজের অনুরূপ হবে। যে ব্যক্তির ইশার নামাজ ফউত হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পর  
তা পড়ে সে যদি উক্ত নামাজে ইমামতি করে তাহলে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। -এর সকালে  
জামাআতের সাথে ফজরের নামাজ কাযা করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন করেছিলেন। আর যদি সে একা নামাজ  
পড়ে, তাহলে অবশ্যই নীরবে কিরাআত পড়বে। (উভয় রকম পড়ার) ইখতিয়ার থাকবে না, এটাই বিতুদ্ধ মত।  
কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠের বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে জামাআতের সাথে অবশ্যজ্ঞাবীরূপে, কিংবা সময়ের সাথে  
স্বৈচ্ছামূলকভাবে মুনফারিদের ক্ষেত্রে। অথচ এখানে দু'টোর কোনোটিই পাওয়া যায়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জুমা এবং দুই ঈদের নামাজেও ইমামের উপর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। দলিল হলো,  
আহাদীসে মাশহুরাহ। ইমাম বুখারী ব্যতীত মুহাদ্দিসীনে কেরামের এক জামাআত বর্ণনা করেছেন যে,

إِنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِيحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَائِبَةِ

আর মুসলিমের রিওয়ায়াত হলো

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ سَالَيْنِي عُمَرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِ  
وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

আবু ওয়াকিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইদুল আজহা ও  
ইদুল ফিতরের নামাজে কোন কোন সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, সূরায়ে ক্বাফ ও সূরায়ে ইক্‌তারাবাবিস সা'আহ পড়তেন। এ  
সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি জুমা ও দুই ঈদের নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দিবসের নফল নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। আর রাতের নফল নামাজে  
ইচ্ছাধীন। আন্তে জোরে উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। দলিল হলো, নফল আদায়কারী ব্যক্তিকে একাকী ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির  
উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ একাকী ফরজ আদায়কারীর উপর দিবসের ফরজ নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া

ওয়াজিব। আর রাতের নামাজে ইচ্ছাধীন, জোরেও পড়তে পারে বা চুপে চুপেও পড়তে পারে। আর এ কিসাসের কারণ হলো নফল ফরজের সম্পূরক। তাই নফল ফরজের অনুরূপ হবে। আর রাতের ফরজে মুনফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে। জোরে বা আস্তে পড়বে। এমনভাবে রাতের নফলেও ইখতিয়ার রয়েছে। আর যেহেতু দিনের ফরজে চুপে চুপে পড়া নির্ধারিত, তাই দিনের নফলেও চুপে চুপে পড়াই নির্ধারিত হবে।

وَمَنْ قَاتَلَهُ النَّيْسُ যদি কোনো ব্যক্তির ইশা, মাগরিব অথবা ফজর নামাজ ফউত হয়ে যায়, তারপর তা সূর্যোদয়ের পর কাজা করতে চায়, তবে এর দুই সুরত রয়েছে। এক জামাআতের সাথে কাজা করবে। দুই একাকী কাজা করবে। যদি জামাআতের সাথে কাজা করে তবে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়বে। দলিল হলো হলো, لَيْلَةُ النَّعْرِيسِ -এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে কাযা করেছিলেন তখন তিনি উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়েছিলেন। لَيْلَةُ النَّعْرِيسِ -এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো হলো, এক জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে নিয়ে একস্থানে অবস্থান করলেন। জাগানোর দায়িত্ব ছিল হযরত বিলালের উপর। কিছু হযরত বিলালও ঘুমিয়ে পড়লেন। আর রোদ্দ প্রখর হয়ে যাবার পর জাগ্রত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সূর্য যখন এক নেযা বরাবর উপরে উঠল তখন সামনে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করলেন এবং অজু করলেন। আর মুযাজ্জিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর দুই রাকআত নামাজ পড়লেন অর্থাৎ ফজরের সুনত। তারপর নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হলো, তারপর ফজরের ফরজ নামাজ আদায় করলেন। যেমনটি অন্যান্য দিন আদায় করতেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরজে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়েছেন-এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ لَيْلَةُ النَّعْرِيسِ -এর সময় ফজরের নামাজের কিরাআত উচ্চৈঃশব্দে পাঠ করেছেন। আর যদি উপরোক্ত নামাজগুলো একাকী কাজা করে, তবে নীরবে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। তখন জোরে ও চুপে পড়ার ইখতিয়ার বাকি থাকবে না। এটাই বিতর্ক মত। শামসুল আইম্মা আসসাৱাখসী এবং ফখরুল ইসলাম (র.) প্রমুখের মতে উচ্চৈঃশব্দে পড়া উত্তম। দলিল হলো, সাধারণত কাজা আদা (اداء) অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর রাতের নামাজের আদায়ের ক্ষেত্রে মুনফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে যে, জোরেও পড়তে পারে আবার চুপে চুপেও পড়তে পারে, তবে জোরে পড়া উত্তম। এমনটি কাজার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। তথা জোরে পড়া উত্তম হবে। বিতর্ক কাউলের দলিল হলো, উচ্চৈঃশব্দে পড়া দুই সুরতের সাথে খাস। এক. নামাজ জামাআতের সাথে হওয়া দুই. নামাজ সময়ের ভিতরে হওয়া। প্রথম সুরতে উচ্চৈঃশব্দে পড়া উত্তম। আর দ্বিতীয় সুরতে মুনফারিদের ক্ষেত্রে ইখতিয়ারাধীন। মোট কথা, জোরে ও আস্তে পড় শরিয়তের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী হবে। আর আমরা শরিয়তের মধ্যে উচ্চৈঃশব্দে পড়াকে দুইভাবে পেয়েছি। এক. উচ্চৈঃশব্দে পড়া ওয়াজিব। এটা হলো তখন যখন জামাআতের সাথে জেহরী নামাজ পড়া হবে তা আদা হোক বা কাজা হোক। দুই. জেহের ইচ্ছাধীন, এটা তখন যখন মুনফারিদ ওয়াক্তের ভিতর জেহরী নামাজ পড়ে। আর এখানে মুনফারিদ যখন সূর্যোদয়ের পর জেহরী নামাজ পড়ে তখন তো উপরোক্ত দুই সুরতের এক সুরতও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জামাআতও না ওয়াক্তও না। এ জন্য এ সুরতে জেহেরও ওয়াজিব হবে না এবং জেহের মুখায়য়ারাও নয়। তাই ইখফা তথা চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব হবে।

وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأَوَّلَيْنِ السُّورَةَ وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَمْ يُعَدِّ فِي الْأَخْرَيْنِ وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الْأَخْرَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ وَجَهَرٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحا) وَمُحَمَّدٍ (رحا) وَقَالَ أَبُو يُونُسَ (رحا) لَا يَقْضَىٰ وَاحِدُهُ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يَقْضَىٰ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَىٰ وَجْهِ تَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةُ فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأَخْرَيْنِ تَتَرْتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ وَهَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةَ لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ قَضَاؤَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَفِي الْأَصْلِ بِلَفْظَةِ الْإِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً فَغَيْرُ مَوْضُوعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَلَمْ يُمَكِّنْ مُرَاعَاةَ مَوْضُوعِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইশার প্রথম দুই রাকআতে সূরা পাঠ করল কিন্তু সূরায় ফাতিহা পাঠ করেনি, সে শেষ দুই রাকআতে তা দোহরাবে না। পক্ষান্তরে যদি সূরায় ফাতিহা পড়ে থাকে কিন্তু তার সাথে অন্য সূরা যোগ না করে থাকে, তাহলে শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা ও সূরা দু'টোই পড়বে এবং উচ্চেষ্টারে পড়বে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, দু'টোর মধ্যে কোনোটাই কাজ্য করবে না। কেননা ওয়াজিব যখন নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে বিনা দলিলে সেটাকে কাজ্য করা যায় না। তরফাইন (র.)-এর দলিল যা উভয় অবস্থায় পার্থক্যের সাথে সম্পৃক্ত যে, সূরায় ফাতিহাকে শরিয়তে এমন অবস্থায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার পরে সূরা সংযুক্ত হবে। সুতরাং যদি ফাতিহাকে শেষ দুই রাকআতে কাজ্য করা হয় তাহলে তারতীবের দিক থেকে সূরার পর সূরায় ফাতিহা এসে যাবে। অর্থাৎ এটা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। আর (প্রথম দুই রাকআতে) সূরা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শরিয়ত নির্ধারিতরূপে কাজ্য করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, এখানকার পাঠে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে (কাজ্য করা) ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আর মূল গ্রন্থের উল্লেখিত শব্দে মোস্তাহাব হওয়া বুঝায়। কেননা সূরার কাজ্য যদিও ফাতিহার পরে হচ্ছে তবু এ সূরা ফাতিহার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। এ কারণে নির্ধারিত অবস্থান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি ইশার প্রথম দুই রাকআতে সূরা পড়েছে কিন্তু সূরায় ফাতিহা পড়েনি এখন এ ব্যক্তি শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহার কাজ্য করবে না। আর যদি প্রথম দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়ে কিন্তু অন্য কোনো সূরা পড়েনি; তাহলে শেষ দুই রাকআতে সূরায় ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে এবং উভয়টি উচ্চেষ্টারে পড়বে। এ হকুম হলো তরফাইন (র.)-এর মতে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, সূরায় ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা কোনোটিরই কাজ্য করতে হবে না। তাঁর দলিল হলো হলো, সূরায় ফাতিহা ও এর সাথে অন্য সূরা মিলানো উভয়টিই ওয়াজিব। (এ কারণেই

উভয়টির যে কোনো একটি যদি ক্রমক্রমে তরক করা হয় তখন সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় : **حَاشَى ثَانِي** তে তার কাজা ককর বা না ককর ।) আর ওয়াজিব যখন তার নিজের সময় হতে ফউত হয়ে যায় তখন তার কাজা ফরজ হয় না, তবে যদি কাজার কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে তা হলে কাজা করতে হবে। আর এখানে কাজার কোনো দলিল নেই। এ জন্য এগুলোর কাজা করাও জরুরি নয়। দলিল এ কারণে বিদ্যমান নেই যে, কাজা বলা হয় **مَالَهُ مَشْرُوعًا** কে- **مَاعَلَيْهِ** -এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়াকে। অর্থাৎ শরিয়তে তার জন্য যে হক প্রবর্তন করেছে তাকে তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যা তার উপর ওয়াজিব। আর এখানে অবস্থা হলো, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা প্রবর্তিত হয়নি। তাই যখন শেষ দুই রাকআতে সূরা তার হক হিসাবে প্রবর্তিত হয়নি তাই প্রথম দুই রাকআতের ফউত হওয়া সূরা শেষ দুই রাকআতে কাযা করা হবে না।

তরফাইন (র.)-এর দলিল এবং যা উভয় সুরাতের সাথে পার্থক্যের কারণও বটে, তাহলো হলো, শরিয়ত সূরায়ে ফাতিহাকে এমনভাবে প্রবর্তন করেছে যে, তারপর কোনো সূরাকে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা এমনভাবে পড়বে যে তার পরেও কোনো সূরা পড়বে। এখন প্রথম সুরাতে যখন কোনো সূরা পড়ল কিন্তু সূরায়ে ফাতিহা পড়ল না, যদি শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা কাজা করা হয় তাহলে সূরায়ে ফাতিহা অন্য সূরার পরে সংযুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথমে সূরা পড়া হবে তারপর সূরায়ে ফাতিহা। আর এটাতে খেলাফে শরা তথা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। কেননা শরিয়ত প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা তারপর অন্য সূরার প্রবর্তন করেছে। আর এখানে হচ্ছে তার উল্টো। এ কারণে এ সুরতে সূরায়ে ফাতিহা কাজা করার হুকুম দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ যখন প্রথম দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়ল; কিন্তু অন্য কোনো সূরা পড়ল না তখন শেষ দুই রাকআতে এগুলোর কাজা করবে। কেননা এ সুরতে শরিয়ত প্রবর্তিত নির্ধারিত তরীকা অনুযায়ী কাজা করা সম্ভব। কেননা শরিয়তের প্রবর্তিত তরীকা হলো ফাতিহার পর সূরা পড়া, যা এখানে বিদ্যমান।

ইনায়া গ্রন্থকার ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে, আমরা এ কথা মানি না যে, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা প্রবর্তিত হয়নি। কেননা ফখরুল ইসলাম শরহে জামে সগীরে লিখেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা পড়া মোস্তাহাব। এ কারণেই যদি শেষ দুই রাকআতে কোনো সূরা পড়া হয় তবে সাজাদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় না।

**قَرَأْنِي** বাক্যটুকু দ্বারা ইবারতসমূহের ইখতিলাফ দেখানো হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, জামে সগীরের মধ্যে এমন শব্দ উল্লেখ রয়েছে যাতে শেষ দুই রাকআতের সূরার কাজাও ওয়াজিব বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা জামে সগীরে রয়েছে **قَرَأْنِي**

امر يا **الْأَخْرَجِينَ** -এর স্থলবতী, আর **امر** উজ্জ্বের উপর দালালাত করে। সুতরাং জামে সগীরের ইবারত দ্বারা বুঝা গেল শেষ দুই রাকআতে কাজা করা ওয়াজিব। আর দলিল হলো যে, উহাই পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মাবসূতের মধ্যে ইস্তিহবাবের সাথে বর্ণিত হয়েছে। মাবসূতের ইবারত হলো **أَنْ يَقْضِيَهَا**

**أَحِب** প্রকাশ থাকে যে, **أَحِب** শব্দটি **استحب**-এর উপর দালালাত করে। মাবসূতের ইবারত দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি প্রথম দুই রাকআতে কিরাআতকে তরক করা হয় তবে শেষ দুই রাকআতে তার কাজা করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইস্তিহবাবের দলিল হলো, সূরা মিলানোর বিষয়টি অবশ্যই সূরায়ে ফাতিহার পরে হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম ফাতিহার সাথে সংযুক্ত নয়। কেননা প্রথম ফাতিহা ও সূরার মাঝে দ্বিতীয় ফাতিহা দ্বারা (ঐ ফাতিহা যাকে শেষ দুই রাকআতে পড়া উত্তম) ফাসিলা হয়ে গেছে। সুতরাং নির্ধারিত অবস্থান সর্বোৎসাহে বজায় রাখা সম্ভব নয়। এ জন্য মাবসূতে বলা হয়েছে সূরার কাজা করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।



وَيَجْهَرُ بِهِمَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَيْنٌ وَتَغْيِيرُ التَّنْفِيلِ وَهُوَ الْفَاتِحَةُ أَوْلَى ثُمَّ الْمُخَافَةُ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمَعَ غَيْرَهُ وَهَذَا عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدَوَانِيِّ (رح) لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ أَذْنَى الْجَهْرِ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَأَذْنَى الْمُخَافَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَعَلَ اللِّسَانُ دُونَ الصَّمَاخِ وَفِي لَفْظِ الْكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ -

অনুবাদ : আর উভয়টিকে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে। এটাই বিপুল মত। কেননা একই রাকআতে সরব ও নীরব ইভাবে কিরাআত পাঠ করা মানায় না। কাজেই নফল তথা ফাতিহার মধ্যে পরিবর্তন আনা এর থেকে উত্তম। মনুচ্চৈঃস্বরে পাঠ হলো যেন নিজে শুনতে পায়। আর উচ্চৈঃস্বরের পাঠ হলো অপরে শুনতে পায়। এ হলো ফকীহ হাবু জাফর হিন্দওয়ানীর মত। কেননা আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহবা সঞ্চালনকে কিরাআত বলা হয় না। ইমাম কারখী (র.)-এর মতে উচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শুনানো আর মনুচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো রফের বিপুল উচ্চারণ। কেননা কিরাআত বা পাঠ মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। কুদুরী গ্রন্থের শব্দে এর প্রতি স্মিত রয়েছে- (কেননা ইমাম কুদুরী -جهر-এর ব্যাখ্যা করেছেন يُسْمِعُ نَفْسَهُ 'নিজেকে শুনাবে' দ্বারা। সুতরাং মনুচ্চৈঃস্বরীয় পাঠের অর্থ হবে নিঃশব্দ উচ্চারণ।) তালাক প্রদান, আযাদ করা, استثناء তথা ব্যতিক্রম যোগ করা ত্যাদি শব্দ উচ্চারণমূলক যাবতীয় মাসআলার মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো উক্ত নীতির-পার্থক্যের উপর।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যখন শেষ দুই রাকআতে সূরার কাজ করবে তখন সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটাই বিপুল মত। ইবনে সামা'আহ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন য, শুধু সূরা উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। হিশাম (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন আদৌ উচ্চৈঃস্বরে পড়বে না। সূরায়ে মতিহাও না বা অন্য কোনো সূরাও না। হিশামের রিওয়ায়াতের কারণ হলো, জোরে এবং আন্তে উভয়টিকে এক রাকআতে একত্রিত করা মানায় না। আর সূরাকে পরিবর্তন করা অর্থাৎ জোরের স্থলে সূরাকে আন্তে পড়া উত্তম। কেননা ফাতিহা তার হানেও আছে এবং সূরার আগেও আছে। এ জন্য ফাতিহা হলো اصل আর সূরা হলো তার তাব'। আর শেষ দুই রাকআতে মতিহার হক হলো আন্তে পড়া। তাই তার তাব' হয়ে সূরাকেও ইখফা করা হবে। ইবনে সামা'আহ রিওয়ায়াতের কারণ হলো, শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা পড়া হলো আদা (ادا), আর সূরা পড়া হলো কাজ। আর আদা তার মহল অনুযায়ী হয়ে থাকে, আর কাযা بِحَسَبِ الْفَرَائِضِ অর্থাৎ, ফায়িতা অনুযায়ী হয়। যেহেতু সূরা জেহেরের সাথে ফউত হয়েছে তাই তার ঈযাও জেহেরের সাথে হবে। আর ফাতিহা যেহেতু তার মহলেই রয়েছে এ জন্য ফাতিহার মধ্যে তার সিক্তের রূপ রূপ করা হবে। আর শেষ দুই রাকআতে ফাতিহার সিক্ত হলো নীরবে পড়া। এ জন্য ফাতিহাকে নীরবে পড়া হবে। কিন্তু এ অবস্থায় তা একই রাকআতে জোরে ও আন্তে দুই প্রক্রিয়া একত্রিত হওয়া লায়িম আসে। তাই এর জবাব হলো, কাজা তার মাকামের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সূরা যদিও শেষ দুই রাকআতে পড়া হয়েছে কিন্তু তার হিসাব হবে প্রথম দুই রাকআতে। এই হিসাবে একই রাকআতে জোরে ও আন্তে একত্রিত হওয়া লায়িম আসে না। কাউলে সহীহ-এর দলিল হলো, একই রাকআতে সরবে ও নীরবে

পড়া শররী দৃষ্টিকোণ থেকে মানায় না। এখন দুটোই সুরত এক, উভয়টাই নীরবে পড়বে। যেমন— ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম রিওয়ায়েতে করেছেন দুই, উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এখন প্রথম সুরতে **اقْرَأْ** কে **ادْنِ**—এর তাবে করা লাম্বিম আসে, যা কোনো ভাবেই মুনাসিব নয়। কেননা উচ্চৈঃস্বরে সূরা পড়া ওয়াজিব ছিল। আর শেষ দুই রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়া সুন্নত, যা নফলের পর্যায়। এখন ফাতিহা যা সুন্নত তার সিম্ফত অর্থাৎ চুপে চুপে পড়া হিসাবে সূরা যা ওয়াজিব তার সিম্ফত অর্থাৎ জেহেরকে পরিবর্তন করা মানে **اقْرَأْ** কে **ادْنِ**—এর তাবে বানানো, যা কিছুতেই সমীচীন নয়। এজন্য এ সুরত জায়েজ হবে না। এখন দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ উভয়টিকে জোরে পড়ার এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এই সুরতে ওয়াজিব (সূরা)—এর সিম্ফত (জেহের)—এর কারণে নফল (ফাতিহা)—এর সিম্ফত (ইখ্ফা)—কে পরিবর্তন করতে হবে। আর এটা উত্তম। কেননা এ সুরতে **اقْرَأْ** **ادْنِ**—এর তাবে হবে।

**نُفِىَ الْمَخَافَةِ أَنْ يُسْمِعَ الْخ** উপরোক্ত ইবারতে জেহের ও ইখ্ফা—এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইনায়্যা গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইবারতের সারসংক্ষেপ হলো হলো, কালিমার আজযা (اجزاء) যা মুখে উচ্চারিত হয় তা দুই প্রকার। এক, কালাম দুই, কিরাআত। কেননা এর দ্বারা মুখাতাবকে নিসবতের ফায়িদা পৌছানো উদ্দেশ্য হবে অথবা হবে না। যদি প্রথমটি হয় তবে কালাম। আর না হলে কিরাআত। অতঃপর প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার। এক, জেহের দুই মুখাফাতাত। কিন্তু উভয়টির মাঝের **حَدَ فَاصِل**—এর ক্ষেত্রে আমাদের ওলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে। ফকীহ আবু জাফর হিন্দুয়ানী (র.) বলেন, ইখ্ফা হলো নিজেকে শুনিয়ে দেওয়া। যদি এর চেয়েও কম হয় তবে তাকে **عِصْم** বা **دَنْدَن** বলা হয়, কালাম বা কিরাআত বলা হয় না। আর জেহের হলো অন্যকে শুনিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ এমন আওয়াজ পড়া যে কাছের লোকটি তা শুনেতে পায়। দলিল হলো, আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহবার সঞ্চালনকে কিরাআত বলা হয় না। আভিধানিকভাবেও না এবং পারিভাষায়ও না। ইমাম কারখী (র.) বলেন, জেহের—এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শুনানো আর ইখ্ফা—এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো হরফের বিতঙ্ক উচ্চারণ। কেননা কিরাআত হলো মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। ইখ্ফার এ সংজ্ঞার উপর প্রশ্ন হয় যে, কিতাবাতের সাথেও শব্দের বিতঙ্ক উচ্চারণ পাওয়া যায়, কিন্তু আওয়াজ না হওয়ার কারণে তাকে কিরাআত বলা হয় না। বুঝা গেল কিরাআতের জন্য শুধু শব্দের বিতঙ্ক উচ্চারণই যথেষ্ট নয়, আওয়াজেরও প্রয়োজন আছে। এর জবাব হলো, মুতলাকান শব্দের বিতঙ্ক উচ্চারণকে কিরাআত বলা হয় না বরং জবান দ্বারা শব্দের বিতঙ্ক উচ্চারণকে কিরাআত বলা হয়। এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেছেন, কিরাআত মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম কুদুরী ইবারতেও ইমাম কারখীর মতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে **وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ رَأً** হিদায়া প্রণেতা বলেন, এই ইখতিলাফই প্রত্যেক ঐ জিনিসের মধ্যে প্রযোজ্য হবে যার সম্পর্ক কথার সাথে রয়েছে। যেমন, তালাক প্রদান, আজাদ করা এবং ইসতিস্না তথা ব্যতিক্রম যোগ করা ইত্যাদি। যেমন— কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে **أَنْتِ طَالِقٌ** অথবা গোলামকে **أَنْتَ حُرٌّ** বলল কিন্তু বক্তা নিজে তা শুনেনি। তখন ইমাম কারখীর মতে তালাক ও আজাদ হয়ে যাবে, আর ফকীহ আবু জাফর হিন্দুয়ানীর মতে হবে না। এমনিভাবে যদি উভয়টি উচ্চৈঃস্বরে বলে আর ইস্তিসনাকে এত নিচু স্বরে বলে যে নিজেও না শুনে তবে ইমাম কারখীর মতে তালাক ও আজাদ হবে না, তবে ইস্তিস্না গ্রহণযোগ্য হবে। আর আবু জাফর হিন্দুয়ানীর মতে উভয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্তিস্না গ্রহণযোগ্য হবে না। একই ইখতিলাফ জবাই—এর ক্ষেত্রে তাসমিয়া আর সিদ্দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও।

وَأَذْنَى مَا يُجْزَى مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحمہ) وَقَالَ ثَلَاثُ  
 آيَاتٍ قِصَارًا أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعِي قَارِئًا يَذُوبُهُ فَاتَّخَذَهُ قِرَاءَةً مَا دُونَ الْآيَةِ وَلَهُ  
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ قُضِلَ إِلَّا أَنْ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ وَالْآيَةُ  
 لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ وَفِي السَّفَرِ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيِ سُورَةٍ شَاءَ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي سَفَرِهِ بِالْمَعْوَدَةِ تَيْنِ وَلَئِنْ لَلِشَّكْرِ أَثَرًا فِي  
 اسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ فَلَنْ يُؤَثَّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوَّلَى وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ  
 مِنَ السَّيْرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَمْنَةٍ وَقَرَأَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ نَحْوَ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَأَنْشَقَّتْ لِأَنَّهُ  
 يَكُونُهُ مُرَاعَاةُ السَّنَةِ مَعَ التَّخْفِيفِ -

অনুবাদ : নামাজে যে পরিমাণ কিরাআত যথেষ্ট হয়, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এক আয়াত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ঘ এক আয়াত। কেননা এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে তাকে কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- الْقُرْآنَ কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়ো। এখানে (এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে) কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে এক আয়াতের কম পরিমাণ (সর্বসম্মতিক্রমেই কুরআন রূপে গণ্য হওয়ার হুকুমের) বহির্ভূত। আর পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশ বিশেষের সমার্থক নয়। আর সফরে সূরায় ফাতিহার সাথে অন্য যে কোনো সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর সফরে ফজরের নামাজে সূরায় ফালাক ও সূরায় নাস পাঠ করেছিলেন। তা ছাড়া নামাজের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং কিরাআত হ্রাসকরণের ব্যাপারে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি (মুসাফির) ব্যক্তি ও শান্তি ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে, তাহলে ফজরের নামাজে সূরা বুরূজ ও ইনশাক্কাত পরিমাণ সূরা পাঠ করবে। কেননা এভাবে তাখফীফ সহকারে সুনুতের উপরও আমল সম্ভব হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের মধ্যে কিরাআত ইকামত অবস্থায় হবে অথবা সফর অবস্থায়; যদি ইকামত অবস্থায় হয় তবে তা তিন প্রকার। এক. الصَّلَاةُ بِمَا يُجْزَى অর্থাৎ এমন পরিমাণ যে পরিমাণের সাথে নামাজ জায়েজ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যা ছাড়া নামাজ জায়েজ হবে না। দুই. যে পরিমাণের সাথে حركات থেকে বেরিয়ে যায়। তিন. যে পরিমাণের সাথে احجاب হবে অথবা শক্তির অবস্থায় থাকবে। উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে الصَّلَاةُ بِمَا يُجْزَى-এর পরিমাণের বয়ান করা হয়েছে। চাই ইকামত বা সফর অবস্থায় হোক। গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কিরাআতের সর্বনিম্ন পরিমাণ যার দ্বারা নামাজ জায়েজ হবে তা হলো এক আয়াত। এখন আয়াতটি যদি দুই বা ততোধিক শব্দ বিশিষ্ট হয়, তবে সকল মাশায়িখের মতেই নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। যেমন- আল্লাহর বাণী- فَذَلِيلٌ كَيْفَ تَذَرُهُمْ أَنْظَرُ আর যদি এক শব্দ বিশিষ্ট আয়াত হয় যেমন- نَدْمًا مَسْنَانٍ অথবা এক হরফ বিশিষ্ট হয় যেমন- ن. ن. ن. তবে এতে মাশায়িখদের ইখতিলাফ রয়েছে। কারো মতে যথেষ্ট

হয়ে যাবে, কারো মতে যথেষ্ট হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে **مَا يَجْزِي بِهِ الصَّلَاةُ** -এর পরিমাণ হশো ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পরিমাণ হওয়া। যেমন, আয়াতুল কুরসী। তাঁদের দলিল হলো, ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াতের কম পড়নে ওয়ালা ব্যক্তিকে পরিভাষায় কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য হয়ে গেল। আর এক আয়াতের কম পাঠ করা দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না। তাই ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াতের কম পাঠ করার দ্বারা নামাজ যথেষ্ট হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, **أَلَّا يَأْتِيَ الْفَرَانَ** -এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী-**فَأَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়। আয়াতটি মুতলাক, এখানে এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাই যেমনিভাবে **سَاقُوا الْآيَةَ** নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এমনিভাবে এক আয়াতও যথেষ্ট হবে। কারণ একটি আয়াত হাকীকাতান ও হুকমান উভয়ভাবেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। হাকীকাতান কুরআন হওয়া তো যাহির। হুকমান কুরআন এভাবে যে, এক আয়াতের কিরাআত হায়িয়া এবং জুনুবীর উপর হারাম। সুতরাং **فَأَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** -এর ইতলাকের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন **فَأَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** আয়াতটি হলো মুতলাক। এর মধ্যে তাফসীল করা হয়নি। তাহলে যেমনিভাবে এক আয়াতের কমও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট তেমনিভাবে এক আয়াতের কমও নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা ইতলাক উভয়টাকেই শামিল করে। অথচ **مَادُونَ الْآيَةَ** দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না, তাহলে তো এক আয়াত দ্বারাও নামাজ জায়েজ না হওয়া উচিত। অথচ ইমাম সাহেব জায়েজ হওয়ার কথা বলেন। এর জবাব হলো, **مَادُونَ الْآيَةَ** সর্বসম্মতিক্রমে **مِنَ الْقُرْآنِ** -এর ইতলাকের মধ্যে দাখিল নয়। কেননা মুতলাকান যখন বলা হয় তখন তার দ্বারা **كامل فرد** মুরাদ হয়। আর কুরআনের **كامل فرد** হলো যা হাকীকাতান ও হুকমান উভয়ভাবেই কুরআন। আর **مَادُونَ الْآيَةَ** যদিও হাকীকাতান কুরআন কিন্তু হুকমান কুরআন নয়। এ কারণে **مَادُونَ الْآইَةَ** -এর কিরাআত জুনুবী ও হায়িয়ার জন্য জায়েজ। সুতরাং **مَادُونَ الْآيَةَ** সর্বসম্মতিক্রমে **مِنَ الْقُرْآنِ** -এর ইতলাকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখন যদি বলে যে, যখন **مَادُونَ الْآيَةَ** -এর ইতলাকের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখনতো এক পূর্ণ আয়াতকেও তার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়? এর জবাবে হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এক পূর্ণ আয়াত **مَادُونَ الْآيَةَ** -এর সমার্থক নয়। এ কারণে এক পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশ বিশেষের সাথে সংযুক্ত হবে না।

**وَرَوَى السَّفَرِيُّ بِقَرَأَتِهَا بِغَيْرِ الْخ** : উপরোক্ত ইবারতে গ্রন্থকার সফরের অবস্থায় নামাজের কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাই গ্রন্থকার বলেন, সফরের অবস্থায় মাসনুন কিরাআত হলো, সূর্যোদয় ফাতিহা এবং যে কোনো সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। যদি ছোট ছোট সূরা পড়া হয় তবুও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কেননা বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ **ﷺ** সফর অবস্থায় ফজরের নামাজে **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** পড়েছেন। এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের শেষে রয়েছে **صَلَّى بِهِمَا** সকালের নামাজের জন্য অবতরণ করলেন তখন তিনি লোকদেরকে এ দুই সূরা দ্বারা নামাজ পড়িয়েছেন। আকলী দলিল হলো, নামাজের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সুতরাং যখন সফরের নামাজ অর্ধেক করার ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে তখন কিরাআত তাখফীফ ক্ষেত্রেও এর অবশ্যই প্রভাব থাকবে। মোট কথা, যখন সফরের কারণে মূল নামাজে তাখফীফ তথা কম হয়ে গেছে তখন তার **وصف** তথা কিরাআতের মধ্যে অবশ্যই তাখফীফ হবে। সাহেবে হিদায়া বলেন, এ পরিমাণ তাখফীফ তখন, যখন এ ব্যক্তি তাড়াহুড়ার অবস্থায় থাকে। আর যদি নিরাপদ ও শান্তির পরিবেশে থাকে যেমন- সে কারো ঘরে অবস্থান করে, মনে মনে ইরাদা করছে যে, এখানে কিছুক্ষণ থেকে ইতমিনানের সাথে রওয়ানা হবে তখন এ অবস্থায় ফজরের নামাজে **ذَاتِ الْبُوجِ** এবং **أَنْشَأَتْ** **إِذَا السَّمَاءُ انشأَتْ** **وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُوجِ** পড়বে। কেননা এ সূরতে তাখফীফও হবে এবং সুন্নতও আদায় হবে।

وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَارِعَتَيْنِ آيَةً أَوْ خَمْسِينَ آيَةً سَوَى  
 فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُرْوَى مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ وَمِنْ سِتِّينَ إِلَى مِائَةٍ وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ  
 الْأَثَرُ وَجْهَ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ يَقْرَأُ بِالْأَرْبَعِينَ مِائَةً وَبِالْخَمْسِينَ أَرْبَعِينَ وَبِالْأَوْسَاطِ مَا بَيْنَ  
 خَمْسِينَ إِلَى سِتِّينَ وَقِيلَ يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيَالِي وَقَصَرِهَا وَالْيَ كَثْرَةِ الْأَشْغَالِ  
 وَقِلَّتِهَا قَالَ وَفِي الظُّهْرِ مِثْلُ ذَلِكَ لِاسْتَوَانِهِمَا فِي سَعَةِ الْوَقْتِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ  
 دُونَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْأَشْغَالِ فَيَنْقُصُ عَنْهُ تَحَرُّزًا عَنِ الْمَلَالِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ سَوَاءً  
 يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمَفْصَلِ وَفِي الْمَغْرِبِ دُونَ ذَلِكَ يَقْرَأُ فِيهَا بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ  
 وَالْأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ (رض) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) أَنْ أَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ  
 وَالظُّهْرِ بِطَوَالِ الْمَفْصَلِ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمَفْصَلِ وَفِي الْمَغْرِبِ  
 بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ وَلَآنَ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعَجَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ أَلْيَقُ بِهَا وَالْعَصْرُ  
 وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا التَّأَخِيرُ وَقَدْ بَقِعَانِ بِالتَّطْوِيلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبٍّ  
 فَيُرْقَتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ وَطَوِيلُ الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ إِعَانَةً  
 لِلنَّاسِ عَلَى إِذْرَاكِ الْجَمَاعَاتِ -

**অনুবাদ :** মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকআতে সূরায় ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ বা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। চল্লিশ থেকে ষাট এবং ষাট থেকে একশ আয়াত পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে। আর এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীস এসেছে। বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, (কিরাআত শ্রবণে) আগ্রহীদের ক্ষেত্রে একশ আয়াত এবং অলসদের ক্ষেত্রে চল্লিশ আয়াত এবং মধ্যমদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পাঠ করবে। কারো কারো মতে রাত ছোট বড় হওয়া এবং কর্মব্যস্ততা কমবেশি হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জোহরের নামাজেও অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করবে। কেননা সময়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে উভয় নামাজ সমান। মাঘসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, কিংবা তার চেয়ে কম। কেননা তা কর্মব্যস্ততার সময়। সতুরাং অনীহা এড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ফজর থেকে কমানো হবে। আসর ও ইশা একই রকম। দুটোতেই আওসাতে মুফাসসাল পাঠ করা হবে। আর মাগরিবে তার চেয়ে কম অর্থাৎ তাতে কিসারে মুফাসসাল পাঠ করবে। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর নামে প্রেরিত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর এই মর্মে লিখিত পত্র যে, ফজরে ও জোহরে তিওয়ালে মুফাসসাল পড়ো আর আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাসসাল পড়ো এবং মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল পড়ো। তা ছাড়া মাগরিবের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। সূতরাং হালকা কিরাআতই এর জন্য অধিকতর উপযোগী। আর আসর ও ইশায় মোত্তাহাব হলো বিলম্বে পড়া। আর কিরাআত দীর্ঘ করলে দু'টি নামাজই মোত্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। সূতরাং এ দুই নামাজে আওসাতে মুফাসসাল নির্ধারণ করা হয়। ফজরের প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে। যাতে লোকদের জামাআত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

إِنْ قَوْمَهُ شَكُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَطْوِيلَ قِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَفَتَأَنَّ أَنْتَ بِأَمْعَادِ ابْنِ  
أَنْتَ مِنْ سَبْعِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضَعَهَا

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর কাউমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল যে, মুয়ায ইশার নামাজে খুব দীর্ঘ ক্বিরাআত পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযকে বললেন, হে মুয়ায! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় নিষ্কেপ করতে চাও? কোথায় তুমি رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ وَ النَّفْسِ وَضْعَهَا ۖ وَ نَبِيَّكَ اِسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ থেকে? অর্থাৎ এ দু'টো সূরা কেন পড়ো না? মোট কথা, উপরোক্ত রিয়্যায়াতদ্বয় দ্বারা বৃথা গেল আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্সালের সাথে ক্বিরাআত পড়া ভালো ও মোস্তাহাব। আর মাগরিবের নামাজে কিসারে মুফাস্সালের সাথে ক্বিরাআত পড়বে। দলিল হলো নিম্নোক্ত রিয়্যায়াতে قَرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَلَوةِ الْمَغْرِبِ بِالْمَعْرُودَتَيْنِ ۖ মাগরিবের নামাজে মু'আওওয়াতাইন পড়তেন।

হিদায়া যাহুকার বলেন, সকল নামাজের মোস্তাহাব ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে দলিল হলো- ঐ ফরমান যা খলীফায়ে ছানী আমীরুল মু'মিনীন সায্যিদিনা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবু মূসা আশু'আরীর নামে প্রেরণ করেছিলেন। আর সে ফরমানটি হলো নিম্নরূপ

أَن قَرَأَ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بِطَوَالِ الْمَفْصَلِ وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمَفْصَلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقَصَارِ الْمَفْصَلِ -

অর্থাৎ জোহর ও ফজরে তিওয়ালে মোফাস্সাল থেকে পড়বে। আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবের নামাজে কিসারে মুফাস্সাল থেকে পড়বে।

আকলী দলিল হলো, মাগরিবের নামাজের তিওই হলো দ্রুততার উপর। আর দ্রুততার জন্য মুনাসিব হলো হালকা ক্বিরাআত। আসর ও ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। ক্বিরাআত যদি দীর্ঘ করে আরম্ভ করা হয় তবে এ দুই নামাজ মোস্তাহাব ওয়াস্ত অতিক্রম করে অন্য ওয়াস্তে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ জন্য এ দুই নামাজে আওসাতে মুফাস্সালকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

**ফায়েদা :** তিওয়ালে মুফাস্সাল হলো সূরায়ে হুজুরাত হতে ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ পর্যন্ত, আর আওসাতে মুফাস্সাল হলো সূরায়ে তারিক থেকে لَمْ يَكُنْ سূরা পর্যন্ত, আর কিসারে মুফাস্সাল হলো সূরায়ে যিলযাল থেকে শেষ পর্যন্ত। কোনো কোনো ফুকাহাদের রায় হলো সূরায়ে হুজুরাত থেকে সূরায়ে আবাসা পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাস্সাল। আর إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ থেকে وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ পর্যন্ত আওসাতে মুফাস্সাল। আর وَالضُّحَىٰ থেকে শেষ পর্যন্ত কিসারে মুফাস্সাল। আবাক্যাটি দ্বারা একটি মাসআলা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মাসআলাটি হলো, ফজরের প্রথম রাকআতে দীর্ঘ ক্বিরাআত পড়বে আর দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের তুলনায় ছোট ক্বিরাআত পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ ভরীকা চলে এসেছে। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এটি লোকদের জামাআত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

قَالَ وَرَكَعَتَا الظُّهْرِ سَوَاءٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُطِيلَ الرَّكَعَةُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكَعَتَيْنِ اسْتَوَيَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِرَاءَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمِقْدَارِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ وَالْحَدِيثُ مُحْمُولٌ عَلَى الْإِطَالَةِ مِنْ حَيْثُ الثَّنَاءُ وَالْتَعَوُّدُ وَالتَّسْمِيَةُ وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِعَدَمِ امْكَانِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, জোহরের উভয় রাকআত সমান। তা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সব নামাজেই প্রথম রাকআতকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করা আমার কাছে পছন্দনীয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ সব নামাজেই প্রথম রাকআতকে অন্য রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। শায়খাইনের (র.) দলিল হলো, উভয় রাকআতই কিরাআতের সমান হকদার। সুতরাং পরিমাণের ক্ষেত্রেও উভয় রাকআত সমান হতে হবে। তবে ফজরের নামাজ এর বিপরীত। কেননা তা ঘুম ও গাফলতের সময়। আর উদ্ধৃত হাদীসটি ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আর কমবেশির ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। কেননা আনায়ালে এতটুকু কমবেশি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরের মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে যে, ফজরের নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রাকআতের কিরাআত দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ হবে। কিন্তু ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে শায়খাইন-এর মায়হাব হলো হলো, উভয় রাকআত সমান হবে। প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় দীর্ঘ করা মোস্তাহাব। তাঁর দলিল হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস *النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا*। এ জন্য পুরো নামাজে লোকদেরকে শরিক করার জন্য প্রথম রাকআতকে দীর্ঘ করা হবে। আবু কাতাদার হাদীসের জবাব হলো হলো, প্রথম রাকআতকে এ কারণে দীর্ঘ করা হয়েছে যে, তাতে ছানা, আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়া হয়, যা অন্যান্য রাকআতে পড়া হয় না। আর কিরাআতের পরিমাণের হকের ক্ষেত্রে উভয় রাকআত সমান। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কমবেশির ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যদি এক রাকআতে তিন আয়াতের বেশি পড়া হয় দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায়, তবে এ বেশি ধর্তব্য হবে। আর যদি এক বা দুই আয়াত হয় তখন তা কোনো ধর্তব্য হবে না। বরং তা সাকিত হয়ে যাবে। কেননা এতটুকু থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর শরিয়তে ইসলামি কষ্টকে দূর করেছে। তাই এ কমবেশির কষ্টকেও দূর করে দিয়েছে। সহীহ রিওয়াযাতে রয়েছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই মাগরিবের নামাজে *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ* *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ* আর *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ* পড়েছেন। অথচ *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ* এর মধ্যে পাঁচ আয়াত আর *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ* এর মধ্যে ছয় আয়াত রয়েছে। অর্থাৎ সূরায়ে নাস-এর মধ্যে সূরায়ে ফালাকের তুলনায় এক আয়াত বেশি।



وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا تُحْزَرُ غَيْرُهَا لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا  
وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَقَّتْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ الْبَاقِي وَإِنِّهِمَا  
التَّفْضِيلُ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي الْفَاتِحَةِ لَهُ أَنْ الْقِرَاءَةُ  
رُكْنٌ مِنَ الْأَرْكَانِ فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ  
لَهُ قِرَاءَةٌ وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَكِنْ حُظُّ الْمُقْتَدِي  
الْإِنصَاتِ وَالْإِسْتِمَاعِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَاسْتَحْسِنُوا عَلَى سَبِيلِ  
الْإِحْتِيَاظِ فِيمَا يُرَوَّى عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ -

অনুবাদ : আর কোনো নামাজের সাথে এমন কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই যে, এটি ছাড়া নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা আমরা পূর্বে যে তায়াত মাকরুহ (ফারুওয়া মা তিব্বর মিন লুল্লাহ) পেশ করেছি তা নিঃশর্ত; বরং কোনো নামাজের জন্য কুরআনের কোনো অংশকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরুহ। কেননা তাতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয় এবং বিশেষ সূরার ফজিলতের ধারণা জন্মে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করবে না। সূরায় ফাতিহার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর দলিল হলো, কিরাআত হলো নামাজের অন্যান্য রোকনের মতো একটি রোকন। সুতরাং তা পালনে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরিক থাকবে না। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : **قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ** যে ব্যক্তির ইমাম রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআত তার কিরাআত রূপে গণ্য এবং এর উপরই সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কিরাআত হলো উভয়ের মাঝে শরীকানামূলক রোকন। তবে মুক্তাদীর অংশ হলো নীরব থাকা ও মনোযোগসহ শ্রবণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا** (ইমাম) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা খামুশ থাকবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তা মাকরুহ। কেননা এ সম্পর্কে হুশিয়ারী রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো নামাজে কোনো সূরাকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা যে, এ সূরা ছাড়া নামাজই জায়েজ হবে না, এমনটি করা জায়েজ নেই। দলিল আদ্বাহ তা'আলার বাণী **قَارِئُ الْقُرْآنِ** আয়াতটি মুতলাক। আর মুতলাকে চাহিদা হলো কোনো সূরা নির্দিষ্ট না করা। তা ছাড়া কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরা বা আয়াতকে নির্ধারিত করা মাকরুহ। কারণ একেতো এতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয়। দ্বিতীয়ত এতে বিশেষ কোনো সূরার ফজিলতের ধারণা জন্মে যায়। অথচ ফজিলতের দিক থেকে পুরো কুরআন সমান।

**قَوْلُهُ لَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ** : ইমাম কুদ্দী (র.) আহনাফের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুক্তাদী ইমামের পিছনে আদৌ কিরাআত পড়বে না। ফাতিহা ও না বা অন্য কোনো সূরাও না। নামাজ জেহরী হোক বা সিররী হোক। সূরায় ফাতিহার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বি-ত রয়েছে অর্থাৎ তার মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বিমত তো হলো মুক্তাদীর উপর সিররী নামাজ এবং যে সকল রাকআতে জেহরী কিরাআত নেই সেগুলোতে সূরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটাই ইমাম মালিক (র.)-এরও মত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দ্বিমত এবং সহীহ মাযহাব হলো, মুক্তাদীর উপর প্রত্যেক নামাজে সূরায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, নামাজ জেহরী হোক বা সিররী হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর আকলী দলিল হলো, কিরাআত একটি রোকন আর সমস্ত রোকনের মধ্যে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরিক। যেমন- ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদিতে উভয়ে শরিক। তাহলে কিরাআতের মধ্যেও উভয়ে শরিক



وَسَتَمِعُ وَيُنصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ لِأَنَّ الْإِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَرَضٌ بِالنِّصِّ وَالْقِرَاءَةِ وَسَوَّالُ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّدُ مِنَ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُخِلٌّ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَرَضِيَّةِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخُطْبُ قَوْلَهُ تَعَالَى بِآيَتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ آيَةً فَيَصَلِّي السَّامِعُ نَفْسَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّائِي عَنِ الْمُنْبِرِ وَالْأَحْوُطُ هُوَ السُّكُوتُ إِقَامَةً لِفَرَضِ الْإِنْصَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ -

অনুবাদ : আর মনোযোগ সহকারে শুনে এবং নীরব থাকবে। যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পাঠ করেন। কেননা নীরবে শ্রবণ ও নীরবতা আয়াত দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। আর নিজে পাঠ করা, কিংবা জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সকল এতে বাধা সৃষ্টি করে। খুতবার হুকুমও অনুরূপ। তেমনি হুকুম মহানবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করার সময়ও। কেননা মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করা ফরজ। তবে যদি খতীব এ আয়াত পড়েন তখন শ্রোতা মনে মনে দরুদ পড়বে। অবশ্য মিস্বার থেকে দূরের লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নীরব থাকার মধ্যে ইহতিয়াত রয়েছে। যাতে (কমপক্ষে) খামুশ থাকার ফরজ পালিত হয়। সঠিক বিষয় আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদী খুব মনোযোগসহ তা শুনে এবং খামুশ থাকবে, যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পড়েন। দলিল হলো, মনোযোগসহ শুনা এবং খামুশ থাকা কুরআনের আয়াত الْقُرْءَانَ الْقُرْءَانَ দ্বারা সাবিত। আর ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া, জান্নাত প্রার্থনা করা, জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সবগুলো মনোযোগ এবং খামুশের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্য এ সবগুলো না করা উচিত। ইমাম অথবা মুনফারিদ জান্নাত প্রার্থনা বা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কিতাবে কোনো কিছুই নেই। তবে ইনাযা গ্রন্থকার লিখেছেন, ইমাম এ কাজগুলো ফরজ ও নফল কোনো নামাজেই করতে পারবে না। কেননা এগুলো না রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে না রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইমামের এভাবে দোয়া করা দ্বারা মুক্তাদীদের উপর নামাজ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এটা হলো মাকরুহ। এ জন্য ইমাম এগুলো করবে না। এমনিভাবে মুনফারিদও যখন ফরজ নামাজ আদায় করবে তখন নামাজের মাঝখানে এ দোয়াগুলো করবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর কোনো ইমাম থেকে এর বর্ণনা নেই। আর যদি নফল পড়ে তখন জান্নাত প্রার্থনা করা জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া ইত্যাদি করা উত্তম। এ জন্য যে, হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে এক হাদীস বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ اللَّيْلِ فَمَا مَرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَفْتُ وَرَأَيْتُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَمَا مَرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ذِكْرُ النَّارِ إِلَّا وَقَفْتُ وَتَعَوَّدْتُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

হযাফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাতের নামাজ পড়েছি। যখনই জান্নাতের কোনো আয়াত আসতো তিনি থামতেন এবং আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য আবেদন করতেন। এমনভাবে যখনই জাহান্নাম সম্পর্কিত কোন আয়াত আসত তখনই তিনি থামতেন এবং জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিতেন। এমনভাবে খতীবের খুতবার সময় লোকেরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে আর খামুশ থাকবে। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْأَمَامِ بِخَطْبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا صَلَوةَ لَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি খুতবার মাঝখানে তার সাথীকে বলে খামুশ থাকো। সে অহেতুক কাজ করল। আর যে ব্যক্তি অহেতুক কাজ করল তার নামাজ হলো না। এমনভাবে ইমাম যদি তার খুতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরদ পড়ে তখনও লোকেরা মনোযোগসহ শুনবে আর চুপ থাকবে। দলিল হলো, النَّبِيُّ ﷺ ফরজ নয়; কিন্তু খুত্বা শুনা ফরজ। তাই গায়রে ফরজের কারণে ফরজকে তরক করা যাবে না। হ্যাঁ খতীব যদি খুতবার মাঝখানে নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

তখন শোতা মনে মনে দরদ শরীফ পড়বে। মোট কথা, খুত্বার মাঝখানে দরদ পড়া নিষিদ্ধ। তবে খতীব যখন উপরোক্ত আয়াত পড়ে তখন এর হুকুম ভিন্ন হবে। দলিল হলো, খতীব আল্লাহ তা'আলার নিকট হিকায়াত করতেছে যে, তিনি صَلَوةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ করতেছেন। ফেরেশতাদের কাছেও হিকায়াত করতেছেন যে, তিনি দরদ পড়তেছেন। আর এ কথারও হিকায়াত করতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দরদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অবস্থা হলো, খতীব নিজেই দরদ শরীফে মশগুল। তাই মুসল্লীদের উপরও ওয়াজিব যে, তারা যেন দরদে মশগুল হয়ে যায়। তবেই তো ঐ জিনিস সাব্যস্ত হয়ে যাবে যা তার কাছে চাওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত হুকুমটি হলো তখন যখন মুসল্লী মিশরের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করে। আর যদি মিশর থেকে দূরে থাকে তখন তার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। অর্থাৎ যদি মিশর থেকে এ পরিমাণ দূরে হয় যে খুত্বা শুনতে পায় না তখন এ সূরতে কুরআন পড়া উত্তম না খামুশ থাকা উত্তম এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ থেকে বর্ণিত আছে যে খামুশ থাকা উত্তম। এ মতটি ইমাম কারবী (র.)-ও গ্রহণ করেছেন এবং এটা মুসান্নিফ (র.)-এরও মুখতার বা পছন্দনীয় মাহযাব। দলিল হলো হলো, কুরআনের কিরাআতের সময় মনোযোগসহ শুনা বা খামুশ থাকা দু'টো ফরজ ছিল। কিন্তু দুয়ের কারণে শুনা সম্ভব নয় তবে অপর ফরজ খামুশ থাকা সম্ভব। তাই খামুশই থাকবে। ইমাম ফযলী (র.) বলেন, কিরাআতে কুরআন উত্তম। দলিল হলো, খামুশ থাকার নির্দেশ এ কারণে ছিল যে, যাতে কুরআন শুনে তাদাব্বুর তথা চিন্তা-গবেষণা করে। আর এখন যেহেতু শ্রবণের বিষয়টি ফউত হয়ে গেল তাই কুরআনের কিরাআত করবে, যাতে কুরআন পড়ার ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়।

## بَابُ الْإِمَامَةِ

الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لَا يَتَخَلَفُ عَنْهَا إِلَّا الْمُنَافِقُ وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَقْرَهُمْ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا يَدُ مِنْهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ وَنَحْنُ نَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهَا لِرُكْنٍ وَاحِدٍ وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ -

### অনুচ্ছেদ : ইমামত

অনুবাদ : জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— জামাআত সুন্নতে হুদা তথা সুন্নতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। মুনাফিক ব্যতীত কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকে না। ইমামতির সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি নামাজের মাসাইল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যিনি কিরাআতে সর্বোত্তম। কেননা নামাজে কিরাআত অপরিহার্য। আর ইলমের প্রয়োজন হয় কোনো ঘটনার উদ্ভব ঘটলে। এর উত্তরে আমরা বলি, এক রুকন আদায়ের জন্য কিরাআতের প্রয়োজন আর ইলমের প্রয়োজন সকল রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার পূর্বে ইমামের আলাচনা করেছেন অর্থাৎ উজ্জবে জেহের, উজ্জবে ইখফা, তাজ্জীদে কিরাআত ইত্যাদি এবং মুক্তাদীর আলাচনা করেছেন— অর্থাৎ উজ্জবে ইস্তিমা ও ইনসাত-এর আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায় থেকে তিনি مُشْتَرِعِينَ إِمَامَتٍ-এর সীফাত-এর আলোচনা শুরু করছেন। তাই সর্বাত্মক مُسْتَحِقِّ إِمَامَتٍ-এর আলোচনা এবং এরপর ইমামতের أخِصَاص-এর আলোচনা করেছেন। জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআত সুন্নাতে হুদার অন্তর্ভুক্ত তা থেকে একমাত্র মুনাফিকই পিছনে থাকে। সুন্নত দুই প্রকার। এক. سُنَّةٌ زَائِدَةٌ দুই سنت হুদী সুন্নতে হুদা বলা হয় যা রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবাদত হিসেবে নিয়মিত করেছেন। তবে কদাচিৎ ছেড়েও দিয়েছেন। ইহা তরক করা গুমরাহী। এটা শাআয়িরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আর সুন্নতে যাযিদা হলো যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদত হিসেবে করেছেন। তা তরক করলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন তাহাজ্জুদের নামাজ। মোট কথা, জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, ওজর ব্যতীত তরক করা জায়েজ নেই। এমনকি যদি শহরের লোকেরা জামাআতকে তরক করে তখন তাদেরকে ইকামতে জামাআতের নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি তারা এর উপর আমল করে তবে খুবই ভালো। নতুবা তাদের সাথে লড়াই করা বৈধ হবে। জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়ার সমর্থন ঐ সকল হাদীসে পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে জামাআতের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন— صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ يَخْمَسُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً- জামাআতে নামাজ পড়তে একাকী নামাজ পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি ফজিলত রয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, সাতাশ গুণ বেশি ছুওয়াব রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) উভাই ইবনে কা'বের হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, صَلَوةُ الرَّجُلِ مَعَ رَجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَوةِ رَجُلٍ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَوةِ رَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ وَمَا زَادَ لَهُمَا أَكْبَرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى দুইজনের জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম একজনের নামাজ পড়া থেকে। আর তিনজনের জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম দুইজনের জামাআত থেকে। জামাআত লোক যত বেশি হবে তা আত্মার নিকট তত বেশি পছন্দনীয় হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) غير رواية اصول-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, জামাআত ওয়াজিব। আর আহনাফের

[illegible]

وَأَوَّلَى النَّاسِ الْحَاجَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ: ইমামতির জন্য সর্বাধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি যে সুন্নতের ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞানী। অর্থাৎ এ সকল শরয়ী আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- নামাজের শারায়তে, নামাজের আরকান, নামাজের সুনান এবং নামাজের আদাব ইত্যাদি। তবে শর্ত হলো مَا جُزَّ بِه الصَّلَاةُ পরিমাণ কিরাআতে পারদর্শী হতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েতে হলো, ইমামতের অধিক যোগ্য ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন পাঠে সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো প্রয়োজন অনুযায়ী ইল্ম থাকতে হবে। তাঁর দলিল হলোঃ কিরাআত নামাজের এমন একটি রুকুন, যা ছাড়ার কোনো উপায় নেই। আর ইলমের জরুরত তো তখন দেখা দেয় যখন কোনো ঘটনা ঘটে যায়। যাতে ইল্ম দ্বারা নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করা যায়। আর এ ধরনের ঘটনা নামাজের ভিতর কখনো ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। বুঝা গেল সুন্নতের তুলনায় কিরাআতের ইলম অধিক প্রয়োজন। এ জন্য أَقْرَأَ -كَلِمَةً- عَلَّمَ بِالسَّنَةِ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তরফাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে-এর জবাবে বলব যে, কিরাআতের প্রয়োজন শুধু একটি রুকনের ক্ষেত্র আর ইলমের প্রয়োজন সকল রুকনের ক্ষেত্র। কেননা নামাজ ফাসিদকারী বস্তুর ইলম দ্বারা জানা যায় আবার নামাজ সহীহকারী বস্তুও ইল্ম দ্বারা জানা যায়। বুঝা গেল ইলমের জরুরত কিরাআতের তুলনায় বেশি। এ জন্য أَقْرَأَ-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তরফাইন (র.)-এর সমর্থন হাকিমের রিওয়ায়াতেও বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন، يَوْمَ الْقَوْمِ أَدْفَمُهُمْ حَجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْبَهُهُمْ فِي الدِّينِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِتْنَةِ سَوَاءً فَأَقْرَأَهُم لِقُرْآنٍ (شرح) اَنَّهُ فَيِ كَاؤُمَرِ الْإِيمَانِ تَبِينِي سَرْبَاغْرِ الْهَيْجَرَتِ كَرِهْتَنِ۔ যদি হিজ্রতে সবাই সমান হয় তবে ইলমের দ্বারা (বিশুদ্ধতম কুরআন) (দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি) ইমামত করবে। যদি ফিকায় সবাই সমান হয় তবে লِقْرَان (বিশুদ্ধতম কুরআন পাঠকারী) ইমামত করবে। এ হাদীসে الدِّينِ -কَلِمَةً- اقْرأ-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ইয়রত আনাস (রা.)-এর হাদীস- اِنَّ الدِّينَ جَعَلُو الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اَرْبَعَةَ كَلِمَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ اَبَى بِنِ كَنْبٍ وَمَعَادُ (রা.)-এর হাদীস- رَسَالَاتِهِ بَيْنَ جِبَلٍ وَ زَيْدٌ بَيْنَ نَابِئٍ وَأَبُو زَيْدٍ فَهُلَا اَخْتَرُ قِرَاءَةً مِنْ ابْنِ بَكْرِ (رض) حَتَّى قَالَ اللَّهُ اَقْرَأْ كَمَا ابْنِي۔ যুগে চার ব্যক্তি জামে কুরআন ছিলেন। আর তারা চারজনই আনসারী ছিলেন, (চারজন হলেন) উবাই ইবনে কাব, মুয়ায ইবনে জাবাল, য়ায়েদ ইবনে সাবিত এবং আবু য়ায়েদ (রা.)। এ চার জনই আবু বকর (রা.)-এর তুলনায় কুরআনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। এতদসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতের জন্য সিদ্ধীকে আকবর (রা.)-কে সামনে অগ্রসর করে দিলেন। বুঝা গেল, যখন اقْرأ -كَلِمَةً- عَلَّمَ সমান হয়ে যায়, তখন عَلَّمَ-কে প্রাধান্য দেয়া হবে اقْرأ-এর উপর।

فَإِنْ تَسَاوَوْا فَاقْرَأُوهُم لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقَوْمِ اقْرَأُوا هُمْ يُكْتَبُ اللَّهُ فَإِنْ  
 كَانُوا سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَنِ وَأَقْرَأُوهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتْلَقُونَهُ بِأَحْكَامِهِ  
 فَقَدِمَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا كَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلَمَ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَوْزَعُهُمْ لِقَوْلِهِ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيَّ فَكَانَمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ فَإِنْ تَسَاوَوْا  
 فَاسْتَنْهَمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِنِّي أَبَى مُلْكِكَ وَلِيَوْمُكُمْ أَكْبَرَكُمْ إِنِّسًا وَلَإِنْ فِي  
 تَقْدِيمِهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ وَكَرَّهُ تَقْدِيمَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعْلِيمِ وَالْأَعْرَابِيُّ لَأَنَّ  
 الْغَالِبَ فِيهِمُ الْجَهْلُ وَالْفَاسِقُ لِأَنَّهُ لَا يَهْتِمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ وَالْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى  
 النَّجَاسَةَ وَلَوْلَا الزَّيْنَةُ لَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يَشْفِقُهُ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ وَلَإِنْ فِي تَقْدِيمِ  
 هَؤُلَاءِ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ وَإِنْ تَقَدَّمُوا جَارَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ  
 بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَلَا يَطْوِلُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ  
 صَلَاةَ أَوْعَفِهِمْ فَإِنْ فِيهِمُ الْمَرِيضُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ -

অনুবাদ : ইলমের ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে যিনি কিরাআতে সর্বোত্তম তিনিই অগ্রগণ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহর কিতাব পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি কাওমের ইমাম হবে। যদি এতে সকলে বরাবর হয় তাহলে সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি (ইমাম হবে)। উল্লেখ্য যে, সে যুগে কিতাবুল্লাহ পাঠে উত্তম ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞানীও হতেন। কেননা তারা আহকাম ও মাসায়িলসহ কুরআন শিক্ষা করতেন। তাই হাদীসে কিতাবুল্লাহ পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে অবস্থা সেরূপ নয়। তাই আমরা (দীনী ইলমে) সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে (তিনিই ইমাম হবেন) যিনি অধিক পরহেযগার। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি একজন পরহেযগার আলিমের পিছনে নামাজ আদায় করল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামাজ আদায় করল। এ ক্ষেত্রেও সকলে সমান হলে যিনি অধিকতর ব্যয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই অগ্রগণ্য। কেননা মহানবী ﷺ আবু মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন وَلَيَوْمُكُمْ أَكْبَرَكُمْ إِنِّسًا তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই যেন ইমামতি করে। তা ছাড়া ব্যয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামাআতে লোক সমাগম অধিক হয়। গোলামকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো মাকরুহ। কেননা শিক্ষালাভের জন্য (সাধারণত) সে সুযোগ পায় না এবং বেদুঈন (গ্রাম্য)-কেও (ইমামতির জন্য দেওয়া মাকরুহ)। কেননা মূর্খতাই তাদের মাঝে প্রবল এবং ফাসিককেও (ইমামতির জন্য দেওয়া মাকরুহ)। কেননা সে দীনী বিষয়ে যত্ববান নয় এবং অন্ধকেও কেননা সে পূর্ণ রূপে নাপাকি থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। আর জারজ সন্তানকেও। কেননা তার পিতা (ও অভিভাবক) নেই, যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। অতএব অজ্ঞতাই তার উপর প্রভাবিত হয়। তা ছাড়া এদের আগে বাড়ানোর কারণে জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ এদের প্রতি অশ্রদ্ধাবশত জামাআতে মানুষ কম আসবে) সুতরাং তা মাকরুহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নামাজ আদায় করবে নেককার বদকার যে কোনো ব্যক্তির পেছনে। ইমাম মুক্তাদীদের নিয়ে নামাজ আদায় করতে দীর্ঘ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করে, সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী নামাজ আদায় করে। কেননা তাদের মধ্যে রুগী, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

عَنْ مَاسْأَلَا هَلَا يَدِي سَكَلَةَ عِلْمًا، كِرَاأَتًا وَ پَرَهَيْغَارِيَةً سَمَانْ هَي تَبَعِ يَمِينِ  
 অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই ইমামতের অধিক যোগ্য হবেন। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মূল্যাকার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন  
 وَبَيْنَكُمْ أَكْبَرُكُمْ سَاقِ দ্বিতীয় দলিল হলো বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামাআতে লোক সমাগম অধিক হয়। উপরে  
 বর্ণিত হয়েছে, জামাআতের মানুষের আধিকা অল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর হাদীসেও এসেছে مَنْ لَمْ يُوَكِّرْ كِبَرًا  
 فَلَيْسَ مِنَّا যে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখায়না সে আমার মধ্য থেকে নয়। সুতরাং তাকে নিজের ইমাম বানানো ঘাড়া তাকে  
 সম্মান প্রদর্শন করা হলো। তবে হিন্দীয়া গ্রন্থকার এ কথা বলেননি যে, যদি বয়সে সকলে সমান হয়। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থকারগণ  
 উল্লেখ করেছেন, যদি সকলে বয়সে সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যিনি উত্তম আখলাকের অধিকারী তিনি ইমামতের জন্য  
 উত্তম হবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- خَيْرُكُمْ أَكْثَرُكُمْ تَوْمَادَةَ মধ্যে সে সর্বোত্তম যার  
 আখলাকে সবচেয়ে উত্তম। আর যদি আখলাকে সকলে সমান হয় তখন তাদের মধ্যে যিনি দৈবতে সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত  
 তিনি ইমামতের অধিক যোগ্য হবেন। যেটা কথা, ইমামতের অধিক যোগ্য তিনি হবেন যিনি, ইল্ম, কীরাত, পরহেয়গারী,  
 বয়োজ্যেষ্ঠতা, আখলাক এবং সৌন্দর্যে অপরাপর সকলের চেয়ে উত্তম হয়। কেননা এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ  
 অনুকরণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমৃত্যু ইমামত করেছেন। উপরোক্ত গুণাবলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের থেকে  
 أَكْثَرُ الْأَكْثَرِ لَا تَنْفَضِلُ  
 অশ্রে ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ



قَوْلُهُ لَا يُطِيعُ الْإِمَامَ بِهِمُ الْعِ إমাম কোনো জামাআতকে নিয়ে নামাজ পড়লে সে নামাজ বেশি দীর্ঘায়িত করবে না। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করে সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী নামাজ আদায় করে, কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং প্রয়োজনযন্ত্র লোকও রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদীসও দলিল হতে পারে। হযরত মুয়ায তাঁর গোত্রের লোকদেরকে লম্বা নামাজ পড়িয়েছিলেন, তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন **أَنْتُمْ أَنْتُمْ بِنَاءُ** এ হাদীসটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এ কথাটিও সাবাত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষজরের নামাযে সূরায় ফালাক ও নাস তিলাওয়াত করেছিলেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর সাহাবায়ের কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি নামাজ খুব সংক্ষেপ করেছেন? তখন তিনি বলেন, বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ ধারা আমার ভয় হয়েছিল তাদের মা যেন ফিতনায় না পড়ে যায়। এতে বুঝা গেল ইমাম মুক্তাদীদের হালাত অনুযায়ী ইমামত করবে।

وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ وَخَذَهُنَّ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ إِرْتِكَابِ مُحَرَّمَ وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وَسَطَ الصَّفِّ فَيُكْرَهُ كَالْعُرَاةِ وَإِنْ قَعَلْنَ قَامَتِ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ لِأَنَّ عَائِشَةَ (رض) فَعَلَتْ كَذَلِكَ وَحَمِلَ فَعْلُهَا الْجَمَاعَةَ عَلَى إِنْجِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَنْفِي التَّقَدُّمَ زِيَادَةَ الْكَشْفِ وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِهِ وَأَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْإِمَامِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهُ يَضَعُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوْ فِي يَسَارِهِ جَازَ وَهُوَ مَسْنِيٌّ لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ -

অনুবাদ : স্ত্রী লোকদের এককভাবে জামাআত করা মাকরুহ। কেননা তা একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয় এবং সেটা হলো কাতারের মাঝে ইমামের দাঁড়ানো। অতএব তা মাকরুহ হবে, যেমন উলঙ্গদের জামাআতের হুকুম। তবে যদি তারা তা করে তাহলে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। আর তাঁর এই জামাআত অনুষ্ঠান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তা ছাড়া এ জন্য যে, আগে বেড়ে দাঁড়ানোতে অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে। যে ব্যক্তি এক মুক্তাদী নিয়ে নামাজ আদায় করবে, সে তাকে তার নিজের ডান পাশে দাঁড় করাবে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুক্তাদী করে নামাজ আদায় করেছেন এবং তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়েছেন। আর সে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তাদী তার পায়ের আঙ্গুল ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। তবে প্রথম মতটি স্পষ্ট। অবশ্য যদি এক মুক্তাদী ইমাম পিছনে তা বামে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তাহলে জায়েজ হবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে সে গুনাহগার হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : স্ত্রী লোকদের একাকী জামাআতে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরীমী। কেননা স্ত্রীলোকদের জামাআত একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। এ জন্য তাদের ইমাম মুক্তাদী স্ত্রীলোকদের আগে দাঁড়াবে অথবা তাদের মাঝে দাঁড়াবে। প্রথম অবস্থায় সতর খুলে যাওয়ার ভয় বেশি। আর সতর খুলে যাওয়াটা হলো মাকরুহ। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইমাম তার স্থান ছেড়ে দেওয়া লাযেম আসে অথচ এটাও মাকরুহ। আর জামাআত হলো সুন্নত। অপর দিকে কায়দা আছে, কোনো মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে সুন্নতকে তরক করা উত্তম। এ জন্য স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে জামাআতের সুন্নতকে তরক করে দেওয়া হয়েছে। আর স্ত্রীলোকদের অবস্থা হলো উলঙ্গদের অবস্থার অনুরূপ অর্থাৎ যেমনিভাবে উলঙ্গদের জামাআত মাকরুহ ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীলোকদের জামাআতও মাকরুহ।

কুদুরী গ্রন্থকার বলেন, মাকরুহে তাহরীমী হওয়া সত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকেরা জামাআত করে তখন ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন হযরত আয়েশা (রা.) জামাআতের সাথে নামাজ পড়েছেন, তাহলে তাদের জামাআত মাকরুহ তাহরীমী কেন? এর জবাব হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুষ্ঠিত জামাআত ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। তবে এ জবাবের উপর পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

নবুওয়তের পর ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। তারপর মদীনায় হযরত আয়েশা (রা.) ৬ বৎসরের সময় তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর ৯ বৎসরের সময় হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একত্রে জীবন যাপন করেন। এতে তো বুঝা যায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জামাআতে নামাজ পড়া বালিগ হওয়ার পর হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় হযরত আয়েশার এ কাজ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে হয়? এর জবাব হলো হলো, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হওয়ার দ্বারা মুরাদ হলো- স্বীলোকদের জামাআতের হুকুম মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ الْخ: যদি কোনো ব্যক্তি একজন মুক্তাদী নিয়ে নামাজ আদায় করে তবে ঐ মুক্তাদীকে তার ডান দিকে দাঁড় করাবে। দলিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীস তিনি বলেন,

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لِأُرَاقِبَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فَاتَّبَعَهُ فَقَالَ نَامَتِ الْعَيْنُونَ وَغَابَتِ التَّجُومُ وَبَقِيَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ثُمَّ قَرَأَ آخِرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مَعْلُوقٍ فَتَوَضَّأَ وَافْتَتَحَ فَقُمْتُ وَوَقَفْتُ عَلَى بَسَارِهِ وَآخَذَ بِأَذُنِي وَأَدَارَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ بَيْتِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

একদা আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত যাপন করলাম, যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামাজ দেখতে পাই। (দেখলাম) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠলেন আর বললেন, চক্ষুসমূহ শুয়ে পড়েছে। তারকারাজি ডুবে গেছে। শুধু حَيُّ الْقَيُّومُ তথা আল্লাহ তা'আলা বাকি আছে। তারপর তিনি সূরায় আলে ইমরানের শেষ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন তথা إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর তিনি একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে অঙ্গু করলেন এবং নামাজ আরম্ভ করলেন। (হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,) আমিও উঠে অঙ্গু করলাম এবং গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কান ধরে পিছনের দিক থেকে ঘুরালেন এবং আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি ইমামের সাথে একজন মুক্তাদী হয় তবে তাকে ডান দিকে দাঁড় করানো উত্তম। যাহিরী রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মুক্তাদী একজন হলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে মুক্তাদী তার পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। প্রথম মতটি হলো যাহিরে রিওয়ায়াতের। আর যদি একজন মুক্তাদী ইমামের পিছনে অথবা বামে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবে নামাজ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের পরিপন্থী করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

وَإِنْ أَمَّ اثْنَيْنِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَتَوَسَّطُهُمَا وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ عَلَى أَنَسٍ وَالْبَيْهَقِيِّ جِئْنَا صَلَّى بِهِمَا فَهَذَا لِلْأَفْضَلِيَّةِ وَالْأَثَرُ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَفْتَدُوا بِأَمْرَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ آخَرَهُنَّ اللَّهُ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمَفْتَرِضِ بِهِ وَفِي التَّرَاوُجِ وَالسَّنَنِ الْمَطْلَقَةِ جَوَازُهُ مَشَائِخُ بَلَخَ (رحا) وَلَمْ يَجُوزْهُ مَشَائِخُنَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ فِي النَّفْلِ الْمَطْلُوقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِأَنَّ نَفْلَ الصَّبِيِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ حَيْثُ لَا يَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَبْنِي الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ بِخِلَافِ الْمَظْنُونِ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ فَاعْتَبِرَ الْعَارِضُ عَدَمًا بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الصَّبِيِّ بِالصَّبِيِّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَّحِدَةً.

অনুবাদ : আর যদি কেউ দুই ব্যক্তির ইমামতি করেন, তাহলে সে তাদের আগে দাঁড়াবেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে। আমাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা.) ও তাঁর এতিমকে নিয়ে নামাজ আদায়ের সময় উভয়ের আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং এ হাদীসের দ্বারা উত্তম প্রমাণিত হয়। আর সাহাবীর আমল দ্বারা এরূপ দাঁড়ানো মুবাহ প্রমাণিত হয়। পুরুষদের জন্য কোনো নারী বা নাবালেগের পিছনে ইক্তিদা দ্বারা জায়েজ নয়। স্ত্রীলোকের পিছনে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মহানবী ﷺ বলেছেন— আল্লাহ যেমন তাদের পিছনে রেখেছেন, তেমনি তোমরাও তাদেরকে পিছনে রাখো। সুতরাং তাদের (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো জায়েজ নয়। আর নাবালেগের পিছনে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, সে নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্দিদা জায়েজ হবে না। তবে তারাবীহ ও নিয়মিত সুন্নত-এর ক্ষেত্রে বালুখ-এর মাশায়িখগণ জায়েজ বলেছেন। আর আমাদের মাশায়িখগণ তা অনুমোদন করেননি। আবার কারো কারো তাহকীক অনুযায়ী সাধারণ নফলের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, কোনো নামাজেই তাদের (ইমামতিতে) জায়েজ নয়। কেননা নাবালেগের নফল বালেগের নফলের চেয়ে নিম্ন মানের। কেননা ইজমায়ী মতানুসারে নামাজ ভঙ্গ করার কারণে নাবালেগের উপর কাজা অপরিহার্য হয় না। আর দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি হতে পারে না। ধারণা ভিত্তিক নামাজ এর ব্যতিক্রম, কেননা (ভঙ্গ হলে কাজা করতে হবে কিনা) এতে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং উদ্ধৃত ধারণা (মুক্তদীর বেলায়) অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত। অবশ্য নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইক্তিদার হুকুম ভিন্ন। (অর্থাৎ জায়েজ) কেননা উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ের।

## শ্রাসনিক আলোচনা

যদি ইমাম ব্যতীত মুক্তাদী দু'জন হয় তবে ইমাম তাদের আগে দাঁড়াবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। আর এভাবে দাঁড়ানো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আর তা হলো, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) আলকামা ও আসওয়াদকে নামাজ পড়িয়েছিলেন। আর তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত আনাস ও এতিম নামক ব্যক্তিকে নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তিনি তাদের আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আগে দাঁড়ানো উত্তম হওয়ার দলিল আর ইবনে মাসউদের আমল মুবাহ হওয়ার দলিল। ইব্রাহীমে নাখ্বী (র.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্থান কম হওয়ার কারণে এমনটি করেছিলেন। এ হিসাবে ইবনে মাসউদের আমল দ্বারা মুবাহও সাবিত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجَالِ أَنْ يَفْعَدُوا الْحِجَابَ: পুরুষদের জন্য কোনো নারী বা নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নয়। স্ত্রীলোকদের পিছনে ইকতিদা না জায়েজ হওয়ার কারণ হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- أَفْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ যেমন তাদেরকে পিছনে রেখেছেন তেমনি তোমরাও তাদেরকে পিছনে রাখো। দলিল হলো এভাবে যে, حَيْثُ শব্দটি দ্বারা মুরাদ হলো مكان বা স্থান। যে সকল স্থানে স্ত্রীলোকদেরকে পিছনে রাখা ওয়াজিব সেগুলো নামাজের স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান নয়। তাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীলোকদেরকে নামাজের স্থানে পিছনে রেখেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুরুষদের ইমাম হওয়ার অধিকার দেননি। কেউ কেউ বলেছেন, حَيْثُ শব্দটি تعليل-এর জন্যে এসেছে এ হিসাবে হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে যে, স্ত্রীলোকদেরকে পিছনে রাখো। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাহাদাত, উত্তরাধিকার রাজত্ব এবং সমস্ত পদে পিছনে রেখেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে পিছনে রেখেছেন, সেহেতু তাদেরকে আগে বাড়ানো তথা ইমাম বানানো জায়েজ হবে না।

নাবালেগের ইমামতি। তা এ কারণে নাজায়েজ যে, সেতো নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ বালেগের ফরজ নামাজ তার পিছনে জায়েজ হবে না। হিদায়া প্রণেতা বলেন, তবে তারাবীহ ও নিয়মিত সুন্নতের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। মাশায়িখে বলখের মতানুযায়ী তারাবীহ এবং সুন্নতে মুতলাকাত তথা নিয়মিত সুন্নতের মধ্যে নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ। আর আমাদের মাশায়িখ তথা মাশায়িখে النهي-এর মতে জায়েজ নেই। سنن مطلقه দ্বারা ঐ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ মুরাদ যা ফারায়িযের আগে এবং পরে প্রবর্তিত হয়েছে। এক রিওয়াযাত অনুযায়ী ঈদের নামাজও সুন্নত। বিতর, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ এবং বৃষ্টির নামাজও সাহেবাইনের মতে সুন্নত। মোট কথা, সুন্নত নামাজে যদি নাবালেগ ইমামত করে তবে মাশায়িখে বলখ-এর মতে বালেগ পুরুষদের জন্য তার ইকতিদা করা জায়েজ। আর النهي-এর মা'রা তথা বুঝা, সমরকন্দ এর ওলামা ও মাশায়িখের মতে নাজায়েজ। মাশায়িখে বলখ ধারণা ভিত্তিক নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। আর ধারণা ভিত্তিক নামাজ হলো, এক ব্যক্তি ধারণা করল যে, তার জিম্মায় ওয়াজিব নামাজ রয়েছে এবং এ ধারণা নিয়ে সে নামাজও শুরু করে দিয়েছে। অতঃপর নামাজের মাঝখানে কোনো কারণ বশত নামাজ ভেঙ্গে পোছে। তারপর তার মনে পড়ল যে, তার জিম্মায় কোনো ওয়াজিব নামাজ ছিল না। এখন নামাজ শুরু করার কারণে এর কাজ করা ওয়াজিব কিনা? এ ব্যাপারে আইখায়ে ছালাছার মতে হুকুম হলো, তার কাজা ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তাকে কাজা ওয়াজিব। অতঃপর নফল আদায়কারী বালেগ ব্যক্তি যদি ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ইকতিদা করে তবে তা জায়েজ হবে। মাশায়িখে বলখ-এর কিয়াসের হাদিস হলো, নফল নামাজ আরম্ভ করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ধারণা ভিত্তিক নামাজ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যেহেতু নফল নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ তাই নফল আদায়কারী ব্যক্তির নাবালেগের পিছনেও ইকতিদা করা জায়েজ হবে। আমাদের মাশায়িখদের মধ্য থেকে কেউ কেউ نفل مطلق-এর সূরতের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে ইখতিলাফের কথা বয়ান করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, نفل-এর মধ্যেও বালেগ পুরুষদের ইকতিদা নাবালেগের পিছনে জায়েজ নেই। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বালেগ পুরুষের ইকতিদা নাবালেগের পিছনে কোনো নামাজেই জায়েজ নেই। চাই নফলে মুতলাক হোক বা মুয়াক্কাত হোক। এটাই **النهر ما وراء** -এর মাশায়িখে কিরামের মায়হাব। এর দলিল হলো, নাবালেগের নফল নামাজ বালেগের নফল নামাজের তুলনায় নিম্ন মানের। কেননা নাবালেগ কোনো কারণে নফল নামাজ ভঙ্গ করলে তার উপর কাজা ওয়াজিব নয়। কিন্তু বালেগের নফল নামাজ ফাসিদ করা দ্বারা কাজা করা ওয়াজিব। আর কায়দা আছে, প্রবলের ভিত্তি দুর্বলের উপর হতে পারে না। এ জন্য বালেগের নফলের ভিত্তি নাবালেগের নফলের উপর করা যাবে না।

بِخَلَايِ الْمَطْنُونِ দ্বারা গ্রন্থকার মাশায়িখে বলখ-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের খোলাসা হলো, বালেগের নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করাকে ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর ইকতিদার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা ধারণা ভিত্তিক নামাজ হলো **مُخْتَلَفٌ فِيهِ** তথা বিরোধপূর্ণ নামাজ। যেমন ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ফাসিদ করার সুরতে 'যান (ظن)' তথা ধারণাকারী ব্যক্তির উপর কাজা করা ওয়াজিব। অথচ নাবালেগের নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ হওয়ার সুরতে কাজা করা ওয়াজিব নয়। তা ছাড়া শিশুকাল এমন ব্যাপার যা বালেগ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং বালেগ ও নাবালেগের নামাজ এক পর্যায়ে হবে না। কেননা ফাসিদ করার সুরতে বালেগের উপর কাজা ওয়াজিব কিন্তু নাবালেগের উপর কাজা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ধারণা ভিত্তিক নামাজ এর ব্যতিক্রম। কেননা উদ্ধৃত ধারণা একটি **عارضى** তথা আকস্মিক জিনিস। তাই তাকে অস্তিত্বহীন (**عدم**) ধরা হয়েছে। সুতরাং এখন নফল আদায়কারী ব্যক্তি যদি ধারণা ভিত্তিক নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করে তখন উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ে হয়ে যাবে। বিশেষ করে ইমাম যুফারের মতানুযায়ী। কেননা ফাসাদের সুরতে উভয়ের উপর কাজা ওয়াজিব। মুদ্বাকথা বালেগ ও নাবালেগের নামাজ এক পর্যায়ে নয়। তবে বালেগ ও **اِفْتِدَاءٌ** -এর নফল নামাজ এক পর্যায়ে বিশেষ করে ইমাম যুফারের মতে। সুতরাং এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় **اِفْتِدَاءٌ** -এর উপর কিয়াস করা **اَلْفَارِقُ سَعِ** -এর বিপরীত নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইকতিদা জায়েজ। কেননা উভয়ের নামাজ এক পর্যায়ে। এ কারণে উভয়ের কারো উপর কাজা ওয়াজিব নয়। সুতরাং এটা দুর্বলের ভিত্তি দুর্বলের উপরই হবে।

وَيَصِفُ الرِّجَالَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ ثُمَّ النِّسَاءَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَلْبِسَنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا  
الْأَحْلَامِ وَالتَّهَى لَأَنَّ الْمَحَازَةَ مُفْسِدَةٌ فَيُؤَخَّرْنَ وَإِنْ حَازَتْهُ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُشْتَرِكَةٌ فِي  
صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتَهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَفْسُدَ وَهُوَ قَوْلُ  
الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِعْتِبَارًا بِصَلَاتِهَا حَيْثُ لَا تَفْسُدُ وَجْهَ الْإِسْتِحْسَانِ  
مَا رَوَيْنَاهُ وَإِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا فَيَكُونُ هُوَ الثَّابِتُ لِفَرَضِ  
الْمَقَامِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاتِهَا كَالْمَأْمُومِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ -

অনুবাদ : প্রথমে পুরুষের কাতার করবে। তারপর নাবালেগ এরপর স্ত্রী লোকেরা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানবানরা যেন আমার কাছাকাছি থাকে। আর যেহেতু নারী পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো নামাজ ভঙ্গকারী, সুতরাং তাদের পশ্চাদবর্তিনী রাখা হবে। যদি স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় আর উভয়ে একই নামাজে শরিক হয় তাহলে পুরুষের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়ত করে থাকেন। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হলো নামাজ ফাসিদ না হওয়া। এবং এটিই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত। স্ত্রীলোকটির নামাজের উপর কিয়াস অনুযায়ী। যেহেতু তার নামাজ ফাসিদ হয় না। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস, যা মাশহুর শ্রেণীভুক্ত, আর সেই হাদীসে পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, স্ত্রীলোককে নয়। সুতরাং পুরুষ হচ্ছে স্বানগত ফরজ বর্জনকারী। সুতরাং তার নামাজই ফাসিদ হবে, স্ত্রীলোকটির নামাজ নয়। যেমন মুজাদী (এর নামাজ ফাসিদ হয়) ইমামের আগে দাঁড়ালে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে ইমামের পিছনে দাঁড়াবার তারতীবি বয়ান করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, ইমামের পিছনে প্রথমে পুরুষেরা দাঁড়াবে। তারপর তাদের পিছনে নাবালেগ দাঁড়াবে। তারপর তাদের পিছনে স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী-  
اَلْأَحْلَامُ وَالتَّهَى اَللَّيْلِيْنِي مِنْكُمْ اَوَّلُوا وَالنِّسَاءُ  
থানো بل শব্দটি امر-এর সীগাহ্‌। ولী থেকে নির্গত। অর্থ হলো কাছাকাছি হওয়া। احلام শব্দটি (بالضم) حُلْم-এর বহুবচন حُلُمُ ঐ জিনিস যা শয়নকারী ব্যক্তি দেখে অর্থাৎ স্বপ্ন। কিন্তু তার অধিকাংশ ব্যবহার বালগের স্বপ্নের উপর হয়।

نهی - শব্দটি نهية-এর বহুবচন: অর্থ-জ্ঞান। এ হিসাবে হাদীসের মর্ম এই দাঁড়ায়- তোমাদের মধ্যে থেকে আমার কাছাকাছি তারা হবে যারা আকিল তথা জ্ঞানবান এবং বালগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক। এখন কেউ যদি বলে যে, এ হাদীস দ্বারা তো পুরুষদেরকে বাচ্চাদের আগে দাঁড়ানো বুঝে আসে কিন্তু বাচ্চাদের স্ত্রীলোকদের আগে দাঁড়ানো তো বুঝে আসে না? তা হলে এর জবাব কি?

এর জবাব হলো, احتمال وجوبیت তথা পুরুষদের সম্ভাবনার কারণে বাচ্চারা (নাবালেগ) পুরুষদের تابع হবে। আর এ সাধারণত منبوع-এর পরে হয়। তাই বাচ্চারা (নাবালেগ-পুরুষদের পরে হবে, আর স্ত্রীলোকদের আগে হবে। অধিকন্তু এর জবাবে এটাও বলা যায় যে, নাবালেগের স্ত্রীলোকদের আগে হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফেয়ল তথা কাকের দ্বারা সাবিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃদ্ধা মহিলাকে ইয়াতীম নামী এক নাবালেগের পিছনে দাঁড় করিয়েছিলেন। সর্বোত্তম দলিল নিম্নের হাদীসটি যা ইমাম আহমদ (র.) তাঁর মুসনাদে আবু মালিক আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই-

إِنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ اجْتَمِعُوا وَاجْعِمُوا نِسَاءَكُمْ وَأَيُّهَا كُمْ حَتَّىٰ أُرِيَكُمْ صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاجْتَمِعُوا وَجَعِمُوا إِنِّهَا هُمْ نِسَاءُهُمْ ثُمَّ تَوَضَّأُوا وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ وَصَفَّ الْوِلْدَانِ خَلْفَهُمْ وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الصِّبْيَانِ .

আবু মালিক আশআরী (র.) বলেন, ওহে আশআরী গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেরাও একত্রিত হও এবং তোমাদের স্ত্রীলোক ও নাবালগদেরকেও একত্রিত করো। আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজ দেখাব। সুতরাং তারা নিজেরাও একত্রিত হলো এবং তাদের নাবালগ শিশু এবং স্ত্রীলোকদেরকেও একত্রিত করল। অতঃপর [আবু মালিক আশআরী (রা.)] অজু করলেন এবং তাদেরকে দেখালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে অজু করতেন। অতঃপর আবু মালেক (র.) আগে গেলেন। প্রথমে পুরুষদের কাতার করলেন। তারপর তাদের পিছনে নাবালগদের। তারপর তাদের পিছনে স্ত্রীলোকদের কাতার করলেন।

আকলী দলিল হলো, নারী পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই স্ত্রী লোকদেরকে সর্বপিছনে দাঁড় করানো হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ حَادَتْهُ إِسْرَاءٌ وَهَذَا الْخ: যদি কোনো স্ত্রীলোক নামাজে কোনো পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় এবং উভয়ে একই নামাজে শরিক হয় আর ইমাম ঐ স্ত্রীলোকের নিয়তও করে, এ অবস্থায় পুরুষের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাধারণ কiyাসের চাহিদা হলো পুরুষের নামাজ ফাসিদ না হওয়া। এই হলো ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও মত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) পুরুষের নামাজকে স্ত্রীলোকের নামাজের উপর কiyাস করেন। অর্থাৎ মুহাযাতের কারণে স্ত্রীলোকটির নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ হয় না তাই পুরুষের নামাজও ফাসিদ হবে না। কiyাসের কারণ হলো, محاذات এমন একটি ফেয়েল যা উভয়ের দ্বারা সাবাত হয় সুতরাং محاذات যখন স্ত্রীলোকের নামাজকে ফাসাদ করে না তখন পুরুষের নামাজকেও ফাসাদ করবে না। ইস্তিহসান তথা সূক্ষ্ম কiyাসের কারণ হলো, ঐ হাদীস যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস-  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخْرَوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ .

এ হাদীসের মধ্যে পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা স্ত্রীলোকদেরকে নামাজের মধ্যে পিছনে রাখবে। সুতরাং স্ত্রীলোক যখন তার محاذী হয়ে গেল, তখন যেন পুরুষ লোকটি তার স্থানগত ফরজ বর্জন করল। কেননা এমন নামাজের মধ্যে যার মধ্যে উভয়ে শরিক থাকে, স্ত্রীলোককে পিছনে দাঁড় করানো পুরুষের জন্য ফরজ। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি ফরজ তরক করেছে তার নামাজ ফাসাদ হয়ে যাবে, অন্যের নামাজ ফাসাদ হবে না। এ জন্য আমরা বলেছি محاذات-এর কারণে পুরুষের নামাজ ফাসিদ হবে, স্ত্রীলোকের নামাজ ফাসিদ হবে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ, আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরযিয়ত সাব্যস্ত হয় না? এর জবাব হিদায়া গ্রন্থকার الْمَشَاهِيرِ দ্বারা দিয়েছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি আহাদীসে মাশহুরার অন্তর্ভুক্ত যা অকাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই وَوَمَوَّ الْمُخَاطَبُ দ্বারা কiyাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের হাসিল হলো, স্ত্রীলোকের নামাজ ফাসিদ না হওয়ার দ্বারা পুরুষের নামাজ ফাসিদ না হওয়া লায়িম আসে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী اخروهن-এর মুখাতাব পুরুষ, মহিলা নয়। সুতরাং পুরুষ ফরজ বর্জনকারী হলো, মহিলা নয়। এ জন্য শুধু পুরুষের নামাজ ফাসিদ হবে, মহিলার নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন- মুক্তাদী যখন ইমামের আগে চলে যায় এবং নিজের স্থানগত ফরজ তরক করে তখন তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এমনভাবে যখন স্ত্রীলোকও তার স্থানগত ফরজকে বর্জন করে তখন তার নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে।

ফায়েদা: محاذات - নামাজ বিনষ্টকারী তখন হবে যখন নামাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের পা পুরুষের কোনো অঙ্গের বরাবর



وَأَنْ لَّمْ يَنْوِ إِمَامَتَهَا لَمْ تَصْرَهُ وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا لِأَنَّ الْإِشْرَاقَ دُونَهَا لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِرُفْرِ الْأَتَرَى أَنَّهُ يَلْزِمُهُ التَّرْتِيبُ فِي الْمَقَامِ فَيُتَوَقَّفُ عَلَى التَّزَامِهِ كَالِاقْتِدَاءِ وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُ نَبِيُّهُ الْأَمَامَةُ إِذَا انْتَمَتَ مُحَاضِرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَتِهَا رَجُلٌ فَفِيهِ رَوَاتَانِ وَالْفَرْقُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَزِمُ وَفِي الثَّانِي مَحْصَلٌ وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُحَاضِرَاتِ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرِكَةً وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً وَأَنْ تَكُونَ الْمَرَأَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّهَوَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ مُفْسِدَةً بِالنِّصِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَرَاغَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَيَكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَاتِ بَعْنَى الشَّرَابِ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ .

অনুবাদ : আর যদি ইমাম জীলোকের ইমামতির নিয়ত না করে থাকেন, তাহলে পুরুষের নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে জীলোকটির নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা আমাদের মতে ইমামের নিয়ত ছাড়া সে নামাজে शामिल হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, স্থানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইমামের কর্তব্য। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব এহণের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যেমন ইকতিদার ক্ষেত্রে, (মুজাদীর জন্য ইমামের নিয়ত করা জরুরি) তবে ইমামের নিয়ত তখনই শর্ত হবে, যখন সে কোনো পুরুষের পার্শ্বে ইকতিদা করে। পক্ষান্তরে যদি তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। উক্ত দুটি মতের একটির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ হলো, প্রথম সূরতে তো নামাজ ফাসিদ হওয়া অনিবার্য, আর দ্বিতীয় সূরতে সম্ভাবনায়ুক্ত। নামাজ নষ্টকারী محاذاة তথা-এক সমানে দাঁড়ানো"-এর জন্য শর্ত হলো (উভয়ের) নামাজ অভিন্ন হওয়া এবং (রুকু সিজদা বিশিষ্ট) সাধারণ নামাজ হওয়া। (অর্থাৎ জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে কো-জীলোকের পার্শ্বে অবস্থান দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে নামাজ নয়; বরং মাইয়েতের জন্য নোয়া) আর জীলোকটি কামোত্তেজনাযোগ্য হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকা। কেননা কিয়াস ও যুক্তির বিপরীতে শরিয়তের বাণী দ্বারা তা (নামাজ) ফাসিদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং নস সংক্রান্ত সকল বিষয় এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে। জীলোকদের জামাআতে হাজির হওয়া মাকরুহ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা যুবতী। (তাদের জন্য এ হুকুম)। কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে একটি সূরত বয়ান করা হয়েছে। আর তা হলো- যখন ইমাম জীলোকের ইমামতির নিয়ত না করে অর্থাৎ এ নিয়ত না করে যে, আমি এ জীলোকের ইমাম, তখন এ সূরতে পুরুষের নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না, তবে এ জীলোকের নামাজও জায়েজ হবে না।

দলিল : আমাদের মতে নিয়ত ব্যতীত الصَّلَاةُ সাধিত হয় না। যদিও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সাধিত হয়। কেননা ইমাম যুফার (র.)-এর মতে জীলোকটি যখন পুরুষের নামাজে দাখিল হয়ে গেছে তখন পুরুষের নামাজ ফাসিদ হওয়ার জন্য জীলোকের ইমাম হওয়ার নিয়ত করা শর্ত নয়। এ কারণে যে, পুরুষ-পুরুষ ও জীলোক উভয়ের ইমামত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের ঐ পুরুষ ইমামের ইকতিদা করা ইমামতের নিয়ত ছাড়াও সহীহ, অর্থাৎ যদি ইমাম এ নিয়ত না করে যে, আমি তার ইমাম, তখনও পুরুষ ঐ ইমামের ইকতিদা করতে পারে। তাই এমনভাবে ইমামতের নিয়ত ব্যতীত জীলোকের ইকতিদা করাও সহীহ হবে। সুতরাং বুঝা গেল, পুরুষের নামাজ ফাসিদ হওয়ার জন্য জীলোকের ইমাম হওয়ার

নিয়ত করা শর্ত নয়। কিন্তু আমাদের মতে ইমামতের নিয়ত ব্যতীত ইশ্তিরােক সাধিত হয় না। তার কারণ হলো, হাদীসে বর্ণিত **أَخْرَجُوا** এর কারণে মুক্তাদীদেহকে ধারাবাহিকভাবে দাঁড় করাবার দায়িত্ব ইমামের উপর এসে গেছে। অর্থাৎ স্থানের ধারাবাহিকতা ইমামের উপর লায়িম। আর যার উপর কোনো জিনিস লায়িম হয় তা আবার তার লায়িম করার উপর মওকুফ থাকে। অর্থাৎ সে লায়িম করলে লায়িম হবে নতুবা হবে না। যেমন— ইক্তিদা করার অবস্থা। মুক্তাদীর ইক্তিদা করার নিয়ত করা শর্ত, কেননা এ ইক্তিদার নিয়ত দ্বারা যে তার নামাজকে ইমামের জিম্মায় দিয়ে দিবে। যাতে ইমামের কোনো কাজ দ্বারা নামাজের ক্ষতি হলে তখন মুক্তাদীর তা কবুল করা এবং এ ব্যাপারে সম্মত থাকার দ্বারা তা তার উপর লায়িম হয়ে যাবে। এমনভাবে ইমামের স্ত্রী লোকদের ইমামতের নিয়ত করা শর্ত। যাতে স্ত্রীলোকদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি হলে তখন তা ইমামের পক্ষ থেকে কবুল করা হয়ে যায়।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) ইমামতের নিয়ত ব্যতীত ইমামের নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কারণ বয়ান করেছেন যে, যদি ইমামতের নিয়ত ব্যতীত স্ত্রীলোকের ইক্তিদাকে সহীহ বলা হয় তখন প্রত্যেক স্ত্রীলোক যা ইচ্ছা তাই করে পুরুষদের নামাজ ফাসিদ করে দেওয়ার শক্তি রাখবে। এভাবে যে, পুরুষের ইক্তিদা করে তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এতে পুরুষের ক্ষতি, এ কারণে পুরুষদের উপর ইমামতের নিয়ত করাকে শর্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাতে, এ ক্ষতি পুরুষের সম্মতিতে তার উপর আপত্তি হয়।

**قَوْلُهُ رَأَيْتُكَ بِنْتُ الْأَمَةِ** : বাক্যটি দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমামের উপর ইমামতের নিয়ত করা তখনই

শর্ত যখন স্ত্রীলোক ইমামের মুহাযিয়া তথা বরাবর হয়ে ইমামের মুক্তাদী হয়। অর্থাৎ মুহাযিাতের কারণে ইমামের নামাজ তখনই ফাসিদ হবে যখন স্ত্রীলোক তার মুহাযী হয়ে ইক্তিদা করে এবং ইমামও তার ইমামতের নিয়ত করে। আর যদি স্ত্রীলোকটি ইমামের পিছনে দাঁড়ায় তখন তার দু'টো সুরত রয়েছে। এক, এ স্ত্রীলোকটি কোনো পুরুষ মুক্তাদীর (مَحَاضِي) মুহাযী হয়ে দাঁড়াবে। দুই, কোনো পুরুষ মুক্তাদীর মুহাযী হয়ে দাঁড়াবে না। অর্থাৎ তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ লোক নেই। যদি মহিলা বাম্ববর্তী কোনো পুরুষ মুক্তাদীর মুহাযী হয়ে দাঁড়ায় তখন বিতর্ক মত হলো, ইমামের নিয়ত ব্যতীত এ স্ত্রীলোকটি মুক্তাদিয়াহ হবে না। আর যদি স্ত্রীলোকটির পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে অর্থাৎ তার মুহাযী কোনো পুরুষ নেই তখন এতে দু'টো রিওয়াজাত রয়েছে। এক রিওয়াজাতে ইমামতের নিয়ত করা ইমামের জন্য শর্ত, আর অন্য রিওয়াজাতে শর্ত নয়। উভয় রিওয়াজাতের কারণ হলো, এ সুরতে বিল-ফেয়েল স্ত্রীলোকটি মুহাযী নয়। তাই তার যাতে দ্বারা কোনো ফাসাদও সৃষ্টি হয় নি। তবে এর সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে আগে বেড়ে গিয়ে মুহাযিয়া হয়ে যেতে পারে। এখন এ সম্ভাবনাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ইমামতের নিয়ত করা শর্ত হবে। তাহলে নামাজ ফাসিদ হওয়া তার ইল্টিযাম করার দ্বারা হবে। আর যদি এ সম্ভাবনাকে গ্রহণ না করা হয়, তখন ইমামতের নিয়ত করা শর্ত হবে না। এখন কথা হলো এই দুই রিওয়াজাতের মধ্যে থেকে নিয়ত শর্ত হওয়ার রিওয়াজাত আর প্রথম সুরতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

এর জবাব হলো হলো, প্রথম সুরতের মধ্যে তথা যখন স্ত্রীলোক কোনো পুরুষের মুহাযী দাঁড়াবে তখন **نَسَاءٌ بِالْفِعْلِ** হয়। আর দ্বিতীয় সুরতে ফাসাদের ইমকান আছে, অর্থাৎ যখন স্ত্রীলোক ইমামের পিছনে দাঁড়ায় এবং তার পার্শ্বে কোনো পুরুষ না থাকে, তখন এ সুরতে ফাসাদের সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে আগে বেড়ে গিয়ে পুরুষের মুহাযী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ **مَحْتَمَلٌ** -কে **وَأَمَّا** -এর উপর কিয়াম করে নিয়তের শর্ত করা হয়েছে। এমনকি যদি **مَحْتَمَلٌ** -এর ইতিবার না করা হয় তবে নিয়ত শর্ত হবে না। যেমন- দ্বিতীয় রিওয়াজাতে আছে।— (ইনায়্য)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হিদায়ার ব্যাখ্যাটা লিখেছেন, বিজ্ঞ মুসান্নিফের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রথম সুরত ও দ্বিতীয় রিওয়াজাতের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। পার্থক্য হলো, প্রথম সুরতে যেহেতু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় এ জন্য নিয়ত শর্ত, যাতে নামাজ ফাসিদ হওয়া তার ইল্টিযাম দ্বারা হয়। আর দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে ফাসাদ যেহেতু মুহুতামাল তথা সম্ভাবনাময়, তাই তার জন্য নিয়ত শর্ত করা হয়নি।

**قَوْلُهُ وَكُنْ شَرَابِطُ الْمَحَاضَاتِ** : উপরোক্ত ইবারতে **مُفِيدَةٌ** তথা এক সমানে দাঁড়ানোর দ্বারা নামাজ নষ্টকারী কাজের কতকগুলো শর্ত-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক, উভয়ের নামাজ তাহরীমা ও আদা (إِدَاء) উভয় মধ্যে মুশতারাক হওয়া। তাহরীমার মধ্যে মুশতারাক হওয়ার অর্থ হলো, উভয়ের তাহরীমার বেনা বা ভিত্তি ইমামের তাহরীমার উপর হওয়া অথবা উভয়ের মধ্যে থেকে একজন নামাজের তাহরীমার উপর বেনা করেছে এভাবে যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে থেকে একজন ইমাম আর অপরজন মুক্তাদী। আর আদা-এর মধ্যে মুশতারাক হওয়ার অর্থ হলো— যে নামাজ তারা উভয়ে আদায় করবে উহার মধ্যে তাদের উভয়ের কোনো একজন হাকীকাতান বা হুকমান হবে। যেমন— একজন পুরুষ ও একজন মহিলা তৃতীয় রাক'আতে ইমামের ইক্তিদা করেছে, পরে তাদের হাদাস হওয়ায় তারা অজ্ঞ করতে গেছে অতঃপর এসে নামাজ

আমাদের মাযহাবের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয় যাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল বার খ্বয় সনদে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রিওয়ায়াতটি হলো— **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُمَ إِنْسَاءٌ كُمْ عَنْ لَيْسَ الرِّبَّةَ وَالتَّبَغُّثُ فِي** — অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সুসজ্জিত ও তাকাক্বুরের পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন করা থেকে নিষেধ করে দাও। কেননা বনী ইসরাইলের লোকেরা তখনই অভিশপ্ত হয়েছে যখন তাদের স্ত্রীলোকেরা সুসজ্জিত ও অহংকার জনিত পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন করতছে। আর যেহেতু আমাদের যুগে ফাসিক মুস্কারের প্রবণতা বেশি, তাই সকল স্ত্রীলোকদেরই মসজিদে যাওয়া বিধেয়।

وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  
 (رح) وَقَالَ يَخْرُجْنَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرُّغْبَةِ فَلَا يَكْرَهُ كَمَا فِي  
 الْعَبْدِ وَلَهُ أَنْ قَرَطَ السَّبْقَ حَامِلٌ فَتَقَعَ الْفِتْنَةَ غَيْرَ أَنَّ الْفُسَاقَ إِنْتَشَرَهُمْ فِي الظُّهْرِ  
 وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ هُمْ نَائِمُونَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ  
 مَشْغُولُونَ وَالْجَبَانَةُ مُتَسِعَةٌ فِيمَكْنَهَا الْأَعْتَزَالُ عَنِ الرِّجَالِ فَلَا يَكْرَهُ.

অনুবাদ : বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ঈশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হওয়াতে অসুবিধা নেই। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে কোনো নামাজেই তারা বের হতে পারে। কেননা আকর্ষণ না থাকায় ফিতনার আশংকা নেই। তাই মাকরুহ হবে না। যেমন, ঈদের জামাআতে (শরিক বা হাজির হওয়া মাকরুহ নয়)। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রবৃত্তির প্রাবল্য (দুর্কর্মে) উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সুতরাং ফিতনা ঘটতে পারে। তবে জোহর, আসর ও জুমার সময় ফাসিকদের উপদ্রব থাকে। আর ফজর ও ঈশার সময় (সাধারণত) তারা ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবে পানাহারে মশগুল থাকে। আর (ঈদের) মাঠ প্রশস্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে পাশ কেটে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব; তাই মাকরুহ হয় না। (মূল কথা, ইসলামের শুরুতে ত্রীলোকদের জন্য জামাআতে হাজির হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু যখন তাদের বের হওয়াটা ফিতনার কারণ হয়ে দেখা দিল তখন তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) বৃদ্ধা ত্রীলোকদেরকে জোহর এবং আসরের সময় বের হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে ফজর, ঈশা এবং মাগরিবের সময় বের হওয়ার ইজাজত দিয়েছেন। সাহেবাইন (র.) বৃদ্ধাদেরকে সকল নামাজে বের হওয়ার ইজাজত দিয়েছেন। তাদের দলিল হলো, বৃদ্ধাদের মধ্যে আকর্ষণ কম থাকায় কোনো ফিতনার আশংকা নেই। এ জন্য তাদের বের হওয়া মাকরুহও নয়। যেমন ঈদের নামাজের জন্য বের হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঈদের মধ্যে বের হওয়া ঈদের নামাজের জন্য, নাকি নামাজের জন্য নয়? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে দুটো বর্ণনা রয়েছে। এক রিওয়ায়াত যা হাসান ইবনে রিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধা ত্রীলোকেরা ঈদের নামাজের জন্য বের হবে এবং কাতারের শেষে দাঁড়িয়ে পুরুষের সাথে নামাজ আদায় করবে। কেননা ত্রীলোকেরাও পুরুষদের অনূগত হয়ে জামাআত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত যা মু'আত্তা (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদের মধ্যে বৃদ্ধাদের বের হওয়া জামাআতের সমাগম অধিকারের জন্য, অর্থাৎ তারা একদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে। পুরুষদের সাথে নামাজ পড়বে না। কেননা বিতদ্ধ সূত্রে এ কথা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুময়ী ত্রীলোকদেরকে ঈদের মধ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ তারা এ অবস্থায় নামাজের যোগ্য নয়। বুঝা গেল যে, ঈদের মধ্যে বের হওয়া ঈদের নামাজের জন্য নয়; বরং জামাআতের অধিকারের জন্য।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, প্রবৃত্তির প্রাবল্য সহবাসের কারণ। তাই বৃদ্ধাদের বের হওয়ার দ্বারাও ফিতনা ঘটতে পারে। তবে ফাসিক লোকেরা জোহর, আসর এবং জুমার সময় ঘুরাফিরা করে, তাই ঐ সময়গুলোতে বৃদ্ধারা বের হবে না। আর ফজর ও ঈশার সময় তারা ঘুমিয়ে থাকে আর মাগরিবের সময় খানা-পিনায় মশগুল থাকে। বুঝা গেল যে, এ তিন সময় ফাসিকদের থেকে নিরাপদ সময়। তাই এ তিন সময়ে বৃদ্ধাদেরকে নামাজের জন্য বের হওয়ার ইজাজত দেওয়া হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সাহেবাইনের ঈদের মধ্যে বের হওয়ার উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না। কেননা ঈদের নামাজ সাধারণত মাঠে-ময়দানে হয়ে থাকে। আর মাঠ-ময়দান প্রশস্ত হওয়ায় বৃদ্ধাদের পুরুষদের থেকে আলাদা থাকা সম্ভব। এ জন্য তাদের ঈদের মধ্যে বের হওয়া মাকরুহ নয়।

ফায়েদা : আজকাল যেহেতু ফিতনা ফাসাদ ব্যাপক, তাই সমস্ত নামাজেই বৃদ্ধা ত্রীলোকদের বের হওয়া মাকরুহ :- (ইনশা'আল্লাহ)

قَالَ وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الطَّاهِرُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى حَالًا مِنَ الْمَعْدُورِ وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ بِمَعْنَى تَضَمَّنَ صَلَاتُهُ صَلَوةَ الْمُقْتَدِي وَلَا يُصَلِّي الْقَارِئُ خَلْفَ الْأَمِيِّ وَلَا الْمُكْتَسِي خَلْفَ الْعَارِي لِقَوَّةِ حَالِهِمَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, পবিত্র ব্যক্তি মুস্তাহাযা এর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। সেরূপ পবিত্র স্ত্রীলোকও মুস্তাহাযা-এর পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা সুস্থ ব্যক্তির (তাহারাতের) অবস্থা মাজুর ব্যক্তির চেয়ে উন্নততর। আর কোনো কিছু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। আর ইমাম হচ্ছেন দায়িত্ব বহনকারী। অর্থাৎ মুস্তাদীর নামাজ তার নামাজের আওতাভুক্ত। কুরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উম্মী লোকের পিছনে এবং বস্ত্রধারী ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা তাদের দু'জনের অবস্থা উন্নতর।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুস্তাহাযা এবং যারা মুস্তাহাযার হুকুমে ফুকাহাদের পরিভাষায় তাদেরকে মাজুর বলা হয়। এখন সূরতে মাসআলা হলো, পবিত্র ব্যক্তি মাজুরের পিছনে নামাজ পড়বে না। পাক মহিলা মুস্তাহাযা মহিলার পিছনে নামাজ পড়বে না। দলিলের পূর্বে একথা বুঝতে হবে যে, এ ধরনের সকল মাসআলার আসল বা মূল হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী **الْإِمَامُ ضَامِنٌ**। হাদীসের অর্থ হলো, ইমামের নামাজ মুস্তাদীর নামাজের জন্য **مَنْضَم**। এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম মুস্তাদীর নামাজের জিম্মাদার। দ্বিতীয় কথা হলো, কোনো কিছু তার চেয়ে অনুন্নত বা তার সমপর্যায়ের কোনো কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে কিন্তু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। উক্ত দলিলের হাসিল হলো, উপরোক্ত সূরতে মুস্তাদী যেহেতু পাক এবং গায়রে মাজুর আর ইমাম মাজুরের হুকুমে। তাই মুস্তাদীর নামাজের অবস্থা ইমামের নামাজের অবস্থার চেয়ে উন্নততর। আর ইমামের নামাজের অবস্থা অনুন্নত। আর যেহেতু অনুন্নত কোনো কিছু উন্নত কিছুকে বহন করতে পারে না; তাই এখানে ইমামের নামাজও মুস্তাদীর নামাজকে বহন করতে পারবে না। অথচ ইমামের নামাজ মুস্তাদীর নামাজকে বহন করে থাকে। এ জন্য পাক ও গায়রে মাজুরের ইকতিদা মাজুরের পিছনে জায়েজ নেই। এমনিভাবে পাক স্ত্রীলোকের ইকতিদা মুস্তাহাযা মহিলার পিছনে জায়েজ নেই। কেননা মুস্তাহাযার নামাজের অবস্থা মুস্তাদী স্ত্রী লোকের নামাজের অবস্থার চেয়ে নিম্নতর।

وَيَجُوزُ أَنْ يَوْمَ الْمُتَيْمِمِ الْمُتَوَضَّعِينَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رحا) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحا) لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ أَصْلِيَّةٌ وَلَهُمَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ وَلِهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَيَوْمَ الْمَسِحِ الْغَائِسِلِينَ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَافَةَ الْحَدِّثِ إِلَى الْقَدَمِ مَحَلٌّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ الْحَاضِرَةِ لِأَنَّ الْحَدِّثَ لَمْ يَغْتَبِرْ زَوَالَهُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَةً.

অনুবাদ : আর জায়েজ রয়েছে তায়ামুমকারীর জন্য অজুকারীদের ইমামতি করা। এ হলো ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা তায়ামুম জরুরি অবস্থার তাহারাৎ। আর পানি হলো তাহারাতে মূল উপাদান। ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এটা (সাময়িক তাহারাৎ নয় বরং) সাধারণ তাহারাৎ। (অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন মুস্তাহাযার তাহারাৎ ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ) সুতরাং এ কারণেই তা প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না। (মোজায়) মাসেহকারী ব্যক্তি পা ধৌতকারীদের ইমামতি করতে পারবে। কেননা মোজা পায়ের পাতায় হাদাস-এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। আর মোজায় যে হাদাস যুক্ত হয়, সেটাকে মাসেহ দূর করে দেয়। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বাস্তবে হাদাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরিয়তে তা বিদূরিত হয়ে গেছে বলে গণ্য করা যায় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অজুকারী ব্যক্তি তায়ামুমকারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। শায়খাইন (র.)-এর মতে ইকতিদা করা জায়েজ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তায়ামুম হলো জরুরি অবস্থার তাহারাৎ। আর পানি দ্বারা তাহারাৎ হলো তাহারাতে আসলিয়া, আর এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে, তাহারাতে আসলিয়ার অধিকারী ব্যক্তি শক্তিশালী- তাহারাতে জরুরিয়ার অধিকারী ব্যক্তির তুলনায়। বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের অবস্থার চেয়ে শক্তিশালী। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুন্নত হালাতের অধিকারী ব্যক্তি উন্নত হালাতের অধিকারীর ইমামত করতে পারে না। এ জন্য আমরা বলেছি তায়ামুমকারীর জন্য অজুকারীর ইমামত করা জায়েজ নেই।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, তায়ামুম তাহারাতে মুতলাকাহ তথা সাধারণ তাহারাৎ। মুস্তাহাযার ন্যায় সাময়িক তাহারাৎ নয়। এ কারণেই তায়ামুম প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না; বরং দশ বছরও যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহারে কুদরত হাসিল না হয় তারপরও তায়ামুম বহাল থাকবে। যেহেতু তায়ামুম তাহারাতে মুতলাকাহ সেহেতু তায়ামুমকারী আর অজুকারী উভয়ের অবস্থা সমান হয়ে গেল। আর যখন উভয়ের অবস্থা সমান হলো, তখন একে অপরের ইমামত করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْمَسِحِ الْغَائِسِلِينَ : মোজায় মাসেহকারী ব্যক্তি, পা ধৌতকারীদের ইমামতি করতে পারবে। দলিল হলো, মোজাধারী ব্যক্তি তার পা ধৌত করে মোজা পরিধান করেছে। আর মোজা পায়ের পাতা পর্যন্ত হাদাস এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। এখন এ ব্যক্তি পা ধৌতকারী ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, হাদাস তো মোজার পূর্বেই ঢুকে পড়েছে? জবাব হলো, যা কিছু মোজার মধ্যে ঢুকেছে তাকে মাসেহ দূরীভূত করে দিয়েছে। এ জন্য মোজাধারীর তাহারাৎ ধৌতকারীর তাহারাতে নয় হয়ে গেছে। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তার পিছনে মাজুর হওয়ার কারণে ইকতিদা করা জায়েজ নেই। এর কারণ হলো, মাজুরের হাদাস মূলত বিদ্যমান। তাই হাদাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরিয়ত তাকে মাজুরই আখ্যা দিয়েছে। এমন নয় যে হাদীসকে দূরীভূত করে দিয়েছে। সুতরাং যেহেতু মাজুরের সাথে হাদাস বিদ্যমান, তাই গায়ের মাজুরের জন্য তার পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ হবে না।

وَصَلَّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُجْزِئُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقَوْلِهِ حَالَ الْقَائِمِ  
نَحْنُ تَرْكُنَاهُ بِالْخَبَرِ وَهُوَ مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ  
خَلْفَهُ قِيَامًا وَصَلَّى الْمُؤْمِنُ خَلْفَ مِثْلِهِ لِاسْتِثْنَائِهِمَا فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يُؤْمِيَ الْمُؤْتَمُّ  
قَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُضْطَجِعًا لِأَنَّ الْقَوْمَ مُعْتَبَرٌ فَنُتِبَّ بِهِ الْقَوْمُ -

অনুবাদ : দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে (ইকতিদা করে) নামাজ আদায় করতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তা জায়েজ হবে না। কিয়াসের দাবি এই। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অবস্থা উন্নততর। আমরা হাদীসের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। কেননা বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাঁর শেষ নামাজ বসে আদায় করেছেন আর লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা উভয়ের অবস্থা সমান, তবে যদি মুক্তাদী বসে আর ইমাম শুয়ে ইশারা করে তবে তার পিছনে ইকতিদা জায়েজ হবে না। কেননা বসা শরিয়তে স্বীকৃত। (তাইতো বসতে সক্ষম অবস্থায় চিত হয়ে ইশারার মাধ্যমে নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়) সুতরাং এর দ্বারা তা উন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ নেই। কিয়াসের দাবিও তাই। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর অবস্থা বসে আদায়কারীর তুলনায় উন্নততর। সুতরাং যেমনিভাবে সুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা ঐ অসুস্থ ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই যে ইশারা করে নামাজ আদায় করে। কেননা সুস্থ ব্যক্তির অবস্থা অসুস্থ ব্যক্তির তুলনায় উন্নততর। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর ইকতিদাও বসে আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হবে না। কিন্তু আমরা এ কিয়াসকে নস তথা হাদীসের কারণে বর্জন করেছি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুত্তা শয্যায় শায়িত তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে বলা, সে যেন লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দেয়। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গিয়ে বলা যে, আবু বকর নরম হৃদয়ের লোক, যখন সে তাঁর মুস্তাযিদ দাঁড়াবেন তখন নিজের উপর শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। এ জন্য তিনি যেন অন্য কাউকে নামাজ পড়াবার জন্য বলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ কথাওলা দু'বার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, أَتَنْتِ صَرَاحَاتٍ بِيَوْمٍ তোমারাতো এতসুফ (র.)-এর জীবন সঙ্গীদেই ন্যায়। আবু বকরকে বলা সে যেন লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দেয়। অতঃপর যখন সিদ্দীকে আকবর (রা.) নামাজ শুরু করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিলেন। তাই হযরত আব্বাস ও আলী (রা.)-এর উপর ভর করে তিনি মসজিদে তাকবীর ফেললেন। যখনই হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের অবস্থা অনুভব করলেন, সাথে সাথে তিনি পিছনে চলে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে গেলেন এবং বসে বসে নামাজ পড়ালেন। আবু বকর (রা.) রাসূলের নামাজের সাথে নামাজ পড়লেন। আর লোকেরা আবু বকরের নামাজের সাথে নামাজ পড়ল। মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে বসে ইমামত করলেন, আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাকবীর শুনে তাকবীর বলতেন আর লোকেরা আবু বকরের তাকবীর শুনে তাকবীর বলতো। এটা রাসূলুল্লাহর ﷺ সর্বশেষ নামাজ যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামত করেছেন। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারবে।

মাসআলা : ইশারায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ। যদিও ইমাম বসে বসে ইশারা করে। আর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ইশারা করে। কেননা দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামাজ আদায়ের সূরতে কিয়াম রুকন থাকে না; বরং তা তরক করা উত্তম, তাই এ কিয়াম আদমে কিয়ামের হুকুমে। দলিলের খোলাসা হলো- ইমাম আর মুক্তাদী অবস্থার দিক থেকে উভয়ে সমান। তাই একে অপরের ইকতিদা করা জায়েজ হবে। তবে মুক্তাদী যদি বসে বসে ইশারা করে আর ইমাম শুয়ে শুয়ে ইশারা করে তবে এ সূরতে ইকতিদা জায়েজ হবে না। কেননা এ বসাতো গ্রহণযোগ্য রুকন। আর গ্রহণযোগ্য হওয়ার দিলিল হচ্ছে- যদি কারো বসে ইশারা করে নামাজ আদায়ের শক্তি থাকে তবে তার শুয়ে ইশারা করে নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। এতে বুঝা গেল যে, বসা-এটা একটি গ্রহণযোগ্য রুকন। আর বসা যখন গ্রহণযোগ্য রুকন হলো তখন তার সাথে মুক্তাদীর অবস্থা উন্নত হয়ে যায়- যা ইমামের জন্য হয় না। আর যেহেতু উন্নত অবস্থার অধিকারী ব্যক্তির জন্য অনুন্নত অবস্থার অধিকারীর পিছনে ইকতিদা জায়েজ নেই; সেহেতু বসে ইশারাকারী ব্যক্তির জন্য শুয়ে ইশারাকারী পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ হবে না।

وَلَا يُصَلِّيَ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ لَأَنَّ حَالَ الْمُقْتَدِي أَقْوَى وَفِيهِ خِلَافٌ زَفَرٌ (رح) وَلَا يُصَلِّيَ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ لَأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ بِنَاءٌ وَوَصَفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَعْدُومِ قَالَ وَلَا مَنْ يُصَلِّيَ فَرَضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّيَ فَرَضًا آخَرَ لَأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ شَرْكَهُ وَمُؤَافَقَةٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتِّحَادِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَصِحُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ عِنْدَهُ آدَاءٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُؤَافَقَةِ وَعِنْدَنَا مَعْنَى التَّضَمُّنِ مُرَاعَى -

অনুবাদ : রুকু সিজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পেছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা মুক্তাদীর অবস্থা উন্নততর। এ সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা ইকতিদা অর্থ ভিত্তি করা, আর এখানে ইমামের ক্ষেত্রে “ফরজ” গুণটি নেই। সুতরাং যে গুণ নেই, তার উপর ভিত্তি স্থাপিত হবে না। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এক ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি ভিন্ন ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবে না। কেননা ইকতিদা হলো (একই তাহরীমায়) শামিল হওয়া এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করা। সুতরাং (নামাজে) অভিন্নতা অপরিহার্য। ইমাম শাফি’ঈ (র.) -এর মতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীহ। কেননা তাঁর মতে ইকতিদা হলো সমন্বিত রূপে আদায় করা। আর আমাদের মতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থ বিবেচ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : রুকু সিজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়বে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইশারাকারী ব্যক্তি রুকু সিজদাকারী ব্যক্তির ইমামত করতে পারবে। তাঁর দলিল হচ্ছে— ইশারাকারী ব্যক্তি থেকে রুকু এবং সিজদা ইশারার বিনিময়ে রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ রুকু ও সিজদা যদিও রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তার বদলা তথা ইশারা বিদ্যমান। আর বদলার সাথে আদায় করা এমন যেমন আসল-এর সাথে আদায় করা। এ কারণে তায়ামুমকারী ব্যক্তি অজুকারী ইমামত করতে পারে।

আমাদের দলিল হচ্ছে— এই মাসআলায় মুক্তাদীর অবস্থা উন্নত, আর ইমামের অবস্থা অনুন্নত। উপরে এ নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, অনুন্নত অবস্থাদারী ব্যক্তি উন্নত অবস্থাদারী ইমামত করতে পারবে না। ইমাম যুফারের বক্তব্য “ইশারা রুকু ও সিজদার বদলা” - তা আমরা মানি না। কেননা ইশারা রুকু ও সিজদার بعض বা অংশ বিশেষ। আর بعض شئ - অন্য -এর বদলা হতে পারে না। وَلَا يُصَلِّيَ الْمُفْتَرِضُ الْخ - ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নেই। কেননা ইকতিদা মানে— ভিত্তি করা। আর ভিত্তি হলো - أَمْرٌ وَجُودِيٌّ، أَمْرٌ عَدْمِيٌّ নয়। কেননা ভিত্তি (بِنَاءٌ) হলো কোনো ব্যক্তির অপরের أفعال-এর সাথে অনুসরণ করা। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনুসরণ করা এটা مفهوم وجودي، مفهوم سلبی নয়। তা ছাড়া امر وجودي-এর ভিত্তি عدمي-এর উপর সহীহ নয়। তাই যেহেতু উপরোক্ত মাসআলায় ফরজ গুণটি ইমামের নেই; তাই তার বেনা করা সাব্যস্ত হবে না। আর যখন বেনা করা সাব্যস্ত হলো না তখন ইকতিদা করাও সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مَنْ يُصَلِّيَ فَرَضًا الْخ : এক ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি অপর ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করবে না। যেমন— জোহর আদায়কারীর ইকতিদা আসর আদায়কারীর পিছনে জায়েজ নেই। দলিল হলো, ইকতিদা বলা হয় একই তাহরীমায় শামিল হওয়া এবং শারিরিক কার্যাবলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। আর এ শামিল হওয়া ও মুওয়্যাকাত তখনই



হবে যখন উভয়ের তাহরীমা আর আফযাল এক ও অভিন্ন হবে। যেহেতু উপরোক্ত সূরতে অভিন্নতা নেই তাই ইকতিদাও সহীহ হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উপরোক্ত সকল সূরতে ইকতিদা জায়েজ আছে। অর্থাৎ রুকু সিজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারীর ইকতিদা করতে পারে। এমনভাবে ফরজ আদায়কারী নফল আদায়কারীর এবং এক ফরজ আদায়কারী অপর ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা করতে পারে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হচ্ছে— ইকতিদা عَلَى سَبِيلِ التَّوَانُفُّ তথা সমন্বিত রূপে আরকান আদায় করার নাম। অর্থাৎ শুধু আমলের মধ্যে সমন্বিত রূপ হবে। সূতরাং তার মতে যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় নামাজের ক্ষেত্রে মুনফরিদ। আর জামা'আত তো শুধু এতটুকুনের মধ্যে যে, যে আফযাল (افعال) প্রত্যেকে আদায় করার তা একসাথে আদায় করবে। সূতরাং এ দলিল দ্বারা বুঝা গেল যে, শাওয়াফেদের মতে শুধু আফযালের মধ্যে সমন্বিত হওয়া জরুরি, তাহরীমায় শরিক থাকা জরুরি নয়। আর যেহেতু তাহরীমায় শরিক থাকা জরুরি নয় সেহেতু এক ফরজ আদায়কারী অপর ফরজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারবে। আর আমাদের মতে সমন্বিত (مرافقت) হওয়ার সাথে সাথে দায়িভূর অন্তর্ভুক্তির অর্থও বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে শামিল করে। এমনকি ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়া দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যায়, ইমামের নামাজ সহীহ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যায়। ইমামের যামানাত হওয়ার দলিল হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ হাদীস। মোটকথা, আমাদের মতে জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করা এমন— যেমন কোনো ব্যক্তি কিছু লোককে দাওয়াত করল এবং খাওয়ার ইন্তিয়ামও নিজেই করল। এখন দাওয়াতকারী ব্যক্তি যেন মাদুউ তথা দাওয়াতকৃতদের খাওয়ার শামিল হয়ে গেল। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করা এমন যেমন কিছু লোক তাদের নিজেদের ঘর থেকে খানা নিয়ে কোনো এক ব্যক্তির দস্তরখানে একত্রিত হলো এবং সকলে একত্রে খানা খেলো। এখানে তারা এক অপরের সাথে যেন শুধু খানার মধ্যে সমন্বয় করল। কেউ কারো জিহাদার বা জামিন হলো না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ — হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস,

إِنَّ مَعَادًا كَانَ بَصِلَى الْعِشَاءِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيْهَا بِقَوْمِهِ فَيَنْبِي سَلَمَةً فَكَانَ صَلَوةَ قَوْمِهِ نَرَضًا وَصَلَاتُهُ نَفْلًا.

মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ঈশার নামাজ পড়তেন অতঃপর বনু সালামায় গিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নামাজ পড়াতেন। তখন মু'আয (রা.)-এর কাওমের নামাজ হতো ফরজ আর মু'আয (রা.)-এর নফল। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ফরজ আদায়কারীর নামাজ নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাব হলো যে, হতে পারে হযরত মু'আয (রা.) নফলের নিয়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামাজ পড়তেন, আর তাঁর সম্প্রদায়কে ফরজ পড়াতেন। এ সম্ভাবনাময় সূরতে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো, ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা যদি নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হতো তবে খাওফের নামাজে এ তরীকা প্রবর্তিত হতো না যে, ইমাম অর্ধেক নামাজ একদলকে পড়াবে আর অর্ধেক অপর দলকে পড়াবে; বরং প্রত্যেক দলকেই তো পুরোপুরি নামাজ পড়াতে পারতেন। সর্বোপরি এ কথা সাবিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের অনেকদিন পর দু'টি দলকে এক নামাজ অর্ধেক করে অর্ধেক পড়িয়েছেন। নামাজের মাফখানে প্রত্যেক দলের নামাজের বিপরীত কাজ করতে হয়েছে। যদি ফরজ আদায়কারীর জন্য নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা জায়েজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দলকে পুরো নামাজ পড়াতেন, আধা আধা পড়াতেন না।

وَرُصِّلِيَ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي حَقِّهِ إِلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ وَهُوَ  
 مُوجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقُ الْبِنَاءُ وَمِنْ اقْتِدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحَدِّثٌ  
 أَعَادَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحَدِّثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ  
 وَأَعَادُوا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح) بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَتَحْنُ تَغْتَبِرُ مَعْنَى  
 التَّضَمُّنِ وَ ذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ وَإِذَا صَلَّى أُمِّي يَقُومُ يَقْرَأُ وَنَقِيقُومُ أُمِّيَنَ  
 فَصَلَاتُهُمْ قَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَمْ يَقْرَأْ تَامَةً لِأَنَّهُ مَعْدُورٌ  
 أَمْ قَوْمًا مَعْدُورِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِي عُرَاةً وَلَا يَسِينُ وَلَهُ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ قَرْضَ  
 الْقِرَاءَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسَدُ صَلَاتُهُ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِالْقَارِئِ تَكُونُ قِرَاءَتُهُ  
 قِرَاءَةً لَهُ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا لَهَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ  
 مُوجُودًا فِي حَقِّ الْمُفْتَدِي -

অনুবাদ : নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল নামাজ থাকাই হলো প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল নামাজ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর উপর বিনা **متحقق** সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে ইজ্জিদা করল তারপর জানতে পারল যে, তার ইমাম হাদাসগ্রস্ত, তখন তাকে নামাজ দোহরাতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করল, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাসগ্রস্ত অথবা জুনুবি, তখন সে নিজেও নামাজ দোহরাতে এবং মুক্তাদিরাও দোহরাতে। এ বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (র.) পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করি। আর তা জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কোনো উম্মী ব্যক্তি যদি কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উম্মী একদল লোকের ইমামতি করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সকলের নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমামের নামাজ এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কেননা ইমাম নিজে মাজুর এবং তিনি একদল মাজুর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি একদল উলঙ্গ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামতি করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর দলিল হচ্ছে- ইমাম কিরাআতের উপর সক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাআতের ফরজ তরক করেছে। সুতরাং তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সক্ষমতার কারণ হচ্ছে- সে যদি কারীর পিছনে ইজ্জিদা করতো তাহলে কারীর কিরাআত তার-কিরাআত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার হুকুম ভিন্ন। কেননা ইমামের ক্ষেত্রে যা বিদ্যমান, তা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বলে গণ্য হবে না।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারবে। দলিল হলো, নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল নামাজ থাকাই হলো প্রয়োজন। আর মূল নামাজ ইমামের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে নফল আদায়কারীর ফরজ আদায়কারীর পিছনে বিনা করা সারাষ্ট হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, নফল নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য সাধারণ নিয়ত যথেষ্ট। আর সাধারণ নিয়তের মধ্যে ফরজও शामिल। এজন্য নফল আদায়কারীর ইকতিদা ফরজ আদায়কারীর পিছনে জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ أَتْلُو بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلَيْهِ الْخ: যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের ইকতিদা করে। অতঃপর মুক্তাদী জানতে পারে যে তার ইমাম হাদাসগ্রন্থ। তখন এ ব্যক্তি নিজের নামাজ দোহরাবে। আর যদি ইকতিদা করার পূর্বে জানতে পারে যে, ইমাম হাদাসগ্রন্থ তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইকতিদাই জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ইকতিদা করার পর যদি ইমামের মুহদাস হওয়া জানতে পারে তখন মুক্তাদীর নামাজ দোহরাবো ওয়াজিব নয়। তার দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার মতে ইকতিদা হলো, সম্মতিত রূপে কিছু আফ'আল আদায় করার নাম। অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের নামাজ আলাদা আলাদা। ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজকে शामिल করে না। তাই ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হবে না; বরং মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। যদিও হাদাসের কারণে ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

তবে আমাদের পক্ষ থেকে জবাব হলো হচ্ছে— আমাদের মতে তায়াম্মুম তথা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করা হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী— الْأَسَامُ حَامِي— দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো এর দ্বারা মুরাদ হলো ইমাম তার নামাজের জামিন, অথবা এর দ্বারা মুরাদ হলো সে মুক্তাদীর নামাজের জামিন। প্রথম সূরতের মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। কেননা প্রত্যেক লোক তার নিজের নামাজের জামিন। তাই দ্বিতীয় সূরতই সহীহ। অতঃপর এরও আবার দুই সূরত রয়েছে। কেননা ইমাম হয়তো তার কাওমের ওয়াজিব হিসেবে ও আদা হিসেবে জামিন হবে অথবা সহীহ ও ফাসাদ হিসাবে জামিন হবে। সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব হিসেবে ও আদায় হিসেবে জামিন হওয়া মুরাদ নয়। তাহলে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, সহীহ ও ফাসাদ হওয়ার দিক থেকে জামিন। অর্থাৎ ইমামের নামাজ সহীহ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ خَبَاءَ فَأَعَادَهَا وَقَالَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُعَدِّيًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَأَعَادُوا .

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে নামাজ পড়িয়েছিলেন। পরে তাঁর জুহূরী থাকার কথা মনে পড়ল তখন তিনি নামাজ দোহরালেন, আর বললেন, যে ব্যক্তি কোনো কাওমের ইমামত করে পরে প্রকাশ পায় যে, সে হাদাসগ্রন্থ বা জুহূরী; তখন সে নিজেও নামাজ দোহরাবে এবং মুক্তাদীদেরকেও নামাজ দোহরাতে বলবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) আহনাফের সমর্থনে হযরত জাফর থেকে হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত কার্যের কথা বর্ণনা করেছেন,

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَضُوٍ فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا .

হযরত আলী (রা.) লোকদেরকে জানাবাত অবস্থায় অথবা অজুহীন অবস্থায় নামাজ পড়িয়েছিলেন। পরে নিজে নামাজ পুনরায় পড়েছেন এবং লোকদেরকেও দোহরাতে বললেন। এতে বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর নামাজ ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণে ফাসিদ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ رَأَا صَلَّيْ أَمْرِي يَتَرَمُ الْخ: উম্মী, অর্থ নিরক্ষর। এ শব্দটি অ তথা মা-এর সাথে সম্পর্কিত ও সম্বন্ধিত। এর মর্ম হল, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ অবস্থার মতো নিরক্ষর। কুরআন, হাদীস, আরবি ভাষায় যেখানে এ শব্দটি এসেছে— তার দ্বারা ঐ ব্যক্তি মুরাদ যে লেখা-পড়ায় অক্ষম। যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও জানে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সে উম্মীর অন্তর্ভুক্ত নয়। সাহেবাইনের মতে যে তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত জানে সে উম্মী নয়। — (ইনায়)

মাসআলা : যদি উম্মী ব্যক্তি অন্য উম্মীদের এবং কারীদের ইমামতি করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে তাদের সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাহেবাইনের মতে ইমাম ও গায়রে কারীদের নামাজ তো পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যে সকল মুক্তাদী কুরআন পাঠে সক্ষম তাদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাদের দলিল হচ্ছে— এক মাজ্হুর উম্মী অপর মাজ্হুর উম্মীর ইমামত করতে পারে এটা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। সুতরাং এ মাসআলাটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যেমন একজন উল্লেখ্য ব্যক্তি একদল উল্লেখ্য ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামত করে। এ সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে উল্লেখ্য ইমাম আর উল্লেখ্য মুক্তাদীদের নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে; তবে বস্ত্রধারীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে এখানেও উম্মী ইমাম ও উম্মী মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে। তবে কারীদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) এর দলিল হচ্ছে— কোনো ব্যক্তি যদি কিরাআতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত তরক করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর উক্ত মাসআলায়ও ইমাম অর্থাৎ উম্মী কিরাআতের উপর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত তরক করেছে; এ জন্য ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। আর যখন ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে গেল তখন সকলের নামাজই ফাসিদ হয়ে গেল। কেননা ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজের সহীহ ও ফাসিদ হওয়ার দিক থেকে মুতায়াম্মিন তথা শামিল করে। তবে ইমামে উম্মী কিরাআতের উপর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও ফরজ কিরাআত কিভাবে তরক করল? এর জবাব হলো, যদি উম্মী ইমাম কোনো কারী মুক্তাদীর ইকতিদা করতো তবে কারীর কিরাআত তার কিরাআত হয়ে যেতো। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, **مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ، فَإِمَامٌ لَهُ قِرَاءَةٌ** - আর এ ইকতিদা করা তার ইখতিয়ারে ছিল। অথচ সে তার ইখতিয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে। নতুবা কারীর কিরাআত তার কিরাআত হয়ে যেতো। এর বিপরীত হলো উল্লেখ্য ও বস্ত্রধারীর মাসআলা এবং এর অনুরূপ অন্যান্য মাসআলাও। যেমন— বোবা ব্যক্তি বোবা এবং কারীদের ইমামত করা, অথবা এক ইশারাকারী একদল ইশারাকারীর এবং কিছু রুকু ও সিজদাকারীর ইমামত করা। এর কারণ হলো, এ সকল মাসআলার মধ্যে যে কথা ইমামের জন্য প্রযোজ্য তা মুক্তাদীর জন্য বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ যদি বস্ত্রধারী ব্যক্তি ইমামত করে তখন মুক্তাদির বেলায় শরিয়ত এ হুকুম দেয়নি যে, মুক্তাদি বস্ত্রধারী হয়ে গেছে। অথবা ইমামের রুকু ও সিজ্দা আদায় করার দ্বারা মুক্তাদির রুকু সিজ্দা আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় একটাকে অপরটির উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না।

وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّيَّ وَحْدَهُ وَالْقَارِئَ وَحْدَهُ جَازَ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا رَغْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْآخَرَتَيْنِ أَمِيًّا فَسَدَّتْ صَلَاتُهُمْ وَقَالَ زُفَرٌ (رح) لَا تَفْسُدْ لِتَادِي فَرَضِ الْقِرَاءَةِ وَلَسَانًا كُلَّ رَكْعَةٍ صَلَوَةٌ فَلَا تَخْلُو عَنْ الْقِرَاءَةِ إِمَامًا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَلَا تَقْدِيرًا فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ وَكَذَا عَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ فِي التَّسْهِدِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

**অনুবাদ :** যদি উম্মী ও কারী একা একা নামাজ আদায় করে, তবে জায়েজ কেননা এটাই বিতর্ক মত; কেননা তাদের থেকে জামাতের আকাঙ্ক্ষা পাওয়া যায়নি। যদি ইমাম প্রথম দু রাকাতে কেরাত পড়ে; অতঃপর শেষ দুই রাকাততে কোনো উম্মীকে (নায়িব হিসাবে) আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা কিরাআতের ফরজ আদায় হয়ে গেছে। আমাদের দলিল হলো, প্রতিটি রাকআতই নামাজ। সুতরাং তা কিরাআত থেকে খালি হতে পারে না। চাই তা **تحقیقات** (বাস্তবে) হোক বা **تقدير** (ধরে নেওয়া) হোক। আর উম্মীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকার কারণে কিরাআতকে **تقدير** গণ্য করার অবকাশ নেই। তাশাহুদের সময় তাকে আগে বাড়ালেও অনুরূপ মত পার্থক্য রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি উম্মী ও কারী আলাদা আলাদা নামাজ পড়ে তবে তা জায়েজ। আর এটাই বিতর্ক হুকুম। ইমাম মালিক (র.)-এর মত হলো, এ সূরতে উম্মীর নামাজ জায়েজ হবে না। তাঁর দলিল হলো, এই মাসআলায়ও উম্মী কিরাআতে সক্ষম। কেননা উম্মী যদি কারীর পিছনে ইক্তিদা করতো তখন উম্মীর জন্যও কিরাআত হাসিল হয়ে যেতো। আমাদের দলিল হলো, উম্মী এবং কারী তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে জামআতের প্রতি কোনো অগ্রহ পাওয়া যায়নি। আর যখন জামআতের অগ্রহ-ই পাওয়া যায়নি তখন উম্মীর কিরাআতের উপর সক্ষম হওয়াও যাহির হলো না। এ জন্য তাকে অপারগই ধরা হবে।

**قَوْلُهُ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأَوَّلَيْنِ الخ** : উক্ত ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, ইমাম প্রথম দুই রাকাততে কিরাআত পাঠ করেছে। অতঃপর হাদাস হয়ে গেছে এবং শেষ দুই রাকাততে অথবা মাগরিবের এক রাকাততের জন্য কোনো উম্মীকে খলীফা হিসাবে আগে বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে সব মুক্তাদীর নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যুফারের মাযহাব হলো ফাসিদ হবে না। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এরও একটি রিওয়ায। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ফরজ কিরাআত তো আদায় হয়ে গেছে। শেষ দুই রাকাততে তো কিরাআত ফরজ নয় বরং সুন্নত। এ কারণে শেষ দুই রাকাততে খলীফা বানানোর ক্ষেত্রে কারী ও উম্মী উভয়ে বরাবর। সুতরাং শেষ দুই রাকাততে উম্মীকে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। আমাদের দলিল হলো, প্রত্যেক রাকআতই মূলত স্বতন্ত্র নামাজ। এজন্য কোনো রাকআতই কিরাআত থেকে খালি হতে পারে না। চাই কিরাআত হাকীকাতান হোক অথবা তাকদীরান। অর্থাৎ প্রথম দু রাকাততের কিরাআত হাকীকাতান। আর শেষের দুই রাকাততের কিরাআত তাকদীরান। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রথম দুই রাকাততের কিরাআত-ই শেষ দুই রাকাততের কিরাআত। আর উম্মীর ক্ষেত্রে এ উভয়টার কোনোটাই নেই। তাহকীকান না হওয়া তো যাহির। আর তাকদীরান এ কারণে নেই যে, তার মধ্যে কিরাআতের যোগ্যতা নেই।

এমনিভাবে তাশাহুদের মধ্যে তাশাহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে যদি কোনো উম্মীকে খলীফা বানানো হয় তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। আমাদের মতে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর খলীফা করা হয় তখন ইমাম সাহেবের মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। আর কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, ইমামদের কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

## بَابُ الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ

وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدِيثُ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَنَسَى  
وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُنَافِيهَا وَالْمَشْيُ وَالْإِنْحِرَافُ  
يُفْسِدَانِهَا فَاشْبَهَ الْحَدِيثَ الْعَمَدَ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمَذَى فِي  
صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا  
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيَقْدِمْ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ بِشَيْءٍ وَالْبَلَوَى  
فِيمَا يَسْبِقُ دُونَ مَا يَتَعَمَّدُ فَلَا يُلْحَقْ بِهِ -

### পরিস্বেদ : নামাজের মধ্যে হাদাস হওয়া

অনুবাদ : নামাজের মধ্যে যে ব্যক্তির হাদাস ঘটে যায় সে ফিরে যাবে। যদি সে ইমাম হয় তাহলে (পিছনে দাঁড়ানো) একজনকে স্থলবতী করবে এবং অজু করে বেনা করবে। কিয়াসের দাবি হচ্ছে— নতুনভাবে নামাজ শুরু করবে। এটা ই হলো ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত। কেননা: হাদাস নামাজের বিপরীত। আর কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া এবং হুঁটাচলা করা নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটানোর সদৃশ। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নামাজে যে ব্যক্তির বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্ষরগ হয় কিংবা মজী (তরল পদার্থ) বের হয়, সে যেন ফিরে গিয়ে এবং অজু করে আর নিজের (পূর্ব) নামাজের উপর বিনা করে, যতক্ষণ না সে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, তখন সে যেন তার মুখে হাত রাখে এবং কাউকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়িয়ে দেয়, যার কোনো রাকআত ছুটেনি। সাধারণ ওজর রূপে তাই গণ্য, যা অনিচ্ছায় ঘটে যায়। আর যা ইচ্ছাকৃত ঘটে, তা তার মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং একে তার সাথে যুক্ত করা যায় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) পূর্বের অধ্যায়ে: مَفْصِدَاتُ الصَّلَاةِ -এর অনুশঙ্গিক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন এ অধ্যায়ে ঐ সকল আনুশঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা হবে যা নামাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এবং নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। বস্তুত: সালামতের আহকাম হলো আসল। আর আসল مقدم হয় তাই মুসান্নিফ (র.) সালামতের আহকামকে পূর্বে আলোচনা করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তির নামাজের মধ্যে হাদাস ঘটে যায় অর্থাৎ বেলা ইখতিয়ার হাদাস হয়ে যায়। যাকে হাদাসে সামাজী বলা হয় তখন এ সুরতে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো রকমের বিলম্ব ব্যতিরেকে নামাজ থেকে ফিরে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে নামাজ থেকে ফিরে যাবার হুকুম এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, হাদাসের পর যদি কিছু সময় অবস্থান করে তখন সে নামাজের একটি অংশ হাদাসের সাথে আদায়কারী হয়ে যাবে। আর হাদাসের সাথে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। সুতরাং নামাজের যে অংশ হাদাসের সাথে সম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করা হবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে, আর যেহেতু كل ফাসিদ হওয়ার দ্বারা كل ফাসিদ হয়ে যায় এ জন্য পুরো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর كل ফাসিদ হওয়ার দ্বারা كل কারণে ফাসিদ হয়ে যায় যে, ফাসাদকে (تجزى) ভাগ করা যায় না। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, যখন নামাজের একটি অংশ ফাসিদ হয়ে যাবে তখন পুরো নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা একই নামাজ সহীহ এবং ফাসাদকে এক সাথে কবুল করে না।

এখন যে ব্যক্তি হাদাসমত্ত হলো সে যদি ইমাম হয় তখন মুক্তাদীর মধ্য থেকে কাউকে নিজের খলীফা নির্ধারণ করে নিবে। আর খলীফা নির্ধারণ করার সূরত হলো, তার কাপড় ধরে তাকে মেহরাবের দিকে টেনে নিবে এবং নিজে অঙ্কু করে 'বিনা' করবে অর্থাৎ ঐ নামাজকে অঙ্কুর পর পুরো করে নিবে।

কিয়াসের দাবি হলো নতুনভাবে নামাজ শুরু করবে। এটাই ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, হাদাস নামাজের বিপরীত। কেননা নামাজের জন্য তাহারা ত জরুরি। আর হাদাস তাহারাতে বিপরীত। আর যা লামিমের বিপরীত তা মালুমেরও বিপরীত হয়। সুতরাং সাবাস্ত হলো যে, হাদাস তাহারাতে رنط, য় নামাজের অন্তরায়। আর কায়দা আছে, কোনো (شئ) জিনিস তার বিপরীতের সাথে বাকি থাকে না। সুতরাং হাদাসের সাথে নামাজও বাকি থাকবে না। তাই নতুনভাবে শুরু থেকেই নামাজ পড়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বেনা করার সূরতে নামাজের মাঝখানে হাঁটচলা করা এবং কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া লামিম আসে। আর এই উভয় কাজ নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। আর কায়দা আছে, যে জিনিস নামাজকে ফাসিদ করে দেয় নামাজ তার সাথে বাকি থাকে না। যেমনিভাবে ইচ্ছাকৃত হাদাসের সাথে নামাজ বাকি থাকে না। বুঝা গেল, হাঁটচলা এবং কিবলা থেকে ফিরে যাবার দ্বারা নামাজ বাকি থাকবে না। আর যখন নামাজই বাকি থাকল না তখন তার দোহরানো জরুরি। মোটকথা, তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটানোর সদৃশ হয়ে গেল। আর ইচ্ছাকৃত হাদাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে বেনা জায়েজ নেই। সুতরাং ঐ হাদাসের মধ্যেও বেনা জায়েজ হবে না; বরং শুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি।

আমাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস :

مَنْ قَامَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمَدَى فَنِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصِرْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ نَأْمَ يَنْكَلَمْ.

দ্বিতীয় দলিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ نَفَاةً أَوْ رَعَفَ فَلْيُصَبِّحْ يَدَهُ عَلَى قَبِيهِ وَلْيَقِيمِ مَنْ لَمْ

يَنْصِرْ. যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাজ শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় তখন েনে তার মুখে হাত রাখে এবং কাউকে আগে বাড়িয়ে দেয়, যার কোনো রাকআত ছুটেনি। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুদরিককে স্থলবতী বানানো হবে, মাসবুকে নয়। কেননা যদি মাসবুকে স্থলবতী বানানো হয় তখন সে সালাম ফিরাবার পূর্বেই কোনো মুদরিককে খলীফা বানাবে, যাতে মুদরিক সালাম দ্বারা লোকদের নামাজ পুরা করে দেয়। আর মাসবুকে ইমাম তার নামাজ পূর্ণ করবে। সুতরাং মাসবুকে খলীফা বানানোর দ্বারা বারবার খলীফা বানানো লামিম আসে। এ জন্য উত্তম হলো, প্রথমেই গায়রে মাসবুক তথা মুদরিককে খলীফা বানাবে। তাহলে বারবার খলীফা বানানোর দ্বারা বিপত্তি থেকে নাজাত পাওয়া যাবে। মোটকথা, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা 'বিনা' জায়েজ হওয়ার সূরত এভাবে হয় যে, হাদীসে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ, وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ-এর وَلْيَبْنِ শব্দটি হচ্ছে, امر-এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো اباحت তথা মুবাহ্ হওয়ার পর্যায়। এ জন্য বেনা-র মুবাহ্ হওয়া সাবিত হয়। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হাদীসের মধ্যে وَلْيَتَوَضَّأْ-এর সীগাহ উজ্বের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে তো وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ-এর উজ্বের জন্য হওয়া উচিত। অথচ ফুকাহায়ে আহনাফ উজ্ব বলেন না? এর জবাব হলো- আমাদের মতে قران في النظم - قران في الحكم-এর জবাব হলো।

তাহাড়া খেলাফায়ে রাশিদীন, ফুকাহায়ে সাহাবা (যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস ইবনে মালিক, সালামান ফারসী (রা.) ঐ কথার উপর একমত যা আমরা বলেছি। অর্থাৎ 'বিনা' জায়েজ হওয়ার উপর, উজ্বের উপর নয়। আর ইজমার কারণে কিয়াসকে তরক করা যায়। তাই وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ-কে- وَلْيَتَوَضَّأْ-এর উপর কিয়াস করা যাবে না। দ্বিতীয় হাদীসের মধ্যে শুধু খলীফা বানানোর (استخلاف) বয়ান রয়েছে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী سَمَنْ لَمْ يَنْصِرْ يَنْصِرْ-এর মধ্যে উত্তম হওয়ার বয়ান রয়েছে। কেননা মুদরিক - মাসবুকের তুলনায় নামাজ পূর্ণ করার অধিক যোগ্য। তাই মাসবুকে খলীফা বানালে খেয়ানত হবে।

তাহাড়া وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের খোলাসা হলো, অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া হাদাসকে ইচ্ছাকৃত হাদাস-এর উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। কারণ উভয়টির মধ্যে পার্থক্যকারী বিনামান। কেননা অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া হাদাসের মধ্যে ইচ্ছাকৃত রয়েছে। কেননা তা তার ফেলেল ছাড়াই হাসিল হয়ে যায়। এ জন্য তাকে মাঙ্কুর ধরা হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হাদাসের মধ্যে এমনটি নেই। তাই এই পার্থক্য ধাকা অবস্থায় একটাকে অপরাটের উপর কিয়াস করা সহীহ হবে না।

وَالْأَسْتِثْنَاءُ أَفْضَلُ تَحَرُّرًا عَنِ شُبْهَةِ الْخِلَافِ وَقَبْلَ الْمُنْفَرِدِ يَسْتَفِيلُ إِلَّا لِمَامٍ  
وَالْمُقْتَدِي يَبْنِي صَيَانَةَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُنْفَرِدِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ فِي مَنَزِلِهِ وَإِنْ شَاءَ  
عَادَ إِلَى مَكَانِهِ وَالْمُقْتَدِي يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَعَ أَوْ لَا يَكُونَ  
بَيْنَهُمَا حَائِلٌ۔

অনুবাদ : তবে নতুন করে পড়ে নেওয়াই উত্তম। যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা থেকে বাঁচা যায়। কারো কারো মতে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি নতুনভাবে পড়বে। আর ইমাম ও মুক্তাদী হলে জামাআতের ফজিলত সংরক্ষণ করার জন্য বেনা করবে। আর মুনফারিদ ইচ্ছা করলে নিজের (অজুর) স্থানেই নামাজ পূরা করে নিবে, আবার ইচ্ছা করলে নিজের নামাজের স্থানে ফিরে আসবে। কিন্তু মুক্তাদী নিজের স্থানে ফিরে আসবে। তবে যদি তার ইমাম (নামাজ থেকে) ফারিগ হয়ে যায় কিংবা যদি উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে (তাহলে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই)।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদরী গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মাসআলায় যদিও 'বেনা' করা জায়েজ তবে নতুনভাবে শুরু থেকে পড়াই উত্তম। যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, শুরু করার মধ্যে আমলকে বাতিল করা (ابطال عمل) হয়? তখন আমরা জবাবে বলব, এতে অবশ্যই عمل ابطال আছে, তবে তা ইকমাল তথা পরিপূর্ণ করার জন্য। আর এ ধরনের ইবতালে আমল প্রশংসনীয়, অ-প্রশংসনীয় বা ঘৃণ্য নয়। কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, মুনফারিদের নতুনভাবে পড়া উত্তম। আর ইমাম ও মুক্তাদীর 'বিনা' করা উত্তম। তাহলে জামাআতের ফজিলত সংরক্ষিত থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, যদি ইমাম ও মুক্তাদীর দ্বিতীয় জামাআত পাবার সম্ভাবনা থাকে তবে নতুনভাবে শুরু থেকে পড়া উত্তম। নতুবা 'বেনা' করা উত্তম।

قَوْلُهُ وَالْمُنْفَرِدُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ الْعَمَلُ : গ্রন্থকার বলেন, মুনফারিদের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে বেনা করে সেখানেই নামাজ পূরা করবে যেখানে অজু করেছে। কেননা এর মধ্যে ইটাচলা কম। আবার ইচ্ছা করলে নিজের স্থানে ফিরে আসতে পারবে। যাতে তার পুরো নামাজ একই স্থানে আদায় হয়ে যায়। প্রথম মতটি আমাদের কোনো কোনো মাশায়িবেহর, আর দ্বিতীয় মতটি শামসুল আইখা সারাখসী এবং শায়খুল ইসলাম খাহারযাদার (র.)-এর।

অবশ্য মুক্তাদী নিজের স্থানে ফিরে এসে নামাজ পূরা করবে। যদিও এ মুক্তাদী হাদাসগ্রস্ত ইমাম হয় যিনি খলীফা বানিয়েছিলেন। মুক্তাদীর জন্য এ হুকুম ওয়াজিব। তবে দু'টো সুরত এর থেকে বহির্ভূত। এক, তার ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেছে। দুই, তার ও ইমামের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে। অর্থাৎ মুক্তাদী যেখানে অজু করেছে সেখান থেকে ইমামের সাথে ইকতিদা করার মধ্যে মাঝখানে এমন কোনো প্রতিবন্ধক নেই যা ইক্তিদা বারণকারী। যেমন- প্রশস্ত রাস্তা, বড় নদী, জানালাবিহীন উঁচু দেয়াল ইত্যাদি থাকা। এ দুই স্থানে মুক্তাদী যদি অজুর স্থানে নামাজ পূরা করতে চায় তবে কোনো অসুবিধা নেই।



وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ آخَذَتْ فَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَخُذْهُ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي مَا بَقِيَ وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا الْاسْتِقْبَالُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) لِيُجُودَ الْإِنْصِرَافُ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ وَجْهِ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ أَنْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْأَصْلَاحِ الْآتَرَى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَالْحَقُّ قَصْدُ الْأَصْلَاحِ بِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمَكَانُ بِالْخُرُوجِ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তির মনে হলো যে, তার হাদাস হয়েছে এবং এই মনে করে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল, পরে বুঝতে পারল যে, তার হাদাস হয়নি, তবে সে নতুনভাবে নামাজ আদায় করবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট নামাজ পড়ে নিবে। অবশ্য উভয় অবস্থাতেই কিয়াসের দাবি হলো নতুন করে আদায় করা। এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বর্ণনা ও বটে। কেননা এ ক্ষেত্রে ওজর ছাড়া নামাজ থেকে ফিরে যাওয়া পাওয়া গেছে। ইস্তিহসানের কারণ হলো, সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। দেখুন না, যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের নামাজের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করা হবে যতক্ষণ না বের হওয়ার কারণে স্থানের ভিন্নতা দেখা দেয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তির নামাজে থাকা অবস্থায় মনে পড়ল তার হাদাস হয়েছে। তাই সে নামাজের স্থান থেকে ফিরে গেল। অতঃপর বুঝতে পারল যে তার হাদাস হয়নি। এখন দেখতে হবে তার কিবলা থেকে মুখ ফিরানো তা নামাজের সংশোধনের জন্য ছিল না নামাজ ভঙ্গ করার ইচ্ছায় ছিল? যদি দ্বিতীয়টি হয় তবে তার 'বিনা' করা সহীহ হবে না। চাই সে মসজিদ থেকে বের হোক বা না হোক। আর যদি প্রথমটি হয় তবে তারও দু'টো সূরত রয়েছে। কেননা তখন মসজিদ থেকে বের হয়েছে অথবা হয়নি। যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে থাকে তখন এ সূরতে শুধু থেকে নামাজ নতুনভাবে পড়বে, 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে তখন সে তার অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করবে। শুধু থেকে নতুনভাবে নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উভয় সূরতে (মসজিদ থেকে বের হোক বা না হোক) কিয়াসের দাবি হলো, নামাজ শুরু থেকে পড়া; বিনা না করা। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে, কিয়াসের দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে কোনো ওজর ব্যতীত কিবলা থেকে মুখ ফিরানো পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, বিনা ওজরে কিবলা থেকে মুখ ফিরানো দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। উপরোক্ত উভয় সূরতে ওজর ছাড়া কিবলা থেকে মুখ ফিরানো পাওয়া যাবার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর নামাজ ফাসিদ হয়ে গেলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। 'বিনা' করা ওয়াজিব নয়। এ জন্য ঐ দুই সূরতে নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে।

ইস্তিহসানের কারণ হলো, এ ব্যক্তি নামাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গেছে। এ জন্য এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। তাইতো যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের নামাজের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। শরিয়তে এমনটি সাবিতও আছে। যেমন- যদি কাকিররা মুসলমান বন্দীদেরকে নিজেদের ঢাল বানিয়ে নেয় তবে মুসলমানদের জন্য তাদের দিকে তীর চালানা জায়েজ। কিন্তু শর্ত হলো, মুসলমান তীরশালকদের ইরাদা **رَمَى إِلَى الْكُفَّارِ** হতে হবে। মুসলমান বন্দীদের দিকে তীর চালানা হবে পাতাবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে তখনই যুক্ত করা হবে যখন মসজিদ থেকে বের হওয়া সবুও স্থান পরিবর্তন না হয়। কেননা স্থানের পরিবর্তন দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে যায়। আর স্থান ঠিক থাকলে তাহরীমা ঠিক থাকে।

وَأَنْ كَانَ اسْتِخْلَافَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ عَمَلَ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افْتَتَحَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وَضُوءٍ حَيْثُ تَفَسَّدَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لِأَنَّ الْإِنْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفِضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْتَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ وَمَكَانُ الصُّفُوفِ فِي الصَّخَرَاءِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَقَدَّمَ قَدَامَهُ فَالْحَدُّ السُّتْرَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِقْدَارُ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِّدًا فَمَوْضِعُ سَجُودِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - وَإِنْ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أَغْمَى عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وَجُودَ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَكَذَلِكَ إِذَا فَهَقَهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَهُوَ قَاطِعٌ وَإِنْ حَصَرَ الْإِمَامُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَاهُمْ عِنْدَائِي حَنِيفَةً (رح) وَقَالَا لَا يُجْزِيهِمْ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وَجُودَهُ فَاشْتَبَهَ الْجَنَابَةَ وَلَهُ أَنْ الْإِسْتِخْلَافَ بِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هُنَا الزَّمُ وَالْعَجْزُ عَنِ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ نَادِرٍ فَلَا يُلْحَقُ بِالْجَنَابَةِ -

অনুবাদ : আর যদি (ইমাম হওয়ার কারণে) সে কাউকে স্থলবর্তী করে থাকে তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে ওজর ছাড়া আমলে কাছীর হয়েছে। আর এটি নিম্নোক্ত মাসআলার বিপরীত যে, এক ব্যক্তির ধারণা যে, সে অজু ছাড়া নামাজ শুরু করেছে এবং ফিরে যায় তারপর বুঝতে পারে যে, সে অজু অবস্থায় আছে, তাহলে (মসজিদ থেকে) বের না হলেও তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এই ফিরে আসাটা নামাজ তরক করার ভিত্তিতে হয়েছে। দেখুন না যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই তার নতুন করে নামাজ শুরু করতে হতো এই মূল কথা। আর খোলা মাঠের কাতারের স্থানের বিষয়টি হলো মসজিদের হুকুমভুক্ত। যদি সামনের দিকে যায় তাহলে সুতরা (বা লাঠি) হলো সীমানা। আর যদি সুতরা না থাকে তাহলে (সীমানা হলো) তার পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ। আর মুনফারিদ হলে চারদিকে তার সিঁদার জায়গা পরিমাণ। আর কেউ যদি (নামাজের মধ্যে) পাগল হয়ে যায়, কিংবা ঘুম আসার পর ইহতিলাম হয়ে যায়, কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। কেননা এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া বিরল। সুতরাং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে نص (নস) রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। সেরূপ যদি অট্টোহাস্য করে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ে। আর কথা বলা নামাজ ভঙ্গকারী। যদি ইমাম কিরাআতে আটকে যাওয়ার কারণে অন্যকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে তাদের নামাজ দুরস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের নামাজ দুরস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের ঘটনা বিরল। সুতরাং তা (নামাজরত অবস্থায়) জানাবাতের সদৃশ হলো। (অর্থাৎ নামাজের মাঝে যদি রোগ বশত কারো বীর্যস্থলন হয় তবে বিরল ব্যাপার হিসাবে এ ক্ষেত্রে হুকুম হলো নামাজ নতুন করে শুরু করা। তদ্রূপ এটিও বিরল ঘটনা হিসাবে একই হুকুম ভুক্ত হবে।) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, স্থলবর্তী করা হয় অক্ষমতার কারণে। তা এখানে অধিক প্রযোজ্য। আর কিরাআতের অক্ষমতা বিরল নয়। সুতরাং জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

### প্রাথমিক আলোচনা

মাসআলা : যদি হাদাসগ্রন্থ ব্যক্তি (ইমাম) কাউকে স্থলবর্তী বানায়; পরে মনে হয় যে, তার হাদাস হয়নি, তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও সে মসজিদ হতে বের না হয়ে থাকে। দলিল হলো, খলীফা বানানো আমলে কাছীর। আর ওজর ছাড়া আমলে কাছীর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এ জন্য ঐ সূরতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে যদি মুসত্তীরা খলীফা বানায় তাহলে ইমাম ব্যতীত সকলের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি মুসত্তীরা মনে হয় যে, হাদাস হয়ে গেছে তবে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ সূরতে ওজর বিদ্যমান। সুতরাং খলীফা বানানো **حُرُوفٌ مِّنَ التَّمْجِيدِ**-এর সদৃশ। অর্থাৎ মসজিদ থেকে বের হওয়া যদি নামাজের সংশোধনের জন্য হয়ে থাকে এবং ওজরও বিদ্যমান থাকে; তবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। এমনভাবে খলীফা বানানোও যদি নামাজের সংশোধনের জন্য হয়ে থাকে এবং ওজরও থাকে তবে খলীফা বানানোর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নামাজের সংশোধনের জন্য ফিরে আসা তার বিপরীত। যেমন- সে মনে করল যে, বিনা অজুতে সে নামাজ শুরু করেছে। অতঃপর অজু করার জন্য সে রওয়ানা হলো, পরে মনে পড়ল যে, তার অজু আছে। এতে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এ সূরতেও তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যদিও সে মসজিদ থেকে বেরিয়ে না থাকে। কেননা এই ফিরটা ছিল নামাজকে ভঙ্গ করার জন্যে। নামাজকে সংশোধন করার জন্যে নয়। সুতরাং সে যদি অজু ছাড়া হতো তবে তো তার শুরু থেকে নামাজ পড়তে হতো। আর কায়দা আছে, যদি নামাজ থেকে ফিরটা নামাজের সংশোধনের জন্য হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না, শর্ত হলো মসজিদ থেকে বের না হওয়া এবং খলীফা বানানো - না পাওয়া যাওয়া। আর যদি নামাজ ভঙ্গ করার ইরাদায় ফিরা হয়ে থাকে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

**وَمَكَانَ السُّنُوبِ** - এর দ্বারা গ্রন্থকার একথা বলতে চাচ্ছেন যে, উপরোক্ত ব্যাপারগুলো যদি মসজিদে না হয়ে খোলা মাঠে বা ময়দানে হয়ে থাকে। আর মনে পড়ে যে হাদাস হয়ে গেছে, তখন কাতারগুলোর কাতারের স্থানের হুকুম মসজিদের হুকুমের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ হাদাস ধারণাকারী ব্যক্তি যদি পিছনের দিকে যায় এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে যায়, পরে জানা যায় যে হাদাস হয়নি, তবে তার 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। এমনভাবে যদি ডান দিকে বা বাম দিকে কাতার অতিক্রম করে যায় - তাহলেও 'বিনা' করা জায়েজ হবে না। আর যদি কাতারগুলো অতিক্রম না করে তবে 'বিনা' করা জায়েজ হবে। আর যদি সে সামনের দিকে যায় এবং সামনে সুতরা থাকে, তবে সুতরাই হলো তার সীমানা। এমনকি যদি সে সুতরা অতিক্রম করে যায় তাহলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি সামনে সুতরা না থাকে তখন পিছনের কাতার অনুযায়ী তার সীমানা নিরূপিত হবে। যেমন পিছনের কাতার যদি পাঁচ গজ পর্যন্ত হয় - তবে সামনের কাতারও পাঁচ গজ পর্যন্ত হবে। এর অধিক অতিক্রম করলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

আর যদি হাদাস এর ধারণাকারী ব্যক্তি মুন্ফারিদ হয় (তখন তার সীমানা) চারদিকে সিজদার জায়গা পরিমাণ হবে। অর্থাৎ ডানে, বায়ে, পিছনের দিকে সর্বত্র একই সীমানা হবে।

**قَوْلُهُ وَانْ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاتَّخَذَ الْمَنَاحَ** : যদি মুসত্তীরা পাগল হয়ে যায়। চাই সে ইমাম, মুক্তানী বা মুন্ফারিদ হোক। অথবা নামাজে ঘুম আসায় ইহতিলাম হয়ে গেছে কিংবা সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ সকল সূরতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। দলিল হলো, নামাজের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটা বিরল। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঐ সকল ঘটনার অর্থে নয় যেগুলো **حَدَّثَ غَيْرُ مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَىٰ فَيُصَلِّيهِ صَلَاتِهِ الْمَنَاحَ**-এর বাণী **الْمَنَاحَ** মোটকথা, মোটকথা **نَسِ** (নস) এসেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ **ﷺ**-এর বাণী **الْمَنَاحَ** তথা এমন হাদাস যা ঘটে যাওয়া বিরল নয়, যেমন বায়ু, বমি, নাকরীস ইত্যাদির মধ্যে 'বিনা' করা জায়েজ। তবে এমন হাদাস যা ঘটা বিরল এর মধ্যে কেনা করা জায়েজ নেই। এমনভাবে যদি সে নামাজে অট্টহাসি দেয় তাহলেও 'বিনা' করা জায়েজ হবে না; বরং শুরু থেকে নামাজ পড়তে হবে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়েই। আর কথা হলো নামাজ ভঙ্গকারী। কেননা রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন **مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ** তথা (যতক্ষণ না কথা বলে) 'বিনা' করতে পারবে। বুঝা গেল, কথা বললে 'বিনা' জায়েজ হবে না।

حصر-এর অর্থ হলো, মন সংকোচিত হওয়া, কথা বলায় অপারগ হওয়া। ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে এমনভাবে অপারগ হয়ে পড়ে যে, তা করার আর সামর্থ্য রাখে না তার ক্ষেত্রে বলা হয় قَدْ حَصَرَ عَنْهُ সূতরাং ইমামের যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ ছিল তার পুরোটা ভুলে যাবার কারণে যদি সে কিরাআতে আটকে যায় তখন বলা হবে যে, সে কিরাআত করতে অপারগ। সূতরাং যদি সে মুক্তাদীদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা (স্থলবর্তী) বানায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। আর এটাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে (এ ধরনের স্থলবর্তী নির্ধারণ করা) জায়েজ নেই। তাদের দলিল, কিরাআতে আটকে যাওয়া- বিরল ঘটনা। যেমন- নামাজের ভিতরে জুনুবি হওয়া বিরল। সূতরাং জানাবাতের ন্যায় এটাও مَأْوَرَدٌ بِهِ النَّصُّ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যখন مَأْوَرَدٌ بِهِ النَّصُّ-এর অন্তর্ভুক্ত হলো না তখন যেমনিভাবে জানাবাতের সূরতে গুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি এমনভাবে কিরাআতে আটকে গেলেও গুরু থেকে নামাজ পড়া জরুরি হবে। খলীফা বানানো জায়েজ হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হাদাস হওয়া অবস্থায় খলীফা নির্ধারণ করা জায়েজ। কেননা এ সূরতে ইমাম নামাজ পুরা করতে অক্ষম। আর এখানে অর্থাৎ কিরাআত আটকে যাওয়া অবস্থায় অপারগতা আরো বেশি। কেননা মুহাদিস-এর জন্যে তো এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, মসজিদে পানি বিদ্যমান, আর সে খলীফা বানানো ছাড়াই নিজের নামাজ পূর্ণ করে নিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পুরো মাহফুয কুরআনকে ভুলে যায় সে তো নামাজ পুরা করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না। তবে ইয়া, যদি দ্বিতীয়বার মুখস্থ করে এবং পুরো কুরআন শিখে, (তবে ভিন্নকথা)। সূতরাং যখন হাদাসের সূরতে খলীফা বানানো জায়েজ অথচ এ সূরতে অপারগতা কম, তাহলে তো কিরাআত আটকে যাওয়ার সূরতে অবশ্যই খলীফা বানানো জায়েজ হবে। কেননা এ সূরতে অপারগতা অনেক বেশি।— (ইনায়া)

وَالْعَجْزُ مِنَ الْقِرَاءَةِ দ্বারা সাহেবাইনের অভিমতের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, কিরাআতে আটকে যাওয়া এটা বিরল ঘটনা নয়; বরং স্বাভাবিকভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। বরং নামাজে জুনুবি হওয়া এটা হলো বিরল। সূতরাং এক অ-বিরল ঘটনাকে বিরল ঘটনার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা দুরন্ত হবে? তাই কিরাআতে আটকে যাওয়া-তা জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

وَلَوْ قَرَأَ مِقْدَارَ مَا تَجَوَّزُ بِهِ الصَّلَاةُ لَاجْتَمَعَ لِغَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى  
الِاسْتِخْلَافِ وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَّثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوْضًا وَسَلَامًا لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلَا يَدُ  
مِنَ التَّوَضُّعِ لِإِتْنَائِهِ بِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَّثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا  
يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لَوْجُودِ الْقَاطِعِ لَكِنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ  
لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْكَانِ فَإِنْ رَأَى الْمُتِمِّمَ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ وَقَدْ مَرَّ  
مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : আর যদি নামাজ জায়েজ হওয়া পরিমাণ কিরাআত পড়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা বানান জায়েজ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে খলীফা বানানোর প্রয়োজন নেই। যদি তাশাহুদের পরে সে হাদাসগ্রস্ত হয়, তাহলে অজু করবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং তা আদায় করার জন্য অজু করা জরুরি। আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় কিংবা কথা বলে কিংবা এমন কোনো কাজ করে যা নামাজের বিপরীত, তাহলে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা নামাজ ভঙ্গকারী বিদ্যমান হওয়ার কারণে 'বিনা' সম্ভব নয়; কিন্তু নামাজ দোহরানোও তার উপর জরুরি নয়। কেননা কোনো রোকন তার জিম্মায় বাকি নেই। তায়ামুমকারী যদি নামাজের মধ্যে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আগে এর আলোচনা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ইমাম مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ কিরাআত পড়ে থাকে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে এক আয়াত আর সাহেবাইনের মত তিন আয়াত পড়ে থাকে, এরপর কিরাআত পড়তে অপারগ হয়ে যায়, তবে তার খলীফা বানানো জায়েজ নেই। যদি সে কাউকে খলীফা নির্ধারণ করে ফেলে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। দলিল হলো, যখন কোন মুসল্লী নামাজ জায়েজ হয়ে যায় পরিমাণ কিরাআত পড়ে ফেলল তখন আর খলীফা বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আর একথা স্মর্তব্য যে, শরয়ী জরুরত ব্যতীত খলীফা বানানো জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَّثُ : কোনো নামাজির তাশাহুদের পর হাদাস হলো তখন হুকুম হলো, সে অজু করবে অতঃপর সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং এ কারণে তার অজু করা জরুরি, তাহলে সে উজ্জ্বে সালাম ঠিকভাবে আদায় করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَّثُ فِي فِيهِ الْحَالَةِ : কোনো মুসল্লী যদি তাশাহুদের পর ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলে অথবা এমন কোনো কাজ করে যা নামাজের বিপরীত, তাহলে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। দলিল হলো, নামাজ ভঙ্গকারী পাওয়া যাওয়ার কারণে 'বিনা' করা তো সম্ভব নয়, তবে তার উপর নামাজ দোহরানোও জরুরি নয়। কেননা আরকানের মধ্য থেকে কোনো একটি রোকনও তার জিম্মায় বাকি নেই। তবে تَحْلِيلُ অর্থাৎ خُرُوجُ بَضْعَةٍ - তাও ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলেল করার দ্বারা আদায় হয়ে গেছে। যদিও সালাম (سلام) শব্দটি দ্বারা تَحْلِيلُ ওয়াজিব ছিল। তবে এর দ্বারা অন্য রকমের কোনো ক্ষতি হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর জাহিরে হাদীস (অর্থাৎ যার মধ্যে তাশাহুদ খতম করে বলেছিলেন, যদি তোমার দাঁড়িতে মনে চায় তখন দাঁড়িয়ে যেও)ও এদিকে ইঙ্গিতবহ।

فَإِنْ رَأَاهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدَرَ التَّشْهِيدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَاَنْقَضَتْ مُدَّةَ مَسْحِهِ أَوْ خَلَعَ  
 حُفْيَهُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَانَ أَمِيًّا فَتَعَلَّمَ سُورَةَ أَوْ عَرَبَانَا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُؤَمِّيًّا فَقَدَرَ  
 عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ تَذَكَّرَ فَإِنِئْتَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِئُ  
 فَاسْتَخْلَفَ أَمِيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهُوَ فِي  
 الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بَرٍّ أَوْ كَانَ صَاحِبَ غُذْرِ فَاَنْقَطَعَ  
 عُذْرُهُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بَمَعْنَاهَا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ  
 تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقِيلَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي فَرَضَ عِنْدَ أَبِي  
 حَنِيفَةَ (رح) وَلَيْسَ بِفَرَضٍ عِنْدَهُمَا فَاعْتِرَاضُ هَذِهِ الْعَوَارِضُ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ  
 كَاعْتِرَاضِهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَهَا مَارُونَا  
 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ آدَاءُ صَلَاةٍ أُخْرَى إِلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ وَمَا لَا  
 يُتَوَصَّلُ إِلَى الْفَرَضِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فَرَضًا وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَّتْ قَارِبَتِ التَّمَامِ  
 وَالْإِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ حَتَّى يَجُوزَ فِي حَقِّ الْقَارِئِ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ ضَرُورَةٌ حُكْمٌ  
 شَرْعِي وَهُوَ عَدَمُ صَلَاحِيَةِ الْإِمَامَةِ .

অনুবাদ : যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখতে পায়, কিংবা সে মোজার উপর মাসাহকারী ছিল, কিন্তু মাসাহ মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা আমলে কালীল (অতি সামান্য কাজ) ঘরা মোজা জোড়া খুলে ফেলে, কিংবা উম্মী ছিল কিন্তু সূরা শিখে ফেলল, কিংবা উলঙ্গ ছিল কিন্তু কাপড় পেয়ে গেল, কিংবা ইশারা যোগে নামাজ আদায় করছিল, কিন্তু রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয়ে গেল, কিংবা এই নামাজের পূর্ববর্তী কোনো কাজা নামাজ তার স্মরণ হল, কিংবা কিরাআত পাঠে সক্ষম ইমাম হাদাসগ্রন্থ হয়ে কোনো উম্মীকে খলীফা বানাল, কিংবা ফজরে সূর্যোদয় হয়ে গেল, কিংবা জুমার নামাজে থাকা অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, কিংবা সে জখমের পট্টির উপর মাসাহকারী ছিল, কিন্তু জখম ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে পড়ে গেল, কিংবা সে মাজুর ছিল, কিন্তু তার ওজর দূর হয়ে গেল, যেমন মুস্তাহাযা নারী ও তার সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্যরা-এই সকল অবস্থায় নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এ বিষয়ে আসল কথা হলো হলো, আবু হানীফা (র.) -এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কোনো 'কর্ম' দ্বারা নামাজ থেকে বের হয়ে আসা ফরজ, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা ফরজ নয়। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে এ অবস্থায় (অর্থাৎ তাশাহুদের পরে) এ সকল ঘটনা ঘটা নামাজের মধ্যে ঘটাই সমতুল্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে সালামের পরে ঘটায় সমতুল্য। উক্ত ইমাম দ্বয়ের দলিল হলো ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর হাদীস। ইমাম আবু হানীফা (র.)

-এর দলিল হলো, বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়া ছাড়া অন্য নামাজ আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে কাজ ছাড়া কোনো ফরজ কাজে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না, সে কাজটাও ফরজ। আর হাদীসে বর্ণিত **سُحْت** শব্দের অর্থ হলো সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসেছে। আর স্থলবর্তী করা (স্বকীয়ভাবে) নামাজ উঙ্গকারী নয়। এ জন্যই কিরাআত পাঠে সক্ষম ব্যক্তিকে (স্থলবর্তী) করা জায়েজ; বরং এখানে ফাসাদ এসেছে একটি শরীয়তী হুকুমের অনিবার্য প্রয়োজনে। আর তা হলো (উম্মী ব্যক্তিটির) ইমামতি করার অযোগ্যতা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে **سَائِلٌ إِنِّشَاعَرُهُ** -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ বারটি মাসআলার বর্ণনা করা হয়েছে যা তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পেশ আসে। বারটি মাসআলা নিম্নরূপ : (১) তায়ামুমকারী ব্যক্তি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখল, (২) কিংবা কেউ মোজার উপর মাসাহকারী ব্যক্তি ছিল তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর মাসাহ তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল, (৩) কিংবা তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর আমলে কালীল দ্বারা মোজা জোড়া বুলে ফেলল, অথবা দুই মোজার একটি বুলে ফেলল। আমলে কালীল হলো, মোজা এ পরিমাণ টিলা ছিল যে, হাতের জরুরত ছাড়া শুধু পায়ের ইশারা দ্বারা মোজা বুলে পড়েছে। (৪) কিংবা মুসন্নী উম্মী ছিল কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর সে কুরআনের কোনো সূরা শিখে ফেলল। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, এর দ্বারা মুরাদ হলো কুরআন ভুলে গিয়েছিল কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ সময়ের পর তার তা শ্রবণ হয়ে গেছে। এ মতলব নয় যে, সে নতুন করে শিখেছে। কেননা **تَعْلَم** তথা শিক্ষা নেওয়ার জন্য **تَعْلِم** তথা শিক্ষা দেওয়া জরুরি। আর শিক্ষা দেওয়া হলো নামাজের বিপরীত কাজ। কেউ কেউ বলেন, সূরা শিক্ষা গ্রহণ করার মতলব হলো সে বে-ইখতিয়ার কুরআন শুনেছে এবং কোনো ধরনের চেষ্টা ছাড়াই তার কুরআন শ্রবণ হয়ে গেছে। (৫) কিংবা মুসন্নী উলঙ্গ ছিল, কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর কাপড় পরে গেল। (৬) কিংবা মুসন্নী ইশাআযায়েগে রুকু-সিজ্ঞাকারী ছিল কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর রুকু-সিজ্ঞা করতে সক্ষম হয়ে গেল। (৭) কিংবা মুসন্নীর তাশাহুদের পরিমাণ বসার পর কাজা নামাজ শ্রবণ হয়ে গেল- যা তার উপর এ নামাজের পূর্বে **رَاجِبُ الْقَضَاءِ** ছিল, যেমন- জোহরের নামাজের দ্বিতীয় বৈঠকের পর মনে পড়ল যে, তার ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল, অথচ তারতীবের ফরযিয়ত হিসাবে তা আগে আদায় করা উচিত ছিল। (৮) কিংবা তাশাহুদের পরিমাণ বসার পর কারী ইমামের হাদাস হল আর সে কোনো উম্মীকে স্বীকৃতি বানাল। (৯) কিংবা তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ফজরের নামাজে সূর্যোদয় হয়ে গেল। (১০) কিংবা তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল অথচ এ ব্যক্তি জুমার নামাজরত। (১১) কিংবা মুসন্নী জখমের পথির উপর মাসাহকারী ছিল, কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর জখম ভাল হওয়ার কারণে গুজি বুলে পড়ে গেল। (১২) কিংবা সে মাদুর ছিল কিন্তু তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর তার ওজর দূর হয়ে গেল। অর্থাৎ সে ওজর ছাড়ি চলে গেছে। যেমন- মুত্তাহায়া নারী অথবা তার সমশ্রুণীর অন্যান্যরা। যেমন- যার সর্বদা পেশাব খরার ওজর রয়েছে।

উক্ত বারোটি মাসাইলের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত সকল সূরতে তার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, এ বিষয়ে আসল কথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে মুসন্নীর নিজস্ব কোনো ফেয়েল তথা কর্ম দ্বারা নামাজ থেকে বের হয়ে আসা ফরজ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তা ফরজ নয়। সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে তাশাহুদের পর এ সকল ঘটনা ঘটে যাওয়া এমন যেমন নামাজের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। (অর্থাৎ নামাজের মধ্যে দেখা দেওয়ারই সমতুল্য) আর যেহেতু নামাজের মধ্যে এ সকল ঘটনা ঘটা নামাজ বিনষ্টকারী। এ জন্য তাশাহুদের পরেও যদি এগুলো দেখা দেয় তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে তাশাহুদের পর এগুলো দেখা দেওয়া এমন- যেমন সালামের পর দেখা দিয়েছে। (অর্থাৎ সালামের পর দেখা দেওয়ার সমতুল্য) আর স্বর্ভাব্য বিষয় যে, সালামের পর কোনো ঘটনা ঘটর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। সুতরাং তাশাহুদের পর এ সকল ঘটনা ঘটলেও দেখা নামাজ ফাসিদ হবে না। তাঁদের দলিল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস : **رَأْسُ دُرٍّ هُوَ** ইবনে মাসউদ (রা.) -কে বলেছিলেন **إِذَا قُلْتُ هَذَا أَوْ قُلْتُ هَذَا فَقَدْ نَسْتُ صَلَاتِي** (যখন তুমি এটা (অর্থাৎ তাশাহুদ) বললে কিংবা এটা করলে (অর্থাৎ তাশাহুদ পরিমাণ বসলে) তবে

তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন দাঁড়াতে মনে চাইলে দাঁড়িয়ে যাও।) উক্ত হাদীস দ্বারা استدللاً এভাবে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পূর্ণ হওয়াকে তাশাহুদ পড়া যা তাশাহুদ পরিমাণ বসার সাথে যুক্ত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি পুরো নামাজকে তৃতীয় কোনো জিনিসের সাথে যুক্ত করেছে, সে نص -এর বিরোধিতা করেছে। মোদাক্কা, উক্ত মাসআলাগুলোর মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ঐ সকল ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আর শেষ বৈঠকে নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই তারপর নামাজ বাতিল হওয়ার কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, এ সময়ে অন্য নামাজ আদায় করা ফরজ। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে বর্তমান নামাজ থেকে বের হয়। সুতরাং বুঝা গেল বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়া অন্য ফরজ নামাজ আদায় করার মাধ্যম হলো। অর্থাৎ অন্য ফরজ নামাজ আদায় করা বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়ার উপর موقوف আর যেহেতু ফরজের موقوف عَلَيْهِ ও ফরজ হয়, এ জন্য বর্তমান নামাজ থেকে বের হওয়াও ফরজ হবে। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কর্ম (خُرُوجٌ بِضَعِ الصَّلَاةِ) দ্বারা নামাজ থেকে বের হওয়া ফরজ। এর (نظر) নজির হলো, যেমন এক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল কাউকে খোর-পোষ দেওয়া। আর তা রোজগার করা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই তার উপর এ রোজগার করাও ফরজ। অথবা কারো উপর সিজদা করা ফরজ। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না যতক্ষণ না সে রুকু থেকে ফিরে যায়। সুতরাং এ ফিরে যাওয়াও তার উপর ফরজ। কেননা ফরজের موقوف عَلَيْهِ -ও ফরজ হয়।

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَّتْ الْخ - ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের খোলাসা হলো, হাদীসের মধ্যে تَمَّتْ صَلَاتُكَ -এর অর্থ হলো, قَارَيْتَ السَّامَ অর্থাৎ যখন তুমি এটা করলে বা বললে তখন তোমার নামাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে। এটা এমন- যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فَقَدْ تَمَّ حُجُّهُ -এর আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ উকুফে আরাফার পর এখানে তাওয়াফে যিয়ারত যা ফরজ তা বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং বুঝা গেল, এখানেও এ অর্থ হবে যে, তার হজ সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসে গেছে।

سؤال مفرد -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো হলো, কারী ইমামের হাদাস হয়েছে। আর সে উম্মীকে খলীফা করেছে। এতে তো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ না হওয়া উচিত। কেননা খলীফা বানানো নামাজ ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং যদি এক হাদাসগ্রস্ত ক্বারী অপর ক্বারীকে খলীফা বানায় তবে নামাজ ফাসিদ হয় না সুতরাং এমনিভাবে এখানেও নামাজ ফাসিদ না হওয়া উচিত? জবাব হচ্ছে, নিশ্চয়ই খলীফা বানানো নামাজ ভঙ্গকারী নয়। এ কারণেই এক ক্বারী আরেক ক্বারীকে খলীফা বানানো জায়েজ। কিন্তু উপরোক্ত সূরতে নামাজ ভঙ্গ হওয়া খলীফা বানানোর কারণে নয় বরং অন্য কারণে। আর তা হলো শরিয়তী হুকুমের জরুরত। আর শরিয়তী হুকুমের জরুরত হলো, উম্মী যাকে খলীফা বানায় তার মধ্যে ইমামতী করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং ইমাম অযোগ্য হওয়ার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়, তাকে খলীফা বানানোর কারণে নয়। (অর্থাৎ খলীফা বানানোর কারণে নামাজ ফাসিদ হয় না; বরং খলীফা ইমামের অযোগ্যতার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়।)



وَمِنْ أَمْتَدَى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا صَلَّى رُكْعَةً فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ أَجْزَاءُ لَوْجُودِ  
 الْمَشَارِكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ وَالْأَوَّلَى لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِكًا لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إِتِمَامِ صَلَاتِهِ  
 وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ يُتَقَدَّمَ لِعَجْزِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ فَلَوْ تَقَدَّمَ بِنْتِدَى مِنْ حَيْثُ  
 انْتَهَى إِلَيْهِ الْإِمَامُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا يَسْلَمُ بِهِمْ فَلَوْ  
 أَنَّهُ حِينَ اتَّمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ فَهَقَّهُ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ  
 فَسَدَّتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةَ الْقَوْمِ تَامَةً لِأَنَّ الْمُفْسِدَ فِي حَقِّهِ وَجَدَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَفِي  
 حَقِّهِمْ بَعْدَ تَمَامِ أَرْكَانِهَا وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ قَرَعَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ تَفْسُدُ  
 هُوَ الْأَصَحُّ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইমামের এক রাকআত হওয়ার পর ইক্তিদা করল, তারপর ইমাম হাদাসগ্রস্ত হয়ে তাকে  
 আগে বাড়িয়ে দিলেন, তার পক্ষে (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার) অবকাশ আছে। কেননা তাহরীমাতে (উভয়ের)  
 অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে আগে বাড়ানো।  
 কেননা সে ইমামের নামাজকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে (মাসবুকের তুলনায়) অধিকতর সক্ষম। আর মাসবুকের উচিত  
 সালাম ফিরানোর ব্যাপারে নিজের অপারগতার কথা বিবেচনা করে অগ্রসর না হওয়া। মাসবুক যদি (ইমামের স্থলবর্তী  
 হওয়ার উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হয়, তাহলে ইমাম যেখানে এসে শেষ করেছেন, সেখান থেকে সে শুরু করবে। কেননা  
 এখন সে ইমামের স্থলবর্তী। আর যখন সে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন ইমামের সাথে প্রথম থেকে  
 অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু এই মাসবুক যদি  
 ইমামের নামাজ সম্পন্ন করার পর অষ্টহাসি দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় বা কথা বলে বা মসজিদ থেকে বের  
 হয়ে আসে, তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হবে আর মুক্তাদীদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তার ক্ষেত্রে নামাজ  
 বিনষ্টকারী বিষয়টি নামাজের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া  
 গিয়েছে। আর প্রথম ইমাম যদি (অন্যান্যদের সাথে দ্বিতীয় ইমামের পিছনে) নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে থাকে,  
 তাহলে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। আর ফারিগ না হয়ে থাকলে ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিতর্কিত মত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি এমন ইমামের ইক্তিদা করেছে- যে এক রাকআত নামাজ আদায় করেছে পরে ঐ ইমাম  
 হাদাসগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং ইমাম ঐ মাসবুকে খলীফা করেছে এমনটি কবুল জায়েজ আছে। কেননা খলীফা বানানো সহীহ  
 হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাহরীমায় উভয়ে শরিক থাকা, আর এখানে তা পাওয়া গেছে। সুতরাং খলীফা বানানো সহীহ আছে।  
 তবে উত্তম হলো, ইমাম কোনো মুদরিক তথা প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তিকে খলীফা বানাবে। কেননা সে  
 ইমামের নামাজকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে মাসবুকের তুলনায় অধিকতর সক্ষম; কেননা যদি মাসবুকে খলীফা বানানো হয়

তবে তার সালাম ফিরানোর পর অন্য কাউকে খলীফা বানানোর প্রয়োজন দেখা দেবে। স্বত্ব্য যে, এ সুরতে দু'বার খলীফা বানানো লায়িম আসে। আর দু'বারের তুলনায় একবারই খলীফা বানানো উত্তম। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাসবূকের উচিত হলো সামনে অগ্রসর না হওয়া অর্থাৎ সে, খলীফা হবে না। কেননা সে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে অপারগ। তবে খলীফা হওয়া তো জায়েজ। কিন্তু উত্তম নয়।

قَوْلُهُ فَلَوْ تَقَدَّمَ بَيْنِي وَالْخ : যদি হাদাসগ্রন্থ ইমাম মাসবূককে খলীফা বানায় আর এ মাসবূক সামনে অগ্রসর হয়, তাহলে সেখান থেকে নামাজ শুরু করবে যেখানে এসে ইমাম শেষ করেছেন। কেননা সে ইমামের স্থলবর্তী। আর যখন এ মাসবূক ইমামের নামাজ সম্পন্ন করে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন নিজে পিছনের দিক সরে পড়বে এবং কোনো মুদরিককে আগে বাড়িয়ে দিবে, যাতে সে (মুদারিক) মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরিয়ে তাদের নামাজ সম্পন্ন করতে পারে। আর মাসবূক মুদরিককে আগে বাড়াবে মাসবূক নিজে সালাম ফিরাতে অপারগ হওয়ার কারণে। কেননা এখনো তার এক রাকআত বাকি, তাই সে এমন ব্যক্তির সাহায্য নিবে যে সালাম ফিরাতে সক্ষম। আর যদি এরূপ অবস্থা হয় যে, মাসবূক খলীফা যখন ইমামের নামাজ সম্পন্ন করল, পরে অট্টহাসি দেয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটায় বা কথাবার্তা বলে বা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় - এ সকল অবস্থায় মাসবূকের নিজস্ব নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি মুক্তাদীদের মাঝেও কেউ মাসবূক থাকে তাহলে তার নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মুক্তাদীদের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, এ মুক্তাদী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরিক থাকতে হবে।

দলিল হলো, নামাজ বিনষ্টকারী কাজ মাসবূকের ক্ষেত্রে নামাজের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে নামাজের সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গেছে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নামাজের মধ্যে নামাজ বিনষ্টকারী পাওয়া গেলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। নামাজের সকল রোকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গেলে **مفسد** ফাসিদ হয় না, তবে প্রথম ইমামের দু'অবস্থা হতে পারে। এক. হয়তো সে ছুটে যাওয়া নামাজ খলীফা ইমামের পেছনে আদায় করে নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাবে। দুই. অথবা এখনো নামাজ থেকে ফারিগ হয়নি। প্রথম অবস্থায় তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা সেও মুদরিকের সদৃশ। যদিও মাঝখানে লাহিক হয়েছিল। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, মাসবূকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। এটাই বিদ্বৎমত মত।

فَإِنْ لَمْ يُخَذِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعَدَ قَدَرُ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهَقَهُ أَوْ أَحَدَتْ مُقَعِّدًا فَسَدَتْ صَلَوَةُ الذِّي لَمْ يَذَرِكْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَا لَا تَفْسُدُ وَإِنْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَهُمَا أَنَّ صَلَوَةَ الْمُقَدِّمِ بِنَاءٌ عَلَى صَلَوَةِ الْإِمَامِ جَوَازًا وَفَسَادًا وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَوَةُ الْإِمَامِ فَكَذَا صَلَاتُهُ وَصَارَ كَالسَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَلَهُ أَنَّ الْفَقْهَةَ مُفْسَدَةٌ لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيهِ مِنَ صَلَوَةِ الْإِمَامِ يُفْسِدُ مِنْهُ مِنْ صَلَوَةِ الْمُقَدِّمِ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ فِي الْمَسْبُوقِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ يَخْلَافُ السَّلَامَ لِأَنَّهُ مِنْهُ وَالْكَلَامُ فِي مَعْنَاهُ يَنْقُضُ وَضُوءُ الْإِمَامِ لِيُجُودَ الْقَهَقَةُ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ .

**অনুবাদ :** আর যদি প্রথম ইমামের হাদাস না ঘটে বরং তাশাহুদ পরিমাণ বসেন তারপর অটহাসি করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান, তাহলে ঐ লোকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, যে নামাজের প্রথম দিক পায়নি। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যদি কথা বলেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তাহলে কারো মতেই ফাসিদ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো ইমামের নামাজের উপর। যেহেতু এখানে (কারোর মতেই) ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়নি, সেহেতু মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হবে না। বিষয়টি সালাম এবং কথা বলার মতো হলো। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অটহাসি ইমামের নামাজের এ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অটহাসির সাথে যুক্ত। সুতরাং মুক্তাদীর নামাজেরও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের আর বিনা করার প্রয়োজন নেই। আর মাসবুকের বিনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ, সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা সালাম তো নামাজ সমাপ্তকারী। আর কথা সালামের সমমানের। এ ক্ষেত্রে ইমামের অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেহেতু অটহাসি নামাজে থাকা অবস্থায় হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে ইমামকে **ولا** তথা প্রথম শব্দের সাথে **مفید** করা অর্থাতঃ যথার্থ নয়। কেননা এ মাসআলায় খলীফার কোনো প্রসঙ্গ নেই তাই দ্বিতীয় ইমামও নেই। অতএব শুধু “ইমাম” বলাই যুক্তিযুক্ত। এখানে সূরতে মাসআলা হলো, ইমামের হাদাস হয়নি বরং তিনি পুরো নামাজ পড়িয়েছেন এবং তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেছেনও। অতঃপর তিনি অটহাসি দেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এতে এমন মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে যে ইমামের নামাজের প্রথমংশ পায়নি। অর্থাতঃ মাসবুকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। গ্রন্থকার মাসবুকের নামাজের সাথে **فاد** -এর **فد** এ জন্য যোগ্য করেছেন যে, মুদরিকের নামাজ কারো মতেই ফাসিদ হয় না। তবে লাহিকের নামাজের ক্ষেত্রে দুটো বর্ণনা রয়েছে। এক, ফাসিদ হওয়ার, দুই, ফাসিদ না হওয়ার। সাহেবাইন (র.) বলেন, মাসবুকের নামাজও ফাসিদ হবে না। আর যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ইমাম কথা বলে বা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে সর্ব সম্মত অভিতত অনুসারে কারো নামাজ ফাসিদ হবে না। মাসআলাটির সারমর্ম হলো, ইমাম একদল মুদরিক ও একদল মাসবুকের ইমামতি করেছেন। সালাম ফিরানোর স্থানে এসে তিনি অটহাসি করলেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাসমাত্র হলেন। তখন ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাসবুকের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে সালাম ফিরানোর স্থানে এসে যদি কথা বলেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তবে কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না।

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) সালামের মুহুর্তে এসে অট্টহাসি দেওয়া কিংবা ইচ্ছাকৃত হাদাস সৃষ্টি করা এবং কথা বলা কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য করেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করেন না।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো। ইমামের নামাজের উপর। যেমন **الْإِمَامُ ضَامِرٌ** হাদীস-এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কোনো ইমামের মতেই ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়নি, তাই মুক্তাদীর নামাজও ফাসিদ হবে না। চাই মুক্তাদী মাসবুক, মুদরিক বা লাহিক হোক। বিষয়টি ইচ্ছাকৃত হাদাস, অট্টহাসা, সালাম এবং কথা বলার মতো হয়ে গেল। অর্থাৎ যেমনিভাবে তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালাম এবং কথা বলার দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয় না এমনভাবে অট্টহাসি এবং ইচ্ছাকৃত হাদাস সৃষ্টির দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, অট্টহাসি ইমামের নামাজের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাসির সাথে যুক্ত সূতরাং মুক্তাদীর নামাজও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা মুক্তাদীর নামাজের ভিত্তি হলো ইমামের নামাজের উপর। যখন মুক্তাদীর (মাসবুকের) নামাজের এক অংশ ফাসিদ হয়ে গেল তখন বাকি নামাজের উপর 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা ফাসিদের উপর 'বিনা' করাও ফাসিদ। মোদাকথা, মাসবুকের নামাজের 'বিনা' করার প্রয়োজন নেই। কেননা তার সকল রোকন পূর্ণ হয়ে গেছে এখন তো শেষ করার সময়। কারণ ইমামের নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে মুদরিক মুক্তাদীর নামাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তবে মাসবুকের 'বিনা' করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা তার প্রথম দিকের কিছু নামাজ বাকি রয়েছে গেছে। আর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যে অংশের উপর বিনা করবে সে অংশ অট্টহাসির কারণে ফাসিদ হয়ে গেছে। আর ফাসিদ অংশের উপর বিনা করাও ফাসিদ। এ জন্য মাসবুকের বিনা করা অসম্ভব। আর যখন 'বিনা' করা অসম্ভব হয়ে গেল তাই নামাজও ফাসিদ হয়ে গেল। তবে সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা সালাম হলো নামাজ সমাপ্তকারী, নামাজ বিনষ্টকারী নয়। আর কথা বলা ও সালামের সমমানের। কেননা সালাম মূলত ডানের ও বামের লোকদের সন্মোদন করে কথা বলারই নামান্তর। কেননা সালাম তথা **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** -এর মধ্যে সন্মোদন বাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে যা কথা বলাকে বুঝায়। মোদাকথা যখন কথা বলাও সালামের সমমানের হলো তখন কথা বলাও নামাজ সমাপ্তকারী হবে, বিনষ্টকারী হবে না। সুতরাং যেমনিভাবে সালামের পর মাসবুক তার পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাজ সম্পন্ন করতে পারে এমনভাবে কথা বলার পরও সম্পন্ন করতে পারবে।

নিহায়া গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল এভাবে লিখেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাস ঘটান আর অট্টহাসি উভয়টির কোনটিই **مُوجِبَاتُ تَغْرِيبَةٍ** (তাহরীমা ওয়াজিবকারী) -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং **مَنْعَوَاتُ تَغْرِيبَةٍ** (তাহরীমা বারণকারী) -এর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য উভয়টি ইমামের নামাজের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দিবে যা তার সাথে যুক্ত। আর যেহেতু ইমামের নামাজ জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদীর নামাজকে शामिल করে, তাই মুক্তাদীর নামাজেরও এ অংশ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মাসবুক যেহেতু অবশিষ্ট নামাজ সম্পন্ন করার জন্য 'বিনা' করার মুখাপেক্ষী, কিন্তু ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ, এ জন্য উভয় সূরতে (ইচ্ছাকৃত হাদাস ও অট্টহাসি) মাসবুকদের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর সালাম ও মসজিদ থেকে বের হওয়া উভয়টি **مُوجِبَاتُ تَغْرِيبَةٍ** -এর অন্তর্ভুক্ত। সালাম **مُوجِبُ تَغْرِيبَةٍ** এভাবে যে, রাসুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন, **تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ** - (নামাজ থেকে হালাল হওয়ার উপায় হলো সালাম ফিরানো) আর **خُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ** ও **فَادَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ** (যখন নামাজ আদায় সম্পন্ন হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে) সূতরাং যখন এ দুটি **مُوجِبُ تَغْرِيبَةٍ** তাই নামাজ বিনষ্টকারী হবে না; বরং নামাজ সমাপ্তকারী হবে। এখন যখন ইমামের নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে কোনো অংশ ফাসিদ হয়নি। তাই মাসবুকও তার নামাজের 'বিনা' করতে পারবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের অট্টহাসি আইখায়ে ছালাহার মতে অজু ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সূরতে অজু ভঙ্গকারী নয়। ইমাম যুফার (র.) এ কায়দা বয়ান করেছেন যে, যে অট্টহাসি দ্বারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় তা অজু ভঙ্গকারী। আর যা এমনটি নয় তা অজু ভঙ্গকারীও নয়। সুতরাং যেহেতু ঐ সূরতে ইমামের অট্টহাসি দ্বারা নামাজ দোহরানো ওয়াজিব হয় না সেহেতু তা অজু ভঙ্গকারীও হবে না।

আইখায়ে ছালাহার দলিল হলো, অট্টহাসি নামাজে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোনো ভুল হয়ে যেতো তবে তার উপর সাহ সিদ্ধা ওয়াজিব হতো। আর যে অট্টহাসি নামাজের মধ্যে পাওয়া যায় তা অজুভঙ্গকারী হয়। এ জন্য এ অট্টহাসিও অজু ভঙ্গকারী হবে।

وَمَنْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سَجُودِهِ تَوَضُّعًا وَبَنَى وَلَا يُعْتَدُ بِأَلَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا لِأَنَّ  
إِتِمَامَ الرُّكْنِ بِالْإِنْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدِيثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِعَادَةِ وَلَوْ كَانَ إِمَامًا فَقَدَّمَ  
غَيْرَهُ دَامَ الْمَقْدَمُ عَلَى الرُّكُوعِ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُهُ الْإِتِمَامُ بِالِاسْتِدَامَةِ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ  
أَوْ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ لَهَا أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجُودِهِ فَسَجَدَهَا  
يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَهَذَا بَيَانُ الْأَوَّلَى لِتَقَعَ الْأَفْعَالُ مُرْتَبَةً بِالْقَدْرِ الْمُحْكِنِ وَإِنْ  
لَمْ يُعِدْ أَجْزَاهُ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ مَعَ الظَّهَارَةِ شَرْطٌ  
وَقَدْ وَجَدَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُلْزِمُهُ إِعَادَةَ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الْقَوْمَةَ فَرْضٌ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তির রুকুতে কিংবা সিজদায় হাদাস হয়ে যায়, সে অজু করে বিনা করবে এবং যে রুকনে হাদাস হয়েছে, তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা রোকন পূর্ণ হয় তা থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে। আর হাদাস অবস্থায় প্রস্থান সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং (উক্ত রোকনটি) দোহরানো জরুরি। আর যদি তিনি ইমাম হয়ে থাকেন আর অন্যকে আগে বাড়িয়ে থাকেন, তবে যাকে আগে বাড়ানো হয়েছে, সে রুকু দীর্ঘায়িত করবে। কেননা দীর্ঘায়িত করার দ্বারা তা পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব। (অর্থাৎ রুকু প্রলম্বিত করাই নতুনভাবে রুকু করার সমতুল্য) যদি রুকুতে বা সিজদায় মনে পড়ে যে, তার জিহ্বায় একটি সিজদা রয়ে গেছে, তখন সে রুকু থেকেই সিজদায় অবতরণ করল কিংবা সিজদা থেকে মাথা তুলে ঐ সিজদাটি করে নিল তবে রুকু বা সিজদাকে দোহরাবে। এটা হলো উত্তম হওয়ার বর্ণনা, যাতে রোকনগুলো যথাসম্ভব তারতীব মুতাবিক হয়। আর যদি না দোহরায় তবুও চলবে। কেননা নামাজের রোকনগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা শর্ত নয়। তবে তাহারাতের অবস্থায় (অন্য রোকনে) গমন শর্ত। আর তা তো পাওয়া গেছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য রুকু দোহরানো জরুরি। কেননা তাঁর মতে “কাওমা” হলো ফরজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যার রুকু বা সিজদার অবস্থায় হাদাস হয়েছে, সে মুন্ফরিদ, ইমাম বা মুক্তাদী যাই হোক তার উচিত অজু করে ‘বিনা’ করা, আর যে রোকনে হাদাস হয়েছে তা গ্রহণীয় হবে না। দলিল হলো, একটি রোকন তখনই পূর্ণ হয় যখন তা থেকে অন্য রোকনের দিকে প্রস্থান করা হয়। আর এ প্রস্থান করা ফরজ। আর হাদাসের সাথে প্রস্থান হতে পারে না। কেননা **مَنْتَقِلٌ** তথা যার দিকে প্রস্থান করা হয় তা নামাজের অংশ বিশেষ। আর হাদাস আসার পর নামাজের কোনো রোকন আদায় করা নামাজ বিনষ্টকারী। এ জন্য এ রোকন পুনরায় আদায় করা জরুরি। যেমন- যদি রুকুতে হাদাস হয়ে থাকে তবে অজু করে সে রোকনই আদায় করবে।

ইনশাআল্লাহ আরও লিখেছেন, কিয়ামের চাহিদা তো এই ছিল, যে পরিমাণ নামাজ আদায় করেছে তা সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা কিয়ামকে ঐ হাদীসের কারণে ভরক করেছি যা নামাজের ‘বিনা’র ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিয়াম অনুযায়ী শুধু ঐ রোকনের ফাসিদ হওয়া বাকি রয়েছে যার মধ্যে হাদাস সৃষ্টি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إِسَاءَةُ الْخ : আর যদি হাদাসগ্রস্ত ব্যক্তি ইমাম হয় এবং রুকুতে তাঁর হাদাস হয়েছিল, অতঃপর ইমাম অন্যকে খলীফা বানায় তাহলে ঐ খলীফার শুরু থেকে রুকু করার প্রয়োজন নেই; বরং রুকুর পরিমাণ ঐ রুকুতে অবস্থান করবে। দলিল হলো, যে ফেয়েল তথা কর্মের উপর دوام (দীর্ঘায়িত) করা হয় তার মধ্যে استدامت (অবস্থান করা)-কে শুরু থেকে করার হুকুম দেওয়া হয়। সুতরাং এখানেও খলীফার استدامت -এর সাথে রুকু সম্পন্ন করা সম্ভবপর। এ জন্য বলা হয়েছে সে রুকুতে রুকু পরিমাণ অবস্থান করবে। শুরু থেকে রুকু করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعُ الْخ : কোনো মুসল্লীর রুকুতে মনে পড়েছে যে তার একটি সিজদা রয়ে গেছে অথবা সিজদায় মনে পড়েছে যে তার জিম্মায় একটি সিজদা বাকি আছে। চাই তা তিলাওয়াতী সিজদা হোক কিংবা নামাজী সিজদা হোক। এখন যদি তার রুকুতে মনে পড়ে আর রুকু থেকেই তার কাজার জন্য সিজদায় চলে যায় এবং সিজদা কাজা করে নেয়। অথবা যদি সিজদার অবস্থায় তার কাজা সিজদার কথা মনে পড়ে, আর সে বর্তমান সিজদা থেকে মাথা তুলে সিজদা কাজা করলো। তবে যে রুকু বা সিজদায় কাজা সিজদা আদায় করলো—ঐ রুকু ও সিজদা দোহরাবে। আর এ দোহরানো হলো উত্তম এবং মোস্তাহাব। যাতে যথাসম্ভব রুকনগুলো তারতীব মুতাবিক আদায় হয়। অর্থাৎ বর্তমান রুকুর উপর সিজদাকে আগে করা সম্ভব। এ জন্য তাকে আগে করা উত্তম। আর যদি সে রুকু ও সিজদা না দোহরায় তবুও দুরস্ত আছে। কেননা যে রুকু ও সিজদায় কাজা সিজদার কথা মনে পড়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতো হয়ে গেছে। দোহরানোতো হলো শুধু তারতীবের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু যেহেতু নামাজের রোকনগুলোতে তারতীব শর্ত নয়, এ জন্য তারতীব না পাওয়া যাওয়ার কারণে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। রোকনগুলোতে তারতীব শর্ত না হওয়ার দলিল, মাসবুক তার স্বীয় নামাজ সেখান থেকে আরম্ভ করে যেখান থেকে ইমামকে পায়। তারপর ইমামের সালামের পর - তার প্রথমে ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করে, যেন মাসবুক পরের নামাজকে প্রথমে আদায় করল আর প্রথম নামাজকে পরে আদায় করল। সুতরাং তারতীব যদি শর্ত হতো তবে মাসবুকের জন্য জামাআতের ওজরের কারণে তা তরক করা জায়েজ হতো না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, এই রুকু বা সিজদা যার মধ্যে কাজা সিজদা আদায় করল তার থেকে অন্য রোকনের দিকে তাহারাতের সাথে প্রস্থান করা শর্ত। সুতরাং যখন উক্ত ব্যক্তি রুকু থেকে সোজা সিজদায় চলে গেল বা সিজদা থেকে মাথা তুলে কাজার জন্য সিজদা করল তখন তো তাহারাতের সাথে প্রস্থান করা পাওয়া গেছে। তাই ঐ রুকু বা সিজদা যার মধ্যে কাজা সিজদার কথা মনে পড়েছিল তা আদায় হয়ে গেছে। পুনরায় তা আর দোহরানোর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি রুকু থেকে মাথা উঠানো ছাড়া সোজা সিজদায় চলে যায় তবে তার রুকু দোহরানো জরুরি। দলিল হলো, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে “কাওমা” অর্থাৎ রুকু থেকে মাথা উঠানো ফরজ। সুতরাং যখন সে রুকু থেকে মাথা উঠাল না; বরং রুকু থেকে সোজা সিজদায় চলে গেল এতে সে ফরজকে তরক করেছে। আর যেহেতু সে ফরজ কাওমাকে তরক করেছে তাই তার রুকু আদায় হয়নি। আর যেহেতু তার রুকু আদায় হয়নি তাই, তা দোহরানো জরুরি।

وَمَنْ أَمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَاحْدَثَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَالْعَامُّومُ إِمَامٌ تَوَىٰ أَوْ لَمْ يَتَوَىٰ لِمَا فِيهِ  
 مِنْ صَيَانَةِ الصَّلَاةِ وَتَعْيِينِ الْأَوَّلِ لِقَطْعِ الْمَرَامَةِ وَلَا مَرَامَةَ وَتَيَمُّمِ الْأَوَّلِ صَلَاتَهُ مُقْتَدِرًا  
 بِالثَّانِي كَمَا إِذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيقَةً وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ إِلَّا صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ قَبِيلَ تَفْسُدَ  
 صَلَاتُهُ لِسِتْخَالَاتٍ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَقَبِيلَ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ إِلَّا سِتْخَالَاتٌ قَصْدًا  
 وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে, এমতাবস্থায় তার হাদাস ঘটল আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে তাকে স্থলবর্তী করার নিয়ত করুন বা না করুন। কেননা এতে নামাজ রক্ষার উপায় হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম ইমাম (কাউকে) স্থলবর্তী নিযুক্ত করে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য। আর এখানে সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। অতঃপর প্রথমজন দ্বিতীয়জনের মুক্তাদী হয়ে নামাজ সম্পূর্ণ করবে। প্রকৃতই তাকে স্থলবর্তী করলে যেমন করতো। যদি তার পিছনে বালক ও স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে কারো কারো মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা যার ইমামতি জায়েজ নেই সে খলীফা হয়েছে। অন্য মতে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে “স্থলবর্তীকরণ” পাওয়া যায়নি এবং তার ইমামতি করার যোগ্যতাও নেই। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি মাত্র অপর একজন ব্যক্তির ইমামতি করছে, অতঃপর ইমামের হাদাস হলো এবং সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে। প্রথম ইমাম তাকে স্থলবর্তী করার নিয়ত করুক বা না করুক। তবে শর্ত হলো সে ইমামতের যোগ্য হতে হবে। উক্ত ইবারতের মধ্যে একটি সম্ভাবনা এটাও আছে ঐ মুক্তাদী স্থলবর্তী হওয়ার নিয়ত করুক বা না করুক।” দলিল, ঐ সূরতে অর্থাৎ মুক্তাদী ইমাম নিযুক্ত হওয়ার দ্বারা তার নামাজের হেফাজত হয়। কেননা যদি ইমাম নিযুক্ত না হয় তখন ইমামতের স্থান শূন্য হয়ে থাকবে। আর এর দ্বারা মুক্তাদীর নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই আমরা বলেছি উপরোক্ত সূরতে মুক্তাদী নিজেই ইমাম হয়ে যাবে।

يَغْيُرُ تَعْيِينَ (নিযুক্ত হওয়া) وَتَعْيِينِ الْأَوَّلِ (নিযুক্ত ছাড়া) হতে পারে না। আর এখানে অবস্থা হলো, হাদাসগ্রন্থ ইমাম মুক্তাদীকে ইমামতের জন্য নিযুক্তি করেনি তারপরও সে ইমাম হয়ে গেছে। সুতরাং মুক্তাদী কিভাবে ইমাম হবে? জবাব হলো, হাদাসগ্রন্থ ইমাম কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য, আর এখানে যেহেতু কোনো প্রতিযোগী নেই এ জন্য حَكَا নিযুক্তি বিদ্যমান আছে। আর যেহেতু حَكَا নিযুক্তি বিদ্যমান আছে তাই ব্যাপারটি এমন হলো— যেন হাদাসগ্রন্থ ইমামই তাকে খলীফা নিযুক্ত করেছে। এখন এই হাদাসগ্রন্থ ইমাম নিজের নামাজ অন্য জনের ইকতিদা করে সম্পূর্ণ করবে। যেমন তিনি যদি তাকে হাকীকাতান (প্রকৃতপক্ষে) খলীফা করতেন তখন তার ইকতিদা করে নামাজ সম্পূর্ণ করতেন। যদি হাদাসগ্রন্থ ইমামের পিছনে অগ্রাণ্ড বয়স্ক বালক বা স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে এ ব্যাপারে মাশায়িখে কেবরামের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে ইমামের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তিনি এমন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন, যে ইমামতের যোগ্য নয়। সুতরাং যখন বালক বা স্ত্রীলোকটি ইমামতের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল যদিও হুকমান এবং হাদাসগ্রন্থ ইমাম তার পিছনে ইকতিদাকারী হয়ে গেলে। আর কায়দা আছে, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির ইকতিদা করে যে ইমামতের যোগ্য নয় তখন তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, হাদাসগ্রন্থ ইমামের নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা নামাজ ফাসিদ হওয়া তো মুক্তাদীর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার উপর موقوف যা এখানে নেই। কেননা খলীফা নিযুক্ত করা হয়তো হাকীকাতান হবে অথবা হুকমান হবে। এখানে দু’টার কোনোটিই নেই। হাকীকাতান তো এ কারণে নেই যে, হাদাসগ্রন্থ ইমামের পক্ষ থেকে তো نصدا ইচ্ছাকৃতভাবে খলীফা নিযুক্ত করা পাওয়া যায়নি। আর হুকমান এ জন্য নেই যে, বালক বা স্ত্রীলোক ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং যখন তাদের উভয়ের মাঝে ইমামতের যোগ্যতা নেই তখন হুকমানও খলীফা হতে পারবে না। তাই হাকীকাতান ও হুকমান খলীফা না হওয়ার কারণে হাদাসগ্রন্থ ইমামের নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা ইমামের নামাজ ফাসিদ হওয়া মুক্তাদীর খলীফা নিযুক্ত হওয়ার উপর ভিত্তি। আল্লাহই সত্যক অবহিত।

## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرِهُ فِيهَا

وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي الْخَطَاءِ وَالنِّسْبَانِ وَمَفْرُوعِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ صَلَاتَنَا هِذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَلَئِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ بِخِلَافِ السَّلَامِ سَاهِيًا لِأَنَّهُ مِنَ الْأَذْكَارِ فَيُغْتَبَرُ ذِكْرًا فِي حَالَةِ النَّسْبَانِ وَكَلَامًا فِي حَالَةِ التَّعَمُّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخَطَابِ.

**পরিচ্ছেদ : যা নামাজকে ভঙ্গ করে এবং যা নামাজকে মাকরুহ করে**

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা ভুলে নামাজের মধ্যে কথা বলে, তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। خطا و نسيان তথা বিচ্যুতি বা ভুলবশত কথা বলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমতে পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো সেই প্রসঙ্গি হাদীসটি। আর আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের এ নামাজ কোনো মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। নামাজতো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসটি গুনাহ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। ভুলে সালাম করার বিষয়টি-এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এটা জিকিরের এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভুলের অবস্থায় একে জিকির ধরা হবে এবং সেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। কেননা এতে সম্বোধনের এ সর্বনাম রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কথা : পিছনের অধ্যায়ে ঐ সকল عارض তথা পরিস্থিতির আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো নামাজের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে যায়। আর এ অধ্যায়ে ঐ সকল عارض-এর আলোচনা হবে যেগুলো নামাজের মধ্যে নামাজির ইচ্ছায় হয়। মোদ্দাকথা, পিছনের অধ্যায়ে عوارض غير اختياري-এর আলোচনা ছিল আর এ অধ্যায়ে عوارض اختياري-এর আলোচনা করা হবে।

সহর বলা হয় قوة مدركه তথা উপলব্ধি শক্তি থেকে সূরত দূরীভূত হয়ে যাওয়া। نسيان বলা হয় حافظه তথা স্মরণশক্তি থেকে সূরত এমনভাবে দূর হয়ে যাওয়া যাতে كسب جديد-এর মুখাপেক্ষী হতে হয়। خطا বলা হয়, সূরত তো বাকি আছে কিন্তু এক জিনিস বলার ইরাদা করা অবস্থায় বেলা ইরাদা অন্য জিনিস মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া। এ স্থানে সহর শব্দটি عام বা ব্যাপক যা উক্ত তিন প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু সহর আর نسيان-এর মাঝে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো পার্থক্য নেই তাই গ্রন্থকারও এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি তার নামাজে ইচ্ছা করে বা ভুলে কথা বলে তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। كلام আক্ষরিক অর্থবোধক শব্দকে বলা হয়, তা কখনো এক অক্ষর দ্বারা যথেষ্ট হয়ে যায় যেমন ى বাঁচো, আর যদি নিরর্থক শব্দ হয় তাকে كلام বলা হয় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে خطا ও نسيان তথা বিচ্যুতি ও ভুলবশত কথা বললে নামাজ ফাসিদ হবে না। শর্ত হলো দীর্ঘ না হওয়া। কেননা দীর্ঘ কথা বলা বিচ্যুতি ও ভুলের বিপরীত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল, رُفِعَ عَنْ أَمْتِي الْخَطَا وَالنِّسْبَانُ প্রসঙ্গি হাদীসটি। উক্ত হাদীসের অর্থ হল, আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি রহিত করা হয়েছে।



দলিল এভাবে যে, হুকুম দ'প্রকার (১) দুনিয়াবী (دنیائی) (নামাজ বিনষ্টকারী হওয়া) (২) উখরোবী (اخری) (ওনাহ্গার হওয়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন বলেছেন, আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিপত্তির দুনিয়াবী এবং উখরবী হুকুমকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ দুটো জিনিস দ্বারা কোনো জিনিস ফাসিদও হবে না এবং আখিরাতেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ওনাহ্গার হবে না। ইনশা'য়হুকার লিখেছেন, দলিল এভাবে যে, এ দুটোর *حقیقت* তো *غیر مرفوع* (রহিত হয়নি)। কেননা এগুলো মানুষের মাঝে বিদ্যমান। তাই এগুলোর হুকুম অর্থাৎ নামাজ বিনষ্টকারী হওয়া রহিত (*مرفوع*) বলে গণ্য হবে। আমাদের দলিল, মু'আবিয়া ইবনে আল-হাকাম আসসুলামী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস! পুরো হাদীসটি নিম্নরূপ—

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ  
وَأَنكَلُ أُمَّةً مَالِي أَرَأَيْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ شِزْرًا فَضَرَبُوا بِأَبْصَارِهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ تَعْلِيْمًا أَنَّهُمْ يَسْتَكْتَرُونَ لِي لَمَّا قَرَعَ  
النَّبِيُّ ﷺ دَعَائِي فَرَأَى اللَّهُ مَا رَأَيْتُ مَعْلَمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ مَا كَهَرْنِي وَلَا زَجَرْنِي وَلَكِنْ قَالَ إِنْ صَلَّيْنَا فِيهِ  
لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ .

হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, ইতিমধ্যে কেউ হাঁচি দিল, আমি বললাম *يَرْحَمُكَ اللَّهُ*। লোকেরা আমাকে খুব ক্ষীপ্রদৃষ্টিতে দেখতে লাগল; আমি বললাম তার মা তাকে হারিয়ে ফেলুন! আমার কি হলো! আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা আমাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখছ। তারা তাদের রানের উপর তাদের হাত মারল, আমি বুঝলাম তারা আমাকে চূপ করাতে চাচ্ছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে আমাকে ডাকলেন, আত্মাহর কসম! আমি তার থেকে উত্তম শিক্ষক আর কখনো দেখিনি! তিনি আমাকে ধমকালেনও না এবং ডাটলেনও না; বরং বললেন, আমাদের এ নামাজ কোনো মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। নামাজ তো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, নামাজে কথা না বলা নামাজের হক। যেমনিভাবে পবিত্র হওয়া নামাজের হক। সুতরাং যেমনিভাবে তাহারাৎ ব্যতীত নামাজ হয় না এমনভাবে কথা বললেও নামাজ হবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) বর্ণিত হাদীসটির জবাব হলো, হাদীসটি ওনাহ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। হাদীসটির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে আখিরাতের হুকুম অর্থাৎ 'ওনাহ' মুরাদ। এখন যদি দুনিয়াবী হুকুম তথা মুফসিদ হওয়া মুরাদ নেওয়া হয় তবে *مشارك عموم* লাযিম আসে, অথচ *مشارك عموم* জায়েজ নেই।

بخلان السلام - বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন, কিয়াসের সারাকথা হচ্ছে—সালাম কালামের অনুরূপ। কেননা উভয়টি নামাজ ভঙ্গকারী। সালামের ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও ভুলের মাঝে তাফসীল আছে। অর্থাৎ ভুলে কাউকে সালাম করলে নামাজ নষ্ট হয় না, ইচ্ছা করে সালাম করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ তাফসীল তো কালামের ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত ছিল! অর্থাৎ ভুলে কথা বললে নামাজ ফাসিদ না হওয়া আর ইচ্ছা করে কথা বললে ফাসিদ হওয়া। কিন্তু এমনটি হল না কেন?

জবাবের হাসিল হলো, সালাম *من كل وجه* (পুরোপুরি) কলাম-এর অনুরূপ নয়। কেননা সালাম নামাজে জিকিরের মধ্যে গণ্য। এমনটি আত্মহিয়াত্বে এর মধ্যেও পড়া হয় *السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ* (আপনার প্রতি সালাম হে নবী) আর *سَلَامٌ* আত্মাহর *حسنی* -এর একটি নাম। তবে সালামের সাথে *كاف خطاف* (সম্বোধনের *ক* সর্বনাম) যুক্ত হওয়ায় তা কালামের হুকুমে হয়ে গেছে। সোদাকথা, *السَّلَامُ عَلَيْكَ* *من وجه* - জিকির আর *من وجه* কালাম। তাই আমরা উভয়টির উপর আমল করেছি। আমরা বলেছি যদি ভুলে সালাম করা হয় তবে তা জিকিরের সাথে যুক্ত হবে এবং তা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে সালাম করে তবে কথার সাথে যুক্ত হবে, এবং এতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

فَيَأْنُ فِيهَا أَوْتَاؤُهُ أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاءُهُ فَيَأْنُ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ  
لَمْ يَقْطَعْهَا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا لِأَنَّ فِيهِ  
إِظْهَارَ الْجَزَعِ وَالتَّاسِيفِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَفْسُدْ فِي  
حَالَيْنِ وَأَوْهُ يَفْسُدُ وَقِيلَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهَمَا  
زَائِدَتَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَا تَفْسُدُ وَإِنْ كَانَتَا أَصْلِيَّتَيْنِ تَفْسُدُ وَحُرُوفُ الزَّوَائِدِ جَمَعُوهَا فِي  
قَوْلِهِمُ الْيَوْمَ تَنْسَاهُ وَهَذَا لَا يَقْوَى لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مَتَفَاهِيمِ الْعَرَبِ يَتَّبِعُ وَجُودَ حُرُوفِ  
الْهَجَاءِ وَلِفْهَامِ الْمَعْنَى وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفِ كُلِّهَا زَوَائِدٌ.

অনুবাদ : ৪ যদি নামাজের মধ্যে কাতরায় কিংবা উহ আহ শব্দ করে বা শব্দ করে কান্দে, এগুলো যদি জান্নাত জাহান্নামের স্বরণের কারণে হয়ে থাকে তবে নামাজ নষ্ট হবে না। কেননা এতে অধিক খুশখুশ প্রমাণিত হয়। আর যদি ব্যথা বা কোনো বিপদের কারণে হয়, তবে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তাতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ শব্দটি উভয় অবস্থার কোনো অবস্থাতেই নামাজ নষ্ট করবে না। আর অহ শব্দটি নামাজ নষ্ট করবে। কেউ কেউ বলেছেন, আবু ইউসুফ (র.) -এর মূল ব্যক্তব্য হলো, উচ্চারিত শব্দ যদি দুই হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা একটি যদি (আরবি ব্যাকরণ মতে) অতিরিক্ত -حروف-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ফাসিদ হয়ে যাবে, আর অতিরিক্ত হরফ সমষ্টিকে ফকীহগণ الْيَوْمَ تَنْسَاهُ বাক্যে একত্রিত করেছেন। এ ব্যক্তব্য সবল নয়। কেননা প্রচলিত অর্থে মানুষের কথা বর্ণোচ্চারণ ও অর্থ বুঝানোর অনুগামী হয়ে থাকে। আর তা এমন ধর্মির ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হতে পারে, যার সব কটি বর্ণ অতিরিক্ত বর্ণসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনিন দুঃখ-বেদনায় লিপ্ত ব্যক্তির আওয়াজ যাকে উর্দুতে کراہا এবং বাংলায় ‘কাতরানো’ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, انين অর্থ আহ বলা আর تاءه অর্থ উহ বলা। ارتفاع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমনভাবে কান্দা যার দ্বারা শব্দধ্বনি হয়। মাসআলার সারমর্ম হলো, নামাজের মধ্যে কাতরানো, আহ উহ শব্দ করা এবং এমনভাবে কান্দা যাতে শব্দ সৃষ্টি হয়ে যায়। এখন এগুলোর প্রত্যেকটি জান্নাত জাহান্নামের স্বরণের কারণে হবে কিংবা কোনো দুঃখ বা মসিবতের কারণে হবে। যদি প্রথমটি অর্থ্যাৎ জান্নাত-জাহান্নামের স্বরণের কারণে হয় অথবা উহ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এতে অধিক খুশখুশ রয়েছে। আর যেহেতু নামাজ দ্বারা খুশখুশই উদ্দেশ্য, এ জন্য অধিক খুশখুশ দ্বারা কিভাবে নামাজ ফাসিদ হবে?

দ্বিতীয়ত এ ব্যক্তি যদি স্পষ্টভাবে يَأْنُ مِنَ النَّارِ قَالَ اللَّهُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاعْزِدْكَ مِنَ النَّارِ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হয় না তাহলে كناية -এর সূরতে অবশ্যই নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো দুঃখ বা মসিবতের কারণে এ শব্দগুলো বলে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত। কেননা এতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এ কারণে তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এতেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এ ব্যক্তি যদি দুঃখ বা মসিবতের প্রকাশ স্পষ্টভাবে করে, যেমন বলে انى مصاب - হে খোদা! আমায় সাহায্য করো আমি মসিবতে আক্রান্ত। তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনভাবে كناية এবং اشارة অস্থিরতা এবং আক্ষেপের প্রকাশ দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। উভয় সূরত (উহ-আহ)-এর উপর নিম্নোক্ত اشارة ও دلالة হতে পারে, عَنْ الْأَنْبِيَاءِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) قَالَتْ إِنْ كَانَ مِنْ خُشْبَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْاَلَمِ تَفْسُدُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

طَرَسِي لَيْتَحَانَيْنِ فِي الصَّلَاةِ আয়েশা (রা.)-কে নামাজের মধ্যে কাতরানো আহ, উহ শব্দ এবং কান্নাকাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, যদি তা আল্লাহর ভয়ের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি দুঃখ ও মসিবতের কারণে হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। রাসূলুছাঃ ﷺ বলেন, নামাজের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের জন্য শোষণরবী। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ۱. হামযায় ফাতাহ এবং হাতে জযমেস সাথে বলা কোনো অবস্থায়ই নামাজ ভঙ্গকারী নয়। তা জান্নাত-জাহান্নামের স্বরণে হোক বা দুঃখ মসিবতের কারণে হোক। তবে ۲. উহ বলার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মূল বক্তব্য হচ্ছে- উকারিত শব্দ যদি দু' হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা এর একটি হরফ যদি আরবি ব্যাকরণ মতে অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, ۳. কলাম عرب তথা আরবি ভাষার ভিত্তি হলো তিন অক্ষরের উপর। কেননা এক অক্ষরের জরুরত তো এ কারণে যে তার দ্বারা ইবতিদা করা হয়। দ্বিতীয় অক্ষরের জরুরত এ কারণে যে, তার উপর ওয়াকফ করা হয়। আর তৃতীয় অক্ষরের জরুরত হলো উক্ত দুই অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করার জন্য। সুতরাং এক অক্ষর হলো اقل جمله সর্বনিম্ন বাক্য। এর উপর কালিমা বা ক্বাশামের ইতলাক হয় না। দুই অক্ষর যদি এর মধ্যে অতিরিক্ত হয় তবে আসল অক্ষরের দিকে ঝেঁয়াল করে তার ভিত্তিও এক অক্ষরের উপরই থাকবে। আর যদি দুটি আসল অক্ষর হয়, তবে তো তিন অক্ষরের অধিক পাওয়া গেল। আর اكثر - ۴. -এর স্থলবর্তী হয়। সুতরাং দুই আসল অক্ষরের উপর ব্যবহৃত কালিমা (বাক্য) দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং এ নীতিমালা অনুযায়ী ۵. আহ বলে নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এ বাক্যটি দু'টো অক্ষর (হামযা ও হা) দ্বারা গঠিত। আর উভয় (অক্ষর) অতিরিক্ত অক্ষর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর ۶. উহ বলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এর মধ্যে দুয়ের অধিক শব্দ রয়েছে। দুয়ের অধিক অতিরিক্ত অক্ষরের মধ্যে তার মূল এবং অতিরিক্ত অক্ষরের মধ্য থেকে হওয়ায় দিকে লক্ষ্য করা হয় না বরং দুয়ের অধিক অতিরিক্ত অক্ষর সঞ্চিত বাক্য নামাজকে ফাসিদ করে দেয়। চাই সবগুলো অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্তই হোকনা কেন। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, অতিরিক্ত অক্ষরের সমষ্টিকে ভাষাবিদগণ ۷. اَلْيَوْمَ تَنَسَّاء একত্রিত করেছেন। শায়খ রবী (র.) حروف زوائد -এর উপর একটি ঘটনা নকল করেছেন। ঘটনাটি হলো, একবার এক ছাত্র তার শিক্ষককে حروف زوائد সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, শিক্ষক জবাবে বললেন سَلَّتْ ছাত্র মনে করলো শিক্ষক পূর্বের পাঠের দিকে ইশারা করেছেন। অথচ পূর্বে আমি প্রশ্নও করিনি আর শিক্ষকও জবাব দেননি। এজন্য সাথে সাথে ছাত্র বলল مَسَلَّتْ قَطُ (হয়রত!) আমি তো আপনাকে কখনো প্রশ্ন করিনি! পুনরায় শিক্ষক জবাবে বললেন, اَلْيَوْمَ تَنَسَّاء ছাত্র মনে করল (শিক্ষক মহোদয়) শব্দ বলে শুধু তার মর্ম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষক আমার স্বরণশক্তিকে দুর্বল মনে করে আমাকে পরীক্ষা করে নিতে চাচ্ছেন। শিক্ষক বলেছিলেন, আমি যদি তোমাকে বলে দেই তুমি আজকেই ভুলে যাবে। এ জন্য ছাত্র সাথে সাথেই বলল وَاللَّهِ لَا اَنْسَاهُ শিক্ষক যখন বুঝলেন ছাত্রের জন্য ইশারা যথেষ্ট নয়, তাই তিনি সতর্ক করলেন বললেন يَا اَحْمَقُ اَجَبْتِكَ مَرَّتَيْنِ - ওহে নির্বোধ! আমি তোমাকে দু'বার জবাব দিয়েছি।

۸. وَهَذَا لَا يَفُوتُ দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.) যে নীতিমালা বর্ণনা করেছেন তা শক্তিশালী নয়। কেননা ۹. كَلَامُ النَّاسِ হলো নামাজ বিনষ্টকারী। আর ۱০. عَرَفَ النَّاسُ كَلَامَ دُوْةٍ জিনিসের অনুগত। এক. حروف هجا পাওয়া যাওয়া সুতরাং নামাজের আওতায়ে যদি কোনো শব্দই না হয় তবে কারো মতেই নামাজ ফাসিদ হবে না। দুই. حروف هجا গুলো অর্থবহ হওয়া। সুতরাং অক্ষরগুলো যদি অর্থবহ না হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, ۱১. كَلَامُ اَنْتُمْ اَلْيَوْمَ سَأَلْتُمُونِيهَا তখনও হয় যখন তার সবগুলো অক্ষর অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন কেউ বলল, اَنْتُمْ اَلْيَوْمَ سَأَلْتُمُونِيهَا এ বাক্যটি ۱২. مَبْنِيءٌ خَيْرٌ ও সঞ্চিত বাক্য। এতে সবগুলো حروف زوائد -এর অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। বুঝা গেল যে, ۱৩. مَطْلُفًا কলাম নামাজ ভঙ্গকারী। চাই তা حروف زوائد সঞ্চিত হোক বা حروف اصلی সঞ্চিত হোক। কিন্তু নিহায়া গ্রন্থকার এর জবাবে বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য দুই অক্ষরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অর্থাৎ ۱৪. كَلَام যদি দুই অতিরিক্ত অক্ষর সঞ্চিত হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর যদি দুয়ের অধিক অক্ষর সঞ্চিত হয় তবে সবগুলো অক্ষর অতিরিক্ত অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত তরকাইন (র.)-এর মতের সঙ্গ। অর্থাৎ নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

وَأَنْ تَتَحَنَّنَ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إِلَيْهِ وَحَصَلَ بِالْحُرُوفِ يَنْبَغِي أَنْ  
يَفْسَدَ عِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ بِعُدْوَانٍ فَهُوَ عَفْوٌ كَالْعَطَاسِ وَالْجَشَاءِ إِذَا حَصَلَ بِهِ حُرُوفٌ  
وَمَنْ عَطَسَ فَقَالَ لَهُ آخِرُ بَرَحْمَكِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِي  
مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافٍ مَا إِذَا قَالَ الْعَاطِسُ أَوْ السَّامِعُ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَارَفَ جَوَابًا .

অনুবাদ : কেউ যদি বিনা ওজরে কাশি দেয়, অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থায় নয়, আর তার ফলে হরুফ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ওজরের কারণে হয় তবে তা মাফ। যেমন হাঁচি ও ঢেকুর, যদি এতে হরফ প্রকাশিত হয়। কেউ হাঁচি দিল আর অন্যজন নামাজের মধ্যেই তাকে বَرَحْمَكَ اللَّهُ বলে উঠল তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটি ব্যবহৃত হয় মানুষের পরস্পরের সম্বোধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং উক্ত দোয়া কাজের কথার মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাঁচিদাতা অথবা শ্রোতা যদি لِيُحْمَدَ اللَّهُ বলে তবে নামাজ ফাসিদ হবে না বলে ফকীহগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এটা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো মুসল্লী গলা খাকারি দেয় আর তার কারণে অক্ষরও সৃষ্টি হয় যেমন- ا. বা ব. বললে, তবে এর দু'টো সূরত রয়েছে। এ শব্দ ধনি ওজরের কারণে হবে অথবা বিনা ওজরে হবে। যদি বিনা ওজরে হয় অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থায় হয় তবে তরফাইন (র.) -এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়া উচিত। আর যদি ওজরের কারণে হয় তবে তা ক্ষমার যোগ্য। অর্থাৎ নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন হাঁচি ও ঢেকুর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। যদি এর দ্বারা حروف هجاء বের হয়ে যায়। মাসআলা হলো, এক ব্যক্তির হাঁচি আসলে অন্যজন নামাজের মধ্যেই জবাবে بَرَحْمَكَ اللَّهُ বলল, এতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা بَرَحْمَكَ اللَّهُ -এর মধ্যে সম্বোধনের كان অব্যয় রয়েছে, যা মানুষের পরস্পর সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এ জন্য তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর মানুষের কথা নামাজ বিনষ্টকারী। তাই এটাও নামাজ বিনষ্টকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি হাঁচিদাতা অথবা শ্রোতা নামাজি ব্যক্তি لِيُحْمَدَ اللَّهُ বলে, তবে মাশায়খদের মত অনুযায়ী নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা لِيُحْمَدَ اللَّهُ বলা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়; বরং এটা আল্লাহর জিকির। আর আল্লাহর জিকির দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। এ জন্য বলা হয়েছে যে, لِيُحْمَدَ اللَّهُ বলা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। ইনশায়াৎহুকার মুহীতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় এই রয়েছে যে, হাঁচিদাতা মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, জবান নড়াচড়া করবে না, যদি জবান নড়াচড়া করে তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

وَإِنْ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تَفْسُدُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ  
إِمَامِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ثُمَّ شَرِطَ التَّكْرَارَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ  
لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَيَعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ وَلَمْ يَشْتَرَطْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ  
الْكَلَامَ بِنَفْسِهِ قَاطِعٌ وَإِنْ قَلَّ .

অনুবাদ : আর যদি কিরাআত পাঠকারী ব্যক্তি আটকা পড়ে লোকমা চায়, আর অন্য ব্যক্তি নামাজে থেকেই তাকে লোকমা দেয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো মুসল্লি নিজে ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়। কেননা এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত, তা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাবসূত কিতাবে একাধিকবার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা নামাজের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। রাজেই অল্প মাক্ফ হবে। কিন্তু জামেউস সাগীর কিতাবে এ শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা স্বয়ং মানুষের কথা অল্প হলেও তা নামাজ ভঙ্গকারী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থ- তারা يَسْتَنْصِرُونَ অর্থ- يَسْتَفْتِحُونَ আরাহা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ তা'আলার বাণী استفتاح চার ভাগে বিভক্ত। কেননা লোকমাদাতা, আর লোকমা গ্রহণকারী উভয়ে সাহায্য কামনা করে। যুক্তির দিক থেকে استفتاح চার ভাগে বিভক্ত। কেননা লোকমাদাতা, আর লোকমা গ্রহণকারী উভয়ে নামাজে হবে অথবা হবে না। কিংবা লোকমা গ্রহণকারী নামাজে, আর লোকমাদাতা নামাজের বাইরে। কিংবা তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ লোকমাদাতা নামাজে হয় আর গ্রহণকারী নামাজের বাইরে। প্রথম সূরত, অর্থাৎ যদি উভয়ে নামাজ রত না হয় তবে তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। দ্বিতীয় সূরত অর্থাৎ যখন উভয়ে নামাজে থাকে। এর আবার দু'টো সূরত রয়েছে। (ক) হয়তো উভয়ের নামাজ একই নামাজ হবে অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী ইমাম হবে আর লোকমাদাতা মুক্তাদী হবে (খ) কিংবা উভয়ের নামাজ ভিন্ন ভিন্ন হবে। প্রথম সূরতের আলোচনা সামনে করা হবে। আর দ্বিতীয় সূরত (অর্থাৎ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন নামাজ হলে) এতে উভয়ের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ লোকমাদাতা শিক্ষা দিল আর লোকমা গ্রহণকারী শিক্ষা গ্রহণ করল। এ কারণে এটা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। আর মানুষের কথা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং এগুলো দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, যদি একাধিকবার লোকমা দেওয়া হয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি একাধিকবার না হয় তবে নামাজ ফাসিদ হবে না। দলিল হলো, লোকমা এমন একটি আমল যা নামাজের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কায়দা আছে, নামাজ বিরোধী আমল যদি অধিক হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি কম হয় নামাজ ফাসিদ হবে না। সুতরাং একবার লোকমা দেওয়া হলো عمل قليل (স্বল্প আমল) আর এর চেয়ে অধিক দেওয়া عمل كثير (অধিক আমল)। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি একাধিকবার লোকমা দেওয়া হয়, তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, অন্যথা নয়। তবে জামেউস সগীর গ্রন্থে উক্ত শর্ত নেই। কেননা লোকমা দেওয়া মানে কথা বলা। আর কথা বলা সত্তাগতভাবেই নামাজ ভঙ্গকারী, যদিও স্বল্প হয়। মোদ্দাকথা, লোকমা দেওয়াকে মাবসূতকে -فعل অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর জামেউস সগীরে কলাম ও قول বলা হয়েছে। আর فعل كثير দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়, فعل قليل দ্বারা নয়। আর قليل দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার যদিও কোনোটিকে ترجيع বা প্রাধান্য দেননি; কিন্তু কে'না কোনো মাশায়িখ জামেউস সগীরের রিওয়াযকে صحيح বিতর্ক বলেছেন।

وَأَنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا اسْتِخْسَانًا لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى إِصْلَاحِ صَلَواتِهِ  
فَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ صَلَواتِهِ مَعْنَى وَيَنْوِي الْفَتْحَ عَلَى إِمَامِهِ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ  
الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مَرْخُصٌ فِيهِ وَقَرَأَ تَهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا .

অনুবাদ : আর যদি নিজের ইমামের কিরাআত বলে দেয় তবে তা ইস্তিহসান তথা সূক্ষ্ম কiyাসের দৃষ্টিতে 'কথা' রূপে গণ্য হবে না। কেননা মুক্তাদী নিজের নামাজ সংশোধন করতে বাধ্য। সুতরাং এরূপ বলে দেওয়া প্রকৃতপক্ষে তার নামাজের আমল হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য ইমামের কিরাআত বলে দেওয়ার নিয়ত করবে। নিজে পাঠ করার নিয়ত করবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত, কেননা তাকে বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিরাআত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে প্রথম সূরত যার ওয়াদা পূর্বের পৃষ্ঠায় করা হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী আর লোকমা দানকারী উভয়ের নামাজ যদি একই নামাজ হয় অর্থাৎ লোকমা গ্রহণকারী ইমাম আর লোকমাদাতা মুক্তাদী হয়। তবে এটা সূক্ষ্ম কiyাসের দৃষ্টিতে কলাম হিসাবে হবে না। দলিল হলো নিম্নোক্তটি :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ مِنْهَا كَلِمَةً . فَلَمَّا نَزَعَ مِنْهَا قَالَ ﷺ أَلَمْ تَكُنْ  
فِيكُمْ أَبَى بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ هَلَّا فَتَحْتَ فَقَالَ فَتَحْتُ أَتَيْتُهَا نَيْسَخْتُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
لَوْ نَيْسَخْتُ لَأَبَاتُكُمْ .

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে সূরায়ে মু'মিনুন পড়লেন, একটি বাক্য (এতে) ছুটে গেল। যখন তিনি নামাজ থেকে ফারিগ হলেন, তখন বললেন তোমাদের মাঝে কি উবাই ইবনে কা'ব নেই? উবাই ইবনে কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, বান্দা হাজির। তিনি বললেন, তুমি লোকমা দিলে না কেন? উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমি মনে করেছিলাম এ বাক্যটি হয়তো রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি রহিত হতো তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। -(ইনায়া) এ দ্বারা বুঝা গেল নিজের ইমামকে লোকমা দেওয়া নামাজ উল্লকারী রূপে গণ্য নয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, إِذَا  
أَمَرَ بِهَا دُحْرًا (ইমাম যখন তোমার কাছে লোকমা চায় তখন তুমি লোকমা দাও) -ফাতহুল কাদীরে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে ইমামদেরকে লোকমা দিতাম। -(হাকিম)

আকলি দলিল হলো, মুক্তাদী নিজের নামাজ সংশোধন করতে বাধ্য। তাই এরূপ লোকমা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে তার আমল হিসাবে গণ্য হবে। আর নামাজের কোনো আমল নামাজ বিনষ্টকারী নয়। এ জন্য লোকমা দেওয়াও নামাজ বিনষ্টকারী হবে না। মাশায়খদের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, মুক্তাদী নিজের ইমামের লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে না, কুরআনের কিরাআতের নিয়ত করবে। কেউ কেউ বলেছেন, কিরাআত ও তিলাওয়াতের নিয়ত করবে, লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে- লোকমা দেওয়ার নিয়ত করবে, কুরআন পাঠের নয়। কেননা মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিরাআত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ জন্য যার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে ঐ কাজ করবে না যা নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই কুরআন পাঠের নিয়ত করবে না।

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ انْتَقَلَ إِلَى أَبِيهِ أُخْرَى تَفْسَدُ صَلَوةُ الْفَاتِحِ وَتَفْسَدُ صَلَوةُ الْإِمَامِ لَوْ  
أَخَذَ يَقُولُهُ لَوْ جُودَ التَّلْفِينِ وَالتَّلْفِينِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَنْبَغِي لِلْمَقْتَدِي أَنْ لَا يَعْجَلَ  
بِالْفَتْحِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِئَهُمُ إِلَيْهِ بَلْ يَرْكَعُ إِذَا جَاءَ أَوَانُهُ أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَى أَبِيهِ أُخْرَى فَلَوْ  
أَجَابَ فِي الصَّلَاةِ رَجُلًا يَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا كَلَامٌ مُفْسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ  
(رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) لَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ لَهُ  
أَنَّهُ ثَنَاءٌ بِصِفَتِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِعِزِّهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُوَ  
يَحْتَمِلُهُ فَيُجْعَلُ جَوَابًا كَالْتَّشْمِيَةِ وَالْإِسْتِرْجَاعِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ .

অনুবাদ : আর যদি ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে লোকমাদাতার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং ইমামের নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে যদি সে তার লোকমা গ্রহণ করে। কেননা এখানে বিনা প্রয়োজনে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ সংঘটিত হলো। আর মুক্তাদীর উচিত নয় লোকমা দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা। আবার ইমামেরও উচিত নয় মুক্তাদীদের বলে দেওয়ার জন্য (লোকমা দেওয়ার জন্য) বাধ্য করা। বরং তিনি রুকুর সময় হয়ে গেলে রুকুতে চলে যাবেন কিংবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। যদি নামাজের মধ্যে কারো উত্তরে ۝ اللَّهُ اللَّهُ বলে, তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা নামাজ ফাসিদকারী কলাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটা নামাজ ফাসিদকারী হবে না। এ মতভিন্নতা তখনই, যখন এ বাক্য দ্বারা উত্তর দেওয়ার নিয়ত করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এ বাক্যটি আল্লাহর প্রশংসার অর্থেই গঠিত। সুতরাং তার নিয়তের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, বাক্যটি উত্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর উত্তর হওয়ার উপযোগিতা বাক্যটির রয়েছে। সুতরাং একে উত্তম রূপেই গণ্য করা হবে। যেমন- হাঁচির উত্তরে (ইয়ারহামুকাল্লাহ) আর إِنْ لِّلَّهِ -এর বিষয়টিও বিতুদ্ধ মতে মতবিরোধপূর্ণ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম কোনো আয়াতে আটকে গেল তা এখনো ছুটেনি, এমনতাবস্থায় ইমাম অন্য আয়াত পড়া শুরু করে দিল। অতঃপর মুক্তাদী লোকমা দিয়ে বসল। এতে লোকমাদাতার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি ইমাম তার লোকমা গ্রহণ করে তাহলে ইমামের নামাজও ফাসিদ হয়ে যাবে। দলিল হলো, মুক্তাদীর পক্ষ থেকে পাঠদান ও ইমামের পক্ষ থেকে পাঠগ্রহণ পাওয়া গেছে, যা ছিল নিশ্চয়োজন। এ জন্য ইস্তিহসান তো নেই তবে কিয়াসের চাহিদা হলো এ কথা বলা নামাজ ভঙ্গকারী হবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতটি হলো কোনো কোনো মাশায়িখের যা হিদায়া গ্রন্থকার (উল্লেখ) অবলম্বন করেছেন। আবার কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী কারো নামাজই ফাসিদ হবে না। অর্থাৎ লোকমাদাতা ও লোকমা গ্রহণকারী কারো নামাজই ফাসিদ হবে না। কেননা পূর্বে যে আছর (الْإِسْرَافُ فِي الصَّلَاةِ سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ) অতিবাহিত হয়েছে তা মৃতলাক। আর তার ইত্বলাকের চাহিদা হলো, লোকমাদাতা এবং ইমাম কারো নামাজ কোনো অবস্থায়ই ফাসিদ হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুক্তাদী উভয়কে হিদায়েত করেছেন যে, মুক্তাদী লোকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে জলদী করবে না। আর ইমাম মুক্তাদীদেরকে লোকমা দেওয়ার জন্য বাধ্য করবে না। যেমন- বারবার কোনো আয়াতকে দোহরানো, কিংবা হুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা এমনটি করবে না; বরং যখন مفرد مفروض অর্থাৎ ইমাম সাহেবের মতে এক আয়াত আর

সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত পড়া হবে তবে ককুতে চলে যাবে। আর কেউ কেউ মোস্তাহাব কিরাআতকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মোস্তাহাব কিরাআত পড়া হলে ককুতে চলে যাবে। অথবা ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ যে আয়াতে আটকে গেছে সে আয়াত ছেড়ে দিয়ে অন্য আয়াত আরম্ভ করবে। মোদ্দাকথা তাদেরকে লোকমা দিতে বাধ্য করবে না।

أَلَا مَعَ اللَّهِ يَدِي فِي الصَّلَاةِ: যদি মুসল্লীর সামনে কেউ বলে অল্লাহ্ সাহেব কি কোনো ইলাহ আছে? এর উত্তরে মুসল্লী নামাজের মধ্যে বলে উঠল لا اله الا الله এখন তার এ কথার দু' অবস্থা হতে পারে। হয়তো এর দ্বারা সে জবাবের ইচ্ছা করেছে অথবা নিজের নামাজে থাকার কথা জানানোর ইরাদা করেছে। যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার হুকুম সামনে আলোচিত হবে। আর যদি প্রথমটি হয় তবে তরফাইন (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এ বাক্যটি মূলতঃ معنى مضموع হিসাবে باری تعالیٰ وثناء تبارك و تعالیٰ তথা আল্লাহর প্রশংসার অর্থে গঠিত। আর যে বাক্য معنى مضموع হিসাবে আল্লাহর প্রশংসায় গঠিত হয় তা متکلم-এর ইরাদা দ্বারা পরিবর্তন হয় না। যেমন- মুসল্লী যখন তার এ বাক্য দ্বারা নিজের নামাজে থাকার খবর দেওয়ার ইরাদা করে তবে এর দ্বারা معنى مضموع এর পরিবর্তন হবে না। এমনিভাবে জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করার সুরতও معنى مضموع পরিবর্তন হবে না। আর معنى مضموع যেহেতু مضموع-এর ইরাদা দ্বারা পরিবর্তন হয় না তাই لا اله الا الله বলা দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হবে না।

তরফাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে- باری تعالیٰ বাক্যটি এমন যা باری تعالیٰ তথা আল্লাহর প্রশংসা এবং জবাব উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। তাই এটা كلام مشترك - যৌথ বাক্যের সদৃশ। আর مشترك معانی-এর মধ্য থেকে 'ইরাদার' দ্বারা একটি অর্থকে নির্ধারিত করা জায়েজ। সুতরাং যখন মুসল্লী لا اله الا الله দ্বারা জবাবের ইরাদা করেছে তখন তাকে জবাবই ধরা হবে। যেমন- হাটির জবাব অর্থাৎ يَرْجَمُكَ اللهُ যেহেতু জবাব, এ জন্য তা মানুষের কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর মানুষের কথার দ্বারা যেহেতু নামাজ ফাসিদ হয়ে যায় সেহেতু لا اله الا الله দ্বারাও জবাব মুরাদ নেওয়ার সুরত নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইনশা'য়াক্বাল্লাহ্ একটি প্রশ্ন ও তার জবাব উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলেন। অথচ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন، اَدْخُلُوْهُمَ بِسَلَامٍ أَمِيْنٍ। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবের ইচ্ছা করেছেন। অথচ তাঁর নামাজ ফাসিদ হয়নি। বুঝা গেল যে, যদি কোনো আয়াত কিংবা كلمة توحيد দ্বারা জবাবের ইচ্ছা করা হয় তখনো নামাজ ফাসিদ হয় না। শামসুল আইশা সারাখসী (র.) এর জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছন থেকে তিলাওয়াত করতে করতে ইবনে মাসউদের ইজাজত চাওয়ার সময়ে উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সুতরাং বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াত তিলাওয়াতের ইরাদায় পড়েছেন, জবাব দেওয়ার ইচ্ছায় পড়েননি। সুতরাং এর দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করা জায়েজ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি মুসল্লীর সামনে কেউ বলে, অমুক মরে গেছে। মুসল্লী বলল وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ তবে এর মধ্যে মাশায়িখদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ সুরতটিও মতবিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ তারফাইন (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। আর কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, এ সুরতটি مضموع অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহি-এর ক্ষেত্রে নামাজ ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তরফাইন (র.)-এর সাথে মতফৈশ করেন। তবে প্রশ্ন হলো, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট পার্বক্ব কি? যে لا اله الا الله নামাজ ভঙ্গকারী নয় আর لا اله الا الله নামাজ ভঙ্গকারী? এর জবাব হলো، استرجاع অর্থাৎ ইন্ট্রালিগ্রাইট বলা হয় মসিবত প্রকাশের জন্যে আর নামাজ ো তার জন্য প্রবর্তিত হয়নি। আর لا اله الا الله তাযীম ও তাওহীদের জন্য, আর নামাজতো এর জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো، استرجاع নামাজ বিমুখী হওয়ার কারণে নামাজ ভঙ্গকারী আর لا اله الا الله যেহেতু নামাজ বিমুখী নয় তাই নামাজ ভঙ্গকারী নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাসআলাটি বিতর্ক মতে মতবিরোধপূর্ণ।



وَأِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَفْسُدْ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَابَتْ أَحَدُكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِغْ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ افْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطَوُّعَ فَقَدْ نَقَضَ الظُّهْرَ لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِهِ فَيَخْرُجُ عَنْهُ وَلَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِيَ هِيَ وَبِحُجْرَتِي يَنْتَلِكُ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنٍ مَا هُوَ فِيهِ فَلَعَنَ نَيْتَهُ وَبَقِيَ الْمَنُوءُ عَلَى حَالِهِ .

অনুবাদ : যদি সে এ দ্বারা এ কথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে নামাজে রয়েছে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا نَابَتْ أَحَدُكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِغْ (তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে)। যে ব্যক্তি জোহরের এক রাকআত আদায় করল, তারপর আসর বা সাধারণ নফল শুরু করে দিল, তাহলে তার জোহর ভঙ্গ হয়ে গেল। কেননা অন্য নামাজ শুরু করা তার সহীহ হয়েছে। সুতরাং সে (বর্তমান নামাজ) জোহর থেকে বের হয়ে যাবে। যদি জোহরের এক রাকআত আদায়ের পর আবার জোহরই শুরু করে, তাহলে সেটা জোহরই হবে এবং ঐ রাকআতই যথেষ্ট হবে। কেননা যে নামাজে সে বিদ্যমান আছে, হুবহু সেটাকেই সে শুরু করার নিয়ত করেছে। সুতরাং তার নিয়ত বাতিল হবে এবং নিয়তকৃত নামাজ বহাল থাকবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ الخ : পূর্বের মাসআলায় দ্বিতীয় সম্ভাবনার ওয়াদা করা হয়েছিল। উক্ত ইবারতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো নামাজি ব্যক্তি কালিমায়ে তাওহীদ অথবা কুরআনের কোনো আয়াত এ নিয়তে পড়েছে যে, যেন এর দ্বারা তার নামাজে থাকার কথা জানা যায়। তবে সকলের মতে এর দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী।

إِذَا نَابَتْ أَحَدُكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِغْ فَإِنَّ التَّيْبِيعَاتِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصَنُّفِ لِلنِّسَاءِ : তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে। কেননা তাসবীহ হলো পুরুষের জন্য আর তাসফীক হলো স্ত্রীলোকদের জন্য। তাসফীক হলো, স্ত্রীলোক তার ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর আঘাত করবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ : গ্রন্থকার বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নামাজ যেমন, জোহরের এক রাকআত পড়ল পরে আসর কিংবা নফল নামাজের নিয়ত করল। আর এ নিয়ত মনে মনে করা হয়েছে। জবান দ্বারা নয় এবং কান পর্যন্ত হাতও উঠানো হয়নি। তাহলে এ সুরতে প্রথম নামাজ অর্থাৎ জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, উক্ত ব্যক্তির দ্বিতীয় নামাজ শুরু করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ হয়েছে। আর দ্বিতীয় নামাজ শুরু করার জন্য প্রথম নামাজ থেকে বের হওয়া জরুরি, এ জন্য প্রথম নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ الخ : প্রথমে জোহর আরম্ভ করে তার এক রাকআত আদায়ের পর পুনরায় দ্বিতীয়বার একই জোহরের নিয়তে তাকবীরে তাহরীমা বলে, জবান দ্বারা নিয়ত করা ছাড়া। তবে এই দ্বিতীয় নামাজ মূলত প্রথম নামাজই। অর্থাৎ সে প্রথম নামাজ থেকে বের হয়েছে বলে হবে না। আর যে রাকআত পড়েছে তাও গণ্য হবে। এমনকি যদি তার পরের তিন রাকআত পড়ে তবে জোহরের ফরীয়া আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তারপর চার রাকআত পড়ে এ ধারণায় যে, প্রথম রাকআত ভো বাতিল হয়ে গেছে এবং তৃতীয় রাকআতের মাধ্যম বসেওনি। তবে শেষ বৈঠক ফউত হওয়ার কারণে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, এই মুসল্লী হুবহু ঐ নামাজেরই নিয়ত করেছে যার মধ্যে সে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে, এ জন্য তার এ নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর পূর্বের নিয়তকৃত নামাজ বহাল থাকবে।

وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ آيَةِ حَنِيفَةٍ (رح) وَقَالَ هِيَ نَائِيَةٌ  
لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إِنْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ إِلَّا أَنَّهُ يَكْرَهُ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِضَعِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِلَى حَنِيفَةٍ  
(رح) أَنْ حَمَلَ الْمُصْحَفَ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيلَ الْآوَارِقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَلِأَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ  
الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ  
وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ .

অনুবাদ : ইমাম যদি কুরআন দেখে পাঠ করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এখানে এক ইবাদতের সঙ্গে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে। তবে এরূপ করা মাকরুহ। কেননা এটা কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন শরীফ বহন করা, দেখা এবং পাতা উল্টানো, এগুলো আমলে কাছীর (বেশি মাত্রার কাজ) তা ছাড়া এটা হচ্ছে কুরআন শরীফ থেকে পাঠ গ্রহণ। সুতরাং অন্য কারো কাছ থেকে পাঠ গ্রহণের মতো এটাও নামাজ ফাসিদকারী হবে। দ্বিতীয় দলিলের আলোকে হাতে বহনকৃত এবং কোনো স্থানে রক্ষিত কুরআনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রথম দলিলের আলোকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ইমাম কিংবা মুনফারিদ কুরআন মাজীদ দেখে পাঠ করে। তা কম হোক বা বেশি হোক তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে মাকরুহ হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরুহ ছাড়াই নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন পাঠ একটি ইবাদত। আর কুরআন মাজীদ দেখে পড়াও ইবাদত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اعطوا عَيْنَكُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ حَظًّا وَبِلَاحِظَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ قَالَ الشَّطْرُ فِي الْمُصْحَفِ . (ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা চোখের প্রাপ্য অংশ দান করো, আরজ করা হলো চোখের প্রাপ্য অংশ কি? তিনি বললেন, কুরআন মাজীদ দেখা) উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন দেখে পড়া চোখের ইবাদত। সুতরাং এখানে এক ইবাদতের সাথে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে। আর শুধু এক ইবাদত নামাজ ফাসিদকারী নয়। তাই যখন দুই ইবাদত যুক্ত হবে তখনো তা নামাজ ফাসিদকারী হবে না। দ্বিতীয় দলিল, হযরত যাকওয়ান (রা.)-এর হাদীস, إِنْ كَانَ يَوْمٌ عَائِشَةٌ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْرَأُ مِنَ الْمُصْحَفِ . (হযরত হায়েশা (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম হযরত যাকওয়ান রমজান মাসে (উম্মুল মু'মিনীন হযরত) আয়েশা (রা.)-এর ইমামতি করতেন। আর তিনি কুরআন থেকে সূরা পড়তেন।

মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, এ সূরত কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। কেননা কিতাবীরা জিকির আযকার মুখস্থ না হওয়ার কারণে তারা হাতে কিতাব নিয়ে দেখে দেখে পড়ে। আর আমাদেরকে কিতাবীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বিতুদ্ধ হাদীস দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যে সূরতে সাদৃশ্য হওয়া ছাড়া শরিয়তের উপর আমল করা সম্ভব, ঐ সূরতে কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া মাকরুহ।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কুরআন মাজীদ বহন করা, দেখা এবং পাতা উল্টানো এসবগুলো আমলে কাছীর। আর আমলে কাছীর নামাজ ফাসিদকারী হয়, এ জন্য এগুলোও নামাজ ফাসিদকারী হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, কুরআন দেখে পড়া কুরআন মাজীদ থেকে পাঠ গ্রহণ করারই নামান্তর। সুতরাং এ সূরতেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় দলিলের আলোকে কোনো জিনিসে রক্ষিত কুরআন মাজীদ থেকে পড়া আর হাতে বহনকৃত কুরআন মাজীদ থেকে পড়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, পাঠ গ্রহণ উভয় সূরতেই বিদ্যমান। আর এটাই নামাজ ভঙ্গের কারণ। কিন্তু প্রথম দলিলের আলোকে উভয় মাঝে পার্থক্য আছে। কেননা কুরআন যদি কোনো স্থানে রক্ষিত থাকে, আর মুসন্নী সেখান থেকে দেখে দেখে পড় তবে এটা আমলে কাছীর নয়। আর হাতে বহন করে যদি কুরআন পড়ে তবে এটা আমলে কাছীর। শামসুল আইহা সারাখ্বী (র.) দ্বিতীয় দলিলকে বিতুদ্ধ বলেছেন।

وَلَوْ نَظَرْنَا إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ فَالصَّحِيفُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافٍ  
مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَقْرَأُ كِتَابَ فَلَانٍ حَيْثُ يَحِثُّ بِأَلْفِهِمْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ  
أَلْفَهُمْ أَمَّا فِسَادُ الصَّلَاةِ فَيَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ .

অনুবাদ : যদি (মুসল্লী কুরআন ব্যতীত) অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি দেয় আর বিষয়বস্তু (মুখে না পড়ে) বুঝে ফেলে, তবে বিতর্ক বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কসম করে থাকে যে, অমুকের চিঠি পড়বে না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুধু বুঝার দ্বারাই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সেখানে বুঝাই হলো উদ্দেশ্য। আর নামাজ ফাসিদ হয় আমলে কাছীর দ্বারা। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসল্লী কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস লিখিত দেখল এবং তার বিষয়বস্তু ও বুঝে ফেলল কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেনি। এ ব্যাপারে কোনো কোনো মশায়িখের মতানুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কসম করল অমুকের চিঠি পড়বে না। অতঃপর তার দিকে নজর করল এমনকি তার বিষয়বস্তু ও বুঝে ফেলল কিন্তু মুখ দ্বারা উচ্চারণ করেনি, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মুখ দ্বারা পড়ার মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হলো তার মর্ম বুঝা। সুতরাং বুঝাটাও পড়ার সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যেমনিভাবে পড়া এবং বলা দ্বারা কসম ভঙ্গকারী হয়ে যায় এমনিভাবে মর্ম বুঝার দ্বারাও কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, কিরাআত (পড়া) জবান দ্বারা হয়। কেননা কিরাআত কালামের অনুরূপ। আর কালাম জবান দ্বারা হয়। বুঝা গেল, কিরাআতও জবান দ্বারা হয়। আর মাসআলা হলো, শপথকারী জবান দ্বারা কিছু পড়েনি, বরং লিখা দেখে শুধু তার মর্ম বুঝেছে; এজন্য সে কসমভঙ্গকারী হবে না। আর যদি সে মুসল্লী হয় তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মাসআলায় সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ ফাসিদ হবে না। অর্থাৎ উপরোক্ত মাসআলায় হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সাথে একমত। এখন মোট আলোচনা হলো, কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিত কিছু দেখে যদি মর্ম বুঝে যায় এবং জবান দ্বারা উচ্চারণ না করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে না এবং যদি না পড়ার কসম করে থাকে তবে কসম ভঙ্গকারীও হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) নামাজ ফাসিদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর সাথে। কিন্তু যদি শপথ করে যে, আমি অমুক চিঠি পড়ব না। পরে তা দেখে এবং তার মর্ম বুঝে যায় কিন্তু জবান দ্বারা উচ্চারণ না করে; তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্য হলো, **مَسْئَلَةٌ** শপথের মাসআলায় অর্থাৎ বুঝা হলো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শপথকারীর উদ্দেশ্য হলো, অমুকের ভেদের কথা তার লেখা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করব না। সুতরাং যখন সে তা দেখে বুঝে ফেলেছে তখন কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেল। তা জবান দ্বারা পড়ুক বা না পড়ুক। কেননা শপথের মাকসাদ পাওয়া গিয়েছে। বাকি নামাজ ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য হলো, নামাজ তো আমলে কাছীর দ্বারা ফাসিদ হয় আর এখানে আমলে কাছীর পাওয়া যায়নি। কেননা বুঝে নেওয়া এটা হলো আমলে খফীফ অর্থাৎ এমন আমল যা অপ্রকাশ্য বিষয়, এজন্য এ সূরতে নামাজ ফাসিদ হবে না।-(ইনশাআল্লাহ)

وَأَنَّ مَرَّتْ أَمْرَةً بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَمْ يَقْطَعْ الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُّوهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ الْمَارَّ أَتَمَّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْوُزْرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا بِأَتَمِّ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعٍ سُبُوحِهِ عَلَى مَا قِيلَ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يُحَاذِي أَعْضَاءَ الْمَارِّ أَعْضَاءَهُ لَوْ كَانَ يَصِلُ عَلَى الدُّكَانِ.

অনুবাদ : আর যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে কোনো স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তবে নামাজ ভঙ্গ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُّوهُ شَيْءٌ (কোনো কিছুর অতিক্রম নামাজ ভঙ্গ করে না) তবে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানতো যে, তার কত গুনাহ হবে, তাহলে সে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। কথিত মতে, যদি সে মুসল্লীর সিজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এবং উভয়ের মাঝে কোনো আড়াল না থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম হবে। তদ্রূপ দোকানে (বা অন্য কোনো উচ্চ স্থানে) যদি নামাজ আদায় করে এবং অতিক্রমকারীর অঙ্গসমূহ তার অপের সোজাসুজি হয় তবে গুনাহগার হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসল্লীর সামনে দিয়ে স্ত্রীলোকের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। স্ত্রীলোকটি হয়েযা হোক বা না হোক, এমনিভাবে গাধা ও কুকুরের অতিক্রম দ্বারাও নামাজের নামাজ ফাসিদ হয় না। আসহাবে জাওয়াহির বলে, উপরোক্ত শ্রীশাসমূহের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাসহুর রিওয়াযাত হলো, কালো রঙ্গের কুকুরের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর স্ত্রীলোক এবং গাধার ক্ষেত্রেও এমন একটি রিওয়াযাত রয়েছে।

আসহাবে যাওয়াহিরের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী الصَّلَاةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ-এর হাদীস হযরত আবু যর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। (ইনযা, কিফায়া) অর্থাৎ স্ত্রীলোক, কুকুর এবং গাধা নামাজ বিচ্ছিন্নকারী। আব্দুল্লাহ জালালুদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন আল-খাওয়ারিযিমী -(কিফায়া গ্রন্থকার) উক্ত দলিলের জবাবে বলা হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট যখন উক্ত হাদীস পৌছল তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন। আর হযরত উরওয়াহ (রা.)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন

بَا عُرْوَةُ مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُّوهُ الصَّلَاةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ فَقَالَتْ بَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَالْيَقَانِ وَالْيَقَانِ قَرْنَتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحِمَرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُ بِاللَّيْلِ وَإِنَّا مَعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ إغْتَرِاضَ الْجَنَازَةِ فَإِذَا سَجَدَ حَمَسَتْ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

হে উরওয়া! ইরাকবাসী কি বলে? উরওয়া বললেন, ইরাকবাসী বলে স্ত্রীলোক, গাধা এবং কুকুরের অতিক্রম করা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ওহে আহলে ইরাক, ওয়াশশিকাক, ওয়াননিফাক! তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সাথে মিলিয়ে দিয়েছ (অথচ) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নামাজ পড়তেন, আর আমি তার সামনে জানাযার ন্যায় পড়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদায় ঝুঁকতেন আমি পাগুলো টেনে নিতাম। আবার যখন তিনি দাঁড়াতেন আমি পা গুলো ছড়িয়ে দিতাম। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু যর (রা.)-এর হাদীসকে কঠোরভাবে বর্জন করলেন এবং নামাজের সামনে দিয়ে স্ত্রীলোকের অতিক্রম দ্বারা নামাজ ফাসিদ হওয়াকে কঠিনভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেন। বেশির চেয়ে বেশি এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, আমাদের বক্তব্য হলো, নামাজের সামনে অতিক্রম প্রসঙ্গে, পা ছড়ানো প্রসঙ্গে

নয়। হযরত আয়েশার বর্ণনা দ্বারা তো পা ছড়ানো সাবিত হয় নামাজীর সামনে দিয়ে অতিক্রম সাবিত হয় না? জবাব হচ্ছে হলো, নামাজীর সামনে পা ছড়ানো যখন নামাজ উসকারী নয় তখন অতিক্রম দ্বারা তো অবশ্যই নামাজ ফাসিদ হবে না।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-**لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتُمْ**-এর বাণী-**فَإِنَّهُ السَّبَطَانُ** - কোনো কিছুর অতিক্রম নামাজ উস করে না, যতটুকু সম্ভব তা প্রতিহত কর কেননা সে শয়তান। তবে হ্যাঁ নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার দ্বারা অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **لَوْ عَلِمَ الْمَرءُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الزَّوْرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ** - (নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানতো যে, তার কত গুনাহ হবে, তাহলে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই চল্লিশ বছর, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ দিবস। কোনো কোনো আলিম বলেন, হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনা দ্বারা বিতর্কভাবে জানা যায় যে, এর দ্বারা চল্লিশ বছর উদ্দেশ্য - **وَأَيُّهَا يَأْتُمُ إِذَا مَرَّ الْغ** - বাক্যটি দ্বারা ঐ স্থানের বয়ান করা উদ্দেশ্য যার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। অর্থাৎ যে স্থানের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা হারাম তার সীমা হলো, মুসল্লীর পা থেকে নিয়ে তার সিঁজদার স্থান পর্যন্ত। এটাও বিতর্ক মত। এ মতকেই শামসুল আইম্মা আসসাযাখসী, শায়খুল ইসলাম এবং কাযী খান প্রমুখ গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, তার সীমা হলো, যখন মুসল্লী তার দৃষ্টি সিঁজদার স্থানের দিকে রেখে নামাজ পড়ে তখন অতিক্রমকারীর উপর তার দৃষ্টি পড়ে না। অর্থাৎ সীমাটি হলো সিঁজদার স্থান থেকেও আগ পর্যন্ত। সিঁজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা অবস্থায় যতটুকু আগেও দৃষ্টি যায়। আর যেখানে দৃষ্টি যায় না সেখান দিয়ে অতিক্রম করা মাকরুহ নয়। কেউ কেউ দুই কাতার কিংবা তিন কাতার-এর পরিমাণকে সীমানা বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তিন গজ, কেউ কেউ পাঁচ গজকে সীমা নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ চল্লিশ গজকে সীমা হিসাবে ধরে নিয়েছেন। উপরোক্ত বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নামাজি ব্যক্তি মাঠে ময়দানে নামাজ পড়ে। আর যদি মসজিদে নামাজ পড়ে তবে কারো মতে পঞ্চাশ গজ ছেড়ে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। আবার কারো মতে নামাজি আর কিবলার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করা সীমচীন নয়; বরং দেয়ালের পিছন দিক থেকে অতিক্রম করতে পারবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা তখনই মাকরুহ যখন নামাজি এবং অতিক্রমকারীর মাঝে কোনো আড়াল না থাকে। যেমন খাম, দেয়াল, সুতরা, কিংবা কোনো মানুষের পিঠ ইত্যাদি। আর যদি কোনো আড়াল থাকে তবে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে না।

এরপর গ্রন্থকার বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো উঁচু স্থানে নামাজ পড়ে, তার সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করলে অতিক্রমকারী তখনই গুনাহগার হবে যখন অতিক্রমকারীর অঙ্গসমূহ নামাজি ব্যক্তির অঙ্গসমূহের সোজাসোজি হয়ে যায়। আর যদি এক মানুষ সমান উঁচু স্থানে নামাজ পড়ে তবে সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে না।

وَيَنْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً وَمُقَدَّارَهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْغِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ وَشُلٌ مُؤَخَّرَةٌ الرَّحْلُ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي غِلْظِ الإِصْبَعِ لِأَنَّهُ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاطِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ .

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি মরুভূমিতে (বা খোলা মাঠে) নামাজ আদায় করে তার জন্য উচিত নিজের সামনে একটি সুতরা স্থাপন করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে বা মাঠে ময়দানে নামাজ আদায় করে, তখন সে যেন নিজের সামনে সুতরা স্থাপন করে নেয়। সুতরা এর পরিমাণ হলো একগজ বা তার বেশি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন (তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে নামাজ আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা স্থাপন করতে পারে না। বলা হয়েছে যে, তা আব্দুলের মতো মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চেয়ে সরু হলে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি ময়দান বা খোলা মাঠে নামাজ পড়ে তবে সে তার সামনে এটি সুতরা গেড়ে দিবে। আর এটা হলো মোস্তাহাব। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী **إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً** -এর (তোমাদের কেউ যখন ময়দানে নামাজ পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে সুতরা গেড়ে রাখে। সুতরা কেমন হবে? এ সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন, সুতরার পরিমাণ সর্বনিম্ন একগজ হওয়া উচিত। বেশি উপর যতটুকু হয় অসুবিধা নেই। দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী **-إِيعِزْ أَحَدُكُمْ إِنْ صَلَّى فِي الصَّحَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّجُلِ** (তোমাদের কেউ যখন ময়দানে নামাজ আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা স্থাপন করতে পারে না!) **مُؤَخَّرِهِ** শব্দটি দিয়ে আর **خا** -এর **كسره** -এর সাথে পড়া হয়। তা ঐ কাঠিকে বলা হয় যা হাউদার পিছনে উপবেশনকারীর মাথা বরাবর হয়। **تشدید** দিয়ে পড়া **رحل**। অর্থ হাউদা। কুদরী গ্রন্থকার বলেন, সুতরা আবুলের মতো মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর স্কেল কম মোটা হলে প্রদ্রষ্ট দৃষ্টিগোচর হবে না। অধিকন্তু এর ঘাটা মাকসাদও হাসিল হবে না। এ জন্য বলা হয়েছে, সর্বনিম্ন আঙ্গুরের সমান মোটা হওয়া উচিত।

وَيَقْرُبُ مِنَ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَلَيْدَنْ مِنْهَا  
وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ أَوْ عَلَى الْأَيْسَرِ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ  
السُّتْرَةِ إِذَا أَفْنِ الْمُرُورِ وَلَمْ يُوَاجِهِ الطَّرِيقَ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ صَلَّى بِطَحَاءَ مَكَّةَ إِلَى عَزَّةَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ وَيُعْتَبَرُ الْغَرُزُ دُونَ  
الْإِلْفَاءِ وَالْخَطِّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ .

অনুবাদ : মুসল্লী সুতরা-এর কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুতরা স্থাপন করে  
এর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে, সে যেন সুতরা-এর নিকটবর্তী দাঁড়ায়। সুতরা ডান জ বা বাম জ বরাবর  
স্থাপন করবে। হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। যদি অতিক্রমণের আশংকা না থাকে এবং রাস্তার সামনে রেখে না  
দাঁড়ায়, তবে সুতরা বাদ দেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। ইমামের সুতরা জামাআতের মুসল্লীদের সুতরা বলে গণ্য  
হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার সমতল ভূমিতে লাঠি সামনে রেখে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু জামাআতের  
সামনে কোনো সুতরা ছিল না। (সুতরা) মাটিতে গেড়ে রাখা ই গ্রহণীয়, ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ কাটা নয়।  
কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে বলা হয়েছে মুসল্লী সুতারার কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুতরা  
সামনে রেখে নামাজ আদায় করে সে যেন সুতরা-এর নিকটবর্তী দাঁড়ায়।

সুতরা মুসল্লীর ডান জ বা বাম জ বরাবর থাকবে। অর্থাৎ উভয় চোখের মাঝখানে রাখবে না। কেননা হাদীসে এরূপই  
বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ইমাম আবু দাউদ (র.) দাবাআহ বিনতুল মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা  
মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَمْ  
يَصُدْ لَهُ صَدًا .

তিনি (হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো কোনো কাঠ কিংবা ঝুটি বা গাছ সামনে রেখে  
নামাজ পড়তে দেখিনি কিন্তু তিনি তা ডান জ বা বাম জ বরাবর রাখতেন। একেবারে সোজা রাখতেন না। - (ফাতহুল কাদীর)  
ইনায়া গ্রন্থকার উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে নকশ করেছেন :

إِنَّهُ ﷺ مَا صَلَّى إِلَى شَجَرَةٍ وَلَا إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُودٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ وَلَمْ يَصُدْهُ صَدًا أَيْ نَمَ  
تَقْصُدُ قَصْدًا إِلَى الْمَرَاغِبَةِ .

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সুতরা বাদ দেওয়ার দ্বারা তখন কোনো অসুবিধা নেই যখন মানুষের অতিক্রমণের কোনো আশংকা  
না থাকে এবং সামনে কোনো রাস্তা না থাকে। উক্ত ইবারতে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, সুতরা-এর علت হলো  
অতিক্রম। সুতরাং যেখানে কারো অতিক্রমের প্রবল ধারণা না থাকে সেখানে সুতরা বাদ দেওয়ার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই।  
যদিও নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও সুতরা স্থাপন করা মোস্তাহাব।

قَوْلُهُ وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْقَوْمِ الْخ: বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার বলেন, জামাআতে নামাজ আদায়ের সময় ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্যও যথেষ্ট। দলিল হলো ঐ হাদীস যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু জুহাইফা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আব্বাস ইবনুল হুমামের বর্ণনা মতে, হাদীসটি নিম্নরূপঃ

إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةَ وَالْمَرْءَ وَالْحِمَارَ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমতল ভূমিতে লোকদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন, তাঁর সামনে দিয়ে একটি লাঠি ছিল। স্ত্রীলোক ও গাধা লাঠির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছিল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তখন মুক্তাদীদের কোনো সুতরা ছিল না। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমামের সুতরা মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَبُعْتَبَرُ الْغُرَزِ الْج: এর দ্বারা মাতিন বলেন, সুতরা মাটিতে গেড়ে রাখাই গ্রহণীয়। সুতরাং জমিনে ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ টানা গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি জমি নরম হয় এবং সুতরা তাতে সুতরা স্থাপন করা সম্ভব হয়। আর যদি ভূমি শক্ত হয়। সুতরা গাড়া সম্ভবপর না হয় তাহলে লম্বালম্বি করে সুতরা জমিনে রেখে দিবে। কারণ এতে জমিনে গাড়ার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি সুতরা বানানোর জন্য কোনো কাঠি বা অন্য কোনো জিনিস না পাওয়া যায় তখন জমিনের উপর দাগ কাটা গ্রহণীয় হবে কিনা এ সম্পর্কে ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে তরফাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে দাগ কাটা গ্রহণীয় নয়। আর এটা কোনো কিছুই নয়। তবে ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, একটি দীর্ঘ দাগ কাটবে। কোনো কোনো মাশায়িখে মুতায়্যখ্বিরীন উক্ত মত পোষণ করেছেন। হিদায়াগ্রন্থকার তরফাইনের দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুতরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসল্লী ও অতিক্রমকারীর মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা। আর এ উদ্দেশ্য দাগ কাটা দ্বারা হাসিল হয় না। তাই দাগ কাটা না কাটা উভয়ই সমান।



وَبَدَأَ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ أَوْ مَرَجَنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ فَادْرُؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَبَدَأَ بِالْإِشَارَةِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِوَلَدَيْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ  
يَدْفَعُ بِالتَّسْنِيحِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَبَكَرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِأَنِّ جَادِهِمَا كِفَايَةٌ.

অনুবাদ : যদি মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকে অথবা তার এবং সুতরাহর মাঝখান দিয়ে কেউ অতিক্রম করত  
চায়, তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَادْرُؤُوا (যতটা পারো বাধা  
দাও) আর ইশারার মাধ্যমে বাধা দিবে। উম্মে সালামা (রা.) -এর দুই সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই  
করেছেন। কিংবা তাসবীহ পড়ে রোধ করবে। দলিল হলো ঐ হাদীস, যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। (ইশারা ও  
তাসবীহ) উভয়টি একত্রে করা মাকরুহ হবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটিই যথেষ্ট।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকে, কিংবা সুতরা থাকে কিন্তু সুতরা ও মুসল্লীর মাঝ দিয়ে কারো  
অতিক্রমের সম্ভাবনা থাকে তবে মুসল্লী ঐ অতিক্রমকারীকে রোধ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَادْرُؤُوا  
مَا اسْتَطَعْتُمْ (যতটা পারো বাধা দাও) মুসল্লী অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে কিভাবে বাধা দিবে? এ ব্যাপারে গ্রন্থকার বলেন, ইশারা  
দ্বারা বাধা দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামার দুঃসন্তানকে বাধা দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কিফায়া ও ইনায়া  
গ্রন্থকার এভাবে উল্লেখ করেছেন-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَامَ وَلَدُهَا عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ قِفْ فَوَقَفَ ثُمَّ  
قَامَتْ بَيْنَهُمَا زَيْنَةُ لِيَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ قُفِّي فَأَيْتَ فَمَرَّتْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ  
نَاقِصَاتُ الدِّينِ صَوَاحِبُ بُرُؤٍ صَوَاحِبُ كُرْهٍ يَغْلِبُنَ الْكِرَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ النِّسَاءُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামার ঘরে নামাজ পড়ছিলেন ইতাবসরে উম্মে সালামার ছেলে এসে দাঁড়াল (এ নিয়তে) যে,  
রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাকে বাধা দিলেন, থামো। সে থেমে গেল।  
পরে যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা এসে দাঁড়াল। (এ নিয়তে) যে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাবে।  
রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারায় তাকে বাধা দিলেন থামো, কিন্তু সে থামেনি, বাধা ডিঙিয়ে অতিক্রম করে গেল। রাসূলুল্লাহ  
ﷺ নামাজ শেষ করে বললেন, এরা نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ কম জ্ঞান সম্পন্ন, صَوَاحِبُ بُرُؤٍ স্বল্প দীনদারী, كُرْهٍ ইউসুফের সখী كُرْهٍ নেকড়াধারী। এরা ভালো লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, খারাপ লোক তাদের উপর  
চড়ে বসে। মোদাকুথা এ হাদীস দ্বারা ইশারার মাধ্যমে রোধ করা সাবিত হলো।

অথবা তাকে তাসবীহ পড়ে বারণ করবে। দলিল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী- إِيَّاكَ أَحَدُكُمْ-  
إِذَا نَابَتْ أَحَدُكُمْ- (তোমাদের কেউ যদি নামাজে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে) এটা  
তো পুরুষদের ক্ষেত্রে। আর স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে হলো তাসবীহ। অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে বাম হাতের তালুর  
উপরে আঘাত করবে। তবে ইশারা ও তাসবীহ উভয়টি একত্রে করা মাকরুহ হবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে উভয়টির  
একটিই যথেষ্ট।

আকলী দলিল হলো- পথর-কণা সরানোর দ্বারা নিজের নামাজ সংশোধন হয়। আর যে আমল দ্বারা নামাজের সংশোধন করা উদ্দেশ্য হয় তা করতে কোনো অসবিধা নেই।

وَلَا يَفْرَقُ أَصَابِعَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَفْرَقْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تَصَلِّي  
وَلَا يَتَخَصَّرُ وَهُوَ وَضَعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي  
الصَّلَاةِ وَلَإِنْ فِيهِ تَرَكَ الْوَضْعَ الْمَسْنُونِ وَلَا يَلْتَفِتُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ عَلِمَ  
الْمُصَلِّي مَنْ يَنْاجِي مَا التَفَتَ وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ بِمَنَّةٍ وَبُشْرَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ  
يَلْزِمَ عُنُقَهُ لَا يَكْرَهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُلَاحِظُ أَصْحَابَهُ فِي صَلَاتِهِمْ بِمُزَوِّقِ  
عَيْنِهِ وَلَا يَقْعِي وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ لِقَوْلِ أَبِي ذَرٍّ نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثَلَاثٍ أَنْ أَنْفَرُ  
نَفَرَ الدَّيْنِكَ وَأَنْ أَقْعَى أَقْعَاءَ الْكَلْبِ وَأَنْ أَفْتَرِشَ أَفْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ وَالْإِقْعَاءُ أَنْ يُضَعَ  
الْيَدُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَنْصَبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامُ بِلِسَانِهِ لِأَنَّهُ  
كَلَامٌ وَلَا يَبِيدُ لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنَى حَتَّى لَوْ صَافَحَ بَيْنِيَّةَ التَّسْلِيمِ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ  
وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عَذْرِ لَأَنَّ فِيهِ تَرَكَ سُنَّةَ الْقُعُودِ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ شَعْرَهُ  
عَلَى هَامَتِهِ وَيَشُدَّهُ بِخَيْطٍ أَوْ بِصَنْغٍ لِيَتَلَبَّدَ فَقَدْ رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى أَنْ  
يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مَغْقُوصٌ.

অনুবাদ : আর আঙ্গুল মটকাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় তুমি তোমার আঙ্গুল মটকিয়ে না। আর কোমরে হাত রাখবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। এতে সুন্নতপন্থত অবস্থা তরক করা হয়। আর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসল্লী যদি জানতো যে, কার সঙ্গে কথোপকথন করছে, তাহলে সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করতো না। যদি মুসল্লী ঘাড় বাঁকা না করে চোখের কোণ দিয়ে ডানে- বামে তাকায়, তবে তা মাকরুহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকাভেন। আর হাঁটু ভুলে বসবে না এবং (সিজদার সময়) ডানা ভূমিতে বিছিয়ে রাখবে না। কেননা আবু যর (রা.) বলেছেন, আমার হাবীব আমাকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, মোরগের মতো ঠোঁড় দেওয়া, কুকুরের মতো বসা এবং শূণ্যের মতো ডানা বিছিয়ে দেওয়া। হযরত আবু যর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত -এর অর্থ উভয় নিতম্ব মাটিতে রেখে উভয় হাঁটু খাড়া করে রাখা। এটাই বিতন্ম ব্যাখ্যা। আর মুখে সালামের জবাব দিবে না। কেননা তা কথা বলার অনুরূপ এবং হাতেও না। কেননা এটাও পরোক্ষভাবে সালাম। এমনকি কেউ যদি সালামের নিয়তে মুসাফাহা করে, তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো ওজর ছাড়া আসন করে বসবে না। কেননা তাতে বসার সুন্নত তরক হয়। আর চুল ঝুটি করবে না। ঝুটি করা মানে চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সুতা দিয়ে কিংবা রাবার দিয়ে বাঁধা, যাতে চুল স্থির থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ চুল ঝুটি করা অবস্থায় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

### শ্রাস্ত্রিক আলোচনা

নামাজের মধ্যে আঙ্গুল মটকানোও মাকরুহ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন, **إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَفْرَقْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تَصِلُنِي** আমি তোমার জন্য তা পছন্দ করি যা আমার জন্য পছন্দ করি। তুমি নামাজরত অবস্থায় নিজের আঙ্গুল মটকাবে না। কারো কারো মতে আঙ্গুল মটকানো নামাজের বাইরেও মাকরুহ। মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, এ কাজটি লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাজ ছিল। নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখাও মাকরুহ। কেননা নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত : **رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَأْسَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ يَدُورُ فِي صَلَاتِهِ عَنْ إِيْصَابِ رَأْسِهِ بِإِصْبَعِهِ** রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। আকলী দলিল হলো, কোমরে হাত রাখার সুরতে সুন্নত তরীকাকে তরক করা লায়িম আসে। নামাজের বাইরে পুরুষ মহিলা সকলের জন্য কোমরে হাত রাখা মাকরুহে তানযীহী।

**تَخَصَّرَ**-এর এক ব্যাখ্যা তো হিদায়া গ্রন্থকার উপরে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ কোমরে হাত রাখা। এ ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, **تَخَصَّرَ** হলো লাঠির উপর ভর দেওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, **تَخَصَّرَ** হলো সিজদার আয়াতকে বাদ দিয়ে অন্য আয়াত তিলাওয়াত করা।

**قَوْلُهُ وَلَا يَنْفُتُ الْخ** অর্থাৎ ঘাড় বাঁকা করে অন্য দিকে তাকাবে না। কেননা এর মধ্যে কারাহাত রয়েছে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুসল্লী জানতো যে, কার সাথে কথোপকথন করছে তবে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেন, **إِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهُ الْعَبْدُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا تَفَتَّ أَعْرَضَ عَنْهُ** বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে **مُتَوَجِّه** থাকে। যখন বান্দা অন্য দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আকলী দলিল হলো- ঘাড় মুড়িয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা শরীরের কোনো অঙ্গ কিব্বা থেকে ফিরে যেতে পারে। যদি পুরো শরীর কিব্বামুখী হওয়া থেকে ফিরে যায় তবে তা তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এজন্য যদি শরীরের কিছু অংশ কিব্বা থেকে সরে যায় তবে নামাজ মাকরুহ হবে। যেমন নামাজের ভিতর **عَمَلٌ قَلِيلٌ** মাকরুহ। কেননা **عَمَلٌ كَثِيرٌ** হলো নামাজ ভঙ্গকারী। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

**سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْتَفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ إِخْلَاصٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ .**

**مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ** আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুরুষের নামাজে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এটা হলো শয়তানের ধোঁকা। যার দ্বারা সে বান্দার নামাজে ধোঁকা দেয়। -(বুখারী) মোদ্দাকথা, উপরোক্ত রিওয়ায়াত ও আকলী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, অন্যদিকে তাকানো নামাজ ফাসিদকারী নয়। যদিও ডানে বামে তাকানো অবস্থায় চেহারা কিব্বার দিক থেকে সরে যায়। তবে শর্ত হলো কিব্বার দিকে পিঠ না দেওয়া। যদি মুসল্লী ঘাড় বাঁকা করা ব্যতীত ডানে বায়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকায় তবে তা মাকরুহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকাভেন, তবে আকাশের দিকে তাকানো মাকরুহ।

**قَوْلُهُ وَلَا يَقْعِي وَلَا يَفْتَرِشُ الْخ** কুদরী গ্রন্থকার বলেন, হাঁটু গেড়ে বসা এবং সিজদা অবস্থায় উভয় হাত ভূমিতে বিছিয়ে রাখা মাকরুহ। হিদায়া গ্রন্থকার দলিল দিতে গিয়ে হযরত আবু যর (রা.)-এর কাওল শেখ করেছেন। কিন্তু হিদায়া ব্যাখ্যাভাগ বলছেন ইমাম আহমদ (র.) তার **مسند** এ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাওল বর্ণনা করেছেন। মুরাদ হলো, হযরত আবু যর (রা.)-এর মতটি **غريب**। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রিওয়ায়ানের **متن** হলো নিম্নরূপ :

**نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ قُرْعَةِ كَنْفَرِ الْيَدَيْنِ وَإِقْعَاءِ كَيْفَاءِ الْكَلْبِ وَالْجَنَابِ كَالْيَنَابِ الثَّلْعَابِ .**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক. মোরগের ন্যায় ঠোঁকর মারা থেকে অর্থাৎ সিজদা এমনভাবে করা যেমন মোরগ ঠোঁকর মারে। দুই. কুকুরের মতো বসা থেকে অর্থাৎ আত্মহীন্যাত এবং উভয় সিজদার মাঝে কুকুরের মতো বসা থেকে নিষেধ করেছেন। তিন. শূণ্যের মতো এদিক সেদিক

তাকানো থেকে নিষেধ করেছেন। আর আবু যবের হাদীস যা হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তৃতীয়টি ছিল হলো-  
 أَنْ أَفْتَرَسَ أَفْتَرَأْسَ الثَّغْلَبِ - অর্থাৎ শূণ্যের মতো (অর্থাৎ সিজদার সময়) হাত বিছানো থেকে নিষেধ করেছেন।

إِنْفَاعًا-এর দু'টো তাফসীর রয়েছে, একটি ইমাম তাহাবী (র.) থেকে দ্বিতীয়টি ইমাম কারবী (র.) থেকে। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, إِنْفَاعًا হলো, নিজের নিতম্বের উপর বসা। উভয় রান দাঁড় করে রাখা। উভয় হাঁটু সিনার সাথে মিলিয়ে রাখা। আর উভয় হাত ভূমিতে রাখা। এটাই বিস্তৃত তাফসীর। হিদায়া গ্রন্থকারও এটাই গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম কারবী (র.)-এর মতে, إِنْفَاعًا হলো, নিজের উভয় পা দাঁড় করিয়ে রাখা। নিতম্বের উপর বসা এবং উভয় হাত ভূমিতে রাখা।

قَوْلُهُ وَلَا يَرْدُّ السَّلَامَ الْخ: গ্রন্থকার বলেন, নামাজীর মুখে সালামের জবাব দিলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। কেননা এটা কথা বলারই নামাজের। আর কথা বলা দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং সালামের জবাব দিলেও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। সালাম ও সালামের জবাব 'কথা বলা' হওয়ার দলিল হলো, যদি কেউ শপথ করে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না, অতঃপর তাকে সালাম দিল, এতে সে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। হাত দ্বারা সালামের জবাব দেওয়া মাকরুহ। কেননা এটাও পরোক্ষভাবে সালাম। সুতরাং সালামের নিয়তে কেউ যদি মুসাফাহা করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

এখানে একটি এমর্যে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি হযরত বেলালকে (রা.)-কে বলেছিলাম,  
 كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِ جِئْنَ كَانُوا يَسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُبَيِّنُ بِيَدِهِ .

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে রত থাকতেন এবং লোকেরা তাঁকে সালাম করতো, তখন তিনি কিভাবে সালামের জবাব দিতেন? বেলাল (রা.) বলেন, হাত দ্বারা ইশারা করতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, হাত দ্বারা জবাব দেওয়া মাকরুহ নয়? জবাব হলো, উপরোক্ত ঘটনা مَاتِلَ الْخُرْمِ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ জন্য তাকে 'কারাহাত না'-এর দলিল দেওয়া ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَرْتَعِ إِلَّا مِنْ عِزِّ الْخ: নামাজের মধ্যে ওজর বাতীত আসন করে বসা মাকরুহ। কারণ এ ধরনের বসার দ্বারা বসার সুন্নত তরক হয়। কেউ কেউ বলেছেন, মাকরুহ হওয়ার ইঙ্গিত হলো, এ ধরনের বসা-অহঙ্কারীদের বসা। এ ইঙ্গিতের ভিত্তিতে নামাজের বাহিরেও এভাবে বসা মাকরুহ। কিন্তু শামসুল আইহা সারাখসীসহ অনেকে উপরোক্ত মতকে রদ করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের বাহিরে সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আসন করে বসতেন।-(ফাতহুল কাদীর) এমনিভাবে মসজিদে নবীতেও হযরত ফারুককে আযম (রা.)-এর আম বৈঠক আসন করে ছিল। আসল কথা হলো, আসন করে বসার তুলনায় উভয় হাঁটুর উপর বসা তাওয়াযুহ'-এর অধিক কাছাকাছি। এ জন্য নামাজের মধ্যেও এ ধরনের বসা (হাঁটুর উপর বসা) উত্তম হবে। তবে যদি কোনো ওজর থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। নামাজের মধ্যে মাথার চুল ঝুটি করে বাঁধাও মাকরুহ।

কিফায়া গ্রন্থকার চুলকে ঝুটি করার তিনটি সুরত উল্লেখ করেছেন। এক. মাথার আশ-পাশে চুলের খোপা বানিয়ে বাধা যেমন স্ত্রীলোকেরা বাঁধে। দুই. কপালের উপর একত্রিত করে রশি দ্বারা বাঁধা। তিন. আঠা জাতীয় কোনো জিনিস দ্বারা মোড়ানো। (ঝুটি নিষেধের উপর) দলিল হলো, আবু রাফে (রা.)-এর হাদীস-

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصْلِيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَغْقُوصٌ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে চুলের ঝুটি করা অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,  
 أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ رَأْسٍ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا .

আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং চুল ঝুটি করা ও কাপড় গুটাতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ عَاقِصٍ شَعْرَهُ فَحَلَّهَ حُلًّا غَنِيًّا وَقَالَ إِذَا طَوَّلَ أَحَدُكُمْ شَعْرَهُ فَلْيُرِيْلَهُ لِيَسْجُدَ مَعَهُ .

হযরত ওমর (রা.) এক লোকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন সে সিজদারত ছিল, তার চুল ঝুটি করা অবস্থায় ছিল। হযরত ওমর (রা.) তা অত্যন্ত কষ্টেরভাবে খুললেন। আর বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন কারো চুল লম্বা হয়ে যায় তখন সে তা ছেড়ে রাখবে। যাতে তার সাথে ঐ চুলও সিজদা করতে পারে।

وَلَا يَكْفُ ثَوْبُهُ لِأَنَّهُ نَزَعَ تَجَبَّرَ وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يَرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ عَمَلَ كَثِيرٍ وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكَّرَةٌ .

অনুবাদ : নামাজে নিজের কাপড় আটকিয়ে ও গুটিয়ে রাখবে না। কেননা এতে এক ধরনের অঙ্কার রয়েছে। আর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, سدل অর্থ মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া। আর পানাহার করবে না। কেননা এটা নামাজভুক্ত কাজ নয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে পানাহার করে তবে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর (বা অতিমাত্রার কাজ) আর নামাজের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া (সুতরাং নামাজ অবস্থায় ভুলে পানাহার রোজা অবস্থায় ভুলে পানাহারের মতো হবে না)।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كف ثوب হলো, সিজদা করার সময় আগ-পিছের কাপড় গুটানো। এখন মূল মাসআলা হলো, কাপড় যদি জমিনে পড়ে তবে তা বাধা দান না করা। কেননা এর মধ্যে এক ধরনের অহঙ্কার প্রকাশ পায়। কাপড় অযথা ঝুলিয়েও রাখবে না। দলিল হলো, ইমাম আবু দাউদ (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, إِنَّهُ نَهَى نَبِيُّهُ عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلَاةِ وَأَنْ يَغْفَى الرَّجُلُ نَأْ - রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে সدل করতে নিষেধ করেছেন এবং পুরুষদেরকে মুখ ঢাকতে নিষেধ করেছেন। سدل হলো, মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া।

কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, سدل হলো- চাদর কিংবা কাবা কাঁধের উপর রাখা এবং হাতগুলো আস্তিনের ভিতর না রাখা। তা জামার উপরে হোক বা নিচে হোক।

নামাজের মধ্যে পানাহার করবে না। কেননা এগুলো নামাজের অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়। তবে দাঁতে যদি কোনো জিনিস লাগা থাকে এবং তা গিলে ফেলে তবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা যে সকল জিনিস দাঁতের ভিতর থাকে সেগুলো থুথু তুল্য। থুথু খেলে নামাজ ভঙ্গ হয় না, তাই এগুলোর দ্বারাও নামাজ ভঙ্গ হবে না।

قَوْلُهُ لَئِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ الْخ : অর্থাৎ নামাজের হালাতে পানাহার করা নামাজ ফাসিদকারী। 'চাই নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। খানা-পিনা সেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা ভুলবশত হোক। দলিল, খানা-পিনা প্রত্যেকটি আমলে কাছীর। আর আমলে কাছীর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। এ জন্য এগুলো দ্বারাও নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكَّرَةٌ : দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, প্রশ্নটি হলো, নামাজের মধ্যে ভুলে খানা-পিনা এমনভাবে মাফ হওয়া উচিত যেমনটি রোজার হালাতে মাফ করা হয়? জবাব হলো, নামাজের অবস্থা রোজার মতো নয়। কেননা নামাজের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা, তাই নামাজের অবস্থায় খানা-পিনা ভুলবশত হতে পারে না। পক্ষান্তরে রোজা তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা নয়। এ জন্য রোজার অবস্থায় ভুলবশত পানাহারকে ক্ষমার যোগ্য ধরা হয়েছে।

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ وَكُرَّهٌ أَنْ يَقُومَ  
 فِي الطَّاقِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ صَنِيعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ تَخْصِيصُ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ  
 بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ وَكُرَّهٌ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّكَّانِ لِمَا  
 قُلْنَا وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ لِأَنَّهُ إِزْدِرَاءٌ بِالْإِمَامِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَى  
 ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ لِأَنَّ ابْنَ عَمَرَ رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِيرُ بِنَافِيعَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ  
 وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ أَوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ لِأَنَّهُمَا لَا يُعْبَدَانِ  
 وَبِإِعْتِبَارِهِ تَثَبُّتُ الْكَرَاهَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ لِأَنَّ فِيهِ  
 إِسْتِهَانَةً بِالْصُّورِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى التَّصَاوِيرِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ وَأُطْلِقَ  
 الْكَرَاهِيَّةَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مُعَظَّمٌ.

অনুবাদ : ইমামের দাঁড়ানোর স্থান মসজিদে আর সিজদার স্থান মেহরাবে হওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরুহ। কেননা ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণের দিক থেকে এটা আহলে কিতাবের আচরণ সদৃশ। তবে (পদদ্বয় মসজিদে থাকা অবস্থায়) মেহরাবে সিজদা দেওয়ার বিষয়টি আলাদা। ইমামের একা উচ্চস্থানে দাঁড়ানো মাকরুহ। কারণ তা-ই যা আমরা বলে এসেছি। তদ্রূপ যাহিরী বর্ণনা মুতাবিক (বিপরীত অবস্থাটিও) মাকরুহ হবে। কেননা এতে ইমামের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। বসা, আলাপরত কোনো মানুষের পিঠ সামনে রেখে নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা ইবনে ওমর (রা.) কোনো কোনো সফরে (আপন আজাদকৃত দাস) নারি'কে সূতরা বানিয়ে নামাজ আদায় করতেন। সামনে ঝুলন্ত কুরআন শরীফ বা ঝুলন্ত তলোয়ার রেখে নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এ দুটো ইবাদতযোগ্য বস্তু নয়। আর সে হিসাবেই মাকরুহ হওয়া সাব্যস্ত হয়। ছবি সঞ্চলিত বিছানায় নামাজ আদায়ে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এতে ছবিকে তুচ্ছই করা হয়। আর ছবিগুলোর উপর সিজদা করবে না। কেননা এটা ছবি পূজার সদৃশ। মাবসূত কিতাবে (মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি) নিঃশর্ত করা হয়েছে। কেননা অন্যান্য বিছানার মোকাবেলায় মুসল্লিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমামের পা যদি মসজিদে থাকে। আর সিজদা মেহরাবে করা হয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা পা-ই ধর্তব্য বিষয়। সুতরাং পা যেহেতু মসজিদে, তাই তিনি (ইমাম) মুক্তাদীদের সমান হয়ে গেলেন, যদিও সিজদা মেহরাবেই করতে হবে। আর যদি ইমামের পাও মেহরাবে হয় তবে তা মাকরুহ হবে। কারণ এতে আহলে কিতাবের সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা কিতাবীরা ইমামের স্থান বিশেষভাবে নির্ধারিত করে রাখে। পক্ষান্তরে যদি ইমামের পা মেহরাবের বাহিরে হয় আর সিজদা মেহরাবে হয় তবে এতে তাদের সাদৃশ্য হয় না। আর এতে মাকরুহ হওয়ার কারণেই হলো কিতাবীদের সাদৃশ্য হওয়া। সুতরাং যে সূরতে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সেখানে মাকরুহ হবে আর যেখানে পাওয়া যাবে না সেখানে মাকরুহ হবে না। কেউ কেউ মাকরুহ হওয়ার এ কারণ বয়ান করেছেন যে, ইমাম যদি একাকী মেহরাবে দাঁড়ায় অর্থাৎ তার পা মেহরাবের ভিতর

হয় তখন ইমামের ডানে-বামে দাঁড়ানো মুক্তাদীদের নিকট তার অবস্থান অস্পষ্ট থাকে। সুতরাং যদি মেহরাব এমন হয় যে, ইমামের অবস্থান অস্পষ্ট থাকে না তবে ইমামের একাধী মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরুহ হবে না। এই ইমাম আবু জাফর তাহাবীরও এই অভিমত। —(ইনায়)

আর এটাও মাকরুহ যে, ইমাম একা উঁচু স্থানে দাঁড়াবে আর সকল মুক্তাদী নিচে দাঁড়াবে। কেননা এর দ্বারাও ইহুদিদের সাথে সদৃশ হয়ে যায়। আর যদি ইমামের সাথে কিছু লোকও দাঁড়ায় তবে মাকরুহ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার উচ্চতার সীমা বলেননি। এ সম্পর্কে অনেকগুলো মতামত রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মাঝারি গড়নের মানুষের দেহের উচ্চতা পরিমাণ হলে মাকরুহ হবে, অন্যথায় নয়। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এতটুকুণ উচ্চ হওয়া যার দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। কেউ কেউ বলেন, একগজ পরিমাণ উঁচু হওয়া। তৃতীয় মতকে সুতরা —এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। আর এরই উপর নির্ভরতা। উল্লেখ্য যে, মাকরুহ তখনই হবে যখন কোনো ওজর না থাকে। পক্ষান্তরে ওজরের কারণে ইমামের একা উঁচু স্থানে দাঁড়ালে তা মাকরুহ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি ব্যাপারটি উল্টা হয় অর্থাৎ ইমাম নিচে আর মুক্তাদী উপরে হয় তখনও যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী মাকরুহ হবে। কেননা এ সূরতে যদিও ইহুদিদের সাথে মুশাবাহ নেই কিন্তু ইমামের জন্য এটি অবমাননাকর। অথচ ইমামকে সম্মান করা উচিত। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যেহেতু উপরোক্ত সূরতে ইহুদিদের সাথে মুশাবাহ নেই তাই এ সূরত মাকরুহ হবে না। কিন্তু এর জবাব পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَئِذَا سَأَلَكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ فَقُلْ لَا يَعْلَمُ قَالَ فَيَسْأَلُكَ آخَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ فَقُلْ لَا يَعْلَمُ قَالَ فَيَسْأَلُكَ آخَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ فَقُلْ لَا يَعْلَمُ قَالَ فَيَسْأَلُكَ آخَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ فَقُلْ لَا يَعْلَمُ

পড়া যে ব্যক্তি কথা বলছে, মাকরুহ নয়। দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (র.) সফর ইত্যাদিতে সুতরার জন্য যখন কোনো গাছ বা ডালা পেতেন না তখন তিনি স্বীয় আবাদকৃত গোলাম নাম্বিকে বলতেন, স্বীয় পিঠ ফিরিয়ে দাও। পক্ষান্তরে যদি অন্য ব্যক্তির চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়া হয় তবে মাকরুহ হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে,

إِنْ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يَصَلِّيَ إِلَى وَجْهِ غَيْرِهِ فَقَرَّرَ هَذَا بِالذِّمَّةِ وَقَالَ لِلْمُصَلِّيِ اسْتَنْفِئْ صُورَةَ نَفْسِ صَلَاتِكَ وَقَالَ لِفُلَانِ الْعَدُوِّ اسْتَنْفِئْ الْمُصَلِّيَ بِرُجُلِهِكَ .

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে অন্য ব্যক্তির চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়ছে। তিনি উভয়কে দূররা মারলেন। অতঃপর মুসল্লীকে বললেন, তুমি স্বীয় নামাজে সূরতের ইস্তিকবাল করো। আর বসা ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তোমার চেহারা দ্বারা মুসল্লীর ইস্তিকবাল করতছ। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, অপরের মুখের দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরুহ। না হয় ফারুকে আযম (রা.) এতো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। হ্যাঁ; যদি কোনো লোকের চেহারার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে আর মুসল্লী এবং ঐ ব্যক্তির মাঝে এক তৃতীয় ব্যক্তি থাকে; যার পিঠ মুসল্লীর চেহারার দিকে তবে এ সূরতে মাকরুহ হবে না।

مَاتَن —এর কাউল ٱلَّذِي يَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর মধ্যেও কোনো অসুবিধা নেই যে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে আর তার পাশে বসে কিছু লোক কথাবার্তা বলে, তবে কেউ কেউ একেও মাকরুহ বলেছেন। মাকরুহ হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত হাদীস, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَصَلِّيَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ أَوْ تَأْتِيهِمْ

আল্লাহর নবী নিষেধ করেছেন যে, মানুষ নামাজ পড়বে আর তার পাশে লোকেরা কথা বলবে কিংবা ঘুমিয়ে থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে হাদীসের জবাব হলো, এ নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এ সকল লোকদের আওয়াজ এমন উঁচু হবে-যার কারণে নামাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে শায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ বায়ু নিঃসরণ করবে যার দরুন নামাজে হামির রুল পড়ে যাবে। আর যদি এ ধরনের কথা না থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَلَئِذَا سَأَلَكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الْمَدِينَةِ : গ্রন্থকার বলেন, যদি মুসল্লীর সাথে কুরআন শরীফ বা তলোয়ার মূলত থাকে তবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এগুলোর ইবাদত করা হয় না অথচ ইবাদত করার কারণেই মাকরুহ হয়। সুতরাং যখন এগুলোর ইবাদত করা হয় না তখন এগুলো সামনে মূলত থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। কেউ কেউ বলেন,



একপ করা মাকরুহ। দলিল হলো, তলোয়ার যুদ্ধের অস্ত্র, আর লোহা ও অস্ত্র দ্বারা সাধারণত যুদ্ধ করা হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য নামাজের মতো বিনয়ের স্থানে অস্ত্র ইত্যাদিকে সামনে রাখা মুনাসিব নয়। বলা হয়, এ মতটি ইবনে ওমর (রা.)-এর। কুরআন শরীফকে সামনে রাখা মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, এতে আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা কিতাবীরা তাদের কিতাবের সাথে এমনটিই করে থাকে। এটা ইব্রাহীম ইবনে নাখযী (রা.)-এর অভিমত। আমাদের পক্ষ থেকে প্রথমটির (ইবনে ওমরের মতের) জবাব হলো, অবশ্যই তলোয়ার যুদ্ধের অস্ত্র। কিন্তু নামাজওতে وضع حرب যুদ্ধের স্থান। এ কারণেই ইমামের স্থানকে محراب বলা হয়। সুতরাং নামাজ যখন যুদ্ধের স্থান (وضع حرب), তাই নামাজির কাছে অস্ত্র রাখা সমীচীন হবে। কেননা আমাদের ফরাসি ভাষায় যখন তলোয়ার নামাজির সামনে ঝুলানো পড়তে হকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন، وَلْيَاخُذُوا الْخَوَافَ যখন তলোয়ার নামাজির সামনে ঝুলানো থাকবে তখনই প্রয়োজনের সময় তা হাতে নেওয়া সম্ভব হবে। বুঝা গেল নামাজির সামনে তলোয়ার ঝুলানো মাকরুহ নয়। অধিকন্তু সফর ইত্যাদিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নেয়া গেড়ে দেওয়া হতো। আর তিনি সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। উল্লেখ্য যে, নেয়াও তো হাতিয়ার বা অস্ত্র। বুঝা গেল, মুসল্লীর সামনে হাতিয়ার রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ ইব্রাহীম নাখযীর) জবাব হলো, কিতাবীরা কিতাবকে মুসল্লীদের সামনে এ জন্য রাখতনা যে, তা ইবাদত। বরং এজন্য রাখতো যে, যাতে নামাজের মধ্যে তার থেকে দেখে দেখে পড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, এটাতো আমাদের নিকটও মাকরুহ; বরং নামাজ ফাসিদকারী। কিন্তু যদি মুসল্লীর সামনে এমনই রেখে দেওয়া হয়, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং যদি সামনে ঝুলিয়েও দেওয়া হয় এতেও কোনো অসুবিধা হবে না। -(ফাতহুল কাদীর, কিফায়া)

قَوْلُهُ وَلَا تَأْسَ بِآنَ تَصَلَّى الْخ: এমন বিছানা যাতে ছবি রয়েছে এর উপর নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ বেলা-কারাহাত জায়েজ। দলিল হলো, এমনটি করার দ্বারা ছবিগুলোর তাচ্ছিল্যই প্রদর্শন করা হয়। আর আমাদেরকে হকুম দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি কোনো প্রাণীর ছবি বানিয়ে তার হিমাকাতকে জাহির করে তখন আমাদের করণীয় ঐ ছবিকে তুচ্ছ ভাবা এবং তার সাথে হেয়তার আচরণ করা।

গ্রন্থকার বলেন, ছবির উপর সিদ্ধা করবে না। কেননা এটা ছবি পূজার সদৃশ। জামে সগীরের উক্ত ইবারতের হাসিল হলো, ছবিবিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া জায়েজ। কিন্তু ছবির উপর সিদ্ধা করবে না। মাবসূত নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ছবি বিশিষ্ট বিছানায় নামাজ পড়া নিঃশর্তভাবে (مطلقاً) মাকরুহ। চাই ছবির উপর সিদ্ধা করুক বা না করুক। দলিল হলো- যে বিছানা নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা সম্মানযোগ্য। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে বিছানা সম্মানিত। এখন যদি তার মধ্যে ছবি থাকে তবে এ ছবিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা লাঘিম আসে। অথচ আমাদেরকে ছবির ইহানত-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য জায়নামাজে ছবি থাকা নিঃশর্তভাবে অনুচিত। চাই সে ছবিগুলোর উপর সিদ্ধা করা হোক বা না করা হোক।

ফায়েরদা : ছবি উহাই যাকে আল্লাহর মাখলুকের সদৃশ বানানো হয়। চাই غَيْرِ ذِي رُوح (প্রাণী) হোক বা غَيْرِ ذِي رُوح (প্রাণহীন) হোক۔ تمثال প্রাণীর সাথে খাস। এখানে غَيْرِ ذِي رُوح-এর ছবি মুরাদ। কেননা غَيْرِ ذِي رُوح-এর ছবিতে কোনো কারাহাত নেই। দলিল হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আছর। তিনি এক ছবি নির্মাতাকে বলেছিলেন,

إِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَاعِلُهُ فَعَلَيْكَ تَمْسَالُ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ .

যদি তোমাকে ছবি বানাতেই হয় তবে غَيْرِ ذِي رُوح প্রাণহীনের ছবি বানাও। -(ফাতহুল কাদীর)

وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ يَحْدِثُ تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةٌ  
مُعَلَّقَةٌ لِحَدِيثِ جَبْرِئِلَ إِنَّا لَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ  
صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا تَبْدُو لِلنَّظَرِ لَا يَكْرَهُ لَأَنَّ الصَّغَارَ جِدًّا لَتَعْبُدُ.

অনুবাদ : মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা বরাবরে ছবি থাকা কিংবা ঝুলন্ত ছবি রাখা মাকরুহ। কেননা  
হযরত জিবরাঈল কথিত হাদীসে রয়েছে— যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।  
(-বুখারী) ছবি যদি এত ছোট হয় যে, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরুহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজা  
নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মুসল্লীর মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা ডানে, বামে যদি ছবি থাকে তবে ঐ স্থানে নামাজ আদায়  
করা মাকরুহ। এমনভাবে যদি ছবি ঝুলন্ত থাকে তবুও মাকরুহ। দলিল হযরত জিব্রাঈল (আ.) কথিত হাদীস :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِشْرَافُ جَبْرِئِيلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ ادْخُلُ وَفِي  
بَيْتِكَ يَتَرَفَعُ فِيهِ تَصَاوِيرُ إِنَّا أَنْ تَقْلَعَ رَأْسَهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُؤْطَأُ فَإِنَّ مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ  
تَصَاوِيرُ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নবীর ﷺ কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, মহানবী ﷺ  
বললেন, প্রবেশ করুন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, কিভাবে প্রবেশ করব! আপনার ঘরে একটি ছবি বিশিষ্ট পর্দা রয়েছে  
(তাই) তার মাথা কেটে দেওয়া হোক কিংবা তাকে পদদলিত বিছানা করে দেওয়া হোক। কেননা আমরা ফেরেশতাকুল এমন  
ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি রয়েছে। —(শরহে নিকায়্য) উক্ত হাদীস দ্বারা এভাবে দলিল দেওয়া হয় যে, যে স্থানে  
ফেরেশতা প্রবেশ করে না সে স্থান সর্ব নিকৃষ্ট স্থান। আর এ ধরনের নিকৃষ্ট ঘরে নামাজ পড়া মাকরুহ। এ কারণে এ ধরনের  
ঘরে নামাজ পড়া মাকরুহ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাদীসের মধ্যে ফেরেশতা দ্বারা রহমতের ফেরেশতা উদ্দেশ্য। কেননা  
সার্বজনিক নিয়োজিত ফেরেশতা মাত্র দু' সময় ব্যতীত কখনো মানুষ থেকে পৃথক হয় না। দু' সময় হলো, (১) পায়খানা  
প্রসারের সময় (২) এবং স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময়। —(শরহে নিকায়্য)

আর যদি ছবি এত ছোট হয় যে, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরুহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজা করা হয় না।  
এ জন্য এ ধরনের ছবি মূর্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর সমর্থন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর আমল দ্বারাও হয় অর্থাৎ তাঁর  
নিকট এমন একটি আংটি ছিল যার উপর দুটো মাছির ছবি ছিলো। এ পর্যায়ে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার 'কিফায়া গ্রন্থকার এবং  
মোল্লা আলী কারী (র.) সহ প্রায় সকলেই একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ : হযরত ফারুক আযম  
(রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত দানিয়াল (আ.) নবীর একটি আংটি পাওয়া গিয়েছিলো। এ আংটির নগীনার উপর একটি বাঘ  
ও বাঘীণী এবং তাদের মাঝখানে একটি বাচ্চার ছবি ছিল। ছবিতে দেখানো হয়েছিল বাঘ ও বাঘীণী উভয়ে ঐ বাচ্চাটিকে চেটে  
খাচ্ছে। ফারুক আযম (রা.) ছবিটি অশুভ্রতা চোখে দেখলেন এবং আংটিটি হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর হাওয়ালা  
করলেন। উপরোক্ত ঘটনাটির প্রেক্ষাপট হলো, অগ্নিপূজক বখতে নসর যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, তখন তাকে জৈনিক  
গণক বলেছিল আপনার সম্রাজ্যে এমন একটি বাচ্চার জন্ম হবে যে, আপনাকে ধ্বংস করে দিবে। একথা শুনে বখতে নসর  
ভূমিষ্ঠ প্রত্যেক বাচ্চাকে হত্যা করতে আরম্ভ করে দিল। এ বছরেই হযরত দানিয়াল (আ.) ভূমিষ্ঠ হন। তাই তাঁর মাতা তার  
নিরাপত্তার জন্যে তাকে এক গভীর জঙ্গলে রেখে আসেন। যেখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আদম সন্তান বা অন্য কোনো  
কিছু ছিল না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা এ নিষ্পাপ শিশু এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলোকবর্তিকা -এর হিফাজত এভাবে  
করলেন, একটি বাঘ পাঠালেন যাতে সে এ নবজাতক শিশুটিকে হিংস্র প্রাণী থেকে হিফাজত করে। আর এক বাঘীণী পাঠালেন  
তাকে দুই পান করানোর জন্য। আর এরা উভয়ে এ শিশুটি চাটতে থাকতো। বড় হওয়ার পর হযরত দানিয়াল (আ.) আংটির  
নগীনায এ নকশাটি অংকন করলেন, যাতে তা দেখে আল্লাহর অপূরণীয় নিয়ামতের কথা মনে পড়ে। উক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝা  
গেল যে, ছোট ছবি ঘরে রাখা মাকরুহ নয়। না হয় ফারুক আযম (রা.) উক্ত আংটি আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে কিভাবে দিলেন

وَإِذَا كَانَ الِتِمَثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ أَوْ مَحْوُ الرَّأْسِ فَلَيْسَ بِتِمَثَالٍ لِأَنَّهُ لَا تَعْبُدُ  
 يَدُونِ الرَّأْسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَّى إِلَى شَمْعٍ أَوْ سِرَاجٍ عَلَى مَا قَالُوا وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ  
 عَلَى وَسَادَةٍ مُلْقَاةٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهَا تُدَاسُ وَتَوَطَّأُ بِخِلَافِ مَا إِذَا  
 كَانَتْ الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتْ عَلَى السِّتْرِ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا وَاشْتَدَّ كَرَاهَةُ أَنْ  
 تَكُونَ إِمَامُ الْمُصَلِّي ثُمَّ مِنْ فَوْقَ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ خَلْفَهُ وَلَوْ  
 لَيْسَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَارِيرُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ حَامِلَ الصَّنَمِ وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ  
 ذَلِكَ لِإِسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهَا وَتَعَادُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَكْرُوهٍ وَهُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ  
 أُدِيتَ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَا يُكْرَهُ تِمَثَالٌ غَيْرُ ذِي الرُّوحِ لِأَنَّهُ لَا يَعْبُدُ .

অনুবাদ : আর মূর্তি যদি কর্তিত মস্তক বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ যদি মাথা ফেলে দেওয়া হয় তবে তা মূর্তি নয়। কেননা মস্তকহীন অবস্থায় মূর্তিপূজা করা হয় না। সুতরাং তা প্রদীপ বা মোমবাতি সামনে রেখে নামাজ আদায় করার মতো হলো। যেমন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন। যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরুহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় তো তা পায়ে মাদানো হয়। পক্ষান্তরে বালিশ খাড়া করে রাখা অবস্থায় কিংবা বুলন্ত পর্দায় ছবি থাকলে এর ভিন্ন হুকুম হবে। কেননা এতে ছবির প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। কঠিনতম মাকরুহ হলো, ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা, অতঃপর মাথার উপরে থাকা, এরপর ডান দিকে থাকা, এরপর বাম দিকে থাকা, অতঃপর পিছনে থাকা। আর যদি ছবি যুক্ত কাপড় পরিধান করে তবে মাকরুহ হবে। কেননা, সে মূর্তি বহনকারীর সদৃশ হবে। তবে এ অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা নামাজের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে গায়ের মাকরুহ যুক্ত অবস্থায় তা দোহুরাতে হবে। মাকরুহসহ আদায়কৃত সমস্ত নামাজের এই একই হুকুম। তবে অপ্রাণীর ছবি মাকরুহ হবে না। কেননা সেগুলোর পূজা করা হয় না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি ছবির মাথা কর্তিত হয় অর্থাৎ তার মস্তক একেবারেই ফেলে দেওয়া হয় তবে যেহেতু এটা ছবি নয়; جمادات তথা প্রাণহীন বস্তু সদৃশ তাই এর দিকে ফিরে নামাজ পড়া মাকরুহ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মস্তকবিহীন ছবির পূজা করা হয় না। সুতরাং তা এমন যেমন কোনো ব্যক্তি মোমবাতি বা প্রদীপ সামনে রেখে নামাজ আদায় করল। যেমনিভাবে এগুলোর ইবাদত করা হয় না এমনিভাবে মস্তকবিহীন ছবিরও পূজা করা হয় না। আর মুসল্লীর সামনে রাখা মাকরুহ হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তার পূজা করা হয় যেহেতু এখানে এ কারণ পাওয়া যায় না তাই মাকরুহও হবে না। মাশায়খগণ এটাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সামনে মোমবাতি ও প্রদীপ রেখে নামাজ পড়াও মাকরুহ। যেমন মুসল্লীর সামনে যদি সিগারেট ফ্লেয়ার জন্য ছাইদানা থাকে আর তার থেকে অগ্নিকুলিস বের হয় তবে তা মাকরুহ হবে। কিন্তু বিতর্কিত মত হলো মোমবাতি ও প্রদীপ সামনে রেখে নামাজ পড়া মাকরুহ নয়।

قَوْلَهُ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى وَسَادَةِ الْخ : অর্থাৎ যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরুহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় বালিশ পায়ে মাড়ানো হয় আর বিছানাও বিছানো হয়। (তাও পায়ে

মাড়ানো হয়)

উল্লেখ্য যে, এর দ্বারা ছবির অসম্মান প্রকাশ পায় সম্মান প্রকাশ পায় না। এর সমর্থন একটি ঘটনা দ্বারাও হয়। ঘটনা হলো, একবার হাসান বসরী আর হযরত আতা (র.) এমন এক স্থানে প্রবেশ করলেন যার উপর ছবি বিশিষ্ট একটি বিছানা বিছানো ছিল। হযরত আতা-এর উপর দাঁড়িয়ে গেলেন, আর হাসান বসরী (র.) তার উপর বসে গেলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, ছবির উপর না বসাটা ছবির প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। তবে হ্যাঁ, বালিশ যদি খাড়া করে রাখা হয় কিংবা ছবির বিশিষ্ট পর্দা। যদি ঝুলন্ত থাকে তবে মাকরুহ হবে কেননা এতে ছবির সম্মান প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ وَاشْتَدَّ كَرَاهَةُ : বাক্যটি দ্বারা বয়ান করা হচ্ছে যে, কারাহাত তার افراد واحاد -এর কঠোরতাও দুর্বলতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই তো কঠিনতম মাকরুহ হলো ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা। এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর মাথার উপরে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর ডান দিকে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর বাম দিকে থাকা, এরচেয়ে কম হলো মুসল্লীর পিছনে থাকা। কেউ কেউ বলেছেন, যদি ছবি মুসল্লীর পিছনে হয় তবে নামাজ মাকরুহ হবে না। তবে ছবি ঘরে থাকা মাকরুহ। কেননা নামাজের স্থান এমন জিনিস থেকে পাক করা মোস্তাহাব যা ফেরেশতার প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَيْسَ ثَوْبًا الْخ : ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা মাকরুহ। কেননা এর দ্বারা সে ছবি বহনকারীর সদৃশ হয়ে যায়। সদৃশ বলার কারণ হলো, কাপড়ে তো বাস্তবে কোনো মূর্তি নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সকল মাকরুহ সূরতে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে নামাজের যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আরো বলেন, নামাজ যদি মাকরুহ তরীকায় আদায় করা হয় তবে সতর্কতা হলো, তাকে মাকরুহ মুক্ত অবস্থায় দোহরাতে হবে। এতে শায়খ কওয়ামুদীন কাকী (র.) শরহে মানারের মধ্যে واجب শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নামাজ যদি কারাহাতসহ আদায় করা হয় তবে তা দোহরানো ওয়াজিব। তবে সত্য কথা হলো, নামাজ যদি কারাহাতে তাহরীমীর সাথে আদায় করা হয় তবে তা দোহরানো ওয়াজিব। কেননা মাকরুহে তাহরীমী ওয়াজিবের মোকাবেলায় আসে। আর যদি নামাজ কারাহাতে তানখীহীর সাথে আদায় করা হয় তবে তা দোহরানো মোস্তাহাব। কেননা মাকরুহে তানখীহী মোস্তাহাবের মোকাবেলায় আসে। - (ফাতহুল কাদীর)

وَلَا بَأْسَ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَانَ فِيهِ إِزَالَةُ الشَّغْلِ فَاشْبِهَ ذُرَّ الْعَارِ وَ يَسْتَوِي جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيحُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَيُكَرَّهُ عَدُّ الْآلِي وَالْتَجَنُّبَاتِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ عَدُّ السُّورِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ وَالْتَوَافِلِ جَمِيعًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَلِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ قُلْنَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيَسْتَغْنِي عَنِ الْعِدِّ بَعْدَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : নামাজের মধ্যে সাপ ও বিলু হত্যা করায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দুই কালো (সাপ ও বিলু) মেরে ফেলবে, এমনকি তোমরা যদি নামাজের মধ্যেও থাকো তবুও। তাছাড়া এর দ্বারা নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কাজকে দূরীভূত করা হয়। সুতরাং তা সমুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বোধ করার অনুরূপ বলে গণ্য। সবরকম সাপেরই সমান হুকুম। এটাই সहीহ অভিমত। কেননা আমাদের বর্ণিত হাদীসটি নিঃশর্ত। আর নামাজের মধ্যে হাতে আয়াত ও তাসবীহের সংখ্যা, তদ্রূপ সূরা গণনা করাও মাকরুহ। কেননা তা নামাজের আমল বা কার্যভূক্ত নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিরাআতের সুন্নত পরিমাণ রক্ষা করার জন্য এবং হাদীসে যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা রক্ষা করার জন্য ফরজ ও নফল নামাজে গণনা করা মাকরুহ হবে না। (উত্তরে) আমরা বলি, নামাজ শুরু করার আগেই তো তা গণনা করে নিতে পারে, যাতে পরে গণনা করার প্রয়োজন না হয়। (তদ্রূপ সালাতুত তাসবীহেও হাতে গণনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাতের আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়ে তা গণনা করা সম্ভব।) আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের অবস্থায় সাপ ও বিলু হত্যা করা জায়েজ। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী **لَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ** তোমরা দুই কালো (সাপ ও বিলু) মেরে ফেলবে, যদিও তোমরা নামাজের মধ্যে থাকো। আর আকলী দলিল হলো- সাপ ও বিলু হত্যা করা এ কারণে জায়েজ যে, এর দ্বারা অন্তর তার সাথে মিশ্রিত হওয়া দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ নামাজের দৃষ্টি যতক্ষণ তার দিকে থাকে ততক্ষণ অন্তর এ ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তি থাকে, নামাজের রুহ তথা হৃদয়ে কলব তখন আর থাকে না। এজন্য বলা হয়েছে যে, সাপ বিলু মেরে ফেলো, তাহলে মনের মিশ্রিত দূর হয়ে যাবে এবং হৃদয়ে কলব সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং এ সাপ বিলু মারা নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে রোধ করার সদৃশ হবে। ইনশা'য়াল্লাহু। লিখেছেন, হিদায়া গ্রন্থকার এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি যে, একবার প্রহার করে তাকে হত্যা করবে, কিংবা একাধিকবার প্রহার করার প্রয়োজন দেখা দিলে একাধিকবার প্রহার করে তাকে হত্যা করবে। একই মত শামসুল আইশা আস্‌সাযাদী (র.)-এর। অর্থাৎ যদি একবার মারার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় তবে একবারই কাজে লাগবে। আর যদি একাধিকবার প্রহারের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তা কাজে লাগবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ** -এর মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যদি একবার প্রহার করে একে হত্যা করা সম্ভব হয় তবে মেরে ফেলাবে কিন্তু নামাজ দোহা হবে না। আর যদি একাধিকবার প্রহারের দ্বারা হত্যা করা হয় তবে নামাজ দোহা হবে। কেননা এটা আমলে কাছীর; আর আমলে কাছীর নামাজ বিনষ্টকারী। তবে এর জবাব হলো, অবশ্যই একাধিকবার প্রহারের দ্বারা আমলে কাছীর হয় তবে এটা এমন আমলে কাছীর যা করার ইজাজত শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে। যেমন, নামাজে অজু চলে গেলে নামাজি ব্যক্তির হাঁটা-চলা করা, কূপ থেকে পানি বের করা, অজু করা ইত্যাকার কাজগুলোও আমলে কাছীর। কিন্তু শরয়ীভাবে অনুমতি থাকায় তা নামাজ বিনষ্টকারী নয়। এমনভাবে এখানেও যেহেতু শরিয়তের ইজাজত রয়েছে। তাই বারবার প্রহারের দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত হুকুমে সব ধরনের সাপ অন্তর্ভুক্ত। চাই সাপ সাদা হোক বা লম্বাকেশরাজি বিশিষ্ট হোক কিংবা কালো ফনাতোলা জাতি সাপ হোক। এটাই বিত্তম্ব মত। কেননা আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি তাহালা মুতলাক তথা নিঃশর্ত, যা সবগুলোকে শামিল করে। ফকীহ আবু জা'ফর হিন্দওয়ানী বলেন, কিছু কিছু সাদা সাপ ঘরে অবস্থান করে। এগুলো সাধারণত জিন হয়ে থাকে। এগুলো হত্যা করা জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّهُمُ الْبَيْضَاءُ - তোমরা সাদা রঙ্গের সাপকে হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা সেগুলো জিন্মতের অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত হাদীসে নামাজ এবং গায়ের নামাজের কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ জন্য এ ধরনের সাপকে নামাজ ছাড়া অন্য সময়েও হত্যা করা জায়েজ নেই। হ্যাঁ যদি প্রথমে এভাবে বলে দেওয়া হয় যে, তুমি চলে যাও। মুসলমানদের রাস্তা ছেড়ে পালাও, নতুবা আমরা তোমাকে হত্যা করব। এরপরও যদি না যায় তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ। ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (র.) বলেন, সাপগুলোর মাঝে পার্থক্য করা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন জাতি থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা মানুষের সামনে সাপের আকৃতিতে বের হবে না এবং মানুষের ঘরে প্রবেশ করবে না। যখন তারা কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করল এবং মানুষের বাসা বাড়িতে অবস্থান শুরু করল। তাই এগুলোকে হত্যা করা জায়েজ হবে। এ মতটি শামসুল আইম্মা সাব্বাখী গ্রহণ করেছেন, আর হাদীসের মধ্যে اسودين দ্বারা কালো সাপ মুরাদ নয়; বরং এ শব্দটি আরবদের পরিভাষায় সাধারণত সবধরনের সাপের ক্ষেত্রে বলা হয়।

قَوْلُهُ وَيَكْرَهُ عَذَابِي وَالْغَسْبِيَّاتِ الْخ : নামাজের মধ্যে হাত দ্বারা তাসবীহ এবং আয়াত গণনা করা মাকরুহ। নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। এমনভাবে সূরা গণনা করাও মাকরুহ। কেননা আয়াত, তাসবীহাত এবং সূরাগুলো গণনা করা নামাজের আমালের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই যাহিরী রিওয়ায়াত। بِالْيَدِ -এর فِي দ্বারা দু'টো জিনিস বুঝা যায়। এক, আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়ে গণনা করা মাকরুহ নয়। দুই, জবান দ্বারা গণনা করবে না। কেননা জবান দ্বারা গণনা করা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়।

গ্রন্থকার فِي الصَّلَاةِ -এর فِي দ্বারা এদিকে ইশারা করেছেন যে, নামাজের বাহিরে গণনা করা মাকরুহ নয়। কিন্তু আত্মা মা ফখরুল ইসলাম (র.) বলেছেন, নামাজের বাহিরেও তাসবীহ গণনা করা বিদ'আত। তিনি বলেছেন, كَانَ السَّلْبُ - يَقْرَأُونَ نَذْبًا وَلَا تَغْصِي وَتَسْبَحُ - আসলাফে কেলাম বলতেন, আমরা গুনাই করি গণনা করি না। কিন্তু তাসবীহ পড়ি তা গণনা করি।

غَيْرَ طَاهِرِ الرَّوَاةِ -এর মধ্যে সাহেবাইন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াত ও তাসবীহকে ফরজ ও নফল উভয় নামাজে গণনা করা যায়। দলিল হলো- মানুষের অনেক সময় আয়াত গণনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, সে চায় যে, ফরজ নামাজে সুন্নত তরীকায় কিরাআত পড়বে অর্থাৎ চল্লিশ কিংবা ষাট আয়াত পড়বে- যা সুন্নাতে রাসূল দ্বারা সার্বিত আছে। কিংবা সালাতুত তাসবীহে সুন্নত তরীকার আমল করতে চায়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত উভয় সুরত গণনা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঐ সময়ে গণনা করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, কিরাআতে মাসনুনের উপর আমল করা এভারও সম্ভব যে, নামাজ শুরু করার আগেই নির্ধারণ করে নিবে যে, প্রথম রাক'আতে-এখান থেকে এখন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত পড়ব। এ সুরতে নামাজে গণনার কোনো জরুরত হবে না। এমনভাবে সালাতুত তাসবীহেও হাত দ্বারা গণনা করার কোনো জরুরত নেই। কেননা হাতের আঙ্গুলের মাথা চাপ দিয়েও গণনা করা সম্ভব। আল্লাহই সত্যক অবহিত।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে **مَكْرُوْهَاتٌ** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। উক্ত পরিচ্ছেদে নামাজের বাইরের **مَكْرُوْهَاتٌ**-এর আলোচনা করা হচ্ছে। মাসআলা, **حُجَّتُ فِضَاءٍ** অর্থাৎ পেশাব পায়েখানার সময় স্বীয় লজ্জাস্থান কিবলামুখী করা মাকরুহ তাহরীমী, খোলা ময়দানে হোক বা বন্ধ ঘরে হোক। সামনের দিকে কোনো পর্দা থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় মাকরুহ তাহরীমী। দলিল হলো, **رَأْسُكَ يَلْبِغُكَ** তা থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে যে, **لَقَدْ** عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَنْ الْخِيَرَةِ قَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا اللَّهُ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بِلَى- **ابن داود**। যহরত **عَلَيْكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِيَرَةِ** قَالَ أَجَلَ لَقَدْ نَهَانَا اللَّهُ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَانِطٍ أَوْ بِلَى- **ابن داود**। এমনকি পেশাব পায়েখানা করারও (তার এ কথা ব্রিৎপাশ্বক ছিল) যহরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, জী হ্যা, আমাদেরকে আমাদের নবী পেশাব পায়েখানার অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ) আবু দাউদ শরীফেরই অন্য বর্ণনায় রয়েছে **إِذَا اتَّخَذَ الْغَانِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَانِطٍ وَلَا بِلَى وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا**। (ابن داود)। যখন তোমরা কাজয়ে হাজাতের জন্য যাবে তখন **استقبال قبله** ও **استدبار قبله** করবে না। তবে তোমরা প্রাচ্য ও প্রতীচের দিকে ফিরে ইসতিন্জা করবে। উল্লেখ্য যে, **وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا**-এর হুকুম বিশেষ করে মদীনাবাসীর জন্য। কেননা কা'বা শরীফ মদীনা শরীফের পূর্বেও নয় এবং প্রতীচ্যেও নয় বরং দক্ষিণ দিকে। এ হুকুম আমাদের ভারত মহাদেশের জন্য নয়; বরং আমাদের জন্য হলো, **وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِبُوا** অর্থাৎ কাযয়ে হাজাতের সময় উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে ফিরে বসবে। **استدبار قبله** তথা কা'বার দিকে পিছন দিয়ে বসা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দু'টো বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী **استدبار قبله** ও মাকরুহ। এর কারণ হলো, যেমনিভাবে **قبله استقبال** ঘারা কিবলার সম্মান তরক করা হয়, এমনিভাবে **قبله استدبار** ঘারাও সম্মান তরক হয়। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী **قبله استدبار** মাকরুহ নয়। কেননা যে ব্যক্তি কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসেছে, তার লজ্জাস্থান কিবলার দিকে হয় না। আর যা কিছু লজ্জাস্থান থেকে বের হয় তা জমিনের দিকে পড়ে। অর্থাৎ পেশাবের স্রোত বিভিন্ন দিকে চলে যায়, কিবলার দিকে যায় না। পক্ষান্তরে যে কিবলামুখী হয়ে বসে তার লজ্জাস্থান কিবলামুখী হয়ে থাকে, যা তার থেকে বের হয় তাও কিবলামুখী হয়ে পড়ে। এ জন্য **قبله استقبال** দিকে মাকরুহ বলা হয়েছে। উপরোক্ত মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবের বিদায় নামে।

وَكُرَّهَ الْمُجَامَعَةُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوْلَ وَالتَّخْلِيَّ لِأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَصْغَعَ الْإِقْتِدَاءُ مِنْهُ يَمَنْ تَحْتَهُ وَلَا يَنْطَلُ الْإِعْتِكَافُ بِالصَّغُورِ إِلَيْهِ وَلَا يَجِلُّ لِلْجَنْبِ الرُّقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا بَأْسُ بِالْبَوْلِ فَوْقَ بَيْتِ فِيهِ مَسْجِدٌ وَالْمَرَادُ مَا أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ نُدْبِنَا إِلَيْهِ وَكُرَّهَ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الْمَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقِيلَ لَأَبَأْسُ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَى مَتَاعِ الْمَسْجِدِ غَيْرَ أَوَّانِ الصَّلَاةِ.

**অনুবাদ :** মসজিদের উপরে স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব করা এবং পায়খানা করা মাকরুহ। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য মসজিদের ছাদে দাঁড়ানো মুসল্লীর জন্য ছাদের নিচে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা বৈধ এবং ছাদে আরোহণের কারণে ইতিকাফ বাতিল হয়নি এবং জানাবাতের অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা জায়েজ নয়। ঐ ঘরের ছাদে পেশাব করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই যার নিচে মসজিদ ইবাদতখানা রয়েছে। মসজিদ দ্বারা বাড়ির ঐ অংশকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তা শরঈ মসজিদের হুকুমের আওতা পড়ে। যদিও আমাদেরকে বাড়িতে নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। আর মসজিদের দরজা তালাবদ্ধ রাখা মাকরুহ। কেননা তা নামাজ থেকে নিষেধ করার সদৃশ। কোনো কোনো ফকীহর মতে মসজিদের আসবাবপত্র হারানোর ভয় থাকলে নামাজ ছাড়া অন্য সময়ে বন্ধ রাখাতে অসুবিধা নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদের ছাদের উপর স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহে তাহরীমী। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমভূক্ত। সুতরাং মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কেউ যদি ছাদের নিচে দাঁড়ানো ইমামের পেছনে ইকতিদা করে তবে তা জায়েজ। মসজিদের ছাদে উঠার কারণে মু'তাকিফের ইতিকাফ নষ্ট হয় না। জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ানো জায়েজ নয়, যেমনিভাবে মসজিদের ভিতরেও দাঁড়ানো জায়েজ নেই। বুঝা গেল মসজিদের ছাদ মসজিদেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু মসজিদের ভিতর এ সকল কাজ হারাম সেহেতু মসজিদের ছাদের উপরও এগুলো হারাম হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَأْسُ بِالْبَوْلِ الْغ: ঘরের মধ্যে যদি কোনো স্থান নামাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়, তবে ঐ ঘরের ছাদে পেশাব-পায়খানা করায় কোনো অসুবিধা নেই। দলিল হলো— ঐ স্থানকে হাকীকী মসজিদের হুকুমের আওতাভুক্ত করা যায় না। এমনকি ঐ স্থানটি বিক্রি করাও জায়েজ এবং এর উত্তরাধিকারীও সাবিত হবে। আমাদেরকে ঘরের মধ্যে মসজিদ বানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হলো স্বীয় ঘরের কোনো স্থানকে নামাজের জন্য নির্ধারণ করা যাতে সেখানে সন্নত ও নফল আদায় করা যায়। আত্মাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনায় বলেছিলেন اِفْعَلُوا بِتَوَنُّكُمْ - নিজের ঘরগুলোকে কিবলা বানাও। অর্থাৎ নিজের ঘরের কোনো স্থানকে নির্ধারণ করো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا تَتَخَذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে নামাজকে তরক করে ঘরগুলোকে কবরস্থানের সদৃশ করে না; বরং ঘরগুলোতে নামাজ পড়ো এবং ইবাদত করো।

قَوْلُهُ وَكُرَّهَ أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ الْ: অর্থাৎ মসজিদের তালাবদ্ধ রাখা মাকরুহ। কেননা এটা নামাজ থেকে নিষেধ করা সদৃশ। আর নামাজ থেকে বারণ করা হারাম। আত্মাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ - এর চেয়ে বড় জালিম কে! যে মসজিদগুলোতে আত্মাহর জিকির করতে বারণ করে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, যদি মসজিদের আসবাবপত্র নষ্ট হওয়ার বা চুরি হওয়ার সন্ধান থাকে তবে তালা বন্ধ করায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা কালের বিবর্তনের কারণে মানুষের হালাতও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন— এক সময় খ্রীশোকদের মসজিদে আসার অনুমতি ছিল; কিন্তু ফিতনার ভয়ে তা থেকে তাদেরকে বারণ করা হোয়েছে, কাজেই এ জ্ঞানায় তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা জায়েজ। এমনিভাবে এ ফিতনার জ্ঞানায় মসজিদে তালাবদ্ধ করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং সঠিক তবে তা নামাজের সময়ে করা যাবে না।



وَلَابَّاسٌ يَنْفَقُشُ الْمَسْجِدَ بِالْحَصِ وَالسَّاجِ وَهَاءَ الذَّهَبِ وَقَوْلُهُ لَابَّاسٌ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوجَرُ عَلَيْهِ لِكُنْهَ لَا يَأْتُمُّ بِهِ وَقِيلَ هُوَ قُرْبَةٌ وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ أَمَّا الْمُتَوَلَّى يَفْعَلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إِلَى أَحْكَامِ الْبِنَاءِ دُونَ مَا يَرْجِعُ إِلَى التَّقْشِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : মসজিদের চুনকাম করা, শালকাঠ দ্বারা এবং স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করতে কোনো অসুবিধা নেই। ‘অসুবিধা নেই’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কাজে কোনো ছওয়াব নেই। তবে গুনাহও হবে না। কোনো কোনো ফকীহর মতে এটি ছওয়াবের কাজ। তবে এটি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মাল হতে শুধু ঐ সমস্ত কাজই করতে পারেন, যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও যদি কিছু কারুকার্য করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদ সুসজ্জিত করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে মসজিদ সুসজ্জিত করা মাকরুহ। কেননা একবার হযরত আলী (রা.) এক মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, لِمَنْ هَذَا الْبَيْعَةُ - এই গির্জাটি কার? উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা.) -এর এভাবে বলার দ্বারা সুসজ্জিত করার আমল মাকরুহ হওয়া বুঝায়। এমনভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদ সুসজ্জিত করাকে কিয়ামতের আলামত বলে অভিহিত করেছেন। একবার ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক মসজিদে নববী সুসজ্জিত করার জন্য মদীনা শরীফে আসবাবপত্র পাঠালে ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) তা গরিবদের মাঝে বন্টন করে দেন। উপরোক্ত দলিলগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদ সুসজ্জিত করা মাকরুহ। তবে ফুকাহায়ে আহনাফের মতে এতে কোনো অসুবিধা নেই। দলিল হলো, ফারুককে আ'যম (রা.) তাঁর খিলাফত কালে মসজিদে নববী প্রশস্তও করেছেন এবং সুসজ্জিতও করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, মসজিদ সুন্দর করার কারণে লোকেরা অধিকহারে ইতিকাফের প্রতি ধাবিত হবে এবং দীর্ঘসময় নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকবে। উল্লেখ্য যে, এটাতে খুবই উত্তম কাজ, তাই মসজিদগুলো সুন্দর করাও উত্তম কাজ হবে। আর যদি উত্তম না হয় তবে কমছে কম খরাপ তো আর হবে না? যা আমাদের মাযহাবে রয়েছে।

শামসুল আইয্যা সারাবক্সী (র.) বলেন, مَاتَن -এর কণ্ডল لَابَّاسٌ দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মসজিদ সুসজ্জিত করার দ্বারা কোনো ছওয়াব হবে না এবং কোনো গুনাহও হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদ সুসজ্জিত করা ইবাদত। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মসজিদ আবাদ এবং সুন্দর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন, আল্লাহর বাণী- اِنْسَ اَعْمَرَ مَسْجِدَ الْكَلْبِ مَنْ اَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ তা ছাড়া খানায় কা'বাকে স্বর্ণ ও রূপার পানি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং রেশম কাপড়ের গিলাফ পরানো হয়েছে। বুঝা গেল খানায় কা'বাকে সুসজ্জিত করা ইবাদত এবং ছওয়াবের কারণ। আদ্যুমা ইবনুল হমাম (র.) বলেন, মসজিদগুলো সুসজ্জিতকরণ এ কারণে ইবাদত বলে গণ্য-যেহেতু এগুলো দ্বারা মসজিদের তাযীম ও সন্মান করা হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মসজিদ সুসজ্জিতকরণ ইবাদত রূপে গণ্য হওয়া বা এতে কোনো অসুবিধা না হওয়া এটা তখন যখন মুতাওয়াল্লী তার নিজস্ব টাকা পরিস্রা দ্বারা তা করবে। শর্ত হলো মাল হাসাল হতে হবে। মসজিদ নির্মাণাচরণ যে মাল মসজিদে ওয়াকফ করেছেন তা ব্যয় করতে পারবে না। তাইতো মুতাওয়াল্লী শুধু ঐ সকল মাল খরচ করতে পারেন যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট, কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। এমনকি মুতাওয়াল্লী যদি কিছু করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আবু বকর রাযী বলেন, আমাদের এ জ্ঞমানায় জালিমদের অত্যাচারের ভয়ে অবশিষ্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট জিনিস দ্বারা মসজিদ সুসজ্জিত করা জায়েজ অর্থাৎ এর দ্বারা মুতাওয়াল্লী দায় বহন করতে হবে না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

## بَابُ صَلَاةِ الْوُتْرِ

الْوُتْرُ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ سُنَّةٌ لَظَهَرِ أَثَارُ السُّنَنِ فِيهِ حَيْثُ لَا يُكْفَرُ جَاحِدُهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ وَلَا يُبَيِّنُ حَنِيفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةَ الْوُتْرِ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ أَمْرٌ وَهُوَ لِلْجُؤِبِ وَلِهَذَا وَجِبَ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا لَا يُكْفَرُ جَاحِدُهُ لِأَنَّهُ وَجُوبُهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَهُوَ الْمَعْنَى يَمَارُؤِي عَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَهُوَ يُؤْذَى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَاتَّكَيْتُ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ .

### পরিচ্ছেদ : সালাতুল বিত্ৰ

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে সালাতুল বিত্ৰ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটি সুন্নত। কেননা তাতে সুন্নতের আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিত্ৰ অঙ্গীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না এবং এর জন্য আলাদা আজান দেওয়া হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর দলিল হলো হাদীস, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামাজ বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিত্ৰ। সুতরাং তা তোমরা ইশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করবে। এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। আর তা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। এ জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে তা কাজা করা ওয়াজিব। তবে বিত্ৰ অঙ্গীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ হলো, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবু হানীফা (র.) থেকে বিত্ৰ সুন্নত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ হলো, তা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা ইশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু ইশার আযান ও ইকামতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : গ্রন্থকার مفروضات এবং এর متعلق তথা আওকাত, আদায়ের কাইফিয়ত বা পদ্ধতি, আদায়ে কামিল ও কাছিরের ব্যান থেকে ফারিগ হওয়ার পর উক্ত অনুচ্ছেদে ঐ নামাজের আলোচনা শুরু করছেন, যা ফরজের চেয়ে কম আর নফলের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ সালাতুল বিত্ৰ। সামনে নফলের আলোচনা আসছে সুতরাং ওয়াজিব তথা বিত্ৰকে ফরজ ও নফলের মাঝখানে উল্লেখ করাই যথার্থ।

সালাতুল বিত্ৰের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক, বিত্ৰ ওয়াজিব। দুই, বিত্ৰ সুন্নত মুয়াক্কাদাহ। এ মতটিই সাহেবাইন ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) গ্রহণ করেছেন। তিন, বিত্ৰ ফরজ। এ মতটি ইমাম যুফার ও মালিকিয়াগণ অবলম্বন করেছেন। সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, বিত্ৰের মধ্যে সুন্নতের নমুনা রয়েছে। যেমন- সুন্নতের ন্যায় বিত্ৰ অঙ্গীকারকারী কাফির হয় না। এমনভাবে বিত্ৰের জন্য স্বতন্ত্র কোনো আযান দেওয়া হয় না। যেমনিভাবে সুন্নতের জন্য আযান দেওয়া হয় না। বুঝা গেল, বিত্ৰ হলো সুন্নত। শরহে নিকায় গ্রন্থকার সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে নকলী দলিলও পেশ করেছেন। দলিল হলো হলো, এক, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক গ্রাম্য লোককে বলেছিলেন خَسِرَ صَلَاتَهُ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِمَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْرُقَ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন ;

গ্রাম্য লোকটি বলল, এ ছাড়াও আর কোনো কিছু আমার উপর ফরজ আছে কী? তিনি বললেন, না, বরং নফল পড়বে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত বাকি সব নফল। সুতরাং বিত্বর ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয় না, কেননা বিত্বরও তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাইরে। দুই. বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى الْبَيْتِ** - নবী করীম ﷺ উটের (বাহনের) উপর বিত্বরের নামাজ আদায় করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাহনের উপর নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ, ফরজ ও ওয়াজিব জায়েজ নয়। সুতরাং বিত্বরের নামাজ যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনের উপর তা আদায় করতেন না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল নিম্নোক্ত হাদীস, **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَوةً إِلَّا وَهِيَ الْوُتْرُ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الزَّيَادَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ** -এর **زِيَادَةِ** -এর অর্থ আগ্রাহর দিকে করা হয়েছে, আর সুন্নতের নিসবত রাসুলের দিকে করা হয়। সুতরাং যদি বিত্বরের নামাজ সুন্নত হতো তবে হাদীসের মধ্যে আগ্রাহর দিকে নিসবত করার পরিবর্তে রাসুলের দিকে করা হতো। কিন্তু যেহেতু রাসুলের দিকে নিসবত করা হয়নি সেহেতু বিত্বরের নামাজ সুন্নত হবে না; বরং ওয়াজিব হবে। দুই. কোনো জিনিসের উপর **زِيَادَتِي** তখনই হয় যখন **مَحْدُودُ الْعِدَدِ** (নির্ধারিত পরিমাণ) হয়। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নাওয়াফেল হলো **غَيْرُ مَحْدُودٍ** তথা অ-নির্ধারিত, যার কোনো সীমা নেই। সুতরাং **زِيَادَتِي** ফারায়িমের উপর হবে। কেননা এটিই **مَحْدُودُ الْعِدَدِ** নির্ধারিত। আর যেহেতু **مَزِيدٌ** আর **مَزِيدٌ عَلَيْهِ** এক **جِنْسٌ** হওয়া জরুরি। এ জন্য এর চাহিদা হলো, ফারায়িমের উপর যার যিাদতী করা হয়েছে অর্থাৎ বিত্বরের তাও ফরজ হবে। কিন্তু যেহেতু হাদীস খবরে ওয়াহিদ তাই তা **دَلِيلٌ غَيْرُ قَطْعِي**। আর **دَلِيلٌ غَيْرُ قَطْعِي** দ্বারা ওয়াজিব তো সাবিত হয় কিন্তু ফরজ সাবিত হয় না। এ জন্য সালাতুল বিত্বর ওয়াজিব হবে। তিন. উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে **فَصَلُّوْهَا** -এর সীগাহ এসেছে। আর আমর ওজ্বরের জন্য আসে। সুতরাং এর দ্বারাও বিত্বরের ওয়াজিব হওয়া সাবিত হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিত্বর যেহেতু ওয়াজিব তাই তার কাযাও ওয়াজিব, অথচ সুন্নতের কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম সাহেবের সমর্থন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **الْوُتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يَوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا** - বিত্বর হক ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিত্বরের নামাজ পড়ল না সে আমাদের থেকে নয়। (আবু দাউদ) মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا فَيَسَّلْ** -এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে **أَوْتِرُوا** - শব্দটি ও-এর সীগাহ যার দ্বারা ওয়াজিব সাবিত হয়।

সাহেবাব্দীন (র.)-এর পেশকৃত আকলী দলিলের জবাব হলো, বিত্বর অস্বীকারকারী ব্যক্তি এ জন্য কাফির হয় না যে বিত্বরের সুবৃত হলো **سُنَّةٌ غَيْرُ مَتَوَاتِرَةٍ** দ্বারা (যা দ্বারা ওয়াজিব সাবিত হয়)। আর ইমাম সাহেব কর্তৃক বিত্বর সুন্নত হওয়ার যে কথাটি বর্ণিত আছে এর অর্থ হলো, বিত্বরের সুবৃত হলো সুন্নত দ্বারা। আর যেহেতু বিত্বরের নামাজ ইশার ওয়াক্তে আদায় করা হয় সেহেতু ইশার আযান ও ইকামতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এ কারণে বিত্বরের আলাদা কোনো আযান ও ইকামতের প্রয়োজন নেই। সাহেবাব্দীনের পেশকৃত **حَدِيثُ اِعْرَابِي** -এর জবাব হলো, এ হাদীসটি হলো বিত্বর ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হাদীস। আর ইবনে ওমরের হাদীস **أَوْتَرَ عَلَى الْبَيْتِ** -এর জবাবে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, ইবনে ওমরের হাদীসটি **حَدِيثٌ حَنْظَلُهُ** -এর সাথে বিরোধপূর্ণ (**تَعَارُضٌ**)। **حَدِيثٌ حَنْظَلُهُ** -এর অর্থ ইবনে ওমর তাঁর বাহনের উপর নামাজ পড়তেন কিন্তু বিত্বর জমিনে পড়তেন। ইবনে ওমর বলেন, মহানবী ﷺ এমনটিই করেছেন। অর্থাৎ বিত্বরের নামাজ জমিনের উপর আদায় করতেন। সুতরাং ইবনে ওমরের উভয় হাদীসে যেহেতু **تَعَارُضٌ** হয়ে গেল, তাই উভয়টিই **سَاطِطٌ** হয়ে যাবে। কেননা **إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا**। দুটো জিনিস **تَعَارُضٌ** হলে উভয়টিই **سَاطِطٌ** হয়ে যায়।

قَالَ الْوُتَيْرُ ثَلَاثُ رُكْعَاتٍ لَا يَفْصَلُ بَيْنَهُنَّ يَسْلَامٌ لِمَارُوتَ عَائِشَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ وَحَكَى الْحَسَنُ (র.) إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الثَّلَاثِ وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ (র.) وَفِي قَوْلِ يُؤْتِرُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (র.) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَا وَبَقِيَتْ فِي الثَّلَاثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (র.) بَعْدَهُ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوُتَيْرِ وَهُوَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَنَا مَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الشَّيْءِ آخِرُهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, বিতুর হলো তিন রাকআত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ তিন রাকআতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান (র.) বিতরের তিন রাকআতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও একটি মত এটা। অন্যমতে বিতুর দুই সালামে আদায় করার কথা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এরও এই মত। আমাদের বর্ণিত হাদীস তাদের বিপক্ষে দলিল। আর বিতরের তৃতীয় রাকআতে রুকুর পূর্বে কনূত পড়বে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রুকুর পরে পড়বে। কেননা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের শেষে কনূত পড়েছেন, আর তা রুকুর পরেই হবে। আমাদের দলিল হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী করীম ﷺ রুকুর পূর্বে কনূত পড়েছেন। আর যা অর্ধেকের বেশি, তাকে শেযাংশই বলা যায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিতরের রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে এবং এর মধ্যেও ইখতিলাফ আছে যে, বিতুর এক সালামে হবে না দুই সালামে হবে? ওলামায়ে আহনাফের মতে বিতুর হলো তিন রাকআত এক সালামের সাথে। মাঝে অন্য আরেকটি সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না এ ব্যাপারে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দুটো রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়াত আহনাফের অনুরূপ। দ্বিতীয়টি হলো, বিতুর তিন রাকআত দুই সালামে আদায় করবে। এটাই ইমাম মালিক (র.)-এর মত। কেউ কেউ বলেন, বিতুর হলো এক রাকআত। এক রাকআতের প্রবক্তাদের দলিল হলো, ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। হাদীসটি হলো, صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَنَى مَنَى فَإِذَا خَشِيتُ الصُّبْحَ فَصَلَّ رُكْعَةً - এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট صلاة الليل রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুই দুই রাকআত। যদি তোমার ভোর হয়ে যাবার আশংকা হয় তবে এক রাকআত পড়ে নিবে যা তোমার আদায়কৃত নামাজকে বিতর করে দিবে। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে ইবনে ওমর (রা.) থেকে سرفوعاً বর্ণিত আছে যে, قَالَ مَنْ - الْوُتَيْرُ رُكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ - শেষ রাতে বিতুর এক রাকআত। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, أَحَبُّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বিতুরের পাঁচ রাকআত পছন্দ করে সে তা করবে, আর যে এক রাকআত পছন্দ করে সে তা করবে। তাছাড়া বিতুর সম্পর্কে সাত, নয় এবং এগার রাকআতের বর্ণনাও রয়েছে। - (ইনায়্যাহ)

আমাদের দলিল : (১) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, قَالَ الْوُتَيْرُ ثَلَاثٌ - রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতুর তিন রাকআত আদায় করতেন।

(২) হাসান বসরী (র.) বিতর তিন রাকআত এক সালামের উপর মুসলমানদের ইজমা নকল করেছেন। সুতরাং হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوُتَيْرَ ثَلَاثٌ لَا يَسْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِهِمْ - মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিতর তিন রাকআত। শুধু শেষ রাকআতে সালাম ফিরাবে।

আসিমে আহওয়াল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে **سَمِعْتُ فِي الصَّلَاةِ** সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম রুকু'র পূর্বে না পরে? তিনি বলেন, রুকু'র পূর্বে। আমি বললাম অমুক আমাকে আপনার পক্ষ থেকে এ খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেছেন যে, তা রুকু'র পরে। আনাস (রা.) বলেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ **ﷺ** শুধু একমাস রুকু'র পর কনুত পড়েছেন। এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, কনুত রুকু'র পূর্বে, রুকু'র পরে নয়। ইমাম শাফি'র (র.)-এর পেশকৃত দলিলগুলো জবাব হলো, হাদীসের মধ্যে **فَتَنَى فِي آخِرِ الْوُتْرِ** -এর আলচাক্বা এসেছে। উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিসের অবশেষে বেশি যা হয় তার উপর **آخِر** শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সুতরাং তৃতীয় ব্রাহ্মণাতের রুকু'র পূর্বে অবশ্যের উপরও **آخِر** বিতরের শব্দটি প্রযোজ্য করা সহীহ আছে। সুতরাং এ হাদীসও আমাদের খেলাফ হবে না।

وَيَقْنَتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي غَيْرِ التَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ عَلَّمَهُ دَعَاءَ الْقُنُوتِ اجْعَلْ هَذَا فِي وَتْرِكَ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَتَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوُتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنَتَ كَبَّرَ لِأَنَّ الْحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقْنَتَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاتَرْفَعِ الْأَيْدِيَ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ذَكَرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ وَلَا يَقْنَتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ هَذَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْفَجْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَحْمَدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رح) يَتَّبِعُهُ لِأَنَّهُ تَبَعَ لِإِمَامِهِ وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ مَنْسُوحٌ وَلَا مُتَابَعَةٌ فِيهِ ثُمَّ قِيلَ يَقِفُ قَائِمًا لِبَتَائِعِهِ فِيمَا تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ وَقِيلَ يَقْضِي تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّ السَّائِكَتَ شَرِيكَ الدَّاعِي وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الْإِقْتِدَاءِ بِالشَّافِعِيَّةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ مَا يَزْعَمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ كَالْفُضْدِ وَغَيْرِهِ لَا يَجْزِيهِ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ لِأَنَّهُ دَعَاءٌ.

অনুবাদ : সারা বছরই কুনূত পড়া হবে। রামজানের শেষার্ধ্বে ছাড়া অন্য সময়ের ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে কুনূতের দোয়া শিক্ষা দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اجْعَلْ هَذَا فِي وَتْرِكَ এটা তোমার বিতরের মধ্যে পড়বে, একথা তিনি কোনো তাফসীল ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। বিতরের প্রত্যেক রাকআতে সুরাতুল ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ কুরআনের যে অংশ তোমাদের জন্য সহজ হয় পড়বে। আর যখন কুনূত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলবে। কেননা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আর উভয় হাত উঠাবে এবং কুনূত পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাতটি ক্ষেত্র বাতীত কোথাও হাত উঠানো হবে না। তনুধো কুনূতের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া অন্য কোনো নামাজে কুনূত পড়বে না। ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে কুনূত পড়েছেন, পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম যদি ফজরের নামাজে কুনূত পড়েন তবে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার মুক্তাদীরা নীরব থাকবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ কুনূত পড়বে)। কেননা সে তার ইমামের অনুগত। আর ফজরে কুনূত পড়ার বিষয়টি ইজ্তিহাদ নির্ভর। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, ফজরের কুনূত রহিত হয়ে গেছে। আর যা রহিত হয়ে গেছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়। তবে কথিত আছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন যে বিষয়ে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক, সে বিষয়ে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ বজায় থাকে। অন্য মতে মতভিন্নতা সাবাস্ত করার জন্য বসা অবস্থায় থাকবে। কেননা নীরবতা অবলম্বনকারী আব্বানকারীর সাথে শরিক বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। এ মাসআলাটি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসারীদের পিছনে ইকতিদার বৈধতা এবং বিতরে কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে

অনুসরণের বৈধতা প্রমাণ করে। মুক্তাদী যদি ইমামের পক্ষে থেকে এমন কিছু দেখতে পায়, যাতে সে ইমামের নামাজ ফাসিদ মনে করে, যেমন সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ নয়। কনুতের ক্ষেত্রে পছন্দনীয় হলো তা নীরবে পড়া, কেননা এটা দোয়া।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে বিত্বের মধ্যে সারা বছর দোয়ায়ে কনুত পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে শুধু রমজানের শেষার্ধ্বে দোয়ায়ে কনুত পড়া মোত্তাহাব। আর পুরো বছর কারাহাত হাড়াই জায়েজ। (আইনুল হিদায়া) ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো, **إِنَّ عَمَرَ أَمَرَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ بِالْإِمَامَةِ فِي لَيْلِ مَرْصَانَ وَأَمَرَ بِالْفُتُورِ فِي الْبَيْتِ الْآخِرِ مِنْهُ**।

হযরত ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রমজানের রাতে ইমামত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রমজানের শেষার্ধ্বে দোয়ায়ে কনুত পড়তে বলেছেন। আমাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ **ﷺ** হযরত হাসান ইবনে আলীকে দোয়ায়ে কনুতের তালীম দিয়েছেন। পরে বলেছেন **وَيُرَكِّبُ هَذَا فِي وَرَكِّهِ** এ দোয়াকে তোমার বিত্বের মধ্যে পড়বে। এর মধ্যে রমজান কিংবা গায়েরে রমজানের কোনো তাফসিল করা হয়নি। সুতরাং সারা বছরই দোয়ায়ে কনুত পড়তে হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পেশকৃত **عمر ابن عمر** জবাব হলো, **فُتُورٌ** ঘারা উদ্দেশ্য হলো নামাজের মধ্যে **طول قِراءَة** তথা দীর্ঘ কিরাআত পড়া অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে রমজানের শেষার্ধ্বে দীর্ঘ কিরাআত -এর নির্দেশ দিয়েছেন। এ জবাবের পর উপরোক্ত আছর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হয় না। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, **فُتُورٌ** ঘারা দোয়ায় কনুত মুরাদ, দীর্ঘ কিরাআত মুরাদ নয় তাহলে আমরা জবাবে বলব, এটা সাহাবীর আছর (الر) আর ইমাম শাফিঈ (র.) **أثر صحابي** -কে দলিলযোগ্য মনে করেন না। কাজেই এ হাদীস ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পক্ষে দলিল হতে পারবে না। তবে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয় যে, এই **أثر** টি দলিলযোগ্য এ কারণে যে, এখানে **معنى اجماع** হয়েছে। কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বিশাল জামাআতের উপস্থিতিতে ইমামত করতেন। আর কোনো সাহাবী থেকে এর উপর কোনো ইনকার পাওয়া যায়নি এ জন্য এটা **اجماع** -এর সদৃশ। এর জবাবে আমরা বলব, ইবনে ওমর থেকে ইখতিলাফ তথা ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেননা ইবনে ওমর (রা.) বলেন, **لَا أَعْرِفُ الْفُتُورَ إِلَّا طَوَّلَ الْقِيَامِ** আমার মতে **طول قِيام** ব্যতীত কনুতের ভিন্ন কোনো অর্থ নেই। সুতরাং ইবনে ওমরের ইখতিলাফ থাকা অবস্থায় ইজমা কিভাবে হয়?

**قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ مِنَ الْوُتُورِ الْخ** বিত্বের প্রত্যেক রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়া এবং অন্য একটি সূরা মিলানো সকলের মতে ওয়াজিব। সাহেবাইনের মতে তো এ কারণে যে, বিত্ব হলো সুন্নত। আর সুন্নত ও নফলের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়তে হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিত্ব যদিও ওয়াজিব; কিন্তু যেহেতু বিত্বের উজ্বরের সুব্বত হলো সুন্নত ঘারা, এর ঘারা ইয়াকীনের ফায়দা হয় না, তাই বিত্বের ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়ে গেল। সুতরাং সতর্কতা বশত ইমাম আবু হানীফা (র.) প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন, যেমন সুন্নত ও নফলের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকারের আদ্বাহ তা'আলার বাণী **فَأَقْرَأُوا مَا يَكْفُرُ مِنْ -** **أَقْرَأُوا** ঘারা **مطلق** কিরাআতের উজ্বরের উপর তো দলিল হয়, কিন্তু সূরায় ফাতিহার **تعيين** এবং সূরা মিলানোর **تعيين** -এর উপর দলিল হয় না।

**قَوْلُهُ بَانَ أَرَادَ أَنْ يَفْتَنَ كَبَّرَ الْخ** তৃতীয় রাকআতে সূরায় ফাতিহা পড়া এবং সূরা মিলানোর পর যখন দোয়ায়ে কনুত পড়ার ইরাদা করবে তখন উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। তাকবীর বলবে, তারপর দোয়ায়ে কনুত পড়বে। তাকবীর বলা ওয়াজিব। দলিল হলো, মুসল্লীর হালাতের পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা সে প্রথমে **حَفِظَتْ قِراءَة** -এ বশগুল ছিল আর এখন **شبه قِراءَة** তথা দোয়ায়ে কনুতে বশগুল হলো। আর যেহেতু তাকবীরকে প্রবর্তন করা হয়েছে হালাত পরিবর্তনের সময়, তাই এখানেও তাকবীর বলা ওয়াজিব। তবে এ দলিলের উপর কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, তাকবীর তো তখন **شروع** করা হয়েছে যখন **اقبال** -এর ভিত্তর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এক **نعل** থেকে অন্য **نعل** -এর দিকে প্রত্যাবর্তনের সময়। যেমন, গু'বর সময় এবং উঠার সময় তাকবীর বলা হয়। **اقبال** -এর মধ্যে ইখতিলাফের সময় তাকবীর তো **مشرع** হয়নি। যেমন,

মুসন্নী যখন ছানা শেষ করে কিরাআত শুরু করে তখন তাকবীর বলা হয় না অথচ ছানা থেকে কিরাআতের দিকে হালাত পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল অحوাল ও اقوال-এর ইখতিলাফের সময় তাকবীর বলা مشروع নয়; বরং افعال-এর ইখতিলাফের সময় তাকবীরকে مشروع করা হয়েছে। এর জবাব হলো, এ হালাতে হাত উঠানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَا تَرْفَعُ الْيَدَيْنِ إِلَّا فِي سَبِّ مَوَاطِنَ দ্বারা সাবিত।

আর নামাজের মাঝখানে হাত উঠানোর কোনো সুন্নত নেই। যেমনটি আছে، تكبيرات عيدين و تكبير افتتاح، -এর মধ্যে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা তাকবীর বলাও সাবিত হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ফজরের নামাজে কনূত সুন্নত। আবু নসর বিত্তর ব্যতীত অন্য কোনো নামাজে কনূত নেই। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, ফজরের নামাজে কনূত পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো বাগদাদী বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ফজরের নামাজে কনূত পড়া সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-فَقُنْتُ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ إِلَى أَنْ قَارَأَ الدُّعَاءَ ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো ফজরের নামাজে কনূত পড়তেন। এমনকি (এ অবস্থায় তিনি) ইহখাম ত্যাগ করলেন। আহনাফের দলিল, ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীস-فَقُنْتُ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِ একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাজে কনূত পড়েছেন। (এতে তিনি) আরবের জনৈক গোত্রের জন্য বদ দোয়া করতেন।

হযং আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, فَقُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ شَهْرًا أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى একমাস কিংবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কনূত পড়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ সকল লোকদেরকে বদ দোয়া করা যারা সত্তর কিংবা আশিজন কারীকে শহীদ করেছিল। এ হাদীস দ্বারাও বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে মাত্র কিছু দিন ব্যতীত দোয়ায় কনূত পড়েননি। আবু ওসমান নাহ্দী বলেন, صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ) سَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ (رَضِيَ) كَذَلِكَ نَلَمَ أَرَأَجِدًا مِنْهُمْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ আমি হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর পিছনে দুই বছরকাল নামাজ পড়েছি তাদের কাউকে ফজরের নামাজে কনূত পড়তে দেখিনি।

قَوْلُهُ فَإِنْ قُنْتُ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ যদি শাফعی মসলক ইমাম ফজরের নামাজে দোয়ায় কনূত পড়ে আর মুক্তাদী حنفي المذهب হয়, তবে তরফাইনের মতে حنفي المذهب মুক্তাদী নীরব থাকবে, কনূত পড়বে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, ইমামের অনুসরণ করবে অর্থাৎ حنفي المذهب মুক্তাদীও কনূত পড়বে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মুক্তাদী অবশ্যই ইমামের অনুগত। আসল (اصل) হলো, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে। আর ফজরের নামাজে কনূত পড়ার বিষয়টি বিরোধপূর্ণ (مختلف فيه)। কেননা কারো মতে ফজরের নামাজে কনূত পড়া সুন্নত, আবার কারো মতে ফজরের নামাজে কনূত পড়া সুন্নত ছিল কিন্তু পরে রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং উপরোক্ত ইখতিলাফের কারণে ফজরের নামাজে কনূত পড়া বা না পড়া মাসক্ক এবং মুহতামাল (محتمل)। আর আসল (اصل) রয়েছে صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (رَضِيَ) سَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ (رَضِيَ) كَذَلِكَ نَلَمَ أَرَأَجِدًا مِنْهُمْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ النَّجْرِ সন্দেহ দ্বারা ইয়াকীন দূরীভূত হয় না। এ জন্য ইমামের অনুসরণ করাকে তরক করা যাবে না হযং ইমামের অনুসরণ করে حنفي المذهب মুক্তাদীও কনূত পড়বে।

তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফজরের নামাজে কনূত পড়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজে দীর্ঘ একমাস কনূত পড়েছিলেন কিন্তু পরে তা তিনি ছেড়ে দেন। আর যা রহিত হয়ে গেছে তা অনুসরণযোগ্য নয়। এ জন্য حنفي المذهب মুক্তাদী কনূত পড়ার সময় ইমামের অনুসরণ করবে না বরং নীরব থাকবে।

তবে যেহেতু তারা ইমামের অনুসরণ করবে না তখন কি করবে? এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মুক্তাদীগণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, তাহলে যে জিনিসের মধ্যে অনুসরণ করা ওয়াজিব তার অনুসরণ হয়ে যায় আর তা হলো قيام অর্থাৎ حنفي المذهب মুক্তাদী قيام-এর ক্ষেত্রে স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। আর কনূতের মধ্যে অনুসরণ করবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, যখন حنفي المذهب ইমাম কনূত পড়া শুরু করে তবে তখন حنفي المذهب মুক্তাদী বসে যাবে, তাহলে ইমামের পরিপূর্ণ খুশালাফাত হবে। কেননা নীরব থাকা ব্যক্তিকে দোয়াকারী শরিক মনে করা হয়। যেমন মুক্তাদী কিরাআত পড়ে না বরং নীরব থাকে এতদসত্ত্বেও সে কিরাআতের মধ্যে ইমামের সাথে শরিক আছে।





## بَابُ التَّوَافِلِ

السُّنَّةُ رَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَانِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ  
وَلِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَأَرْبَعُ بَعْدَهَا وَإِنْ شَاءَ  
رَكَعَتَيْنِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ تَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً فِي الْيَوْمِ  
وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَفَسَّرَ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ غَيْرَ أَنَّهُ  
لَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَلِهَذَا أَسَمَاهُ فِي الْأَصْلِ حَسَنًا وَخَيْرَ لِاخْتِلَافِ الْأَثَارِ  
وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا لِعَدَمِ  
الْمُوَظَّيَةِ وَذُكِرَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَفِي غَيْرِهِ ذُكِرَ الْأَرْبَعُ فَلِهَذَا خَيْرٌ إِلَّا أَنَّ  
الْأَرْبَعَ أَفْضَلُ خُصُوصًا عِنْدَ آيِنِ حَنِيفَةٍ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَالْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ  
بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا كَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ -

### পরিচ্ছেদ ৪ নফল নামাজ

অনুবাদ : সুনত নামাজ ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং তারপর দু'রাকআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকআত, তবে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত এবং মাগরিবের পরে দু'রাকআত এবং ঈশার পূর্বে চার রাকআত এবং ঈশার পরে চার রাকআত, তবে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত। এ সম্পর্কে মূলভিত্তি হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস-“যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বার রাকআত সুনত নামাজ নিষ্ঠার সাথে আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।” এরপর রাসূল ﷺ ঐ ভাবেই তাফসীর করেছেন। যেভাবে (মবসূত) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে আসরের পূর্ববর্তী চার রাকআতের কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। এ কারণেই (ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল আসল (মবসূত) নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার (র.) একে (সুনতের পরিবর্তে) হাসান বা উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই চার রাকআত পড়া না পড়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন এ সম্পর্কে হাদীস বিভিন্ন রকমের হওয়ায়। তবে চার রাকআতই উত্তম। ঈশার পূর্ববর্তী চার রাকআতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এজন্যই عَدَمِ مَرَاظَةِ তথা নিয়মিত ভাবে আদায় না করার কারণে এটাকে মোসতাহাব ধরা হয়েছে। তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসে ঈশার পরে দু'রাকআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ইমাম কুদুরী (র.) “ইচ্ছা করলে” কথাটি বলেছেন- তবে চার রাকআতই উত্তম। বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সুপরিচিত মত অনুসারে। (কেননা তাঁর মতে রাতে এক সালামে চার রাকআত আদায় করা উত্তম)। আর যুহরের পূর্বের চার রাকআত আমাদের মতে এক সালামে আদায় করা উত্তম। যেমন (ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে) রাসূল ﷺ আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে বলেছেন। এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর ভিন্ন অভিমত রয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**প্রসঙ্গ কথা :** পূর্বে ফরজ এবং ওয়াজিব নামাজের আলোচনা ছিল এখানে সুন্নত এবং নফলের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। নফল ফরজ ব্যতীত অন্যান্য সব ইবাদতকে শামিল করে এবং সুন্নতকেও শামিল করে বিধায় শিরোনামে শুধু নফল এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সুন্নতের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার এ অধ্যায়ে যদিও সুন্নত এবং নফল উভয়ের আলোচনা করেছেন, তবে গুরুত্ব এবং মর্শদার বিবেচনায় সুন্নতের আলোচনা পূর্বে এনেছেন। সুন্নত দু'প্রকার- এক, মুযাক্কাদা (مُزَكَّد) দুই, গায়ের মুযাক্কাদা (غَيْر مُزَكَّد)

**মুযাক্কাদা :** এ সুন্নতকে বলা হয়, যা মহানবী ﷺ সর্বদা পড়তেন তবে কখনো তিনি তা ছেড়েও দিয়েছেন।

**গায়ের মুযাক্কাদা :** এ সুন্নতকে বলা হয়, যা মহানবী ﷺ সর্বদা পড়তেন। সুন্নতে মুযাক্কাদা বার রাকআত : ফজরের পূর্বে দুই রাকআত যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং তারপরে দুই রাকআত। মাগরিবের পরে দুই রাকআত। ঈশার পর দুই রাকআত এছাড়া অন্যান্য সব নামাজ সুন্নতে গায়ের মুযাক্কাদা। কুদূরী গ্রন্থকার মুযাক্কাদা এবং গায়ের মুযাক্কাদা এর আলোচনা এভাবে করেছেন যে, ফজরের পূর্বে দুই রাকআত যুহরের পূর্বে চার রাকআত তারপর দুই রাকআত, আশরের পূর্বে চার রাকআত, ইচ্ছা করলে দুই রাকআত। মাগরিবের পর দুই রাকআত। ঈশার পূর্বে চার রাকআত এবং ঈশার পরে চার রাকআত ইচ্ছা করলে দুই রাকআত।

**প্রশ্ন :** কুদূরী গ্রন্থকার আলোচনার সূচনা ফজরের সুন্নত দ্বারা কেন করলেন?

**জবাব :** ফজরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- صَلَوَاتُكَ وَتَرَدُّدُكَ الْغَبْلُ অর্থ- তোমরা ফজরের সুন্নত পড়তে থাকো যদিও ঘোড়া তোমাদেরকে পাড়িয়ে যায়। হানান ইবনে খিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের সুন্নত কোনো ওজর ব্যতীত বাসে পড়ে তাহলে তা জায়েজ হবে না। ওলামা ও মাশায়িখে কেবাম লেখেছেন, কোনো আলিমকে যদি লোকেরা ব্যাপকহারে ফতোয়া এবং শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে লোকদের জরুরতের প্রেক্ষিতে তার জন্য সকল সুন্নত তরক করা জায়েজ আছে ফজরের সুন্নত ব্যতীত। এর দ্বারাও ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব প্রতিভাত হয়। ইনায়ার গ্রন্থকার ফজরের সুন্নতের আলোচনা আগে আনার একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সময়ই যেহেতু নামাজকে স্বরণ করিয়ে দেয় আর ফজরের সময়টি হল, সর্বপ্রথম, তাই ফজরের সুন্নতের আলোচনা অন্যান্য সুন্নতের আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মবসূত নামক গ্রন্থে যুহরের সুন্নতের আলোচনা প্রথমে এনেছেন এবং এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, সুন্নত ফরজের তাবে (تابع), আর রাসূল ﷺ-এর উপর সর্বপ্রথম যুহরের নামাজ ফরজ হয়েছে বিধায় যুহরের সুন্নতের আলোচনা প্রথমে এনেছেন। ফজরের সুন্নতের পর কোন সুন্নতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য আছে। ইমাম হালওয়ানী (حلاوانی)-এর মতে ফজরের সুন্নতের পর মাগরিবের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূল ﷺ মাগরিবের সুন্নত সফরে এবং বাড়িতে কখনো ছাড়েননি। অতঃপর তিনি (হালওয়ানী (র.)) বলেছেন, যে মাগরিবের সুন্নতের পর যুহরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এর কারণ উল্লেখ করে বলেন যে, যুহরের পরের সুন্নত সর্বসম্মতি ক্রমে সুন্নত এবং যুহরের পূর্বের সুন্নত মতানৈক্য আছে। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, যুহরের সুন্নতের পর ঈশার পরের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর যুহরের পূর্বের সুন্নতের স্থান। অতঃপর আশরের পূর্বের সুন্নতের স্থান অতঃপর ঈশার পূর্বের সুন্নতের স্থান।

কোনো আলিমের মতে ফজরের সুন্নতের পর যুহরের পূর্বের সুন্নত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ মতই অধিক বিতর্ক। কেননা তাহা তরক করার ক্ষেত্রে ধর্মকী এসেছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَرَكَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنْلَ شَفَاعَتِي.

**অর্থ :** যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত তরক করবে, সে আমার শাফাআত পাবে না। আহাম্মা হালওয়ানী (র.) এ কথাও বলেছেন যে, তারাবীহ ব্যতীত অন্যান্য সুন্নতসমূহ ঘরে পড়া উত্তম, কেননা তারাবীহ-এর ক্ষেত্রে সকল সাহাবাদের ঐকমত্য হলো যে, তারা তারাবীহ-এর নামাজ মসজিদে পড়তেন- (ইনায়ী) হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, উক্ত বার রাকআত সুন্নতে মুযাক্কাদা হওয়ার ক্ষেত্রে মূলভিত্তি এবং দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর বাণী-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَرِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدْرِ .

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন রাসূল বলেছেন, সে ব্যক্তি বার রাকাতাত সুন্নত নামাজ সর্বদা আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে এক ঘর তৈরি করবেন। বার রাকাতাত নামাজ হচ্ছে- চার রাকাতাত যুহরের পূর্বে, তারপর দু রাকাতাত, দু রাকাতাত মাগরিবের পর, ঈশার পর দু রাকাতাত, এবং ফজরের পূর্বে দু রাকাতাত। ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত অন্যান্য মুহাদিসগণ সকলেই এ হাদীসকে নিম্নোক্ত শব্দে উম্মে হাবীবা বিনতে আবী সুফয়ান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন  
إِنَّمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ بَصَلَّى لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ : উম্মে হাবীবা (রা.) রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন- যে বান্দা ইখলাসের সাথে প্রতিদিন ফরজ নামাজ ব্যতিরেকে অতিরিক্ত বার রাকাতাত নামাজ আদায় করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, রাসূল ﷺ বার রাকাতাতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যা কিতাবের মতনে উল্লেখ আছে। তবে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আসরের পূর্বের চার রাকাতাতের উল্লেখ নেই। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মবসুত গ্রন্থে এ চার রাকাতাতকে মোসতাহাব আখ্যা দিয়েছেন এবং ইখতেয়ার দিয়েছেন যে আসরের পূর্বে চার রাকাতাত পড়া যায় এবং ইচ্ছা করলে দু' রাকাতাতও পড়া যায়। কেননা আসরের পূর্বের নামাজের রাকাতাতের ক্ষেত্রে রেওয়াময়েতের মধ্যে ইখতেলাফ আছে যেমন ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

অর্থ : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন। মহান আল্লাহ এ বান্দার উপর রহমত করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাতাত নামাজ পড়ে থাকে।

হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, ʾأَرْتَبَ ۖ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ʾআসরের পূর্বে দুই রাকাতাত নামাজ পড়তেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে উত্তম হলো যে আসরের পূর্বে চার রাকাতাত নামাজ পড়া। কেননা চার রাকাতাতের সংখ্যা অধিক এবং এতে তাহরীমা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকবে। বিধায় দু রাকাতাতের তুলনায় চার রাকাতাত পড়ায় অধিক হওয়াব হবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন যে, রাসূল ﷺ বার রাকাতাতের ব্যাখ্যার সময় ইশার পূর্বে চার রাকাতাতের কথা উল্লেখ করেন নি। তাই এ চার রাকাতাত নামাজও মোসতাহাবের পর্যায়ে ভুক্ত। কেননা তিনি এ চার রাকাতাত নামাজ সদা সর্বদা আদায় করেন নি। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ʾمَنْ تَابَرِ الْغ ʾএ হাদীসে ঈশার পরে দুই রাকাতাতের কথা উল্লেখ হয়েছে, তবে উক্ত (مَنْ تَابَرِ الْغ) হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে চার রাকাতাতের উল্লেখ আছে।

যেমন বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِمْ فَلَهُمْ بَعْدَ الْغُشَاءِ كَأَن كَمِلْتُمْ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকাতাত নামাজ পড়ল, যেন সে রাত্রির ইবাদত করল এবং যে ব্যক্তি ঈশার নামাজের পর চার রাকাতাত নামাজ পড়ল, যেন সে লাইলাতুল কদরে চার রাকাতাত নামাজ আদায় করল। যেহেতু চার রাকাতাত এবং দুই রাকাতাতের হাদীসের শব্দের মধ্যে ইখতেলাফ আছে, এই জন্য ইমাম কুদুরী ইখতেয়ার দিয়েছেন- ইশার পর চার রাকাতাত পড়তে পারে এবং দুই রাকাতাতও পড়তে পারে। তবে উত্তম হলো চার রাকাতাত পড়া। বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) মাঝে একটি মূলনীতিতে ইখতলাফ আছে তা হলো যে, ইমাম সাহেব এর মতে রাত্রে নামাজ চার রাকআত করে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে দু রাকআত করে পড়া উত্তম। উক্ত মূল নীতির ভিত্তিতে ইমাম সাহেবের মতে ঈশার পর চার রাকআত নামাজ পড়া উত্তম। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আমাদের (হানাফীদের) মতে যুহরের পূর্বে চার রাকআত একই সঙ্গে আদায় করতে হবে। অতএব যদি কেউ উক্ত চার রাকআত নামাজ দুই সালামের সহিত আদায় করে তাহলে আমাদের মতে ঐ নামাজ জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে উত্তম হলো দুই সালামের সাথে আদায় করা। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بِتَسْلِيمَتَيْنِ .

অর্থ রাসূল ﷺ: উক্ত চার রাকআত নামাজ দুই সালামে আদায় করতেন। অন্য হাদীসের আছে

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى .

অর্থ : রাসূল ﷺ: বলেছেন, রাত্রে এবং দিনের নামাজ দুই দুই রাকআত করে।

আমাদের দলিল আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর হাদীস,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ مَا فِيهِ الصَّلَاةُ الَّتِي قَدْ تَوَدَّعَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَذِهِ سَاعَةٌ نَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَاجِبٌ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ فَقُلْتُ فَيُكَلِّمُنِي قِرَاءَةً قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ ائْتَسْلِمُ أَمْ يَتَسْلِمُ فَقَالَ يَتَسْلِمُ وَاحِدَةً

অর্থ : রাসূল ﷺ: সূর্য হেলে যাওয়ার পরে চার রাকআত নামাজ পড়তেন। আমি (আবু আইয়ুব আনসারী) বললাম, এ কোন নামাজ যা আপনি সর্বদা পড়ে আসছেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইহা এমন মুহূর্ত যাতে আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। আমি পছন্দ করি যে, ঐ মুহূর্তে আমার নেক আমল উপরে উঠুক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি, প্রত্যেক রাকাতে কিরআত আছে কি? রাকআতে উত্তর দিলেন হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক সালামের সাথে না দুই সালামের সার্থে? জবাবে তিনি বললেন, এক সালামের সাথে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে যুহরের পূর্বে এক সালামের সাথে চার রাকআত সুন্নত। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের উত্তর উক্ত হাদীসে تشهدین দ্বারা আদায় করতেন। হাদীসে হাল (حال) অর্থাৎ রাসূল ﷺ: যুহরের পূর্বে চার রাকআত নামাজ দুই تشهد (তাশাহুদ) দ্বারা আদায় করতেন। হাদীসে হাল (حال) অর্থাৎ রাসূল ﷺ: এর উল্লেখ করে মহল (মحل) অর্থাৎ تشهد (তাশাহুদ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ ব্যাখ্যা ফকীহল উম্মত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর — صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى -এর শব্দ মাশুহ্ব বা প্রসিক্ক এবং النهار-এর শব্দ গরীব বা বিরল যা দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। অতএব এ হাদীসের দ্বারা যুহরের পূর্বে চার রাকআত দুই সালামে আদায় করার পক্ষে দলিল দেওয়া সহীহ হবে না।

قَالَ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّيْ بِتَسْلِيمَةٍ رُكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا وَتَكَرَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فَمَا نَافِلَةُ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّيْ ثَمَنَ رُكْعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ جَازَ وَتَكَرَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رُكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَذْكُرِ الثَّمَانِي فِي صَلَوةِ اللَّيْلِ وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ وَالْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُونُسَ وَمُحَمَّدٍ مَثْنِي مَثْنِي وَفِي النَّهَارِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا مَثْنِي مَثْنِي وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي وَلَهُمَا الْإِغْتِبَارُ بِالتَّرَاوِجِ وَلَا يَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا رَوَتْهُ عَائِشَةُ (رض) وَكَانَ يُوَاطِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضُّحَى وَلَئِنَّهُ أَذْوَمَ تَحْرِيمَةً فَيَكُونُ أَكْثَرُ مُشَقَّةً وَأَزِيدَ فَضِيلَةً وَلِهَذَا لَوْنَدَرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَعَلَى الْقَلْبِ يَخْرُجُ وَالتَّرَاوِجُ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَيَرَاغَى فِيهَا جِهَةُ التَّيْسِيرِ وَمَعْنَى مَارَوَاهُ شَفَعًا لَا وَتَرَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, দিনের নফল ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকআত আদায় করবে। আর ইচ্ছা করলে চার রাকআতও আদায় করতে পারবে। এর বেশি আদায় করা মাকরুহ হবে। আর রাতের নফল সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, এক সালামে আট রাকআত পর্যন্ত আদায় করা জায়েজ আছে। কিন্তু এর বেশি আদায় করা মাকরুহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন : রাতে এক সালামে দুই রাকআতের বেশি আদায় করবে না। জামেউস সগীর কিতাবে রাত্রের নফলের ক্ষেত্রে আট রাকআতের উল্লেখ নেই। মাকরুহ হওয়ার দলিল হচ্ছে— রাসূল ﷺ -এর থেকে বেশি আদায় করেননি। যদি মাকরুহ না হতো তাহলে বৈধতার বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি বেশি আদায় করতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রাত্রে দুই রাকআত করে পড়া আর দিনে চার রাকআত করে আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই দুই রাকআত করে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই চার রাকআত করে আদায় করা উত্তম।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর হাদীস صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي - অর্থ— রাত্র ও দিনের নামাজ দুই রাকআত করে আদায় করা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তারাবীহের নামাজের উপর কিয়াস করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর প্রমাণ হলো হলো, রাসূল ﷺ ঈশার পর চার রাকআত পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন— (আবু দাউদ)। তাছাড়া তিনি চাশতের সময় নিয়মিত চার রাকআত পড়তেন। উপরন্তু এতে তাহরীমা দীর্ঘতর হয়। সুতরাং তা অধিক কষ্ট কর হবে এবং অধিক

ফজিলতপূর্ণও হবে। এ কারণেই যদি কেউ এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে থাকে তবে দুই সালামে নামাজ পড়ার দ্বারা মান্নত থেকে সে মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীত করার দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হবে : (সাহেবাইনের দলিলের জবাব হচ্ছে— তারাবীহ এর উপর সাধারণ নফলকে কিয়াস করা ঠিক নয়) কেননা তারাবীহ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। সুতরাং তাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (র.) এর হাদীসের জবাব হলো উক্ত হাদীসের অর্থ হলো জোড় রাকআত আদায় করতেন বেজোড় রাকআত আদায় করতেন না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে সুন্নতের আলোচনা ছিল, এখানে নফলের আলোচনা করা হয়েছে। আলিমগণ বৈধ এবং উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে রাহ ও দিনের নফলের পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে দিনের নফলের ক্ষেত্রে এক সালামে দুই রাকআত পড়া এবং চার রাকআত পড়া উভয়টিই জায়েজ। এর থেকে অধিক পড়া মাকরুহ এবং রাতে এক সালামে আট রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েজ আছে। আট থেকে অধিক পড়া মাকরুহ। জামেউস সগীর গ্রন্থে আট রাকআতের উল্লেখ নেই। বরং ছয় রাকআতের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস সগীর গ্রন্থে বলেছেন, রাতে এক সালামে ছয় রাকআত পর্যন্ত আদায় করতে পারে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, রাতে এক সালামে আট রাকআতের অধিক (পড়া) মাকরুহ হওয়ার দলিল হলো: রাসূল ﷺ আট রাকআতের অধিক পড়েননি। যদি আট রাকআতের অধিক পড়তেন, তাহলে মাকরুহ হতো না। বৈধতা শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি একবার বা দু'বার আট রাকআতের অধিক পড়তেন। যেহেতু তিনি কখনো এক সালামে আট রাকআতের অধিক নফল পড়েননি তাই এক সালামে আট রাকআতের অধিক নফল আদায় করা মাকরুহ। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, সালাতুল লাইল الصلاة اللیل বা রাত্রের নামাজে আট রাকআতের অধিক নামাজ পড়া হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যেমন হাদীসে আছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُليُّ بِاللَّيْلِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَبْعَ رَكَعَاتٍ نَحْوَ رَكَعَاتٍ أَحَدَ عَشَرَ رَكَعَةً ثَلَاثَ عَشَرَ رَكَعَةً.

অর্থ : রাসূল ﷺ রাতে (কখনো) পাঁচ রাকআত, (কখনো) সাত রাকআত, (কখনো) নয় রাকআত, (কখনো) এগার রাকআত এবং কখনো তের রাকআত নামাজ পড়তেন।

আমাদের পক্ষ হতে এর জবাব হলো— পাঁচ রাকআতের মধ্যে দুই রাকআত রাত্রের নফল, আর তিন রাকআত বিতর এবং সাত রাকআতের মধ্যে চার রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিতর এবং নয় রাকআতের মধ্যে ছয় রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিতর এবং এগার রাকআতের মধ্যে আট রাকআত রাত্রের নফল আর তিন রাকআত বিতর এবং তের রাকআতের মধ্যে আট রাকআত রাত্রের নফল, তিন রাকআত বিতর আর দুই রাকআত ফজরের সুন্নত। রাসূল ﷺ এসব একই সালামে আদায় করতেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর আর কোনো আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ নেই।

—(ফতহুল কাদীর)

কুদূরী-এর ইবারত رَكَعَتَيْنِ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ بِسَلَامَةٍ -এর বাহ্যিক দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহেবাইনের মতে রাতে এক সালামে দুই রাকআতের আধিক নামাজ পড়া জায়েজ নেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো তাদের মতে এক সালামে দুই রাকআতের অধিক নামাজ পড়া উত্তম নয়। قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَةٍ দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতের থেকে পরহেজ করেছেন। কেননা ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন, এক সালামে চার রাকআতের অধিক পড়া জায়েজ নেই। যদি চার রাকআতের অধিক পড়ে তাহলে মাকরুহ হবে।

وَالْأَصْلُ فِي اللَّيْلِ - এখানে নফল নামাজের রাকআতের ব্যাপারে উত্তম কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাহেবাইনের মতে রাতে দুই রাকআত করে পড়া এবং দিনে চার রাকআত করে পড়া উত্তম। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে রাতে ও দিনে দুই রাকআত করে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে রাতে ও দিনে চার রাকআত করে পড়া উত্তম।

إِمَامُ شَافِعٍ (ر.)-এর দলিল, ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস **صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى** - রাসূল ﷺ বলেছেন, রাতে ও দিনের নামাজ (নফল) দুই রাকআত করে পড়া উত্তম।

সাহেবাইনের দলিল, তারা তারা বীহ-এর নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। তারা বীহ-এর নামাজ যেহেতু সর্বসম্মতি ক্রমে দু' রাকআত করে পড়া উত্তম। অতএব রাতের অন্যান্য নফল নামাজ দুই রাকআত করে আদায় করা উত্তম।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল, ইমাম আবু দাউদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস সংকলন করেছেন, তা হঃ রাসূল ﷺ দিশার পর চার রাকআত নামাজ এক সালামে পড়তেন এবং সদা সর্বদা চাশতের নামাজ চার রাকআত করে পড়তেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, রাতে ও দিনে নফল নামাজ চার রাকআত করে পড়া উত্তম।

যুক্তি ভিত্তিক দলিল হলো, এক সালামে চার রাকআত পড়ার দ্বারা তাহরীমা দীর্ঘ হয়; বিধায় কষ্ট বেশি হয় অতএব এটিই উত্তম হবে। পক্ষান্তরে দুই রাকআতে কষ্ট কম। এ কারণে যদি কোনো ব্যক্তি এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে তবে দুই সালামে চার রাকআত নামাজ আদায় করে তাহলে মান্নত হতে মুক্ত হবে না। কেননা সে উত্তম তরীকায় চার রাকআত আদায় করার মান্নত করেছিল কিন্তু এখন সে অনুত্তম তরীকায় চার রাকআত আদায় করল। মূলনীতি আছে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অনুত্তম এবং অশ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা আদায় হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ দুই সালামে চার রাকআত পড়ার মান্নত করে তাহলে এক সালামের সাথে আদায় করার দ্বারা মান্নত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা অনুত্তম বস্তু উত্তম বস্তু দ্বারা আদায় হবে।

قَوْلُهُ الشَّرَافُ بِعَزَائِهِ تَزِيدُ بِحَسَابَةِ الْخ - এর দ্বারা সাহেবাইনের কিয়াসের জবাব দেওয়া হয়েছে, জবাবের সারকথা হলো নিশ্চয়ই তাহরীহ-এর নামাজ দুই রাকআত করে পড়া উত্তম, তবে যেহেতু তারা বীহ-এর নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। তাই জামাআতবন্দী কাজে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে সহজ করার হুকুম এসেছে। যেমন পবিত্র হাদীসে এ মর্মে নির্দেশ এসেছে যে, ইমামের জন্য উচিত যেন সে জামাআতের নামাজ সংক্ষেপে পড়ায়। প্রকাশ্য থাকে যে, রাসূল (সা.) এর এ নির্দেশে জন মানুষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অতএব যেহেতু তারা বীহ-এর নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে সহজ করার নিমিত্তে তারা বীহ-এর নামাজ দুই রাকআত করে পড়ার হুকুম দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ তারা বীহ-এর নামাজ একাকী পড়ে তাহলে চার রাকআত করে পড়া উত্তম, যদি সে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে নফল নামাজ যেহেতু জামাআতের সাথে পড়া হয় না তাই নফল নামাজে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য করার কোনো বিষয় নেই।

قَوْلُهُ وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ لَا وَتَرَا الْخ - এর দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে, জবাবের সারকথা হলো যে, **صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى** -এর মর্ম হলো রাত্রি ও দিনের নামাজ জোড়, বেজোড় নয়, এ হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য দুই দুই সংখ্যা বর্ণনা করা নয়; বরং রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো নফল নামাজ বেজোড় আদায় করা হবে না; বরং নফল নামাজ জোড়ভাবে আদায় করা হবে। চাই এক সালামে দুই রাকআত হোক বা চার রাকআত বা আট রাকআত হোক।



فَصَلِّ فِي الْقِرَاءَةِ : وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرَضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكَعَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا يَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَصَلَاةٍ إِلَّا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ صَلَاةً وَقَالَ مَالِكٌ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ إِقَامَةً لِأَكْثَرِ مَقَامِ الْكُلِّ تَبْسِيرًا وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَفْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِالْأُولَى لِأَنَّهُمَا تَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَأَمَّا الْآخِرَيَانِ تَفَارَقَانِيهِمَا فِي حَقِّ السُّقُوطِ بِالسَّفَرِ وَصَفَةِ الْقِرَاءَةِ وَقَدَرِهَا فَلَا تَلْحَقَانِ بِهِمَا وَالصَّلَاةُ فِيمَا رَوَى مَذْكُورَةٌ صَرِيحًا فَتَصَرَّفُ إِلَى الْكَامِلَةِ وَهِيَ الرَّكَعَتَانِ عُرْفًا كَمَنْ حَلَفَ لَا يَصَلِّي صَلَاةً بِخِلَافٍ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَصَلِّي -

### কিরাআত সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ

অনুবাদ : ফরজ নামাজের দুই রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব<sup>১</sup>। ইমাম শাফেঈ (র.) এর মতে সকল রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ - কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ নয়। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে তিন রাকআতে কিরাআত ফরজ। সহজ করার নিমিত্তে অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য করেছেন।

আমাদের দলিল আল্লাহর বাণী - কুরআনের যতটুকু সহজ হয় পাঠ কর [৭৩, ২০] আর কোনো কাজের নির্দেশ পূনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। তবে দ্বিতীয় রাকআতে আমরা কিরাআত ওয়াজিব করে দিয়েছি প্রথম রাকআতের সাথে তুলনা করে। কেননা উভয় রাকআত সকল দিক থেকে সাদৃশ্য। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআতের পার্থক্য রয়েছে প্রথম দুই রাকআত থেকে। সফরে ঐ দু'রাকআত মাফ হওয়ার এবং কিরাআতের গুণে (উচ্চৈঃস্বরে ও নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে) এবং কিরাআতের পরিমাণের ব্যাপারে। কাজেই শেষের দু' রাকআত প্রথম দু' রাকআতের সহিত মিলিত হবে না।

আর ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সালাত শব্দটি স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ সালাতের উপরই প্রযোজ্য হবে। আর তা সাধারণ ব্যবহারে দুই রাকআতই হয়। যেমন কেউ শপথ করে বলল যে, يَا بَصَلَى صَلَاةً (সে কোনো সালাত আদায় করবে না) এহেন অবস্থায় দুই রাকআত পড়লেই তার শপথ ভঙ্গ হবে। পক্ষান্তরে যদি শপথ করে বলে যে, لَا يَصَلِّي (সে সালাত আদায় করবে না) তা হলে এক রাকআত পড়লেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

১. ওয়াজিব শব্দটি এখানে সুপরিচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার ফরজ, ওয়াজিব, এবং নফলের বিবরণ থেকে ফারিগ হবার পর কিরাআত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। চার রাকআত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের কিরাআত সম্পর্কে পাঁচটি মতামত আছে।

১. হানাফী আলিমদের মতে দুই রাকআতে কিরাআত ফরজ। ২. ইমাম শাফেঈ (র.) এর মতে প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব। ৩. ইমাম মালিক (র.) এর মতে তিন রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। ৪. হাসান বসরী (র.) -এর মতে এক রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। ৫. আবু বকর আসাম (অম) (র.) -এর মতে নামাজে কিরাআত সুনত। আবু বকর আসাম (র.) কিরাআত-কে অন্যান্য জিকিরের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেমন নামাজের রুকু এবং সিজদার তাসবীহ এবং ছানী সুনত অনুরূপভাবে প্রতি রাকআতে কিরাআত পড়াও সুনত।

হাসান বসরী (র.) -এর দলিল **فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرِمُونَ الْقُرْآنَ** এ আয়াতের মধ্যে **فَأَقْرَأُوا** শব্দটি আমার (امر) -এর সীপাহ। আর আমার বা নির্দেশ কোনো কাজের পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। অতএব এক রাকআতেই কিরাআত পড়া ফরজ হবে।

ইমাম মালিক (র.) -এর দলিল : **رَأْسُ** ইরশাদ করেছেন। **أَصْلُهُ الْإِقْرَاءُ** অর্থ কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ বিধায় কোনো রাকআতই কিরাআত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। যেহেতু তিন রাকআত অধিকাংশ, তাই সহজ করার নিমিত্তে অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য ধরা হয়েছে এবং তিন রাকআতে কিরাআত ফরজ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (র.) -এর দলিলও এই হাদীস, কেননা **رَأْسُ** ইরশাদ করেছেন কিরাআত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। আর প্রতিটি রাকআতই নামাজ। অতএব প্রতি রাকআতে কিরাআত ফরজ হবে। প্রত্যেক রাকআতই নামাজ এর দলিল হলো : যদি, কেউ শপথ করে যে আমি নামাজ পড়ব না অতঃপর সে এক রাকআত পড়ল তাহলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। এক রাকআত পড়ার দ্বারা শপথ ভেঙ্গে যাওয়াই দলিল হলো যে, এক রাকআতও নামাজ। অন্যথায় কসম ভেঙ্গে যেত না। হানাফীদের দলিল মহান আল্লাহর বাণী **فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرِمُونَ الْقُرْآنَ**। এ আয়াতে **فَأَقْرَأُوا** শব্দটি আমার (امر) -এর সীপাহ। আর আমার পুনরাবৃত্তির দাবি রাখে না। এক রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়াটা কুরআনের **النص** দ্বারা প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় রাকআত যেহেতু সম্পূর্ণভাবে প্রথম রাকআতের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। এই জন্য **دلالة النص** দ্বারা দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআতও ফরজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের মাঝে **مشابهت** বা সাদৃশ্যতা নেই; বরং উভয়ের মাঝে **مفارقة** বা ভিন্নতা আছে। তা এভাবে যে, প্রথম রাকআতে ছানী, তায়াবুযু (نعوذ) এবং বিসমিল্লাহ আছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রাকআতে এসব জিনিস নেই। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের মাঝে বিসাদৃশ্য প্রমাণিত হল।

জবাব : এসব জিনিস অতিরিক্ত। ধর্তব্য শুধু আরকানের (اركان)। মূল আরকানের ক্ষেত্রে উভয় রাকআত সমান। পক্ষান্তরে শেষের দু' রাকআত প্রথম দু' রাকআত থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতা কয়েক দিক থেকে।

১. সফরের কারণে শেষের দু' রাকআত মাফ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রথম দু' রাকআতে মাফ হয় না। ২. প্রথম দু' রাকআতে উক্বাঃ স্বরে কিরাআত পড়া হয় পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দু' রাকআত কিরাআত ধ্বনি বিহীন পড়া হয়। ৩. প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআতে সূরা মিলানো ওয়াজিব নয়। উভয়ের মাঝে যেহেতু অনেক বাবধান অতএব শেষের দুই রাকআতকে প্রথম দুই রাকআতের সাথে মিলানো যাবে না।

**وَالصَّلَاةُ إِذَا قُرِئَ** -এর দ্বারা ইমাম শাফেঈ (র.) -এর বর্ণিত হাদীস। **وَالصَّلَاةُ إِذَا قُرِئَ** -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সার কথা হচ্ছে- হাদীসে সুস্পষ্ট শব্দ **صَلَاةٌ** দ্বারা **صَلَاةٌ كَامِلَةٌ** বা পূর্ণ নামাজ উদ্দেশ্য। আর সাধারণ ব্যবহারে পূর্ণ নামাজের দ্বারা দুই রাকআতকেই বুঝায়। অতএব হাদীস দ্বারা দুই রাকআতের জন্য কিরাআত সাবিত হবে। প্রতি রাকআতের জন্য কিরাআত সাবিত হবে না।

প্রশ্ন ॥ সাধারণ ব্যবহারে সুস্পষ্ট ভাবে **صَلَاةٌ** শব্দ উল্লেখ করার দ্বারা দুই রাকআত বুঝা যায়। এর প্রমাণ কি?

জবাব : যদি কেউ শপথ করে যে **صَلَاةٌ لَا يَصِلُنِي صَلَاةٌ** অর্থাৎ **صَلَاةٌ** শব্দটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তবে দুই রাকআত নামাজ পড়লে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে **لَا يَصِلُنِي** বলে এবং **صَلَاةٌ** শব্দটি উল্লেখ না করে তাহলে এক রাকআত পড়ার দ্বারা শপথ ভেঙ্গে যাবে।

وَهُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْأَخْرَجِينَ مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ كَذَا رَوَى عَنْ  
 أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ (رض) إِلَّا أَنَّ  
 الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الشُّهُورُ يَتْرَكُهَا فِي  
 ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْوُتْرِ أَمَّا  
 النَّفْلُ فَلَا نَ كُلَّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَوةٌ عَلَى حِدَةٍ وَالْيَقَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيمِهِ مُبْتَدَأَةً  
 وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إِلَّا رَكَعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَلِهَذَا قَالُوا  
 يَسْتَفْتَحُ فِي الثَّالِثَةِ أَيْ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَأَمَّا الْوُتْرُ فَلِلْإِحْتِيَاطِ قَالَ مَنْ شَرَعَ  
 فِي نَافِلَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَأَقْضَاهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَّبِعٌ فِيهِ وَلَا لُزُومَ  
 عَلَى الْمُتَّبِعِ وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى وَقَعَ قُرْبَةً فَلَيْزِمَ الْإِتِمَامُ ضُرُورَةً صَيَانَتُهُ عَنِ الْبُطْلَانِ .

অনুবাদ : শেষ দুই রাকআত তার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত অর্থাৎ ইচ্ছা করলে সে নীরব থাকবে, ইচ্ছা করলে কিরআত পড়বে। আবার ইচ্ছা করলে তাসবীহ পাঠ করবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। বহুতর হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং আয়েশা (রা.) থেকে এই অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে। তবে কিরআত পড়াই উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ সর্বদা এরূপ করেছেন। এ কারণেই যাহিরী রিওয়াযাত মতে তা তরক করার কারণে সাজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হয় না। নফলের সকল রাকআতে এবং বিতরের সকল রাকআতে কিরআত পড়া ওয়াজিব। নফলে ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, নফলের প্রতি দুই রাকআত আলাদা নামাজ এবং তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমা বাঁধার সমতুল্য। এ কারণেই আমাদের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতে প্রথম তাহরীমার দ্বারা শুধু দুই রাকআতই ওয়াজিব হয়। তাই ফকীহগণ বলেছেন যে, তৃতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের ন্যায় ছানা পড়বে। অর্থাৎ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْخ** পড়বে। আর বিতরে ওয়াজিব করা হয়েছে **تَحِيَّاتُ** তথা সতর্কতা হিসাবে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নফল শুরু করে তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সে এর কাজ করবে। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, তার উপর কাযা ওয়াজিব নয়। কেননা সে তা স্বেচ্ছায় আরম্ভ করেছে। আর যে স্বেচ্ছায় কিছু করে তার উপর বাধ্য বাধকতা আরোপিত হয় না। আমাদের দলিল হচ্ছে— আদায়কৃত অংশটুকু ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা অনিবার্য। যেহেতু আমলকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদুরী গ্রন্থকার বলেছেন যে, শেষের দুই রাকআতে নামাজি ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে সে ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে, তিন তাসবীহ পরিমাণ নীরব থাকতে পারে, অথবা তাসবীহও পড়তে পারবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। এটিই যাহিরী রিওয়াযাত এবং তাসবীহ পড়া হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তবে শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ সর্বদা ই তা

পড়েছেন। এ কারণেই যদি শেষের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করা হয় তাহলে সাজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হয় না। এর দ্বারা শেষ দুই রাকআতে সূরা পড়া উত্তম হওয়া জানা গেল। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটিই যাহিরুর রিওয়াযাত।

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আ'যম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শেষ দুই রাকআতে যদি মুসল্লী কিরাআত না পড়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাসবীহও না পাঠ করে তাহলে গুনাহগার হবে এবং যদি ভুলে এগুলো তরক করে তাহলে সাজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হবে। দলিল হলো যে, শেষ দুই রাকআতে কিয়াম نِيَام হলো উদ্দেশ্য। সুতরাং তাকে কিরাআত ও জিকির থেকে শূন্য করা মাকরুহ হবে। ইনায়্যা গ্রন্থকার বলেছেন যে, যাহিরুর রিওয়াযাতই অধিক বিস্তৃত। কেননা কিয়ামের মধ্যে মূল হলো কিরাআত। যখন কিরাআত মাফ হলো তখন সাধারণ কিয়াম (مَطْلَنُ نِيَام) বিদ্যমান থাকল। অতএব এটা সাধারণ মুক্তাদীর কিয়ামের মতো হলো। - (ইনায়্যা)

নফল এবং বিতরের সকল রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব। নফলের প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো যে, নফলের প্রতি দুই রাকআতই আলাদা নামাজ। এ কারণেই প্রথম তাহরীমা দ্বারা দুই রাকআত ওয়াজিব হয়। যদিও দুই রাকআতের অধিক নিয়ত করে। হানাফী আলিমদের প্রসিদ্ধ মত এটিই। অতএব যদি কেউ চার রাকআত নামাজের নিয়ত করে অতঃপর দুই রাকআত পূর্ণ করার পূর্বেই নামাজ ফাসেদ করে দেয় তাহলে নামাজ শুরু করার কারণে শুধু দুই রাকআত কায্য করা ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম তাহরীমার দ্বারা শুধু দুই রাকআত ওয়াজিব হবে।

যেহেতু প্রতি দুই রাকআত আলাদা নামাজ, এই জন্য হানাফী মাশায়িখে কোরাম বলেছেন যে, তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর সময় ছানা পড়বে, কেননা তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমার পর্যায় ভুক্ত। বিতরের প্রতি রাকআতে কিরাআত এই জন্য ওয়াজিব যে, নামাজের মধ্যে কিরাআত প্রত্যক্ষভাবে রুকন (رُكْن) এবং মূল উদ্দেশ্য। আর বিতর ওয়াজিব হওয়াটা যেহেতু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই বিতরে নফল হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। অতএব সতর্কতার কারণে বিতরের প্রতি রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব করা হয়েছে। মোটকথা হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিতরের নামাজ যদিও ওয়াজিব কিন্তু উহাতে নফলের আলামত (أَمَارَاتُ) প্রকাশ পাওয়ার কারণে সতর্কতার দৃষ্টিকোণে আমরা সুন্নত এবং নফলের ন্যায় বিতরের প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত ওয়াজিব করেছি।

نَفْلٌ نَامَازٌ أَوْ رَوَاجَا শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য আছে। হানাফী আলিমদের মতে নফল নামাজ ও রোজা শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। অতএব শুরু করার পর যদি একে ফাসেদ করে দেয় তাহলে এর কাজা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে নফল শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় না। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ শুরু করার পর তা ফাসেদ করে দেয় তাহলে তার উপর এর কাজা ওয়াজিব হবে না। ইমাম শাফেঈ (রা.)-এর দলিল হচ্ছে- নফল আদায়কারী ব্যক্তি নামাজ স্বেচ্ছায় আরম্ভ করে। আর যে স্বেচ্ছায় কিছু করে তার উপর কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ অর্থ- স্বেচ্ছায় পুণ্যকারীদের উপর কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। [৯: ৯১] অতএব নফল শুরুকারীর উপরও কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। আমাদের দলিল- শুরু করার পর নফলের আদায়কৃত অংশ ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা আমল নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরি। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ অর্থ- তোমরা স্বীয় আমল নষ্ট করো না। [৪৭-৩৩] নফল শুরু করার দ্বারা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। অতএব মধ্যখানে তা ফাসেদ করলেও এর কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিলের জবাব- স্বেচ্ছায় নফল আরম্ভকারীর উপর প্রথমে কোনো জিনিস আবশ্যক ছিল না। তবে শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়েছে। আর مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ আয়াতটি প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

وَأَنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَرَأَ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأَخْرَبَيْنِ قَضَى رَكَعَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدَّمَهُ وَالْقِبَاءَ إِلَى الثَّالِثَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّحْرِيمَةِ مُبْتَدَأَةً فَيَكُونُ مُلْزِمًا هَذَا إِذَا أَفْسَدَ الْأَخْرَبَيْنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا وَلَوْ أَفْسَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي لَا يَقْضَى الْأَخْرَبَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ أَنَّهُ يَقْضَى إِعْتِبَارًا لِلشُّرُوعِ بِالنَّذْرِ وَلَهُمَا أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ مَا شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَصَحَّ لَهُ إِلَّا بِهِ وَصَحَّ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ لَأَتَّعِلَقُ بِالثَّانِي بِخِلَافِ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى هَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَقِيلَ يَقْضَى أَرْبَعًا إِحْتِياطًا لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَوةٍ وَاحِدَةٍ .

অনুবাদ : যদি কেউ চার রাকআত নামাজ শুরু করে এবং প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে ও বৈঠক করে অতঃপর শেষ দুই রাকআত নষ্ট করে ফেলে তাহলে দুই রাকআত কাজ্য করবে। কেননা প্রথম দুই রাকআত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুনভাবে তাহরীমা করার সমতুল্য। সুতরাং তা সে ওয়াজিব করে নিয়েছে। এ হুকুম তখনকার জন্য যখন শেষ দুই রাকআত শুরু করার পর নষ্ট করে ফেলে। আর যদি শেষের দুই রাকআত শুরু করার আগেই নষ্ট করে ফেলে, তাহলে শেষ দুই রাকআত কাজ্য করতে হবে না। (প্রথমদুই রাকআত কাজ্য করলেই হবে)

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নামাজ শুরু করাকে মানুতের উপর কিয়াস করে বলেন যে, চার রাকআত কাজ্য করবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে- আরম্ভ অবশ্য পালনীয় করে ঐ অংশকে যা আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে অংশ ছাড়া ঐ কর্ম শুদ্ধ হয় না। আর প্রথম দুই রাকআতের শুদ্ধতা দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দ্বিতীয় রাকআতের বিষয়টি এর বিপরীত। যুহরের সুন্নত সম্পর্কেও একই মত পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা মূলত এটাও নফল। তবে কারো কারো মতে সতর্কতা হিসাবে চার রাকআত কাজ্য করবে। কেননা যুহরের ফরজের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত একই নামাজ হিসাবে গণ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ নফলের নিয়তে চার রাকআত নামাজ শুরু করে প্রথম রাকআতে ওয়াজিব কিরাআত পড়েছে এবং দুই রাকআতের শেষে বৈঠক করেছে অতঃপর শেষের দুই রাকআত ফাসেদ করে দিয়েছে তাহলে তার উপর শেষের দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। মুসান্নিফ (র.) এই মাসআলায় দুই রাকআতের পর বসার শর্ত এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে, যদি দুই রাকআতের শেষে বৈঠক না করে এবং শেষের দুই রাকআত ফাসেদ করে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে চার রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। সারকথা হলো যে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পর যদি শেষ দুই রাকআত নষ্ট করে দেয় তাহলে শেষের দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম দুই রাকআত পূর্ণ হয়েছে। আর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমার সমতুল্য। অতএব এই তাহরীমার দ্বারা শুধু শেষের দুই রাকআত ওয়াজিব হয়েছে। বিধায় উহাকে ফাসেদ (فسد) করার কারণে শুধু উহার কাজ্য ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে ফাসেদ করে দেয় তার পর হলে তার উপর কোনো কাজ্য ওয়াজিব হবে না। কেননা প্রথম দুই রাকআতে বৈঠক করার কারণে প্রথম দুই রাকআত পূর্ণ

হয়েছে এবং শেষের দুই রাকআত এখানে আরম্ভ করেনি। মোটকথা, প্রথম দুই রাকআতের কাজা তো এই জন্য ওয়াজিব নয় যে উহা পূর্ণ হয়েছে। আর শেষের দুই রাকআতের কাযা এ জন্য ওয়াজিব হবে না যে, সে এখানে তা শুরুই করেনি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) চার রাকআত নফল নামাজ আরম্ভ করাকে নয়র বা মান্নতের উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ যেক্রপ চার রাকআত নফল নামাজের মান্নত করার দ্বারা চার রাকআতই ওয়াজিব হবে, অনুরূপ ভাবে চার রাকআতের নিয়তে নফল শুরু করার দ্বারা চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। অতএব প্রথম দুই রাকআত নামাজ ফাসিদ করুক বা দুই রাকআতের পর ফাসিদ করুক সর্বাবস্থায় চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। এই কিয়াসের ইন্নত (علت) বা কারণ হচ্ছে যে যেক্রপ মান্নত শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয় অনুরূপভাবে নফল নামাজও শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো যে, শুরু করাটা ঐ জিনিসের জন্য ইন্নত (علت) বা কারণ হবে যা শুরু করা হয়েছে এবং ঐ জিনিসের ওয়াজিব (وجوب) হওয়ারও কারণ হবে যার উপর আরম্ভকৃত জিনিসের বিশুদ্ধতা (صحت) নির্ভরশীল। যেমন : নফল নামাজ শুরু করার দ্বারাই প্রথম রাকআত ওয়াজিব হয়। কেননা প্রথম রাকআত শুরু কৃত জিনিস। আর প্রথম রাকআতের সিহহাত (صحت) বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল। অতএব শুরু করার দ্বারা দ্বিতীয় রাকআতও ওয়াজিব হবে।

**প্রশ্ন :** প্রথম রাকআতের সিহহাত (صحت) বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল কেন?

**জবাব :** উহার কারণ হলো; যদি প্রথম রাকআত নামাজ দ্বিতীয় রাকআত ছাড়া থাকে তাহলে একে সালাতে বুতায়রা (صَلَاةٌ بَئِيرًا) বা এক রাকআত হিসাবে অভিহিত করা হবে, আর রাসূল ﷺ এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম রাকআতের সিহহাত বা বিশুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআত সেখানে শুরু করেনি এবং এর উপর প্রথম দুই রাকআতের সিহহাত বা বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়। অতএব প্রথম দুই রাকআত আরম্ভ করার দ্বারা শেষের দুই রাকআত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি শেষের দুই রাকআত ফাসিদ করে দেয় তাহলে শুধু শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। প্রথম দুই রাকআতের কাযা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ এক সালামে চার রাকআত নামাজ পড়ার মান্নত করে তাহলে তাহলে এক সালামে চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। যদি দুই সালামে চার রাকআত পড়ে তাহলে মান্নত পূর্ণ হবে না। অনুরূপ মতনৈকা রয়েছে যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নতের ব্যাপারে। অর্থাৎ কেউ যদি যুহরের চার রাকআত সুন্নতের নিয়ত করে নামাজ পড়া আরম্ভ করে। প্রথম দুই রাকআত পড়ার পর তৃতীয় রাকআতের জন্য দাড়িয়ে তা ফাসিদ করে দেয়। তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করতে হবে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করতে হবে।

কোনো কোনো শাইখের মতে এই সূরতে احتیاط তথা সতর্কতার দৃষ্টি কোণে চার রাকআত কাজা করবে। কেননা এই চার রাকআত একই নামাজ হিসাবে গণ্য। যেমন- কোনো মহিলাকে ঐ চার রাকআত নামাজের প্রথম দুই রাকআতের অবস্থায় তৃতীয় রাকআত আরম্ভ করার পূর্বে তার স্বামী তালাকের খিয়ার (خيار) দিল। সে চার রাকআত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাল। তাহলে ঐ মহিলার খিয়ার বাতিল হবে না। অথচ মজলিস পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা খিয়ার (خيار) বাতিল হয় এবং কর্ম পরিবর্তন হওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত এক নামাজ হিসাবে গণ্য। অন্যথায় যদি প্রথম দুই রাকআত আলাদা নামাজ হতো এবং শেষের দুই রাকআত নামাজ আলাদা হয় হত। তাহলে শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করার দ্বারাই ঐ মহিলার খিয়ার (خيار) বাতিল হয়ে যেতো। কেননা কর্ম পরিবর্তনের কারণে মজলিস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

وَلَنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَعَادَ رَكَعَتَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَفْضِي أَرْبَعًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا يُرْجَبُ بَطْلَانُ التَّحْرِيمَةِ لِأَنَّهَا تَعَقُّدٌ لِلْأَفْعَالِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ بَطْلَانُ التَّحْرِيمَةِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْآدَاءِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ زَائِدٌ لَا تَرَى أَنَّ لِلصَّلَاةِ وَجُودًا بِدُونِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلْآدَاءِ إِلَّا بِهَا وَفَسَادُ الْآدَاءِ لَا يَرْتَبِدُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَبْطُلُ التَّحْرِيمَةُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ يُوجِبُ بَطْلَانُ التَّحْرِيمَةِ وَفِي إِحْدَيْهِمَا لَا يُوجِبُ لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدِّهِ وَفَسَادُهَا فِي رَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْتَهِدٌ فِيهِ فَقَضَيْنَا بِالْفَسَادِ فِي حَقِّ وَجُوبِ الْقَضَاءِ وَحَكَمْنَا بِقَاءِ التَّحْرِيمَةِ فِي حَقِّ لَزُومِ الشَّفْعِ الثَّانِي إِخْتِطَابًا إِذَا ثَبَتَ هَذَا نَقُولُ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْكُلِّ قَضَى رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ هُمَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدْ بَطَلَتْ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمَا فَلَمْ يَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الثَّانِي وَبَقِيَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) فَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ثُمَّ إِذَا فَسَدَ الْكُلُّ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : আর যদি কেউ চার রাকআত (নফল নামাজ) আদায় করে কিন্তু তাতে কোনো কিরাআত পড়ে না তাহলে সে দু' রাকআতই দোহরাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। এই মাসআলাটি আট প্রকার। মাসআলার মূল হলো হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে অথবা দুই রাকআতের যে কোনো একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। কেননা তাহরীমা বাঁধা হয় কর্ম সম্পাদনের জন্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং সালাত আদায় হওয়াকে ফাসেদ করে। কেননা কিরাআত হলো সালাতের অতিরিক্ত রুকন (ركن)। তাই তো দেখা যায় যে, কিরাআত ছাড়াও নামাজের অস্তিত্ব হয়ে যায়। (যেমন বোবা মানুষের নামাজ) তবে কিরাআত (زائد) ছাড়া নামাজ আদায় বিশুদ্ধ হয় না। আর আদায় ফাসেদ হওয়া রুকন তরক করার চেয়ে গুরুতর নয়। সুতরাং তাহরীমা বাতিল হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয় কিন্তু দুই রাকআতের শুধু এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। কেননা প্রতি দুই রাকআত স্বতন্ত্র নামাজ। আর এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে নামাজ নষ্ট হওয়া বিতর্কিত বিষয়। তাই

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. চার রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ২. শেষ দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ৩. প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ৪. শেষ দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৫) প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ৬. প্রথম দুই রাকআতের যে কোন এক রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যেকোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৭) শেষ দুই রাকআতে এবং প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। (৮) প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে (الكفاية)। এসব মাসআলার তাখরীজ (تخريج) তিন ইমামের আলাদা আলাদা উসূল বা মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। এই জন্য হিদায়ার গ্রন্থকার প্রথমে এসব উসূল (أصول) বা মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি হলো প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা অথবা এর কোনো একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমকে বাতিল করে। কেননা তাহরীম সংঘটিত করা হয় কর্মের জন্যে আর কর্ম



কিরাআত তরক করার দ্বারা ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে তাহরীমা কর্মের জন্য সংঘটিত করা হয়েছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মূলনীতি হলো- প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; বরং নামাজ আদায় হওয়াকে ফাসেদ করে দেয়। কেননা কিরাআত হলো নামাজের অতিরিক্ত রুকুন। চিন্তা করে দেখুন, যে কিরাআত ছাড়াও নামাজের অস্তিত্ব হয়ে যায়। যেমন বোবা মানুষের ক্ষেত্রে কিরাআত বিহীন নামাজ। তবে কিরাআত ছাড়া নামাজ সहीহ হয় না। মোটকথা প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা ফাসাদে আদা (فساد آداء) বা আদায় ফাসাদের কারণ; তবে তাহরীমাকে বাতিল করার কারণ হবে না। আদায় ফাসাদ হওয়াটা রুকুন তরক করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ যদি আদায়কে তরক করে যেমন কারো অজু ভেঙ্গে গেল এবং সে অজু করতে গেল, তাহলে সে ঐ অবস্থায় আদায়কে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাহরীমা বাতিল হবে না। অতএব যখন তরকে আদা (ترك آداء) বা আদায় তরকের দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না তাহলে ফাসাদে আদা (فساد آداء) বা আদায় ফাসাদ হওয়ার দ্বারা অবশ্যই তাহরীমা বাতিল হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মূলনীতি হলো- প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। তবে প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না; প্রথম মাসআলার দলিল নফলের প্রতি দুই রাকআত নামাজ স্বতন্ত্র নামাজ। এতে কিরাআত তরক করা নামাজকে কিরাআত শূন্য করার শামিল। নামাজকে কিরাআত শূন্য করার দ্বারা নামাজ এমনভাবে ফাসেদ হবে যে, এতে এর তাহরীমা বাতিল হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় মাসআলার দলিল : এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে যুক্তির দাটব ছিল যে, প্রথম মাসআলার ন্যায় তাহরীমা বাতিল হয়ে যাওয়া এবং নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া। যেমন ফজরের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। তবে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে নামাজ নষ্ট হওয়াটা বিতর্কিত বিষয়। কেননা হাসান বসরী (র.)-এর মত হলো যে, নামাজের এক রাকআতে কিরাআত পড়া যথেষ্ট। যদি দুই রাকআতের মধ্যে হতে এক রাকআতে কিরাআত পড়ে অন্য রাকআতে কিরাআত না পড়ে তাহলে নামাজ ফাসেদ হবে না। তাই সতর্কতা অবলম্বন হেতু আমরা বলেছি যে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। তবে শেষের রাকআতদ্বয় আবশ্যিক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, এপর্যন্ত প্রত্যেক (তিনজন) ইমামের মূলনীতি বর্ণিত হলো এখন মতন (مতـن)-এর মাসআলার বিশ্লেষণ পেশ করা হবে- যদি মুসল্লী নফল নামাজের চার রাকআতে কিরাআত তরক করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর যেহেতু তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে তাই শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করাই সहीহ হয়নি। অতএব মনে করা হবে যে, সে শুধু দুই রাকআতেরই তাহরীমা বেঁধেছে এবং ঐ দুই রাকআতকে ফাসেদ করে দিয়েছে। সুতরাং শুধু দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সहीহ হয়েছে। তবে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআত ফাসেদ হয়ে গিয়েছে। অতএব চার রাকআতেরই কাজা ওয়াজিব হবে (আল্লাহই উত্তম জানেন)।

وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَوَّلِينَ لَأَغْيَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَخْرَسِينَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ التَّخْرِيمَةَ لَمْ تَبْطُلْ فَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ثُمَّ فَسَادُهُ يَشْرِكُ الْقِرَاءَةَ لَا يُوْجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ. وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَسِينَ لَأَغْيَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَوَّلِينَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصَحَّ الشُّرُوعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي وَعِنْدَ أَبِي يُونُسَ إِنْ صَحَّ فَقَدْ آذَاهُمَا.

অনুবাদ : যদি শুধু প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআত কাজ্য করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তাহরীমা বাতিল হয় নি। সুতরাং শেষের রাকআতদ্বয় শুরু করা সহীহ হয়েছে। অতঃপর কিরাআত তরক করার কারণে তা ফাসেদ হওয়া প্রথম দুই রাকআত ফাসেদ হওয়াকে সাব্যস্ত করে না। যদি শুধু শেষ দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআতের কাজ্য করা ওয়াজিব হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা শুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে (শেষের দুই রাকআতের) শুরু করা যেমনিভাবে শুদ্ধ হয়েছে তেমনি তা আদায়ও হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি নফল নামাজের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং শেষ দুই রাকআতে কিরাআত না পড়ে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পাঠ করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। তবে কিরাআত তরক করার কারণে শেষের দুই রাকআত ফাসেদ হওয়ার দ্বারা প্রথম দুই রাকআত নষ্ট হবে না। যেহেতু প্রথম দুই রাকআত ফাসেদ হয়নি তাই এর কাজ্য ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে শেষের দুই রাকআত ফাসেদ হয়েছে বিধায় এর কাজ্য ওয়াজিব হবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, এই হুকুম ঐ সময় যখন প্রথম দুই রাকআতের পর বৈঠক করবে। পক্ষান্তরে যদি দুই রাকআতের মাথায় বৈঠক না করে তাহলে চার রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। কিরাআত তরক করার কারণে শেষের দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। আর বৈঠক তরক করার কারণে প্রথম দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে।

মুসল্লী যদি শেষের দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে। এই মাসআলার হুকুমের ক্ষেত্রে ইমামত্রয় সকলেই একমত। তবে তাখরীজের (تخریج) -এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। অতএব যদি শেষের দুই রাকআতে কেউ তার ইকতদা (اقتداء) করে তাহলে তার ইকতদা সহীহ হবে না। এমনভাবে যদি শেষের দুই রাকআতে এই (ইকতদাকারী) ব্যক্তি অষ্ট হাসি দেয় তাহলে তার অজু ভেঙ্গে যাবে না। যদি তাহরীমা বাতিল না হতো এবং শেষ দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হতো তাহলে তার ইকতদা করা জায়েজ হতো এবং অষ্ট হাসি দ্বারা অজু ভেঙ্গে যেত।

মোটকথা হলো, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। আর তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করাই সহীহ হয়নি। আর যেহেতু শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়নি। তাই এর কাজ্য ওয়াজিব হবে না। শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয় নি।

অতএব শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। আর যেহেতু শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। তাই তা আদায় করাও সহীহ হবে। সুতরাং শেষের দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে না। শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজ্য ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَاحِدَى الْآخَرَيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْآخَرَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي  
 الْآخَرَيْنِ وَاحِدَى الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ  
 وَاحِدَى الْآخَرَيْنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُونُسَ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ  
 بَارِقَةٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدَارُ تَفَعُّتٍ عِنْدَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو يُونُسَ  
 هَذَا الرَّوَايَةَ عَنْهُ وَقَالَ رَوَيْتَ لَكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم) أَنَّهُ يُلْزِمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَمُحَمَّدٌ  
 لَمْ يَرْجِعْ عَنْ رَوَايَةٍ عَنْهُ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لِأَغْيَرِ قَضَى أَرْبَعًا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ  
 مُحَمَّدٍ قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْآخَرَيْنِ لَا غَيْرِ قَضَى أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُونُسَ  
 وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصْلِي بَعْدَ صَلَوةٍ مِثْلَهَا تَعْنِي  
 رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَكُونُ بَيَانُ فَرَضِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ كُلِّهَا .

অনুবাদ : যদি প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের মধ্য হতে এক রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষ দুই রাকআত কাজা করতে হবে। আর যদি শেষ দুই রাকআতে এবং প্রথম রাকআতদ্বয়ের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রথম দুই রাকআত কাজা করতে হবে। আর যদি উভয় অংশের এক এক রাকআতে কিরাআত পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত তাই। কেননা তাহরীমা অব্যাহত রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কেননা প্রথম রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে। তার মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এই বর্ণনার কথা অস্বীকার করেছেন। (ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে সম্বোধন করে) তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ বর্ণনা শুনিয়ছি যে, তাকে দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে তার এ বর্ণনা প্রত্যাহার করেননি। যদি শুধু প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে শাইখাইন (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। আর মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করবে। আর যদি শেষের দুই রাকআতের শুধু এক রাকআতে কিরাআত পড়ে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআত কাজা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর হাদীস “কোনো নামাজের পর অনুরূপ নামাজ পড়বে না।” এর মর্ম হলো এরপ পড়বে না যে, দুই রাকআত কিরাআতসহ আর দু’ রাকআত কিরাআত ছাড়া। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা নফলের সকল রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়া বয়ান করা উদ্দেশ্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে তিনটি সূরত উল্লেখ করা হয়েছে, ১. প্রথম দুই রাকআত এবং শেষের কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে। এই সূরতে সর্বসম্মতি ক্রমে শেষের দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ২. শেষ দুই রাকআত এবং প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে, এই সূরতে প্রথম দুই রাকআতের সর্বসম্মতি ক্রমে কাজা করা ওয়াজিব। ৩. প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে এবং শেষের দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে। এই সূরতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আজম (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ-এর মতে প্রথম দুই রাকআতে একাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে- প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি হলো প্রথমে দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণ। তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে শেষের দুই রাকআত শুদ্ধ করাই সহীহ হয়নি। আর তা শুদ্ধ করা সহীহ না হওয়ার কারণে কাজা করা ওয়াজিব হবে না। বরং শুধু প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ

(র.)-এর মতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষের দুই রাকআত আরম্ভ করা সহীহ হয়েছে। শেষের দুই রাকআত শুরু করা বিতর্ক হয়েছে। বিধায় উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

وَقَدْ أَكْرَبُ يُونُسَ هَذِهِ الرِّيَاةِ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মায়াম্বা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং আবু ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য আছে। সারকথা হলো যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) উক্ত মাসআলায় জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বরাতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামেউস সগীর গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করার পর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-কে তা শুনালেন, তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে বললেন যে, আমি তোমার নিকট ইমাম আবু হানীফার এই রিওয়ায়াত বা মত বর্ণনা করিনি। বরং আমি তোমার নিকট আবু হানীফা (র.)-এর এই মত বর্ণনা করেছি যে, তার উপর দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বললেন যে, না। আপনি আমার নিকট এই রিওয়ায়েত বা মত বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় স্মৃতি শক্তির উপর এত অটল থাকলেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অস্বীকার করার পরও তিনি তা প্রত্যাহার করলেন না। ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনাই সঠিক। কেননা পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করা তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণ। এক রাকআতে কিরাআত তরক করলে তাহরীমা বাতিল হয় না। উক্ত মাসআলায় এই সূরতই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে এবং উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। অতএব যখন প্রথম দুই রাকআতের যে কোনো এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে ইমাম আযম (র.)-এর মতে তাহরীমা বাতিল হয় না তাই শেষের দুই রাকআত শুরু করা সহীহ হবে। সুতরাং উভয়ের এক এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে, দুই রাকআতের নয়।

وَلَوْ قَرَأَ فَيُحْدِثُ الْأَرْبَعِينَ : যদি কেউ প্রথম দুই রাকআতের মধ্যে হতে কোনো এক রাকআতে কিরাআত পড়ে এবং অবশিষ্ট রাকআতে কিরাআত কেউ তরক করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআত কাজা করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

শাইখাইনের দলিল : তাদের মতে তাহরীমা বিদ্যমান আছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা এই জন্য যে, প্রথম দুই রাকআতের মধ্য হতে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয় না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে কোনো অবস্থায়ই তাহরীমা বাতিল হয় না। তাদের মতে যেহেতু তাহরীমা বাতিল হয়নি; তাই শেষের দুই রাকআত শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে এবং প্রথম شفع -এর এক রাকআতে এবং দ্বিতীয় شفع -এর উভয় রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে- প্রথম দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। তাই শেষ দুই রাকআত আরম্ভ করাই সহীহ হয় নি। যেহেতু আরম্ভ করা বৈধ হয়নি তাই এর কাজাও ওয়াজিব হবে না। অবশ্য প্রথম দুই রাকআতে এক রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে প্রথম দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : যে শেষের দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত পড়েছে আর অবশিষ্ট তিন রাকআতে কিরাআত তরক করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল, তার মতে উক্ত সূরতে তাহরীমা বাতিল হয়নি বিধায় শেষ দুই রাকআতের শুরু করা বৈধ হয়েছে। যেহেতু সে প্রথম দুই রাকআতে এবং শেষ দুই রাকআতের এক রাকআতে কিরাআত তরক করেছে তাই চার রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার দ্বারা তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। এ কারণে শেষ রাকআতদ্বয়ের আরম্ভ করা বৈধ হয়নি। কাজেই শেষ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত তরক করার কারণে এর কাজা ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার هَذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْمَعٍ (এ মাসআলাটির আটটি সূরত) বলে যে আট সূরতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অধম (জামীল সাহেব) সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে এবং দলিলসহ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উল্লেখ করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উক্তি "وَتَنْفِيسُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْلِي بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا" -এর দ্বারা নফলের প্রতি রাকআত কিরাআত ফরজের পক্ষে দলিল দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ফরজের মতো এরপর অনুরূপ চার রাকআত পড়লে না অর্থাৎ দুই রাকআত কিরাআতের সাথে আর দুই রাকআত কিরাআত বিহীন বরং চার রাকআতের প্রতি রাকআতই কিরাআত সহ হবে। অতএব এ হাদীস দ্বারা নফলের প্রতি রাকআতে কিরাআত ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো।

وَيَصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقَدَرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَوَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَوَةِ الْقَائِمِ وَإِلَّا الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ وَرَبَّمَا يَسْقُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْلًا يَنْقَطِعَ عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَةِ الْقَعْدَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقْعُدَ كَمَا يَقْعُدُ فِي حَالَةِ التَّشْهُدِ لِأَنَّهُ عَهْدٌ مَشْرُوعًا فِي الصَّلَاةِ.

অনুবাদ : দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়তে পারবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, বসা অবস্থার নামাজের ছওয়াব দাঁড়ানো অবস্থার নামাজের অর্ধেক। তাছাড়া নামাজ হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত (যা সব সময় আদায়যোগ্য) অথচ মাঝে মধ্যে দাঁড়ানো তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। তাই কিয়াম (قیام) তরক করা তার জন্য জায়েজ হবে। যাতে নামাজ পড়া হতে (শুধু এ কারণে) তাকে নিবৃত্ত থাকতে না হয়। বসার ধরন সম্পর্কে আলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে পছন্দনীয় (যা ফতোয়া রূপে গৃহীত) মত হচ্ছে— তাশাহহদের অবস্থার ন্যায় বসবে। কেননা এটা নামাজে বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। দলিল রাসূল ﷺ বলেছেন, صَلَوَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَوَةِ الْقَائِمِ অর্থ : বসা অবস্থায় নামাজের ছওয়াব দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজের অর্ধেক। বসে নামাজ পড়া দুই কারণে হতে পারে। ওজরের কারণে বসে পড়া অথবা ওজর ছাড়া বসে পড়া। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হতে পারে না। কেননা ওজরের কারণে বসে পড়া এবং দাঁড়িয়ে পড়া ছওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। অতএব হাদীসের উদ্দেশ্য ওজর ছাড়া বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হলো।

প্রশ্ন : নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজ উদ্দেশ্য না নফল নামাজ?

উত্তর : কারো মতেই এখানে ফরজ নামাজ উদ্দেশ্য নয়, কেননা ওজর ব্যতীত ফরজ নামাজ বসে পড়া আয়েজ নেই। অতএব উক্ত হাদীসে নামাজ দ্বারা নফল নামাজই উদ্দেশ্য। সারকথা, নফল নামাজ ওজর ছাড়া বসে পড়া জায়েজ আছে তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা নামাজের অর্ধেক ছওয়াব হবে। দলিলে আকলী (دلیل عقلی) বা যুক্তিভিত্তিক দলিল, নফল নামাজ ওয়াজিব নয়। যে জিনিস এমন অবস্থায় থাকে তাতে এমন শর্ত আরোপ করা ঠিক হবে না যা তা ছেড়ে দেওয়ার কারণ হয়। কেননা তরকে খায়র (ترك خير) বা কল্যাণকর বস্তু ছেড়ে দেওয়ার সবব (سبب) বা কারণ হওয়া খায়র (خير) বা ভাল হতে পারে না। নফল নামাজে কিয়ামের (قیام) শর্তারোপ করা নফল নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে। কেননা কোনো কোনো সময় মুসল্লীর জন্য দাঁড়ানো কষ্টকর হয়। সুতরাং যদি নফল নামাজে দাঁড়ানোকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয় তবে মাঝে মধ্যে দাঁড়ানো কষ্টকর হওয়ার কারণে নফল নামাজ তরক লায়েম (لازم) আসবে। অথচ নফল নামাজ উত্তম ইবাদত যা সব সময়ে আদায় করা সম্ভব। এ কারণে নফল নামাজে কিয়াম- (قیام)-এর শর্তারোপ করা হয়নি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন— নফল নামাজের বৈঠকের কাইফিয়াত (کیفیت) বা অবস্থার ক্ষেত্রে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, নফল আদায়কারী ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছামত মতো বসে নফল নামাজ পড়তে পারবে। কেননা তার জন্য যখন কিয়াম (قیام) ছাড়া জায়েজ আছে তাহলে তার জন্য বৈঠকের নির্দিষ্ট কাইফিয়াত (کیفیت) ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই জায়েজ হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে হাবওয়া (حبوا) বানিয়ে বসবে অর্থাৎ উভয় হাটু দাড় করে রাখবে এবং উভয় নিতর মাটিতে ঠেকিয়ে দিবে এবং হস্তদ্বয় দিয়ে দুই হাটুতে পেঁচিয়ে ধরবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, আসন পেতে বসবে। ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, তাশাহহদ অবস্থার ন্যায় বসবে। গ্রন্থকারের নিকট এমত-ই অধিক পছন্দনীয়। এটি ফতোয়া রূপে গৃহীত। কেননা এটা নামাজের বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

وَإِنْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ جَازٍ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ  
وَعِنْدَهُمَا لَا يُجْزِيهِ وَهُوَ قِيَاسٌ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْتَبَرٌ بِالنَّذْرِ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْقِيَامَ  
فِيمَا بَقِيَ وَلِمَا بَاشَرَ صَحَّ يَذُونِهِ بِخِلَافِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ التَّزَمَهُ نَصًّا حَتَّى لَوْ لَمْ يَنْصُرْ  
عَلَى الْقِيَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ تَنَقَّلَ عَلَى  
دَابَّةٍ إِلَى آيٍ جَهَةٍ تَوَجَّهَتْ يَوْمَئِذٍ إِيْمَاءً لِحَدِيثِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّعٌ إِلَى  
خَبَرٍ يَوْمَئِذٍ إِيْمَاءً وَلَإِنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْ الزَّمَنَاهُ النَّزُولُ وَالْإِسْتِقْبَالُ  
تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِلَةُ أَوْ يَنْقَطِعُ هُوَ عَنِ النَّافِلَةِ أَمَّا الْفَرَائِضُ مُخْتَصَّةٌ بِوَقْتٍ وَالسُّنَنُ  
الرَّوَائِبُ نَوَافِلٌ وَعَنْ ابْنِ حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَنْزِلُ لِسَنَةِ الْفَجْرِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ سَائِرِهَا  
وَالْتَقْيِدُ بِخَارِجِ الْمِصْرِ يُنْفَرُ اشْتِرَاطُ السَّفَرِ وَالْجَوَازُ فِي الْمِصْرِ وَعَنْ أَبِي يُونُسَ  
أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمِصْرِ أَيْضًا وَوَجَّهَ الظَّاهِرُ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَالْحَاجَةُ إِلَى  
الرُّكُوبِ فِيهِ أَغْلَبَ .

অনুবাদ : যদি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে তারপর ওজর ছাড়া বসে পড়ে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) এর মতে জায়েজ হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। এটা হলো সাধারণ কিয়াস, কেননা আরম্ভ করা মানুষের সাথে তুলনীয়। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর যুক্তি হচ্ছে- অবশিষ্ট নামাজে তো সে কিয়াম গ্রহণ করেনি। আর নামাজের যতটুকু অংশ সে আদায় করেছে কিয়াস ছাড়াই তার বিমুদ্বিত রয়েছে। নয়র বা মানুষের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে স্পষ্ট ভাষায় এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এমনকি যদি কিয়ামের বিষয়টি স্পষ্ট না বলে থাকে তবে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে তার জন্য কিয়াম জরুরি হবে না। যে ব্যক্তি শহরের বাহিরে রয়েছে সে তার সাওয়ারির জঙ্কুর উপর ইশারা করে নফল পড়তে পারবে। সাওয়ারি যেদিকে অভিমুখী হোক। কেননা বর্ণিত আছে যে, হয়রত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ কে আমি খায়বর অভিযুগ্মী হয়ে গাধার পিঠে ইশারা করে নামাজ পড়তে দেখেছি। (মুসলিম শরীফ) তা ছাড়া নফল বিশেষ কোনো ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এমতাবস্থায় যদি আমরা সাওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেই তবে সে হয় নফল ছেড়ে দিবে অথবা কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফরজ নামাজগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত সুন্নত নামাজগুলো নফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণিত, এক রেওয়াযাত মতে ফজরের সুন্নতের জন্য সাওয়ারি হতে নামতে হবে। কেননা এটা অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বাইরে হওয়ার শর্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিয়মিত সফর হওয়া শর্ত নয়। তদ্রূপ শহরের ভিতরে এরূপ আদায় করা জায়েজ হবে না। আব ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত এক মতে শহরেও জায়েজ আছে। জাহিরী রিওয়াযাতের কারণ হচ্ছে- হাদীসটি শহরের বাইরের সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। আর সাওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশি।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে তারপর ওজন ছাড়া বসে পড়ে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে জায়েজ হবে না। প্রথম হুকুমটি ইসতিহাসন তথা সুস্থ কিয়াস ভিত্তিক, আর দ্বিতীয় হুকুমটি সাধারণ কিয়াস ভিত্তিক। সাহেবাইনের দলিল : তারা নফল নামাজকে মানুতের উপর কিয়াস করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার মানুত করে তাহলে তার জন্য বসে পড়া জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আরম্ভ করার জন্য তা বসে পড়া জায়েজ হবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল, পূর্বে গেছে যে, কোনো জিনিস শুরু করার দ্বারা শুরুকৃত জিনিসটি ওয়াজিব হয় এবং যার উপর বিতুদ্ধতা বা সহীহ হওয়া নির্ভরশীল তাও ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়। যেমন প্রথম রাকআতের বিহহাত (صحت) বা বিতুদ্ধতা দ্বিতীয় রাকআতের উপর নির্ভরশীল। অতএব নফল শুরু করার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত ওয়াজিব হবে। প্রথম রাকআত এই জন্য যে, তা আরম্ভ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রাকআত এই জন্য যে, এর উপর প্রথম রাকআতের বিতুদ্ধতা নির্ভরশীল। কেননা এক রাকআত নামাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ। তবে উল্লেখিত মাসআলায় প্রথম রাকআত দাঁড়িয়ে শুরু করলেও এর বিতুদ্ধতা যেহেতু দ্বিতীয় রাকআত দাঁড়িয়ে পড়ার উপর নির্ভরশীল নয়, অতএব প্রথম রাকআত দাঁড়িয়ে পড়া দ্বিতীয় রাকআত দাঁড়িয়ে পড়াকে আবশ্যক করে না।

পক্ষান্তরে মানুতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মানুতের মধ্যে সে স্পষ্টভাবে নিজের উপর কিয়াম (قيام) কে লায়েম (لازم) বা আবশ্যক করে নিয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে পড়লে মানুত পূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ কিয়াম এর বিষয়টি স্পষ্ট না করে বরং শুধু বলেছে আমি নামাজ পড়ব। তাহলে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে তার উপর কিয়াম জরুরি হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْحَضَرِ : শহরের বাইরে সওয়ারির উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ওজর থাক বা না থাক, নামাজ শুরু করার সময় কিবলামুখী হোক বা না হোক। সাওয়ারি যেদিকে অভিমুখী হবে সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়বে। তবে ইমাম ফারসি (র.) নামাজের শুরুতে কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব বলেছেন। অতঃপর সওয়ারি যে দিকে অভিমুখী হবে সে দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে। প্রকাশ থাকে যে, সওয়ারিতে নামাজ ইশারায় আদায় করবে। সিঁজদার জন্য ইশারাটি রুকু'র এর ইশারা থেকে অধিক নিষ্ঠুর হবে।

এসবগুলোর দলিল হযরত ইবনে ওমর (র.)-এর হাদীস, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُتِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مَتَوَّجٌ إِلَى : আমি রাসূল ﷺ-কে গাধার উপর খাঁড়বর মুখী হয়ে ইশারা করে নামাজ আদায় করতে দেখেছি।

আকসী দলিল (على دليل) : যুক্তি ভিত্তিক দলিল) : সওয়ারির উপর নফল পড়া এই জন্য জায়েজ আছে যে, নফল কোনো ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এমনভাবে যদি আমরা মুসল্লীর জন্য সওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া আবশ্যক করে দেই তাহলে দুই অবস্থা। ১। হয়তো সে সওয়ারি হতে নেমে কিবলামুখী হবে ২। অথবা সওয়ারি হতে নামা নেবে না এবং কিবলামুখীও হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় তার থেকে নফল ছুটে যাবে। কেননা সাওয়ারিতে থাকা অবস্থায় নফল পড়তে পারতেন। অথচ নফল শ্রেষ্ঠ ইবাদত, তা থেকে সে বঞ্চিত হলো। এমনভাবে নফল নামাজের নেকি সব সময় হাসিল করা যায়। আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয় অর্থাৎ সওয়ারি থেকে নেমে কিবলামুখী হয়ে নফল নামাজ পড়ে তাহলে সে কাফেলা হতে পিছনে পড়ে যাবে। এই ওজরের কারণে সওয়ারির উপর নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে ফরজ নামাজগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব নির্ধারিত সময়ে সওয়ারি থেকে নেমে কিবলামুখী হওয়ার মধ্যে কোনো জটিলতা বা সংকীর্ণতা নেই। এ কারণে সাওয়ারির উপর ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। তবে হাঁ ওজরের কারণে সওয়ারির উপরে ফরজ পড়া জায়েজ আছে। যেমন চোরের ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় হয় যে, সওয়ারি হতে নেমে ফরজ নামাজ আদায় করলে সওয়ারি এবং এর সমান চোরের নিয়ে যাবে অথবা হিংস্র জন্তু ধ্বংস করে দিবে, অথবা জমিনে এমন কাঁদা অথবা গর্ভ যে এর উপর শিঁজদা করা সম্ভব নয় অথবা সওয়ারিতে আরোহণকারী ব্যক্তি এমন বৃদ্ধ যে একবার সে সওয়ারি থেকে নামলে পুনঃরায় একা উঠতে পারবে না, উক্ত সুরতগুলোতে সওয়ারির উপর ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন اَوْ رُكْبَاتًا أَوْ رُكْبَاتًا অর্থ- যদি তোমরা আশঙ্কা বোধ কর তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা সওয়ারিতে চড়ে নামাজ পড়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে সুন্নতে মুযাক্কাদা নফলের মতো সওয়াযিতে পড়া জায়েজ আছে। তবে বিতর-এর নামাজ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সওয়াযিতে পড়া জায়েজ নেই। কেননা তাঁর মতে বিতরের নামাজ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বিতরের নামাজে সাওয়াযিতে পড়া জায়েজ আছে। কেননা তাদের মতে বিতরের নামাজ সুন্নত। আর সুন্নত নফলের মতো সাওয়াযিতে পড়া জায়েজ আছে।

ইমাম আযম (র.)-এর একটি বর্ণনা হলো- ফজরের সুন্নত সাওয়াযি থেকে নেমে পড়বে। কেননা ফজরের সুন্নত অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য উহার হুকুম অপরাপর সুন্নতের হুকুম থেকে ভিন্ন। ফকিহ ইবনে ওজ্জা বলেন যে, আমার মনে হয় যে এ হুকুম উত্তম, জরুরি নয়।

تَوَكَّلْهُ وَالْغَفِيُّدَ يَتَارِجُ النِّصْرِ الْخ- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- এই শর্তের (শহরের বাইরে) দ্বারা দু'টি জিনিস সাব্যস্ত করা হয়েছে, (এক) সাওয়াযির উপর নফল নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য মুসাফির হওয়া শর্ত নয়; বরং শহরের বাইরে থাকাই যথেষ্ট, চাই সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক।

ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, সওয়াযির উপর নফল জায়েজ হওয়াটা মুসাফিরের সঙ্গে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ৪৮ মাইলের নিয়ত করে শহর থেকে বের হবে তার জন্য সাওয়াযির উপর নামাজ পড়া জায়েজ হবে। দলিল হলো, ইশারার দ্বারা নামাজ জায়েজ হয়েছে জরুরত বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। মুকীম অবস্থায় যেহেতু কোনো জরুরত বা প্রয়োজন নেই তাই মুকীম অবস্থায় নফল নামাজ সওয়াযির উপরে পড়া জায়েজ হবে না। তবে বিত্বদ্রুত হচ্ছে- এ হুকুমে মুসাফির এবং মুকীম সকলের ক্ষেত্রে সমান অর্থাৎ উভয়েই সওয়াযিতে নফল পড়তে পারবে। তবে শর্ত হলো যে, শহরের বাইরে হতে হবে।

প্রশ্ন : শহর থেকে কতটুকু দূরে হতে হবে?

জবাব : এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে- মবসূত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক মাইল দূর হতে হবে। কোনো কোনো ফকীহের মতে যেখান থেকে মুসাফিরের জন্য কসর (قصر) পড়া জায়েজ হয়, সেখান থেকে সাওয়াযিতে নফল পড়া জায়েজ হবে। (দুই) শহরের ভিতরে সাওয়াযির উপর নফল পড়া জায়েজ নেই। কেননা শহরের বাইরে সওয়াযির উপরে নামাজ খিলাফে কিয়াস (خلاف قياس) হাদীসের দ্বারা সাবিত হয়েছে। শহর শহরের বাইরের হুকুমের মধ্যে शामिल নয়। অতএব শহরের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল করা হবে অর্থাৎ সাওয়াযির উপর নফল নামাজ পড়বে না। পক্ষান্তরে শহরের বাইরে খেলাফে কিয়াস হাদীসের উপর আমল করা হবে। অর্থাৎ সাওয়াযির উপর নফল নামাজ পড়বে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, শহরের ভিতরেও বিলা কারাহাত (بلاكرهات) সওয়াযির উপর নফল পড়া জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কারাহাতের (كرهات) সাথে জায়েজ হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ الْجِمَارَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ يَصَلِّي وَهُوَ رَاكِبٌ .

অর্থ- নবীজী ﷺ মদীনায় গাধার উপর আরোহণ করে সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর বীমারদারী (গুশ্চা) করতে গেলেন এবং তখন তিনি সওয়াযিতে নামাজ পড়েছিলেন। এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, শহরে সাওয়াযির উপর নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে। ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন যে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন যে, শহরে সাওয়াযির উপরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তখন ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত হাদীস পেশ করলেন, এ হাদীস শ্রবণ করে তিনি মাথা উচু করেন নি। কোনো কোনো আলিম বলেন যে, মাথা উচু না করার মর্ম হলো যে, তিনি পূর্বের মতো প্রত্যাহার করেছেন এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীসের সামনে মাথা নত করেছেন অর্থাৎ রাসূলের হাদীস মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন। কোনো আলিম বলেছেন রাসূল ﷺ-এর শহরে সাওয়াযির উপরে নফল নামাজ পড়াটা বিরল (ساذ) ঘটনা। আর বিরল (ساذ) ঘটনা শরিয়তের প্রমাণ্য দলিল হয় না। অতএব এ হাদীস ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বিরুদ্ধে দলিল হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলও এই হাদীস। কিন্তু তার নিকট মাকরুহ হওয়ার কারণ হল যে, শহরে ভীড় বেশি থাকে বিধায় কিরাআত ভুল হওয়া থেকে নিরাপদে থাকে না। এ কারণে শহরে সাওয়াযির উপরের নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। যাহিক্রর রিওয়াযেতের কারণ হল যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্ত হাদীস শহরের বাইরের জন্য বর্ণিত হয়েছে। আর সাওয়াযির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশি। অতএব শহরকে বাইরের উপর কিয়াস করা যাবে না।



فَإِنْ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا ثُمَّ نَزَلَ يَنْبَغِي وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَاكِبًا اسْتَقْبَلَ لِأَنَّ  
إِحْرَامَ الرَّاكَبِ اِنْعَقَدَ مُجَوِّزًا لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَدَرِهِ عَلَى النُّزُولِ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا  
صَحَّ وَإِحْرَامُ النَّازِلِ اِنْعَقَدَ لِحُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ مَا لَزِمَهُ مِنْ  
غَيْرِ عُدَّةٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ إِذَا نَزَلَ أَيْضًا وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) إِذَا  
نَزَلَ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً وَالْأَصَحُّ هُوَ الظَّاهِرُ —

অনুবাদ : যদি নফল নামাজ সাওয়ার অবস্থায় শুরু করে তারপর সাওয়ারি থেকে নেমে যায় তাহলে বিনা (بِئَاء) করবে। আর যদি নামা অবস্থায় এক রাকআত পড়ে তারপর আরোহণ করে তাহলে নতুন ভাবে শুরু করবে। কেননা নামতে সক্ষম হওয়ার কারণে আরোহীর তাহরীমা সংগঠিত হয়েছে রুকু সাজদার বৈধতা সহকারে। সুতরাং যখন সে নেমে রুকু সাজদা আদায় করবে তখন তা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে অবতরণ কারীর তাহরীমা রুকু সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংগঠিত হবে। সুতরাং যা তার উপর বাধ্যতা মূলক হয়ে গিয়েছে, তা সে বিনা ওজরে তরক করতে পারবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, সাওয়ারি হতে নামলেও নতুন করে পড়বে। অদ্রুপ ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাকআত পড়ার পর অবতরণ করলে নতুন করে শুরু করবে। তবে উপরোক্ত যাহিরি রিওয়ায়তই হল অধিকতর বিস্তৃত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি সওয়ারিতে ইশারায় নফল নামাজ আরম্ভ করে তারপর সওয়ারি থেকে মাটিতে নেমে যায় তাহলে সে বিনা (بِئَاء) করবে। নতুন করে নামাজ পড়ার দরকার নেই।

দলিলের পূর্বে একটি ভূমিকা উপলব্ধি করা আবশ্যিক। ভূমিকা হলো যে, এক নামাজকে অন্য নামাজের উপর বিনা করা ঐ সময় জায়েজ হয় যখন একই তাহরীমা উভয় নামাজকে শামিল করে। পক্ষান্তরে যদি একই তাহরীমা উভয় নামাজকে শামিল না করে তাহলে বিনা করা জায়েজ হবে না।

মূল দলিল হচ্ছে—সওয়ারির উপর আরোহণ করে যে, তাহরীমা বাধা হয়েছে এতে রুকু সাজদা ইশারায় আদায় না করে রুকু সাজদা সহকারে আদায় করাও জায়েজ আছে। কেননা সে বাতিলকারী না হয়েও সওয়ারি থেকে নেমে রুকু সাজদা করতে সক্ষম। অতএব, সে যে নামাজ সওয়ারিতে ইশারায় পড়েছে এবং যে নামাজ সওয়ারি হতে নেমেও রুকু সাজদার সাথে পড়েছে; উভয়কে একই তাহরীমা শামিল করে বিধায় একটি অপরটির উপর বিনা করা সহীহ হবে। সওয়ারি থেকে নেমে মাটিতে যে তাহরীমা বেধেছে তা রুকু সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ সওয়ারি থেকে নামার কারণে রুকু-সাজদা করা ওয়াজিব হয়েছে। ইশারা ওয়াজিব হয়নি। কেননা বাতিলকারী হওয়া ছাড়া সে সওয়ারীতে আরোহণ করতে সক্ষম হবে না। আর বাতিলকারী হওয়া আমলে কাসীর (عمل كاسير) রূপে গণ্য। অতএব সে যে নামাজ জমিনে রুকু সাজদা সহ পড়েছে। আর যে নামাজ সওয়ারিতে আরোহণ করে ইশারায় পড়েছে, ঐ দুটোকে একই তাহরীমা শামিল করে না, বিধায় দুটোর মধ্য হতে একটির বিনা অপরটির উপর সহীহ হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি সাওয়ারির উপর নফল নামাজ শুরু করে তারপর জমিনে নেমে আসে তাহলে বিনা করবে না। বরং নতুন করে নামাজ পড়বে। দলিল ঐ সূরতে দুর্বলের উপর শক্তিশালী জিনিসের বিনা করা হচ্ছে। কেননা যে নামাজ সওয়ারিতে ইশারায় আদায় করেছে তা দুর্বল। আর যে নামাজ সওয়ারি থেকে নেমে জমিনে রুকু সাজদা করে আদায় করেছে তা শক্তিশালী। শক্তিশালী জিনিসের বিনা দুর্বলের উপর জায়েজ নেই। যেমন যে রুগী ইশারায় নামাজ পড়ে সে যদি নামাজের মাঝে রুকু-সাজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে নতুন করে নামাজ পড়তে হবে। যাতে শক্তিশালী জিনিসের বিনা দুর্বলের উপর না হয়।

জবাব : আমাদের পক্ষ থেকে উত্তরে ঐ ভূমিকা উল্লেখ করা ই যথেষ্ট হবে, যা অধম ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করেছে। সুস্পষ্ট করা হলো যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর কিয়াস ফাসিদ। কেননা যে রুগী রুকু সাজদা করতে অক্ষম, তার তাহরীমা অক্ষমতার কারণে রুকু সিজদাকে শামিল করবে না। অতএব তাহরীমা যাকে শামিল করেনা তার বিনা এ জিনিসের উপর কিভাবে জায়েজ হবে যাকে তাহরীমা শামিল করে। এ কারণে যে রুগী রুকু সাজদা করতে অক্ষম সে যদি নামাজের মাঝে রুকু সাজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে তার বিনা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ সওয়ারিতে নফল নামাজ আরম্ভ করে তারপর সওয়ারি হতে নেমে যায়, তাহলে তার জন্য বিনা সহীহ হবে। কেননা সওয়ারিতে যে তাহরীমা বেঁধেছিল তা রুকু সাজদাকে বৈধ করে। বিধায় এই তাহরীমা ঐ নামাজকে শামিল করে যা সওয়ারিতে পড়েছে এবং ঐ নামাজকেও শামিল করে যা সওয়ারি থেকে নেমে রুকু সাজদা করে আদায় করেছে। মোটকথা তাহরীমা উভয়কে শামিল করার কারণে একটির বিনা অপরটি উপর সহীহ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সওয়ারিতে এক রাকআত পূর্ণ করে নেমে আসে তাহলে নতুনভাবে পড়বে বিনা করবে না। কেননা এক রাকআতও নামাজ। অতএব এ ক্ষেত্রে শক্তিশালীকে দুর্বলের উপর বিনা করবে না। পক্ষান্তরে যদি এক রাকআত পূর্ণ না করে সওয়ারি থেকে নেমে আসে তাহলে বিনা করতে পারবে। কেননা এক রাকআতপূর্ণ হওয়ার পূর্বে শুধু তাহরীমা পাওয়া গিয়েছে। তাহরীমা নামাজের শর্ত। যে শর্ত দুর্বলের জন্য সংঘটিত হয়েছে তা শক্তিশালীর জন্যও শর্ত হবে। যেমন যে অজু নফলের জন্য করা হয়েছে তা ফরজের জন্যও যথেষ্ট। অতএব এক রাকআতে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নেমে আসলে বিনা করতে পারবে। এতে শক্তিশালীর বিনা দুর্বলের উপর হচ্ছে না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, মতনে উল্লেখিত প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ এবং এটিই যাহিরুর রিওয়াযাত।



বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় যে, হিদায়া গ্রন্থের ইবারতে খুলাফা (خلفاء) শব্দটি অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এখানে খুলাফা দ্বারা ওমর (রা.), ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.) তিন খলীফা উদ্দেশ্য। কেননা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাআতের সাথে বিশ রাকআত তারাবীহ এর সূচনা হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছে। এর পূর্বে লোকেরা একাকীভাবে তারাবীহ পড়তেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, **إِنِّي أَرَى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى** আমি লোকদেরকে এক ইমামের পিছনে সমবেত করা সমীচীন মনে করলাম, অতঃপর ওমর (রা.) তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) তাঁদের পাঁচ তারাবীহায় বিশ রাকআত নামাজ পড়ালেন।

**প্রশ্ন :** যদি তারাবীহ-এর নামাজ সুন্নতে মুযাক্কাদা হয় তাহলে রাসূল ﷺ তা নিয়মিত পড়লেন না কেন।

**উত্তর :** হিদায়া গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইশারা করেছেন। রাসূল ﷺ নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, আমি নিয়মিত আদায় করলে উম্মতের উপর ফরজ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই জন্যে নিয়মিত আদায় করিনি। কখনো কখনো ছেড়ে দিয়েছি। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

**إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ لَيْلِ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَشْرِينَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجَ وَصَلَّى بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةَ كَثُرَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ عَرَفْتُ إِجْمَاعَكُمْ لَيْسَ خِيَّتِي أَنْ تَكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَكَانَ النَّاسُ يَصُلُّونَهَا فَرَأَى إِلَى زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.**

**অর্থ :** রাসূল ﷺ রমজানের কোনো এক রাতে তাশরীফ আনলেন এবং লোকদেরকে বিশ রাকআত নামাজ পড়ালেন। যখন দ্বিতীয় রাত আসল তখন লোকেরা একত্রিত হলেন, রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ালেন। যখন তৃতীয় রাত আসল তখন অনেক লোক একত্রিত হলেন। রাসূল ﷺ তাশরীফ আনলেন না। বললেন যে, আমি তোমাদের সমবেত হওয়ার কথা জেনেছি। তবে আমার আশঙ্কা হয় এই নামাজ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাওয়ার (এজন্য বের হইনি)। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের আগ পর্যন্ত লোকেরা একাকী তারাবীহ পড়তেন।

**প্রশ্ন :** তারাবীহ-এর নামাজ সুন্নতে মুযাক্কাদা। তাহলে ইমাম কুদূরী একে মুস্তাহাব কেন বললেন?

**উত্তর :** পূর্ববর্তী মাশায়িখে কিরাম (مشايخ متقدمين) মোস্তাহাব শব্দকে অতি উত্তম বা বেশি ভাল এর জন্য ব্যবহার করেছেন যে, “বেশি ভাল” শব্দটি ওয়াজিবকেও শামিল করে। (অর্থাৎ সুন্নতকে তো শামিল করেই) হতে পারে যে মোস্তাহাব শব্দটি এখানে এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ তারাবীহ-এর জন্য সমবেত হওয়া বেশি ভাল ও বড় মর্যাদাপূর্ণ জিনিস এবং তা সুন্নত। দ্বিতীয় উত্তর : ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) লোকদের সমবেত হওয়াকে মোস্তাহাব বলেছেন, তারাবীহ-এর নামাজকে মোস্তাহাব বলেন নি। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উত্তরের সারকথা হলো পবিত্র রমজানে ইশার নামাজের পর লোকদের সমবেত হওয়া মোস্তাহাব তবে তারাবীহ এর নামাজ সুন্নত।

**তৃতীয় উত্তর :** কোনো কোনো সহীহ রিওয়াযাত দ্বারা সাবিত হয় যে, রাসূল ﷺ বিতরসহ তারাবীহ বিশ রাকআত পড়েছেন। আবার কোনো কোনো রিওয়াযাত দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকআত সাবিত হয়। এগার রাকআত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র.)-এর হাদীস দ্বারা সাবিত হয়। যার শব্দ নিম্নরূপ,

**سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا يَنْقُصُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ - (فتح القدير)**

**অর্থ :** আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র.) বলেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রমজানে রাসূল ﷺ-এর নামাজ কিরূপ ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি রমজান ও রমজানের বাইরে এগার রাকআতের অধিক নামাজ পড়েন নি। (তন্মধ্যে আট রাকআত তারাবীহ। তিন রাকআত বিতর।) এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রিওয়াযাত দ্বারা তারাবীহ বিশ রাকআত সাবিত হয় যেমন- ইরশাদ হয়েছে, **إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً يَوْمَ** (فتح القدير)

**অর্থ :** রাসূল ﷺ রমজানে বিশ রাকআত পড়তেন বিতর বাতীত। (ফতহুল কাদীর) কোনো কোনো আলিম উক্ত হাদীস দ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন। আট রাকআত তারাবীহ সুন্নত, বিতর বাতীত। আর বিশ রাকআত তারাবীহ মোস্তাহাব। হতে পারে যে কুদূরী গ্রন্থকার উক্ত মতের ভিত্তিতে তারাবীহ-এর নামাজকে মোস্তাহাব বলেছেন।

وَالسُّنَّةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ لَكِنَّ عَلَى وَجْهِ الْكِفَايَةِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ عَنْ إِقَامَتِهَا كَانُوا مُسَيِّئِينَ وَلَوْ أَقَامَهَا الْبَعْضُ فَالْمُخْلِفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ تَارِكٌ لِلْفَضِيلَةِ لِأَنَّ أَفْرَادَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ عَنْهُمْ التَّخَلُّفَ وَالْمُسْتَحْبَبُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارُ التَّرْوِيحَةِ وَكَذَا بَيْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوَتْرِ لِعَادَةِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الْإِسْتِرَاحَةَ عَلَى خَمْسٍ تَسْلِيْمَاتٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُؤْتِرُ بِهِمْ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ وَقْتُهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْوَتْرِ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَائِخِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَقْتُهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْوَتْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا تَوَافُلُ لَيْسَتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْفِرَاءِ وَكَأَكْثَرَ الْمَشَائِخِ (رح) عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْخَتَمُ مَرَّةً فَلَا يَتْرَكَ لِكَسَلِ الْقَوْمِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّشَهُدِ مِنَ الدَّعَوَاتِ حَيْثُ يَتْرَكُهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَلَا يُصَلِّي الْوَتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

অনুবাদ : তারাবীহ-এর নামাজ জামাআতে পড়া সুন্নত। তবে তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া সুতরাং কোনো মসজিদের মুসল্লীরা যদি তারাবীর জামাআত কায়েম করা হতে বিরত থাকে, তাহলে সকলে গুনাহগার হবে। আর যদি কিছু সংখ্যক লোক তা কায়েম করে, তাহলে অন্যরা শুধু জামাআতের ফজিলত হতে বঞ্চিত হবে। কেননা কিছু সংখ্যক সাহাবী তারাবীর জামাআতে হাজির হননি বলেও বর্ণিত আছে। দুই তারবীহার মধ্যে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসা মোস্তাহাব। তদ্পর পঞ্চম তারাবিহা ও বিতরের মাঝেও (ঐ পরিমাণ বসা মোস্তাহাব)। কেননা হারামাইনের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ চলে আসছে। আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের পর বিশ্রাম নেওয়া উত্তম বলেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইমাম কুদুরী (র.)-এর উক্তি "অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন"। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তারাবীহ-এর সময় হলো ইশার নামাজের পর বিতরের আগে। আর অধিকাংশ মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, তারাবীর সময় হলো ইশার পর হতে শেষ রাত পর্যন্ত। এটা বিতরের পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। কেননা তারাবীহ হলো নফল বিশেষ, যা ইশার পরে আদায় করার জন্য সুন্নত হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে। ইমাম কুদুরী (র.) কিরাতের পরিমাণ উল্লেখ করেননি, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে সুন্নত হলো তারাবীহের নামাজে কুরআন খতম করা। সুতরাং মুসল্লীদের অলসতার কারণে তা বাদ দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তাশাহুদদের পরে দু'আগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। কেননা এগুলো সুন্নত নয়। রমজান ছাড়া অন্য কোনো সময় জামাআতের সাথে বিতর পড়বে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। (আল্লাহই উত্তম জানেন)

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, অধিকাংশ মাশায়েখে কিরামের মতে তারাবীর জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। অতএব যদি কোনো মসজিদের অধিবাসীরা তারাবীর জামাআত তরক করে, তাহলে সকলে গুনাহগার হবে। তবে যদি কিছু সংখ্যক লোক তা কায়েম করে এবং অন্যরা তা তরক করে, তাহলে জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা ফজিলত তরককারী হবে।

দলিল হলো যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.)-এর তারাবীর জামাআতে শরিক না হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একাকী তারাবীর নামাজ পড়েছেন। ইমাম তাহাবী (র.) ইবনে ওমর (রা.) এবং ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো আলিম তারাবীর জামাআতকে সুনুতে আইন অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য সুনুত বলেছেন। অতএব তাঁদের মতে যদি কেউ একাকী তারাবীর নামাজ আদায় করে তাহলে সুনুত তরকের কারণে গুনাহ্গার হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে, যদি সুনুত কিরাতে রিয়ায়েত (رعاية) করে বাড়িতে তারাবীহ পড়া সম্ভব হয়, তাহলে একাকী তারাবীহ পড়া জায়েজ হবে বাড়িতে। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি প্রখ্যাত প্রবীণ ফকিহ হয় এবং সাধারণ জনমানুষ তার আমলের অনুসরণ করে থাকে তাহলে বাড়িতে তারাবীর নামাজ আদায় করা সমীচীন হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল,

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ وَفِي سُبُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ لِّلرَّافِي بَيْنَهُمَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ .

অর্থঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই গৃহে (নফল) নামাজ পড়। কেননা মানুষের গৃহের নামাজই শ্রেষ্ঠ নামাজ ফরজ ব্যতীত। উক্ত দলিলকে ওলামায়ে আহনাফ এ ভাবে খন্ডন করেছেন যে, রমজানের তারাবীর নামাজ উক্ত হুকুমের ব্যতিক্রম। কেননা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ মসজিদে এসে তারাবীর নামাজ পড়েছেন আর যখন মসজিদে আসেননি তখন তিনি পরবর্তিতে না আসার কারণ বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলও তদ্রূপ ছিল যে, তারা তারাবীর নামাজ জামাআতের সাথে মসজিদে পড়েছেন। এ কারণে ওজর ব্যতীত তারাবীর জামাআত তরক করার অনুমতি নেই।

قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْجُلُوسِ : এই ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুই তারবীহের মধ্যে এবং পঞ্চম তারবীহা বিতরের মাঝে বসা মোস্তাহাব। দলিল হলো মক্কা ও মদীনাবাসীদের অভ্যাস তথা আমল এমনই ছিল। মক্কার অধিবাসীরা দুই তারবীহের মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। পক্ষান্তরে মদীনার অধিবাসীরা তার পরিবর্তে চার রাক'আত নফল নামাজ পড়তেন।

ভবে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের ইচ্ছিত্যার আছে যে, দুই তারবীহের মাঝে তাসবীহ পড়বে অথবা কলেমা তায়োবা পাঠ করবে অথবা নিরবে অপেক্ষা করবে। ফত্বুলকাদীর এর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এবং ইনায়া গ্রন্থকার লিগেছেন যে, প্রতি দুই তারবীহের মাঝে নিরবে বসে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। কেননা তারাবীহ (تراويح) এবং তারবীহা (تراويح) রাহাত (راحت) আরাম হতে নির্গত। অতএব এমন কাজ করবে ফাতে আরাম হাসিল হয়। বলা বাহুল্য যে নিরবে থাকার মাঝেই আরাম। অতএব নিরবে বসে অপেক্ষা করা উত্তম ও মোস্তাহাব হবে।

আশরাফুল হিদায়ার লেখক বলেন যে, উক্ত বক্তব্যে অধমের আপত্তি আছে। তা হলো নিঃসন্দেহে তারাবীহ (تراويح) রাহাত (راحت) হতে নির্গত। কিন্তু পার্থিব আরামই শুধু উদ্দেশ্য, এমন নয়; বরং অনেক সময় পারলৌকিক আরামও উদ্দেশ্য হয়। বলা বাহুল্য যে, পারলৌকিক আরাম নিরবে বসে থাকার মাঝে নেই; বরং নেক আমলের মাঝে নিহিত রয়েছে। অতএব ঐ সময়ে তাসবীহ পাঠ করবে, অথবা কলেমা তায়োবা পড়বে, অথবা নফল পড়বে। আল্লাহই ভাল জানেন (জামিল আহমদ)

আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের (অর্ধেক তারাবীহ) পর বিশ্রাম নেওয়া উত্তম বলেছেন। কিন্তু ইহা সঠিক নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হিদায়া গ্রন্থকারের এই ইবারত *وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْجُلُوسِ*-এর মধ্যে তাসামুহ (تسامح) অর্থাৎ ভুল আছে - কেননা উক্ত ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, দুই তারবীহের মাঝে বসা মুস্তাহাব। এর দলিল হিসাবে পেশ করেছেন হারামহিনের অধিবাসীদের অভ্যাস। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার অধিবাসীরা (দুই তারবীহের মাঝে) তাওয়াফ করতেন। আর মদীনার অধিবাসীরা নফল নামাজ পড়তেন।

বুঝা গেলে যে দুই তারবীহের মাঝে বসে থাকা তাঁদের অভ্যাস ছিল না; বরং অপেক্ষা করা তাঁদের অভ্যাস ছিল। তা বসে হোক বা না বসে হোক। এজন্য এরূপ বলা সমীচীন ছিল *وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْإِنْتِظَارِ بَيْنَ التَّرَاوِيحَيْنِ مِمَّا دَارَ التَّرَوِيحَ* (ইনায়া, ফত্বুল কাদীর, কিফায়া) অর্থ দুই তারবীহের মাঝে এক তারবীহা পরিমাণ অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। — (ইনায়া, ফত্বুল কাদীর, কিফায়া)

قَوْلُهُ ثُمَّ يَزِيدُ بِهِمُ : এই ইবারতে তারাবীহের নামাজের সময় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারাবীহের সময় ইশার পর বিতরের আগে। আর অধিকাংশ ফকীহদের মত এরূপই। পক্ষান্তরে যদি কেউ ইশার আগে এবং বিতরের পরে তারাবীহের নামাজ পড়ে তাহলে তারাবীহের নামাজ সহীহ হবে না কেননা তারাবীর ইলুম সাহাবাদের কর্মের দ্বারা হাসিল

হয়েছে। অতএব সাহাবারা যে সময় তারাবীহের নামাজ পড়েছেন, ঐ সময়ই তারাবীহের সময় হিসেবে গণ্য হবে। তবে একথা স্বীকৃত যে, সাহাবারা ইশার পর এবং বিতরের পূর্বে তারাবীহ পড়েছেন। সুতরাং তারাবীহের জন্য এটিই অনুমোদিত সময় হবে। বলবের মাশায়েখদের মত হলো যে, পূর্ণরাত সুবহি সাদিক পর্যন্ত তারাবীহের সময়, ইশার আগেও ইশার পরেও। কেননা তারাবীহ নামাজের নাম হলো “কিয়ামুল লাইল” (قيام الليل) বা রাতের নামাজ সুতরাং এর সময় (পূর্ণ) রাত হবে।

তবে বিতুদ্ধতম মত হলো তারাবীহ নামাজের সময় ইশার পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত। বিতরের আগেও (বিতরের) পরেও। কেননা তারাবীহ নফল, যা ইশার পরে পড়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব তারাবীহ নামাজ ইশার নামাজের তাবৈ (تابع) বা অনুগামী। আর সাধারণ নিয়ম হলো, তাবৈ (تابع) মতবু (متبوع) বা পূর্বগামীর পর হয়। অতএব তারাবীহ নামাজ ইশার পরে হবে, পূর্বে হবে না।

তারাবীহ নামাজ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন রাতের অর্ধেকাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি অর্ধেক রাতের পর তারাবীহ পড়ে তাহলে কারো কারো মতে মাকরুহ হবে। কেননা তারাবীহ ইশার নামাজের তাবৈ (تابع) আর ইশা অর্ধেক রাতের পর মাকরুহ, সুতরাং অর্ধেক রাতের পর তারাবীহ ও মাকরুহ হবে।

তবে বিতুদ্ধতম মত হলো যে অর্ধেক রাতের পর তারাবীহ মাকরুহ নয়। কেননা তারাবীহ হলো রাতের নামাজ। আর রাতের নামাজ শেষ রাতে উত্তম। সুতরাং তারাবীহ নামাজ শেষ রাতে পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম মাকরুহ নয়।

وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْفَرَسِ وَالْخ: হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, মাতিন (ماتن) এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বর্ণনা করেননি যে, তারাবীহ বিশ রাকআত নামাজে কি পরিমাণ কুরআন পড়তে হবে? তবে এ সম্পর্কে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তারাবীহ প্রতি দুই রাক'আতে মাগরিবের দুই রাক'আতের সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। কেননা তারাবীহ নামাজ নফল। আর নফল ফরজের তুলনায় হালকা হয়। অতএব তারাবীহের কিরাআতের পরিমাণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ছোট কিরাআত ওয়ালা ফরজ অর্থাৎ মাগরিবের উপর কিয়াস করা হবে। কিন্তু এ অতিমতটি বিতুদ্ধ নয়। কেননা পূর্ণ মাসে এ পরিমাণ কিরাআত পড়ার দ্বারা তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন খতম হবে না। অথচ তারাবীহতে এক বার কুরআন খতম করা সুন্নত। কেউ কেউ বলেছেন, তারাবীহ প্রতি দুই রাক'আতে ইশার সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। কেননা তারাবীহ ইশার তাবৈ (تابع)। হাদেন ইবনে হিযাদ (র.) ইমাম আযিম (র.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন, প্রতি রাক'আতে দশ আয়াত সমপরিমাণ কিরাআত পড়বে। এটাই হলো বিতুদ্ধতম অতিমত। কেননা এতে মানুষের জন্য সহজ হবে এবং পূর্ণ কুরআন খতম করার সুন্নতও আদায় হবে। গ্রিষ রাতে তারাবীহ ছয় শত রাক'আত নামাজ হয়। আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজারের কিছু বেশি। অতএব যখন প্রতি রাক'আতে দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে তাহলে এক মাসের তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন খতম হয়ে যাবে এবং এটাই সুন্নত। হিদায়া গ্রন্থকারের মত হলো, তারাবীহতে একবার কুরআন খতম করা সুন্নত। এমনকি অলসতার কারণেও সুন্নত ভরক করা যাবে না। কিফায়া নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, দুই বার কুরআন খতম করা উত্তম। আর মুজতাহিদীনে উম্মতগণ তো এক দশকের মধ্যে এক খতম করতেন।

ইমামুল হুদাম কুদওয়াতুল আনাম ইমামে রাব্বানী আবু হানীফা (র.) রমজান মাসে একষষ্ঠি বার কুরআন খতম করতেন। গ্রিষ খতম রমজানের রাতে, গ্রিষ খতম রমজানের দিনে এবং তারাবীহতে এক খতম, মোট একষষ্ঠি খতম। (ফাতাওয়ায়ে কাশীখান) হে আত্মাহ! তুমি স্বীয় মকবুল বান্দার সমাধি নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমি পাপিষ্টের তনাইও ক্ষমা করে দাও। (আমিন)

পক্ষান্তরে তাশাহুদদের পরবর্তী দোয়ার বিধান হলো যে, যদি আভতাহিয়াতুল (الاحتياطات)-এর পরের দোয়াসমূহ পড়া মুক্তাদীর জন্য কঠিন হয়, তাহলে তা ভরক করলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তা সুন্নত নয়। তবে আভতাহিয়াতুল পর দরুদ শরীফ পড়া উচিত। তা ভরক করবে না। কেননা দরুদ পরা ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে ফরজ। সাবধানতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মতেও তা পড়বে।

رَمَزَانُ هَذَا: রমজান ছাড়া অন্যান্য মাসে বিতরের নামাজ জামাআত সাথে অনুমোদিত নয়। কেননা বিতর একদিক থেকে নফল। আর রমজান ছাড়া নফল জামাআতসহ পড়া মাকরুহ। তবে পবিত্র রমজানে বিতর জামাআতে পড়া মাকরুহ নয়। কিন্তু উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। আব্দাম্মা ইবনে হুদাম (র.) বলেছেন, যে রমজান মাসে বিতর জামাআতে পড়া উত্তম। কেননা ওমর (রা.) বিতর জামাআতের সহিত পড়তেন। আবু আলী নাসাফী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের আলিমদের নিকট বিতর জামাআতের সাথে না পড়া উত্তম। কেননা হযরত উবাই ইবনে কাআব (রা.) বিতর জামাআতের সাথে পড়তেন না। (আব্দাহই উত্তম জানেন)

## بَابُ إِذْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَمَتْ بِصَلَاةٍ أُخْرَى صَبَّأَتْهُ لِمَوْلَايَ عَنِ الْبُطْلَانِ  
ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ إِخْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَنْ لَمْ يَقْبِدِ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطَعُ  
وَيُسْرِعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ بِمَحَلِّ الرَّفْضِ وَالْقَطْعُ لِلْإِكْمَالِ بِخِلَافِ مَا إِذَا  
كَانَ فِي النَّفْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِكْمَالِ وَلَوْ كَانَ فِي السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ فَأَقْبَمَ أَوْ  
خُطِبَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَدْ قِيلَ بَيْنَهُمَا .

### পরিচ্ছেদ : জামাআত পাওয়া বা তাতে शामिल হওয়ার মাসাইল

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি এক রাক'আত পড়ল, তারপর ইকামাত হলো, তাহলে সে আরেক রাক'আত পড়ে নেবে, আদায়কৃত অংশকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। এরপর লোকদের সাথে (জামাআতে) शामिल হবে, জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য। আর যদি প্রথম রাক'আতে সেজদা না দিয়ে থাকে তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে নামাজ শুরু করবে। এটাই বিতুদ্ধতম মত। কেননা সে ছেড়ে দেওয়ার স্থানে রয়েছে। আর আমল ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করা। তবে নফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন রূপ। কেননা তা ভঙ্গ করা পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য নয়। আর যদি যুহর বা জুম'আর পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজে রত থাকে, আর এমতাবস্থায় ইকামত বা খুত্বা শুরু হয়; তাহলে (জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য) দুই রাক'আতের মাথায় নামাজ শেষ করে দিবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত। কারো কারো মতে চার রাক'আত পূর্ণ করবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থ কথ্য : পূর্বের অধ্যায়গুলোতে ফরজ, ওয়াজিব এবং নফলের আলোচনা করা হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে নামাজ পূর্ণভাবে আদায় অর্থাৎ জামাআতের সাথে আদায় করার আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি একাকী যুহরের নামাজ শুরু করে এক রাক'আত পূর্ণ করেছে অর্থাৎ সেজদাও করেছে। তারপর যদি ইমাম জামাআতে নামাজ শুরু করে। তাহলে সে আর এক রাক'আত পড়ে দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাবে। তবে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে না। উক্ত বিধানের দলিল হলো, যদি এক রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরায়ে তাহলে এ রাক'আত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা হাদীসে, صَلَّى سَلَامًا تَهَاكَ عِنْدَ اللَّهِ তথা এক রাক'আত নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আদায়কৃত রাক'আতকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় রাক'আত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরানোর পর এই ব্যক্তি ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে যাতে জামাআতের ফজিলত হাসিল করতে পারে। আর এ হুকুমটি এমন যেমন কোনো ব্যক্তি জুমার দিন জামে মসজিদে যুহরের নামাজ শুরু করল এবং এক রাক'আত পূর্ণ করল। অতঃপর জুমার নামাজ শুরু করা হলো। তাহলে এ ব্যক্তি এক রাক'আতের সাথে আরো এক রাক'আত দিলাবে। অতঃপর দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাবে এবং জুমার ফজিলত হাসিল করার নিমিত্তে জুমার নামাজে শরিক হবে। তবে এখানে ইমামা গ্রন্থকার একটি প্রশ্ন উত্তরসহ উত্থাপন করেছেন।



প্রশ্ন : যুহরের নামাজ হলো ফরজ। অপর দিকে জামাআতে শরিক হওয়া সুন্নত। অতএব একাকী যুহরের নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি সুন্নত আদায় করার জন্য ফরজ কিভাবে বাতিল করবে?

উত্তর : যুহরের যে ফরজ একাকী শুকু করা হয়েছিল, তা সুন্নত আদায় করার জন্য ভেসে দেওয়া হয়নি; বরং ফরজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য ভেসে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য যে ڪمال বা পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য ভেসে দেওয়াও ইকমাল (اکمال) বা পূর্ণাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য ভেসে দেওয়া ছওয়াবের কাজ। আজাবের কারণ নয়। প্রকাশ্য থাকে যে, জামাআতের সাথে নামাজে একাকী নামাজ পড়ার তুলনায় সাতাশ গুণবেশি ছওয়াব।

কুদূরী গ্রন্থকার দ্বিতীয় সূরত বর্ণনা করেছেন, যদি সে ব্যক্তি প্রথম রাক'আতের সিজদা না করে, এমতাবস্থায় জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে নামাজ ভেসে ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে। আর এটিই হলো বিতর্ক মত এবং ফখরুল ইসলাম বখদুরীর মতও এটিই। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ (দ্বিতীয়) সূরতেও দু'রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে এবং শামসুল আইশ্বা সারাখসী (র.)-এর মতও এটিই। শামসুল আইশ্বা সারাখসী (র.)-এর দলিল প্রথম রাক'আতের সিজদা করার পূর্বে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও সে নামাজে রত; কিন্তু পক্ষান্তরে তা কুরবত ও ইবাদত। আর জামাআত হলো সুন্নত মাত্র, আর সুন্নতের রিয়াযত করে ইবাদত বাতিল করা কিভাবে জায়েজ হবে? যেমন কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ আরম্ভ করল এবং প্রথম রাক'আতের সিজদা করেনি, এমতাবস্থায় ফরজ নামাজের জামাআত শুরু হলো। তাহলে নফল পড়লেওলা ব্যক্তি নফল নামাজ ছেড়ে দিবে না; বরং দুই রাক'আত পূর্ণ করে ইমামের সাথে জামাআতে শরিক হবে। অতএব যেহেতু প্রথম রাক'আতের সিজদা না করার সূরতে নফল নামাজ ভেসে দেওয়া হয় না, তাহলে ফরজ তো কোনো ক্রমেই ভেসে দেওয়া যাবে না।

তবে বিতর্কমত মতের দলিল হলো প্রথম রাক'আতের সিজদা দেওয়ার পূর্বে তা ভেসে দেওয়া জায়েজ হওয়াটা তার নযীর হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি চতুর্থ রাক'আতের মাথায় না বসে পঞ্চম রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়, তাহলে পঞ্চম রাক'আতের সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত সেটা (পঞ্চম রাক'আত) ভেসে দিতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চম রাক'আতের সিজদা করার পূর্বেই সে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে আসতে পারে। তার উপর ৬ষ্ঠ রাক'আত মিলানো জরুরি নয়। তবে তার উপর ফরজকে বাতিল করার যে اشكال লাজেম আসছে।

সে ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এখানে ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে আদায় করা يُخْلِي مَا إِذَا كَانَ فِي التَّغْلِي - এর দ্বারা শামসুল আইশ্বাসারাখসী (র.)-এর নফলের উপর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো যে, যুহরের ফরজকে ভেসে জামাআতে শরিক হওয়া ফরজ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার জন্য অর্থাৎ জামাআতের ফজিলত আদায় করার জন্য। পক্ষান্তরে নফলকে ভেসে দেওয়া পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করার জন্য হয় না। সুতরাং এই পার্থক্যের কারণে ফরজকে নফলের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না।

আর যদি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত নামাজ শুরু করা অবস্থায় যুহরের জামাআত আরম্ভ হয়। অথবা জুমার পূর্বে সুন্নতের নিয়ত করা অবস্থায় ইমাম জুমার খুঁবা আরম্ভ করে, তাহলে উক্ত সূরতদ্বয়ের হুকুম হলো দুই রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। অতঃপর যুহরের জামাআতে এবং খুঁবায় শরিক হবে। আর এ হুকুম ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, চার রাক'আত পূর্ণ করে যুহরের জামাআতে এবং খুঁবায় শরিক হবে। কেননা যুহরের এবং জুমার চার রাক'আত একই নামাজ হিসেবে গণ্য বিধায় তাকে দুভাগে বিভক্ত করবে না; বরং চার রাক'আত এক সাথে পড়বে।

মুগশেষ্ঠ ফকীহ সুগদী (র.) বলেন যে, আমি এরূপ ফতোয়া দিতাম যে, যুহরের পূর্বে চার রাক'আতের নিয়ত করা অবস্থায় জামাআত শুরু হলে চার রাক'আত সুন্নত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। পক্ষান্তরে নফল নামাজে দুই রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাবে। কিন্তু যখন আমি নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম আযম (র.)-এর এ রিওয়ায়াত দেখলাম যে, "জুমার সুন্নত শুরু করার পর যদি ইমাম সাথে খুঁবার জন্য বের হয় এমতাবস্থায় যদি এক রাক'আত পূর্ণ হয়, তাহলে দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে"। তখন আমি স্বীয় ফতোয়া প্রত্যাহার করলাম এবং ইমাম আযম (র.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুসারী হয়ে গেলাম।

অনুবাদ : আর যদি যুহরের তিন রাক'আত পড়ে থাকে তবে তা পূর্ণ করে নিবে। কেননা لَاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আর ইচ্ছা করলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়ার জন্য তাকবীরও বলতে পারবে। কেননা এ দ্বারা জামআতের ফজিলত হাসিল করার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হওয়া বুঝায়- যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: **وَسَارِعَا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَ** তোমরা তোমাদের প্রতিপালক কর্তৃক ক্ষমার প্রতি দ্রুত ধাবিত হও।

তবে তাক্বীর বলার সময় তার ইখতিয়ার আছে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে পারে, নাও উঠাতে পারে মতনে উল্লেখ রয়েছে যে, একাকী তিন রাক'আত পড়ার পর জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে, সে জোহরের চার রাক'আত পূর্ণ করবে। অতঃপর মুক্তাদীদের সাথে জামাআতে शामिल হবে। তবে জামাআতে शामिल হওয়া জরুরি নয়। কেননা জামাআতের নামাজ তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর পূর্বে একাকী আদায়কৃত নামাজ যুহরের ফরজ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব জামাআতে আদায়কৃত নামাজকেও যদি ফরজ ধরা হয় তাহলে এক ওয়াক্কে একই ফরজ দুই বার আদায় করা লাজেম আসবে। অথচ এক ওয়াক্কে ফরজের পুনরাবৃত্তি অনুমোদিত নয়; বরং এক ওয়াক্কে একটি ফরজ অনুমোদিত। নফল নামাজ যেহেতু জরুরি বা ওয়াজিব নয়। তাই জামাআতে शामिल হওয়া জরুরি নয়। তবে জামাআতে शामिल হয়ে নফল পড়া উত্তম। কেননা মুক্তাদীদের সাথে শরিক হওয়ার দ্বারা জামাআত হতে বিমুখ হওয়ার অপবাদ দূর হবে। অন্যথায় অথবা জামাআত হতে বিমুখ হওয়ার দোষারোপ করা হবে।

প্রশ্ন : কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রমজান ব্যতীত অন্য মাসে জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরুহ অথচ উক্ত আলোচ্য মাস্আলায় জামাআতে নফল পড়া লাজেম আসছে, তার কারণ কি?

উত্তর : মাকরুহ ঐ সময় হবে যখন ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় নফল পড়বে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম ফরজ এবং মুক্তাদী নফল পড়ে, তাহলে মাকরুহ হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَعَ مِنَ الظُّهْرِ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فِي أُخْرَيَاتِ الصُّفُوفِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ فَقَالَ عَلَىٰ يَهْمَا فَايِّرِي يَهْمَا وَتَرَاتِيْهُمَا تَزْعُدُ فَقَالَ عَلَىٰ رِسْلِكُمَا فَايِّرِي ابْنَ أُمِّرَةَ كَأَنَّ تَأْكُلُ الْقِدِيرَ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمَا لَمْ تُصَلِّا مَعَنَا فَقَالَ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ اتَّبَعْنَا صَلَاةَ قَوْمٍ فَصَلَّيَا مَعَهُمْ وَاجْعَلَا صَلَاتِكُمَا مَعَهُمْ سُبْحَةً أَوْ نَافِلَةً . (عنايه، كفايه)

অর্থ : একদা রাসূল ﷺ যুহরের নামাজ হতে ফারিগ হলেন তখন সর্বশেষ কাতারে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা রাসূল ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েননি। রাসূল ﷺ বললেন, তাঁদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো, তাঁদেরকে রাসূল ﷺ-এর নিকট আনা হলো। ভয়ে তাদের স্বন্দ থরথর করে কাঁপতে ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন, তোমরা শান্ত হও! (ভয় করো না) আমি এমন মহিলার ছেলে, যিনি শুকনা গোশত খেতেন অর্থাৎ আমি গরিব পরিবারের সন্তান। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা আমাদের সাথে নামাজ পড়নি কেন? তারা উত্তর দিলেন যে, আমরা আমাদের বাড়িতে নামাজ পড়েছি। তখন রাসূল ﷺ তাঁদেরকে সযোধান করে বললেন, যদি তোমরা নিজ বাড়িতে নামাজ পড়। অতঃপর কোনো দলের বা জামাআতের নামাজের সময়ে উপস্থিত হয়ে যাও। তাহলে তাঁদের সাথেও নামাজ পড়তে। আর তাঁদের সাথে যে নামাজ আদায় করা হবে, তা নফল হিসাবে গণ্য করবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি ইমাম ফরজ আদায় করে আর মুক্তাদী নফল পড়ে, তাহলে তা মাকরুহ হবে না।

فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا  
 أُخْرَى تَفَوُّتُهُ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَهَا بِالسَّجْدَةِ وَبَعْدَ  
 الْإِنْتِمَاءِ لَا يَشْرَعُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ لِكِرَاهِيَةِ النَّفْلِ بَعْدَهُ وَكَذَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ  
 الرِّوَايَةِ لِأَنَّ التَّنْفَلَ بِالثَّلَاثِ مَكْرُوهٌ وَفِي جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَفَةٌ لِإِمَامِهِ وَمَنْ دَخَلَ  
 مَسْجِدًا قَدْ أُذِّنَ فِيهِ بِكُرْهِهِ لَمْ أَنْ يَخْرُجْ حَتَّى يُصَلِّيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَخْرُجُ مِنَ  
 الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيدُ الرُّجُوعَ قَالَ إِلَّا إِذَا كَانَ  
 يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ لِأَنَّهُ تَرَكَ صُورَةَ تَكْمِيلٍ مَعْنَى .

অনুবাদ : যদি ফজরের এক রাকআত পড়ার পর ইকামত হয়, তাহলে তা ভঙ্গ করে জামাআতে शामिल হয়ে যাবে। কেননা যদি তার সাথে আরেক রাকআত যুক্ত করে, তবে তার জামাআত ফউত হয়ে যাবে। তেমনি যদি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার সাথে সিজদা মিলানোর পূর্ব পর্যন্ত এ হুকুম হবে। আর ফজরের নামাজ পূর্ণ করার পর ইমামের সাথে জামাআতের নামাজে शामिल হবে না। কেননা ফজরের পর নফল পড়া মাকরুহ যাহিরুর রিয়ওয়াত মুতাবিক মাগরিবের পরও এই হুকুম, কেননা তিন রাকআত নফল পড়া মাকরুহ। পক্ষান্তরে তাকে চার রাকআতে রূপান্তরিত করলে ইমামের বিরোধিতা হয়। আজান হয়ে গেছে, এমন সময় মসজিদে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে তার জন্য নামাজ না পড়ে সেখান থেকে বের হওয়া মাকরুহ। কেননা রাসুল ﷺ বলেছেন, আজান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বের হয় না, যে মুনাফিক কিংবা ঐ ব্যক্তি যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তবে যদি তার উপর অন্য কোনো জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে তাহলে সেও যেতে পারবে। কেননা এটা বাহ্যত বর্জন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণাঙ্গতা দানের शामिल।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পড়ার পর জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে সে নামাজ ভঙ্গ করে লোকদের সাথে জামাআতের নামাজে शामिल হবে। কেননা যদি আরেক রাকআত মিলায় তাহলে একাকী তার নামাজ পূর্ণ হবে এবং জামাআত ফউত হবে। অথচ জামাআত সুনতে মুয়াক্কাদা। অতএব জামাআতের ফজিলত হাসিল করার জন্য ঐ নামাজ ভেঙ্গে দিবে, যা একাকী আরম্ভ করেছিল। অনুরূপভাবে যদি এ ব্যক্তি ফজরের দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে যদি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা না করে থাকে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ করে জামাআতের নামাজে शामिल হবে। পক্ষান্তরে কেউ ফজরের নামাজ একাকী পড়েছে, তারপর জামাআত দাঁড়িয়েছে, তাহলে সে ইমামের সাথে জামাআতে शामिल হবে না। কেননা এমতাবস্থায় ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করবে, তা নফল হবে। অথচ ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নফল পড়া মাকরুহ। তদ্রূপ আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল পড়া মাকরুহ। যাহিরুর রিয়ওয়াত মুতাবিক মাগরিবের নামাজ একাকী পড়ার পর জামাআতের নামাজে शामिल হবে না। কেননা ইমামের সাথে শরিক হলে দুই সুরত।

(১) হয়তো ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে।

(২) অথবা ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আরেক রাকআত মিলাবে, যাতে চার রাকআত হয়। তিন রাকআত ইমামের সাথে, আর এক রাকআত ইমাম ফারিগ হওয়ার পর। প্রথম সুরতে তিন রাকআত নফল হচ্ছে, অথচ তিন রাকআত

নফল পড়া মাকরুহ। আর দ্বিতীয় সুরতে ইমামের বিরোধিতা হয়, এটা জায়েজ নেই। এজন্যে আমরা বলেছি যে, যদি কোনো ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ একাকী আদায় করে অতঃপর জামাআত দাঁড়ায়, তাহলে সে ব্যক্তি জামাআতের নামাজে আর শরিক হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا الْ: যদি কেউ এমন মসজিদে প্রবেশ করে যাতে আজান হয়ে গেছে; তাহলে এ সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে। উক্ত মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তির দুই অবস্থা- (১) হয়তো সে নামাজ পড়েছে (২) অথবা সে নামাজ পড়েনি। যদি নামাজ পড়ে থাকে, তাহলে তার হুকুম পরে বর্ণনা করব। আর যদি নামাজ না পড়ে তাহলে দুই সুরত- এক, এটি তার মহল্লার মসজিদ দুই, অথবা এটি মহল্লার মসজিদ নয়।

যদি এটি তার মহল্লার মসজিদ হয়, তাহলে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার পূর্বে মসজিদ হতে বের হওয়া মাকরুহ হবে। কেননা মুয়াজ্জিন তাকে নামাজের দাওয়াত দিয়েছে। সুতরাং তা কবুল করবে। নামাজ না পড়ে বের হবে না; পক্ষান্তরে যদি এটি তার মহল্লার মসজিদ না হয়, তাহলে দুই অবস্থা- এক, তার মহল্লার লোকেরা স্বীয় মসজিদে নামাজ পড়েছে। দুই, অথবা নামাজ পড়েনি। প্রথম অবস্থায় নামাজ না পড়ে এই মসজিদ থেকে বের হওয়া মাকরুহ। কেননা এ মসজিদে প্রবেশ করার কারণে এ ব্যক্তি এ মসজিদের অধিবাসী বা পরিবার বলে গণ্য হয়ে গেছে।

দুই, দ্বিতীয় অবস্থায় এ ব্যক্তি স্বীয় মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য এই মসজিদ হতে বের হতে পারবে। কেননা তার জন্য নিজ মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া ওয়াজিব। (ইনায়্যা)

হিদায়া গ্রন্থকার উক্ত মাসআলাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করে যাতে আজান হয়ে গেছে, তাহলে নামাজ না পড়ে এ মসজিদ হতে বের হওয়া তার জন্য মাকরুহ। দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস- لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِنْدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِإِجَاعٍ يَرِيدُ الرُّجُوعَ এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ مَوْلَى عَفَّانَ بْنِ عَمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ادْرَكَ الْأَذَانَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ يَخْرُجُ لِإِجَاعٍ وَهُوَ لَا يَرِيدُ الرُّجُوعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ .

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (র.) বলেন যে- রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান দেওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করল, অতঃপর কোনো প্রয়োজন ব্যতীত এবং ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যতীত সে বের হলো, তাহলে সে ব্যক্তি মুনাফিক।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন যে, যদি ঐ ব্যক্তির উপর অন্য কোনো মসজিদের জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে, যেমন সে ব্যক্তি ইমাম অথবা মুয়াজ্জিন, তাহলে তার জন্য আজানের পরও বের হওয়া জায়েজ হবে। কেননা এ বের হওয়াটি যদিও বাহ্যত বর্জন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণাঙ্গতা দানের শামিল।

প্রশ্ন : হাদীসের দ্বারা সাবিত হয় যে, আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ। চাই তার সাথে অন্য কোনো মসজিদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাক বা না থাক? এহেন অবস্থায় উক্ত তাবীলের অবকাশ আছে কী?

উত্তর : হাদীসে নিষেধের উদ্দেশ্য হলো দোষারোপ অর্থাৎ আযানের পর মসজিদ হতে যারা বের হবে লোকেরা তাদেরকে নামাজ হতে বিমুখ হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করবে। কিন্তু ইমাম ও মুয়াজ্জিনের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ বিদ্যমান নয়। অর্থাৎ সকল লোক জানে যে তাঁরা অন্য মসজিদে জামাআতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন। অতএব তাঁদের বের হলে কোনো সন্দেহ নেই।

وَلَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَانَتِ الظُّهُرُ وَالْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بَأَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ  
اللَّهِ مَرَّةً إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ لِمُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ عِبَانًا  
وَأِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ أَوْ الْفَجْرُ خَرَجَ وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِيهَا لِكِرَاهِيَةِ  
النَّفْلِ بَعْدَهَا .

অনুবাদ : আর জোহর ও ইশার ক্ষেত্রে যদি কেউ ঐ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে থাকে, তাহলে (আজানের পরও মসজিদ থেকে) বের হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা আল্লাহর আহ্বানকারীর ডাকে সে একবার সাড়া দিয়েছে। তবে যদি মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দেয়, তাহলে বের হওয়া ঠিক হবে না কেননা এ অবস্থায় সে জামাআত তরক করার দোষে অভিযুক্ত হবে। বাহ্যত! জামাআতের বিরোধিতার কারণে। আর আসর, মাগরিব এবং ফজরের সময় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দিলেও (মসজিদ হতে) বের হয়ে যাবে। কেননা এ সকল নামাজের পর নফল পড়া মাকরুহ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ইবারতে ঐ সূরত উল্লেখ করা হয়েছে, যা বর্ণনা করার প্রতিশ্রুতি পূর্বের মাসআলায় দেওয়া হয়েছে। তা হলো যে, এক ব্যক্তি এমন মসজিদে প্রবেশ করেছে যাতে আজান হয়ে গেছে এবং এ ব্যক্তি ঐ ওয়াক্তের নামাজ নিজ বাড়িতে বা অন্য কোনো মসজিদে আদায় করেছে। যদি এ নামাজটি জোহর অথবা ইশার নামাজ হয়, তাহলে তার জন্য এ মসজিদ হতে বের হওয়ায় কোনো দোষ নেই। কেননা সে একবার আল্লাহর আহ্বানকারী অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তবে যদি মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করে দেয়, তাহলে সে মসজিদ হতে বের হবে না; বরং জামাআতে শরিক হবে। দলিল, ইকামত এবং জামাআত শুরু করার পর মসজিদ হতে বের হলে, লোকেরা জামাআতের বিরোধিতার দোষ আরোপ করবে। অতএব দোষারোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জামাআতে शामिल হবে। তবে জামাআতে আদায়কৃত নামাজ নফল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা পূর্বেই সে ফরজ আদায় করেছে। পক্ষান্তরে যদি ঐ নামাজ আসর, মাগরিব এবং ফজরের হয়, তাহলে মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করার পরও মসজিদ হতে বের হতে পারবে। কেননা পূর্বেই সে ফরজ আদায় করেছে। এমতাবস্থায় যদি সে ঐসব নামাজের জামাআতে शामिल হয়, তাহলে তা নফল হবে। অথচ আসর এবং ফজরের পর নফল পড়া মাকরুহ। তবে মাগরিবের পর যদিও নফল পড়া মাকরুহ নয় তবে ইমামের সাথে শরিক হওয়ার কারণে নফল তিন রাকআত হয়ে যাবে অথচ তিন রাকআত নফল পড়া মাকরুহ।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর সে আরো এক রাকআত নফল পড়ে নিবে, তাহলেই তা চার রাকআত হয়ে যাবে।

উত্তর : এ সূরতে ইমামের বিরোধিতা হয়। কেননা ইমাম তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। আর এ ব্যক্তি চার রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়েছে। অথচ ইমামমের বিরোধিতা করা জায়েজ নেই।

وَمِنْ أَنْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتِي الْفَجْرِ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكَعَةً وَيَذْرُكَ الْآخَرَى يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ امْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ وَإِنْ خَشِيَ قَوْتَهَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ نَوَابِ الْجَمَاعَةِ اعْظَمَ وَالْوَعْدُ بِالْتَّكْرَارِ الزَّمَّ بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ حَيْثُ يَتْرُكُهَا فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ آدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَضِ هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى الرَّكَعَتَيْنِ وَتَاخِيرِهَا عَنْهُمَا وَلَا كَذَلِكَ سُنَّةُ الْفَجْرِ عَلَى مَا نَسَبْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّقْيِيدُ بِالْآدَاءِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى الْكِرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَالْأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالتَّوَاتُفُّلِ الْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ফজরের নামাজে এমন সময় পৌছল যে, ইমাম নামাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সে এখনো ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয় যে, এক রাকআত ফউত হয়ে যাবে এবং এক রাকআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজার সামনে ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়ে নিবে, তারপর ইমামের সাথে শরিক হবে। কেননা এভাবে তার জন্য সুন্নত এবং জামাআতের উভয় ফজিলতই হাসিল করা সম্ভব। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতও ফউত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যাবে। কেননা জামাআতের ছওয়াব অতিবেশি এবং জামাআত তরক করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। জোহরের সুন্নতের হুকুম হলো ভিন্ন অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তা ছেড়ে দিবে। কেননা ওয়াক্তের ভিতরে ফরজের পর তা আদায় করা সম্ভব। এটাই বিতুদ্ধ মত। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য শুধু এই ব্যাপারে যে, উক্ত চার রাকআত সুন্নতকে দুই রাকআতের আগে পড়বে, না পরে পড়বে। কিন্তু ফজরের সুন্নতের বেলায় এ সুযোগ নেই। ইন্শাআল্লাহ পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে। মসজিদের দরজার সামনে আদায় করার শর্তারোপ করা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম নামাজরত থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতরে (সুন্নত আদায় করা) মাকরুহ। সাধারণ সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে আদায় করা উত্তম। এটাই রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময়ে প্রবেশ করেছে যে ইমাম ফজরের নামাজে রত অথচ এ ব্যক্তি এখনও ফজরের সুন্নত পড়েনি, তাহলে তার হুকুম হলো যে, যদি প্রথমে সুন্নত পড়ে তাহলে ফরজের এক রাকআত ফউত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় রাকআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজায় সুন্নত পড়ে জামাআতে শরিক হবে। দলিল, ফজরের সুন্নত সমস্ত সুন্নত হতে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন **أَرْبَعٌ صَلَواتُهُمْ وَأَنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَبِيلُ** - তোমরা ফজরের সুন্নত পড়বে যদিও ঘোড়া তোমাদের পাড়িয়ে যায় বা পদদলিত করে।

অন্যে ইরশাদ করেছেন- **وَكُنَّا الْفَجْرَ خَيْرَ مِنَ النَّاسِ وَمَا فِيهَا** ফজরের দুই রাকআত (সুনত) দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। আর ইমামের সাথে ফজরের এক রাকআত পাওয়া ফজরের পূর্ণ ফরজকে পাওয়ার সমতুল্য। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- **مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ** যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল সে পূর্ণ নামাজ পেল। (ইনায়্যা) এখানে উভয় ফজিলত অর্থাৎ ফজরের সুন্নতের ফজিলত এবং ফজরের জামাআতের ফজিলত একত্রে হাসিল করা সম্ভব। এ কারণে প্রথম সুন্নত পড়বে অতঃপর জামাআতে शामिल হবে এতে উভয় ফজিলতই হাসিল হবে।

আর যদি তার আশংকা হয় যে, ফজরের সুন্নতে মশগুল হলে ফজরের ফরজের উভয় রাকআত ফউত হয়ে যাবে তাহলে সুন্নত না পড়ে ইমামের সাথে জামাআতে शामिल হবে। কেননা জামাআতের ছওয়াব বেশি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- **صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَقْضِي صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ سِتِّينَ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً** জামাআতের নামাজে একাকী নামাজের তুলনায় সাতশ গুণ বেশি ছওয়াব। আর জামাআত তরক করা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- **تَارِكُ الْجَمَاعَةِ مُلْعَنٌ** জামাআত তরককারী অভিশপ্ত। রাসূল ﷺ অন্যত্রে ইরশাদ করেছেন- **لَقَدْ مَنَّتُ أَنْ أَتَخَلَّفَ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَنْظُرَ إِلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ فَأَمَرْتُ بَعْضَ فِتْيَانٍ بِإِحْرَاقِ بَيْتِهِمْ**।

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করেছি যে, কোনো ব্যক্তিকে আমার খলীফা নিযুক্ত করব, সে লোকদের নামাজ পড়াবে এবং আমি দেখব ঐসব লোকদেরকে যারা জামাআতে আসেনি। অতঃপর নওজোয়ানদেরকে নির্দেশ দিব যেন তারা তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়। দলিলের সারকথা হলো, জামাআতের ছওয়াবও বেশি এবং জামাআত তরকে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। অতএব এ ব্যক্তি ফজরের সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে शामिल হয়ে যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের সুন্নত না পড়ে মসজিদে এমন সময় দাখিল হয় যখন ইমাম সাহেব জোহরের ফরজ নামাজ পড়াতে রত, তাহলে তার হুকুম সম্পর্কে বিজ্ঞ গ্রন্থকার (صاحب هداية) বলেছেন যে, যদি জোহরের সুন্নত পড়ার কারণে ইমামের সাথে জোহরের পূর্ণ নামাজ ফউত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা অংশ বিশেষ ফউত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে উভয় সুরতে জোহরের সুন্নত ছেড়ে দিয়ে জামাআতের নামাজে शामिल হবে। কেননা ওয়াক্তের মধ্যে ফরজের পর জোহরের সুন্নত আদায় করা সম্ভব। তাই সুন্নতের কারণে জামাআতের ফজিলত ছেড়ে দিবে না। এটিই বিতর্ক মত। কেননা একবার রাসূল ﷺ -এর জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত ছুটে গিয়েছিল তখন রাসূল ﷺ জোহরের পর এর কাযা করেছেন। এটা হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। - (ইনায়্যা)

জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত ফউত হলে, তা জোহরের পর দুই রাকআত সুন্নতের পূর্বে আদায় করবে অথবা পরে আদায় করবে? এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত হলো প্রথমে জোহরের পরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করবে অতঃপর জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নতের কাজা করবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো যে, প্রথমে জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নতের কাজা করবে অতঃপর জোহরের পরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল, এ চার রাকআত তো তার সুন্নতের স্থান (জোহরের পূর্বে) থেকে ফউত হয়েছে। সুতরাং জোহরের পরের দুই রাকআতকে স্থায়ী স্থান হতে ফউত করবে না; বরং জোহরের ফরজের পর ঐ দুই রাকআত আদায় করবে। অতঃপর জোহরের পূর্বের চার রাকআত কাজা করবে। দুনিয়ার আইনে তার নজির পাওয়া যায়। আমরা নৈনন্দিন প্রত্যক্ষ করে আসছি যে, যদি স্টেশনে দুই গাড়ির ক্রস হয় তাহলে রেলওয়ের নীতি হলো, যে গাড়ি স্টেশনে প্রথমে আসছে তা পরে ছাড়া হবে। আর যে গাড়ি পরে আসছে তা আগে ছাড়া হবে। কেননা যে গাড়ি স্টেশনে প্রথমে দাঁড়িয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করেছে। পরের গাড়িকে অথবা বিলম্ব করাবে না। এ জন্য পরের গাড়িকে আগে রওয়ানা করাবে।



ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল : জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত তো এমনিই বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে কাজেই একে আর অধিক বিলম্ব না করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, প্রথমে জোহরের পূর্বের চার রাকআত পড়বে অতঃপর জোহরের পরের দুই রাকআত পড়বে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ফজরের সুন্নতের অবস্থা অনুরূপ নয়, এর বিস্তারিত আলোচনা আসন্ন।

قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِأَلَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الْخ : এ ইবারতে ইমাম কুদুরী (র.) দরজার নিকট ফজরের সুন্নত পড়ার ফায়দা বর্ণনা করেছেন। সারকথা হলো যে, ইমাম জামাআতের নামাজ রত অবস্থায় মসজিদে সুন্নত পড়া মাকরুহ। কেননা এ ব্যক্তি মসজিদে নফল আদায়কারী এবং ইমাম ফরজ আদায়কারী। আর এটা মাকরুহ এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সুন্নত মসজিদের দরজায় আদায় করবে। তবে যদি দরজায় নামাজ পড়ার স্থান না থাকে, তাহলে মসজিদের ভিতরে খুঁটির পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে।

যে কাতারে মানুষ ফরজ পড়ছে সেই কাতারে সুন্নত পড়া অধিক মাকরুহ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে তারাবীহ ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত এবং নফল ঘরে আদায় করা উত্তম। এতদ বিষয়ে রাসূল ﷺ -এর থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে,

(১) نَوْرًا لِّبُيُوتِكُمْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا তোমরা স্বীয় গৃহসমূহ নামাজ দ্বারা আলোকিত কর। একে কবরস্থান বানিও না।

(২) إِنْ جَمَعَ سَنَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَرَاكَانَ فِي بَيْتِهِ - অর্থ- রাসূল ﷺ সমূহ সুন্নত ও বিতর গৃহে আদায় করতেন।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ لَمَّا رَأَاهُمْ يَصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ - (৩) আবদাউদ তرمذী, نسائي।

অর্থ- রাসূল ﷺ বনী আব্দুল আশহালের মসজিদে যখন লোকদের দেখলেন যে, তারা মাগরিবের পর মসজিদে নামাজ পড়ছে, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, এটা গৃহের নামাজ। অর্থাৎ ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজ গৃহে পড়া উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ (৪) فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত নিজ ঘরে পড়তেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে লোকদেরকে নিয়ে ফরজ পড়তেন। অতঃপর গৃহে প্রবেশ করে দুই রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়তেন। অতঃপর গৃহে দাখিল হয়ে দুই রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। এ হাদীস দ্বারা গৃহে সুন্নত পড়া সাবিত হয়।

عَنْ حَفْصَةَ زَيْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ - (৫) متفق عليه .

অর্থ- বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত হাফসা (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমার পর দুই রাকআত নামাজ নিজ ঘরে পড়তেন।

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ أَلْمَرُّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (৬)

অর্থ- তোমরা অবশ্যই নিজ নিজ ঘরে নামাজ পড়বে। কেননা মানুষের ঘরের নামাজই সর্বোত্তম, ফরজ ব্যতীত।

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ - (৭) আবদাউদ

অর্থ- লোকদের জন্য নিজ ঘরে নামাজ পড়া উত্তম। আমার এই মসজিদের (মসজিদে নববী) নামাজের তুলনায় ফরজ ব্যতীত। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সাবিত হয় যে, ফরজ ব্যতীত সুন্নত ও নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম। — (ফতহুল কাদীর)।

وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لَا يَفْضِيهِمَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ يَبْقَى نَفْلًا مُطْلَقًا وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ آيَةِ حَنِيفَةٍ وَأَيُّ يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْضِيَهُمَا إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَاهُمَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ غَدَاةً لَيْلَةَ التَّغْرِيْسِ وَلَهُمَا أَنْ الْأَصْلُ فِي السُّنَّةِ أَنْ لَا تُقْضَى لِاخْتِصَاصِ الْقَضَاءِ بِالْوَاجِبِ وَالْحَدِيثُ وَرَدَّ فِي قَضَائِهِمَا تَبَعًا لِلْفَرِضِ فَبَقِيَ مَا رَوَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنَّمَا تُقْضَى تَبَعًا لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَفِيهَا بَعْدَهُ إَخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ وَأَمَّا سَائِرُ السَّنَنِ سِوَاهَا لَا تُقْضَى بَعْدَ الْوَقْتِ وَحْدَهَا وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِي قَضَائِهَا تَبَعًا لِلْفَرِضِ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَةً وَلَمْ يَدْرِكِ الثَّلَاثَ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) قَدْ أَدْرَكَ فَضَّلَ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الشَّيْءِ فَقَدْ أَدْرَكَهُ فَصَارَ مُحَرَّرًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لِكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْجَمَاعَةِ حَقِيقَةً وَلِهَذَا يَحْتِثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يَدْرِكُ الْجَمَاعَةَ وَلَا يَحْتِثُ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْجَمَاعَةِ -

অনুবাদ : যদি ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) ফউত হয়ে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা কাজা করবে না। কেননা তা কেবল নফল হয়ে যায়। আর ফজরের পর নফল পড়া মাকরুহ। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পরেও তা কাযা করবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় হলো সূর্য হলে পড়া পর্যন্ত তা কাজা করবে। কেননা রাসূল ﷺ তথা শেষ রাতে যাত্রা বিরতির ঘটনায় পরবর্তী সকালে সূর্য উপরে উঠার পরে ফজরের দুই রাকআত সুন্নত কাজা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো হলো, সুন্নতের ক্ষেত্রে কাযা না করাই হলো আসল হুকুম। কেননা কাজার বিষয়টি ওয়াজিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর উক্ত হাদীসের ঘটনায় দুই রাকআতের কাজা করার কথা এসেছে ফরজের অনুসরণে। সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে আসল হুকুম (সুন্নতের কাজা নেই) মূলনীতি হিসাবে বহাল থাকবে। ফরজ জামাআতের সাথে আদায় করা হোক বা একা। সুন্নতকে ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কাজা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফরজ ছাড়া অন্য সকল সুন্নত ওয়াজ্জের পরে এককভাবে কাজা করা হবে না। আর ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে কিনা? সে সম্পর্কে মাশায়েখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। যে ব্যক্তি জোহরের নামাজ এক রাকআত পেল কিন্তু বাকি তিন রাকআত পায়নি, সে জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জামাআতের ফজিলত সে লাভ করবে। কেননা কোনো কিছুই শেষাংশ পেয়ে, সে যেন ঐ বস্তু পেয়ে গেছে।

সুতরাং সে জামাআতের ছওয়াব অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হয়নি। এ কারণেই যদি কেউ কসম খায় যে, সে কখনো জামাআত ধরবে না, তবে শেষ রাকআত জামাআতে শরিক হওয়ার দ্বারা সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু “জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়বে না”, এই কসম করলে, সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফজরের সুন্নত কাজা হয়ে গেলে তা কাজা করবে কিনা? এ কথার উপর একমত যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কাজা করবে না। কেননা সুন্নত যখন নিজ ওয়াক্ত হতে ফউত হয়েছে তখন তা নফল হয়েছে। আর ফজরের নামাজের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া মাকরুহ অতএব সূর্যোদয়ের পূর্বে উহা কাজা করবে না। আর সূর্যোদয়ের পর কাজা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মাঝে মতানৈক্য আছে। শায়খাইন অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে সূর্যোদয়ের পরও উহার কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন যে, কাজা করা ওয়াজিব নয়। তবে পছন্দনীয় হলো কাজা করা। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল লায়লাতুত তারীস (لَيْلَةُ التَّغْرِيسِ)-এর সকালে সূর্য উঠে হওয়ার পর রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নত কাজা করেছেন। এর দ্বারা সাবিত হয় যে, সূর্যোদয়ের পর ফজরের সুন্নত কাজা করা যায়।

শাখাইনের দলিল, মূল হুকুম হলো যে, সুন্নতের কাজা নেই। কেননা কাজা ওয়াজিবের সাথে সম্পৃক্ত। এর কারণ হলো, কাজা বলা হয়, تَطْلِيمٌ مِّنْ لِّمَا وَجِبَ بِالنَّفْسِ নির্দেশের দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে তার অনুরূপ জিনিস সোপর্দ করা। আর যেহেতু সুন্নত ওয়াজিব নয়, অতএব مثل واجب বা ওয়াজিবের মতো কিভাবে হবে?

ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রদত্ত দলিলের জবাবঃ লাইলাতুত তারীস (لَيْلَةُ التَّغْرِيسِ) রাসূল ﷺ ফজরের ফরজের অনুসরণে ফজরের সুন্নত কাজা করেছেন। যেহেতু রাসূল ﷺ এর ফজরের ফরজও ফউত হয়েছিল, তাই রাসূল ﷺ ফরজের কাজা করেছেন এবং তার অনুসরণে সুন্নতেরও কাজা করেছেন। অতএব তা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল হুকুম অনুযায়ী সুন্নতের কাজা করা হবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ফজরের সুন্নত ফরজের অনুসরণে কাজা করা হবে। অর্থাৎ ফজরের ফরজ কাজা করলে সুন্নতও কাজা করবে। চাই ফরজ জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক। প্রকাশ থাকে যে, ফজরের সুন্নত ফরজের অনুসরণে কাজা করতে পারবে সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। আর সূর্য হেলে গেলে কাজা করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নতের কাজা নেই, যদিও ফজরের ফরজের অনুসরণে হয়। কেননা রাসূল ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে ফরজের অনুসরণে ফজরের সুন্নতের কাজা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ফরজের অনুসরণে সূর্য হেলে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নতের কাজা করবে। তবে ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নতের কাজার ব্যাপারে বিধান হলো, ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর একাকী সুন্নতের কাজা করা যাবে না। কিন্তু ফরজের অনুসরণে কাজা করবে কিনা? এ ব্যাপারে মাশায়েখে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাজা করবে। কেননা অনেক জিনিস যিম্নান (ضمان) সাবিত হয় যদিও তা ইচ্ছাকৃতভাবে সাবিত হয় না। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাজা করবে না। কেননা কাজা ওয়াজিবের সাথে সম্পৃক্ত। এটিই বিতর্কিত মত।

قَوْلُهُ وَمَنْ آذَرَكَ مِنَ الظُّمَيْرِ الخ: যদি কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের এক রাকআত ইমামের সাথে পায় আর তিন রাকআত না পায়, তাহলে সে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ল না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে জামাআতের ফজিলত পেয়েছে। মতনে (মন) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নাম এমনিই উল্লেখ করা হয়েছে এর কোনো হেতু নেই। কেননা এটা আহনাফের সর্ববাদী অভিমত। দলিল হলো যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর শেষ অংশ পেল, সে যেন ঐ বস্তুটি পূর্ণ পেল। অতএব এ ব্যক্তি জামাআতের মর্যাদা অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হয়নি। এ কারণে কেউ কসম খেল আদ্বাহর কসম আমি জামাআত ধরব না। অতঃপর সে এক রাকআত নামাজ জামাআতের সাথে পেল, তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হবে। কেননা সে জামাআতের ফজিলত পেয়েছে। আর যদি একরূপ কসম খায় যে وَاللَّوْلَا أَصْبَيْتُ الظُّمَيْرَ بِالنَّجَافَةِ অর্থাৎ আদ্বাহর কসম আমি জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়ব না। অতঃপর সে ইমামের সাথে জামাআতে এক রাকআত পেল, তাহলে এ ব্যক্তি কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে জোহরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়েনি।

وَمَنْ آتَىٰ مَسْجِدًا قَدْ صَلَّىٰ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا بَدَأَ لَهُ مَا دَامَ  
 فِي الْوَقْتِ وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةً وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَيْقٌ تَرَكَهُ قَبْلَ هَذَا فِي غَيْرِ سُنَّةِ  
 الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّ لَهُمَا زِيَادَةَ مُرَبَّةٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ صَلَّوْهَا  
 وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ وَقَالَ فِي الْأُخْرَىٰ مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنْلَهُ شَفَاعَتِي وَقَبْلَ  
 هَذَا فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاطَّابَ عَلَيْهَا عِنْدَ آدَاءِ الْمَكْتُوباتِ بِالْجَمَاعَةِ وَلَا  
 سُنَّةَ دُونَ الْمَوَاطِبَةِ وَالْأَوَّلَىٰ أَنْ لَا يَتْرُكَهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا لِكُونِهَا مُكْمِلَاتٍ لِلْفَرَائِضِ  
 إِلَّا إِذَا خَافَ فَوَتْ الْوَقْتَ .

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি জামাআত হয়ে গেছে এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলো, সে ফরজ আদায় করার  
 পূর্বে ওয়াক্তের ভিতরে যতক্ষণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে। ইমাম কুদুরী (র.)-এর এ বক্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে,  
 যখন সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লে সুন্নত ও নফল ছেড়ে দিবে। আর কেউ  
 কেউ বলেছেন (নফল ছেড়ে দেওয়ার) এ হুকুম হলো জোহর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কেননা এ দুটি  
 সুন্নতের অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। ফজরের সুন্নত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, অশ্বদল তোমাকে তাড়া করলেও  
 তোমরা তা পড়। অপর সুন্নতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, জোহরের পূর্ববর্তী চার রাকআত সুন্নত যে ছেড়ে দিবে, সে  
 আমার শাফায়াত লাভ করবে না। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা সকল সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা রাসূল ﷺ  
 জামাআতের সাথে ফরজ আদায় করার সময় নির্ধারিত সুন্নতগুলো নিয়মিত আদায় করেছেন। আর নিয়মিত ছাড়া সুন্নত  
 সাব্যস্ত হয় না। তবে উত্তম হল, কোনো অবস্থাতেই তা তরক না করা। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরজসমূহের  
 সম্পূরক। তবে ওয়াক্ত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে ছেড়ে দিবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তির জামাআত ফউত হয়ে যায় এবং সে এমন মসজিদে আসে যেখানে জামাআত হয়ে গেছে অথবা সে  
 ঘরে ফরজ পড়ার ইচ্ছা করেছে। তাহলে ফরজের পূর্বে ওয়াক্তের মধ্যে যে পরিমাণ সুন্নত ও নফল আদায় করতে চায় আদায়  
 করে নিবে। আর যদি সময় সংকীর্ণ হয় তাহলে প্রথমে ফরজ আদায় করে নিবে। যাতে ফরজ ছুটে না যায়। কেউ কেউ  
 বলেছেন, সময় সংকীর্ণের সুরতে সুন্নত এবং নফল ছেড়ে দেওয়ার এ হুকুম জোহর এবং ফজর এর সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে।  
 কেননা জোহর এবং ফজরের সুন্নতের অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক ছওয়াব। এ জন্য ওয়াক্তের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও তা  
 অবশ্যই পড়বে। তবে যদি সময় বেশি সংকীর্ণ হয় তাহলে জোহরের এবং ফজরের সুন্নত ছেড়ে দিবে। ফজরের সুন্নতের  
 গুরুত্বের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর বাণী وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ وَقَالَ فِي الْأُخْرَىٰ مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنْلَهُ شَفَاعَتِي  
 -এর বাণী

কেউ কেউ বলেছেন, সময় সংকীর্ণতার সুরতে সুন্নত তরক করার হুকুম সকল (নামাজের) সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।  
 চাই তা জোহর ও ফজরের হোক বা অন্য ওয়াক্তের সুন্নত হোক। কেননা রাসূল ﷺ যখন ফরজ নামাজ জামাআতের সাথে  
 আদায় করতেন, তখন তিনি সুন্নতসমূহও নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। পক্ষান্তরে যখন ফরজ একাকী আদায় করতেন তখন  
 সুন্নত নিয়মিত আদায় করতেন না। নিয়মিত আদায় করা ছাড়া কোনো আমল সুন্নত বলে সাব্যস্ত হয় না। অতএব একাকী ফরজ  
 আদায়কারীর ক্ষেত্রে এসব নামাজ (বারো রাকআত) সুন্নত হবে না; বরং নফল হবে। আর নফলের ক্ষেত্রে তার অর্থতিয়ার  
 থাকবে পড়তে পারে নাও পড়তে পারে। এজন্য বলা হয়েছে যে, না পড়ার হুকুম সমস্ত সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, উত্তম হলো এসব সুন্নতকে কোনো অবস্থায়ই ছাড়বে না, ওয়াক্ত সংকীর্ণ হোক বা প্রশস্ত হোক,  
 ফরজ নামাজ জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক, চাই মুসাফির হোক বা মুকীম। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরজের সম্পূরক।  
 অতএব, ফরজের ছওয়াব পূর্ণ করার লক্ষ্যে ওগুলোকে কখনো ছাড়বে না। এছাড়া খুলাফার রাশেদীন, শ্রবীণ সাহাবীগণ এবং  
 তাবেদ্বীগণ ও এর উপর আমল করেছেন যে, তারা কোনো অবস্থায় সুন্নত ছাড়েননি। তবে হ্যাঁ যদি ওয়াক্ত ফউত হওয়ার সম্ভাবনা  
 থাকে, তাহলে সুন্নত তরক করবে এবং ফরজ আদায় করবে। — (ইনায়্যা)

وَمَنْ أَنْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي رُكُوعِهِ فَكَبَّرَ وَ وَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَا يَصْبِرُ  
مُدْرِكًا لِيَلِكُ الرَّكْعَةُ خِلَافًا لِرَفْرِهُ هُوَ يَقُولُ أَدْرَكَ الْإِمَامُ فَيَسْمَا لَهُ حُكْمُ الْقِيَامِ وَلَنَا أَنَّ  
الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَا فِي الْقِيَامِ وَلَا فِي الرُّكُوعِ .

অনুবাদ : কেউ যদি এসে ইমামকে রুকুতে পায় এবং তাকবীর বলে দাড়িয়ে থাকে আর এ অবস্থায় ইমাম মাথা তুলে ফেলে তাহলে সে ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র.) -এর মত ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন, ইমাম কে যে এমন অবস্থায় পেয়েছে যা কিয়ামের হুকুমভুক্ত। কাজেই সে রাকআত পেয়েছে। আমাদের দলিল হচ্ছে— নামাজের কার্যসমূহে (ইমামের সাথে) অংশ গ্রহণ করা হল শর্ত। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি, কিয়ামের অবস্থায়ও না এবং রুকুর অবস্থায়ও না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায় এবং সে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাজে শরিক হয়ে যায়, অতঃপর দাড়িয়ে থাকে এবং ইমামের সাথে রুকুতে শরিক না হয় এমনতাবস্থায় ইমাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে নেয় তাহলে তিন ইমামের (আবু হানীফা (র.) আবু ইউসুফ (র.) মুহাম্মদ (র.) মতে এ ব্যক্তি ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এ ব্যক্তি ঐ রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। সুফয়ান সাওরী (র.) ইবনে আবী লায়লা (র.) আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.)-এর মতও অনুরূপ।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, সে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়েছে, যদিও সে নিজে রুকু পায়নি, রুকুকে কিয়ামের হুকুমে ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং রুকুর অবস্থায় পাওয়ার অর্থই হলো যেন প্রকৃত কিয়াম অবস্থায়ই পেয়েছে। আর কিয়াম অবস্থায় পাওয়ার দ্বারা রাকআত পালন এয়ালা হলো। অতএব রুকু অবস্থায় ইমামকে পাওয়ার দ্বারা রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তিন ইমামের দলিল হল ইকুতেন্দা (الافتاء) বলা হয়। নামাজের কর্মে অংশ গ্রহণ করাকে। আর এখানে অংশ গ্রহণ করা পাওয়া যায়নি, কিয়াম অবস্থায়ও নয় এবং রুকু অবস্থায়ও নয়। যেহেতু সে এই রাকআতের কিয়ামে এবং রুকুতে অংশ গ্রহণ করেনি। তাই সে এই রাকআত পেয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব! আমরা রুকুকে কিয়ামের হুকুমে ধরা স্বীকার বা সমর্থন করি না। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সুয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا أَدْرَكَتْ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَتْ يَلِكُ الرَّكْعَةُ وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرَكَعَ فَاتَّسَدَ يَلِكُ الرَّكْعَةُ .

অর্থ— যখন তুমি ইমাম কে রুকুতে এবং ইমাম (রুকু হতে) মাথা উঠানোর পূর্বে তুমি রুকু করে নাও, তাহলে তুমি ঐ রাকআত পেয়েছ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তোমার রুকু করার পূর্বে যদি ইমাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে নেয় তাহলে ঐ রাকআত ফউত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

وَلَوْ رَكِعَ الْمُفْتَدِي قَبْلَ إِمَامِهِ قَادَرَكُمُ الْإِمَامُ فِيهِ جَاَزَ وَ قَالَ زُفَرٌ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ مَا  
 أَتَى بِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ فَكَذَا مَا يُبْنَى عَلَيْهِ وَلَكِنَّا أَنْ الشَّرْطَ هُوَ الْمُشَارَكَةُ  
 فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي طَرَفِ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকূতে চলে যায়, আর ইমাম তাকে রুকূতে গিয়ে পায়, তাহলে নামাজ জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন এটা তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা ইমামের আগে যা সে করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এর উপর যা বিনা করা হয়েছে তাও শুদ্ধ হবে না। আমাদের দলিল হচ্ছে- শর্ত হলো নামাজের কোনো অংশে (ইমামের সাথে) শরিক হয়ে যাওয়া। যেমন প্রথম অংশে (শরিক হলে তা গণ্য হয়)। আক্কাইই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকূতে চলে যায়। অতঃপর ইমামও রুকূতে যায় এবং উভয় রুকূতে গিয়ে শরিক হয় তাহলে এই সূরতে মুক্তাদীর নামাজ নষ্ট হবে না। তদ্রূপ হুকুম যদি এ অবস্থা সাজদাতে হয়। তবে মুক্তাদীর নামাজ মাকরুহ হবে। মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস,

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْكِعُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ رَأْسُهُ رَأْسَ الْحِمَارِ .

অর্থ- যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে রুকূতে যায় তার ভয় করা উচিত যে তার মাথা গর্ধবের মাথায় রূপান্তর করা হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উক্ত সূরতে মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না বিধায়, মুক্তাদীর জন্য ঐ রুকু পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব। যদি পুনঃআদায় না করে তাহলে তার নামাজ আদায় হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল, মুক্তাদী রুকুর যে অংশ ইমামের পূর্বে আদায় করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ .

অর্থ- ইমাম এই জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে তার অনুসরণ করা হবে। অতএব তোমরা ইমামের সাথে ইখ্তেলাফ বা বিরোধিতা করবে না।

সুতরাং মুক্তাদীর একাকী আদায়কৃত অংশ গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় উহার উপর যা বিনা করা হবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মূলনীতি হচ্ছে-

الْيَأْتِ عَلَى النَّاسِ نَافِيَةٌ .

অর্থ- ফাসিদের উপর যার বিনা হয় তা ফাসিদ হয়। এটাকে ধরে নেওয়া হবে যে, ইমাম রুকু করার পূর্বেই মুক্তাদী রুকু থেকে স্বীয় মাথা উঠিয়ে নিয়েছে।

**আমাদের দলিল :** জায়েজের শর্ত হলো, কোনো এক অংশে শরিক হওয়া। আর এখানে এক অংশে শরিক হওয়া পাওয়া গেছে। নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শিরকতই (শরক) যথেষ্ট। যেমনঃ প্রথম অংশে মুক্তাদী ইমামের সাথে শরিক হলো, অতঃপর ইমামের পূর্বে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে নিল। তাহলে নামাজ জায়েজ হয়। কেননা এক অংশে শরিক হওয়া পাওয়া গেছে।

পক্ষান্তরে যদি ইমামের পূর্বে রুকূতে যায় এবং ইমাম রুকু করার পূর্বেই মুক্তাদী মাথা রুকু হতে উঠিয়ে নেয় তাহলে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা এই সূরতে কোনো অংশেই ইমামের সাথে শরিক হওয়া পাওয়া যায়নি। অথচ কোনো অংশে শরিক থাকা শর্ত।

## بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

مَنْ قَاتَنَهُ صَلَوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلَى فَرَضِ الْوَقْتِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ  
التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرَضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْتَحَقٌّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ  
كُلَّ فَرَضٍ أَصْلٌ يَنْفُسُهُ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنِ  
صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَصِلِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لْيَصِلِ  
الَّتِي ذَكَرَهَا ثُمَّ لْيُعِدِ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ . وَلَوْ خَافَ فَوَتْ الْوَقْتِ يُقَدِّمُ الْوَقْتِيَّةَ ثُمَّ  
يَقْضِيهَا لِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضَيِّقِ الْوَقْتِ وَكَذَا بِالنِّسْيَانِ وَكَثُرَتْ الْفَوَائِتُ  
كَيْلَا يُؤَدَّى إِلَى تَفْوِيتِ الْوَقْتِيَّةِ . وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ جَازَ لِأَنَّ النِّهْيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا  
لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا يَخْلَافُ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَقَدَّمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ  
لِأَنَّهُ أَذَاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيثِ .

### পরিচ্ছেদ : কাজা নামাজের বিবরণ

অনুবাদ : যদি কারো কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে যখনই স্বরণ হবে তখন তা পড়ে নেবে এবং ওয়াক্তিয়া (وقية) নামাজের আগে তা পড়ে নিবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো- ওয়াক্তিয়া ফরজ নামাজ এবং কাজা নামাজসমূহের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমাদের মতে ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে তা মোস্তাহাব। কেননা প্রতিটি ফরজ নামাজ اصل بنفسه বা নিজস্বভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং অন্য ফরজের জন্য তা শর্ত হতে পারে না। আমাদের দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বাণী, যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা নামাজের কথা ভুলে যায়, আর তা ইমামের সাথে নামাজে শরিক হওয়ার পরই মনে মনে পড়ে। তবে সে যে নামাজ আরম্ভ করেছে, তা পড়ে নেবে। এর পর যে নামাজের কথা মনে পড়েছে তা পড়ে অতঃপর ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করেছে তা পুণরায় আদায় করবে। যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ওয়াক্তিয়া নামাজ আগে পড়ে নিবে, এরপর কাজা নামাজ আদায় করবে, সময়ের সংকীর্ণতার কারণে। তেমনি ভুলে যাওয়ার কারণে এবং কাজা বেশি হওয়ার কারণে তরতীব বহিত হয়ে যায়, যাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার উপক্রম না হয়ে পড়ে। আর যদি কাজা নামাজ আগে পড়ে নেয় তবে তা জায়েজ হবে। কেননা তা আগে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে (কাজা নামাজের নিজস্ব কোনো কারণে নয়)। পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাজকে আগে আদায় করে, তবে তা জায়েজ হবে না। কেননা হাদীস দ্বারা উক্ত নামাজের জন্য যে সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে তার পূর্বে সে তা আদায় করেছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**প্রাসঙ্গিক কথা :** পূর্বের অধ্যায়ে আদা (ادا) নামাজ সম্পর্কীয় আহকামের আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কাজা নামাজের আহকাম আলোচনা হবে। যেহেতু আদা (ادا) নামাজ আসল আর কাজা (قضاء) নামাজ উহার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত এজন্য আদা নামাজের আলোচনা আগে আর কাজা নামাজের আলোচনা পরে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আইনে ওয়াজিবকে তার মুস্তাহিক বা হকদারের নিকট সোপর্দ করা কে আদা (ادا) বলে। ওয়াজিবের মতো জিনিসকে মুস্তাহিক বা হকদারের নিকট সোপর্দ করে দেওয়াকে কাজা (قضاء) বলে।

যদি কারো নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে যখনই স্বরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের আগে তা পড়ে নিবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মূলনীতি হলো আমাদের মতো কাজা নামাজ এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের মাঝে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ কাজা নামাজ ওয়াক্টিয়া নামাজের অগ্রে পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে তরতীব বা ক্রম রক্ষা করা মোস্তাহাব। তাই কাজা নামাজকে ওয়াক্টিয়ার অগ্রে আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল, প্রতিটি ফরজ নামাজ নিজস্বভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং তা অন্য ফরজের জন্য শর্ত হতে পারে না। কেননা শর্ত তাবে (تابع) হয়। আর মূল (اصل) এবং তাবইয়্যাত (تبعيت) বা তাবের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। অতএব যদি ওয়াক্টিয়া নামাজ আদায় করার জন্য কাজা নামাজকে অগ্রে আদায় করা শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে কাজা নামাজ তাবে হচ্ছে অথচ কাজা নামাজ ফরজ হওয়ার কারণে নিজস্ব ভাবে আসল বা মূল। অতএব সাবিত হলো যে, কাজা নামাজ ওয়াক্টিয়া নামাজের অগ্রে আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

**আমাদের দলিল :** রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَصِلِ النَّيَّ هُوَ فِيهَا ثُمَّ يَصِلِ النَّيَّ ذَكَرَهَا ثُمَّ لْيَعِدِ النَّيَّ مَعَ الْإِمَامِ .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সে যে নামাজ ইমামের সাথে পড়েছে তা কাজা নামাজের অগ্রে হয়েছে। অথচ কাজা নামাজ অগ্রে পড়া ওয়াজিব। এ কারণে ঐ নামাজ (ওয়াক্টিয়া) দোহরানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে। যাতে কাজা এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের মাঝে তরতীব রক্ষা হয়।

**প্রশ্ন :** এ হাদীসটি হলো আখবারে আহাদ (اخبار احاد)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) দ্বারা ফরজ সাবিত হয় না। অতএব এ হাদীস দ্বারা তারতীবের ফরজ সাবিত হবে না।

**উত্তর :** এ হাদীস খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) নয় বরং খবরে মশহুর (خبر مشهور) আর খবরে মাশহুর দ্বারা ওয়াজিব বা ফরজ সাবিত হয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ তাহলে জবাব হলো যে, তারতীব আল্লাহর কিতাব (الْقُرْآن) এর দ্বারা সাবিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এ ক্ষেত্রে মুজমাল (مجمّل) আর উক্ত হাদীসটি কিতাবের মুজমালের ব্যাখ্যা স্বরূপ হয়েছে।

**الح** : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের মাঝে তরতীব ওয়াজিব। তবে যদি সময় সংকীর্ণ হয় যে, কাজা নামাজ রত হলে ওয়াক্জ শেষ হওয়ার অশঙ্কা থাকে, তাহলে ওয়াক্টিয়া নামাজ আগে আদায় করবে, অতঃপর কাজা নামাজ আদায় করবে। কেননা তিন জিনিসের দ্বারা তারতীব রহিত হয়ে যায় ১. সময়ের সংকীর্ণতা ২. ভুলে যাওয়া। ৩. কাজা নামাজ বেশি হওয়া। বেশির সীমা হলো ছয় ওয়াক্জ নামাজ উক্ত জিনিসগুলো দ্বারা তারতীব এই জন রহিত হয় যে, কাজা নামাজসমূহ আদায়ের কারণে ওয়াক্টিয়া নামাজ যেন ফউত না হয়।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কাজা এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের মাঝে তরতীব ওয়াজিব। তবে তা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে ত রহিত হয়ে যায়। যদি সময়ের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কাজা নামাজ আগে পড়ে এবং ওয়াক্টিয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে কাজা নামাজ জায়েজ হবে। কেননা তা সময় সংকীর্ণতার অবস্থায় অগ্রে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে। অর্থাৎ ওয়াক্টিয়া ছেড়ে দেওয়ার কারণে। এখানে ওয়াক্টিয়া ছাড়ার কারণে কাজা নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি হয় নি; তবে ওয়াক্টিয় নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার গুনাহ হবে। পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্টিয়াকে অগ্রে আদায় করে নেয়, তবে তা জায়েজ হবে না। কেননা হাদীস দ্বারা উক্ত নামাজের জন্য যে ওয়াক্জ সাব্যস্ত হয়েছে তার পূর্বে সে ত আদায় করেছে। অর্থাৎ হাদীস দ্বারা সাবিত হয়েছে যে, ওয়াক্টিয়ার সময় কাজা আদায়ের পর। আর যে নামাজ সময়ের পূর্বে আদায় করা হয় তা জায়েজ হয় না। কাজেই সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকলে ওয়াক্টিয়া নামাজ কাজার অগ্রে পড়তে জায়েজ হবে না।



وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتُ رَبِّهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجِبَتْ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ  
 السَّلَامُ شَغَلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرْتَبًا ثُمَّ قَالَ صَلُّوا كَمَا  
 رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي إِلَّا أَنْ يَزِيدَ الْفَوَائِتُ عَلَى سِتٍّ صَلَوَاتٍ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ قَدْ كَثُرَتْ  
 فَتَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيمَا بَيْنَ الْفَوَائِتِ بِنَفْسِهَا كَمَا يَسْقُطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ  
 وَحَدِّ الْكَثْرَةِ أَنْ تَصِيرَ الْفَوَائِتُ سِتًّا بِخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ السَّادِسَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ  
 بِالْمَذْكُورِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَنْ فَاتَتْهُ أَكْثَرُ مِنْ صَلَوَاتٍ يَوْمَ وَلَبَّيْ  
 أَجْرَاتِهِ الَّتِي بَدَأَ بِهَا لِأَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَبَّيْ تَصِيرُ سِتًّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِعْتَمَرَ  
 دُخُولَ وَقْتِ السَّادِسَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ بِالْدُخُولِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ  
 وَذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ -

অনুবাদ : যদি কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে মূলতঃ নামাজ যে তরতীবে ওয়াজিব হয়েছিল  
 কাজা নামাজও সে তরতীবে আদায় করবে। কেননা খন্দকের যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা  
 হয়েছিল। তখন তিনি সেগুলো তারতীবের সাথে কাজা করেছিলেন। এরপর বলেছিলেন, আমাকে যেভাবে নামাজ  
 পড়তে দেখেছো, সেভাবে তোমরাও নামাজ পড়ো। তবে যদি কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্তের বেশি হয়ে যায় তবে এর  
 হুকুম ভিন্ন। কেননা কাজা নামাজ বেশি পরিমাণে হয়ে যাওয়ায় কাজা নামাজগুলোর মাঝেও তরতীব রহিত হয়ে যাবে,  
 যেমন- কাজা নামাজ ও ওয়াক্তিয়া নামাজের মাঝে রহিত হয়ে যায়। অধিক্যের পরিমাণ হলো- কাজা নামাজ ছয়  
 ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া। জামিউস সাগীর কিতাবের নিম্নোক্ত ইবারতের অর্থ  
 এটাই। “যদি একদিন একরাত্রের অধিক নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করবে,  
 তা জায়েজ হবে। কেননা একদিন এক রাত্রের অধিক হলে নামাজের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি ষষ্ঠ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তবে প্রথমেই  
 মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা পুনঃ আরোপিত হওয়ার সীমায় উপনীত হওয়া দ্বারা আধিক্য সাব্যস্ত হয়। আর তা প্রথমেই  
 দ্রুত হয়েছিল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যেমন ওয়াক্তিয়া এবং কাজা নামাজের মাঝে তরতীব ফরজ তদ্রূপ কাজা নামাজসমূহের মাঝেও তরতীব ফরজ। যদি  
 একাধিক নামাজ ফউত হয়ে যায় তাহলে এর কাজা ঐ তরতীব (ধারাবাহিকতা) অনুযায়ী পড়বে যে তরতীব অনুযায়ী আদা  
 ওয়াজিব হয়েছিল। হাদীস-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ  
 يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ  
 ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

অর্থ- হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুশরিকরা হযরত রাসূল ﷺ-কে চার ওয়াত্ নামাজ থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি রাতের কিয়াদংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত রাসূল ﷺ হযরত বিলাল (রা.) কে হুকুম দিলেন। হযরত বিলাল (রা.) আযান দিলেন; তারপর ইকামত দিলেন, অতঃপর যুহরের নামাজ পড়লেন। তারপর ইকামত দিলেন এবং আসরের নামাজ পড়লেন। অতঃপর (মাগরিবের) ইকামত দিলেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়লেন, তারঃপর ইশার আজান দিলেন এবং ইশার নামাজ পড়লেন।

অতঃপর বললেন- صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أَصَلِّي অর্থ- তোমরা যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো, সেভাবে তোমরাও নামাজ পড়বে। হাদীসে চিহ্না-ভাবনা করার দ্বারা জানা যায় যে, যে তরতীব অনুযায়ী নামাজ ফউত হয়েছে, হযরত রাসূল ﷺ সে তরতীব অনুযায়ীই নামাজ কাজ করেছেন।

অতঃপর নির্দেশ স্বরূপ বলেছেন- صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِي أَصَلِّي তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো, তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ও। প্রকাশ থাকে যে, আগামী সময়ের জন্য পড়বে এ হুকুম প্রযোজ্য। মোটকথা এ হাদীসের দ্বারা কাজা নামাজের মধ্যে তরতীব সাবিত হয়। তবে হ্যাঁ; যদি কাজা নামাজের সংখ্যা ছয় ওয়াক্তের বেশি হয়, তাহলে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। দলিল কাজা নামাজ বেশি হলে অসুবিধার কারণে তরতীব পালনের হুকুম রহিত হবে। যেমন অনেক কাজা এবং ওয়াক্তিয়ার মাঝে তরতীব রহিত হয়ে যায়। আধিক্যের পরিমাণ হলো ষষ্ঠ নামাজের ওয়াত্ পার হয়ে যাওয়া।

উক্ত মাসআলা জামেউস সাগীর গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ যদি একদিন এক রাত্রের বেশি হয়, তাহলে যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করবে তা জায়েজ হবে। কেননা একদিন এক রাত্রের অধিক হলে নামাজের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে। আর ছয় নামাজ হওয়া আধিক্যের আলামত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ অধিক পরিমাণ হলে তরতীব রহিত হয়ে যায়। অতএব যে ওয়াক্তের নামাজই প্রথমে কাজা করে, তা জায়েজ হবে। তরতীব অনুযায়ী পড়ুক বা তরতীব বিহীন পড়ুক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ষষ্ঠ নামাজের ওয়াত্ দাখিল হওয়ার দ্বারা কাজা অধিক হিসাবে সাব্যস্ত হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, প্রথম মতটি বিতদ্ধ। অর্থাৎ ষষ্ঠ ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য, প্রথম সময় দাখিল হওয়া ধর্তব্য নয়।

প্রথমে মতটি বিতদ্ধ হওয়ার দলিল- আধিক্য ঐ সময় বলা হবে যখন নামাজের মধ্যে তাকরার تَكَرَّر বা পুনঃসম্পাদনের আরোপিত হবে। আর তাকরার (تَكَرَّر) ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। কেননা যখন ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হয় তখনই কাজা নামাজে তাকবার সাব্যস্ত হয়।

ইনয়া গ্রন্থকার বলেছেন, تَضَاءٌ بِالْأَغْمَاءِ-এর বিষয়টি। অর্থাৎ যদি অচেতনের কারণে কাজা নামাজ অনেক বেশি হয় তাহলে এর কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি কাজা নামাজ কম হয় তা হলে এর কাজা ওয়াজিব হবে। এ বর্ণনা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, হযরত আলী (রা.) একদিন ও একরাত থেকে কম অচেতন ছিলেন, তখন তিনি একদিন ও এক রাতের নামাজ কাজা করেছেন। আশ্বাহ ইবনে ইয়াসীর (রা.) পূর্ণ এক দিন এক রাত অচেতন ছিলেন তিনি একদিন একরাতের নামাজ কাজা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একদিন ও এক রাত থেকে অধিক অচেতন ছিলেন তিনি নামাজ কাজা করেননি। উক্ত তিন হযরতের ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, আধিক্যের সংজ্ঞায় তাকবার (تَكَرَّر)-এর বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাজের সময় শেষ হওয়া।

وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِثُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ قَبْلَ يَجُوزُ الْوَقْتِيَّةَ مَعَ تَذَكُّرِ الْحَدِيثِ  
لِكثْرَةِ الْفَوَائِثِ وَقِيلَ لَا تَجُوزُ وَيَجْعَلُ الْمَاضِي كَانَ لَمْ يَكُنْ زَجْرًا لَهُ عَنِ التَّهَاطُورِ .  
وَلَوْ قُضِيَ بَعْضُ الْفَوَائِثِ حَتَّى قَلَّ مَا بَقِيَ عَادَ التَّرْتِيبُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنَّهُ  
رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَعَلَ يَقْضِي مِنَ النَّعْدِ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ  
فَائِتَةً فَالْفَوَائِثُ جَائِزَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْوَقْتِيَّاتُ فَائِدَةٌ إِنْ قَدَّمَهَا لِدُخُولِ الْفَوَائِثِ فِي  
حَدِّ الْقِيلِ وَإِنْ آخَرَهَا فَكَذَلِكَ إِلَّا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لِأَنَّهُ لَا فَائِتَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ حَالِ آدَانِهَا .

অনুবাদ : যদি পূর্বের ও সাম্প্রতিক কাজা নামাজ একত্রিত হয়ে যায়। তবে কোনো কোনো আলিমের মতে সাম্প্রতিক কাজা নামাজ স্বরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্টিয়া নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে। কেননা কাজা নামাজ অধিক হয়ে গেছে। কোনো কোনো আলিমের মতে জায়েজ হবে না এবং বিগত কাজা নামাজ গুলোকে যেন তা হয়নি বলে ধরে নেওয়া হবে। যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অলসতা থেকে সতর্ক হয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি কিছু কাজা নামাজ আদায় করে ফেলে এবং অল্প পরিমাণ কাজা তার উপর অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কোনো কোনো আলিমের মতে তারতীবের হুকুম পূর্ণ; আরোপিত হবে। এই মতই অধিক সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একদিন ও এক রাতের নামাজ তরক করে, আর পরবর্তী দিন প্রতি ওয়াক্টিয়া নামাজের সাথে এক ওয়াক্তের কাজা নামাজ আদায় করতে থাকে তবে কাজা নামাজগুলো সর্বাবস্থায় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্টিয়া নামাজ (কাজা নামাজের) আগে আদায় করে তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা কাজা নামাজগুলো অল্প-এর গণ্ডিতে এসে গেছে। আর যদি ওয়াক্টিয়াকে (কাজা নামাজের) পরে আদায় করে, তবে একই হুকুম হবে (অর্থাৎ ফাসিদ হবে) কিন্তু পরবর্তী ইশার নামাজের হুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ তা আদায় হয়ে যাবে)। কেননা তার ধারণা মতে ইশার নামাজ আদায় করার সময় তার যিখায় কোনো কাজা নামাজ ছিল না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাজা নামাজ দুই প্রকার পুরাতন কাজা, নতুন কাজা। যেমন কোনো ব্যক্তি এক মাসের নামাজ কাজা করেছে। অতঃপর হযী কর্মের প্রতি অনুতত্ত্ব হয়ে কাজা নামাজগুলো আদায় করা শুরু করেছে ওয়াক্টিয়ার মাঝে। সবগুলো কাজা আদায় করার পূর্বেই আরো কিছু নামাজ নতুন করে কাজা করেছে। তবে তা ছয় ওয়াক্তের কম। পূর্বের ফউত হওয়া নামাজকে পুরাতন কাজা আর পরবর্তীতে ফউত হওয়া নামাজকে নতুন কাজা বলা হবে। এমতাবস্থায় যদি সে ওয়াক্টিয়া নামাজ পড়ে এবং তার নতুন কাজা নামাজের কথা স্বরণ থাকে। তাহলে ওয়াক্টিয়া নামাজ জায়েজ হবে কিনা? পরবর্তী আলিমদের মতে ওয়াক্টিয়া নামাজ জায়েজ হবে। কেননা পুরাতন কাজা এবং নতুন কাজা একত্র করলে তা অধিকের পরিমাণে পৌছে। আর আধিকার তরতীবের রহিত করে দেয়। অতএব ওয়াক্টিয়া নামাজকে অগ্রবর্তী করতে কোনো অসুবিধা নেই। ফতোয়া এর উপরই। কেউ কেউ বলেছেন, নতুন কাজার পূর্বে ওয়াক্টিয়া নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই। এর দলিল হলো, সে পুরাতন কাজা আদায় করতে অলসতা করেছে। তাই শরিয়ত তাকে শাসনের জন্য পুরাতন কাজাকে শূন্য ঘোষণা করেছে মনে হয়, যেন তার দায়িত্বে তা ছিল না। সুতরাং এখন তার দায়িত্বে শুধু নতুন কাজা রয়েছে। কাজা এবং ওয়াক্টিয়ার মাঝে তরতীব ওয়াজিব। তাই ওয়াক্টিয়া নামাজকে অগ্রবর্তী করা জায়েজ নেই।

সূরতে মাসআলা, যেমন কোনো ব্যক্তির এক মাসের নামাজ ফউত হয়েছে। অতঃপর সে কাজা নামাজগুলো পড়া আরম্ভ করে দিল। অতঃপর তা ছয় ওয়াক্তের কম রয়ে গেল। তারপর সে ওয়াক্টিয়া নামাজ পড়ল, অবশিষ্ট কাজা নামাজ স্বরণ থাকা সত্ত্বেও। এমতাবস্থায় ওয়াক্টিয়া নামাজ জায়েজ হবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মুত্তাবিক জায়েজ হবে না। অন্য বর্ণনা মুত্তাবিক জায়েজ হবে। এটাই আবু হাফস কাবীর (র.), আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.), শামসুল আইযা (মুহীত প্রণেতা) (র.) এবং কাজী বান প্রমুখ ফকীহগণের মত। দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল, এই ব্যক্তির দায়িত্বে এক মাসের নামাজ ছিল। বলা বাহুল্য যে, এক মাসের নামাজ আধিকার গভী ভুক্ত। আর আধিকারের পরিমাণে পৌছালে তরতীব রহিত হয়ে যায়। এখানেও কাজা নামাজ অধিক হওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গেছে। মূলনীতি আছে السَّائِطُ الْاَرْبُ - যা একবার রহিত হয়ে যায়, তা আর ফিরে আসে না। যেমন অল্প নাপাক পানি, এই নাপাক পানি যদি প্রবাহমান

পানিতে ঢেলে দেওয়া হয় তারপর তা বেশি হয়ে যায় এবং প্রবাহিত হয় অতঃপর তা কালীল (قيل) বা কম হয়ে যায় তাহলে এই পানি নাপাক হবে না। কেননা এ পানি অধিক এবং প্রবাহমান হওয়ার কারণে এর নাপাকি দূর হয়ে গেছে। আর মূলনীতি আছে السَّائِقُ لَا يَغْتَوُّ অতএব দূর হয়ে যাওয়া নাপাকি পুনরায় আর ফিরে আসবে না। তদ্রূপ কাজা নামাজ অধিক হওয়ার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গিয়েছে। অতঃপর কাজা নামাজ কমেব গণ্ডিতে এসে গেছে। বিধায় কমেব গণ্ডির কারণে তরতীব পুনরায় ফিরে আসবে না। সুতরাং ওয়াক্টিয়া নামাজ অবশিষ্ট কাজা নামাজের অশ্রে পড়া জায়েজ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, প্রথম বর্ণনা যুক্তির দৃষ্টিকোণে এবং রিওয়াযাতের ভিত্তিতে অগ্রগণ্য। যুক্তির দৃষ্টিকোণে তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লাত (علت) বা কারণ হলো অধিকা যা জটিলতার সৃষ্টি করে। আর যেহেতু সে কাজা নামাজের অধিকাংশ আদায় করেছে। ছয় ওয়াক্টি নামাজের কম অবশিষ্ট আছে। এই জন্য তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লাত বা কারণ নেই। তাই তরতীব রহিত হবে না এবং কেননা ইল্লাত চূড়ান্ত হওয়ার দ্বারা হুকুমও চূড়ান্ত হয়; সুতরাং তারতীব পুনরায় ফিরে আসবে। তাই অবশিষ্ট কাজা নামাজের উপর ওয়াক্টিয়া নামাজকে আগে আদায় করা জায়েজ হবে না। কেননা অল্প কাজা এবং ওয়াক্টিয়া নামাজের মাঝে তরতীব ফরজ।

রিওয়াযাতের ভিত্তিতে এই মতই শক্তিশালী যে, এ ব্যক্তির ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এক দিন এক রাহের নামাজ ছেড়ে দিবে, যেমন কারো ফজর হতে ইশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্টি নামাজ ফউত হয়ে গেল তারপর আগামীকাল প্রতি ওয়াক্টিয়া নামাজের সাথে এক ওয়াক্টি কাজা নামাজ আদায় করতে লাগল। যেমন ফজরের নামাজের সময় গতকালের ফজরের নামাজ এবং যুহরের নামাজের সময়; গতকালের যুহরের নামাজ আদায় করল অনুজপভাবে অন্যান্য নামাজ আদায় করে নিল, তাহলে কাজা নামাজ হয়ে যাবে। চাই কাজা নামাজ ওয়াক্টিয়া নামাজের আগে পড়ুক বা পরে পড়ুক। পক্ষান্তরে ওয়াক্টিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে, চাই ওয়াক্টিয়া নামাজ কাজা নামাজের আগে পড়ুক বা পরে পড়ুক। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, ওয়াক্টিয়া নামাজ আগে আদায় করার সূরতে পাঁচ ওয়াক্টি ফজর হতে ইশা পর্যন্ত ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্টিয়া নামাজ পরবর্তীতে পড়ার সূরতে ইশা ব্যতীত অন্য চার ওয়াক্টি ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর ব্যাখ্যা হলো- যে ব্যক্তির ফজর হতে ইশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্টি নামাজ ফউত হয়েছে, সে পেরের দিন হতে কাজা পড়া আরম্ভ করে দিল। এভাবে আদায় করা আরম্ভ করল যে, প্রথমে ফজরের ওয়াক্টিয়া নামাজ আদায় করল, অতঃপর গতকালের ফজর আদায় করল। যেহেতু এ ব্যক্তির উপর তরতীব ওয়াজিব। এই জন্য ওয়াক্টিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে করার কারণে ওয়াক্টিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। এখন কাজা নামাজের সংখ্যা ছয় হলো গতকালের পাঁচ ওয়াক্টি এবং আজকের ফজরের এক ওয়াক্টি (মোট ছয় ওয়াক্টি) গতকালের ফজরের নামাজ আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচ হয়েছে গতকালের যুহর হতে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্টি এবং আজকের ফজর। এমনভাবেই যদি আজকের যুহর আগে আদায় করে এবং গতকালের যুহর পরে আদায় করে তাহলে আজকের যুহরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তার উপর তারতীব ওয়াজিব থাকা সত্ত্বেও সে ওয়াক্টিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে আদায় করেছে। আজকের যুহর ফাসিদ হওয়ার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ গতকালের যুহর হতে আজকের যুহর পর্যন্ত। তবে আজকের যুহরের নামাজ পড়ার দ্বারা কাযা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে যাবে। অর্থাৎ গতকালের আসর থেকে আজকের যুহর পর্যন্ত। অতঃপর যদি আজকের আসরকে প্রথমে আদায় করে তাহলে তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। বিধায় কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়াবে। তবে গতকালের আসর আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ মাগরিব হতে আসর পর্যন্ত। তারপর যদি মাগরিবের সময় ওয়াক্টিয়া নামাজকে আগে আদায় করে, তাহলে তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে মাগরিবের ওয়াক্টিয়া নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাজা নামাজের সংখ্যা ছয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ গতকালের মাগরিব হতে আজকের মাগরিব পর্যন্ত। তবে গতকালের মাগরিবের কাজা আদায় করার কারণে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে দাঁড়াল। এমনভাবেই ইশার সময় ওয়াক্টিয়া নামাজ আগে করল। বিধায় তার উপর তরতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে ইশার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই কাজা নামাজের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়ে। অর্থাৎ গতকালের ইশা হতে আজকের ইশা পর্যন্ত তবে গতকালের ইশার নামাজ আদায় করেছে এবং উহা জায়েজ হয়েছে তাহলে কাজা নামাজের সংখ্যা পাঁচে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিস্তারিত ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, যদি ওয়াক্টিয়া নামাজকে কাজা নামাজের আগে আদায় করে তাহলে ওয়াক্টিয়া নামাজ ফাসিদ হবে, তবে কাজা নামাজ জায়েজ হবে এবং ইহাও সার্বিত হয়েছ যে, যদি কাজা নামাজ ছয় ওয়াক্টির কম হয় তাহলে তারতীবের ওজুব (وجوب) পুনঃ আরোপিত হবে। এখানে একে সার্বিত করা লক্ষ্য। পক্ষান্তরে যদি ওয়াক্টিয়া নামাজ কাজা নামাজের পরে আদায় করে। তাহলে এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে- কেউ আজকের ফজরের সময় গতকালের ফজর আগে পড়েছে। তারপর আজকের ফজর পড়েছে। তাহলে গতকালের ফজর বিতন্ধ হয়েছে, তবে আজকের ফজর সহীহ হবে না। কেননা আজকের ওয়াক্টিয়া ফজরকে কাজা নামাজের আগে পড়েছে অথচ তরতীব বা ক্রম রক্ষা ওয়াজিব হওয়ার কারণে কাজা নামাজকে ওয়াক্টিয়া নামাজের আগে পড়া আবশ্যক ছিল। এভাবে অন্যান্য নামাজগুলোকে কিয়াদ করুন। তবে ইশার সময় গতকালের ইশা আগে পড়লে। তারপর আজকের ইশা পড়লে, এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, আজকের ইশা জায়েজ হবে। কেননা সে এ ধারণা আছেন যে, আমার দায়িত্বে কোনো কাজা নামাজ নেই। অথচ তার জিম্মায় আজকের চার ওয়াক্টি নামাজ কাজা আছে। এ ব্যক্তিকে এ ব্যক্তি ন্যায় ধরা হবে যে কাজা নামাজ ভুলে গিয়েছে। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, ভুলে যাওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যাবে। তাই ইশার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকবে যে, হুকুমই সময় যখন এ ব্যক্তি অজ্ঞাত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এ ব্যক্তি জ্ঞাত হয় এবং এই মাসআলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় তাহলে ইশার নামাজও জায়েজ হবে না।

وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي آخِرِ  
الْوَقْتِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّرْتِيبِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْفَرَضِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي  
حَنِيفَةَ وَأَبِي يُونُسَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَةَ عَقِدَتْ لِلْفَرَضِ فَإِذَا بَطَلَتِ  
الْفَرَضِيَّةُ بَطَلَتِ التَّحْرِيْمَةُ أَصْلًا وَلَهُمَا أَنَّهَا عَقِدَتْ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ يَوْصِفُ الْفَرَضِيَّةَ  
فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةٍ بَطْلَانِ الْوَصْفِ بَطْلَانِ الْأَصْلِ ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ فَسَادًا مُتَوَقِّفًا  
حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِيدِ الظُّهْرَ انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  
وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًا لَا جَوَازَ لَهَا بِحَالٍ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ .

**অনুবাদ :** যোহর আদায় করেনি, একথা স্বরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি আসরের নামাজ পড়ে তবে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু একেবারে শেষ ওয়াক্তে স্বরণ থাকা অবস্থায় পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। এটা তরতীব সংক্রান্ত মাসআলা। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসূফ (র.) -এর মতে (উক্ত আসরের নামাজের) ফরজগুণ নষ্ট হয়ে গেলেও মূল নামাজ বাতিল হবে না (বরং তা নফল রূপে গণ্য হবে)। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ফরযিয়াতের জন্যই নিয়ত বাধা হয়েছিল। সুতরাং যখন ফরযিয়াত বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসূফ (র.) -এর দলিল হচ্ছে- তাহরীমা বাধা হয়েছে মূলতঃ নামাজের জন্য ফরযিয়াতের গুণ সহকারে। সুতরাং ফরযিয়াতের গুণ বিনষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজ বিনষ্ট হওয়া জরুরি নয়। তবে আসর ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়। অতএব যদি যোহরের কাজা আদায় না করে ধারাবাহিক ছয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ফেলে তবে সবকিছু ওয়াক্তের নামাজই জায়েজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চূড়ান্তভাবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো অবস্থায় তা পুনঃ বৈধতা পাবে না। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েছে এবং তার স্বরণ আছে যে, সে যুহরের নামাজ পড়েনি, তা হলে তার আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি- যা তার উপর ওয়াজিব ছিল। পক্ষান্তরে যুহর পড়েনি, এ কথা স্বরণ থাকা সত্ত্বেও আসরের নামাজ যদি আসরের শেষ সময়ে পড়ে, তাহলে আসরের নামাজ জায়েজ হবে। কেননা সময়ের সংকীর্ণতার কারণে তরতীব রহিত হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন ৥** তরতীব ফউত হয়ে যাওয়ার কারণে ফরযিয়াত বাতিল হয়ে গেছে; এহেন অবস্থায় মূল নামাজও কি বাতিল হয়ে যাবে?

**জবাব :** ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসূফ (র.)-এর মতে তরতীব ফউত হওয়ার কারণে আসরের ফরজ যদিও বাতিল হয়ে যাবে; কিন্তু মূল নামাজ বাতিল হবে না; বরং তা নফল রূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফরজের গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। তাই এ নামাজ না ফরজ হিসাবে গণ্য হবে, না নফল হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত মতটেক্যের ফলাফল এই সূরতে প্রকাশ পাবে যে, এক ব্যক্তি আসরের নামাজ বেলা ডুবায়

অনেক আগেই আরম্ভ করল, এমতাবস্থায় যে, তার যুহরের কাজা ইয়াদ আছে। অতঃপর সে নামাজ অবস্থায় অট্টহাসি দিল তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে তার অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা তাঁদের (শায়খাইনের) মতে মূল নামাজ বিন্যাস আছে। আর নামাজ অবস্থায় অট্টহাসী অজুকে ভেঙ্গে দেয়। এই জন্য তাঁদের মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল নামাজ বাতিল হয়ে গেছে। তাই এ অট্টহাসি নামাজ অবস্থায় দেয় নি। আর নামাজের অবস্থা ব্যতীত অট্টহাসি অজুকে ভঙ্গ করে না। এই জন্য এ সূরতে অট্টহাসি অজুকে ভেঙ্গে দিবে না। মূল মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হচ্ছে- তাহরীমা আসরের ফরজের জন্য বাঁধা হয়েছে। অতএব যার জন্য তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল তা যখন বাতিল হয়ে গেল, তাহলে তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তাহরীমা এ বস্তুকে অর্জন করার মাধ্যম। আর যেহেতু উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে গেছে। তাই মাধ্যমও বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহরীমা বাতিল হওয়ার কারণে মূল নামাজও বাতিল হয়ে যাবে। অতএব তা ফরজ হিসাবে ও গণ্য হবে না এবং নফল হিসাবেও গণ্য হবে না।

শায়খাইনের দলিল তাহরীমা বাঁধা হয়েছে মূল নামাজের জন্য- যা ফরজের গুণে গুণান্বিত। আর তরতীব ফউত হওয়ার কারণে আসরের নামাজের ফরজ গুণ বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং ফরযিয়াতের গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নামাজ বিনষ্ট হওয়া জরুরি নয়। অর্থাৎ গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে মূল নষ্ট হওয়া জরুরি নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি আর্থিক সংকটের কারণে কসমের কাফ্যারার জন্য রোজা রাখা আরম্ভ করেছিল। অতঃপর দিনের মধ্যে সম্পদশালী হয়ে গেল। তাহলে মূল রোজা বাতিল হবে না। তবে তা কসমের কাফ্যারা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং নফল রোজা রূপে গণ্য হবে। কসমের কাফ্যারা হিসাবে গণ্য না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, মালদার ব্যক্তির জন্য কসমের কাফ্যারায় খাবার প্রদান করা বা গরিবদেরকে কাপড় দেওয়া অথবা গোলাম আজাদ করা জরুরি। উক্ত তিনটির কোনো একটি আদায় করতে সক্ষম না হলে তখন রোজা রাখার হুকুম। অতএব সে আর্থিক সংকটের কারণে কসমের কাফ্যারার রোজার দ্বারা আরম্ভ করেছিল। তবে দিনের মধ্যে রোজা অবস্থায় সে মালদার হয়েছে। তাই তার রোজার কাফ্যারার গুণ বাতিল হয়ে গেছে, তবে মূল রোজা বাতিল হয়নি। যেভাবে এখানে গুণ বাতিল হওয়ার কারণে মূল বাতিল হয়নি তদ্রূপ মতনের মাসআলার ক্ষেত্রেও ফরযিয়াতের গুণ বাতিল হওয়ার কারণে মূল নামাজ বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَصْرُ يَنْسُدُ الْخ : সূরতে মাসআলা, কোনো ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়েছে, এমতাবস্থায় যে তার শ্রবণ আছে যে, সে যোহরের নামাজ পড়েনি, তাহলে তরতীব ফউত হওয়ার কারণে তার আসরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

তবে এতে মতান্তর আছে যে, আসরের নামাজ স্থগিতাবস্থায় ফাসিদ হবে না চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হবে? ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়। তবে যদি ছয় ওয়াক্ত নামাজ আজকের আসর হতে আগামীকালের আসর পর্যন্ত পড়ে ফেলে এবং যুহরের কাজা নামাজ এখনো পড়েনি তাহলে এসব নামাজ জায়েজ হবে।

দলিল হলো : আসরের নামাজ এবং তার পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফাসিদ হওয়ার কারণ হচ্ছে তরতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা ওয়াজিব হওয়া। অর্থাৎ আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজর এবং আগামীকালের যোহর, এই জন্য ফাসিদ হবে যে, এখনো গতকালের যোহর আদায় করা হয়নি। অথচ তরতীবের দাবি ছিল প্রথমে গতকালের যোহর আদায় করা। তবে যখন সে আগামী দিনের আসর আদায় করেছে তখন মনে হয় যেন গতকালের যোহরের পরের ছয় ওয়াক্ত নামাজ ফাসিদ হয়েছে। ছয় ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা আধিক্য সাবিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজা নামাজ বেশি হওয়ার দ্বারা তরতীব রহিত হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে আগামী দিনের আসর আদায় করল। তখন কাজা নামাজের আধিক্যের কারণে তরতীব রহিত হয়ে যাবে। তাই সকল নামাজ জায়েজ হবে।

সাহেবাইনের মতে আসরের নামাজ চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনো অবস্থায়ই তা জায়েজ হবে না। এর সূরত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যোহরের নামাজ পড়েনি, তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিজ নিজ ওয়াক্তে পড়ে নিয়েছে তাহলে সাহেবাইনের দলিল, তরতীব রহিত হয়ে যাওয়ার ইল্লত (علت) বা কারণ কাজা নামাজের আধিক্য। মূলনীতি আছে যে, হুকুম ইল্লতের (علت) পরে হয়। অতএব ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাওয়ায় হুকুম হবে যখন কাজা নামাজ বেশি (ছয়) হবে। তাই যোহরের কাজা ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত যা স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়েছে, তা চূড়ান্তভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তরতীব রহিত হওয়ার ইল্লত (علت) পাওয়া যায় নি।

وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتِرْ فِيهِ فَايْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) خِلَافًا لَّهُمَا وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْوُتْرَ وَاجِبٌ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا وَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَعَلَى هَذَا إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى السُّنَّةَ وَالْوُتْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى الْعِشَاءَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَعِنْدَهُ يُعِيدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ دُونَ الْوُتْرِ لِأَنَّ الْوُتْرَ فَرَضٌ عَلَى حِدَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوُتْرَ أَيْضًا لِكُونِهِ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : বিতর পড়েনি, একথা স্বরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি ফজরের নামাজ আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ মতভিন্নতার ভিত্তি হলো এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বিতর হলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা সুন্নত। আর সুন্নত ও ফরজ নামাজসমূহের মাঝে তরতীবী জরুরি নয়। বিতরের ব্যাপারে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই এ মাসআলা রয়েছে যে, কেউ যদি ইশার নামাজ পড়ার পর পুনরায় অজু করে সুন্নত ও বিতর আদায় করে। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, ইশার নামাজ সে বিনা অজুতে পড়েছে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শুধু ইশা ও সুন্নত পুনঃ আদায় করতে হবে। কেননা বিতর ভিন্ন ফরজ। সাহেবাইনের মতে বিতরও পুনরায় পড়বে। কেননা তা ইশা এর তাবৈ (تابع) বা অনুবর্তী। আল্লাহই ভাল জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়েছে। কিন্তু সে বিতর পড়েনি। একথা তার স্বরণও আছে। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে ফাসিদ হবে না। ইমাম সাহেব এবং সাহেবাইনের মাঝে মতনৈক্যের ভিত্তি হলো যে, ইমাম সাহেবের মতে বিতরের নামাজ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা সুন্নত। ইশা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, শুধু ফরজ নামাজসমূহের মাঝে তরতীবী ওয়াজিব। সুন্নত নামাজসমূহের মাঝে ওয়াজিব নয়। যেহেতু ইমাম সাহেবের মতে বিতর ওয়াজিব এই জন্য বিতর এবং ফজরের মাঝে তরতীবী ওয়াজিব হবে। উল্লেখিত সূরতে তরতীবী না থাকার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বিতর সুন্নত। এই জন্য ফজর এবং বিতরের মাঝে তরতীবী ওয়াজিব হবে না; যদিও একথা স্বরণ থাকে যে, সে বিতর পড়েনি। এই মূলনীতির ভিত্তিতে (ইমাম সাহেবের মতে বিতর ওয়াজিব আর সাহেবাইনের মতে সুন্নত) যদি কেউ ইশার নামাজ পড়ল, তারপর অজু করে সুন্নত পড়ল এবং বিতর আদায় করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, সে বিনা অজুতে ইশার নামাজ পড়েছে। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইশার নামাজ এবং সুন্নত নামাজ উভয় কাজা করতে হবে। তবে বিতরের নামাজ কাজা করতে হবে না। বিতর এই জন্য কাজা করতে হবে না যে, বিতর ইমাম সাহেবের নিকট ওয়াজিব। তা খাফা সময়ে পবিত্রতার সাথে আদায় করেছে। কেননা ইশার সময় যতটুকু, বিতরের সময়ও ততটুকু। এ ক্ষেত্রে শুধু এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, ইশা এবং বিতরের মাঝে তরতীবী পাওয়া যায়নি। এর জবাব হলো যে, ভুলে যাওয়ার কারণে তরতীবী রহিত হয়ে গিয়েছে। অতএব বিতরের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। পক্ষান্তরে সুন্নত নামাজ এই জন্য পুনঃ আদায় করতে হবে যে, তা ফরজের তাবৈ (تابع) বা অনুবর্তী। অতএব ইশার ফরজ পুনরায় আদায় করার কারণে সুন্নতকেও পুনরায় আদায় করা জরুরি হবে। সাহেবাইনের মতে বিতর সুন্নত। আর সুন্নত ইশার তাবৈ (تابع) বা অনুবর্তী। এজন্য ইশার নামাজের সাথে বিতর পুনরায় আদায় করা জরুরি। আল্লাহই ভাল জানেন।

## بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

يَسْجُدُ لِلَّسَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ يَشْهَدُ ثُمَّ يَسْلِمُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحمہ) يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ لِلَّسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ فَتَعَارَضَتْ رَوَايَتَا فِعْلِهِ فَيَبْقَى التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ سَالِمًا وَلَآنَ سُجُودِ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ حَتَّى تَوَسَّيَ عَنِ السَّلَامِ يَنْجِيزُهُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْأُولَى بَأَنِّي يَتَسَلِّمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ صَرَفًا لِلَّسَّهْوِ الْمَذْكُورِ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالِدُّعَاءُ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ۔

### পরিশ্ছেদ : সাজদায়ে সাহব-এর বিবরণ

অনুবাদ : নামাজে কম বেশি করার কারণে (শেষ বৈঠকে) সালামের পর দু'টি সাজদায়ে সাহ করবে। অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করবে এবং সালাম ফিরাবে। ইমাম সাফেঈ (র.) -এর মতে সালামের আগে সিজদা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আগেই সিজদায়ে সাহব করেছেন। আমাদের দলিল এই যে, নবী করীম ﷺ এর বাণী-প্রতিটি সাহব (ভুল)-এর জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা- (আবু দাউদ)। আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এরপর দু'টি সিজদা করেছেন- (মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)। এখানে রাসূল ﷺ -এর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা দুটিতে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ রূপে তার বাণী গ্রহণ করা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। আর এ কারণেও যে, সিজদায়ে সাহবও এক নামাজে বারংবার হয় না। সুতরাং একে সালাম থেকে বিলম্বিত করতে হবে, যাতে সালামের ব্যাপারে ভুল হলে সাজদায়ে সাহব দ্বারা তা পূরণ হতে পারে। (সাজদায়ে সাহবও এর) উল্লিখিত সালামকে (নামাজে) পরিচিত সালামের সাদৃশ্য হিসাবে দুই সালাম সহ সিজদা করবে। এটাই বিতুদ্ধ মত। নবী করীম ﷺ -এর উপর দরুদ এবং দোয়া 'সাজদায়ে সাহব' পরবর্তী বৈঠকে পড়বে। এটাই বিতুদ্ধ মত। কেননা নামাজের শেষাংশই হলো দোয়ার প্রকৃত স্থান।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আদা নামাজ এবং কাজা নামাজের আলোচনা হতে অবসর হওয়ার পর ওয়াক্তিয়া নামাজ এবং কাজা নামাজের মাঝে সংঘটিত ত্রুটিতে লাঘবকারী জিনিসের আলোচনা করবেন অর্থাৎ সাজদায়ে সাহব আলোচনা। মুসান্নিফ (র.) সুজুদু সাহ (سجود السهر) -এর মধ্যে মুসাব্বাব (مسبب) বা হকুমকে সবব (سبب) বা কারণের দিকে ইয়াফত (اضافت) করেছেন। কেননা নামাজের মধ্যে সাহ (سهر) বা ভুলের কারণে সিজদা ওয়াজিব হয়।

প্রশ্ন : নামাজের মধ্যে সাহর জন্য দুই সিজদা নির্ধারণ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : হাকীমুল উম্মাহ আশরাফ আলী ধানবী (র.) -এর উক্তি লক্ষণীয়। প্রথম সিজদা মনকে এ কথার প্রতি সতর্ক করা যে, আমি এ মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি, আর দ্বিতীয় সিজদা এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, আমাকে এই মাটিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মুফতী জামীল আহমদ সাহেব হযরত ধানবী (র.) কর্তৃক সংকলিত "احكام اسلام عقل کی نظر میں" -এর টীকায় লেখেছেন যে, শয়তান সিজদা করতে অস্বীকার করেছে, তাকে অবমাননা করার জন্য দুই সিজদা ফরজ হয়েছে। (احكام اسلام عقل کی نظر میں) যদি নামাজের মধ্যে কোনো কম বা বেশি করে তাহলে দুটি সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। প্রকাশ্য থাকে যে, সাজদায়ে সাহব সালামের আগেও জায়েজ আছে, পরেও জায়েজ আছে, তবে রিওয়াযাতে ইখতলাফ আছে। ইমামদের মাঝে এই মত নৈকা আছে যে, সিজদা যে সাহব সালামের আগে উত্তম? না সালামের পরে উত্তম?

হান ফীদার মতে সালামের পরে সিজদায়ে সাহব উত্তম পক্ষান্তরে ইমাম সাফেঈ (র.) -এর মতে সালামের পূর্বে উত্তম। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজে কোনো কিছু কম করে, তাহলে সিজদায়ে সাহব সালামের পূর্বে করবে। আর যদি কোনো কিছু বেশি করে, তাহলে সালামের পরে সাজদায়ে সাহব করবে।



ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, রাসূল ﷺ থেকে যেসব স্থানে সালামের আগে সাজদায়ে সাহব করা সারিত আছে, সেখানে আগে করবে। আর যেখানে রাসূল ﷺ থেকে সালামের পরে সাজদায়ে সাহব করা সারিত আছে, সেখানে পরে করবে। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল, রাসূল ﷺ সাজদায়ে সাহব সালামের পূর্বে করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মালিক (র.)-এর সূত্রে সিহা সিহায়ে (صحااح) বর্ণিত হাদীস, বুখারী শরীফের শব্দ নিম্নরূপ-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَظْهَرَ فَنَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَنَاءَ الثَّالثِ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى النَّاسَ تَسْلِيمَهُ كَبِيرٌ وَهُوَ جَالِسٌ فَجَدَّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلِمَ.

অর্থ- রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ পড়লেন, প্রথম দুই রাকআতে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর সাথে লোকেরাও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যখন নামাজ সমাপ্ত করার উপক্রম হলেন, তখন লোকেরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলেন। রাসূল ﷺ বসে বসে তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদা দিলেন। এ হাদীস দ্বারা জনা গেল যে, সাজদায়ে সাহব সালামের পূর্বে হয়।

হানাফীদের দলিল - রাসূল ﷺ -এর বাণী السَّلَامُ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ - প্রতিটি সাহব না ভুলের জন্য সালামের পরে দুটি সিজদা - (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

দ্বিতীয় দলিল হলো হাদীসে ফেলী (রাবু'ল ফেলী) রাবু'ল সালামের পরে দুটি সিজদা করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দু'টি ফেলী হাদীসের মাঝে পরস্পর বিরোধ। তাই এ দু'টি ছেড়ে দিয়ে কওলী হাদীস (قولی) -এর উপর আমল করা হবে। রাসূলে ﷺ -এর হাদীস আছে যে সাজদায়ে সাহব-এর দু'টি সিজদা সালামের পরে।

হানাফীদের যুক্তি হলো, আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে সাজদায়ে সাহব-এর مكرر বা দ্বিত্ব হয় না। সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহব করার সূরতে تَكَرَّرٌ বা বারংবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার সূরত এই যে, সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহব করল তারপর যখন সালাম ফিরানোর সময় আসল তখন তার সংশয় হলো যে, নামাজ তিন রাকআত হলো নাকি চার রাকআত হলো? এ চিন্তায় রত থাকার কারণে সাজদায়ে সাহব-এর দ্বিত্ব হলো। অতঃপর স্মরণ আসল যে, (নামাজ) চার রাকআত হয়েছে। এমতাবস্থায় সালাম বিলম্ব করার কারণে পুনরায় সাজদায়ে সাহব করতে হবে। এখন পুনরায় সাজদায়ে সাহব করবে কিনা? দুই সূরত - এক, যদি দ্বিতীয় বার সাজদায়ে সাহব না করে, তাহলে নামাজে ত্রুটি থেকে যায়, যা লাঘব করা হচ্ছে না বা দূর করা হচ্ছে না। আর যদি দ্বিতীয় বার সিজদা করে তাহলে সাজদায়ে সাহব مكرر বা দ্বিত্ব হচ্ছে যা আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত নয়। অন্য এটাই যুক্তিসঙ্গত সালামের পর সাজদায়ে সাহব করবে, যাতে সমূহ ভুলের লাঘব হয়। সাজদায়ে সাহব-এর পূর্বে দুই দিকে সালাম ফিরাবে না এক দিকে সালাম ফিরাবে? এক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থকারের নিকট বিতর্ক মত হলো যে, দুই দিকে সালাম ফিরাবে। শামসুল আইহা সারাখসী (র.), সদরুল ইসলাম (র.) এবং ফকীহ আবুল লাইস (র.)-এর মত অনুরূপ। তবে শাইখুল ইসলাম খাযারযাদা (র.), আত্মা ফখরুল ইসলাম (র.) এবং ইয়াহ গ্রন্থের প্রণেতা প্রমুখ ফকীদের নিকট প্রাধান্য হলো শুধু ডানে সালাম ফিরাবে।

হিদায়া গ্রন্থকারের মতের দলিল : হাদীসে যেখানে সালাম শব্দ উল্লেখ হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুপরিচিত সালাম, আর সুপরিচিত সালাম উভয় দিকে ফিরানো অতএব দুই দিকে সালাম ফিরানো জরুরি।

শাইখুল ইসলাম খাযারযাদা এবং অন্যান্য ফকীহদের মতের দলিল : সালামের দুটি হুকুম একটি হলো কওমের জন্য অভিনন্দন আর দ্বিতীয়টি নামাজ হতে تحليل বা হালাল হওয়ার জন্য। বাহা বাল্হা যে, تحليل বা হালাল হওয়ার মধ্যে তাকরার (تَكَرَّر) বা দ্বিত্ব নেই। অতএব সালামের তাকরারের কোনো প্রয়োজন নেই। ডান দিকে সালাম ফিরানোই যথেষ্ট। দরুদ এবং দু'আয়ে মাসূরা হয়তো নামাজের বৈঠকে পড়বে অথবা সাজদায়ে সাহব-এর বৈঠকে পড়বে। নামাজের বৈঠক দ্বারা সাজদায়ে সাহব-এর পূর্বের বৈঠক আর সাজদায়ে সাহব-এর বৈঠক দ্বারা সাজদায়ে সাহব-এর পরের বৈঠক উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (র.) বলেছেন যে, উভয় বৈঠকে দরুদ এবং দু'আ মাসূরা পড়বে। পক্ষান্তরে এর মামু মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সাজদায়ে সাহব-এর পরের বৈঠকে পড়বে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এটাই বিতর্ক মত।

ইমাম তাহাবী (র.) স্বীয় মতের সমর্থনে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যে বৈঠকের শেষে সালাম আছে সেখানে দরুদ পড়া হবে। এই মূলনীতির আলোকে উভয় বৈঠকে (সাজদায়ে সাহব-এর পূর্বে ও পরে) দরুদ পড়া হবে। কেননা উভয় বৈঠকের শেষে সালাম আছে।

শায়খাইনের দলিল, দরুদ এবং দু'আ মাসূরা শেষ বৈঠকে পড়া হয়। যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। তার সাজদায়ে সাহব-এর জন্য প্রদত্ত সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। তাহলে নামাজের বৈঠকই শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু এ সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয় না বরং সাজদায়ে সাহব পরবর্তী সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। এই সাজদায়ে সাহব এর বৈঠকই শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে। নামাজের বৈঠক শেষ বৈঠক হিসাবে গণ্য হবে না। আর দরুদ এবং দোয়ার স্থান হলো নামাজের শেষে, এ জন্য সাজদায়ে সাহব এর বৈঠকে দরুদ এবং দোয়া পড়বে নামাজের বৈঠকে পড়বে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।

قَالَ وَيَلْزَمُهُ السَّهْوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جَنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَجْدَةَ السَّهْوِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصَانِ تَمَكُّنٍ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِبَةً كَالِدِمَاءِ فِي الْحَيِّ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ سَاهِيًا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا وَجِبَتْ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لَا تَعْرِى عَنْ تَأْخِيرِ رُكْنٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ قَالِ وَيَلْزَمُهُ إِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِعْلًا وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِتَسْمِيَّتِهِ سُنَّةً أَنْ وَجُوبَهَا بِالسُّنَّةِ . قَالَ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ أَوْ تَكْيِيزَاتِ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاضْبَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً وَهِيَ لِمَا رَأَى الْجُوبِ وَلِأَنَّهَا تَضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَوَةِ فَدَلَّ أَنَّهَا مِنْ خَصَائِصِهَا وَذَلِكَ بِالْجُوبِ ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ يَحْتَمِلُ الْقَعْدَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ وَفِيهَا سَجْدَةُ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِيحُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে যদি এমন কোনো কাজ বৃদ্ধি করে যা নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজ ভুক্ত নয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহব আবশ্যক হবে। আবশ্যক শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব। এটাই বিদ্বক্ত মত। কেননা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় ইবাদতে সৃষ্ট ফ্রটির ক্ষতি পূরণ করার জন্য। সুতরাং সেটা ওয়াজিবই হবে। যেমন হজের ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। যখন এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো তখন ভুলে কোনো ওয়াজিব তরক করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা কোনো রোকন বিলম্বিত করার কারণেই শুধু সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই মূল নীতি। অতিরিক্ত কোনো কাজ যুক্ত হওয়ার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, তা কোনো রোকন বিলম্বিত হওয়া বা কোনো ওয়াজিব তরক হওয়া থেকে মুক্ত নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, যদি কোনো মাসনুন আমল তরক করে তাহলে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। সম্ভবতঃ এখানে মাসনুন দ্বারা ওয়াজিব আমল বুঝানো হয়েছে তবে মাসনুন বলার কারণ, এই আমল ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম কুদূরী বলেন, যদি কেউ ফাতিহা পড়া তরক করে। কেননা তা ওয়াজিব। অথবা দোয়ায় কুতূব, তাশাহহুদ বা দুই ঈদের তাকবীরসমূহ তরক করে। কেননা এগুলোও ওয়াজিব। কেননা রাসূল ﷺ একবারও তরক না করে এগুলো অব্যাহতভাবে পালন করেছেন। আর এটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত। সর্বোপরি এ সমস্ত আমলকে পুরা নামাজের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। আর এ সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাজের সাথে বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হয় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে। তাশাহহুদ শব্দের দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এই সবই ওয়াজিব। আর তাতে সাজদায়ে সাহব আবশ্যক। এটাই বিদ্বক্ত মত।

## প্রামাণিক আলোচনা

অনুচ্ছেদের শুরুতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজে কম বা বেশি করার কারণে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়; কিন্তু একথা বর্ণনা করা হয়নি যে, কোন ধরনের কম বা বেশি করাটা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব করে; এখন এর বাখায-বিশ্লেষণ আরম্ভ করা হচ্ছে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে যদি এমন কোনো কাজ অতিরিক্ত করে ফেলে, যা নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজভুক্ত নয়। তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। যেমন এক রাকআতে দুইটি রুকু করল অথবা তিনটি সিজদা করল, একটি রুকু এবং একটি সিজদা অতিরিক্ত করল। এ দুটো যদিও নামাজ জাতীয় কিন্তু নামাজের অংশ নয়। অর্থাৎ অতএব যদি এক রুকুর স্থানে দুই রুকু করল অথবা দুই সিজদার স্থানে তিন সাজদা করল, তাহলে এই অতিরিক্তের কারণে তার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মাতিন (ماتن) -এর কওল **وَيُزْمَعُ السُّجُودُ إِذَا زَادَ** -এর দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। ওয়াজিব হওয়ার মতই বিতর্ক। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মতও অনুরূপই। পক্ষান্তরে হানফীদের কোনো আলিম যেমন আবুল হাসান কারখী (র.) -এর মতে সাজদায়ে সাহব দৃঢ়। বিতর্ক মতের দলিল হলো যে, সাজদায়ে সাহব নামাজে সৃষ্ট ত্রুটি ক্ষতি পূরণ করার জন্য ওয়াজিব হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সাজদায়ে সাহব-এর দ্বারা ত্রুটি পূর্ণ না হয়, তাহলে নামাজ পুনরায় আদায় করা জরুরি হবে, যাতে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়। যেহেতু ত্রুটি ক্ষতিপূরণ করার জন্য নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব অতএব সাজদায়ে সাহব ও ওয়াজিব হবে। কেননা উহা দ্বারাও ত্রুটি পূর্ণ হয়। সাজদায়ে সাহব-এর উদাহরণ হলো যেমন হজে ত্রুটি করলে দম ওয়াজিব হয় অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় কোনো জেনায়েত করলে হজে ত্রুটি আসে। আর ঐ ত্রুটির ক্ষতি পূর্ণ দম বা কুরবানি দ্বারা হবে। তাই যেভাবে হজে ত্রুটির কারণে দম বা কুরবানী ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ নামাজেও সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। কিন্তু গ্রন্থকার বলেছেন সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব। আর তা কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা কোনো ওয়াজিব অথবা কোনো রুকন আদায় করতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়। ওয়াজিব তরক করার উদাহরণ, যেমন- প্রথম বৈঠক তরক করা অথবা দুই ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ (تَكْبِيرَاتُ زَوَائِدٍ) তরক করা (তবে যদি দুই ঈদের নামাজে প্রচণ্ড ভিড় হয় তবে সাজদায়ে সাহব করা হবে না)। ওয়াজিব বিলম্ব করার উদাহরণ, যেমন- পঞ্চম রাকআত নামাজের জন্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেল এবং এ দ্বারা সালাম ফিরাতে বিলম্ব হলো। আর সালাম ফিরানো নামাজে ওয়াজিব। কোনো রুকন বিলম্ব করার উদাহরণ যেমন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়া আরম্ভ করল। তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানো ফরজ, এতে বিলম্ব হলো। মোটকথা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি হচ্ছে নিম্নোক্ত তিনটি বস্তু- ওয়াজিব তরক করা, অথবা ওয়াজিব বিলম্ব করা, অথবা রুকন বিলম্ব করা।

**قَوْلُهُ وَارْتَا وَجَبَتْ بِالرَّيْبِ إِذَا الْخ** -এর দ্বারা গ্রন্থকার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। গ্রন্থকার বলেছেন যে, ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় অথবা ওয়াজিব বিলম্ব করার দ্বারা ওয়াজিব হয় অথবা রুকন বিলম্ব করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। কিন্তু অতিরিক্ত করার দ্বারা ওয়াজিব তরকও হয় না এবং বিলম্বও হয় না। অতএব অতিরিক্ত করার সূরতে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব না হওয়া উচিত। অথচ অনুচ্ছেদের প্রথমে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত করার দ্বারা ও সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়।

**জবাব :** অতিরিক্ত করার দ্বারাও রোকন তরক হয় অথবা ওয়াজিব তরক হয়। যেমন তিন সিজদা করার দ্বারা কিয়াম (قيام) যা ফরজ তা আদায় বিলম্ব হয়ে যায়। আর যদি ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং একে সিজদার সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে হুকুম হলো এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলানো যাতে চার রাকআত ফরজ আর দু' রাকআত নফল হয়। আপনি লক্ষ্য করুন এ দুই রাকআত অতিরিক্ত করার কারণে চার রাকআতের মাধ্যমে সালাম ফিরানো ওয়াজিব ছিল, তা তরক হয়ে গেছে। এর দ্বারা সাবিত হয় যে অতিরিক্ত করাটাও রুকন বিলম্ব অথবা ওয়াজিব তরক হওয়াকে আবশ্যিক করে।

**قَوْلُهُ قَالَ وَزُيْمَ إِذَا تَرَكَ الْخ** : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন যে, যদি মুসল্লী কোনো মাসনুন আমল তরক করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, মতনে (مَنْ) মাসনুন আমল দ্বারা ওয়াজিব আমল উদ্দেশ্য। কেননা মাসনুন আমল তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় না; বরং ওয়াজিব তরক করার দ্বারা (সাজদায়ে সাহব) ওয়াজিব হয়।

প্রশ্নঃ তাহলে মতনে ফেলে মামনুন কেন বলা হল?

উত্তরঃ একথা বুঝানোর জন্য যে সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হওয়াটা সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

الْحَقُّ أَن تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ : উক্ত ইবারতে এসব জিনিসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলো তরক করার কারণে সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হয়। যেমন তিনি বলেছেন, নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দেওয়াটা সাজদায়ে সাহ্‌কে ওয়াজিব করে। কেননা নামাজে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তবে এ কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হয় না। কেননা শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর একটি বর্ণনা আছে যে, শেষ দুই রাকআতেও সূরা ফাতিহা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হয়।

বিতরের নামাজে দোয়ায় কুনূত ছেড়ে দেওয়া। তাশাহুদ ছেড়ে দেওয়া এবং দুই ঈদের তাকবীর ছেড়ে দেওয়া সাজদায়ে সাহ্‌কে ওয়াজিব করে। দলিল হলো যে, উক্ত তিনটি বস্তু ওয়াজিব। আর ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হয়। অতএব এগুলো তরক করার দ্বারাও সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হবে। উক্ত জিনিসগুলো ওয়াজিব হওয়ার দলিল হল, রাসূল ﷺ : এগুলো অব্যাহতভাবে পালন করেছেন, কখনো ছেড়ে দেননি। আর রাসূল ﷺ : -এর কোনো আমল তরক না করে অব্যাহতভাবে পালন করাটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত।

দ্বিতীয় দলিল হলো, এসব আমলকে পুরা নামাজের সাথে সম্বন্ধ করা হয় যেমন বলা হয়ে থাকে কুনূতুল বিতর (فوتت) তাকবীরাতু সালাতিল ঈদাইন (تَكْبِيرَاتُ صَلَاتِ الْعِيدَيْنِ) তাশাহুদে সালাত (تشهد صلاة)। আর এই সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাজের সাথে বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য সাবিত হওয়া ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, আবুল হাসান কুদুরী (র.) এখানে তাশাহুদ শব্দ উল্লেখ করেছেন। তাশাহুদ শব্দটি প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠক এবং তাশাহুদ পাঠ করা এই সবগুলোর ক্ষেত্রে বলা হয়। আর এই সবগুলোর প্রতিটি ওয়াজিব আমল। এগুলো তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব হবে এটাই সহীহ মত।

প্রশ্নঃ হিদায়ার এই ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন “كُلُّ ذَالِكٍ رَائِبٌ” ঐ সবগুলো ওয়াজিব” এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষ বৈঠকও ওয়াজিব অথচ শেষ বৈঠক ওয়াজিব নয় বরং শেষ বৈঠক ফরজ, যা তরক করার দ্বারা নামাজই ফাসিদ হয়ে যায়।

জবাবঃ ইবারতে তাখসীস (تخصيص) বা ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ শেষ বৈঠক ব্যতীত প্রতিটিই ওয়াজিব। দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে যে, শেষ বৈঠক তরক করার দ্বারা উদ্দেশ্য তা বিলম্বে আদায় করা যেমন কেউ শেষ বৈঠক না করে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাড়িয়ে গেল। তারপর পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করে বৈঠকের দিকে ফিরে আসল তাহলে সাজদায়ে সাহ্ করে নামাজ পূর্ণ করবে। কেননা বিলম্ব করাটাও এক ধরনের তরক করা। এ জন্য বিলম্বে তরক-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يَخَافُ أَوْ خَافَتْ فِيمَا يَجْهَرُ تَلَزَمَهُ سَجْدَتَا السُّهُوِّ لِأَنَّ الْجَهْرَ فِي مَوْضِعِهِ وَالْمَخَافَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَاخْتَلَفَ الرَّوَاةُ فِي الْمِقْدَارِ وَالْأَصَحُّ قَدْرًا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي الْفَضْلَيْنِ لِأَنَّ السَّيْرَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءَ لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ وَعَنِ الْكَثِيرِ مُمَكِّنٌ وَمَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ كَثِيرٌ غَيْرُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَبَدٌ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثُ آيَاتٍ وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْمُتَفَرِّدِ لِأَنَّ الْجَهْرَ وَالْمَخَافَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْجَمَاعَةِ -

অনুবাদ : আর চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে ইমাম যদি উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়েন অথবা উচ্চৈঃশব্দে কিরাআতের ক্ষেত্রে যদি চুপে চুপে পড়েন, তাহলে এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। বিতর্কতম মত হলো— যে পরিমাণ কিরাআত দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় উভয় ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ বিবেচ্য। কেননা সামান্য পরিমাণ উচ্চৈঃশব্দে বা চুপে চুপে পাঠ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর যে পরিমাণে নামাজ শুদ্ধ হয় সেটাই হলো অধিক। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে সেটা হলো এক আয়াত, আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। এটা হল ইমামের ক্ষেত্রে একা নামাজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পাঠ ও চুপে চুপে কিরাআত পাঠ জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে কেউ যদি চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়ে অথবা উচ্চৈঃশব্দে কিরাআতের ক্ষেত্রে চুপে চুপে পড়ে তাহলে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, উক্ত সুরতদ্বয়ে সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন যে, যদি চুপে চুপে কিরাআতের ক্ষেত্রে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়ে তাহলে সালামের পর সাজদায়ে সাহব করবে, আর যদি উচ্চৈঃশব্দে কিরাআতের ক্ষেত্রে চুপে চুপে কিরাআত পড়ে তাহলে সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহব করবে। ইমাম আহমদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, যদি উক্ত সুরতগুলোতে সিজদায়ে সাহব করে তাহলে ভাল। আর যদি সাজদায়ে সাহব না করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল আবু কাতাদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস **إِنَّ السَّجْدَةَ كَأَنَّ يَسْمَعُنَا آيَةً** (র.)-এর অর্থ— রাসূল ﷺ আমাদেরকে জোহর এবং আসরের নামাজে একটি, দুটি আয়াত শুনাতে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যুহর এবং আসরে চুপেচুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। যেহেতু উক্ত নামাজদ্বয়ে কিরাআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব নয়। তাহলে রাতের নামাজে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়া কিভাবে ওয়াজিব হবে? উচ্চৈঃশব্দে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। তাই তা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাও সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। —(আল-কিফায়)

উত্তর : আমাদের পক্ষ হতে জবাব হলো যে, রাসূল ﷺ জোহর এবং আসরে এ জন্য উচ্চৈঃশব্দে কিরাআত পড়ছেন যে, লোকেরা যেন অবগত হয় যে, জোহর এবং আসরের নামাজেও কিরাআত পড়া শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। রাসূল ﷺ এর এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়নি।

আমাদের দলিল হলো— যেসব নামাজে কিরাআত উচ্চৈঃশব্দে পড়া হয় সেগুলোতে কিরাআত উচ্চৈঃশব্দে পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব। যাতে ইমামের কিরাআত মুকতাদীও শ্রবণ করে। আর ইমামের কিরাআতই মুকতাদীর কিরাআতের স্থলাভিষিক্ত বা স্থলবর্তী হয়। আর দিনের নামাজে ইমামের উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া এ জন্য ওয়াজিব যে, চুপে চুপে কিরাআত পড়া মূলত অনুমোদিত হয়েছে, যাতে কাম্বিনদের বিভ্রান্তি হতে পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন আমরা জানি যে, রাসূল

চুপে চুপে কিরাআত পড়ার নির্দেশ ঐ সময় প্রদান করেছেন যখন কাফির বা রাসূল ﷺ-কে তিলাওতের সময় বিভ্রান্তিত ফেলতে চেষ্টা করেছিল। এ কারণে দিনের নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে রাত্রের নামাজে (চুপে চুপে কিরাআত পড়া) ওয়াজিব নয়। কেননা রাত্রে তারা শায়িত অবস্থায় পড়ে থাকে। মোটকথা হলো দিনের নামাজে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে চুপে চুপে কিরাআত অনুমোদিত হয়েছে। এরূপ নামাজে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। যেহেতু চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়া আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়া ওয়াজিব। তাই তা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়।

**প্রশ্ন :** উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে কি পরিমাণ চুপে চুপে পড়লে, আর চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে কি পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়লে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়।

**উত্তর :** এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে, যাহিরুর রিওয়ায়েতে আছে যে, উভয় সূরতে কম (فليل) বা বেশির (كثير) একই হুকুম অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের স্থানে চুপে চুপে পড়ল অথবা চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়ল চাই পারমাণ কম হোক বা বেশি হোক, উভয় সূরতে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, বিতুদ্ধ মত হলো এই যে, যে পরিমাণ কিরাআত পড়া দ্বারা নামাজ বিতুদ্ধ হয় ঐ পরিমাণ চুপে চুপে পড়া, অথবা উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কারণে উভয় সূরতে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি দিনের নামাজে مَاجُوزِيه الصَّلَاةُ যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় ঐ পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়ল অথবা রাত্রের নামাজে ঐ পরিমাণ চুপে চুপে পড়ল তাহলে (উভয় সূরতে) সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে এবং চুপিসারে অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। এ জন্য সাজদায়ে সাহব এর হুকুম অধিক পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। অল্প পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত নয়। যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় তা কাসীর (كثير) বা অধিক আর যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয় না তা কালীল (فليل) বা কম।

**প্রশ্ন :** مَاجُوزِيه الصَّلَاةُ (যে পরিমাণের দ্বারা নামাজ জায়েজ হয়) এর পরিমাণ কতটুকু?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে মতাতৈক্য আছে— ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এক আয়াত। আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, চুপে চুপে কিরাআতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পড়ার কারণে, আর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার স্থানে চুপে চুপে কিরাআত পড়ার কারণে ইমামের উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ যদি ইমাম এরূপ করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি এরূপ করে তাহলে তার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। দলিল এই যে, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ এবং চুপে চুপে কিরাআত পাঠ জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যদি কেউ একাকী নামাজ পড়তে চায় তবে তার ইখতিয়ার আছে, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে পারে অথবা চুপে চুপে কিরাআত পড়তে পারে। একা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উপর উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া এবং চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব নয়। তাই তা তরক করার দ্বারা সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে ইমামের উপর তা ওয়াজিব এজন্য তা তরক করলে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

**প্রশ্ন :** জাহরী নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআতের ওজুব (وجوب) টি জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য। এটা স্বীকৃত, কেননা জাহেরী (جهرى) নামাজে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে পারে অথবা চুপে চুপে কিরাআত পড়তে পারে। পক্ষান্তরে সিররী (سرى) নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়ার ওজুব (وجوب) টি জামাআতের নামাজের বৈশিষ্ট্য হওয়াটা স্বীকৃত নয়। কেননা সিররী নামাজে একাকী ব্যক্তির জন্য চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। অতএব সিররী নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়া তরক করার কারণে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উপরও সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হওয়া চাই। অথচ হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না।

**উত্তর :** ইহা নাওয়াদির (نواذير) গ্রন্থের বর্ণনা অর্থাৎ সিররী নামাজে মুন্ফারিদ (منفرد)-এর উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এটা নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা। পক্ষান্তরে যাহিরুর রিওয়ায়েত মুতাবিক মুন্ফারিদদের উপর চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা দিনে কিরাআত চুপে চুপে পড়া এ জন্য ওয়াজিব ছিল, যাতে কাফিরদের পক্ষ থেকে সূচি ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, কাফিরদের পক্ষ হতে ভ্রান্তি ঐ সময় সূচি হবে যখন নামাজের ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে মুন্ফারিদ-এর নামাজ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আদায় হয় না, এজন্য তার জন্য চুপে চুপে কিরাআত পড়া ওয়াজিব হবে না। বরং তার ইখতিয়ার আছে সিররী নামাজে চুপে চুপে কিরাআত পড়তে পারে অথবা উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়তে পারে। ইখতিয়ারের কারণে চুপে চুপে কিরাআত পড়া দ্বারা তার (মুন্ফারিদ) উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না।—(ইনশা'আল্লাহ)

قَالَ وَسَهْرُ الْإِمَامِ يَوْجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ لِتَقَرُّرِ السَّبَبِ الْمَوْجِبِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ وَلِهَذَا يُلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِقَامَةِ بَيْنِيَّةِ الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا وَمَا التَّزَمَ الْأَدَاءُ إِلَّا مُتَابِعًا فَإِنْ سَهِيَ الْمُؤْتَمُّ لَمْ يُلْزَمِ الْإِمَامُ وَلَا الْمُؤْتَمُّ السُّجُودَ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ وَحْدَهُ كَانَ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ وَلَوْ تَابَعَهُ الْإِمَامُ يَنْقَلِبُ الْأَصْلُ تَبَعًا -

**অনুবাদ :** ইমাম কুদুরী বলেন, ইমামের ভুল মুক্তাদীর উপর সাজদা (সাহুব) ওয়াজিব। কেননা যায় উপর নামাজে নির্ভরশীল (ইমাম) তার উপর সিজদা (সাহুব) ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এজন্যই মুক্তাদীর উপর মুকীম হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায় ইমামের নিয়তের কারণে। আর যদি ইমাম সিজদা না করে তাহলে মুক্তাদীও সিজদা করবে না। কেননা সে এমতাবস্থায় ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যাবে। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে নামাজ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আর যদি মুক্তাদী ভুল করে তবে ইমাম এবং সেই মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে (সাহুব) ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি সে একা সিজদা করে, তবে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি ইমাম মুক্তাদীর অনুসরণ করে, তাহলে যে অনুসরণীয়, সে অনুসরণকারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** ইমামের কোনো ভুল হলে, ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হবে। কেননা ইমামের উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব করার কাজটি মুক্তাদীর ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা মুক্তাদী নামাজ সহীহ হওয়া, ফাসিদ হওয়া এবং মুকীম হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অতএব ইমামের ভুলের কারণে ইমামের নামাজে যে ত্রুটি এসেছে, ঐ ত্রুটি মুক্তাদীর নামাজেও এসেছে। ইমামের নামাজের ত্রুটি পূরণ করার জন্য যেকোন সিজদায় সাহুব করতে হয় তদ্রূপ মুক্তাদীর ক্ষেত্রেও নামাজের ত্রুটি পূরণ করার জন্য সিজদায়ে সাহুব করা জরুরি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, মুক্তাদীর নামাজ ইমামের নামাজের তাবো (تابع) বা অনুবর্তী, এই জন্য যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় মুসাফির হয় এবং নামাজের মাঝে ইমাম ইকামতের নিয়ত করে, তাহলে সকল মুক্তাদীর রুবায়ী (رباعی) নামাজ চার রাকআত পড়তে হবে। যদিও মুক্তাদীরা নিয়ত না করে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন যে, সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি ইমাম সিজদায়ে সাহুব আদায় না করে, তাহলে মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহুব করা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহুব করা ওয়াজিব হবে; যদিও ইমাম সিজদায়ে সাহুব না করে। আমাদের দলিল হলো, ইমাম সিজদায়ে সাহুব না করার অবস্থায় যদি মুক্তাদী সিজদায়ে সাহুব করে, তাহলে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যায়। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে নামাজ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সারকথা হলো, মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারপর ইমামের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। অনুসরণ এবং বিরুদ্ধাচারণের মাঝে বৈপরীত্য। অতএব মুক্তাদীর সিজদায়ে সাহুব-এর কারণে বিরুদ্ধাচারণ সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই এ অবস্থায় মুতাবায়াত (متابعة) থাকতে পারবে না।

মুত্তাদীর সিজদায়ে সাহুব-এর কারণে বিরুদ্ধাচারণ সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই এ অবস্থায় মুতাবায়াত (متابعة) থাকতে পারবে না।  
**মুত্তাদীর সিজদায়ে সাহুব-এর কারণে বিরুদ্ধাচারণ সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই এ অবস্থায় মুতাবায়াত (متابعة) থাকতে পারবে না।**  
 বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ভুলে গেল তাহলে এর কারণে ইমাম এবং মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হবে না। কেননা নামাজ বিতাক এবং ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের নামাজ মুক্তাদীর নামাজের উপর নির্ভরশীল নয়। ইমামের নামাজে ত্রুটি না হওয়ার কারণে তার উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হয় নি, অতএব মুক্তাদীর উপরও সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হয় তাহলে সে একা সিজদা সাহুব করবে অথবা তার ইমামও তার সাথে সিজদায়ে সাহুব করবে। প্রথম সূরতে ইমামের বিরুদ্ধাচারণ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় সূরতে উক্টা হয়ে যায় অর্থাৎ ইমাম বা অনুসরণীয় ব্যক্তি, অনুসরণকারীতে পরিণত হয় আর মুক্তাদী বা অনুসারী, সে অনুসরণীয় হয়ে যায়। এ দুটিই নাজাজেজ। তাই মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সাহুব ওয়াজিব হবে না।

وَمَنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى حَالَةِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشْهَدُ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ ثُمَّ قَبْلَ يَسْجُدَ لِلْسَّهْوِ لِلتَّأْخِيرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ كَمَا إِذَا لَمْ يَقُمْ وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّهُ كَالْقَائِمِ مَعْنَى وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ . وَإِنْ سَهَى عَنِ الْقَعْدَةِ الْآخِرَةِ حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِأَنَّ فِيهِ إِضْلَاحٌ صَلَاحٌ وَأَمْكَنُهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفِضِ قَالَ وَالْفَى الْخَامِسَةَ لِأَنَّهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلُّهُ قَبْلُهَا فَيَرْتَفِضُ وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ لِأَنَّهُ آخَرٌ وَاجِبٌ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি মুক্তাদী প্রথম বৈঠক ভুলে যায়, পরে বসার অধিকতর নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তাহলে সে ফিরে এসে বসে যাবে এবং তাশাহুদ পড়বে। কেননা যা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। কারো কারো মতে এমতাবস্থায় বিলম্ব জনিত কারণে সিজদায়ে সাহব করবে। কিন্তু বিতর্কিত মত হচ্ছে—সিজদায়ে সাহব করবে না। যেমন না দাঁড়ালে সিজদা করতে হয় না। পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ানো অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তাহলে (বৈঠকের দিকে) ফিরে আসবে না। কেননা প্রকৃত পক্ষে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতোই এবং এ অবস্থায় সে সিজদায়ে সাহব করবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে। আর কেউ যদি শেষ বৈঠক ভুলে যায়, এমন কি পঞ্চম রাআকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা এই ফিরে আসার মধ্যে তার নামাজের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব। কেননা যা এক রাআকাতের কম, তা পরিহারযোগ্য। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, পঞ্চম রাআকাত বাতিল করে দিবে। কেননা সে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে—যার স্থান উক্ত রাআকাতের পূর্বে। সুতরাং তা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহব করবে। কেননা সে ওয়াজিব বিলম্বিত করেছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কেউ সূলাসী (ثلاثي) - তিন রাআকাত, রুবাযী (رباعي) - চার রাআকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম বৈঠক ভুলে যায়; অতঃপর স্মরণ হয় তবে এর দুটি সূরত—একটি হচ্ছে সে হয়তো বসার অধিকতর নিকটবর্তী হবে এর নিরূপণের সূরত হচ্ছে যে, সে হাটু জমিন থেকে উঠায়নি। দ্বিতীয় সূরত হচ্ছে যে, সে দাঁড়ানো অবস্থার অধিক নিকটবর্তী হবে। যেমন সে হাটু জমিন থেকে উঠিয়ে নিয়েছে।

প্রথম সূরত যে ফিরে এসে বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়বে। কেননা যে বস্তু কোনো বস্তুর নিকটবর্তী, তা ঐ বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। যেমন—জুমুআর নামাজ এবং দুই ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে শহরতলীকে শহরের হুকুমে গণ্য করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : কারো কারো মতে সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। এতে বিলম্ব হয়েছে। তবে বিতর্কিত মত হলো সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। কেননা যা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী তাকে ঐ বস্তুর হুকুমে গণ্য করা হয় অতএব মনে করা হবে যে, সে দাঁড়ায়নি এবং প্রথম বৈঠক ছেড়ে না দাঁড়ানোর কারণে, তার প্রথম বৈঠকে বিলম্বও হয়নি। সুতরাং তার উপর সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না।



দ্বিতীয় সূরতে সে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে না; বরং তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, সে কোনো জিনিসের নিকটবর্তী, তা এ জিনিসের হুকুমে গণ্য হয়। এ ব্যক্তি মোহেত্ব কিয়ামের নিকটবর্তী তাই তাকে কিয়ামের হুকুমে গণ্য করা হবে। আর দাঁড়ানো বা গণ্যমান ব্যক্তির জন্য প্রথম বৈঠকের দিকে ফিরে যাওয়া জায়েজ নেই কেননা তৃতীয় রাকআতের কিয়াম ফরজ আর প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিবের কারণে ফরজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। তবে এই সূরতে প্রথম বৈঠক তরক করার কারণে সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যায় এবং রুবায়ী (رباعی) নামাজে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে দায় অথবা ছুলাহী (ثلاثی) নামাজে (মাগরিব, বিতর) চতুর্থ রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় অথবা সুনায়ী (ثنائی) বা দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাজে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে রুবায়ী নামাজে পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। দলিল হচ্ছে— বৈঠকের দিকে ফিরে আসার মধ্যে তার নামাজের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব, কেননা যা এক রাকআতের কম, তা ছেড়ে দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এক রাকআতের কম حقیقة বা প্রকৃত অর্থে নামাজ হয় না এবং حکماً বা হুকুমের দিক থেকেও নামাজ হয় না। এই কারণে যদি কেউ কসম খায় যে, আমি নামাজ পড়ব না তারপর যদি এক রাকআতের কম পড়ে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

পঞ্চম রাকআতের ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী বলেছেন যে, একে বাতিল করে দিবে। কেননা সে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরেছে। আর শেষ বৈঠকের স্থান পঞ্চম রাকআতের পূর্বে। এ ক্ষেত্রে এর মূলনীতি হচ্ছে— যে ব্যক্তি নামাজের কোনো কর্ম থেকে এমন জিনিসের দিকে ফিরে যাবে যার স্থান এর পূর্বে, তাহলে তা (مرجوع عنه) আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। যেমন— কেউ তাশাহহুদ পরিমাণ বসল তারপর স্মরণ হলো যে, সে সিজদা করেনি অথবা সিজদায়ে তিলাওয়াত করেনি, তারপর ফউত হওয়া সিজদা আদায় করল, তাহলে তার সিজদা করার পূর্বের বৈঠক বাতিল হয়ে যাবে; কেননা সিজদার স্থান শেষ বৈঠকের পূর্বে ছিল। মোটকথা পঞ্চম রাকআত ছেড়ে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে। তখন তার উপর ওয়াজিব সিজদায়ে সাহব করা এবং ফরজ এবং ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে। ফরজে বিলম্ব এভাবে হয়েছে যে, শেষ বৈঠকে বিলম্ব হয়েছে। আর শেষ বৈঠক ফরজ। আর ওয়াজিব বিলম্ব হয়েছে এভাবে যে, সালাম শব্দ বলা ওয়াজিব। আর তা নির্ধারিত সময়ে হতে বিলম্বিত হয়েছে।

হিদায়ার ইবারত لانه اخر واجب -এর মধ্যে ওয়াজিব (واجب) শব্দ তার সুপরিচিত অর্থ— ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর واجب قطعى ফরজও উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হলে সালাম বিলম্বিত হওয়া মুরাদ হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হলে শেষ বৈঠক বিলম্বিত করা উদ্দেশ্য হবে।

وَأَنَّ قَبْدَ الْخَامِسَةِ بِسَجْدَةٍ بَطُلٌ فَرَضَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ  
شُرُوعَهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ اكْمَالِ أَرْكَانِ الْمَكْتُوبَةِ وَمِنْ ضَرُوبِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرِيضِ  
وَهَذَا لِأَنَّ الرُّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَوةٌ حَقِيقَةٌ حَتَّى يَخِثَّ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يَصِلُ  
وَتَحَوَّلَتْ مَلَاتُهُ نَفْلًا عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَأَبْنَى يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ عَلَى مَا مَرَّ -  
فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رُكْعَةً سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَأَشَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ  
فَرَضُهُ بِوَضْعِ الْجَنْبَةِ عِنْدَ ابْنِ يُوسُفَ لِأَنَّهُ سَجُودٌ كَامِلٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ لِأَنَّ  
تَمَامَ الشَّيْءِ يَأْخِرُهُ وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَمْ يَصِغْ مَعَ الْحَدِيثِ وَثَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا  
سَبَقَهُ الْحَدِيثُ فِي السُّجُودِ بَنَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِابْنِ يُوسُفَ .

অনুবাদ : আর যদি পঞ্চম রাকআতের এক সিজদাও করে ফেলে তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হবে। ইমাম শাফেঈ (র.) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আমাদের দলিল হচ্ছে- ফরজ নামাজের রুকনসমূহ পূর্ণ করার পূর্বেই সে তার নফল নামাজের আরম্ভকে পোক্ত করে নিয়েছে। আর এটার অবশজাবী দাবি হলো, ফরজ থেকে বের হয়ে আসা। এর কারণ হচ্ছে- ‘এক সিজদাসহ রাকআত আদায়কে প্রকৃত অর্থেই নামাজ বলে গণ্য করা হয়। তাই “নামাজ পড়বে না।” বলে কসমের বেলায় এক সিজদা সহ এক রাকআত আদায় করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তার এই নামাজ নফলে পরিণত হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কাজা নামাজ অধ্যায়ে এটা আলোচিত হয়েছে। সূত্রাং উক্ত রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। যদি কোনো রাকআত যুক্ত না করে, তাহলে তার উপর (সিজদায়ে যে সাহব বা কাজা) কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা ধারণা বশীভূত কাজ। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা ই পূর্ণ সিজদা। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাথা উঠানোর পর তা বাতিল হবে। কেননা কোনো কিছু পূর্ণতা লাভ করে শেষাংশের মাধ্যমে। আর তা হলো মাথা উঠানো। অতএব হাদাস (حدث) অবস্থায় মাথা উঠানো বিবৃদ্ধ হবে না। মতভিন্নতার ফলাফল প্রকাশ পাবে সিজদার মধ্যে হাদাস দেখা দিলে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে বিনা (بإساءة) করবে আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বিনা করতে পারবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা : যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের সিজদা করে ফেলে। তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন যে, তার ফরজ বাতিল হবে না। বরং সে বসার দিকে ফিরে আসবে এবং তাশাহুদ পড়বে এবং সিজদায়ে সাহব করে সালাম ফিরাবে। এ হুকুম ঐ সময় যখন ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং শেষ বৈঠক না করে থাকে, তাহলে আমাদের মতে এ সূরতেও পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করলে তার নামাজ ফাসিদ হবে না যেমন ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে নামাজ ফাসিদ হয় না। তবে ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, যখনই ইচ্ছাকৃত ভাবে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল তখনই তার নামাজ ফাসিদ হয়ে গেল। সারকথা হচ্ছে- এই মাসআলায় আমাদের এবং শাফিঈ মতাবলম্বীদের মাঝে দুই স্থানে ইখতিলাফ আছে-

এক ভুলে যদি চার রাকআতের স্থানে পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে, তাহলে আমাদের মতে পঞ্চম রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে পঞ্চম রাকআতকে ছেড়ে দিবে। যেমন- এক রাকআতের কম নামাজকে ছেড়ে বসার দিকে ফিরে আসে।

দুই. এক রাকআতের কম ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত করা হলো তাহলে আমাদের মতে নামাজ ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে নামাজ ফাসিদ হবে।

যদি পঞ্চম রাকআতের জন্য ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের জন্য সিজদা করে নেয়, তাহলে আমাদের মতে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে তার ফরজ বাতিল হবে না।

ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলির **صَلَّى الظُّهْرَ خَسًا** রাসূল ﷺ যুহরের নামাজ পাঁচ রাকআত পড়েছেন। এ কথা বর্ণিত নেই যে, রাসূল ﷺ চার রাকআতের মাথায় বৈঠক করেছেন এবং ইহাও বর্ণিত নেই যে, তিনি এ নামাজ পুনরায় আদায় করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো- ঐ ব্যক্তি ভুলের ফলে নামাজে এমন জিনিস বৃদ্ধি করেছে, যা নামাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার নামাজ ফাসিদ হবে না। যেমন- এক রাকআতের কম অথবা অধিক করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না।

আমাদের দলিল হলো- ঐ ব্যক্তি সিজদাসহ পঞ্চম রাকআত আদায় করার কারণে উক্ত নামাজ নফলে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ এখনো তার ফরজ নামাজের আরকান পূর্ণ হয়নি। কেননা শেষ বৈঠক ফরজ তা, সে আদায় করেনি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ফরজ নামাজের আরকান পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে নফল নামাজের আরম্ভ পোক্ত করে ফলেছে, তাই তার ফরজ ফাসিদ হয়ে গেছে। এর কারণ হলো- ফরজ এবং নফলের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। দুটি বিপরীত বস্তুর একটি নফল হওয়ার কারণে অপর (ফরজ) টি শেষ হয়ে গিয়েছে।

হিনায়া গ্রন্থকার বলেন যে, সিজদা ছাড়া রাকআত প্রকৃত পক্ষে কোনো নামাজই নয়। কারণ সিজদার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে নামাজের অস্তিত্ব হয়। যেমন কেউ কসম খেল যে, **وَاللَّوْ لَا أَصَلَّى** আত্মার কসম আমি নামাজ পড়ব না, তাহলে এক রাকআত সাজদার সাথে পড়ার দ্বারাও তার শপথ ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন যে, পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার কারণে ফরজ বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে- শায়খাইনের মতে ফরজ হওয়ার গুণ বাতিল হয়েছে। আর মূল নামাজ বাকি আছে।

অর্থাৎ উক্ত নামাজের ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নফল হিসাবে বাকি থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল নামাজই বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ যে নামাজ শেষ বৈঠক ছাড়া পড়া হয়েছে; তা ফরজ হিসাবে গণ্য হবে না এবং নফল হিসাবেও গণ্য হবে না। উভয় দলের দলিল কাজা নামাজের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, শায়খাইনের মতে গুণ নষ্ট হওয়ায় মূল নষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুণনষ্ট হওয়াটা মূল নষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে।

ইমাম শাফেঈ (র.) কর্তৃক জবাব হলো যে, ইনায়্যা গ্রন্থকার বলেছেন, যে রাসূল ﷺ চতুর্থ রাকআতের মাথায় শেষ বৈঠকে বসেছেন, এ কায়ার দলিল হচ্ছে- হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন **صَلَّى الظُّهْرَ خَسًا** যুহর বলা হয় সমস্ত আরকানকে, আর সমস্ত আরকান বৈঠকও অন্তর্ভুক্ত আছে। আর পঞ্চম রাকআতের জন্য রাসূল ﷺ এই ধারণায় দাঁড়িয়ে গেছেন যে, ইহা তৃতীয় রাকআত। সুতরাং হাদীসের এই বাখ্যার পর এ হাদীসটি ইমাম শাফেঈ (র.)-এর দলিল হিসাবে গণ্য হবে না।

**كَوْنَهُ نَبْطُمُ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادَةَ الْغ** পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন পঞ্চম রাকআতের সিজদা করল তখন শায়খাইনের মতে তার ফরজ নামাজ নফলে পরিণত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ফরজ নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূলতঃ নামাজই বাতিল হয়ে যাবে। শায়খাইনের মতে মূল নামাজ নষ্ট না হওয়ার কারণে পঞ্চম রাকআতের সাথে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত করবে। যাতে নফল নামাজ জোড় হয় বিজোড় না হয়। কেননা নফল নামাজ জোড় অনুমোদিত হয়েছে। বিজোড় অনুমোদিত হয় নি।

**প্রশ্ন :** এমতাবস্থায় তার উপর সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে কি না?

**জবাব :** কারো মতে সিজদায়ে সাহব করবে। কিন্তু বিতর্কিত মত হলো সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। কেননা শেষ বৈঠক না করার কারণে তার নামাজ ফাসিদ হয়ে গেছে। ফাসিদ হওয়ার কারণে যে ক্রটি হয়েছে তা সিজদায়ে সাহব দ্বারা পূরণ হবে না।

সূতরাং সিজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। কেননা সিজদায়ে সাহব ক্রটি পূরণ করার নিমিত্তে অনুমোদিত হয়েছে এবং যদি সে ষষ্ঠ রাকআত যুক্ত না করে, তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা পঞ্চম রাকআতের নামাজটি ধারণাবশীভূত।

অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে নফল শুরু করেনি। এর কারণ এই যে, সে একে (পঞ্চম রাকআতকে) ৪র্থ রাকআত মনে করে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম রাকআত মনে করে দাঁড়ায়নি। মোটকথা হচ্ছে— পঞ্চম রাকআত হতে আরম্ভকৃত নামাজ হচ্ছে— **مظنون** বা ধারণা বশীভূত। আর **مظنون** টা **غير مضمون** (মূল আলোচনার বহির্ভূত) হয়। সুতরাং ঐ নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে না।

**لَمْ يَسْطِرْ** এর দ্বারা এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যখন পঞ্চম রাকআতের সিজদা করল, তখন ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। তবে সিজদার সূচনা হলো জমিনে কপাল রাখা। আর সিজদার শেষ হলো জামিন থেকে মাথা উঠানো।

প্রশ্ন : জমিনে কপাল রাখার দ্বারাই কি ফরজ বাতিল হবে না জমিন থেকে মাথা উঠানোর দ্বারা?

জবাব : হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটাই পূর্ণ সিজদা। প্রকৃত পক্ষে সিজদা বলা হয় জমিনে কপাল রাখা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, মাটি থেকে মাথা উঠানোর পর তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কোনো বস্তুর পূর্ণতা তার পরিসমাপ্তি দ্বারাই হয়ে থাকে। আর এর শেষ হচ্ছে— মাথা উঠানো। কাজেই যখন মাটি হতে মাথা উঠাবে তখনই সিজদা পূর্ণ হবে। আর যখন মাথা উঠানো দ্বারা সিজদার পূর্ণতা পেল, তখন মাথা উঠানোর পরেই ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। এর পূর্বে বাতিল হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) স্বীয় মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত বাক্য **لَمْ يَصِغْ مَعَ الْحَدِيثِ** দ্বারা দলিল দিয়েছেন অর্থাৎ হাদাস (حدث) অবস্থায় মাথা উঠানো বিতর্ক হয়নি। সারকথা হলো যে, যে রুকনে হাদাস পাওয়া যায় ঐ রুকন পুনরায় আদায় করা জরুরি বা ওয়াজিব। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা সিজদাপূর্ণ হয় না। মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা সিজদাপূর্ণ হলে হাদাস পাওয়ার সূরতে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হতো না। কেননা হাদাস আসার পূর্বেই সিজদা পূর্ণ হয়েছে। মোটকথা, ইহা সাবিত হলো যে, মাটি হতে কপাল উঠানোর দ্বারা সিজদা পূর্ণ হয়। মাটিতে মাথা রাখার দ্বারা পূর্ণ হয় না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানৈক্যের ফলাফল ঐ সূরতে প্রকাশ পাবে যে, ঐ ব্যক্তির পঞ্চম রাকআতের সিজদায় হাদাস (حدث) হল এবং সে অজ্ঞ করতে গেল এখন তার স্মরণ হলো যে, সে চতুর্থ রাকআতের পরে শেষ বৈঠক করেনি তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অজ্ঞ করবে এবং শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে যাবে এবং ফরজ নামাজ এভাবে পূরা করবে যে, তাশাহুদ পড়বে, সিজদায়ে সাহব করবে এবং সালাম ফিরাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট মাটি হতে মাথা উঠানোর পূর্বে সিজদা পূর্ণ হবে না এবং হাদাসের সাথে মাথা উঠানো বিতর্ক নয়। অতএব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ সিজদা নির্ভরযোগ্য হয়নি। আর যেহেতু সিজদাই ধর্তব্য হয়নি, তাই সে যেন পঞ্চম রাকআতকে সিজদার সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। আর যখন পঞ্চম রাকআতকে সিজদার সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি, তাই তার ফরজ বাতিল হবে না। অতএব ফরজ বাতিল না হওয়ার কারণে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে যাবে এবং ফরজ পূরা করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্বীয় নামাজের উপর বিনা করবে না। কেননা তাঁর মতে কপাল মাটিতে রাখার দ্বারাই সিজদা পূর্ণ হয়ে যায়। আর পঞ্চম রাকআতের সিজদা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার ফরজ বাতিল হয়ে গেল। যেহেতু তার ফরজই বাতিল হয়ে গেল তাই বিনা করা জায়েজ হবে না। কেননা বাতিল জিনিসের উপর বিনা করা যায় না।

وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْلَمْ عَادَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدَ لِلْخَامِسَةِ  
وَسَلَّمَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَأَمَّا كُنْهُ الْإِقَامَةِ عَلَى وَجْهِهِ  
بِالْفَعُولِ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ بِمَحَلِّ الرَّفِضِ وَإِنْ قَعَدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ صَمَّ  
إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَتَمَّ قَرَضُهُ لِأَنَّ الْبَاقِيَ إِصَابَةُ لَفْظَةِ السَّلَامِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَلِأَمَّا بِضَمِّ  
إِلَيْهَا أُخْرَى لِتَصِيرِ الرَّكْعَتَيْنِ نَفْلًا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَجْزِيهِ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
عَنِ التَّبَيُّرَاءِ ثُمَّ لَا تَتَوَيَّانِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمُوَاطَّظَةَ عَلَيْهَا  
يَتَحَرِّمُ مَبْتَدَأَةً .

অনুবাদ : আর যদি চতুর্থ রাকআতের পর বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে পঞ্চম রাকআতের সিজদা না করা পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করা বিধি সম্মত নয়। আর বৈঠকে ফিরে এসে বিধি সম্মতভাবে সালাম ফিরানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যা এক রাকআতের কম, তা পরিহারযোগ্য। আর যদি পঞ্চম রাকআতে সিজদা করার পর স্মরণ হয় (যে সে পঞ্চম রাকআত অতিরিক্ত করেছে) তাহলে তার সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে নিবে, এতে তার ফরজ পূরা হয়ে যাবে। কেননা এখন শুধু সালাম শপথি বাকি আছে। আর তা হচ্ছে ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে এ ক্ষেত্রে আরেক রাকআত এ জন্য মিলাবে, যাতে দুই রাকআত নফল হয়। (আর চার রাকআত ফরজ হয়, যদি চতুর্থ রাকআতের মাথায় বসে।) কেননা এক রাকআত নামাজ জায়েজ নেই। রাসূল ﷺ এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করে। তবে এ দুই রাকআত মোহরের পরবর্তী দুই রাকআত সন্নতের স্থলবর্তী হবে না। ইহাই বিতুদ্ধ মত। কেননা রাসূল ﷺ থেকে নতুন তাহরীমা দ্বারা এর উপর নিয়মিত আমল রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা : যদি মুসল্লী চতুর্থ রাকআতে তাশাহুদ পরিমাণ বৈঠক করে এবং সালাম না ফিরিয়ে ভুলে চতুর্থ রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাহলে পঞ্চম রাকআতের সিজদার পূর্ব পর্যন্ত সে বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে। তবে বৈঠকের দিকে ফিরে আসার পর তাশাহুদ পুনরায় পড়বে না। বরং সিজদায়ে সাহু করবে সালাম ফিরাবে। নকলী দলিল হচ্ছে— একবার রাসূল ﷺ পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এ জন্য পশ্চাত থেকে তাসবীহ দ্বারা তাকে অবগত করলেন তখন তিনি বৈঠকের দিকে ফিরে গেলেন। তখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং সাজ্জাদে সাহু করলেন। আকলী দলিল হলো— দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরানো শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। আর এখানে অনুমোদিত পদ্ধতিতে সালাম ফিরানো সম্ভব। তা এভাবে যে, বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : এই সূরতে পঞ্চম রাকআত বর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে।

উত্তর : পঞ্চম রাকআতের সিজদা করার পূর্বে তা এক রাকআতের কম হয়। আর যা এক রাকআতের কম তা বর্জন করলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো নামাজের এক রাকআতে আছে, এখনো সিজদা করেনি। এমতাবস্থায় মুয়াজ্জিন তাকবীর বলা আরম্ভ করল, তাহলে ঐ ব্যক্তির উচিত ঐ রাকআত ছেড়ে জামাআতের নামাজে শরিক হওয়া।

**প্রশ্ন :** এক রাকআতের কম নামাজ কেন বর্জন করা হবে?

**জবাব :** এক রাকআতের সিদ্ধা করলে এবং এক রাকআত পূরা করলে। তা নামাজের হুকুমে গণ্য হলো, আর নামাজকে বাতিল করা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ অর্থ- তোমরা স্বীয় আমল বাতিল কর না। তবে সিদ্ধা করার পূর্ব পর্যন্ত ঐ রাকআত অসম্পূর্ণ (ناقص) তা নামাজের হুকুমে গণ্য নয়। অতএব উহা বাতিল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা উহা لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ -এর আওতা ভুক্ত হবে না।

যদি পঞ্চম রাকআতের সিদ্ধা করার পর স্বরণ হয় (যে, সে পঞ্চম রাকআত অতিরিক্ত করেছে) তাহলে তার সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে নিবে। এহেন অবস্থায় ফরজ পূরা হয়ে যাবে। দুই রাকআত নফল হবে, আর চার রাকআত ফরজ হয়ে যাবে। ফরজ এ জন্য পূর্ণ হবে যে, আমাদের নিকট সালাম শব্দ দ্বারা নামাজ থেকে ফারিগ হওয়া ওয়াজিব। আর এই সুরতে শুধু সালাম বাকি আছে। বলা বাহুল্য যে, ওয়াজিব তরক করার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হয় না। সুতরাং ঐ সুরতে ফরজও ফাসিদ হবে না। ওয়াজিব তরকের ক্রটি সাজদায়ে সাহ্ দ্বারা পূরণ হবে।

ইমাম শাফেঈ (র.) বলেছেন, এমতাবস্থায় যদি ষষ্ঠ রাকআত যোগ করে তাহলে তার ফরজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ঐ সুরতে সে অন্য নামাজের দিকে চলে গেছে। অথচ সালাম শব্দ এখনো বাকি আছে। আর সালাম শব্দ ইমাম শাফেঈ (র.) -এর মতে ফরজ। বলা বাহুল্য যে, ফরজ তরক করার দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যায়। অতএব ঐ সুরতেও নামাজ বাতিল বা ফাসিদ হয়ে যাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, ষষ্ঠ রাকআত যোগ করার হুকুম এ জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে দুই রাকআত নফল হয়। কেননা রাসূল ﷺ বিচ্ছিন্ন এক রাকআত নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই এক রাকআত নামাজ পড়া জায়েজ নেই। ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে যেহেতু এক রাকআত নামাজ পড়া জায়েজ আছে এ জন্য তাঁর মতে ষষ্ঠ রাকআত যোগ করার তেমন প্রয়োজন নেই।

ইমাম কুদুরী (র.) -এর ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, ষষ্ঠ রাকআত যোগ করা ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব অথবা জায়েজ। তবে মবসূত (مبسوط) -এর ইবারত হলো এই- عَلَىٰ أَنْ يُضَيَّفَ শব্দটি ওয়াজিব করা জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং মবসূত (مبسوط) -এর ইবারত ওয়াজিব বুঝাবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ দুই রাকআত অর্থাৎ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাকআত যোহর পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নতের স্থলবর্তী হবে না। এটিই বিসৃদ্ধ মত। তবে কারো কারো মত হলো যে, এই দুই রাকআত জোহর পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নতের স্থলবর্তী হবে। বিসৃদ্ধ মতের দলিল এই যে, রাসূল ﷺ জোহর পরবর্তী সুন্নত নিয়মিতভাবে নতুন তাহরীমা দ্বারা আদায় করতেন। প্রথমোক্ত সুরতে নতুন তাহরীমা পাওয়া যায়নি তাই তা জোহর পরবর্তী সুন্নতের স্থলবর্তী হবে না।

وَيَسْجُدُ لِلَّهِوَ اسْتِحْسَانًا لِيَتَمَكَّنَ التَّقْصَانِ فِي الْفَرَضِ بِالْخُرُوجِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ وَفِي التَّنْفِيلِ بِالْخَوْلِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ وَلَوْ قَطَعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إِنْسَانٌ فِيهِمَا يَصِلِي سِتًّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) لِأَنَّهُ الْمُؤَدَّى يَهْدِيهِ التَّحْرِيمَةُ وَعِنْدَهُمَا رَكَعَتَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ خُرُوجَهُ عَنِ الْفَرَضِ وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْمُقْتَدِي لَاقْضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) إغْتِبَارًا بِالْإِمَامِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يَقْضَى رَكَعَتَيْنِ لِأَنَّ السُّقُوطَ يَعَارِضُ يَخْصُ الْإِمَامَ.

অনুবাদ : আর ভুলের জন্য সিজদা করবে। এটা সূক্ষ্ম কiyাসের দাবি। কেননা সুন্নত তরীকার বিপরীতে (ফরজ হতে) বের হওয়ার কারণে ফরজে ক্রটি হয়েছে। আর সুন্নত তরীকার বিপরীত (নফল নামাজে) দাখিলের কারণে নফল নামাজেও ক্রটি হয়েছে। এহেন অবস্থায় সে যদি আর এই নফল নামাজ ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর কাজা আবশ্যক হবে না। কেননা এ রাকআতটা ধারণা বশীভূত।

এ রাকআতদ্বয়ে কেউ যদি তার সাথে ইকতেদা করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে ছয় রাকআত পড়বে। কারণ এ তাহরীমা দ্বারা ছয় রাকআত আদায় করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে দুই রাকআত আদায় করবে। কেননা ফরজ হতে তার বের হয়ে আসা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুক্তাদী যদি এই নামাজ ফাসিদ করে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইমামের উপর কiyাস করে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে (মুক্তাদীকে) দুই রাকআত কাজা করতে হবে। কেননা عارض (বিশেষ কারণে) এর কারণে কাজা রহিত হওয়ার বিষয়টি ইমামের সাথে খাস।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা : যদি কোনো মুসল্লী চার রাকআতের মাথায় তাশাহুদ পরিমাণ বসে, তারপর ভুলে পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং (পঞ্চম রাকআতের) সিজদা করে, তাহলে এর হুকুম হলো, এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলাবে। এমতাবস্থায় প্রথম চার রাকআত ফরজ হবে এবং পরের দুই রাকআত নফল হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, সাজদায়ে সাহব-এর হুকুম সূক্ষ্ম যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় সাধারণ যুক্তির দাবি হলো যে, সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে না। কেননা সালাম দেওয়া ওয়াজিব। যা তরক করে দিয়েছে এবং মুসল্লী পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর দ্বারা ফরজের থেকে নফলের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে যে, যে নামাজে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়েছে ঐ নামাজে তা আদায় করা ওয়াজিব। অন্য নামাজে তা (সাজদায়ে সাহব) আদায় করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এখানে যদি সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে সাজদায়ে সাহব তো ওয়াজিব হয়েছে ফরজে আর তা আদায় করা হচ্ছে নফল নামাজে। এটা জায়েজ নেই। অতএব যুক্তির আলোকে প্রমাণ হলো যে, তার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব নয়।

সূক্ষ্ম যুক্তি : সূক্ষ্ম যুক্তি বুঝার পূর্বে উপলব্ধি করতে হবে যে, এখানে ফরজ এবং নফল উভয়ের মধ্যে ক্রটি অনুপ্রবেশ করেছে : ফরজ এভাবে যে, চার রাকআতের পর সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। অথচ সে সালাম তরক করে দিয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব তরক করার কারণে ফরজে ক্রটিযুক্ত হলো। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নফলে এভাবে ক্রটি হয়েছে যে, তার মতে নফল নামাজ নতুন তাহরীমা দ্বারা শুরু করা ওয়াজিব, আর এই ব্যক্তি তা তরক করেছে। সারকথা হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সালাম শব্দ তরক করার কারণে ফরজ ক্রটিযুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নফলের মধ্যে নতুন তাহরীমা না পাওয়ার কারণে নফল ক্রটিযুক্ত হয়েছে।

এই ভূমিকার পর আমাদের বক্তব্য হলো যে, উক্ত সূরতে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী। কেননা ইমাম মুহাম্মদ মতে ফরজ ক্রটি পাওয়া গিয়েছে এবং সে ফরজ নামাজ হতে নফল নামাজের দিকে ধাবিত হয়েছে। সাধারণ যুক্তির দাবি হলো যে, ফরজ নামাজের ক্ষতি নফল নামাজের দ্বারা পূরণ হবে। এর উদাহরণ এরূপ যে, এক ব্যক্তি এক সালামে ছয় রাকআত নফল পড়া শুরু করল। তারপর প্রথম দুই রাকআতে ২ রকদায়ে সাহব ওয়াজিব হলো, তাহলে নামাজের শেষে সাজদায়ে সাহব আদায় করবে। যদিও নফলের প্রতি দুই রাকআত ভিন্ন। স্বতন্ত্র নামাজ। কিন্তু একই তাহরীমার কারণে ছয় রাকআত একই নামাজ হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যেহেতু নতুন তাহরীমা না পাওয়ার কারণে নফল ক্রটি যুক্ত হয়েছে, তাই তার মতে সাধারণ যুক্তি এবং সূক্ষ্ম যুক্তি উভয়ের আলোকে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, যদি এ ব্যক্তি এ নফল নামাজ ভেঙ্গে দেয় যেমন পঞ্চম রাকআত পূর্ণ করার পর নামাজ ভেঙ্গে দিল, তাহলে তার উপর এ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেছেন যে, এ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে।

মূল ইখতিলাফ (اختلاف) হলো! যদি কোনো নামাজ বা রোজা সন্দেহের ভিত্তিতে শুরু করে, তাহলে তা আমাদের মতে ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ওয়াজিব হবে। কেননা সে ফরজের ধারণা করে পঞ্চম রাকআত শুরু করেছে অথচ তার দায়িত্বে কোনো ফরজ অবশিষ্ট নেই। সুতরাং আমাদের মতে এরূপ শুরু করার দ্বারা নফল ওয়াজিব হবে না বিধায় তা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে কাজাও ওয়াজিব হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যেহেতু সন্দেহের ভিত্তিতে নফল শুরু করলে তা ওয়াজিব হয়, তাই তা ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে কাজা ওয়াজিব হবে। **وَلَا يُؤْتِيهِمْ إِيْمَانًا** যিহাদে বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এ দুই (পঞ্চম ও ষষ্ঠ) রাকআতে এ ব্যক্তির ইক্তেদা করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ মুসরী ছয় রাকআত নামাজ পড়বে। অর্থাৎ যদি পঞ্চম রাকআতে ইক্তেদা করে, তাহলে ইমাম সালাম ফিরানোর পর আরো চার রাকআত পড়বে। আর যদি ষষ্ঠ রাকআতে ইক্তেদা করে, তাহলে ইমাম নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আরো পাঁচ রাকআত পড়বে। তা এভাবে যে, আরো এক রাকআত পড়ে বৈঠক করবে, তারপর দুই রাকআতের মাথায় বৈঠক করবে, অতঃপর দুই রাকআত পড়ে শেষ বৈঠক করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল, এ মুক্তাদী ইমামের তাহরীমার সাথে নামাজ শুরু করেছে। সুতরাং যে পরিমাণ নামাজ ইমাম আদায় করেছে, ঐ পরিমাণ নামাজ মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু ইমাম ছয় রাকআত নামাজ আদায় করেছে, সুতরাং মুক্তাদীর উপরও ছয় রাকআত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে শায়খাইনের মতে এ মুক্তাদী শুধু দুই রাকআত নামাজ পড়বে।

শায়খাইনের দলিল, ইমাম যখন পঞ্চম রাকআতের জন্য দাঁড়াল তখন ইমাম সাহেবের ফরজ নামাজ থেকে বের হওয়া সুনিশ্চিত হল, আর ফরজ নামাজ থেকে বের হওয়া নিশ্চিত হওয়ার কারণে তার (ইমামের) ফরজের তাহরীমা বাতিল হয়ে গিয়েছে। কেননা একই সময়ে দু'টি ভিন্ন নামাজের তাহরীমায় অবস্থান করা সম্ভব নয়। সারকথা হলো যে, ফরজের তাহরীমা ছিন্ন হয়ে নফলের তাহরীমা শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ মুক্তাদী নফলের তাহরীমায় ইক্তেদা করেছে। সুতরাং তার উপর এই দুই রাকআত নফল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

**قَوْلُهُ وَأَنفَدَهُ الْمَقْصُودُ الْخ** এই ইবারতের সারকথা হলো যে, যদি কোনো ব্যক্তি পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাকআতে ইমামের ইক্তেদা করার পর ঐ নামাজকে ফাসিদ করে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঐ মুক্তাদীর উপর ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ঐ মুক্তাদীর উপর ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল যে, তিনি মুক্তাদীর অবস্থাকে ইমামের অবস্থার উপর কিয়াস (তুলনা) করেছেন। কয়েক লাইন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি ইমাম দুই রাকআত ফাসিদ করে দেয়, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হয় না। ইমামের অবস্থার উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে যে, মুক্তাদীর উপর ঐ দুই রাকআতের কাজা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল, যুক্তির (কিয়াসের) দাবি ছিল যে, ইমামের উপর কাজা ওয়াজিব হওয়া। কেননা ইমামও পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাকআত (নফল) শুরু করার পর তা বাতিল করে দিয়েছে। সুতরাং এ সূরতে ইমামের উপরও কাজা ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটি বাধার কারণে ইমামের নামাজের কাজা রহিত হয়ে গেছে। আর এ বাধা বা প্রতিবন্ধক হচ্ছে যে, ইমাম ফরজ নামাজ আদায় করার নিয়তে নফল শুরু করেছে। এ প্রতিবন্ধক ইমামের সাথে নির্দিষ্ট (নির্দিষ্ট) ব্যক্তি যে জিনিস ইমামের সাথে নির্দিষ্ট না অন্যের প্রতি সম্প্রসারিত হবে না এই প্রতিবন্ধকের কারণে ইমামের দায়িত্ব থেকে কাজা রহিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে মুক্তাদীর ক্ষেত্রে এ প্রতিবন্ধক নেই। সুতরাং তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে।



অনুবাদ : জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ল আর তাতে ভুল করল এবং সাজদায়ে সাহব করল। অতঃপর (একই তাহরীমার দ্বারা) আরও দুই রাকআত পড়ার ইচ্ছা করল তাহলে (পরবর্তী রাকআত দ্বয়ের উপর) সে বিনা (بِئْسَ) করতে পারবে না। কেননা তখন সালাতের মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহব বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুসাফির যদি সাজদায়ে সাহব করার পর মুকীম হওয়ার নিয়ত করে তাহলে সে (পূর্ববর্তী রাকআত দ্বয়ের উপর পরবর্তী রাকআতের) বিনা করতে পারবে। কেননা মুসাফির যদি বিনা না করে তাহলে তার সম্পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও যদি সে (পরবর্তী দুই রাকআত নফল) আদায় করে, তাহলে তার তাহরীম নামাজ থাকার কারণে তা সহীহ হবে। কিন্তু সাজদায়ে সাহব বাতিল হয়ে যাবে। এটিই বিতুদ্ধ মত। (সুতরাং শেষে পুনঃ সাজদায়ে সাহব আদায় করে নিবে)।

সূরতে মাসআলা, কোনো ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ল এবং তাতে কোনো ভুল করল এবং ভুলের কারণে সাজদায় সাহব করল, অতঃপর ইচ্ছা করল যে, ঐ দুই রাকআতের সাথে (একই তাহরীমায় দ্বারা) আরও দুই রাকআত পড়বে। তাহলে তার বিনা করা জায়েজ হবে না; বরং প্রথম দুই রাকআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে নতুন তাহরীমা বেঁধে দুই রাকআত পড়ে নিবে। এক্ষা স্বরণ রাখা আশংক্য যে, সাজদায় সাহব নামাজের শেষাংশে অনুমোদিত নামাজের দুই তফআ (انفع) এর মাঝখানে অনুমোদিত নয়। দলিলের কারণে বারকথা হলো যে, এমতাবস্থায় সাজদায় সাহব করার পর যদি শেষের দুই রাকআতের বিনা করা হয় তাহলে তা বিনা প্রয়োজনে সাজদায় সাহবকে বাতিল করে দিচ্ছে। কেননা সাজদায় সাহব নামাজের মাঝখানে পতিত হয়েছে। অথচ নামাজের মাঝে সাজদায় সাহব অনুমোদিত নয়; বরং নামাজের শেষাংশে অনুমোদিত। বিনা প্রয়োজনের কথা আমরা এ জন্য বর্ণিচ্ছি যে, যদি এ ব্যক্তি পরবর্তী দুই রাকআত নতুন তাহরীমা দ্বারা আদায় করে বিনা করা ছাড়া, তাহলে তা জায়েজ হবে। এ জন্য বিনা করে সাজদায় সাহবকে বাতিল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে হ্যাঁ একথা বলা যায় যে, বিনা করলে এক সালমে চার রাকআতে আদায় করার ফজিলত অর্জন হয়। কেননা এক সালমে চার রাকআত আদায় করা দুই সালমে চার রাকআত আদায় করার তুলনায় উত্তম। এর উত্তরঃ বিনা করার সূরতে নিঃসন্দেহে চার রাকআত নিরবিচ্ছিন্নভাবে আদায় করার ফজিলত হালিস হয়, তবে এতে একটি জটিলতা হচ্ছে— সাজদায় সাহব যা ওয়াজিব তা নামাজের মাঝে পতিত হবার কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ওয়াজিব (সাজদায় সাহব) নষ্ট করার থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, ফজিলত হালিস করার তুলনায়। এ জন্য বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দুই রাকআতের উপর বিনা করলে না; বরং নতুন তাহরীমা দ্বারা পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন যে, নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তির বিনা করা উচিত নয়, তবে যদি এতদসত্ত্বেও বিনা করে তাহলে তার পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করা সহীহ হবে। কেননা এখনও তার তাহরীমা বিদ্যমান আছে। তবে হ্যাঁ সাজদায় সাহব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিনা করার কারণে সাজদায় সাহব নামাজের মাঝখানে পতিত হয়ে গেছে। অথচ নামাজের মাঝে সাজদায় সাহব অনুমোদিত নয়। এ জন্য সাজদায় সাহব গ্রহণযোগ্য হবে না। তার উপর পরনায় সাজদায় সাহব করা ওয়াজিব হবে।

: قَوْلُهُ يَخَالِي الْمَسَاكِينَ : এ ইবারতের হুকুম মতনের মাসআলার বিপরীত। মোটকথা হলো, কোনো মুসাফির ব্যক্তি চার রাকআত পড়ল এবং নামাজে কোনো ভুল হওয়ার কারণে সাজাদায়ে সাহব করল, তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে মুকীম হওয়ার নিয়ত করল, তাহলে এ মুসাফির এ তাহরীমার উপর (مَسَا) করা এবং চার রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরানো। এমনকি মুকীম হওয়ার নিয়ত করার কারণে তার উপর চার রাকআত পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। এমতান্বয় যদি সে বিনা না করে তাহলে তার পূর্ণ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর বিনা করার দ্বারা ওয়াজিব নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সাজাদায়ে সাহব বাতিল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, ওয়াজিব নষ্ট করা বা ছেপে দেওয়া উত্তম, ফরজ বাতিল করার তুলনায়। মূলনীতি আছে যে, বড় ক্রটি দু'র করার জন্য ছোট ক্রটি বরাশত করা যায়। এ জন্য ফরজ বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করা উত্তম হবে সাজাদায়ে সাহব ছেপে দেওয়ার তুলনায়।

وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَلَنْ سَجَدَ  
 الْإِمَامُ كَانَ دَاخِلًا وَلَا فَلَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبْنِ يُونُسَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ  
 دَاخِلٌ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ لِأَنَّ عِنْدَهُ سَلَامٌ مِّنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ  
 الصَّلَاةِ أَصْلًا لِأَنَّهَا وَجِبَتْ جَبْرًا لِلنَّقْصَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْزَامِ الصَّلَاةِ  
 وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ لِأَنَّهُ مُحِلِّلٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ  
 إِلَى آدَاءِ السَّجْدَةِ فَلَا يَظْهَرُ دُونَهَا وَلَا حَاجَةٌ عَلَى إغْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَيُظْهَرُ  
 الْإِخْتِلَافُ فِي هَذَا وَفِي إِنْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَرَةِ وَتَغْيِيرِ الْفَرَضِ بِنَيْةِ الْإِقَامَةِ فِي  
 هَذِهِ الْحَالَةِ -

অনুবাদ : কেউ (নামাজের শেষে) সালাম ফিরাল অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহব রয়ে গেছে এমন সময়  
 সালামের পর কোনো ব্যক্তি সে মুসল্লী নামাজে দাখিল হলো, এহেন অবস্থায় ইমাম যদি সিজদায় যায়, তাহলে মুক্তাদী  
 নামাজে शामिल বলে গণ্য হবে। অন্যথায় নামাজে शामिल বলে গণ্য হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং  
 ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম সিজদা করুন আর না করুন মুক্তাদী নামাজে  
 शामिल বলে গণ্য হবে। কেননা তার মতে যার জিম্মায় সাজদায়ে সাহব আছে তার সালাম মূলত তাকে নামাজ হতে  
 বের করে না। কারণ এ সিজদা ওয়াজিব হয়েছে ক্ষতি পূরণের জন্য। সুতরাং নামাজের তাহরীমায় থাকা তার জন্য  
 অপরিহার্য। ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সালাম তাকে তায়াক্কুফ (توقف)  
 স্থগিতাবস্থায় নামাজ থেকে বের করে। কেননা বস্তুত সালাম মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। কিন্তু সিজদা  
 আদায়ের প্রয়োজনে এখানে তা কার্যকারী হবে না। সুতরাং সিজদা ছাড়া এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর  
 সিজদায় ফিরে না আসার প্রেক্ষিতে কার্যকারিতার প্রয়োজনও নেই।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল আলোচ্য মাসআলায় যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনি প্রকাশ পাবে এ অবস্থায় অটুইহাসি  
 দ্বারা অজু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুকীম হওয়ার নিয়ত দ্বারা ফরজ পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, কোনো ব্যক্তি সালাম ফিরাল অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহব রয়ে গেছে। এমন সময় অন্য কোনো  
 ব্যক্তি তার সালাম ফিরানোর পর তার নামাজে ইজ্জদার নিয়ত করে शामिल হয়ে গেল। তাহলে শায়খাইনের মতে তার হুকুম  
 হলো যে, ইমাম সাজদায়ে সাহব করে থাকলে মুক্তাদীর নামাজে দাখিল হওয়া গণ্য হবে। অন্যথায় মুক্তাদীর নামাজে দাখিল  
 হওয়া গণ্য হবে না। আলোচ্য মাসআলা এবং আরো অনেক মাসআলা এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল যে, “যার উপর সাজদায়ে  
 সাহব ওয়াজিব হয় তার সালাম ফিরানো তাকে নামাজের তাহরীমা থেকে বের করে দেয় কিনা”? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ  
 (র.)-এর মত হলো যে, তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে না স্থগিতাবস্থায় নয় এবং অনিবার্য এবং নিশ্চিতভাবেও

নয়। এটিই ইমাম যুফার (র.) এর মত। পক্ষান্তরে শায়খাইনের মত হলো। তার সালাম তাকে নামাজ থেকে স্থগিতাবস্থায় বের করে দেয়। স্থগিতাবস্থায় মর্ম হলো যে, সালামের পর যদি সাজদায়ে সাহব করে তাহলে তাহরীমা বাকি থাকবে। অতএব অন্যান্য মুসল্লীদের ইক্কেদা করা জায়েজ হবে। আর যদি সালামের পর সিজদা না করে, তাহলে তাহরীমা বাকি থাকবে না। অতএব অন্যান্য মুসল্লীদের ইক্কেদা (اكتفاء) করা সহীহ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো যে, সাজদায়ে সাহব আদায়কৃত নামাজের ক্রটি দূর করার জন্য ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ সংঘটিত বা চলমান নামাজের ক্রটি দূর করার জন্য সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়। আর নামাজের অস্তিত্ব তাহরীমা বাকি থাকার উপর নির্ভরশীল। উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যার উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় তার সালাম তাকে নামাজ থেকে বের করে দেয় না; বরং সালাম ফিরানো সত্ত্বেও তাহরীমা বিদ্যমান থাকে। সালামের পর তাহরীমা বাকি থাকার কারণে তার সাথে অন্যের ইক্কেদা করা সহীহ হবে। চাই ইমাম সাজদায়ে সাহব করুক বা না করুক।

শায়খাইনের দলিল, সালাম প্রত্যক্ষভাবে মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দেয়। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন تَحِلُّهَا النَّاسُ সালাম নামাজি ব্যক্তির জন্য সবকিছুকে হালাল করে। তবে হ্যাঁ যদি কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তাহলে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না। আর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হলো সাজদায়ে সাহব আদায় করার প্রয়োজনীয়তা। অতএব যদি সাজদায়ে সাহব আদায় করে তাহলে প্রতিবন্ধক পাওয়ার কারণে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না অর্থাৎ ঐ মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করবে না। আর যদি সাজদায়ে সাহব না করে তাহলে নামাজ থেকে হালাল হওয়ার প্রতিবন্ধক না পাওয়ার কারণে সালামের কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে, অর্থাৎ মুসল্লীকে নামাজ থেকে বের করে দিবে। এই দলিলের দ্বারা সাবিত হলো, যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয় তার সালাম তাকে স্থগিতাবস্থায় নামাজ থেকে বের করে দেয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং শায়খাইনের ইখতেলাফের ফলাফল আলোচ্য মাসআলা এবং অন্যান্য মাসআলায় প্রকাশ পাবে। ১: সালামের পর ঐ ব্যক্তি অট্টহাসি বা উচ্চহাসি দিলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অজু ভেঙ্গে যাবে। কেননা সাজদায়ে সাহব করার কারণে নামাজের মাঝে অট্টহাসি পাওয়া গেল, আর যদি সাজদায়ে সাহব না করে তাহলে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা এমতাবস্থায় নামাজের পর উচ্চ হাসি পাওয়া গেল। ২: সালামের পর এবং সাজদায়ে সাহব-এর পূর্বে কোনো মুসাফির যদি ইকামতের নিয়ত করে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার ফরজ নামাজ দুই রাকআতের স্থানে চার রাকআত পড়তে হবে। চাই সাজদায়ে সাহব করুক বা না করুক। আর শায়খাইনের মতে যদি সাজদায়ে সাহব করে তাহলে ইকামতের (اقامت) নিয়তের কারণে তার ফরজ নামাজ চার রাকআত পড়তে হবে। আর যদি সাজদায়ে সাহব না করে তাহলে চার রাকআত হবে না।- (শরহে নিকায়্য)

وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِسَهْوِهِ لِأَنَّ هَذَا  
السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعٍ وَنِيَّتُهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَشْرُوعِ فَلَعَنَتْ. وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ  
أَتَلَّهَا صَلَّى أَمْ أَرَعَا وَ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرِضَ لَهُ إِسْتَانْفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا شَكَّ  
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقِيلِ الصَّلَاةَ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নামাজ শেষ করার নিয়তে সালাম ফিরাল, অথচ তার জিম্মায় সাজদায়ে সাহব রয়ে গিয়েছে, তাহলে তার কর্তব্য হলো নামাজে সাজদায়ে সাহব করা। কেননা এ সালাম নামাজ সমাপ্তকারী নয়। আর তার নিয়তের লক্ষ্য হচ্ছে শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তন। সুতরাং এ নিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত পড়েছে তা বলতে পারে না। আর এই প্রথমে সে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাহলে সে পুনরায় নামাজ আদায় করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় নামাজে সন্দেহান হয়ে পড়ে যে, সে কত রাকআত পড়েছে? তাহলে সে যেন পুনরায় নামাজ আদায় করে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, যে ব্যক্তির দায়িত্বে সাজদায়ে সাহব ওয়াজিব হয়েছে সে যদি সালাম ফিরায় নামাজ শেষ করার জন্য তবে, নামাজ ভঙ্গকারী জিনিস পাওয়ার পূর্বেই তার উপর সাজদায়ে সাহব করা ওয়াজিব। কেননা যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহব করা ওয়াজিব তার সালাম ফিরানো নামাজকে ভঙ্গ করে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট এ সালাম মুহাল্লিল (মحلل) বা নামাজ থেকে বহিষ্কারকারী হিসাবে অনুমোদিত নয়। পক্ষান্তরে শায়খাইনের থেকে বহিষ্কারকারী স্থগিতাবস্থায়, চূড়ান্তভাবে নামাজ থেকে বহিষ্কারকারী নয়। মোটকথা এ সালাম নামাজ ভঙ্গকারী রূপে শরিয়তে অনুমোদিত নয়। আর যে জিনিস নামাজ ভঙ্গকারীরূপে শরিয়তে অনুমোদিত নয়। তা- নামাজকে ভঙ্গ করতে পারে না। কাজেই এ সালামের কারণে নামাজ ভঙ্গ হবে না। এতদ্বসত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে যে নামাজ ভঙ্গ করার নিয়ত করা হয়েছে তা শরিয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে। তাই তা ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ الْخ : যদি কোনো মুসল্লীর নিজ নামাজে সন্দেহ হয় যে, তিন রাকআত হয়েছে না চার রাকআত হয়েছে? আর সে এই প্রথম বার এরূপ সন্দেহের সম্মুখীন হয়েছে তাহলে সে নতুন করে নামাজ পড়ে নিবে। দলিল হিদায়া গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত হাদীস। **أَوَّلُ مَا عَرِضَ لَهُ** এ ইবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

এ সম্পর্কে কোনো কোনো শায়খ বলেছেন যে, এর মর্ম হল, ভুল হওয়া তার আদত বা অভ্যাস নয়; বরং কখনও কখনও ভুল হয়ে থাকে। এ মর্ম নয় যে, জীবনে তার কখনও ভুল হয়নি এটিই প্রথম ভুল। এটি শামসুল আযিম্বা সারাখসী (র.)-এর মত।

ফখরুল ইসলাম বযদবী (র.) বলেছেন, এর মর্ম হলো ঐ নামাজের প্রথম ভুল। কেউ কেউ বলেছেন যে, এরমর্ম হল, এটিই জীবনের প্রথম ভুল, বয়ঃসপ্তাণ্ড হওয়ার পর কখনো তার নামাজে ভুল হয়নি। এটিই অগ্রণ্য। (জামীল আহমদ)

وَأَنْ كَانَ يَعْزِزُ لَهُ كَثِيرًا بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأْيُ بَنَى عَلَى الْبَقِيَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرْ أَتْلُثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ وَالْإِسْتِغْبَالَ بِالسَّلَامِ أَوْلَى لِأَنَّهُ عَرَفَ مُحَلِّلاً دُونَ الْكَلَامِ وَمَجْرَدَ النَّيْسَةِ تَلْغُو وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ يَفْعَدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَتَوَهَّمُ آخِرُ صَلَاتِهِ كَيْلًا يَصِيرَ تَارِكًا فَرَضَ الْقَعْدَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : আর যদি এ অবস্থা তার বহবার হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বিনা করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে যেন চিন্তার মাধ্যমে কোনটি সঠিক তা সাব্যস্ত করে। আর যদি তার কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে নিম্ন সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নামাজে সন্দিহান হয়ে পড়ে, ফলে সে বলতে পারে না যে, তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত পড়েছে, তাহলে সে কম-এর উপর নির্ভর করবে। আর সালাম দ্বারা (সন্দেহহস্ত নামাজ শেষ করে) নতুন নামাজ শুরু করা উত্তম। কেননা সালামই নামাজ সমাপ্তকারী রূপে পরিচিত, কথাবার্তা দ্বারা নয়। সালাত বাতিল করার নিয়তে বাতিল বলে গণ্য হবে। আর কম সংখ্যার উপর নির্ভর করার সুরতে যে রাকআতকে নামাজের শেষ রাকআত হিসাবে ধারণা করা হবে এমন প্রত্যেক স্থানে বসবে, যেন সে ফরজ বৈঠক তরককারী না হয়। আল্লাহই উত্তম জ্ঞান

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা, যদি আদায়কৃত নামাজের পরিমাণের ব্যাপারে অধিক সন্দেহ হয় তাহলে এর দুই সুরত- কোনো এক দিকে প্রবল ধারণা হবে অথবা হবে না। যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলে সে মুতাবেক আমল করবে। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْلَمْ ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ .

অর্থ- যদি তোমাদের কেউ নামাজে সন্দিহান হয় তাহলে সে সঠিক তথ্যের জন্য চিন্তা-ভাবনা করবে এবং চিন্তা-ভাবনাও প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। তারপর সালাম ফিরাবে এবং দুটি সাজদায়ে সাহু্ব দিবে। যুক্তি-ভিত্তিক দলিল হলো যে, যদি প্রতিবার নামাজ পুনরায় পড়ার হুকুম দেওয়া হয় তাহলে জটিলতা এবং সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। এজন্য এই জটিলতা বা সংকীর্ণতা দূর করার লক্ষ্যে প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। আর যদি তার কোনো দিকে প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কম সংখ্যার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ তিন রাকআত ধারণা করা হবে। দলিল রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرْ أَتْلُثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ .

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত শব্দে নকল করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَأَلْتَنِي أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثَنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَذَرْ ثَنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَنَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَذَرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ .

وَالْإِسْتِغْبَالَ بِالسَّلَامِ -এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো যদি নতুনভাবে নামাজ পড়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে সন্দেহযুক্ত নামাজ সালামের দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়া উত্তম, কথাবার্তা দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে দেওয়া উত্তম নয়। কেননা শরিয়তে সালামকে মুহাল্লাল (محلل) বা নামাজ সমাপ্তকারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কথাবার্তাকে নামাজ সমাপ্তকারী হিসাবে গণ্য করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কথাবার্তা নামাজকে ফাসিদ বা বাতিল করে দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন تَغْلِبُهَا التَّنِيمُ সালাম মুসল্লীকে নামাজ থেকে বৈধভাবে বের করে দেয়। তাই সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বের হওয়া উত্তম, কথাবার্তা দ্বারা নয়। যদি শুধু নামাজ থেকে বের হওয়ার নিয়ত করে তাহলে নামাজ ভঙ্গকারী আমল না পাওয়ার কারণে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না এবং তার কোনো প্রভাব নামাজের উপর পড়বে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقْلِ الْخ : এ ইবারতের সারকথা হলো, কম এর উপর নির্ভর করার সূরতে বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ পড়বে যেমন রুবাই (رباعى) বা চার রাকআত নামাজে সন্দেহ হয়েছে যে, এটা প্রথম রাকআত না দ্বিতীয় রাকআত এবং কোনো দিকে তার প্রবল ধারণা নেই, তাহলে একে প্রথম রাকআত ধরে নিবে। তবে তা পুরা করার পর বৈঠক করবে। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, এটা তার দ্বিতীয় রাকআত, আর দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করা ওয়াজিব। এ জন্য প্রথম রাকআত পুরা করে বৈঠক করবে তারপর দাঁড়াবে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকআত পড়ে বৈঠক করবে। কেননা মুসল্লী একে দ্বিতীয় রাকআতের হুকুমে ধরে নিয়েছে। অতঃপর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকআত পড়ে বৈঠক করবে। কেননা হতে পারে যে, এটিই চতুর্থ রাকআত। আর চতুর্থ রাকআতের মাথায় বৈঠক করা ফরজ। তারপর চতুর্থ রাকআত পড়ে শেষ বৈঠক করবে। কেননা এটা মুসল্লীর মতে চতুর্থ রাকআতের হুকুমে, আর চতুর্থ রাকআতে বৈঠক করা ফরজ।

সারকথা হলো যে, ফরজ বৈঠক এবং ওয়াজিব বৈঠক ছুটে যাওয়ার আশংকার ভিত্তিতে প্রত্যেক রাকআতের মাথায় বৈঠক করবে। যার সূরত অধম বর্ণনা করেছে। আল্লাহই ভাল জানেন। (জামীল আহমদ)

## بَابُ صَلَوةِ الْمَرِيضِ

إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيُحْمَرَانَ  
بَنِي حُصَيْنٍ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تَوَمَّنِي  
إِيمًا، وَلَإِنَّ الطَّاعَةَ يَحْسِبُ الطَّاقَةَ.

### পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

**অনুবাদ :** অসুস্থ ব্যক্তি যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তখন সে বসে রুকু সিজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-কে বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি তা না পার তবে বসে পড়বে। যদি তা না পার তবে পার্শ্বের উপর শয়ন করে ইস্তিতার মাধ্যমে পড়বে। তা ছাড়া যুক্তি হলো, ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**প্রসঙ্গ কথা :** এর- مريض -এর দিকে اِلَى الْفَاعِلِ -এর অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা عوارض سميحه -এরপর এ জন্য করেছেন যে, مريض ও سميحه উভয়টিই জন্ম করেছেন যে, سجد -এর আলোচনা পূর্বে করেছেন আর নামাজের আলোচনা পরে করেছেন।

**মাসআলা :** অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়, অর্থাৎ দাঁড়ালে সুস্থতা বিলম্বে হাসিল হওয়ার ভয় আছে কিংবা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় হয় কিংবা দাঁড়াতে ব্যথা লাগে এ ধরনের ব্যক্তির জন্য কিয়ামকে তরক করা জায়েজ আছে এবং এ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা দ্বারা নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো, অযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)-এর قَالَ كُنْتُ يَوْمَئِذٍ بَوَاسِرَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَعَلَى الْجَنْبِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَتُسَلِّمُ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا -এর শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন, ইমাম নাসায়ী (র.)-এর ইমাম নাসায়ী (র.)-এর ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.) বলেন, আমার بوايسر -এর রোগ ছিল। (بوايسر বলা হয় অর্ধ রোগকে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ অবস্থায় নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি তা না পার তবে বসে আদায় কর। আর যদি তাও না পার তবে পার্শ্ব শয়ন করে আদায় কর। যদি তাও না পার তবে চিৎ হয়ে ওয়ে আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধের বাইরে কষ্ট দেন না। হিদায়া গ্রন্থকার আকলী দলিল বয়ান করতে গিয়ে উক্ত বাক্যটির (لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَفْسًا) সার-সংক্ষেপ বলেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার বলেন, طَاعَتٌ يَقْتَضِيهِ اَللّٰهُ اَرْوَاحًا ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। যার যতটুকু সম্ভব এবং যখন সম্ভব তা সে তখন ঐ পরিমাণ আদায় করবে।

**ফায়দা :** যদি অসুস্থ ব্যক্তি সামান্য দাঁড়াতে সক্ষম হয় যেমন, এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ, পুরো দাঁড়াতে পারে না। তবে তাকে এ পরিমাণ দাঁড়ানোর-ই নির্দেশ দেওয়া হবে। যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন বসে যাবে। কেননা সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত হয়ে থাকে। এমনভাবে যদি সে কোনো জিনিসের উপর চেস দিয়ে বা কোনো লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তবে তার জন্য দাঁড়ানোকে বর্জন করা জায়েজ হবে না।

قَالَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْمِئْ بِإِيمَاءٍ بَعْنِي قَاعِدًا لَأَنَّهُ وَسِعَ مِثْلَهُ وَجَعَلَ  
 سَجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ لَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُمَا فَآخِذٌ حُكْمَهُمَا وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْءٌ  
 يَسْجُدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ قَدَّرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَلَا قَائِمٌ  
 بِرَأْسِكَ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَخْفَضُ رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ لُجُودُ الْإِيمَاءِ وَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَنْبَيْهِ  
 لَا يُجْزِئُهُ لِإِنْعَادِمِهِ.

অনুবাদ: ইমাম কুদরী (র.) বলেন, যদি রুকু সিজদা করতে না পারে তাহলে ইশারায় তা আদায় করবে। অর্থাৎ বসা অবস্থায় (ইশারায় রুকু সিজদা করবে)। কেননা এতটুকু করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে সিজদার ইশারাকে রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। কেননা ইশারা হলো রুকু-সিজদার স্থলবর্তী। রুকু-সিজদার হুকুম গ্রহণ করবে। সিজদা করার জন্য কোনো কিছু কপালের সামনে উচু করে ধরা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَلَا قَائِمٌ بِرَأْسِكَ** যদি তুমি জমিনে সিজদা করতে পার তবে সিজদা করো। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা করো। আর যদি কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিঞ্চিৎ অবনত করে, তবে ইশারা আদায় যাওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি উক্ত উত্তোলিত বস্তুকে কপালের উপর শুধু স্থাপন করে তবে ইশারা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদরী গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হয় তবে বসে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করবে। কেননা এ সময় তার এটুকুই শক্তি আছে। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদত শক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে। তবে সিজদার ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় কিছুটা নিচু হবে। অর্থাৎ সিজদার ইশারার সময় মাথা তুলমামূলক কিছুটা বেশি নিচু করবে। দলিল হলো, ইশারা হলো রুকু ও সিজদার স্থলবর্তী। তাই এতেও রুকু ও সিজদার হুকুমে হবে। আর যেহেতু হাকীকী সিজদায় হাকীকী রুকুর তুলনায় একটু বেশি অবনমিত হতে হয় তাই সিজদার ইশারাও রুকুর ইশার তুলনায় নিচু হবে। শায়খ আবুল হাসান কুদরী (র.) বলেন, সিজদা করার জন্য কোনো জিনিসকে মাথার দিকে উঠাবে না। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-**يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَلَا قَائِمٌ بِرَأْسِكَ** ইমাম বাযযায় (র.) তার মুসনাদের মধ্যে উক্ত হাদীসটির শব্দমালা এভাবে নকল করেছেন যে,

عَنْ جَابِرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَادَ مَرِيضًا فَرَأَى بَصِلِيَّ عَلَى وَسَادَةٍ فَآخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَآخِذٌ عَمْدًا لِيَصِلِيَّ عَلَيْهِ فَآخِذَهُ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ لِيَنْ اسْتَطَعْتُ وَلَا قَائِمٌ بِإِيمَاءٍ وَاجْعَلْ سَجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ  
 হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির সেবার জন্য তাম্বীরক নিয়োগ দিলেন। গিয়ে দেখলেন, সে বাগিচার উপর নামাজ আদায় করছে। তিনি বাগিচাটি ছুড়ে ফেল দিলেন। অতঃপর সে একপাশে খড়ি নিল তাতে নামাজ আদায় করার জন্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাও ছুড়ে ফেললেন। আর বললেন, যদি সক্ষম হও তবে জমিনের উপর নামাজ পড়ো, আর যদি সক্ষম না হও, তবে ইশারা করো এবং রুকুর তুলনায় সিজদাতে অবনমিত একটু বেশি হবে। এ হাদীসটি এ কথার উপর প্রযোজ্য যে, অসুস্থ ব্যক্তিটি বাগিচা উঠিয়ে মাথার সাথে লাগাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে বারণ করলেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল সিজদার জন্য কোনো কিছুকে মাথা পর্যন্ত উঠানো জায়েজ নেই। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি যদি বাগিচা উঠিয়ে কপালের সাথে লাগায় তবে তার দুঃবস্থা রয়েছে। সে সিজদার জন্য মাথা নিচু করবে অথবা নিচু করবে না। যদি নিচু করে তবে তা যথেষ্ট হবে। কেননা মাথা নত করার দ্বারা ইশারা পাওয়া গিয়েছে। আর এটাই তার উপর ফরজ, তবে এরূপ কাজ মাকরুহ। আর যদি বাগিচা উঠিয়ে মাথার সাথে লাগায় আর মাথা একদম নত না করে, তবে এর দ্বারা রুকু-সিজদা আদায় হবে না। কেননা এ সুরতে ইশারা পাওয়া যায়নি অথচ ইশারাই তার উপর ফরজ ছিল।



وَأَنْ لَّمْ يَسْتَطِيعِ الْقُعُودَ اسْتَلْفَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رَجُلِيهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَوَمَى  
بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْلِي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا  
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَى قَفَاءٍ يُؤَمِّي إِمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعَذْرِ  
مِنْهُ وَإِنْ اسْتَلْفَى عَلَى جَنْبِهِ وَ وَجَّهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ جَازٍ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلِ إِلَّا أَنْ الْأَوَّلَى هُوَ  
الْأَوَّلَى عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ إِشَارَةَ الْمُسْتَلْفِي تَقَعُ إِلَى هَوَاءِ الْكُعْبَةِ وَ إِشَارَةُ  
الْمُضْطَّجِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَانِبِ قَدَمَيْهِ وَبِهِ تَتَأَدَّى الصَّلَاةُ .

অনুবাদ : আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শুইবে এবং দু'পা কিবলামুখী করবে এবং  
ইশারায় রুকু-সিজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে, যদি তা না  
পারে তাহলে বসে আদায় করবে, যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইশারায় আদায় করবে। যদি তাও না পারে  
তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তার ওজর কবুল করার অধিক হকদার। আর যদি পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়ন করে আর  
তার চেহারা কিবলামুখী থাকে তবে তা জায়েজ হবে। প্রমাণ হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত (ইমরান ইবনে হুসায়ন  
(রা.)-এর) হাদীস। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সূরতটি উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা  
চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা কা'বা শরীফের অভিমুখী হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির  
ইশারা তার পদদ্বয় অভিমুখী হয়। অবশ্য এ অবস্থায়ও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শুইবে এবং মাথার নিচে উচু করে একটি বালিশ রাখবে  
যাতে বমার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করা সম্ভব হয়। কেননা এ ছাড়া সুস্থ ব্যক্তিও ইশারা করতে সক্ষম নয়,  
অসুস্থ ব্যক্তির ইশারা করার প্রশ্নই আসে না এবং দু'পা কিবলামুখী করবে আর ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে। দলিল হলো  
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-

يَصْلِي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَى قَفَاءٍ يُؤَمِّي إِمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ  
فَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعَذْرِ مِنْهُ .

উক্ত হাদীসের শেখাংশ وَأَمَّا مَنْ عَذَرَ اسْقَاطَ -এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ  
কেউ বলেন, ইশারা করতে সক্ষম না থাকা অবস্থায়ও কাযা রহিত হবে না। তবে নামাজকে বিলম্ব করা যাবে। সুস্থ হলে এর  
কাজা আদায় করে নিবে। এ সকল আলিমগণের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাখির তথা বিলম্বের  
ওজরকে কবুল করার অধিক হকদার। আর কারো মতে এ অবস্থায় কাযা রহিত হয়ে যাবে। তাদের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা  
হবে আল্লাহ তা'আলা عَذَرَ اسْقَاطَ -কে কবুল করার অধিক হকদার, ইনায়া গ্রন্থকার এ মতকে اصح (বিশুদ্ধতম) বলেছেন।

যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শুইবে এবং মাথার নিচে উচু করে একটি বালিশ রাখবে  
যাতে বমার সাদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করা সম্ভব হয়। কেননা এ ছাড়া সুস্থ ব্যক্তিও ইশারা করতে সক্ষম নয়,  
অসুস্থ ব্যক্তির ইশারা করার প্রশ্নই আসে না এবং দু'পা কিবলামুখী করবে আর ইশারায় রুকু ও সিজদা করবে। দলিল হলো  
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-

يَصْلِي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَى قَفَاءٍ يُؤَمِّي إِمَاءً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ  
فَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعَذْرِ مِنْهُ .

উক্ত হাদীসের শেখাংশ وَأَمَّا مَنْ عَذَرَ اسْقَاطَ -এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ  
কেউ বলেন, ইশারা করতে সক্ষম না থাকা অবস্থায়ও কাযা রহিত হবে না। তবে নামাজকে বিলম্ব করা যাবে। সুস্থ হলে এর  
কাজা আদায় করে নিবে। এ সকল আলিমগণের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাখির তথা বিলম্বের  
ওজরকে কবুল করার অধিক হকদার। আর কারো মতে এ অবস্থায় কাযা রহিত হয়ে যাবে। তাদের মতে উক্ত অংশের ব্যাখ্যা  
হবে আল্লাহ তা'আলা عَذَرَ اسْقَاطَ -কে কবুল করার অধিক হকদার, ইনায়া গ্রন্থকার এ মতকে اصح (বিশুদ্ধতম) বলেছেন।

**অনুবাদ** যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার নামাজ বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা বা চোখের স্রু দ্বারা ইশারা করা যাবে না। ইমাম যুফার (র.) -এর এ থেকে ভিন্নমত রয়েছে আমাদের দলিল হলো ইতঃপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তা ছাড়া মুক্তি হলো, নিজস্ব মত দ্বারা স্থলবর্তী নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর মাথা দিয়ে ইশারা-এর উপর কিয়াস করাও সঙ্গত নয়। কেননা মাথা দ্বারা নামাজের রুকন আদায় করা হয় অথচ চোখ বা অপর দুটি দ্বারা তা করা যায় না। “নামাজ বিলম্বিত করা” হবে- ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের ফরজ তার থেকে রহিত হবে না। যদিও অক্ষমতা একদিন এক রাত্রের বেশি হয়; আর সে সজ্ঞানে থাকে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে শরিয়তের সম্বোধন উপলব্ধি করতে পারে। অজ্ঞান লোকের বিষয়টি এর বিপরীত।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শাযখ আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, রোগ যদি এমন বেড়ে যায় যে মাথা ঘরা ইশারা করার শক্তিও না থাকে, তবে নামাজ বিলম্ব করে দিবে অর্থাৎ পরে আদায় করবে। কিন্তু চক্ষুদুঃ, অন্তর এবং চোখের ক্র দ্বারা ইশারা করা যথেষ্ট নয়। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি তার চোখ এবং অন্তর দ্বারা ইশারায় নামাজ আদায় করবে এবং সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় তা পড়বে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও অনুরূপ অভিমত। আমাদের দলিল ঐ হাদীস যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ **إِنْ نَذَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَسَجِدْ وَلَا تَأْمُرْ بِرَأْسِكَ** উক্ত হাদীসের মধ্যে **فَسَجِدْ** -এর স্থানে আলোচনাকে মাথার উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মাথা বাতীত বসে অন্য কন্যে অঙ্গ দ্বারা ইশারা করা জায়েজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তা পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়ান না করা জায়েজ না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আকলী দলিল হলো, ইশারা হলো মূলত রুকু ও সিজদার বদল। আর বদলকে রায় দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। হাদীসের মধ্যে শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করার বর্ণনা রয়েছে, চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করার বর্ণনা নেই। সুতরাং যদি এগুলো দ্বারা ইশারা করার ইজাজত দেওয়া হয় তবে বদলকে রায় দ্বারা নির্ধারণ করা লায়িম বা জায়েজ নেই। এ জন্য চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করার কথা জায়েজ হবে না। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মতো দ্বারা বদলকে নির্ধারণ করা নয়; এবং এখানে তো মাথার হুকুমের উপর ক্বিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমনিভাবে মাথা দ্বারা ইশারা করা রুকু ও সিজদার জন্য যথেষ্ট, এমনিভাবে চোখ ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করাও যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে এর জবাব হলো, চোখ ইত্যাদিকে মাথার উপর ক্বিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা মাথা দ্বারা নামাজের একটি রুকুন তথা সিজদা আদায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে চোখ, অন্তর এবং ক্র দ্বারা সিজদা আদায় করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত তিন অঙ্গের সিজদা আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো দখল নেই। সুতরাং এ ধরনের পার্থক্য থাকা অবস্থায় একতাকে অপরটির উপর কিভাবে ক্বিয়াস করা সইয়া হবে?

কদুরীর ইবারত- احتر عنه দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি থেকে নামাজের ফরজ রহিত হবে না; বরং নামাজ তার জিম্মায় বাকি থাকবে। সুস্থ হওয়ার পর তার কাজ করা ওয়াজিব হবে। যদি এ অবস্থা একদিন এক রাতের বেশি হয়, তবে শর্ত হলো এ সময়ে অসুস্থ ব্যক্তির ইশ থাকতে হবে। এটাই বিতদ্ব মত। কেননা এ অসুস্থ ব্যক্তি যখন ইশ অবস্থায় আছে তখন সে নামাজের আদানের হুকুমকে বুঝে। আর যখন সে হুকুম বুঝে তখন হুকুম তার উপর আবর্তিত হয় যার দ্বারা তার উপর আদায় ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে জুজের কারণে তাকে সাথে সাথে আদায় করা থেকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যাতে তার পূর্ণ শক্তি অর্জন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি একদিন ও রাতের অধিক বেশি থাকে, তখনতো সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করা থেকে অপারগ। তাই এ অবস্থায় নামাজ তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় মাথা ধারা ইশারা করতেও যদি সক্ষম না হয় আর তা একদিন ও রাতের অধিক হয়, তখন তার উপর কাজা ওয়াজিব না; আর একদিন ও রাতের কম হলে কাজা ওয়াজিব হবে।

وَأَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزِمَ الْقِيَامَ وَيَصَلَّى قَاعِدًا  
يَوْمِيَّ إِنَّمَا لِأَنَّ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى السَّجْدَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ نَهَائِيَةِ التَّعْظِيمِ  
فَإِذَا كَانَ لَا يَتَقَبَّحُ السُّجُودَ لَا يَكُونُ رُكْنًا فَيَتَخَيَّرُ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِنَّمَاءُ قَاعِدًا لِأَنَّهُ أَشْبَهُ  
بِالسُّجُودِ وَأَنْ صَلَّى الصَّحِيحَ بَعْضُ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ  
وَيَسْجُدُ أَوْ يَوْمِيَّ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ مُسْتَلْقِبًا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ لِأَنَّهُ بَنَى الْآدَنِيَّ عَلَى الْأَعْلَى  
فَصَارَ كَالْقَاعِدَاءِ.

অনুবাদ : যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কিয়াম করা জরুরি নয়; বরং বসে ইশারায় (রুকু-সিজদা করে) নামাজ আদায় করবে। কেননা কিয়াম রুকন হয়েছে সিজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সিজদায় যাওয়ার মধ্যে চূড়ান্ত তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পরে সিজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। তবে উত্তম হলো বসে অবস্থায় ইশারা করা। কেননা তা সিজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক নামাজ আদায় করার পর যদি অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর অক্ষম না হলে ইশারা দ্বারা আদায় করবে। আর (বসতে) সক্ষম না হলে চিত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। কেননা সে নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর “বিনা” করেছে। সুতরাং এটা ইকতিদার মতো হলো।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি এমন রোগাক্রান্ত হয় যে, দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম নয়। তখন তার দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরি নয়; বরং বসে ইশারায় নামাজ আদায় করবে। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু ও সিজদায় সক্ষম না হয় তাহলে তার জিন্মা থেকে কিয়াম রহিত হয় না। তাঁদের দলিল হলো, কিয়াম হলো রুকন, আর অসুস্থ ব্যক্তি তা থেকে অক্ষম নয়; বরং অন্যান্য রুকন তথা রুকু ও সিজদা থেকে অপারগ। তাই রুকু ও সিজদায় অপারগ হওয়ার কারণে কিয়াম তার জিন্মা থেকে কিভাবে রহিত হবে? আমাদের দলিল হলো, কিয়াম শুধু এ কারণে রুকন যে, তা সিজদা আদায়ের অসিলা হয়। আর কিয়াম সিজদা আদায়ের রুকন হলো এ কারণে যে, কিয়ামের পর সিজদা করার দ্বারা অধিক তাজীম প্রকাশ পায়। সুতরাং কিয়ামের পর সিজদা না হলে কিয়াম রুকনই থাকবে না। আর ঐ অবস্থায় যখন কিয়াম রুকন থাকল না তখন অসুস্থ মুসল্লীর কিয়াম করা আর না করার মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে। তবে উত্তম হলো বসে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করবে। কেননা বসে ইশারায় সিজদা করা হাকীকী সিজদার অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা বসে সিজদা করার সময় মাথা জমিরের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঁড়িয়ে ইশারা করার দ্বারা এমনটি হয় না।

وَأَنْ صَلَّى الصَّحِيحَ الخ মাসআলা হলো, যদি সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক নামাজ আদায় করার পর এমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না, তবে যদি সে রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয় তবে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, বসতেও না পারে তবে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পুরো করবে। দলিল হলো, উপরোক্ত সুরতগুলোতে নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর বিনা করা হয়েছে, আর এমনটি করা জায়েজ। যেমন- নিম্নাবস্থার ব্যক্তির জন্য উচ্চাবস্থার ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা জায়েজ। অর্থাৎ যেমনিভাবে বসে নামাজ আদায়কারীর ইকতিদা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর পিছনে জায়েজ। এমনভাবে নারাজের আংশিক দাঁড়িয়ে অতঃপর ওজরের কারণে পরের অংশ বসে আদায় করাও জায়েজ।

وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرِيضٍ ثُمَّ صَبَّحَ بَنِي عَلَى صَلَاتِهِ قَائِمًا عِنْدَ  
 أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ يُونُسَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اسْتَقْبِلْ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي  
 الْاِقْتِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَإِنْ صَلَّى بَعْضُ صَلَاتِهِ بِإِنْمَاءٍ ثُمَّ قَدَّرَ عَلَى الرُّكُوعِ  
 وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ عَنْهُمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اِقْتِدَاءُ الرَّائِعِ بِالنُّومِيِّ فَكَذَا الْبِنَاءُ  
 وَمَنْ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا ثُمَّ أَعْيَى لِأَبَاسٍ أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصَا أَوْ خَائِطٍ أَوْ يَقْعُدَ  
 لِأَنَّ هَذَا عَذْرٌ وَإِنْ كَانَ الْإِتِكَاءُ بِغَيْرِ عَذْرٍ يَكْرَهُ لِأَنَّهُ إِسَاءَةٌ فِي الْأَدَبِ وَقِيلَ لِأَيْكَرَهُ  
 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) لِأَنَّهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَكَذَا لِأَيْكَرَهُ الْإِتِكَاءُ  
 وَعِنْدَهُمَا يَكْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقُعُودُ عَنْهُمَا فَيَكْرَهُ الْإِتِكَاءُ وَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِ عَذْرٍ  
 يَكْرَهُ بِالْإِتِّفَاقِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَنْهُ وَلَا تَجُوزُ عَنْهُمَا وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النُّوَافِلِ .

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি অসুস্থতা বশত বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ শুরু করল। এরপর (নামাজের মাঝেই) সূত্থ হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে তার পূর্ববর্তী নামাজের উপরই বিনা করে অবশিষ্ট নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো তাদের ইকতিদা সংক্রান্ত মতপার্থক্য। পূর্বে এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি আংশিক নামাজ ইশারা দ্বারা আদায় করার পর রুকু সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সকলের মতেই নতুন করে নামাজ শুরু করতে হবে। কেননা ইশারা দ্বারা আদায়কারীর পিছনে রুকু-সিজদাকারীর ইকতিদা করা জায়েজ নয়। সুতরাং বিনা ও জায়েজ হবে না। যে ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ শুরু করে পরবর্তীতে ক্লাস্ত হয়ে পড়ে সে লাঠিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াবে কিংবা বসে যাবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এটা ওজর, বিনা ওজরে হেলান দেওয়া অবশ্য মাকরুহ। কারণ তা আদবের পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা মাকরুহ নয়। কেননা তাঁর মতে বসা জায়েজ আছে। সুতরাং হেলান দেওয়া ও মাকরুহ হতে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু (বিনা ওজরে) বসা জায়েম নেই, সেহেতু হেলান দেওয়া ও মাকরুহ হবে। যদি (দাঁড়িয়ে নামাজ আরম্ভ করার পর) বিনা ওজরে বসে পড়ে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা মাকরুহ হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নামাজ দূরন্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দূরন্ত হবে না। নফল অনুচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে বসে রুকু-সিজদা দ্বারা আংশিক নামাজ আদায় করল, পরে নামাজের মাঝেই সূত্থ হয়ে গেল এবং কিয়ামের শক্তি ফিরে পেল। শায়খাইন (র.)-এর মতে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার নামাজের বিনা করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নতুন করে নামাজ শুরু করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও শায়খাইন (র.)-এর মূল মতপার্থক্য হলো এ ব্যাপারে যে, দাঁড়ানো ব্যক্তির বসা ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা জায়েজ কিনা? ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাঁড়ানো ব্যক্তির ইকতিদা বসা ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই। শায়খাইন (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। সুতরাং যেহেতু ইমাম মুহাম্মদ

(র.)-এর মতে দাঁড়ানো ব্যক্তির ইকতিদা বসা ব্যক্তির পিছনে জায়েজ নেই সেহেতু দাঁড়ানো অবস্থার বিনা ও বসা অবস্থার উপর জায়েজ নেই। আর শায়খাইন (র.)-এর মতে যেহেতু জায়েজ আছে; সেহেতু দাঁড়ানো অবস্থার নামাজের বিনা বসা অবস্থার নামাজের উপর জায়েজ হবে।

لَنْ يَكُنِيَ بِغَضِّ صَلَاتِهِ : এক ব্যক্তি অপারগতার কারণে আংশিক নামাজ ইশারা করে আদায় করল, পরে নামাজের মাঝেই রুকু ও সিজদার উপর শক্তি পেয়ে গেল, তাহলে আইখায়ে ছালাছার মতে শুধু থেকে নামাজ আরম্ভ করবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সুরতেও বিনা করা জায়েজ আছে। দলিল হলো, আমাদের মতে রুকুকারী ব্যক্তির ইকতিদা ইশারাকারীর পিছনে জায়েজ নেই। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। আর বিনা করার অবস্থাও তৈরি।

وَمِنْ اَفْتَتَحَ الطَّرْعُ الْخ কেউ যদি নফল নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করে অতঃপর কোনো জিনিসের উপর হেলান দেয় তবে এর দুই সুরত হতে পারে। হেলান হয়তো ওজরের কারণে দিয়েছে কিংবা ওজর ছাড়া দিয়েছে। যদি ওজরের কারণে হেলান দিয়ে থাকে এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি বিনা ওজরে দিয়ে থাকে তবে কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন, উলামায়ে আহনাফের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে তা মাকরুহ। কারণ হলো, বিনা ওজরে হেলান দেওয়া আদবের পরিপন্থী এবং বেআদবি, তবে এ বক্তব্যের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে বিনা ওজরে হেলান দেওয়ার মাঝে পার্থক্য ব্যান করতে হবে। কেননা ইমাম সাহেবের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরুহ নয় কিন্তু বিনা ওজরে হেলান দেওয়া মাকরুহ। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, শুরুতেই দাঁড়িয়ে নফল আরম্ভ করা আর বসে শুরু করার মধ্যে নফল পড়নেওয়ালার ইখতিয়ার আছে। সুতরাং তার এ ইখতিয়ার শেষেও বেলা কারাহাত বাকি থাকবে। তবে তার এ ইখতিয়ার নেই যে, শুরুতেই নফল নামাজ হেলান দিয়ে শুরু করবে। সুতরাং শুরুতে যখন তার ইখতিয়ার নেই, তখন শেষেও তার ইখতিয়ার বাকি থাকবে না। (পার্থক্য হয়ে গেল) কোনো কোনো মাশায়িখ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে নামাজের মাঝখানে যদি ওজর ব্যতীত হেলান দেওয়া হয় তবে তা বেলা কারাহাত জায়েজ। দলিল হলো, ইমাম সাহেবের মতে ওজর ব্যতীত নফল নামাজের মাঝখানে বসা মাকরুহ নয়, তাই হেলান দেওয়াও মাকরুহ হবে না। কেননা বসা যা দাঁড়ানোর বিপরীত যখন তা মাকরুহ হলো না তখন হেলান দেওয়া যা দাঁড়ানোর বিপরীত নয় তা অবশ্যই মাকরুহ হবে না। সাহেবাইনের মতে বিনা ওজরে হেলান দেওয়া মাকরুহ। কেননা তাঁদের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরুহ, তাই হেলান দেওয়াও মাকরুহ হবে।

لَنْ يَكُنِيَ بِغَضِّ عَزْرِ الْخ : কোনো ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আরম্ভ করে পরে বিনা ওজরে বসে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তা মাকরুহ হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে মাকরুহ হওয়া সত্ত্বেও নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে নামাজ সহীহ-ই হবে না।

উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে কিছুটা تَسَامَح হয়েছে। কারণ, উপরোক্ত সুরতে সাহেবাইন عدم جواز -এর প্রবক্তা। আর عدم جواز বলা بِكُرْهِ يَأْتِيَانِ সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাই সাহেবাইনের মাসলাকের ভিত্তিতে কখনো কখনো গিয়ে বলা হয়েছিল। সহীহ হবে? দ্বিতীয় কথা হলো, উপরোক্ত মাসআলা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল। নফল নামাজের মাঝখানে বিনা ওজরে বসা মাকরুহ। অথচ এর পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, ইমাম সাহেবের মতে বিনা ওজরে বসা মাকরুহ নয়। এ উভয় বর্ণনায় সামঞ্জস্য বিধান হলে এভাবে যে, মাযহাবের বর্ণনা মতে ইমাম সাহেবের বিতুদ্ধ মত হলো মাকরুহ না হওয়া। তার অপর একটি মত মাকরুহ হওয়াও রয়েছে। সুতরাং পূর্বের মাসআলায় বিতুদ্ধ মত আর এ মাসআলায় দ্বিতীয় মতকে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ عِنْدَ ابْنِ حَنِيفَةَ وَالْقِيَامَ أَفْضَلَ وَقَالَ لَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِنْ عَذْرِ لَأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا تَرْكُ وَلَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا دَوْرَانُ الرَّأْسِ وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ إِلَّا أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شِبْهِ الْخِلَافِ وَالْخُرُوجِ أَفْضَلَ مَا امْكَنَهُ لِأَنَّهُ اسْكَنَ لِلْقَلْبِ وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَةِ وَالْمَرْبُوطَةُ كَالشَّيْطَانِ هُوَ الصَّحِيحُ.

**অনুবাদ :** কোনো ব্যক্তি নৌকায় (জলযানে) বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়লে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। আর সাহেবাইন (র.) বলেন যে, ওজর ছাড়া তা জায়েজ হবে না। কেননা তার কিয়ামের সামর্থ্য আছে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, সেখানে মাথা ঘুরানোর সম্ভাবনাই প্রবল; সুতরাং সেটা বাস্তবতুল্য। তবে দাঁড়িয়ে পড়া হলো উত্তম। কেননা তা মতপার্থক্যের সংশয় থেকে উদ্ধৃত। আর যতটা সম্ভব নৌকা থেকে বের হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। কেননা তা অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিকর। এ মতপার্থক্য নোঙ্গরহীন নৌকার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বাঁধা নৌকা নদীর তীরের (ভূমির) মতোই। এটাই বিতর্কিত মত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, নৌকায় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির দু' অবস্থা, হয়তো সে দাঁড়াতে অপারগ হবে কিংবা হবে না। যদি অপারগ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। আর যদি অপারগ না হয় তবে দু' অবস্থা, নৌকা বাঁধা অবস্থায় থাকবে অথবা চলমান অবস্থায় থাকে। যদি বাঁধা অবস্থায় থাকে, তবে সকলের মতে বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। আর যদি নৌকা চলা অবস্থায় থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কোনো অসুস্থতা ছাড়াই বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে। তবে দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। একই মাযহাব ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর। সাহেবাইনের দলিল হলো, তার কিয়ামের সামর্থ্য রয়েছে। আর কিয়ামের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কিয়ামকে তরক করা জায়েজ নেই। তাই ঐ সুরতেও কিয়ামকে তরক করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নৌকায় চলা অবস্থায় নামাজ পড়া দ্বারা সাধারণত মাথা ঘুরার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আর প্রবল সম্ভাবনা তা বাস্তবতুল্য। যেমন, পার্শ্বের উপর শোয়াকে হাদাস বলা হয়েছে, কারণ সাধারণত এ অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যাবার কারণে বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। তাই প্রবলকে বাস্তবতুল্য মনে করে অজু ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এখানেও মাথা ঘুরানোর প্রবল ধারণাকে বাস্তবতুল্য মনে করে বলা হয়েছে যে, যেন এ ব্যক্তি কিয়াম থেকে অপারগ। আর যেহেতু সে কিয়াম থেকে অপারগ তাই বসে নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে ইমাম সাহেবের মতেও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। কেননা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া তা মতপার্থক্যের সংশয় মুক্ত। অর্থাৎ বসে নামাজ আদায়ের মধ্যে ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যদি সম্ভব হয় তবে নামাজের জন্য নৌকা থেকে বের হওয়া উত্তম। কেননা এর দ্বারা অন্তর অধিক প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি নৌকা থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হওয়ার পরও সে বের না হয় এবং নৌকাতেই নামাজ আদায় করতে নেয় তবে তাও জায়েজ হয়ে যাবে। গ্রন্থকার আরো বলেন, বিনা ওজরে বসে নামাজ আদায় ক'ন জায়েজ বা নাজাজেজ এর উপরোক্ত মতবিরোধ ঐ সকল নৌকার ক্ষেত্রে যেগুলো পারে বাঁধা নয় বরং চলমান আছে। আর যে সকল নৌকা কিনারায় বাঁধা অবস্থায় থাকে সেগুলো নদীর কিনারারই সাদৃশ্য। অর্থাৎ যেমনিভাবে ওজর ব্যতীত নদীর কিনারায় বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই, এমনিভাবে বাঁধা নৌকায়ও বিনা ওজরে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না এটাই হলো সহীহ অভিমত।

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ أَوْ دُونَهَا قَضَىٰ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ  
وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الْإِغْمَاءُ وَقَدْ صَلَوَةُ كَامِلٍ  
لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ فَشَبَّهَ الْجُنُونَ وَجْهَ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمُدَّةَ إِذَا طَالَتْ كَثُرَتْ الْفَوَائِتُ  
فَيَخْرُجُ فِي الْأَدَاءِ وَإِذَا قَصُرَتْ قَلَّتْ فَلَا حَرَجَ وَالْكَثِيرُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِأَنَّهُ  
يَدْخُلُ فِي حَيْدِ التَّكْرَارِ وَالْجُنُونَ كَالْإِغْمَاءِ كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو سَلِيمَانَ يَخْلَافُ النَّوْمَ لِأَنَّ  
إِمْتِدَادَهُ نَادِرٌ فَلْيَحَقِّقْ بِالْقَاصِرِ ثُمَّ الزِّيَادَةَ تَعْتَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْأَوْقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ  
التَّكْرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা তার চেয়ে কম সময় বেইশ থাকে, তবে সে কাজা আদায় করবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় বেইশ থাকে, তাহলে কাজা পর্যন্ত করবে না। এটা সূক্ষ্ম কিয়াস তথা ইস্তিহসানের সিদ্ধান্ত। আর সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী অজ্ঞানতা যদি এক পূর্ণ নামাজের ওয়াক্ত স্থায়ী হয়, তাহলে কাজা ওয়াজিব হবে না। কেননা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা পাগল হওয়ার সমতুল্য। ইস্তিহসানের ব্যাখ্যা হলো, সময় দীর্ঘ হলে কাজা নামাজের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সময় সংক্ষিপ্ত হলে কাজা নামাজের সংখ্যা কম হয়। ফলে তাতে কষ্ট হয় না। আর বেশির পরিমাণ হলো কাজা নামাজ একদিন ও একরাতের অধিক হয়ে যাওয়া। কেননা তখন তা পুনরাবৃত্তির গণিতে প্রবেশ করে। আর পাগল হওয়ার হুকুম অজ্ঞান হওয়ার মতো। আবু সুলায়মান (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। ঘুমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঘুম এত দীর্ঘ হওয়া বিরল। সুতরাং সেটা সংক্ষিপ্ত ওজরের পর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে বেশির পরিমাণ হিসাব করা হবে নামাজের ওয়াক্ত হিসাবে। কেননা সেটা পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতে সময় হিসাবে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। নির্ভুল তথ্য সম্পর্কে আল্লাহই উত্তম জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় বা তার চেয়ে কম সময় বেইশ থাকে তবে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে অধিক সময় বেইশ থাকে তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা হলো ইস্তিহসানের সিদ্ধান্ত। আর কিয়াসের চাহিদা হলো, যদি বেইশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় তাহলে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এরও মত। হানাবেলদের মতে ফউত হওয়া নামাজের কাজা ওয়াজিব হবে। যদিও এক হাজার নামাজ ফউত হয়। মোটকথা, হানাবেলদের মতে বেইশীর কারণে ফউত হওয়া নামাজ কম বা বেশি হোক সর্বাবস্থায় কাজা করা ওয়াজিব। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে যদি বেইশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় এবং একট মাত্র নামাজ ফউত হয় তবুও কাজা ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ বেইশীর কারণে ফউত হওয়া নামাজ কম বা বেশি হোক কোনো অবস্থাতেই কাজা ওয়াজিব হবে না। আমাদের ওলামায়ে কেরাম মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বলেছেন, যদি বেইশীর কারণে ফউত হয়ে যাওয়া নামাজের সংখ্যা কম হয় তবে তার কাজা করা ওয়াজিব। আর যদি বেশি হয় তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। হানাবেলদের দলিল হলো, বেইশী এক ধরনের রোগ। আর রোগের কারণে যত নামাজ ফউত হয় তার

কাজা করা ওয়াজিব। সুতরাং এ সূরতেও কাজা ওয়াজিব হবে। ফউত হওয়া নামাজ যত বেশিই হোক না কেন। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, যদি বেহুশী এক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত স্থায়ী হয় তবে-এতে অপারগতা পাওয়া যায়। আর কারো কারো মতে এটি পাগল- এর সাদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং তাদের মতে যেমনিভাবে পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের জুনু'নী কাজা ওয়াজিব করে না এমনিভাবে বেহুশী অবস্থায়ও কাজা ওয়াজিব হবে না। ইস্তিহসানের কারণ যা ওলামায়ে আহনাফের দলিল তা হলো, বেহুশীর সময় যত দীর্ঘ হবে ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যাও তত বেশি হবে। এখন যদি অনেক ফায়িতা-এর কাজা করার হুকুম দেওয়া হয় তখন সে ব্যক্তি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। আর যেহেতু ইসলামি শরিয়ত মানুষের দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করার পক্ষে তাই অনেক ফায়িতা-এর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি বেহুশীর সময় স্বপ্ন হয় তবে ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যাও কম হবে। আর অল্প নামাজের কাজা করাতে যেহেতু কোনো কষ্ট নেই তাই তার কাজা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আহনাফের দলিলকে এভাবেও বয়ান করা যায় যে, ওজর তিন ধরনের- এক. **مُتَعَدٍّ** তথা দীর্ঘ যেমন-শিশুকাল, সর্বসম্মতিক্রমে এটা ফরযিয়তের প্রতিবন্ধক। দুই. **فَاصِرٍ** তথা অসম্পূর্ণ যেমন ঘুম, এটা সর্বসম্মতিক্রমে ফরযিয়তের প্রতিবন্ধক নয়। এমনকি ঘুমের কারণে যদি নামাজ ফউত হয়ে যায় তবে তার কাজা ওয়াজিব। তিন. মাঝামাঝি পর্যায়ের যেমন পাগল ও বেহুশী। এগুলো যদি স্থায়ী হয় তবে **مُتَعَدٍّ**-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার কাজা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কম হয় তবে **فَاصِرٍ**-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার কাজা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, **كَثِيرٍ**-এর সীমা হলো, ফউত হওয়া নামাজের সংখ্যা একদিন ও রাতের চেয়ে বেড়ে যাওয়া। এমনকি ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্তও পার হয়ে যাওয়া। কেননা ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম করার দ্বারা নামাজের মধ্যে তাকরার শুরু হয়ে যায়। আর তাকরার পর **كُثْرَت** হওয়া যাহির-বাহির কথা।

**لَاغِيَا** দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম মালেক ও ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিয়েছেন। জবাবের হাসিল হলো, **اغْيَاء** তথা বেহুশী জুনু'নের মতো নয় বরং **جُنُونٍ** হলো **اغْيَاء**-এর অনুরূপ। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অধিক সময় যদি জুনুন থাকে তবে কাজা রহিত হয়ে যায়। আর যদি কম হয় তবে রহিত হয় না। আবু সুলাইমান (র.) এটাই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ঘুম যদি বেশি ও হয় তথাপিও কাজা রহিত হবে না। কিন্তু ঘুমের অধিক দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারটি নাদির তথা খুব কমই হয়ে থাকে।

এ জন্য তাকে **عذر قاصر**-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, **عذر مُتَعَدٍّ**-এর সাথে নয়।

ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে একমত যে, **كَثِيرٍ**-এর সীমা হলো কাজা নামাজের সংখ্যা একদিন ও একরাত থেকে বেড়ে যাওয়া। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ বৃদ্ধি পাওয়াটা **اَلْاَوْقَاتِ** **مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتِ** না **مِنْ حَيْثُ الْاَوْقَاتِ** গ্রহণযোগ্য হবে? ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, **مِنْ حَيْثُ الْاَوْقَاتِ** গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ যদি ছয় নামাজ ফউত হয়ে যায় এবং ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম করে তবে **كُثْرَت** সাবিত হয়ে যাবে। আর **كُثْرَت فُرَاتٍ**-এর কারণে কাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ষষ্ঠ নামাজের ওয়াক্ত পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম না করে; বরং কিছু সময় অতিক্রম করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে **كُثْرَت** সাবিত হবে না এবং তার জিম্মা থেকে কাজা রহিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, “তাকরার” ছয় ওয়াক্ত নামাজের ফউত হওয়া দ্বারাই সাবিত হয়ে যাবে। আর ছয় নামাজের ওয়াক্ত ফউত হওয়াই **مُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ**-কে আবশ্যক করে যা কাজাকে সািকিতকারীও বটে। এ জন্য **كُثْرَت**-এর সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নামাজ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিই ধর্তব্য হবে। শায়খাইন (র.) বলেন, **كُثْرَت**-এর সীমার মধ্যে **سَاعَات**-এর ইতিবার করা হবে; **اَوْقَات**-এর নয়। অর্থাৎ একদিন ও একরাত থেকে যদি দুই ঘট্টাও বেশি হয়ে যায় তবে **كُثْرَت** সাবিত হয়ে যাবে। এটা হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। উপরোক্ত মতবিরোধের ফলাফল বের হবে এভাবে যে, এক ব্যক্তি চাশতের সময় থেকেই বেহুশ হয়ে গেল। অতঃপর পরের দিন সূর্য হেলে পড়ার এক ঘট্টা পূর্বেরি সে হুশ ফিরে পেল। এখন এটা **سَاعَات** হিসাবে একদিন ও একরাতের চেয়ে বেশি। তাই শায়খাইনের মতে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা এ সূরতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অধিক নামাজ পাওয়া যায়নি। নির্ভুল জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।



## بَابُ فِي سَجْدَةِ التَّلَاوةِ

قَالَ سَجُودُ التَّلَاوةِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ عَشْرٌ فِي أَجْرِ الْأَعْرَافِ وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمَ وَالْأُولَى مِنَ الْحِجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالْمَ تَنْزِيلِ وَصَ وَحَمَّ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَقْرَأَ كَذَا كُتِبَ فِي مِصْرَفِ عُثْمَانَ (رض) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحِجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا وَمَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِي حَمَّ السَّجْدَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ لَا يَسْأَمُونَ فِي قَوْلِ عُمَرَ (رض) وَهُوَ الْمَأْخُذُ لِلِاخْتِبَاطِ وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِيِ وَالسَّامِعِ سَوَاءً قُصِدَ سَمَاعُ الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يُقْصَدْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا وَهِيَ كَلِمَةٌ إِنْجَابٍ وَهُوَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالنَّقْصِ وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ لِإِلْتِزَامِهِ مُتَابَعَتَهُ وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ عِنْدَ آيَةِ حَنِيفَةَ وَأَيُّ يُوسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) يَسْجُدُ وَنَهَا إِذَا فَرَّغُوا لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ وَلَا مَانِعَ بِخِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى خِلَافٍ وَضِعَ الْإِمَامَةُ أَوْ التَّلَاوةُ وَلَهُمَا أَنَّ الْمُفْتَدَى مَخْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ لِنِفَازِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفِ الْمَخْجُورِ لِحُكْمِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْجَنْبِ وَالْحَائِضِ لِأَنَّهُمَا مُنْهَيَّانِ عَنِ الْقِرَاءَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ بِتِلَاوَتِهَا كَمَا لَا يَجِبُ بِسَمَاعِهَا لِإِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْجَنْبِ .

### পরিচ্ছেদ : তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কুরআন শরীফে মোট চৌদ্দটি সিজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। (১) সূরা তুল আ'রাফের শেষে, (২) সূরা তুর রা'দ, (৩) সূরা তুন নাহল, (৪) সূরা বনী ইসরাঈল, (৫) সূরা মারইয়াম, (৬) সূরা তুল হাজ্জ-এর প্রথমটি, (৭) সূরা তুল ফুরকান, (৮) সূরা আন'নামুল, (৯) আলিফ-লাম-মীম তানযীল, (১০) সূরা সা-দ, (১১) সূরা হামীম সাজ্দা, (১২) সূরা তুন নাজম, (১৩) সূরা ইয়াস-সামাউন শাক্কাত ও (১৪) সূরা ইকরা। মাসহাফে ওসমানীতে এভাবেই লিখিত হয়েছে এবং এটাই নির্ভরযোগ্য। সূরা তুল হাজ্জ-এর সিজদার দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদের মতে নামাজের সিজদা সংক্রান্ত। আর হামীম আস্ সাজদা-এর সিজদাতুল হলো, لَا يَسْأَمُونَ আয়াতটি। এটা ওমর (রা.)-এর মত এবং সতর্কতা অবলম্বনে এটাই গ্রহণীয়। এ সকল স্থানে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব। কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সিজদার আয়াত যে শ্রবণ করেছে এবং যে তিলাওয়াত করেছে উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব। অথবা এটা ওয়াজিব নির্দেশক। আর তা ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। ইমাম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তখন তিনি সিজদা করবেন এবং

মুক্তাদীও তাঁর সঙ্গে সিজদা করবে। কেননা, সে ইমামের অনুসরণ নিজ কর্তব্য রূপে গ্রহণ করেছে। মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা করবে না, নামাজের মধ্যেও না নামাজের পরেও না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, নামাজ শেষ করার পর সকলেই সিজদা করবে। কেননা, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। নামাজের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, নামাজের ভিতরে সিজদা করা ইমামতির অথবা তিলাওয়াতের অবস্থার বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে যাবে। শায়খাইনের যুক্তি হলো, মুক্তাদীর উপর ইমামের কর্মকাণ্ড আরোপিত হওয়ার কারণে সে কিরাআত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মের উপর কোনো হুকুম আরোপিত হয় না। জুনুবি ও হয়েযখস্ত নারীর অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তাদের কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হয়েযখস্ত নারীর উপর তিলাওয়াতের কারণে সিজদা ওয়াজিব হবে না, তদ্রূপ শ্রবণের কারণেও ওয়াজিব হবে না। কেননা, তার নামাজ আদায়ের যোগ্যতাই নেই। জুনুবি ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উচিত তো ছিল সিজদায়ে তিলাওয়াতকে সিজদায়ে সাহুর সাথে সাথেই উল্লেখ করা। কেননা, তন্মধ্যকার উভয়টিই হলো সিজদা সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ *عارض ساربه*-এর কারণে হয় এবং সিজদায়ে সাহুর নামাজও *عارض ساربه*-এর কারণে হয়, এই মুনাসাবাতের কারণে সিজদায়ে সাহুর পর অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং যখন মুনাসাবাতের কারণে সিজদায়ে সাহুর পর অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আলোচনা করা হয়েছে, তাই তিলাওয়াতে সিজদার আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই পরে এসে গেছে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের মধ্যে *حکم*-এর *اضافة*-এর দিকে করা হয়েছে। কেননা, সিজদার *سبب* হলো তিলাওয়াত-ই। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তিলাওয়াত ছাড়া *سماع* ও তো সিজদার *سبب*, তাহলে তো এভাবে বলা উচিত ছিল *سَبَبُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالسَّمْعِ* এর জবাব হলো তিলাওয়াত যেমনিভাবে সিজদার *سبب*, এমনিভাবে *سماع* ও সিজদার *سبب*। সুতরাং তিলাওয়াতের আলোচনা দ্বারা *سماع*-এর আলোচনাও *من وجه* হয়ে গেছে। এ কারণেই শুধু তিলাওয়াতের আলোচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

কুদরী গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুরআনে কারীমে মোট চৌদ্দটি আয়াতে সিজদা রয়েছে। যথা-

১. সূরায়ে আ'রাফের শেষে, যেমন- *إِنَّ الَّذِي عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسُحِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ*
২. সূরায়ে রারদের মধ্যে, যেমন- *وَلِلَّهِ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لِّلَّهِ الْبَاقِرُونَ الْأَوَّلُونَ*
৩. সূরায়ে নাহলের মধ্যে, যেমন- *يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ*
৪. সূরায়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যে, যেমন- *وَيَخْرُجُونَ لِيْلَاقِيَانِ يَنْبَغُونَ وَيُزِيدُهُمْ خَشْرَةً*
৫. সূরায়ে মারযামের মধ্যে, যেমন- *وَإِذَا تَنَفَّسْتُمْ عَلَيْهِنَّ أَيْدِي الرِّحْمَنِ خَرُورًا سِجْدًا وَبُكْيًا*
৬. সূরায়ে হাজ্জের প্রথমটি, যেমন- *وَمَنْ يُؤَيِّنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ*
৭. সূরায়ে ফুরকানের মধ্যে, যেমন- *وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرِّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرِّحْمَنِ اسْجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَ هُمْ تُفُورًا*
৮. সূরায়ে নামলের মধ্যে, যেমন- *أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ*
৯. সূরায়ে সাজদা (আলিফ- লাম-মীম- তানযীল)-এর মধ্যে, যেমন- *إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ*
১০. সূরায়ে সা-দ-এর মধ্যে, যেমন- *فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ - وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَّآبٍ*
১১. সূরায়ে হামীম সাজদার মধ্যে, যেমন- *يَسُحِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ*

১২. সূরায়ে নাজমের মধ্যে, যেমন- فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

১৩. সূরায়ে ইয়াস সামাউন শাক্কাতের মধ্যে, যেমন- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

১৪. সূরায়ে আলাক -এর মধ্যে, যেমন- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

হিদায়া গ্রন্থকার উপরোক্ত সিজদার চৌদ্দ স্থানের ক্ষেত্রে মাসহাফে ওসমানীর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর মাসহাফে ওসমানী হলো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ إِلَى الْحَجِّ الْغ

শাফি'ঈ (র.)-এর মতে ও সিজদার আয়াত চৌদ্দটি। তবে তাঁর মতে সূরায়ে হাজ্জের উভয় সিজদাই হলো। তিলাওয়াতের সিজদা। আর সূরায়ে ৷-এর মধ্যে কোনো সিজদা নেই; বরং সিজদায়ে শুকর আছে। আর আমাদের মতে সূরায়ে হাজ্জের প্রথম সিজদা হলো তিলাওয়াতে সিজদা আর দ্বিতীয় সিজদা দ্বারা নামাজের সিজদা মুরাদ, তিলাওয়াতে সিজদা মুরাদ নয়। আর আমাদের মতে সূরায়ে ৷-এর সিজদা তিলাওয়াতে সিজদা।

সূরায়ে হাজ্জের দুই সিজদার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীস-  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَصَلَّى الْحَجَّ يَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا لَمْ يَتِمَّ

সূরায়ে হাজ্জকে দুই সিজদা দ্বারা ফজিলত দেওয়া হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ দুই সিজদা আদায় করল না সে যেন সূরাই পড়েনি। আমাদের দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, فَلَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ فِي الْحَجِّ إِلَى الْأَوَّلَى وَالثَّانِيَةَ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ দ্বিতীয়টি হলো নামাজের সিজদা। এর সমর্থন একথা দ্বারাও বুঝে আসে যে, দ্বিতীয় সিজদাকে রুকুর সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বলা হয়েছে وَارْكُعُوا وَسَجِدُوا রুকু করে, সিজদা আদায় করে। আর কায়দা আছে যে, যে সিজদা রুকুর সাথে মিলে থাকে তার দ্বারা নামাজের সিজদা মুরাদ হয়ে থাকে। যেমন- হযরত মারইয়াম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল, وَاسْجُدِي وَارْكُعِي এখানেও নামাজের সিজদা মুরাদ।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহর বাণী-عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ-এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম সিজদা তিলাওয়াতের সিজদা আর দ্বিতীয় সিজদা নামাজের সিজদা। সূরায়ে ৷-এর মধ্যে সিজদায়ে শুকরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কিং ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস-  
ثَلَاثِي خُطْبَةٍ سُرَّةٍ مِّنْ قِسْطِ النَّاسِ لِمِثْلِ مَا قَالُوا فَقَالَ عَلَامَ تَسْتَرْثَمُونَ إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيِّ وَقَالَ ﷺ سَجْدَةً دَاوُدَ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা খুতবার মধ্যে সূরায়ে ৷ তিলাওয়াত করলেন (সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের সময়) লোকেরা সিজদার জন্য তৈরি হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমরা সিজদার জন্য কেন তৈরি হচ্ছে এটা তো হলো নবীর তওবা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই স্থানে পৌছে হযরত দাউদ (আ.) সিজদা করেছিলেন তওবা হিসাবে, আর আমরা সিজদা করি শুকরিয়া হিসাবে। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাব হলো, সিজদায়ে শুকর সিজদায়ে তিলাওয়াতের মুনাফী নয়। কেননা, কোনো ইবাদত এমন নেই যার মধ্যে শুকরের অর্থ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও সাবিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মাঝখানে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা সূরায়ে ৷-এর সিজদাটি তিলাওয়াতে সিজদা হওয়া বুঝে আসে। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, তিনি এ স্থানে সিজদা করেননি। তখন বলা হবে যে এটা ছিল جواز تاخير অর্থাৎ বিলম্বের বৈধতার তালীমের জন্য। এ কারণে নয় যে, এ স্থানে সিজদায়ে তিলাওয়াতে ওয়াজিব নয়।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, এক সাহাবী একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখছে যে, সে সূরায়ে ৷ লিখতেছে। যখন সিজদার স্থান পর্যন্ত পৌঁছল তখন দেখল যে, দোয়াত ও কলম সিজদা করা আরম্ভ করল। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দোয়াত ও কলমের তুলনায় আমরা সিজদা

করার অধিক হকদার। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন সিজদার আয়াত পড়া হলো এবং তিনিও সাহাবীর সাথে সিজদা করলেন। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, حم سجده -এর মধ্যে সিজদার আয়াত হলো لَا يَسْأَلُونَ য়েমন- হয়রত ওমর (রা.) বলেছেন। আর এর উপর আমল করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

وَالسَّجْدَةُ رَاجِعَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْخ: ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দ স্থানে কারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। শ্রবণকারী শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম মালিক (র.) ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং হামাবেলাদের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো, হয়রত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সূরায়ে নাজম তিলাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কেউ সিজদা আদায় করেননি। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। কেননা, যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হয়রত য়ায়েদ (রা.) কেউই উভয় সিজদাকে তরক করতেন না। আমাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- تَلَامَا عَلَى مَنْ سَبَعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَامَا -এর দলিল হলো এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে عَلَى শব্দটি এসেছে, যা ওয়াজিব নির্দেশক। আর যেহেতু হাদীসটি ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয় এ জন্য প্রত্যেক শ্রবণকারীর উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। শ্রবণের ইচ্ছা করুক বা না করুক। ইমাম মালিক (র.) এবং অন্যান্যদের পক্ষ থেকে উথাপিত দলিলের জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। আর আমাদের মতে তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা না করা জায়েজ। তা ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা না করার দ্বারা عَلَى السَّجْدَةِ সিজদা না করা বুঝে আসে না। সুতরাং হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে সিজদা আদায় করেছেন। উক্ত সম্ভাবনার কারণে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব না হওয়া সাবিত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَا تَلَا الْإِسْمَاءَ أَيْ السَّجْدَةِ الْخ: ইমাম যদি নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তবে ইমাম নামাজের মধ্যে সাথে সাথে সিজদা আদায় করবে, আর তাঁর সাথে মুক্তাদীরাও সিজদা করবে। দলিল হলো, মুক্তাদী ইক্তিদার নিয়ত দ্বারা ইমামের অনুসরণ করাকে তার উপর লায়িম করে নিয়েছে। এ অবস্থায় যদি মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে, তবে তো ইমামের বিরোধিতা করা লায়িম আসে। আর যদি মুক্তাদী নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে শায়খাইন (র.)-এর মতে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা আদায় করবে না। নামাজের মধ্যেও না, নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পরও না। এটিই হলো عامة العلماء -এর মাযহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী যখন নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যাবে তখন সকলে সিজদা আদায় করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তাদীর সিজদার আয়াত পড়া আর অন্যান্যদের তা শুনা। আর সিজদার প্রতিবন্ধকতা (অর্থাৎ তার নামাজের ভিতরে থাকা) দূর হয়ে গেছে। আর কায়দা রয়েছে, যখন কোনো জিনিসের সবব পাওয়া যায় এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় তখন ঐ জিনিস অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ জন্য নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত হলো নামাজের অবস্থা। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা আদায় করবে না। কেননা, নামাজের ভিতরে সিজদা করার দ্বারা ইমামতের অথবা সিজদায়ে তিলাওয়াতের পরিপন্থী লায়িম আসবে। কেননা, যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করল সে প্রথমে সিজদা করবে অথবা ইমাম প্রথমে সিজদা করবে। যদি তিলাওয়াতকারী অর্থাৎ মুক্তাদী প্রথমে সিজদা করে আর ইমাম তার অনুসরণ করে, তবে তো ইমামতের পরিপন্থী কাজ করা লায়িম আসবে। অর্থাৎ ইমাম যিনি متابع ছিলেন তিনি تابع হয়ে গেলেন, আর মুক্তাদী যিনি تابع ছিলেন তিনি تابع হয়ে গেলো। আর যদি ইমাম প্রথমে সিজদা করে, আর তিলাওয়াতকারী অর্থাৎ মুক্তাদী তার অনুসরণ করে তবে তো তিলাওয়াতের পরিপন্থী কাজ করা লায়িম আসবে। কেননা, সাধারণত تالী (তিলাওয়াতকারী) ব্যক্তি سامع তথা শ্রবণকারী ব্যক্তির ইমাম হয়ে থাকে। সুতরাং তিলাওয়াতকারীর সিজদা অগ্রে করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াতকারী সথকে বলেছিলেন- كُنْتُ إِسْمَاعِيلَ فَلَوْ سَجَدْتُ لَسَجَدَ مَعَكَ -তুমি আমাদের ইমাম, তুমি যদি সিজদা কর তোমার সাথে আমরাও সিজদা করব। মোটকথা, তিলাওয়াতকারীর সিজদা আগে করা ওয়াজিব। আর এখানে ব্যাপারটি উল্টো হয়ে গেল। অর্থাৎ ইমাম আগে সিজদা করল আর মুক্তাদী পরে সিজদা করল। তাই নামাজের ভিতরে সিজদা করার দ্বারা যখন কোনো না কোনো খারাবি লায়িম আসে তাই নামাজের ভিতরে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সিজদা করবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, «ممنوع عن الفراء» ইওয়ার ক্ষেত্রে জুন্নবী ও হায়েযা বরাবর। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, হায়েযা নারীর নিজের তিলাওয়াত দ্বারাও সিজদা ওয়াজিব হবে না এবং অন্যের তিলাওয়াত শুনার দ্বারাও হবে না। আর জুন্নবী ব্যক্তি যদি নিজে তিলাওয়াত করে তখনও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি অন্যের থেকে শুনে তখনও ওয়াজিব হবে। কারণ, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নামাজের আহলিয়ত-যোগ্য হওয়া জরুরি চাই নামাজ।<sup>১৬</sup> হোক কিংবা قضاء হোক। হায়েযা নারী উভয় দিক থেকেই নামাজের আহাল নয়। কিন্তু জুন্নবীর মধ্যে নামাজের আহলিয়ত বিদ্যমান। কেননা, জুন্নবী ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের ভিতরেই গোসল করে নেয় তবে তার উপর আদা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর ওয়াক্তের বাহিরে গোসল করলে কামা ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ سَجَدَهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْحَجَرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَعْدُوهُمْ وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوا فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَسَجْدُوهَا بَعْدَهَا لِيَتَحَقَّقَ سَبَبُهَا وَلَوْ سَجَدُوا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُجْزِهِمْ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ لِمَكَانِ النِّهْيِ فَلَا يُتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ .

অনুবাদ : যদি উক্ত নামাজ বহির্ভূত কোনো ব্যক্তি (ইমাম বা মুক্তাদী থেকে) উক্ত আয়াত শ্রবণ করে তবে সে সিজদা করবে। এটাই বিতর্ক মত। কেননা, (শরিয়ত কর্তৃক) প্রতিবন্ধকতা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাদের অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না। যদি নামাজের ভিতরে থেকে তারা এমন লোকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে, যে নামাজে তাদের সাথে শরিক নেই, তাহলে তারা নামাজে ঐ তিলাওয়াতে সিজদা করবে না। কেননা, এটি নামাজভুক্ত সিজদায়ে তিলাওয়াত নয়। কারণ, তাদের এই সিজদার আয়াত শ্রবণ নামাজের কোনো আমল নয়, তবে নামাজের পরে এর জন্য তারা সিজদা করবে। কেননা, সিজদার কারণ পাওয়া গেছে। যদি তারা নামাজের মধ্যেই সিজদা আদায় করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা নিম্নমানের সিজদা। সুতরাং তা দ্বারা পূর্ণমানের সিজদা আদায় হতে পারে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাজের বাইরে এমন ব্যক্তি যদি ইমাম কিংবা মুক্তাদী থেকে সিজদার আয়াত শুনে এবং শুনার পর নামাজে शामिल না-ও হয় তারপরও সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। এটাই বিতর্ক মত। কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত হুকুমটি হলো مختلف منه তথা বিরোধপূর্ণ। যেমন- শায়খাইন (র.)-এর মতে উক্ত ব্যক্তি সিজদা করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সিজদা করবে। বিতর্ক মতের দলিল হলো: محجور عن الفراء: মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। তাই তাদেরকে অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না; বরং তার উপরই তা আরোপিত হবে।

وَأِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مাসআলা, যদি কিছু লোক নামাজরত অবস্থায় এমন ব্যক্তি থেকে সিজদার আয়াত শুনে যে নামাজে তারা শরিক নয় তবে তারা নামাজের হালাতে সিজদা করবে না। কেননা, এ সিজদা নামাজের সিজদা নয়। কারণ, তাদের এ সিজদার আয়াতটি শুনা নামাজের কোনো আমল নয়। কেননা নামাজের আমল হয় ফরজ হবে, না হয় ওয়াজিব কিংবা সুন্নত হবে। আর উক্ত আয়াতটি শুনা কোনোটিই নয়। মোটকথা, উক্ত সিজদা নামাজের কোনো আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যা নামাজের আমল নয় তা নামাজের ভিতরে আদায় করাও জায়েজ নয়। সুতরাং বুখা গেল এরা নামাজের ভিতরে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করবে না। তবে নামাজের পর সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা, সিজদা আদায়ের সবব তথা আয়াতে সিজদা তারা শ্রবণ করেছে।

وَلَوْ سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ مাসআলা, পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছে যে, ঐ সকল লোকদের জন্য নামাজের ভিতরে সিজদা করা নিষেধ। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি তারা সিজদা করে তবে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না। তবে নামাজও ফাসিদ হবে না। সিজদা গ্রহণ না হওয়ার দলিল হলো, এ সিজদাটি হলো নিম্নমানের সিজদা। কেননা, শরিয়ত নামাজের ভিতরে প্রত্যেক ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছে যা নামাজের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুখা গেল, এ সিজদাটি হলো নিম্নমানের সিজদা, আর এদিকে শ্রবণের কারণে যে সিজদা ওয়াজিব হয় তা হলো, পূর্ণমানের সিজদা। আর কায়দা আছে যে, পূর্ণমাণের কাজ নিম্নমানের কাজ দ্বারা আদায় হয় না। এ জন্য তাদের নামাজের মধ্যে সিজদা করার দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হবে না।

فَلَمْ تَرَ إِلَى الْإِسْمَاعِيلِ مَاسْأَلَا، إِيْمَامُ سِجْدَانِ اَيَّاهُ تِلَا وِيءَاتُ كَرِهَعْلَهُ اَوْرُا تَا اَمْنِم بَاقِيَهْ تُنَالَحُهُ يَهْ اِيْمَامُم  
নামাজের সাথে শরিক নয়, অতঃপর এ ব্যক্তি ইমানের সাথে নামাজে শরিক হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত সূরত রয়েছে হযোতা সে  
ইমামের সিজদা করার পর নামাজে শরিক হয়েছে কিংবা সিজদা করার পূর্বে শরিক হয়েছে। যদি প্রথম সূরত হয়, তবে তার  
উপর সিজদা করা জরুরি নয়। কেননা, এ রাকআতে শরিক হওয়ার দ্বারা এ সিজদাতেও সে শরিক হয়েছে বলে গণ্য হয়েছে  
আর যদি সে দ্বিতীয় রাকআতে ইমামের সাথে শরিক হয়, তাহলে নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর তিলাওয়াতে সিজদা আদায়  
করবে; কেননা, সে যখন এ রাকআতে পায়নি যার মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছিল, তবে তো সে কিরাআত ও  
পায়নি এবং তার صلاتها তথা সিজদাও পায়নি, আর যেহেতু সে সিজদা পায়নি তাই নামাজ থেকে ফরিগ হওয়ার পর তার  
সিজদা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি দ্বিতীয় সূরত হয়, অর্থাৎ ইমামের সিজদা করার আগে ইমামের সাথে শরিক হয়  
তবে ইমামের সাথে সিজদা করবে; কেননা, এ ব্যক্তি যদি সিজদার আয়াত না জনতো, যথা ইমাম চূপে চূপে অযাহাত সিজদা  
পড়তো, তথাপিও ইমামের সাথে তার সিজদা করা ওয়াজিব হতো। সুতরাং এ সূরত যখন সে সিজদার আয়াত ও জনল  
সুতরাং তার তো ইমামের সাথে সিজদা করা ওয়াজিব। আর এ ব্যক্তি ইমাম থেকে অব্যাহত সিজদা তাই নামাজে শরিক হয়নি  
তাই নামাজের বাইরে তার সিজদা করা ওয়াজিব হবে। কেননা, সিজদার সব অর্থ্যাৎ আয়াতে সিজদা শুধুমাত্র পাওয়া গেছে।

وَكُلُّ سَجْدَةٍ وَجِبَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُدْهَا فِيهَا لَمْ تَقْضِ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا  
 صَلَاتِيَّةٌ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلَاةِ فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ وَمَنْ تَلَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ  
 فِي صَلَاةٍ فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْرَاتُ السَّجْدَةِ عَنِ التَّلَاوَتَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَقْوَى لِكُونِهَا  
 صَلَاتِيَّةً فَاسْتَبَعَتْ الْأَوَّلَى وَفِي التَّوَارِدِ يَسْجُدُ أُخْرَى بَعْدَ الْفَرَاغِ لِأَنَّ لِأَوَّلَى قُوَّةَ السَّبْقِ  
 فَاسْتَوَتْ قُلْنَا لِلثَّانِيَةِ قُوَّةُ اتِّصَالِ الْمَقْصُودِ فَتَرَحَّجَتْ بِهَا .

**অনুবাদ :** যে সিজদা নামাজের মধ্যে ওয়াজিব হলো কিন্তু সে নামাজের মধ্যে আদায় করল না, তবে নামাজের বাইরে আর কাজ করবে না। কেননা, এ হলো নামাজের মধ্যকার সিজদা। তার নামাজভিত্তিক অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং নিম্নমানের সিজদা দ্বারা তা আদায় হবে না। যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করল, এরপর সিজদা না করেই নামাজ শুরু করে উক্ত আয়াত পুনঃ পাঠ করল এবং সিজদা করল, তার দু'বারের তিলাওয়াতের জন্য এ সিজদাই যথেষ্ট হবে। কেননা, দ্বিতীয় সিজদাটি সালাতভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। তবে 'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আর এক সিজদা করে নিবে। কেননা, প্রথম সিজদাটি অগ্রগামিতার প্রাধান্য রাখে। সুতরাং উভয়টি সমমানের হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য হলো, উদ্দেশ্যের সাথে আদায় নিজে সংযুক্ত হওয়ার কারণে এর অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং এদিক থেকে তা অগ্রগণ্য হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুদুরী গ্রন্থকার (র.) একটি নীতি করেছেন। নীতিটি হলো, প্রত্যেক ঐ সিজদা যা নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হয়। কিন্তু নামাজের মধ্যে সিজদা আদায় করা হয় না। ঐ সিজদা নামাজের বাইরে আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। দলিল হলো, এ সিজদাটি হলো নামাজের সিজদা। নামাজের সিজদা হওয়ার অর্থ হলো, আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত যা সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ তা নামাজের আফয়াল তথা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আর নামাজের সিজদার মধ্যে নামাজের ফজিলত রয়েছে। এ জন্য নামাজের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াতের উজ্বল কমিল তথা পরিপূর্ণ হলো। আর যে জিনিষে **حُجْرٌ كَامِلٌ** হয় তা নাকিস তথা অসম্পূর্ণতার সাথে আদায় করার দ্বারা আদায় হয় না। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নামাজের বাইরে যেহেতু নামাজের ফজিলত নেই। এ জন্য নামাজের বাইরে যে সিজদা আদায় করা হবে তা নাকিস হবে, তথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এর বর্ণনা করা হয়েছে। মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদা আদায় না করেই কোনো নফল বা ফরজ নামাজ দাখিল হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় ঐ সিজদার আয়াত নামাজের মধ্যে তিলাওয়াত করে এবং নামাজের মধ্যেই সিজদা আদায় করে তবে তার ঐ সিজদা উভয় তিলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। দলিল হলো, দ্বিতীয় সিজদাটি নামাজের সিজদা হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। এ জন্য দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার দ্বারা প্রথম সিজদাও আদায় হয়ে যাবে। তবে 'নাওয়াদির' নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, নামাজের মধ্যে সিজদা আদায় করার দ্বারা এক সিজদা আদায় হবে। দ্বিতীয় সিজদা নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর আদায় করা জরুরি। দলিল হলো, দ্বিতীয় সিজদা নামাজভুক্ত হওয়ার কারণে যদিও শক্তিশালী, কিন্তু প্রথম সিজদা অগ্রগামিতার কারণেও শক্তি রাখে। তাই শক্তিতে উভয়টি এক সমান। সুতরাং একটি অপরাটর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ কারণে একটি সিজদা আদায়ের দ্বারা অপর সিজদা আদায় হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের জবাব হলো, দ্বিতীয় সিজদা বরাবর হওয়ার পরও অতিরিক্ত একটি শক্তি রাখে, তা হলো, তিলাওয়াতটি আদায়ের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যখন নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদাটি তিলাওয়াত করল, তখন তে তার সাথে সাহেই সিজদা আদায় করেছে। পক্ষান্তরে প্রথমবার যখন নামাজের বাইরে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিল তখন সিজদা আদায় করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হলো যে, প্রথম সিজদার তুলনায় দ্বিতীয় সিজদাটি অধিকতর শক্তিশালী। এ কারণে দ্বিতীয় সিজদা অগ্রগণ্য হবে এবং দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার দ্বারা প্রথমটিও আদায় হয়ে যাবে।



وَأَنَّ تَلَاهَا فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَتَلَهَا سَجْدَ لَهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ الْمُسْتَتَبِعَةَ  
وَلَا وَجْهَ إِلَى الْحَاقِقِهَا بِأَلَاؤِ لِي لَأَنَّهُ يُوَدِّي إِلَى سَبَبِ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ  
سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجَزَّ أَنْ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسٍ فَسَجْدَهَا ثُمَّ  
ذَهَبَ وَرَجَعَ فَقَرَأَهَا سَجْدَهَا ثَانِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجْدَ لِلْأُولَى فَعَلَيْنِ سَجْدَتَانِ وَالْأَصْلُ أَنَّ  
مَبْنَى السَّجْدَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ دَفْعًا لِلحَرَجِ وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْبَقْ  
بِالْعِبَادَاتِ وَالثَّانِي بِالْعُقُوبَاتِ وَإِمَّا كَانَ التَّدَاخُلُ عِنْدَ إِتْحَادِ الْمَجْلِسِ لِكُرْبِهِ جَامِعًا  
لِلْمُتَفَرِّقَاتِ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ وَلَا يَخْتَلِفُ بِمَجْرَدِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ  
الْمُخَيَّرَاتِ لَأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَهُوَ الْمُبْطَلُ هُنَاكَ وَفِي تَسْدِيَةِ الشُّرُوبِ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ  
وَفِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ كَذَلِكَ فِي الْأَصْحِ وَكَذَا فِي الدِّيَاسَةِ لِلْإِحْتِيَاطِ .

অনুবাদ : আর যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদা করে, এরপর নামাজে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এর জন্য আবার সিজদা করবে। কেননা, দ্বিতীয়বার আয়াতে সিজদা তার পক্ষতে এসেছে। অতএব, এটিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা, এমতাবস্থায় “কারণ”-এর উপর “কার্য” অগ্রবর্তী হয়ে পড়বে; যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একটি মাত্র সিজদার আয়াত পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে একই সিজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি নিজ স্থানে আয়াত তিলাওয়াত পূর্বক সিজদা করে এরপর অন্যত্র গিয়ে উক্ত আয়াত আবার তিলাওয়াত করে, তবে দ্বিতীয়বার সিজদা করতে হবে। আর প্রথম তিলাওয়াতের জন্য সিজদা না করে থাকলে তার উপর দু’টি সিজদাই ওয়াজিব হবে। মূল নিয়ম হলো, কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতে সিজদার ভিত্তি হলো একত্রীকরণের উপর। আর এ একত্রীকরণ সাধিত হবে (সিজদার) কারণ (অর্থঃ তিলাওয়াত)-এর ক্ষেত্রে, হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে নয়। ইবাদতের ব্যাপারে এটাই মুনাসিব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি শান্তি বিষয়ক ক্ষেত্র অধিক যুক্তিযুক্ত। আর একত্রীকরণ তখনই সম্ভব, যখন মজলিস অভিন্ন হবে। কেননা, মজলিসই হলো বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্রকারী। সুতরাং মজলিস যখন বিভিন্ন হবে তখন হুকুম বা বিধান মূল অবস্থায় ফিরে যাবে। শুধু দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তালকের ইখতিয়ার প্রাপ্ত নারীর বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে দাঁড়ানো গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে, আর তা ইখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়। কাপড়ের সূতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে ওয়াজিব পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাওয়াতের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কেউ নামাজের বাইরে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে, এরপর নামাজে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে, তবে নামাজের মধ্যে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করার কারণে তার উপর আবার সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। দলিল হলো, উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় সিজদা নামাজভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। আর শক্তিশালী হওয়ার কারণে তা প্রথম সিজদাকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর দ্বিতীয় সিজদা যখন প্রথম সিজদার অন্তর্ভুক্তকারী, তাই দ্বিতীয় সিজদাকে প্রথম সিজদার সাথে সংযুক্ত করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। কেননা, দ্বিতীয় সিজদাকে যদি প্রথম সিজদার সাথে সংযুক্ত করা হয় তখন তার মতলব এই দাঁড়াবে যে, দ্বিতীয় সিজদার জন্য

তিলাওয়াত পরে করা হয়েছে, আর সিজদা প্রথমে করা হয়েছে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো তিলাওয়াত করা। সুতরাং উপরোক্ত সূরতে সبب তথা কারণ এর মুখর হওয়া আর حکم -এর مقدم হওয়া লামিম আসে, যা দূরন্ত নেই। সুতরাং বুঝা গেল উপরোক্ত সূরতে তদাখল কঠিন। আর যখন তদাখল কঠিন হলো তখন দ্বিতীয় সিজদা দ্বিতীয় তিলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হবে।

وَمِنْ كَرَّرَ تِلَاوَةً سَجْدَةً  
বারবার তিলাওয়াত করেছে, তাহলে সমস্ত তিলাওয়াতের জন্য একটি মাত্র সিজদাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি এক মজলিসে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করল, অতঃপর অন্যত্র গিয়ে পুনরায় ফিরে আসল এবং ঐ আয়াত পুনরায় তিলাওয়াত করল, তবে দ্বিতীয়বার সিজদা আদায় করে নিবে। আর যদি সে প্রথমবার সিজদা আদায় না করে থাকে তবে তার উপর দুই সিজদা আদায় করা ওয়াজিব হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, মূল নিয়ম হলো, استحسان সিজদার ভিত্তি হলো তদাখল তথা একত্রি করণের উপর। নতুবা কিয়াসের তাকযা হলো, প্রত্যেক তিলাওয়াতের কারণে সিজদা ওয়াজিব হওয়া, মজলিস এক হোক বা বিভিন্ন হোক। কেননা, সিজদা হলো তিলাওয়াত -এর হুকুম, আর হুকুম সبب -এর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়। এ জন্য বারবার তিলাওয়াত দ্বারা বারবার সিজদাও ওয়াজিব হওয়া উচিত। বারবার তিলাওয়াত একই মজলিসে হোক বা বিভিন্ন মজলিসে হোক। استحسان -এর কারণ হলো, লোকদের থেকে কষ্টকে লাঘব করা। কেননা, মুসলমান কুরআনের تعلیم ও تعلم -এর অধিক মুখাপেক্ষী। আর تعلیم ও تعلم তাকরার ব্যতীত হাসিল হয় না। সুতরাং একই মজলিসে সিজদার এক আয়াতকে বারবার পড়ার কারণে যদি বারবার সিজদা করাকে অবধারিত করা হয়, তবে মানুষের কষ্ট হবে। অথচ শরিয়ত কর্তৃক কষ্ট দূরীভূত হয়েছে। এ জন্য বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত সূরতে একই সিজদা ওয়াজিব হবে।

হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, জিব্রীল আমীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সিজদার একটি আয়াত নিয়ে আসতেন, আর তা বারবার দোহরাতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মাত্র সিজদা আদায় করতেন। অথচ সিজদায়ে তিলাওয়াতের সবব যেমনভাবে তিলাওয়াত এমনিভাবে سماع তথা শ্রবণ করাও। তা ছাড়া হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি কুফার মসজিদে বসে লোকদেরকে কুরআনের তালীম দিতেন। যদি সিজদার আয়াত আসতো তাও বারবার পড়তেন। কিন্তু যেহেতু একই মজলিসে পড়তেন তাই একটি মাত্র সিজদা আদায় করতেন।

(কিনায়া, ইনয়া)

হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, তদাখল (একত্রিতকরণ) দুই প্রকার। এক, تَدَاخُلٌ فِي الْحَكْمِ দুই تَدَاخُلٌ فِي الْحَكْمِ। ইবাদাতের ব্যাপারে السَّبَبُ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব। আর উক্বাত তথা শাস্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে تَدَاخُلٌ فِي الْحَكْمِ মুনাসিব। ইবাদতের মধ্যে السَّبَبُ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব হওয়ার কারণ হলো, যদি حکم -এর মধ্যে তদাখল হয় আর سبب -এর মধ্যে তদাখল না হয় তবে اسباب -এর تعدد বাকি থাকবে। আর যখন اسباب -এর মধ্যে تعدد বাকি থাকবে তখন سبب যা موجب ছিল তা ইবাদত বিহীন পাওয়া যাবে। আর এর মধ্যে ترك احتياط রয়েছে। অথচ ইবাদত করার মধ্যে احتياط রয়েছে; তরক করার মধ্যে নয়। এ জন্য আমরা বলেছি ইবাদতের মধ্যে السَّبَبُ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব। যাতে সব সবব এক সববের ন্যায় হয়ে যায় অতঃপর তার উপর হুকুম দেওয়া যায়। এর বিপরীত হলো عقوبات কেননা এগুলো আদায় করার মধ্যে কোনো احتياط তথা সর্তকতা নেই; বরং এগুলো দূর করার মধ্যে احتياط রয়েছে। এ জন্য عقوبات -এর ক্ষেত্রে تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ মুনাসিব। যাতে سبب موجب পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও হুকুম না পাওয়া যায়। আর سبب موجب পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও عقوبات পাওয়া না যাওয়া নিরোট আল্লাহর ফয়ল ও করমের নতীজা হবে। কেননা, কারীম (ক্ষমাশীল) কখনো কখনো শাস্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। উক্ত মতভেদের ফলাফল নিম্নের উদাহরণের মধ্যে পরিস্ফুটভাবে বুঝা যাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি একবার জেন্না করল এবং এ কারণে তাকে একবার হদ্দ লাগানো হলো। যদি এই ব্যক্তি পুনরায় জেন্না করে তবে তাকে পুনরায় হদ্দ লাগানো হবে।

কেন? যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা আদায় করে নেয় অতঃপর পুনরায় এ মজলিসে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সববের মধ্যে তদাখলের কারণে দুই তিলাওয়াত এক সববের স্তরভিত্তিক হয়ে গেছে।

رَأَى كَأَنَّ الشَّاهِدَ الخ দ্বারা তাদাতুলের শর্ত নয়ান করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, ادخال -এর শর্ত হলো সিজদার আয়াত আর মজলিস এক হওয়া। কেননা, نص (নস) ইজমা এবং مجلس واحدে حرج -এর সূরতে পাওয়া যায়। সুতরাং, তা বাতীত সব সূরত আসল কিয়াসের দিকে ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, ادخال তখন সহীহ হবে যখন এমন কোনো জামে সর্বব পাওয়া যাবে যা সব সর্ববকে একত্র করে এবং এক সর্ববের পর্যায়ে নিয়ে আসে। আর এমন জামে সর্বব হলো মজলিস। কেননা, মজলিসই হলো বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে একত্রকারী। যেমন- কোনো মজলিসে যদি ঈজাব ও কবুল উভয়টি পাওয়া যায় তখন বলা হয় কবুল ঈজাবের সাথে متصل হয়েছে। অথচ মূলত উভয়টি منفصل। সুতরাং বুঝা গেল, মজলিস ঈজাব ও কবুল উভয়ের একত্রকারী। এমনিভাবে কেউ যদি একই মজলিসে কিছু কিছু করে কয়েকবার বসি করে তখন একটি মাত্র বসি হয়েছে বলে ধরা হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল মজলিস বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোর একত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিস এক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারবার তিলাওয়াত করা সত্ত্বেও একটি মাত্র সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু মজলিস যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তবে হুকুম তার আসলের দিকে ফিরে যাবে। অর্থাৎ একই সিজদার আয়াত বারবার তিলাওয়াত করার দ্বারা বারবার সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

মজলিস কখন পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে? এ পর্যায়ে কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, প্রথম মজলিস থেকে উঠে যদি দূরে যেথাও চলে যায়, তবে মজলিস পরিবর্তনের হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি নিকটে কোথাও যায় তবে মজলিস একই থাকবে। আর কাছে ও দূরের পার্থক্যটি এভাবে সাবুত হবে যে, দুই তিন কদম পরিমাণ হলে কাছে ধরা হবে। এর থেকে বেশি হলে দূর ধরা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, শুধু দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তবে مخبر -এর ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। مخبر ঐ নারীকে বলা হয় যাকে তার স্বামী نفسى বলে তালাকের ইখতিয়ার দিয়েছে। এখন مخبر তথা ইখতিয়ারপ্রাপ্ত নারী যদি خيار -এর শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে যায় তবে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তবে খেয়ার এ জন্য বাতিল হয়নি যে, তার মজলিস ভিন্ন হয়ে গেছে। বরং এ জন্য যে, “দাঁড়ানো” গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে। আর اعراض সরাসরি হোক বা ইঙ্গিতে হোক খেয়ারকে বাতিল করে দেয়। বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেন, কাপড়ের সূত: তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে উজ্জবে সিজদা পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। অর্থাৎ তানা করার সময় যদি একটি সিজদার আয়াতকে বারবার তিলাওয়াত করে তবে যতবার তিলাওয়াত করা হবে ততগুলো সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা, আসা-যাওয়ার দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি গাছের এক ডালে বসে একটি আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে অতঃপর অন্য ডালে গিয়ে ঐ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে তবে দুই সিজদা ওয়াজিব হবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। এমনিভাবে শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এক আয়াতকে বারবার তেলাওয়াত করার দ্বারা বারবার সিজদা ওয়াজিব হবে। এতেই রয়েছে সতর্কতা।

وَلَوْ تَبَدَّلَ مَجْلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِيِ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ وَكَذَا إِذَا تَبَدَّلَ مَجْلِسُ التَّالِيِ دُونَ السَّامِعِ عَلَى مَا قَبِلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ لِمَا قُلْنَا وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَرْبُوعُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ لَإِنَّ ذَلِكَ لِلتَّحْلِيلِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ وَهُوَ مُنْعَمَةٌ.

**অনুবাদ :** যদি পাঠকারীর মজলিস অভিন্ন থেকে শ্রোতার মজলিস ভিন্ন হয় তাহলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব সিজদা পুনরাবৃত্ত হবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে শ্রবণই হলো সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। তদ্রূপ যদি শ্রোতার মজলিস অপরিবর্তিত থাকে আর পাঠকারীর মজলিস পরিবর্তিত হয়। এরূপই বলা হয়েছে। তবে বিতংকতম মত হলো, শ্রোতার উপর ওয়াজিব সিজদার হুকুম পুনরায় বর্তাবে না। কারণ আমরা আগেই বলেছি। যে ব্যক্তি সিজদা করার ইচ্ছা করবে, সে উভয় তাকবীর বলেবে এবং সিজদায় যাবে। এরপর তাকবীর বলে মাথা উঠাবে, নামাজের সিজদার অনুসরণে। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তার উপর তাশাহুদ বা সালাম ওয়াজিব নয়। কেননা, তা তো করা হয় হালাল হওয়ার জন্য আর তার চাহিদা হয় পূর্ববর্তী তাহরীমার উপস্থিতি যা এখানে নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি সিজদার আয়াত শ্রবণকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় আর তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন না হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রোতার উপর উজ্জবে সিজদার পুনরাবৃত্ত হবে। দলিল হলো, শ্রোতার ক্ষেত্রে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার সব্ব হলো শ্রবণ করা। আর যেহেতু মজলিস পরিবর্তন হওয়ার কারণে শ্রবণ বারবার হয়েছে এ জন্য উজ্জবে সিজদাও বারবার হবে। আর যদি তিলাওয়াতকারীর মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু শ্রোতার মজলিস পরিবর্তন না হয় তবে আঙ্গামা ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মত অনুযায়ী এ সূরতেও সিজদার উজ্জব শ্রোতার উপর পুনরাবৃত্ত হবে। দলিল হলো, সিজদার আয়াত শ্রবণ করার জিতি হলো তিলাওয়াতের উপর। আর তিলাওয়াতের মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই শ্রবণকেও তিলাওয়াতের উপর কিয়াস করা হবে। অর্থাৎ এভাবে বলা হবে যে, যখন তিলাওয়াতের মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেল তখন **حكما** শ্রবণের মজলিসও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেউ কেউ এ দলিল ব্যয়ান করেছেন যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের সব্ব তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের ক্ষেত্রেই তিলাওয়াত। মজলিস পরিবর্তন হওয়ার দরুন তিলাওয়াত বারবার হয়েছে, এ জন্য সিজদার উজ্জব তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর বারবার হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত সূরতে শ্রোতার উপর উজ্জবে সিজদা বারবার হয় না। কেননা, শ্রোতার ক্ষেত্রে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার **سبب** হলো শ্রবণ করা, আর শ্রবণের মজলিসে তাকরার হয়নি। এ জন্য তার উপর উজ্জবে সিজদাও বারবার হবে না।

**উপরোক্ত ইবারতে** সিজদায়ে তিলাওয়াতের কায়ফিয়ত তথা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা হলো যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার ইচ্ছা করা হবে তখন উভয় হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীর বলে সিজদা করবে। তারপর তাকবীর বলে মাথা জমিন থেকে উঠাবে। দলিল হলো, নামাজের সিজদার উপর কিয়াস। এটাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত উভয় তাকবীর সুনুত, ওয়াজিব নয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়কারীর উপর তাশাহুদও নেই: সালামও নেই। কেননা, তাশাহুদ ও সালাম নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। আর নামাজ থেকে বের হওয়ার তাকাযা হলো প্রথমে তাহরীমা থাকা। অথচ এখানে তাহরীমা নেই। সুতরাং তাহরীমা না থাকার কারণে **وتحلل** ও হবে না। আর **تحلل** (তথা নামাজ থেকে বের হওয়া) না হওয়ার কারণে তাশাহুদ ও সালামও হবে না।

**ফায়দা :** কুদুরী ও হিদায়ার ইবারতে এ ব্যাপরে কিছুই বলা হয়নি যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের সময় কি পড়বে। তবে এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজের সিজদায় যা পড়ে তাই পড়বে। আবার কেউ কেউ বলেছেন সিজদায়ে তিলাওয়াতে এ **سَبَّحَ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** পড়বে—

قَالَ وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي صَلَوةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْعَ آيَةَ السَّجْدَةِ لِأَنَّهُ يَنْشَبُ  
الْإِسْنِكَافُ عَنْهَا وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدْعَ مَا سِوَاهَا لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَيْهَا  
قَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ دَفْعًا لَوَهْمِ التَّفْضِيلِ وَاسْتَحْسَنُوا  
إِخْفَاءَ مَا شَفَقَهُ عَلَى السَّامِعِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে বা নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে সূরা তিলাওয়াত করা মাকরুহ। কেননা, তা সিজদার আয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের সদৃশ। তবে অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এতে সিজদার আয়াতের প্রতি অগ্রহ প্রকাশ পায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পছন্দনীয় হলো, সিজদার আয়াতের পূর্বে এক বা দু' আয়াত পড়ে নেওয়া। যাতে এ ভুল ধারণা না হয় যে, আয়াতে সিজদার ফজিলত অধিক রয়েছে। শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফকীহগণ সিজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নামাজ বা নামাজের বাইরে পুরো সূরা পড়া আর সিজদার আয়াতকে বাদ দেওয়া মাকরুহ। কারণ, এতে আয়াতে সিজদার প্রতি অবজ্ঞা বুঝা যায়। আর কুরআনে কারীমের কোনো আয়াতকে অবজ্ঞা করা হারাম এবং এটা কুফরি। সুতরাং যখন মৌলিকভাবে অবজ্ঞা করা হারাম তাহলে যা অবজ্ঞা সদৃশ তা অবশ্যই মাকরুহ হবে। আর যদি কেউ শুধু আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে, অবশিষ্ট সূরা না পড়ে তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, এর দ্বারা সিজদার প্রতি অগ্রহ প্রকাশ পায়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পছন্দনীয় বক্তব্য হলো, সিজদার আয়াতের আগে এক বা দুই আয়াত পড়ে নেওয়া; তাহলে এ সন্দেহ হবে না যে, অপরাপর আয়াতের উপর সিজদার আয়াতের ফজিলত রয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কুরআন হওয়ার ক্ষেত্রে সকল আয়াতই বরাবর। শ্রোতাদের যাতে কষ্ট না হয় এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সিজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন। ইনশায়া গ্রন্থকার মুহীত নামক গ্রন্থের হাওয়ালায় লিখেছেন যে, যদি তিলাওয়াতকারী একাকী হয় তবে যেভাবে ইচ্ছা তিলাওয়াত করতে পারে চুপি চুপি হোক বা স্বজারে হোক। আর যদি তার সাথে অন্য কোনো লোক থাকে তবে মাশায়িখে হানাফিয়া বলেন, ঐ সকল লোকেরা যদি অজ্ঞ অবস্থায় হয় এবং সিজদা করতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই তবে তিলাওয়াতকারী জোরে তিলাওয়াত করবে। আর যদি তারা অজ্ঞবিহীন অবস্থায় হয় অথবা বুঝা যায় যে, তারা সিজদার আয়াত শুনে হয়তো সিজদা করবে না অথবা তাদের কষ্ট হবে, তবে তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি চুপি চুপি তিলাওয়াত করবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

## بَابُ صَلَوةِ الْمُسَافِرِ

السَّفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ أَنْ يَقْصُدَ مَبْنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا يَسِيرُ  
الْإِيلَ وَمَشَى الْأَقْدَامَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمَسُّحُ الْمُقِيمُ كَمَا لَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ  
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا عَمَّتِ الرُّخْصَةُ الْجِنْسَ وَمِنْ ضَرُورَتِهِمْ عُمُومُ التَّقْدِيرِ وَقَدَّرَ  
أَبُو سُوَيْفٍ يَوْمَيْنِ وَكَثَّرَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ وَالشَّافِعِيُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي قَوْلِهِ وَكَفَى  
بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا .

### পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাজ

অনুবাদ : যে সফর দ্বারা শরিয়তের আহকাম পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা হলো, উটের চলার গতি বা পায়ে হেঁটে চলার গতি হিসাবে তিনদিন তিনরাত্ পরিমাণ দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছা করা। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুকীম ব্যক্তি মাসাহ করবে পূর্ণ একদিন একরাত্, আর মুসাফির ব্যক্তি মাসাহ করবে তিনদিন তিনরাত্। মাসাহ করার এই অবকাশ প্রত্যেক মুসাফিরকে শামিল করবে। এর অনিবার্য দাবি হচ্ছে সফরের সীমা ব্যাপক হওয়া। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়কে সফরের পরিমাণ বলে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে তিনি সফরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন একদিন একরাত্। উভয়ের বিপরীতে আলোচ্য হাদীসই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সফর (سفر) -এর আভিধানিক অর্থ- দূরত্ব অতিক্রম করা। আর শরঈ পরিভাষায় সফর বলে এমন ভ্রমণকে যার কারণে আহকাম তথা বিধিবিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন- নামাজে কুসর করা, রমজান মাসে রোজা ভাঙ্গার অনুমতি, পায়ের মোজার উপর মাসাহ করার মেয়াদ একদিনের পরিবর্তে তিনদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়া, জুমা, দুই ঈদের নামাজ এবং কুরবানি করার وجوب রহিত হয়ে যাওয়া, মাহরাম ব্যতীত আজাদ মহিলাদের জন্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। প্রণিধানযোগ্য যে, শরঈ দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ঐ ভ্রমণই সফর বলে গণ্য হবে, যার জন্য সফরের নিয়ত করা হয়েছে এবং কার্যত সফরও করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তিনদিনের পথ অতিক্রম করার নিয়ত ব্যতীত সারা দুনিয়াও ঘুরে বেড়ায় তবুও সে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে না। অনুসঙ্গভাবে শুধুমাত্র নিয়ত করে বসে থাকলেও মুসাফির বলে গণ্য হবে না।

মোটকথা, আহকাম পরিবর্তনকারী সফর ঐটাই হবে যার মাঝে কার্যত সফরের অস্তিত্ব এবং নিয়ত উভয়টা একই সাথে পাওয়া যাবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইকামতের জন্য শুধুমাত্র নিয়তই যথেষ্ট, অথচ সফরের জন্য শুধু নিয়ত যথেষ্ট নয়, এটা কেন? এর উত্তর হলো, সফর হচ্ছে একটি কাজ। আর কাজের ক্ষেত্রে শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপও প্রয়োজন হয়। যেমন- নামাজ একটি কর্মমূলক আমল। তাই এর জন্য শুধু নিয়তই যথেষ্ট হয় না; বরং এর সাথে সাথে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি কর্মমূলক আমলগুলোরও প্রয়োজন হয়, অন্যথায় নামাজ হয় না। পক্ষান্তরে ইকামত হচ্ছে ترك فعل তথা কর্ম বর্জনের (সফরের কর্ম) নাম। আর ترك فعل শুধুমাত্র নিয়ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এর জন্য কোনো কর্মমূলক পদক্ষেপ নিতে হয় না।

কুদরী প্রণেতা বলেন, যে সফর দ্বারা শরিয়তের বিধিবিধানের মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা এমন যার ক্ষেত্রে মানুষ তিনদিন তিনরাত্র সফর করার সংকল্প করে। চলার ক্ষেত্রে উটের চলা, পায়ে হাঁটা কিংবা গরুর চলা ধর্তব্য। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের বছরের সবচেয়ে ছোট দিনকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হবে। এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, রাতদিন দ্বারা ২৪ ঘণ্টার চলাকে বুঝানো হয়নি; বরং প্রতিদিন সকাল থেকে সূর্য হেলার সময় পর্যন্ত চলাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ একাধারে ২৪ ঘণ্টা পায়ে চলার সাধ্য না মানুষের আছে, না কোনো বাহনের আছে। সুতরাং প্রতিদিন সকাল থেকে সূর্য হেলা পর্যন্ত চলার পর কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করে পরদিন আবার এভাবে চলে কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করবে এবং তার পরদিনও সকালে চলতে শুরু করে সূর্য হেলার পর অবস্থান করবে। এভাবে তিনদিন তিনরাত্র চলার পর যে দূরত্ব অতিক্রম করা হয় এই পরিমাণ দূরত্বই হচ্ছে সফরের পরিমাণ।

সফরের পরিমাণ তিনদিন তিনরাত্র নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয় এই হাদীসটি—

بَسَّحَ الْمَيْمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلَاتِهَا -

অর্থ : মুকীম ব্যক্তি পূর্ণ একদিন একরাত্র মাসাহ করবে আর মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয় এভাবে যে, এখানে المسافر কথাটির মাঝে الف لام অব্যয়টি استغرافي অর্থার্থে সার্বজনীন। এর দ্বারা সকল মুসাফির ব্যক্তি এই মাসাহ-এর অবকাশের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এ কথার মর্ম হচ্ছে— প্রত্যেক মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করতে পারবে। আর প্রত্যেক মুসাফির তখনই তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করার ক্ষমতা রাখবে যখন সফরের ন্যূনতম মেয়াদ হবে তিনদিন তিনরাত্র। যদি সফরের মেয়াদ এর চেয়ে কম ধরা হয়, তাহলে প্রত্যেক মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র মাসাহ করতে সক্ষম হবে না। অথচ হাদীস দ্বারা প্রত্যেক মুসাফিরের মাসাহ করার ক্ষমতা তিনদিন তিনরাত্র প্রমাণিত। অতএব, এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিন তিনরাত্র।

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ পূর্ণ দু'দিন আর তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ একদিন একরাত্র। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ চার "ফরসখ"। এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও একটি মত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হাদীসটি বিপক্ষের উভয় মতের বিপরীতে দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

وَالسَّبَرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسْطُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رحم) التَّقْدِيرُ بِالْمَرَّاجِلِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْفَرَّاسِخِ هُوَ الصَّحِيعُ وَلَا يُغْتَبَرُ السَّبَرُ فِي الْمَاءِ مَعْنَاهُ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّبَرُ فِي الْبَرِّ فَمَا الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَحْرِ فَمَا يَلْتَقِي بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَلِ قَالَ وَفَرَضَ الْمُسَافِرُ فِي الرَّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَرَضَهُ الْأَرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةً اِغْتِيَابًا بِالصَّوْمِ وَلَنَا أَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِي لَا يَقْضَى وَلَا يَأْتُمُّ عَلَى تَرْكِهِ وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يُقْضَى .

অনুবাদ : আর উল্লিখিত পথ চলা দ্বারা মধ্যম গতির পথ চলাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মঞ্জিল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর তা প্রথমোক্ত মতের নিকটবর্তী। ফরসখ দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই বিতর্কিত অভিমত। আর নৌপথের চলার গতিকে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ স্থলপথের জন্য নৌপথের যাত্রাকে পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হবে না। অবশ্য সমুদ্রের ক্ষেত্রে তার উপযোগী পরিমাপ বিবেচ্য হবে। যেমন পার্বত্য পথের হুকুম। ইমাম কুদূরী বলেন, চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজে মুসাফিরের জন্য ফরজ হলো দু' রাকআত। এর অধিক আদায় করবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, তার ফরজ তো চার রাকআতই। তবে কসর হলো তার জন্য রুখসত রোজার উপর ক্যেয়াস করে। আমাদের দলিল হলো, শেষের দু' রাকআত না কাজা করতে হয় না তরক করার কারণে গুনাহ হয়। আর এটা হলো নফল হওয়ার আলামত। রোজার ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ রোজার কাজা করতে হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের চলা কিংবা পায়ে চলা বলতে মধ্যম গতির পথ চলাকে বুঝানো হয়েছে। খুব দ্রুতগতি কিংবা ধীরগতির পথ চলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এই মর্মে একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, সফরের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন মঞ্জিল। অর্থাৎ কেউ যদি তিন মঞ্জিল পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়তে সফর শুরু করে। তাহলে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলে গণ্য হবে। হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর এই মতটিও প্রথমোক্ত মতের নিকটবর্তী। কারণ সাধারণত মানুষ একদিনে এক মঞ্জিল পথই অতিক্রম করে থাকে। বিশেষ করে ছোট দিনে। সুতরাং সফরের মেয়াদ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনদিন বলা আর তিন মঞ্জিল বলা ফলত একই কথা। হিদায়া প্রণেতা বলেন, বিতর্কিত মত অনুযায়ী ফরসখ দ্বারা সফরের দূরত্ব নির্ণয় করা গ্রহণযোগ্য নয়। এক ফরসখের সমপরিমাণ হচ্ছে তিন মাইল। মাশায়িখে কেরামের ব্যাপক অভিমত হচ্ছে ফরসখের হিসাবকে গণ্য করা। তাই কোনো কোনো ফকীহ এগার ফরসখের কথা বলেছেন, আবার কেউ আঠার ফরসখের কথা বলেছেন। আর অপরদিকে কেউ পনের ফরসখের কথাও উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ السَّبَرُ الْخ : কেউ যদি সামুদ্রিক পথে নৌযান যোগে ভ্রমণ করে, তাহলে তার যাত্রা পরিমাপ করা হবে নৌপথের উপযোগী পরিমাপ অনুযায়ী। অর্থাৎ বাতাস যদি অনুকূল কিংবা প্রতিকূল না হয়ে শুধু স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়, তাহলে সে অবস্থায় তিনদিন তিনরাতে যে পরিমাণ পথ চলা যায়, সেটাই হবে সফরের নির্ধারিত সীমা। যেমন পার্বত্য পথের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাতেই পরিমাপ হিসাবে গণ্য হয়, যদিও সমতল পথে তিনদিন তিনরাতেই চেয়েও কম সময়ে এই পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায়।



এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তা হচ্ছে **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুখ দিয়ে মুকীম অবস্থার জন্য চার রাকআত এবং সফর অবস্থার

জন্য দু'রাকআত নামাজ ফরজ করেছেন। তিবরানী বর্ণিত হাদীস হাচ্ছে— **اِنْفَرَضَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَا** —  
 - **اِنْفَرَضَ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا** — অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের জন্য দু'রাকআত নামাজ ফরজ করেছেন। যেমন, মুস্বীম  
 অবস্থার জন্য ফরজ করেছেন চার রাকআত।

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন— **صَحِبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ لَمْ**  
**يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ**  
**أَمَّا** **فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** —

রাসূলুল্লাহ ﷺ—এর সাথে সফরে ছিলাম, এ সময় তিনি দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি। এমনিভাবে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ওমর (রা.)—এর সাথে সফর করেছি তিনিও দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি। এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আমি হযরত ওসমান (রা.)—এর সাথে সফর করেছি। তিনিও দু'রাকআতের বেশি আদায় করেননি এবং তিনিও এ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন “আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

উপরোক্ত সকল হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, সফরের নামাজ দু'রাকআত। যদি ইমাম শাফি'ঈ (র.)—এর দাবি অনুযায়ী সফরে চার রাকআত আদায় করাই উত্তম হতো, তাহলে খোদা রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ তা পরিভাগ করতেন না।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)—এর কেয়াসের জবাব : মুসাফিরের নামাজকে তাঁর রোজার উপর কেয়াস করা বিধিসম্মত নয়। কারণ মুসাফিরকে যদিও রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা কাজা করার দায়িত্ব তার উপর থেকে তুলে নেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে মুসাফিরকে দু'রাকআত **فَصْر** আদায় করার অবকাশ এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, অবশিষ্ট দু'রাকআত আর কাজা করতে হবে না। সুতরাং মুসাফিরের নামাজ আর রোজার রুখসতকে একই ধরনের রুখসত মনে করার অবকাশ নেই।

মোটকথা, কোনো আমল যদি এমন হয় যে, এর বদলও ওয়াজিব নয় আবার তা তরক করলেও গুনাহ হয় না, তাহলে এ অবস্থা উক্ত আমলটির নফল হওয়ার নির্দশন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক পেশকৃত আয়াতের জবাব এই যে, উক্ত আয়াতে নামাজের গুণাগুণের (অوصان) কসরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দূশমনের ভয়ের দরুন কেয়াম বাদ দিয়ে **نَعُوذُ** এখতিয়ার করা, রুকু সিজদা বাদ দিয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করা ইত্যাদির অবকাশকে বুঝানো হয়েছে। আর আমাদের মায়হাব অনুযায়ী ভয়ের সময় **اوصان**—এর কসর করা ওয়াজিব নয়; বরং মুবাহ। অতএব, এ আয়াত দ্বারা যেহেতু **اوصان**—এর কসর বুঝানো হয়েছে, সেহেতু এটাকে রাকআতের কসরের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করা ঠিক হবে না। যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, এ আয়াতে রাকআতের কসরই বুঝানো হয়েছে, তবুও ইমাম শাফি'ঈ (র.)—এর পক্ষ থেকে করা এ দাবি ঠিক নয় যে, **لَا حَاجَ** কথাটিকে ওয়াজিব বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয় না; বরং তা উল্লেখ করা হয় মুবাহ বুঝানোর জন্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন— **اِنَّ الصَّلَاةَ وَالْمَرْوَةَ وَبَيْنَ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَاجَ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوفَ بِهِمَا** এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা **لَا حَاجَ** বলে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করাতে ওয়াজিব করেছেন। এ ক্ষেত্রে খোদা ইমাম শাফি'ঈ (র.)ও **لَا حَاجَ** “কথা দ্বারা মুবাহ বুঝানো হয়েছে বলেননি।” যেমনটি তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)—এর পক্ষ থেকে পেশ করা হাদীসের জবাব হাচ্ছে যে, অত্র হাদীসটি ইমাম শাফি'ঈ (র.)—এর নয়; বরং আমাদের দলিল। কারণ হাদীসে **فانصرفوا** আমার তথা আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমাদের মায়হাব অনুযায়ী আমার ওয়াজিব বুঝানোর জন্য আসে। সুতরাং যে কসরকে সদকা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা মুবাহ নয় বরং ওয়াজিব। অপর আরেকটি জবাব হলো, সদকা দু' প্রকার। এক, মালিকানাযুক্ত যেমন আর্থিক সদকা। দুই, **اسقاط** তথা ত্যাগ দেওয়া মূলক। যেমন— গেলাম আজাদ করা, কেসাসের হক ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি।

মূলনীতি হলো, যদি মালিকানাযুক্ত সদকা হয়, তাহলে তা রদ করে দিলে রদ হয়ে যায়। কিন্তু যদি **اسقاط** মূলক সদকা হয়, তাহলে রদ করার দ্বারা রদ হয় না। আর কসরও হাচ্ছে **اسقاط** মূলক সদকা। তাই এটাকেও রদ করার দ্বারা রদ হবে না। অতএব, তা মান্য করা ওয়াজিব বলেই সাব্যস্ত হলো।

অর্থাৎ “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় জোহরের নামাজ পড়েছি চার রাকআত। আর খুল হুলায়ফায় আসরের নামাজ পড়েছি দু’ রাকআত।”

وَلَا يَزَالُ عَلَىٰ حُكْمِ السَّفَرِ حَتَّىٰ يَنْتَوِيَ الْإِقَامَةُ فِي بَلَدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ  
يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَٰنْ نَّوَىٰ أَقْلٌ مِنْ ذَٰلِكَ قَصَرَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إَعْتِبَارِ مُدَّةٍ لِأَنَّ السَّفَرَ  
يَجْمَعُهُ اللَّبْثُ فَقَدَرْنَا بِمُدَّةِ الطَّهْرِ لِأَنَّهُمَا مَدَّتَانِ مُوجِبَتَانِ وَهُوَ مَا ثَوَّرَ عَيْنَ ابْنِ  
عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عَمَرَ (رض) وَالْآثَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَلَدَةِ وَالْقَرْيَةِ يُشِيرُ  
إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّةٌ فِي الْمَفَازَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ -

**অনুবাদ :** আর কোনো শহরে বা জনপদে ১৫ দিন কিংবা তার চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করার নিয়ত করা পর্যন্ত সফরের হুকুম অব্যাহত থাকবে। যদি এর চেয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে কসর করবে। কারণ এর মাঝে সময়ের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কেননা সফরের মাঝেও (বিরতিমূলক) অবস্থান থাকে। তাই আমরা ইকামতের মেয়াদ নির্ধারণ করেছি তুহরের মেয়াদের উপর অনুমান করে। কারণ উভয়টাই এমন মেয়াদ যা কিছু হুকুম আরোপ (واجب) করে। আর এটি ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণীও হাদীসের মতো। শহর বা জনপদের শর্ত এই ইস্তিত করে যে, মাঠে-প্রান্তরে ইকামতের নিয়ত করা সহীহ নয়। এটাই জাহির রিওয়াযাত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসাফিরের সফরের হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না সে কোনো শহর বা গ্রামে পনেরো বা ততোধিক সময় অবস্থান করার নিয়ত করে। যদি এ ধরনের নিয়ত করে ফেলে, তাহলে তার সফরের হুকুম শেষ হয়ে যাবে। যদি পনেরো দিনের কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে আমাদের মাহযাব মতে সে মুকীম বলে গণ্য হবে না; বরং মুসাফিরের হুকুমেই থেকে যাবে। সে কসর করতে থাকবে।

ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (রা.) বলেন, চার দিনের নিয়ত করলেই মুকীম হয়ে যাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এমন একটি মত আছে যে, যদি কোনো মুসাফির চার দিনের অতিরিক্ত সময় কোথাও অবস্থান করে, তাহলেই সে মুকীম হয়ে যাবে। ইকামতের নিয়ত করুক বা না করুক।

ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল কুরআন মাজীদে এই আয়াত- **إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ** -এর অর্থঃ এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।-(সূরা নিসা, আয়াত- ১০১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা **ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ** তথা পথচলা অবস্থায় কসর করাকে মুবাহ করেছেন। যার বিপরীত অর্থ (مفهوم مخالف) হচ্ছে, যদি পথচলা বা **ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ** না পাওয়া যায়, তাহলে কসরের অনুমতি নেই। আর মুসাফির যখন ইকামতের নিয়ত করে, তখন সে **ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ** ত্যাগ করে। যখন **ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ** ত্যাগ করে, তখন তার জন্য কসর করা মুবাহ থাকে না। অবশ্য এই দলিলের উপর এমন আপত্তি আরোপ করা যায় যে, তাহলে তো চারদিনের নিয়ত করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই; বরং যখনই চারদিনের চেয়ে কম সময়ের জন্যও ইকামতের নিয়ত করবে, তখনই কসর করার অনুমতি না থাকার কথা। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাব হচ্ছে, আয়াতের দাবিতো এটাই, তবে আমরা ইজমা দলিলের দরুন চারদিনের শর্ত আরোপ করেছি; কারণ এর চেয়ে কম সময়ের নিয়ত দ্বারা মুকীম হওয়ার দাবি কারো পক্ষ থেকেই করা হয়নি।

আমাদের মাযহাব মতে মুকীম হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিয়ত করা। যদি একামতের নিয়ত না করে কেউ পনেরো দিনের চেয়েও বেশি সময় অবস্থান করে, তবু সে মুকীম বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে মুকীম হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। তাঁর দলিল হলো হযরত ওসমান (রা.)-এর এই হাদীসটি **أَتَمَّ أَرْبَعًا أَسَمَ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারদিন কেয়াম করবে সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। এখানে নিয়তের কথা উল্লেখ নেই। অতএব, বুশা যাচ্ছে যে, মুকীম হওয়ার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, একজন মুসাফিরের জন্য জরুরি নয় দিনরাত্রি চল্লিশ ঘণ্টা তার সফর অব্যাহত রাখা; বরং সে চলার পথে এ সময়ের মধ্যে কোথাও অবস্থানও করে। এমনকি কখনও কখনও বেশ লম্বা সময়ও অবস্থান করে। মোটকথা, পথচলা আর অবস্থান করা উভয় মিলেই সফর। আর এটাও দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, কোথাও অবস্থান করার নামই হচ্ছে একামত করা বা মুকীম হওয়া। তাই এ ধরনের খল্প মেয়াদী একামত আর শরিয়তের বিধান পরিবর্তনকারী একামতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার স্বার্থে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই আমরা তুহুরের মুদতের উপর কেয়াস করে ইকামতের মুদতও পনেরো দিন নির্ধারণ করেছি। প্রশ্ন হতে পারে যে, কেয়াসের **علت مشتركة** টা কি? এ সম্পর্কে হিদায়া প্রণেতা বলেন, উভয়ের মাঝে এমন একটা হুকুম পাওয়া যায়, যা **علت مشتركة** বলে বিবেচিত হতে পারে। তা হলো হায়েযের সময় সাকতে হয়ে যাওয়া আমলগুলো যেমনিভাবে তুহুরের মেয়াদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে তেমনিভাবে সফরের সময়ে সাকতে হয়ে যাওয়া আমলগুলোও আবার মুকীম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। এই মিলের কারণেই ইকামতের মেয়াদকে তুহুরের মেয়াদের উপর কেয়াস করা হয়েছে। ঠিক এ কারণেই হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিনের উপর কেয়াস করে সফরের মেয়াদও তিনদিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিদায়া রচয়িতা বলেন, ইকামতের মেয়াদ পনেরো দিন হওয়ার ব্যাপারটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا إِذَا دَخَلْتَ بَلَدًا وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي عَزْمِكَ أَنْ تَقِمَ بِهَا خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا . فَكَيْفِ الصَّلَاةُ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَطْعَنُ فَاقْصِرْ .**

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যদি তুমি মুসাফির অবস্থায় কোনো শহরে প্রবেশ কর, আর তোমার সংকল্প থাকে যে এখানে পনেরো দিন অবস্থান করবে, তাহলে তুমি পরিপূর্ণ সালাত আদায় করবে। আর যদি জানা না থাকে যে, কখন সফর করবে, তাহলে কসর অব্যাহত রাখো। হিদায়া প্রণেতা বলেন, পনেরো দিন ধার্য করার বিষয়টি শরয়ী পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত। আর দিন নির্ধারণ করার কাজটি এমন, যা বৃদ্ধি বা কিয়াস দিয়ে করা সম্ভব নয়। আর মূলনীতি হলো কিয়াসের আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়ে সাহাবীর বক্তব্য হাদীসের মর্যাদা তুল্য। এ থেকে মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) পনেরো দিন নির্ধারণ করার বিষয়টি শরয়ী পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত। আর দিন নির্ধারণ করার কাজটি এমন, যা বৃদ্ধি বা কিয়াস দিয়ে করা সম্ভব নয়। আর মূলনীতি হলো কিয়াসের আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়ে সাহাবীর বক্তব্য হাদীসের মর্যাদা তুল্য। এ থেকে মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) পনেরো দিন নির্ধারণ করার বিষয়টি হয়তো ছহুর **الصلوة**-এর কাছে গুনেই বর্ণনা করেছেন।

হিদায়া প্রণেতা বলেন, ইমাম কুদুরী ইকামতের জন্য যে শহর বা গ্রামের কথা বলেছেন, এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, জনমানবশূন্য ময়দানে ইকামত করার সংকল্প করা বৈধ নয়। এটিই যাহেদী রায়। যদিও কাজি আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আরোহীগণ যদি পানি ও ঘাস বিশিষ্ট এলাকায় তাঁবু স্থাপন করে এবং পনেরো দিন অবস্থান করার নিয়ত করে, তাহলে মুকীম হবে।

وَلَوْ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزَمٍ أَنْ يَخْرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ مَدَّةَ الْإِقَامَةِ حَتَّى  
 فَيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ قَصَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) أَقَامَ بِأَذْرَبَجَانَ سِنَةً أَشْهُرَ وَكَانَ  
 يَقْصُرُ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض) مِثْلُ ذَلِكَ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرْبِ  
 نَوَّوْا الْإِقَامَةَ بِهَا قَصَرُوا وَكَذَا إِذَا حَاصَرُوا فِيهَا مَدِينَةً أَوْ حِصْنَ لِأَنَّ الدَّخَلَ بَيْنَ أَنْ  
 يَهْزِمَ فَيَفِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يُهْزِمَ فَيَقْرُ فَلَمْ تَكُنْ دَارَ إِقَامَةٍ.

অনুবাদ : যদি কেউ এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কোনো শহরে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল অথবা পরও এখান থেকে বের হয়ে যাবে, আর সে ব্যক্তি ইকামতের জন্য নির্ধারিত কোনো মেয়াদের নিয়ত না করে, এভাবে একাধারে বছরের পর বছর অবস্থান করতে থাকে, তবু সে কসর করবে। কারণ হযরত ইবনে ওমর (রা.) আজারবাইজান শহরে ছয়মাস অবস্থান করেছেন এবং তিনি সেখানে এ সময়ে কসর করেছিলেন। আরো বহু সাহাবায়ে কেয়াম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোনো সৈন্য বাহিনী যখন শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ইকামতের নিয়ত করে, তখন তারা কসরই পড়বে। তদ্রূপ শত্রুদেশের কোনো শহর বা কেল্লা অবরোধ করলেও। কারণ শত্রু ভূমিতে প্রবেশকারীর অবস্থা নিশ্চিত নয়। হয় সে পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে, না হয় পরাজিত করে অবস্থান দৃঢ় করবে। তাই তা (দোদুল্যমান অবস্থার দারুল হরব) ইকামতের স্থান হতে পারে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : বর্ণিত হয়েছে যে, ইকামতের জন্য পনেরো দিনের নিয়ত করা জরুরি এর শাখা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি কোনো শহরে এই নিয়ত নিয়ে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল কিংবা তার পরদিন এখান থেকে চলে যাব, এমতাবস্থায় সে যদি পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করে আর একদিন দু' দিন করে সেখানে বছরের পর বছরও অবস্থান করে, তবু সে কসরই করবে। এমন ব্যক্তিকে মুকীম বলা হবে না। এর দলিল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল। বর্ণিত আছে তিনি আজারবাইজানে ছয় মাস অবস্থান করেছিলেন; কিন্তু একবারও একাধারে পনেরো দিন থাকার নিয়ত করেননি। তাই তিনি উক্ত ছয়মাস যাবৎ নামাজ কসর করেছেন। অনুরূপ আমল অন্য সাহাবীগণ থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি নীশাপুরের কোনো এক গ্রামে দুই মাস অবস্থান করেছেন। আর এ সময়ে নামাজ কসর করেছেন। এমনিভাবে আলকামা ইবনে কায়স খাওয়ারযিমে দুই বৎসর অবস্থান করেও নামাজ কসর করেছেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرَ الخ : ইসলামি বাহিনী শত্রু ভূমিতে প্রবেশ করার পর পনেরো দিন থাকার নিয়ত করলেও তারা মুকীম হবে না; বরং মুসাফিরই থাকবে এবং কসর করবে। এই একই বিধান প্রযোজ্য হবে ঐ সৈন্যদের বেলায়ও যারা শত্রু ভূমির কোনো শহর বা কেল্লা অবরোধ করে রেখেছে। মোদ্দাকথা হলো শত্রু দেশে প্রবেশকারী ইসলামি বাহিনীর ইকামতের ক্ষেত্রে নিয়ত ধর্তব্য নয়, কারণ ইকামতের নিয়ত করার যোগ্য স্থান হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে মানুষ নিশ্চিতভাবে অবস্থান করার অবকাশ থাকে। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রটি এর বিপরীত। কারণ এখানে মুসলিম বাহিনীর পলায়ন করা বা অবস্থান করার মাঝামাঝি এক দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে; কেননা পরাজিত হলে পলায়ন করতে হবে, আর যদি বিজয় লাভ হয় তবে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং পলায়ন ও অবস্থানের দোদুল্যমান অবস্থায় কামিফ রক্তিকে (দারুল হরব) মুসলিম সৈন্যদের জন্য অবস্থান স্থল (দারে ইকামত) বলা যাবে না। যেমন- মুসলিম রাষ্ট্রের জঙ্গল অবস্থান স্থল নয়, এ কারণে জঙ্গলের মধ্যে ইকামতের নিয়ত করলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَكَذَٰلِكَ إِذَا حَاصَرُوا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ أَوْ حَاصَرُوهُمْ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّهُمْ مُبْطَلُ عِزَّتِهِمْ وَعِنْدَ زُفَرٍ (رح) يَصُحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَتِ الشُّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الْقَرَارِ ظَاهِرًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يَصُحُّ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدْرِ لِأَنَّهُ مُوَضَّعٌ أَقَامَةً وَبَيْتُهُ الْإِقَامَةُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَالَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْأُخْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَصُحَّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ مُتَبَيَّنُونَ بِرُؤْيِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) لِأَنَّهُ الْإِقَامَةُ أَصْلٌ فَلَا تَبْطُلُ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ مَرْعَى إِلَى مَرْعَى .

**অনুরূপ :** অনুরূপভাবে (কসর আদায় করবে) যদি (মুসলিম) বাহিনী দারুল ইসলামের শহর বাহির্ভূত কোনো এলাকায় অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে তাদের অবরোধ করে। কেননা তাদের অবস্থা তাদের নিয়তের দৃঢ়তা বাতিল করে। যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় (ইকামতের নিয়ত) গ্রহণযোগ্য হবে, যদি মুসলিম বাহিনীর শক্তিতে প্রাধান্য থাকে। কেননা সে অবস্থায় বাহ্যত তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি তারা বস্তি এলাকায় থাকে তবে (নিয়ত) গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বস্তি এলাকা ইকামত করার স্থান। আর তাঁবাবাসীদের সম্পর্কে ইকামতের নিয়ত কারো কারো মতে দুরন্ত নয়। তবে বিতর্ক মত হলো, তারা মুকীম বিবেচিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। কেননা ইকামত হলো (মানুষের জীবনের) আসল অবস্থা। সুতরাং এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণ ভূমিতে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি মুসলিম বাহিনী দারুল ইসলামের শহর বাহির্ভূত জঙ্গল ইত্যাদিতে বিদ্রোহীদেরকে অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে কোনো দ্বীপে বিদ্রোহীদেরকে অবরোধ করে এবং মুসলিম বাহিনী পনের দিন ইকামতের নিয়ত করে, তবে তাদের উক্ত নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাদের কসর নামাজ পড়তে হবে। দলিল হলো, মুসলিম বাহিনী উপরোক্ত অবস্থাতেও অবস্থান ও পলায়নের মাঝামাঝি দোদুল্যমনা অবস্থায় থাকে। তাই তাদের এ দোদুল্যমনা অবস্থা তাদের নিয়তের দৃঢ়তার অবস্থানকে বাতিল করে দেয়। কেননা যেমনিভাবে বিজয় লাভ করে মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে এমনিভাবে পরাজিত হয়ে পলায়নেরও সম্ভাবনা আছে। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবাবতের মধ্যে **مِصْرٍ** আর **بَيْتِ الْبَيْتِ** -এর **بَيْتِ** হলো **إِنْتَانِي** এ কারণে মুসলিম বাহিনী যদি বিদ্রোহীদের শহরে অবস্থান করে আর কিছার ভিতর তাদেরকে অবরোধ করে তখনও তাদের ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা বিদ্রোহীদের শহর উদ্দেশ্য (বিজয়) হাসিল হওয়ার পর জঙ্গলের অনুরূপ হয়ে যায়। তাই মুসলিম বাহিনী তাতে মুকীম হবে না; বরং ঘিরে চলে আসবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মুসলিম বাহিনী কাফিরদের অবরোধ করুক কিংবা বিদ্রোহীদের অবরোধ করুক উভয় অবস্থায় ইকামতের নিয়ত সহীহ হবে। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন শহরের ভিতর মুসলিম বাহিনীর শক্তির প্রাধান্য থাকে। কেননা এ অবস্থায় বাহ্যত তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মায়দাব হলো, মুসলিম বাহিনীর কাফির বা বিদ্রোহীদেরকে অবরোধ করা অবস্থায় ইকামতের নিয়ত করা তখন সহীহ হবে যখন মুসলিম বাহিনীর ইকামত মাটির ঘর বা বস্তিতে হয়। আর যদি তাঁবুতে ইকামত করে তবে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। দলিল হলো, ঘর ও বস্তি ইকামতের স্থান, তাঁবু ইকামত করার স্থান নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে সকল লোকের জীবিকার ভিত্তি হলো পতর উপর। যেখানে ঘাস বা পানি দেখে সেখানেই তাঁবু এটে অবস্থান করে। তারপর যখন ঘাস পানি খতম হয়ে যায় তখন অন্যত্র গিয়ে অবস্থান নেয়। এদের ইকামতের নিয়ত সহীহ কিংবা গায়ের সহীহ -এর ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো আলিম বলেন, তাদের ইকামতের নিয়ত সহীহ নয়। কেননা এরা ইকামতের স্থানে অবস্থান করছে না। তবে বিতর্কমত মত হলো তারা মুকীম বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ শুধু থেকেই তারা মুসাফির নয়। কেননা ইকামত হলো মূল বা আসল, আর সফর হলো তার আরিয়া বা প্রতিবন্ধক। সুতরাং ইকামত তখন বাতিল হবে যখন সফর তার প্রতিবন্ধক হবে। যেমন সে একস্থান থেকে অন্য স্থানের অবস্থানের নিয়ত করল, যা তিনদিন পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে। তখন এরা রাষ্ট্রীয় মুসাফির হবে। আর এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা সফর হয় না। তাই এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে যাওয়ার দ্বারা ইকামত বাতিল হবে না। আর ইকামত বাতিল না হওয়ার কারণে এরা মুকীম হবে মুসাফির হবে না।

وَأَنِ افْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمَقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَتَمَّ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ قَرَضُهُ إِلَى أَرْبَعٍ لِلتَّبَعِيَّةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بِنَيْبَةِ الْإِقَامَةِ لِاتِّصَالِ الْمُغَيَّرِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ الْوَقْتُ وَأَنِ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تَجْزِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِانْقِضَاءِ السَّبَبِ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ بِنَيْبَةِ الْإِقَامَةِ فَيَكُونُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمَقِيمِينَ رَكَعَتَيْنِ سَلَّمَ وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ لِأَنَّ الْمُفْتَدَى النِّزَمَ الْمُوَافَقَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ فَيَنْفَرِدُ فِي الْبَاقِي كَالْمَسْبُوقِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْرَأُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ تَخْرِيمًا لَا فِعْلًا وَالْفَرَضُ صَارَ مُؤَدَّى فَيَتَرَكُهَا احْتِطًا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ لِأَنَّهُ أَذْرَكَ قِرَاءَةً نَافِلَةً فَلَمْ يَتَأَدَّ الْفَرَضَ فَكَانَ الْإِنْيَانُ أَوَّلَى .

অনুবাদ : আর মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া নামাজের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইকতিদা করে তাহলে চার রাকআত পূরা করবে। কেননা তার অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় তার ফরজ চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ, পরিবর্তনকারী বিষয় (অর্থাৎ ইকতিদা) 'সবব'-এর সাথে (অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে) যুক্ত হয়েছে। যদি মুকীম ইমামের কাছে কাজা নামাজে शामिल হয়, তবে তা জায়েজ হবে না। কেননা ওয়াক্তের সবব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ফরজ পরিবর্তিত হয় না, যেমন ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। এমতাবস্থায় এটা বৈঠক ও কেহরাতের ক্ষেত্রে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতিদার মতো হয়ে যাবে, যা জায়েজ নয়। মুসাফির যদি দুই রাকআতে মুকীমদের ইমামতি করে তবে সে (দুই রাকআত শেষে) সালাম ফিরাবে আর মুকীমগণ তাদের নামাজ পূর্ণ করে নিবে। কেননা দুই রাকআতের ক্ষেত্রে (মুসাফির ইমামের) অনুসরণের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তারা মাসবুকের মতো একাকী হয়ে পড়বে। তবে বিসুদ্ধ মতে সে কিরাআত পড়বে না। কেননা তারা তাহরীমার বেলায় মুকতাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় নয়। আর ফরজ (কেহরাত) আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং সর্বকথা হিসাবে কেহরাত তরক করবে। মাসবুকের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে নফল কেহরাত পেয়েছে; কিন্তু ফরজ কেহরাত আদায় হয়নি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে কেহরাত পড়াই উত্তম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দু'টি মাসআলার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। এক. মুসাফিরের মুকীমের ইকতিদা করার হুকুম। দুই. মুকীমের মুসাফিরের ইকতিদা করার হুকুম। প্রথম মাসআলা ওয়াক্তের মধ্যে জায়েজ; কিন্তু ওয়াক্তের পর জায়েজ নেই। দ্বিতীয় মাসআলা ওয়াজিবের মধ্যেও জায়েজ এবং ওয়াক্তের বাইরেও জায়েজ। কুদুরী গ্রন্থকার প্রথম মাসআলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, মুসাফির যদি ওয়াক্তের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে, অর্থাৎ মুসাফির চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের আদায়ের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে তবে মুসাফির পূরা চার রাকআত আদায় করবে। দলিল হলো, মুসাফির এমন ব্যক্তির অনুসরণকে বাধ্য করেছে, যার ফরজ নামাজ হলো চার রাকআত। সুতরাং তখন অনুসরণের বাধ্যবাধকতার কারণে তার ফরজও চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন ইকামতের নিয়ত দ্বারা মুসাফিরের ফরজ চার রাকআতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।



لَا يَصِلُ الْمَغِيرَ -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে حَامِع বিদ্যমান আছে, আর তা হল: مغير তথা দুই রাকআতকে চার রাকআতে পরিবর্তনকারী সবব-এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং مغير প্রথম টির মধ্যে হলে ইকতিদা যা সবব তথা ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন দ্বিতীয়টির মধ্যে مغير যথা ইকামতের নিয়ত সবব তথা ওয়াক্তের সাথে যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِضَةِ الْمَكِيِّمِ ইকতিদা করে তবে এটা জায়েজ নেই। কেননা ওয়াক্তের পরিবর্তন দ্বারা মুসাফিরের ফরজ পবিত্রিত হয় না কারণ ফরজ নামাজের সবব তো হলো ওয়াক্ত। আর ইকতিদা যে পরিবর্তন সাধিত করে তা সববের সাথে যুক্ত হয়ে করে। আর যেহেতু কাজা নামাজের মধ্যে সবব তথা ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা এই যুক্ততা পাওয়া যায়নি, তাই মুসাফিরের ফরজ দুই রাকআত থেকে চার রাকআতের দিকে পরিবর্তিতও হবে না, যেমন কাজা নামাজ ইকামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। অথচ ইকামতের নিয়তও দুই রাকআতকে চার রাকআতে পরিবর্তনকারী।

قَوْلُهُ فَيَكُونُ أَفْضَلُ: দ্বারা পূর্বের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। সার সংক্ষেপ হলো, ওয়াক্ত চলে যাবার পর মুসাফির যদি চার রাকআত বিশিষ্ট কাজা নামাজের মধ্যে মুকীমের ইকতিদা করে তবে দুই অনুবিধার এক অনুবিধা অবশ্যই হবে। হয় নিজ ইমামের বিরোধিতা করতে হবে না হয় নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা করতে হবে। কেননা মুসাফিরের এ ধরনের ইকতিদার মধ্যে দুটি সুরত রয়েছে। মুসাফির মুক্তাদী দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাবে, কিংবা চার রাকআতের পর। যদি মুসাফির দুই রাকআতের পর সালাম ফিরায় তবে নিজ ইমামের বিরোধী হবে, যা নামাজ বিনষ্টকারী। আর যদি মুসাফির শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে শরিক থাকে তবে এরও দুটি সুরত রয়েছে। মুসাফির ওকু থেকেই ইকতিদা করবে কিংবা শেষ দুই রাকআতে ইকতিদা করবে। যদি প্রথম সুরতটি হয় তবে দুই রাকআতের পর বসা মুসাফিরের জন্য ফরজ। কেননা এটা হলো তার শেষ বৈঠক। আর ইমামে মুকীমের জন্য ফরজ নয় কেননা তাদের ব্যাপারে এটা হলো প্রথম বৈঠক। আর প্রথম বৈঠক ফরজ নয়। সুতরাং এ সুরতে বসার ক্ষেত্রে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি নফল আদায়কারীর মুক্তাদী হবে। আর যদি শেষ দুই রাকআতে ইকতিদা করা হয়, তবে শেষে তো ইমাম তথা মুকীমের কেরাত নফল আর মুক্তাদী তথা মুসাফিরের ফরজ। সুতরাং এ সুরতে কেরাতের ক্ষেত্রে ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির নফল আদায়কারীর ইকতিদা করা জঙ্কর হবে। আর এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, ফরজ আদায়কারীর ইকতিদা নফল আদায়কারীর পিছনে জায়েজ নেই। মুদ্বাকথা, ওয়াক্ত চলে যাবার পর মুসাফিরের মুকীমের মুক্তাদী হওয়ার বেলায় যেহেতু উভয় সুরতই ঠিক না, সেহেতু ওয়াক্তের পর এই ইকতিদা-ই জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَأَنْ صَلَّى الْمَسْأَرُ الن: যদি মুকীমরা মুসাফিরের ইকতিদা করে, তবে মুসাফির তাদেরকে দুই রাকআত-এর বসার পর সালাম ফিরাবে। আর মুকীমগণ তাদের নামাজ পূর্ণ করবে। দলিল হলো, মুকীম মুক্তাদীরা ইমামকে মুসাফির মানে করে দুই রাকআতের মধ্যে তার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। আর যার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল তা আদায় হয়ে গেছে। অথচ মুকীম মুক্তাদীর নামাজ এখনো পূর্ণ হয়নি। এজন্য মুকীম মুক্তাদী বিশিষ্ট দুই রাকআতের ক্ষেত্রে মুনফরিদ হবে, যেমন ইমামের সালাম ফিরাবার পর মাসবুক মুনফরিদ হয়ে যায়। তবে উভয়টির মাঝে পার্থক্য এতটুকু যে, মুকীম মুক্তাদী বিতক্ত মতানুযায়ী ঐ রাকআতগুলোর মধ্যে কেরাত পড়বে না, যা মুসাফির ইমামের সালাম ফিরাবার পর পড়া হয়, আর মাসবুকের কেরাত পড়তে হয়। বিতক্ত মতটির দলিল হলো, মুকীম শেষ দুই রাকআতে তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী তবে অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয়। তাহরীমার বেলায় তা মুক্তাদী এ জন্য যে, সে প্রথম তাহরীমায় ইমামের সাথে আদায় করার বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করেছে। আর অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী এজন্য নয়, যে দুই রাকআত শেষে সালাম ফিরাবার দ্বারা মুসাফির ইমামের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি এমন হয় অর্থাৎ তাহরীমার বেলায় মুক্তাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় মুক্তাদী নয়, তাকে লাহিক বলা হয়। আর লাহিকের উপর কেরাত নেই। কেননা তাহরীমার বেলায় যদি তার মুক্তাদী হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তার কেরাত পড়া হারাম হবে। আর যদি কাজের বেলায় মুক্তাদী না হওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে তার কেরাত পড়া মোতাহাব। কারণ, যে প্রথম দুই রাকআতে কেরাতে ফরজ ছিল তা আদায় হয়ে গেছে। মুদ্বাকথা, শেষ দুই রাকআতে মুকীম মুক্তাদীর কেরাত পড়া হারাম আর মোতাহাবের মাঝামাঝি পরিবেষ্টিত। তাই হারামকে অগ্রাধিকার দিয়ে সতর্কতা হলো এটাই যে, মুকীমে মুক্তাদী শেষ দুই রাকআতে কেরাত ছেড়ে দিবে। মাসবুকের বিষয়টি এর বিপরীত। এখানে মাসবুক দ্বারা ঐ মাসবুক উদ্দেশ্যে যে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম দুই রাকআতে ইমামকে পায়নি বরং শেষ দুই রাকআতে ইমামের সাথে শরিক হয়েছে। তাই ইমামের সালাম ফিরাবার পর মাসবুক যখন তার ফউত হওয়া দুই রাকআত আদায় করেছে তখন সে দুইরাকআতে তার কিরাআত পড়া ওয়াজিব হবে। কেননা মাসবুক শেষের দুই রাকআতে ইমামের যে কেরাতে পেয়েছে তা হলো নফল কেরাত। আর প্রথম দুই রাকআতে যে ফরজ কেরাত ছিল তা এখনো পর্যন্ত আদায় করেনি। তাই মাসবুকের উপর কেরাতে পড়া ওয়াজিব হবে। আল্লাহই সত্যক অবহিত।

قَالَ وَيَسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ آمِنُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ قَالَ هَ جَيْنَ صَلَّى يَاهِلِ مَكَّةَ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسَافِرُ فِي مِصْرِهِ أَتَمَّ  
الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمَقَامَ فِيهِ لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَضْحَاهُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا  
يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مُقِيمِينَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيدٍ .

অনুবাদ : সালাম ফিরানোর পর (মুসাফির) ইমামের পক্ষে এ কথা বলে দেওয়া মোস্তাহাব যে, তোমরা তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির কাফেলা। কেননা মুসাফির অবস্থায় মক্কাবাসীদের ইমামতি করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছিলেন। মুসাফির যখন আপন শহরে প্রবেশ করবে তখন নামাজ পূর্ণ করবে। যদি সেখানে সে ইকামতের নিয়ত না করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সফর করতেন। অতঃপর ইকামতের নতুন নিয়ত ব্যতীত ওয়াতানের দিকে ফিরে এসে মুকীম হিসাবে অবস্থান করতেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম যদি মুসাফির হয় তবে দুই রাকআত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলবে— আপনারা নিজেদের নামাজ পূর্ণ করে নিন আমি মুসাফির। দলিল হলো—আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীস,

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَنَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يَصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ صَلُّوا أَرَبْنَا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ .

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর সাথে মক্কা বিজয়ের দিন শরিক ছিলাম। তিনি আঠার রাত মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় তিনি (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের) দুই রাকআত পড়েছিলেন। আর বলেছিলেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা চার রাকআত-ই পড়ো আমি মুসাফির।

ফায়েদা : কুদুরীর ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, এটা শর্ত নয় যে, নামাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুক্তাদীর ইমাম মুসাফির কিংবা মুকীম জানার। কেননা মুক্তাদীগণ যদি পূর্ব থেকেই ইমাম-মুসাফির হওয়ার কথা জানে তবে সালাম ফিরাবার পর ইমামে মুসাফিরের *أَتَمُّ صَلَاتِكُمْ* "তোমরা নিজেদের নামাজ পূর্ণ করো" বলা অযথা হয়ে যাবে। আর যদি তার (মুক্তাদীর) ইমাম মুকীম হওয়ার কথা জানা থাকে তবে মুসাফির তার কথা *إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ* "আমি মুসাফির কাফেলা" -এর মধ্যে মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।

وَأِذَا دَخَلَ الْمَسَافِرُ فِي مِصْرِهِ : যখন মুসাফির তিন দিনের সফর শেষে আপন শহরে প্রবেশ করল তখন লোকালয়ে প্রবেশ করা মাত্রই মুকীম হয়ে যাবে, যদিও ইকামতের নিয়ত না করে। দলিল হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ আর সাহাবায়ে কেরাম সফর করতেন, সফর পূর্ণ হওয়ার পর যখন দেশে ফিরতেন, তখন ইকামতের নিয়ত ছাড়াই মুকীম হয়ে যেতেন।

وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَأَنْتَقَلَ مِنْهُ وَاسْتَوَظَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ قَصَرَ  
لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ وَطَنًا لَهُ إِلَّا يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَدَّ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنَ  
الْمُسَافِرِينَ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْوَطَنَ الْأَصْلِيَّ تَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ  
تَبْطُلُ بِمِثْلِهِ وَيَا السَّفَرَ وَيَا الْأَصْلِيَّ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَى حَفَسَةً  
عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَتِمَّ الصَّلَاةُ لِأَنَّ إِعْتِبَارَ النَّبِيَّةِ فِي مَوْضَعَيْنِ يَفْتَضِي إِعْتِبَارَهَا فِي  
مَوَاضِعَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يَغْرَى عَنْهُ إِلَّا إِذَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا  
فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ مُضَافَةً إِلَى مِثْلِهِ .

অনুবাদ : যদি কারো নিজস্ব আবাসভূমি থাকে অতঃপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাসভূমি  
রূপে গ্রহণ করে, অতঃপর সফর করে প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে সে কসর পড়বে। কেননা প্রথমটি  
তার আবাসভূমি থাকে না। এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে মক্কায় মুসাফির রূপে  
গণ্য করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে— নীতি হলো, স্থায়ী আবাসভূমি অনুরূপ আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, সফর  
দ্বারা হয় না। পক্ষান্তরে অস্থায়ী আবাসস্থল অনুরূপ স্থল দ্বারা, সফর দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।  
মুসাফির যদি মক্কায় ও মীনায় পনের দিন থাকার নিয়ত করে তবে সে কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের  
নিয়তকে যদি ইতিবার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন স্থানের ইকামতের নিয়তকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর  
তা নিষিদ্ধ। কেননা সফর তো বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে মুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে একটিতে রাত্রি যাপন  
করার নিয়ত করে থাকে তবে সে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা লোকের ইকামতের  
বিষয়টি তার রাত্রি যাপনের স্থানের স্থলে সম্পৃক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَائَةُ الْمَنَائِعِ সাধারণ মাশায়িখগণ আবাসভূমির তিনভাগ বর্ণনা করেছেন। স্থায়ী আবাসভূমি (وطن اصلی), অস্থায়ী  
আবাসভূমি (وطن اقامت), বসবাসের আবাসভূমি (وطن سكنی)। স্থায়ী আবাসভূমি হলো মানুষের জন্মের স্থান। কিংবা এ  
শহর যার মধ্যে তার পরিবার-পরিজন বসবাস করে এবং সেখানে থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা তাদের নেই। অস্থায়ী  
আবাসভূমি বলা হয়, এ শহর কিংবা গ্রামকে যার মধ্যে মুসাফির পনেরো দিন অবস্থানের ইরাদা করেছে। এর অপর নাম  
সফরের আবাস স্থল (وطن سفر)। আর وطن سكنی এ শহরকে বলা হয়, যার মধ্যে মুসাফির পনেরো দিনের কম  
অবস্থানের নিয়ত করেছে।

কেননা—  
- وطن سكنی তার وطن اقامت - وطن اصلی - وطن দুই ভাগে বিভক্ত  
করেননি। কেননা وطن سكنی -এর মধ্যে অবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায় না, বরং সফরের হুকুম বাকি থাকে। নীতিমালা হলো,  
স্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অস্থায়ী আবাসভূমি বা সফর দ্বারা বাতিল হয় না। আর  
অস্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয় এবং সফর ও স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয়ে যায়। তার  
দলিল হলো, একটি বক্তৃ তার চেয়ে বড় বক্তৃ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, কিংবা তার সমপর্যায়ের বক্তৃ দ্বারাও বাতিল হয়ে যায়। আর এ  
কথা সর্বসম্মত যে, স্থায়ী আবাসভূমির চেয়ে বড় অন্য কোনো কিছু নেই। তাই স্থায়ী আবাসভূমি তার বরাবর অর্থাৎ অন্য একটি

স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। এ সূরত হলো, এক ব্যক্তির একটি আবাসভূমি আছে, সে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অন্য স্থানকে তার আবাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন প্রথম আবাসভূমি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং শরয়ী সফরের পর সে যদি তার প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে মুকীম থাকবে না; বরং কসরের নামাজ পড়তে হবে। এটা ই কারণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মূল আবাসভূমি হলো মক্কা মুকাররামা। কিন্তু তিনি যখন হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন এবং মদীনাকে নিজের আবাসভূমি বানালেন, তখন আর মক্কা স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে থাকেনি। তাই তো হিজরতের পর যখন তিনি মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তিনি নিজেকে মুসাফির হিসাবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন, **أَيُّمًا** **صَلَّوْكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَرَّ** আর যেহেতু স্থায়ী আবাসভূমি অস্থায়ী আবাসভূমির চেয়ে বড়। তাই অস্থায়ী আবাসভূমি স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। আর অস্থায়ী আবাস ভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমির বরাবর। তাই অস্থায়ী আবাসভূমি আরেকটি অস্থায়ী আবাসভূমি দ্বারাও বাতিল হয়ে যাবে এবং অস্থায়ী আবাসভূমি সফর দ্বারাও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সফর হলো অস্থায়ী আবাসভূমির বিপরীত। আর নীতিমালা আছে যে, কোনো বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সফর তো স্থায়ী আবাসভূমিরও বিপরীত তাই স্থায়ী আবাসভূমিও সফর দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে, অথচ এমনটি তো হয় না?

জওয়াব হলো, স্থায়ী আবাস ভূমি সফর দ্বারা বাতিল হয় না হাদীসের কারণে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে দূর দূরত্বে চলে যেতেন, কিন্তু এরপরও মদীনা তাঁর স্থায়ী আবাসভূমি ছিল। তাই তো তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন কিন্তু অস্থায়ী আবাস স্থলের নিয়ত করতেন না। যদি স্থায়ী আবাসভূমি সফর দ্বারা বাতিল হয়ে যেতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে অবশ্যই অস্থায়ীভাবে নিয়ত করতেন।

**الْحَجُّ وَالْإِسَاءَةُ** মুসাফির এমন দুই স্থানে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত করেছে যার মধ্যে একটি স্থায়ী (مستقل) স্থান। যেমন- মক্কা ও মীনায় অবস্থানের নিয়ত করেছে। তখন সে মুকীম হবে না বরং মুসাফির-ই থাকবে এবং নামাজ কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়তকে ইতিবার করার দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, দুইয়ের অধিক স্থানের মধ্যে নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না হয় **لَا يَجُزِّعُ بِأَلَا مَرَّجِعٍ** লামিম আসবে। আর মুসাফিরের একসাথে অনেক স্থানে অবস্থানের নিয়ত করা নিষেধ। কেননা সফর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে খালি হয় না; বরং বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করা জরুরি হয়ে যায়। সুতরাং যদি বিভিন্ন স্থানের নিয়তের ইতিবার করা হয় তবে তার মতলব এই দাঁড়াবে যে, মানুষ কখনো মুসাফির-ই হবে না। হ্যাঁ যদি এ সূরত করা হয় যে, দুই স্থান মিলে পনেরো দিনের ইকামতের নিয়ত করা হয় এবং এ দুটির নির্দিষ্ট কোনো একটিতে রাত কাটানোর নিয়ত করা হয়, তবে এ নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। এখন এ ব্যক্তি যদি প্রথমে ঐ স্থানে যায় যেখানে দিনে থাকার নিয়ত করেছিল তবে সে মুকীম হবে না। আর যদি প্রথমে ঐ স্থানে যায় যেখানে রাত কাটানোর নিয়ত করেছিল তবে ঐ অধিবাসীতে প্রবেশ হওয়া মাত্র মুকীম হয়ে যাবে। অতঃপর ঐ অধিবাসীতে যাবার দ্বারা মুসাফির হবে না। যেখানে দিন অতিবাহিত করার নিয়ত করেছিল। কেননা মানুষের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রিযাপনের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আপনি দেখাবেন, যে লোক বাজারে কামকাজ করে তাকে যদি বলা হয় এ সময় আপনি কোথায় থাকেন তখন সে ঐ স্থানের কথাই বলবে সেখানে সে রাত্রি যাপন করে।

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكَعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسَبِ الْأَدَاءِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّيِّئَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ .

অনুবাদ : সফরে যার নামাজ ফউত হয়ে যায়, সে মুকীম হওয়ার পরও দুই রাকআতই কাজা করবে : হুদ্রূপ যার ইকামত অবস্থায় (চার রাকআত ওয়ালা নামাজ) কাজা হয়ে যায় সফরে তা চার রাকআত-ই আদায় করবে : কেননা আদায় অনুরূপ কাজা হয়ে থাকে। অনুরূপ কাজার বেলায় ওয়াকতের শেষ সময় ধর্তব্য। কেননা শেষ ওয়াক্ত-ই সবদ হিসাবে গণ্য, যখন ওয়াকতের মধ্যে নামাজ আদায় না করা হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : সফরে অবস্থায় যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ কাজা হয়ে যায় এবং হালাতে ইকামতে তা আদায় করতে চায় তবে দুই রাকআত কাজা করবে। আর যদি ইকামতের হালাতে কোনো চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ ফউত হয়ে যায়, অতঃপর সফরের হালাতে তা কাজা করতে চায় তবে চার রাকআত কাজা করবে। দলিল হলো, কাজা আদায়ের অনুরূপ ওয়াজিব হয়ে থাকে। অর্থাৎ যার উপর চার রাকআত আদায় ওয়াজিব হয় সে কাযাও চার রাকআত করবে। আর যার উপর দুই রাকআত আদায় ওয়াজিব হয়, তার উপর কাযাও দুই রাকআত ওয়াজিব হবে। আদায়ের মধ্যে ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য : ওয়াক্তের শেষ সময় দ্বারা তাহরীমা পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। যেমন, যদি জোহরের প্রথম ওয়াক্তের মুকীম থাকে অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই সফরের জন্য বের হয় এবং অধিবাসী থেকে তখন বের হয় যখন ওয়াক্ত শুধু এক রাকআত কিংবা এর চেয়ে কম বাকি থাকে তখন তার উপর দুই রাকআত-ই কাজা ওয়াজিব হবে। কেননা শেষ ওয়াক্তে সে মুসাফির হয়েছিল আর এটাই গ্রহণযোগ্য।

আদায়ের মধ্যে শেষ ওয়াক্ত এজন্য ধর্তব্য যে, ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করার সুরতে নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবদ হিসাবে শেষ ওয়াক্ত ধর্তব্য। এখানে একটি প্রশ্ন হয় তা হলো, আমাদের আলোচনা হলো কাজা নামাজের ক্ষেত্রে আর নামাজ যখন তার ওয়াক্ত থেকে ফউত হয়ে গেল তবে উসূলে ফিকহের বর্ণনামতে পূর্ণ ওয়াক্ত নামাজের সবদ হয়, শেষ অংশ সবদ হয় না? জওয়াব হলো, কোনো কোনো মাশায়িখের মতে নামাজ ফউত হওয়ার সুরতে ওয়াক্তের শেষাংশ সবদ হয়। হতে পারে হিদায়া গ্রন্থকার এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِهِ فِي الرَّخْصَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) سَفَرُ  
الْمَغْصِيَةِ لَا يَفِيدُ الرَّخْصَةَ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ تَخْفِيفًا فَلَا تَعْلَقُ بِمَا يَرْجُبُ التَّغْلِيطَ  
وَلَنَا إِطْلَاقَ التَّنْصُوصِ وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَغْصِيَةٍ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يَجَاوِرُهُ  
فَصَلَحَ مُتَعَلِّقُ الرَّخْصَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : অবৈধ উদ্দেশ্যে ও বৈধ উদ্দেশ্যে সফরকারী সফরে রুখসত লাভের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান। ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন, ওনাহের সফরে রুখসত লাভ হবে না। কেননা তা কষ্ট লাঘবের জন্য কার্যকরী। সুতরাং যা কঠোরতা দাবি করে, তার সাথে তা সম্পৃক্ত হবে না। আমাদের দলিল, শরিয়তের বিধানের নিঃশর্ততা। তা ছাড়া মূলত সফর কোনো অপরাধ নয়। অপরাধ তো এর পাশাপাশি বা পরে সংযুক্ত হয়। সুতরাং রুখসত সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফকীহগণের বর্ণনা মতে সফর তিন প্রকার, ইবাদতের সফর যেমন হজ এবং জিহাদ। মুবাহ সফর যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য। অবৈধ সফর যেমন- ডাকাতি করার জন্য সফর করা, কোনো সতীলোকের মাহরাম ব্যতীত হজের সফর করা। প্রথম দুই প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে রুখসতের সবব বা কারণ। আর তৃতীয় প্রকার আমাদের মতে তো রুখসতের সবব কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে সবব নয়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো, রুখসত মুকাট্লামের উপর কষ্টকে লাঘব করে দেয় আর যে জিনিস লাঘবের জন্য কার্যকরী তা এমন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না, যা কঠোরতাকে ওয়াজিব করে। অর্থাৎ অপরাধ আর নাফরমানী তো কঠোরতা আর আজাবকে ওয়াজিব করে। এর সাথে রুখসত আর তাখফীফ সম্পৃক্ত হতে পারে না। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, রুখসত হলো রহমত ও ইনআম যা আজাবের উপযোগীর নিকট আসতে পারে না। আমাদের দলিল হলো শরিয়তের বিধানের মূলতাক হওয়া। অর্থাৎ যে শরিয়ত কর্তৃক রুখসত পাওয়া গিয়েছে তা আমভাবে সকল মুসাফিরকে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ يَنْسَخُ فَرَضُ الْمَسَافِرِ رُكْعَتَانِ অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন, رَأْسُ الْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْلِيَّهَا করা হয়নি; বরং প্রত্যেক মুসাফিরকে শামিল করা হয়েছে। চাই সে তার সফরে বাধ্য হোক বা অবাধ্য হোক। দ্বিতীয় দলিল হলো, মূল সফর অপরাধ নয়। কেননা সফর বলা হয় দূরত্ব ভ্রমণ করাকে এ অর্থে কোনো অপরাধ নেই অপরাধ তো এর পরে হবে। যেমন- ডাকাতি, চুরি, কিংবা কোনো ধরনের অপরাধ সফরের সাথে সাথে হয় যেমন- কোনো গোলাম পলায়ন করা, সুতরাং মূল সফর যেহেতু অপরাধ নয়, তাই তার সাথে রুখসত সম্পৃক্ত হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

## بَابُ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ

لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ فِي مُصَلًّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقَرْيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَشْرِيْقُ وَلَا فِطْرُ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ إِمْرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْأَحْكَامَ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ وَهَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) وَعَنْهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسْغَهُمْ وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالثَّانِي اخْتِيَارُ الثَّلَاثِي وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلًّى بَلْ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَقْنِيَةِ الْمِصْرِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَائِجِ أَهْلِهِ.

### পরিচ্ছেদ : সালাতুল জুমুআ

অনুবাদ : জুমার নামাজ সহীহ হয় না কেবল জামে শহর কিংবা শহরের ইদগাহ ব্যতীত। গ্রামাঞ্চলে জুমা জায়েজ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমা, (তাকবীর) তাশরীক, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নেই। “জামে শহর” অর্থ এমন লোকালয়, যেখানে শাসক ও বিচারক রয়েছেন, যিনি শরিয়াতের বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং হদসমূহ কার্যকর করতে পারেন। এ হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মত। তাঁর থেকে আরেকটি মত বর্ণিত রয়েছে যে, যদি তারা তাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রথমটি ইমাম কারখী (র.) সমর্থিত মত এবং এটাই প্রকাশ্য মাযহাব। আর দ্বিতীয় মত হলো ইমাম সালজী (র.) গৃহীত মত। তবে জুমার বৈধতা শুধু ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং শহরের সমগ্র উপকণ্ঠেই জায়েজ হবে। কেননা শহরবাসীদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে তা শহরেরই স্থলবর্তী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত অধ্যায় ও পূর্বের অধ্যায়ের সাথে মিল রয়েছে। কেননা উভয়টির মধ্যে তানসীফ (সমানভাবে দুইভাগে বিভক্তিকরণ) আছে। তবে কসরের মধ্যে সফরের কারণে তানসীফ করা হয়েছে। আর জুমার মধ্যে খুতবার কারণে। তবে যেহেতু সফর প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ তানসীফ করে আর জুমার খুতবা শুধু জোহরের নামাজকে তানসীফ করে, এ জন্য সফর প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজের জন্য আম বা ব্যাপক আর জুমার খুতবা শুধু জোহরের নামাজের তানসীফের জন্য বাহ। আর বাছের আলোচনা যেহেতু আমের পরে হয় তাই সফরের নামাজের পর জুমার নামাজের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। ضم (জমعه) -এর মিম শব্দটি جمع (জমعه) থেকে নির্গত। যেমন فرقت শব্দটি افتراق থেকে নির্গত। যেমন اجتماع থেকে جمع (জমعه) এবং سكون (জমعه) সাথেও পড়া যায়। কেউ কেউ ميم-কে فتح দিয়েও (জমعه) পড়েছেন। জুমাকে জুমা এ কারণে বলা হয় যে, সে দিন সমস্ত লোক একত্রিত হয়।

জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং আকলী দলিল দ্বারা পাওয়া যায়। কুরআন দ্বারা এভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مَشْهُدٍ بَرْنَا মশহর বর্ণনা মতে যিকরুল্লাহ দ্বারা খুতবা মুরাদ। আর اسعوا -এর সীগাহ, যা উজুবকে চায়।

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي يَوْمِي. জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা জুমার নামাজ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন, আমার এই দিবসে, আমার এই মাসে, আমার এই শহরে। দ্বিতীয় হাদীস হলো: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ. জুমার নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জামাআতের সাথে আদায় করা হককে ওয়াজিব তথা ফরজ। কিন্তু চার প্রকারের লোকের উপর যেমন দাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি। তৃতীয় হাদীসে হলো: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذَرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُتَأَنِّفِينَ. যারাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ওজর ছাড়া তিন জুমা বর্জন করবে, সে মুনাফিকের দলে शामिल হয়ে যাবে। চতুর্থ হাদীস হলো: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ جَمَعَ مُتَوَلِّبَاتٍ فَقَدْ تَبَدَّدَ إِسْلَامُ رَأَاهُ. যে ব্যক্তি একাধারে চার জুমা বর্জন করবে সে ব্যক্তি ইসলামকে তার পিঠ পিছে ঠেলে দিয়েছে। এই দুই হাদীসের মধ্যে জুমা বর্জনের উপর কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ধর্মিক ফরজ বর্জন করার ঘরাই দেওয়া হয়। সুতরাং উক্ত হাদীস দুটি দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো। আর যেহেতু সকল লোক জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে, তাই ইজমা দ্বারাও জুমার নামাজ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি কুবায়ে আমার ইবনে আউফের মহল্লায় চৌদ্দরাত অতিবাহিত করেছিলেন। ঐ সময় তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যাকে ইসলামের সর্বপ্রথম মাসজিদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। যাকে কুরআনে **عَلَى الشُّرُفَى** দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর যখন তিনি কুবা থেকে মদীনার দিকে জুমার দিন রওয়ানা হলেন, তখন রাস্তায় সালামি ইবনে আতিকের মহল্লায় জুমার ওয়াক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে এ মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেছেন যা বতনে ওয়াদীতে অবস্থিত। এটা ইসলামে জুমা আদায়কারী সর্বপ্রথম মসজিদ ছিল। উক্ত জুমায় অনেক মুসলমান শরিক হয়েছিল। ইসলামে সর্বপ্রথম জুমা এবং খুতবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা **اصم السیر - شرح سیر کبیر** এ বর্ণিত হয়েছে।

জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য বারটি শর্ত রয়েছে, ছয়টি শর্ত তো এমন যা মুসল্লীর মধ্যে পাওয়া যাওয়া জরুরি (১) স্বাধীন হওয়া, সুতরাং গোলামের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। (২) পুরুষ হওয়া; (৩) মুকীম হওয়া, মুসাফিরের উপর জুমা ফরজ নয়। (৪) সুস্থ হওয়া, অর্থাৎ এমন অসুস্থ না হওয়া যে জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (৫) পা সहीহ হওয়া (৬) চোখ ঠিক হওয়া, সুতরাং লেংড়া ও অন্ধের উপর জুমা ফরজ নয়। অবশিষ্ট ছয়টি শর্ত এমন যার সম্পর্ক মুসল্লীর সাথে নয়। (১) শহর হওয়া, (২) জামাআত (৩) বাদশা (৪) ওয়াক্ত (৫) খুতবা এবং (৬) ইয়নে আম তথা ব্যাপক অনুমতি থাকা।



مصر مصلی المصر مصر جامع মতনের দুটি শব্দ, مصر جامع আর مصلی المصر ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। مصر جامع তথা জামে শহরের সংজ্ঞায় মতবিষয়ে রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জামে শহর হলো, যেখানে রাস্তা ঘাট, হাট বাজার এবং বিচারক থাকে-যারা জাতিম ও মজলুমের মাঝে ইনসাফ করে। আর আলিম থাকবে যারা বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া সমস্যাবলিতে ফতওয়া দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর থেকে এ ব্যাপারে তিনটি প্রিয়ওয়াযত রয়েছে। এক, জামে শহর প্রত্যেক ঐ স্থানকে বলা হয় যেখানে আমীর ও বিচারক থাকবে যারা শরিয়তের বিধি নিষেধ প্রয়োগ করতে সক্ষম : بَيْتُ الْحُكْمِ -এর পর الْحُكُودُ -এর- بَيْتُ বৃদ্ধি করে মুহাক্কাম (যাকে হাকাম ও ফয়সাল নির্ধারণ করা হয়েছে) এবং মহিলা বিচারক থেকে ইহতিরায করা হয়েছে। কেননা মহিলাদের বিচার জায়েজ তবে তাদের হদসমূহ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করার শরয়ী শক্তি নেই। জামে শহরের ক্ষেত্রে এটাই যাহিরে মাযহাব এবং এটাই ইমাম কারবী (র.) অবলম্বন করেছেন। দুই, জামে শহর ঐ স্থানসমূহকে বলা হয়, যার সবচেয়ে বড় মসজিদে তার সকল লোক যাদের উপর জুমা ফরজ যদি সমবেত হয়, তবে তাদের সংকুলান হয় না; বরং জুমার জন্য আরেকটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। উক্ত রিওয়াযাটটি আবু আব্দুল্লাহ সালজী গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় রিওয়াযাত হলো, দশ হাজার জন বসতীর স্থান হলো জামে শহর। সুফিয়ানে সাওরী (র.) বলেন, জামে শহর হলো, যাকে লোকেরা শহরের আলোচনায় শহর হিসাবে অভিহিত করে।

দ্বিতীয় শব্দ হলো, مصلی। শহরের মুসল্লা ইদগাহ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে মুসল্লা দ্বারা উপশহর উদ্দেশ্য, উপশহর শহরের ঐ পরিধিকে বলা হয়, যা শহরের সাথে সম্পৃক্ত এবং শহর বাসীদের জন্য বানানো হয়েছে। যেমন, কবর স্থান, ঘোড়দৌড়ের ময়দান, ইদগাহ, যবাইয়ের স্থান এবং আমাদের কালের পার্ক ইত্যাদি। ফনায়ে শহর এর পরিধির ব্যাপারে মতবিবোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এক গালওয়ার সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। গালওয়া বলা হয় তিনশত গজ থেকে চারশত গজকে। অর্থাৎ শহরের বাইরে চারশত গজ পর্যন্ত এলাকাকে উপশহর বলা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) একমাইল কিংবা দুই মাইলের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাইতো ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি ইমাম কোনো প্রয়োজন বশত শহর বাসীদের সাথে শহর থেকে বের হয়ে দুই মাইল পর্যন্ত বাইরে চলে যায়, এমনকি জুমার সময় হয়ে যায়। তবে তার জন্য জায়েজ আছে যে, ঐ স্থানেই জুমার নামাজ আদায় করিয়ে দিবে। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি শহরে দাঁড়িয়ে চিৎকার দেয়, কিংবা মুযাজ্জিন আযান দেয় তবে যেস্থান পর্যন্ত আওয়ায পৌছে সেস্থান পর্যন্তকে ফনায়ে শহর বলা হবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে সূরতে মাসআলা হলো, জুমার নামাজ শহর এবং উপশহর উভয় স্থানেই জায়েজ। তবে গ্রামে-গঞ্জে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে গ্রামে-গঞ্জে জুমার নামাজ জায়েজ। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে গ্রামে চল্লিশ জন স্বাধীন মুকীম ব্যক্তির আবাস হবে এবং যারা জাযাবরদের ন্যায় শীত ও গরমকালে এদিক সেদিক যায় না তাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলিল হলো, فَاسْعُرُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ উক্ত আয়াতটি। উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন জুমার দিন জুমার আজান হবে তখন লোকেরা সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, জুমার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের স্থানের প্রয়োজন নেই; বরং সবস্থানে জুমা আদায় করা জায়েজ। চাই শহর হোক বা গ্রাম হোক এবং গ্রাম ছোট হোক বা বড় হোক। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস,

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْمَدِينَةِ مَا جُمِعَتْ بِجَوَائِزٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ -

ইসলামের মধ্যে মদীনা শরীফের পর সর্ব প্রথম জুমা জুমাসা নামক স্থানে পড়া হয়েছিল। আর জুমাসা হলো বাহরাইনের একটি গ্রাম। তৃতীয় দলিল হলো কিয়াস দ্বারা। আর তা হলো, জুমার নামাজ ও অন্যান্য নামাজের ন্যায় একটি নামাজ। তাই অন্যান্য জামাজের মতো জুমার নামাজ ও সবজায়গায় জায়েজ হবে।

আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী لَا جُمُعَةَ وَلَا تَسْبِيحَ الْحَجِّ -এর অর্থাৎ জুমার নামাজ, তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা শুধু শহরের মধ্যে জায়েজ। উক্ত বাণীটিকে হিদায়া গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বলেছেন, অথচ সহীহ হলো এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয় বরং হযরত আলীর বাণী। যেমন- ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার

লিখেছেন যে, ইবনে আবী শায়বা উক্ত বাণীটিকে হযরত আলী (রা.)-এর উপর মওকুফ করেছেন, অর্থাৎ তার বাণী বলেছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর প্রথম দলিলের জওয়াব হলো, **فَانْصَرُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** আয়াতটি আপনাদের মতেও তার ইতলাক এর উপর নেই। কেননা আয়াতটির ইতলাক-এর চাহিদা হলো, জুমা প্রত্যেক স্থানে জায়েজ হওয়া। জনবসতী হোক বা জঙ্গল হোক। অথচ আপনাদের মতে জুমার নামাজ জঙ্গলেও জায়েজ নেই এবং এমন স্থানেও জায়েজ নেই যার বাসিন্দারা শীতে গরমে অন্যত্র চলে যায়। সুতরাং বুঝা গেল, আয়াত দ্বারা বিশেষ স্থান উদ্দেশ্য! আপনারা বিশেষ স্থান দ্বারা গ্রাম মুরাদ নিয়েছেন, আর আমরা শহর মুরাদ নিয়েছি। আর শহর মুরাদ নেওয়াটা ই সমীচীন। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর বক্তব্য এর সমর্থক। দ্বিতীয় দলিল তথা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব হলো, হাদীসের মধ্যে **قَرِيه** (কারিয়া) দ্বারা শহর মুরাদ। কেননা প্রাথমিক কালে কারিয়া দ্বারা শহরকে বুঝানো হতো। যেমন, কুরআনে বর্ণিত আছে—**وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا**—আয়াতে **قَرَيَتَيْنِ** দ্বারা মক্কা ও তায়েফ উদ্দেশ্য। আর নিঃসন্দেহে মক্কা শহর, সুতরাং বুঝা গেল হাদীসের মধ্যে **قَرِيه** দ্বারা শহর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, জুয়াকা বাহরাইনের একটি কিল্লার নাম। আর সাধারণত কিল্লার মধ্যে বিচারক ও আলিম থাকেন। তাই এর দ্বারাও জুয়াসা-এর শহর হওয়া প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মাবসূত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জুয়াসা হলো বাহরাইনের শহরের নাম।

তৃতীয় দলিল তথা কিয়াসের জবাব হলো, আয়াত দ্বারা সব স্থানে জুমার নামাজ জায়েজ হওয়া বুঝায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) কোনো কোনো স্থানে জুমার নামাজ জায়েজ হওয়াকে নিষেধ করেছেন। যেমন—গ্রামে-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে। হযরত আলী (রা.)-এর কোনো কোনো স্থানে জুমাকে জায়েজ বলা বা কোনো কোনো স্থানে নাজায়েজ বলা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেই বলেছেন, অথচ এটা কিয়াস পরিপন্থী কথা। সুতরাং যখন শহরের মধ্যে জুমা জায়েজ হওয়া আর গ্রামে-গঞ্জে নাজায়েজ হওয়া কিয়াসের খেলাফ হলো, তাই এটাকে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করা জায়েজ হবে না।

**وَالْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمَصْلِيِّ الْخ** ইবারত টুকুর ব্যাখ্যা হলো, জুমার নামাজ যেমনিভাবে ঈদগাহে জায়েজ। কেননা, এটা হলো উপশহর (**فناء شهر**) এমনিভাবে শহরের চতুর্দিকে যেখানে যেখানে উপ শহরের ইতলাক হয় সেখানেও জুমা জায়েজ। কেননা শহরবাসীদের জরুরত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উপশহর শহরের ভূমিকা রাখে।

وَيَجُوزُ بِمَنَىٰ إِنْ كَانَ الْأَمِيرُ أَمِيرَ الْحِجَازِ أَوْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مُسَافِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وَأَبُو يُوسُفَ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) لَا جُمُعَةَ بِمَنَىٰ لِأَنَّهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى لَا يَبْعُدَ بِهَا وَلَهُمَا أَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَمُ التَّغْفِيدِ لِلتَّخْفِيفِ وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهَا فِضَاءٌ وَبِمَنَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالتَّغْفِيدُ بِالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الْحِجَازِ لِأَنَّ الْوَلَايَةَ لَهُمَا أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلْبِي أُمُورَ الْحَجِّ لَا غَيْرَ وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهَا تَقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّفْذِيرِ قَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَنْجِيمًا لَأَمْرِهِ .

অনুবাদ : মীনাতে জুমা জায়েজ হবে যদি হিজায়ের আমীর উপস্থিতি থাকেন। কিংবা যদি মুসাফির অবস্থায় খলীফা উপস্থিত থাকেন। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মীনাতে জুমা জায়েজ নেই। কেননা এটি গ্রামে গণ্য। এ জনাই সেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, হজের মৌসুমে মীনা শহরে পরিণত হয়ে যায়, ঈদের আনুষ্ঠান হয় না। হাজীদের দায়িত্বভার লাঘবের জন্য। আরাক্ষতে সকলের মতেই জুমা জায়েজ নয়। কেননা তা খোলা প্রান্তর। পক্ষান্তরে মীনাতে ঘরবাড়ি রয়েছে। খলীফা কিংবা হিজাজের আমীরের সাথে বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। হজ মওসুমের আমীর তো শুধু হজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ই তদারক করে থাকেন, অন্য কিছু নয়। খলীফা কিংবা খলীফা নির্ধারিত লোক ছাড়া অন্য কারো জন্য জুমার নামাজ কয়েম করা জায়েজ নয়। কেননা জুমা বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা এছাড়া অন্যান্য কারণেও কোনো কোনো সময় ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুমার নামাজ সূত্বভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য তা জরুরি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে হজের মৌসুমে মীনা জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো হজের আমীর সে ব্যক্তি হতে হবে যে হিজাজের বিচারক। তার উপস্থিতি থাকতে হবে, শুধু হজের জন্য আমীর বানানো হয়েছে সে নয়। কিংবা খলীফাতুল মুসলিমীন স্বয়ং হজের ইরাদায় সফর করে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। খলীফার সাথে মুসাফিরের **فد** এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, খলীফা যদি মীনায় মুকীম থাকে, তবে তো অবশ্যই জুমার নামাজ মীনায় জায়েজ হবে। দ্বিতীয়ত এ সন্দেহকে দূর করার জন্য যে হজের মওসুমের আমীর যদি মুসাফির হয় তবে সে জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এমনভাবে খলীফাও মুসাফির হওয়া অবস্থায় জুমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।

ইমাম কুদুরী (র.) উক্ত সন্দেহকে দূর করার জন্য বলেছেন যে, হজের মওসুমের আমীর মুসাফির হওয়া অবস্থায় নিঃসন্দেহে জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও জুমা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর দ্বারা এটাও বুঝে আসল যে, খলীফা কিংবা বাদশা যদি নিজেদের সম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে সফর করে তবে প্রত্যেক শহরে তাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে শহরে জুমার দিন এসে যাবে সেখানেই জুমা আদায় করবে। দলিল হলো, যখন তার নির্দেশে অন্যদেরকে জুমার ইমাম নির্ধারণ করা যায় তখন তার নিজের পক্ষে জুমার ইমামত করা অবশ্যই জায়েজ হবে। যদিও তিনি মুসাফির হোন। মুদ্বাকথা শায়খাইনের মতে উপরোক্ত শর্তের সাথে মীনায় জুমার নামাজ জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মীনায় জুমার নামাজ একেবারেই জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো, মীনা না শহর না উপশহর; বরং একটি গ্রাম, আর গ্রামে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। এ জন্য মীনায়ও জুমার নামাজ জায়েজ হবে না। এ কারণেই মীনায় কুরবানির ঈদের নামাজ আদায় করা হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মীনা ফেনায়ে শহর তথা মক্কায় এ কারণে দাখিল নয় যে, তার মতে ফেনায়ে শহর বুখায় সেখানে এক গালওয়া তথা চারশত গজ পর্যন্ত হয়। আর মীনা মক্কা থেকে এর চেয়ে অধিক দূরত্বে অবস্থিত।

শাখাইন (র.)-এর দলিল হলো, মীনা নিঃসন্দেহে শহর নয়। কিন্তু হজের মওসুমে শহর হয়ে যায়। কেননা হজের মওসুমে সেখানে বাজার বসে, বাদশাহ কিংবা তার নায়েব এবং কাজী ঐ মওসুমে সেখানে উপস্থিত থাকেন। যেহেতু হজের মওসুম ব্যতিরেকে অন্য সময় এ সকল শর্ত পাওয়া যায় না, এ জন্য হজের মওসুম ব্যতীত অন্য সময় সেখানে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। তবে মীনায কুরবানির ঈদ আদায় না করার কারণ এই নয় যে, মীনা হজের মওসুমে শহর হয় না; বরং এর কারণে ঐ দিন হাজীগণ হজের আহকাম, রমী, জবাই এবং মাথা মুগানো ইত্যাদির কাজে মশগুল হয়ে যায়। আর সময়ও কম থাকে, এজন্য সহজ করণার্থে হাজীগণের কুরবানির ঈদের নামাজ না পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মীনা যেহেতু হরমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু মীনা ফেনায়ে মক্কার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আর বাণী, **مَذْبُوحَةُ الْكُفَّةِ** উক্ত আয়াতে মীনাকে কাবার সাথে গণনা (تعتبر) করা হয়েছে। আর তা এভাবে যে, কুরবানি ও হাদী-এর পশু মক্কায় জবাই করা হয় না; বরং মীনায জবাই করা হয়, এর দ্বারা বুঝা গেল মীনা মক্কা কিংবা ফেনায়ে মক্কার অন্তর্ভুক্ত। আর জুমা আদায় করা যেমনভাবে শহরের মধ্যে জায়েজ এমনিভাবে ফেনায়ে শহর তথা উপশহরেও জায়েজ।

আরাফার ময়দানে সর্বসম্মতিক্রমে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। কারণ হলো, আরাফা নিরেট একটি ময়দান, জনবসতি ইত্যাদি কিছুই তাতে নেই এবং ফেনায়ে মক্কারও অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা আরাফা হিন্ন-এর মধ্যে, হারামের মধ্যে নয়। সুতরাং আরাফা শহর কিংবা ফেনায়ে শহর কিছুই নয়, তাই সেখানে জুমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করাও জায়েজ হবে না।

কুদরী এছকার মীনার মধ্যে জুমা জায়েজ হওয়ার জন্য হিজাবের আমীর কিংবা খলীফার উপস্থিতির শর্তারোপ এ কারণে করেছেন যে, জুমা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা তাদের দুজনেরই রয়েছে। আর আমীর যাকে আমীরে মওসুম বলা হয় সেতো শুধু হজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তদারককারী, অন্য কিছু নয়। এ জন্য তার জুমা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা নেই।

**وَلَا يَجُوزُ إِقامَتُهَا** الخ: জুমার নামাজ আদায়ের জন্য সুলতান উপস্থিত থাকা আবশ্যিক। সুলতান ঐ ক্ষমতাবাহর ব্যক্তিকে বলা হয় যার উপর অন্য কোনো ক্ষমতাবাহর ব্যক্তি নেই। যেমন- খলীফা কিংবা ঐ ব্যক্তি থাকবে যাকে সুলতান নির্দেশ দিয়েছে। যথা- আমীর, কাজী কিংবা খতীব থাকবে। তবে শর্ত হলো তাদের জুমা প্রতিষ্ঠা করার ইজায়ত থাকতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, জুমা আদায়ের জন্য সুলতান কিংবা তাঁর নায়েব থাকা শর্ত নয়। (ইনায়্য) তাঁর দলিল হলো, যে সময় তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) দাঙ্গবাজদের ভয়ে স্বীয় ঘরে মদীনায় বন্দী ছিলেন, তখন হযরত আলী (রা.) তাদেরকে নামাজ পড়িয়েছিলেন, কিন্তু একথা বর্ণিত নেই যে, ওসমান (রা.)-এর নির্দেশে পড়িয়েছেন। অথচ ঐ সময় খিলাফতের দায়িত্বভার হযরত ওসমান (রা.)-এর হাতে ছিল। এর দ্বারা বুঝা গেল জুমা আদায়ের জন্য সুলতান কিংবা তাঁর নির্ধারিত লোকের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলিল হলো, জুমা একটি বিশাল জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। কেননা জুমা হলো জামেউল জামাআত তথা সমস্ত জামাআতের একত্রকরণকারী। আর অবস্থা হলো যে, আগ-পিছ নিয়ে কখনো ঝগড়া-বিবাদই বেধে যায়। কেউ বলে আমি ইমামত করব। অপরজন বলে আমি ইমামত করব। আবার কখনো সামনে অগ্রসর করানোর ক্ষেত্রেও ঝগড়া হয়। একদল বলে আমরা অমুক বুজুর্গকে ইমাম বানাব। অন্য দল বলে, না, আমরা অন্যজনকে ইমাম বানাব। আবার কখনো অন্যান্য ব্যাপারেও ঝগড়া হয়। যেমন- কেউ বলে আমাদের মসজিদে জুমা আদায় করা হবে। আবার কেউ বলে, না; বরং আমাদের মসজিদে আদায় করা হবে। কেউ বলে জলদী আদায় করা হবে, অপর কেউ বলে দেরি করে আদায় করা হবে। বিশাল জামাআতের এই মতবিরোধ দ্বারা শয়তানের ফিতনা সৃষ্টি করার বিরাত সুযোগ মিলে যায়। এ জন্য আমরা বলেছি জুমা আদায়ের জন্য খলীফা কিংবা তাঁর নায়েব থাকা জরুরি। খলীফা আদিল হোক বা জালিম হোক। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিলের জওয়াব হলো, হযরত আলী (রা.) হযরত ওসমানের নির্দেশক্রমে জুমার নামাজ পড়িয়েছেন। আর যদি আমরা মেনেও নেই যে হযরত ওসমান (রা.) নির্দেশ দেননি। তারপরেও জওয়াবে আমরা বলব, যখন লোকেরা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গেল এবং ইকামতে জুমারও মুখাপেক্ষী ছিল, তখন হযরত আলী (রা.)-এর জন্য জুমা পড়ানো জায়েজ হয়ে যায়। কেননা যখন খলীফার নির্দেশ নিতে অপারগ হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা যার উপর ঐকমত্য পোষণ করল তা-ই করলেন, অর্থাৎ নামাজ পড়িয়ে দিলেন।

وَمِنْ شَرَايِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصَحُّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا تَصَحُّ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا اسْتَقْبَلَ الظُّهْرَ وَلَا يَنْبِيهِ عَلَيْهَا لِاخْتِلَافِهَا .

অনুবাদ : জুমার আরেকটি শর্ত হলো সময়। সুতরাং তা জোহরের সময়ে সহীহ হবে। তার পরে সহীহ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, الْجُمُعَةُ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ যখন সূর্য হেলে পড়ে তখন তুমি লোকদের নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করো। যদি জুমার নামাজে থাকা অবস্থায় ওয়াক্ত চলে যায় তবে পুনরায় জোহর শুরু করবে, জুমার উপর জোহরের বিনা করবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন নামাজ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জুমার শর্তসমূহের মধ্যে ওয়াক্তও একটি শর্ত। অর্থাৎ জুমার নামাজ জোহরের ওয়াক্তে সহীহ হবে, এরপর সহীহ হবে না। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন— الْجُمُعَةُ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ যখন সূর্য হেলে যাবে তখন লোকদেরকে নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করো। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْلِي الْجُمُعَةَ جَنِّ تَيْبَلِ الشَّمْسِ যখন সূর্য হেলে পড়তো তখন জুমার নামাজ আদায় করতেন। মুসলিম শরীফে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য হেলে পড়তো তখন জুমার নামাজ আদায় করতেন। মুসলিম শরীফে আছে, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رَضِيَ) كُنَّا نَجْمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَتْ الشَّمْسُ যখন সূর্য হেলে পড়তো তখন জুমার নামাজ আদায় করতেন। মুসলিম শরীফে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুমার নামাজ পড়তাম যখন সূর্য হেলে যেতো।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যদি জোহরের ওয়াক্ত এ অবস্থায় বেরিয়ে আসে যে, ইমাম তখনো জুমার নামাজে মশগুল তবে জুমার নামাজ ফসিদ হয়ে যাবে, এখন শুরু থেকে জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে। জুমার উপর জোহরের নামাজের বিনা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিনা করা জায়েজ হবে— তাঁদের দলিল হলো, জুমা হলো জোহরের কসর নামাজ। তাই যা জোহরের ওয়াক্ত তা জুমারও ওয়াক্ত। সুতরাং যেহেতু জুমা জোহর-ই বটে সেহেতু জুমার উপর জোহরের বিনা জায়েজ হবে। আমাদের দলিল হলো, জুমা আর জোহরের মাঝে كَمَا . اسْمَا শর্তের দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। ইসমান পার্থক্য হলো, একটির নাম জুমা আর অপরটির নাম জোহর। কামান পার্থক্য হলো, জোহরের নামাজ চার রাকআত আর জুমার নামাজ হলো দুই রাকআত। কাইফান পার্থক্য হলো, জুমার নামাজের কিরাআত সশব্দে আর জোহরের নামাজের কিরাআত হলো নিঃশব্দে। শর্তের দিকে থেকে পার্থক্য হলো, জুমার নামাজ আদায়ের জন্য কিছু এমন শর্ত রয়েছে যা জোহরের মধ্যে নেই। মুদাকথা জুমা ও জোহরের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পরিবর্তন, ব্যবধান বিনাকে বারণ করে, যেমনটি ইফ্রিদাকে বারণ করে। এ জন্য আমরা বলেছি যে, জোহরের বিনা জোহরের উপর জায়েজ হবে না।

ইমাম কুদরী (র.) বলেন, দুটি খুতবা ওয়াজিব। দুই খুতবার মাঝে তিন তাসবীহ পরিমাণ বসা উত্তম। এভাবেই আমল চলে এসেছে। অর্থাৎ বুজুগদের থেকে একের পর এক এভাবেই করা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মতে এই কথাটি শর্ত নয়; বরং আরাম লাভের জন্য বসা হয়। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে শর্ত। এমনকি তাঁর মতে এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েজ নয়। তাঁর দলিল হলো আমলে তাওয়ারুস অর্থাৎ অতীতের সর্বকালীন আমল। আমাদের দলিল জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস— **إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا خُطْبَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا أَسْرَجَ جَعَلَهَا خُطْبَتَيْنِ بَعِثَ**—**رَسُولُ اللَّهِ ﷺ** দাঁড়িয়ে এক খুতবা পড়তেন, পরে যখন বার্বাছা উপনীত হলেন তখন দুই দুই খুতবা পড়তে লাগলেন এবং উভয় খুতবার মাঝে বসতেন। এর দ্বারা বঝা গেল এক খুতবার উপর ইকতিফা করা জায়েজ আছে।

অনুবাদ : তাহারাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। কেননা দাঁড়িয়ে খুতবা একটি সর্বকালীন আমল। অন্তঃপরি  
হত খুতবা হলো নামাজের শর্ত, এতে তাহারাত মুস্তাহাব। যেমন- আজানের ধ্বনি। যদি বসে কিংবা তাহারাত  
খুতবা পাঠ করে, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাসিল হয়ে যায়। তবে তা মাকরুহ  
। সর্বকালীন আমলের বিরুদ্ধাচরণ এবং নামাজ ও খুতবার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, খুতবা তাহারাতে সাথে দাঁড়িয়ে পড়া হবে। দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া আমাদের মতে সুন্নত। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বসে বসে খুতবা পড়া জায়েজ নেই। এক বর্ণনা মতে ইমাম মালিক (র.)ও উক্ত মত পোষণ করেন। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। খুতবার সময় তাহারাৎ আমাদের মতে সুন্নত, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে শর্ত। এমনকি তাঁদের মতে তাহারাৎ বাতীত খুতবা পাঠ করা জায়েজ নেই। দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার আমল সর্বকালীন আমল। অর্থাৎ অতীত বুজুর্গদের থেকে দাঁড়িয়ে জুমার খুতবার আমল চলে আসছে। বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন— **أَنَّكَ تَنْتَوِيهِ فَرَّقَهُ تَعَالَى** এবং বারাসুল্লাহ **ﷺ** দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় এক ব্যবসায়ী দল আসল। লোকেরা রাসুলুল্লাহ **ﷺ**-কে ছেড়ে ঐ দিকে চলে গেল। এই প্রক্ষেপটে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়— **فَإِذَا رَأَوْا تَبَارَةً أَوْ لَهْجًا انْفَضُّوا**। যখন তারা কোনো তিজারত বা খেল-তামাশাকে দেখল, সেদিকে তারা চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। উক্ত ঘটনা ঘরা বুঝা গেল, রাসুলুল্লাহ **ﷺ** দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, খুতবা যেহেতু জুমার নামাজের শর্ত তাই খুতবার মধ্যে তাহাযাহ বুজাহাব। যেমন- আজানের মধ্যে (তাহারাত মুস্তাহাব)। গ্রন্থকার খুতবাকে আজানের সাথে তুলনা করেছেন। বাহ্যিকভাবে বুখা যায় **وَجْهٌ شَبِيهُ** শর্ত হয় যেমন, যেমনিভাবে খুতবা জুমার নামাজের শর্ত এমনিভাবে আজানও শর্ত। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। আজান নামাজের শর্ত হওয়ার বিষয়টি একেবারে ভুল। ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, **كَالْأَذَانِ** -এর সম্পর্ক **يُتَسَبَّحُ فِيهَا الطَّهَارَةُ** -এর সাথে, **وَمِثْلِهِ** -এর সাথে নয়। এখন মর্মার্থ এই হবে যে, যেমনিভাবে আজানের জন্য তাহাযাহ মুস্তাহাব এমনিভাবে খুতবার মধ্যেও তাহাযাহ মুস্তাহাব। আদ্যমাতুল হিন্দ মাওলানা আবদুল হাই (র.) হিদায়ার টীকায় লিখেছেন যে, **وَجْهٌ شَبِيهُ** হলো হলো, যেমনিভাবে আজান ওয়াক্ব আসার পর দেওয়া হয় এমনিভাবে খুতবোও ওয়াক্ব আসার পর দেওয়া হয়। ইমাম কুদ্দুরী (র.) বলেন, যদি বসে বসে খুতবা পড়ে কিবা তাহাযাহ ছাড়া খুতবা পড়ে তা জায়েজ তবে মাকরুহ হবে। জায়েজ হওয়ার কারণ হলো খুতবার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। অর্থাৎ ওয়াক্ব নসীহত হয়ে যায়। আর বসে পড়া মাকরুহ এ কারণে যে, তাওয়াক্কুফ তথা সর্বকালীন আমলের খেলাফ। তাহাযাহ ছাড়া মাকরুহ এ কারণে যে, এ সুরতে নামাজ ও খুতবার মাঝে ব্যবধান হয়ে যায়। কেননা তাহাযাহ ব্যতীত খুতবা দেওয়ার সুরতে খুতবার পর তাহাযাহ হাসিল করবে তারপর নামাজ আরম্ভ করবে। এভাবে নিঃসন্দেহে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) -এর দলিল (বসে খুতবা জায়েজ না হওয়ার উপর) হলো, খুতবা হলো দুই রাকআতের স্থলবর্তী, সুতরাং যেমনিভাবে নামাজের জন্য কিয়াম শর্ত এমনিভাবে খুতবার জন্যও কিয়াম শর্ত :

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফি'র (র.)-এর দলিল (তাহারাত খুতবার শর্তের উপর) হলো, খুতবা হলো অর্থ নামাজের মর্যাদায়। যেমন বর্ণিত আছে যে, **قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (رض) إِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِمَكَانِ الْخُطْبَةِ**। সুতরাং যেমনিভাবে নামাজের জন্য তাহারাত শর্ত, এমনিভাবে খুতবার জন্যও তাহারাত শর্ত।

فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ جَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هِيَ الْوَاجِبَةُ وَالتَّسْنِيحَةُ وَالتَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّى خُطْبَةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوزُ حَتَّى يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ اِغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاسْمَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَعَنْ عُثْمَانَ (رض) أَنَّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَارْتَجَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلَّى .

অনুবাদ : যদি শুধু জিকিরের উপর শেষ করে দেয়, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ। আর সাহেবাইনের মতে এই পরিমাণ দীর্ঘ জিকির আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যায়। কেননা খুতবা হলো ওয়াজিব। শুধু তাসবীহ আর শুধু হামদকে খুতবা বলা হয় না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) প্রচলিত রীতির উপর ভিত্তি করে বলেন, দু'টি খুতবা পাঠ ছাড়া জায়েজ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْمَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও। এতে কোনো বিশ্লেষণ করা হয়নি। হয়রত ওসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলার পর তাঁর কথা থেমে গেলে তিনি (মিষর থেকে) নেমে গেলেন এবং নামাজ আদায় করলেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খুতবার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খোদ হানাফী আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমামে আবু হানীফা (র.)-এর মতে যদি খুতবার ইরাদায় শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে কিংবা সুবহানাল্লাহ বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তবে তা জায়েজ হবে। আর যদি ইচ্ছা দেওয়ার কারণে খতীব সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বলেন, কিংবা আশ্বর্যের কোনো সংবাদের কারণে সুবহানাল্লাহ বলেন, তবে সর্বসম্মতিক্রমে খুতবা জায়েজ হবে না। সাহেবাইন বলেন, এ পরিমাণ দীর্ঘ জিকির হওয়া জরুরি যাকে সাধারণত খুতবা বলা হয়। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলা কিংবা সুবহানাল্লাহ বলা কিংবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এগুলোর নাম খুতবা নয়। সুতরাং খতীব যদি শুধু উপরোক্ত বাক্যগুলো বলে তবে ওয়াজিব খুতবা আদায় হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, দুই খুতবা ওয়াজিব। প্রথম খুতবা আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরদ, তাকওয়ার উপদেশ এবং সর্বনিম্ন এক আয়াত সফলিত হতে হবে। আর দ্বিতীয় খুতবার মধ্যে আয়াতের স্থলে মুসলমান নর-নারীদের জন্য দোয়া করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল প্রচলিত রীতি এবং মানুষের স্বাভাবিক আদত বা অভ্যাস। অর্থাৎ এর চেয়ে কম পরিমাণকে মানুষের আদত বা প্রচলিত রীতি বলা হয় না। অধিকন্তু খতীব সাহেবগণ সাধারণত এর কম খুতবা দেন না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْمَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ সমস্ত মুফাসসিরদের মতে যিকরুল্লাহ দ্বারা খুতবা মুরাদ, এর মধ্যে কমবেশির কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা গেল, মৃতলাকান যিকরুল্লাহ দ্বারা চাই কম হোক বা বেশি হোক ওয়াজিব খুতবা আদায় হয়ে যাবে। হয়রত ওসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, খলীফা হওয়ার পর যখন প্রথমবার জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য মিষরে উঠলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ বললেন, তখন তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মিষর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকদেরকে জুমার নামাজ পড়িয়ে দিলেন। ঐ সময় ওলামায়ে সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন, তবে কেউ হয়রত ওসমানের উক্ত কাজকে অপছন্দ করেননি। সুতরাং সাহাবীগণের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধু আল্লাহর জিকিরের দ্বারা খুতবা জায়েজ হয়ে যায়। তবে সাহেবাইনের এই বক্তব্য যে, শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলাকে প্রচলিত রীতিতে খুতবা বলা হয় না। নিঃসন্দেহে উরফে তাকে খুতবা বলা হয় না, তবে আভিধানিকভাবে খুতবা বলা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই ব্যক্তিকে يَسْرُ الْخُطْبُ নিষ্ঠ খতীব বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর খুতবায় مَنْ يَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رُئِدَ وَمَنْ يَعْصِيهَا فَقَدْ غَوَى . বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, খুতবার জন্য দীর্ঘ জিকিরের কোনো প্রয়োজন নেই। (ফাতহুল কাদির)



وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْهَا وَأَقْلَهُمْ عِنْدَ إِبْنِ حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ سَوَى الْإِمَامِ وَقَالَ إِنْ شَاءَ قَالَ (رض) وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ إِبْنِ يُونُسَ وَخَذَهُ لَهُ أَنَّ فِي الْمَثْنَى مَعْنَى الْاجْتِمَاعِ وَهِيَ مُبْنِيَّةٌ عَنْهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ جَمْعٌ تَسْمِيَةٌ وَمَعْنَى وَالْجَمَاعَةُ شَرَطٌ عَلَى جِدَّةٍ وَكَذَا الْإِمَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْهُ.

অনুবাদ :- জুমার আরেকটি শর্ত হলো জামাআত। কেননা جمعة শব্দটি جماعة শব্দ হতে গঠিত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে জামাআতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ইমাম ছাড়া তিনজন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ছাড়া দুইজন হতে হবে। গ্রন্থকার বলেন, বিদ্বৎমত কথা হলো, এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর একার মত। তাঁর দলিল হলো, দুইয়ের মাঝে اجتماع বা সমাবেশের অর্থ রয়েছে। আর جمعة শব্দটি সমাবেশের প্রতিই ইঙ্গিত করে। তারফাইনের দলিল হলো, প্রকৃতপক্ষে جمع বা বহুবচন হলো তিন। কেননা এটিই নাম ও অর্থ উভয় দিক থেকেই جمع। আর জামাআত আলাদা শর্ত। তদ্রূপ ইমামও শর্ত। সুতরাং ইমাম জামাআতের মধ্যে গণ্য হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জামাআত সর্বসম্মতিক্রমে জুমার শর্ত। তবে মুসল্লীদের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম ব্যতীত সর্বনিম্ন তিনজন হওয়া জরুরি। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে ইমাম ব্যতীত দুইজন যথেষ্ট। এটাতে হলো ইমাম কুদুরী (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সত্যকথা হলো, ইমাম ব্যতীত দুইজন মুকাদ্দী হওয়া শুধু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুরূপ। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনার খোলাসা হলো, তারফাইনের মতে জুমা জামাআতের জন্য ইমাম ব্যতীত তিনজন হওয়া শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ইমাম ব্যতীত দুইজনও যথেষ্ট। জুমার জন্য জামাআত এ জন্য শর্ত যে, জুমা শব্দটি جماعت (জামাআত) থেকেই নির্গত হয়েছে। তাই জুমা জামাআত ব্যতীত সংগঠিত হবে না। যেমন- ضارب (যারিবুন) ضرب (যারবুন) থেকে নির্গত হয়েছে। ضارب (প্রহারকারী) যারব তথা প্রহার ব্যতীত সংগঠিত হবে না। জামাআতের সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, জুমার আভিধানিক অর্থ- جمع তথা অনেক আর দুইয়ের মধ্যে সমাবেশের অর্থ রয়েছে। কেননা তার মধ্যে একটি অপরটির সাথে একত্রিত হয়। সুতরাং যেহেতু জুমার আভিধানিক অর্থ দুইটি সংখ্যা দ্বারা সংগঠিত হয়ে যায়, সেহেতু ইমাম ব্যতীত দুইজন হওয়াই জুমা জামেজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তারফাইনের দলিল হলো, নিঃসন্দেহে জুমা اجتماع তথা সমাবেশ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আদ্বাহ তা'আলার বাণী نَاسِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ-এর মধ্যে نَاسِعُوا দ্বারা খিতাব جمع দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্মোহনের জন্য বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর جمع দ্বারা কমপক্ষে তিন বুঝায়। কেননা তিন সংখ্যাটি নাম এবং অর্থ উভয় দিক থেকে বহুবচন। এ জন্য আমরা বলেছি যে, ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন হওয়া জরুরি।

وَالْجَمَاعَةُ شَرَطٌ عَلَى جِدَّةٍ الْخ- ইবারতটুকু দ্বারা প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত অনুযায়ীও ইমামসহ তিনজন হয়ে যায়। এর জবাব হলো, জামাআত আলাদা শর্ত, ইমাম হওয়া আলাদা শর্ত। কেননা আদ্বাহর বাণী نَاسِعُوا-এর- جمع-এর সীগাহটি তিনজনকে বুঝায়। আর إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ এক ব্যাকের তথা ইমামকে বুঝায়। সুতরাং আয়াত দ্বারা চারজন হওয়া প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ একজন ইমাম, তিনজন মুকাদ্দী। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম এ তিনজনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইমাম ব্যতীত তিনজনের জামাআত হওয়া শর্ত।

وَأَنْ نَفَرَّ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَيَسْجُدَ إِلَّا السَّمَاءَ وَالصَّيْبَانَ اسْتَقْبَلَ الظُّهَرَ  
 بِئَذَى حَنِيفَةً (رح) وَقَالَا إِذَا نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَإِنْ  
 مَرُّوا عَنْهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِرُفَرٍ (رح) هُوَ يَقُولُ  
 تَهْ شَرْطٌ فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَائِمِهِ كَالْوَقْتِ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الْإِنْعِقَادِ فَلَا يَشْتَرِطُ  
 وَامُهَا كَالْخُطْبَةِ وَلَا بِئَذَى حَنِيفَةً (رح) أَنَّ الْإِنْعِقَادَ بِالشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ  
 لَا بِتَمَامِ الرَّكْعَةِ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَيْسَ بِصَلَاةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَائِمِهَا إِلَيْهَا بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ  
 بِأَنَّهَا تُنَافِي الصَّلَاةَ فَلَا يَشْتَرِطُ دَوَائِمُهَا وَلَا مُعْتَبَرٌ بِبَقَاءِ التَّسْوَانِ وَكَذَا الصَّيْبَانِ  
 تَهْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ فَلَا تَتِمُّ بِهِمُ الْجَمَاعَةُ.

অনুবাদ : ইমাম রুকু ও সিজদা করার পূর্বেই যদি লোকেরা চলে যায়, শুধু নারী ও শিশুরা থেকে যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম পুনরায় জোহর শুরু করবেন। সাহেবাইন বলেন, ইমাম নামাজ শুরু করার পর তারা যদি তাকে ছেড়ে যায় তবুও তিনি জুমার নামাজই আদায় করবেন। আর যদি রুকু ও একটি সিজদা করার পর তারা চলে যায়, তবে (সকলের মতে) তিনি জুমাই অব্যাহত রাখবেন। ইমাম যুফার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে তিনি বলেন, যেহেতু এটা শর্ত সেহেতু এর স্থায়িত্ব আবশ্যিক। যেমন ওয়াক্তের বিষয়টি। সাহেবাইনের দলিল হলো জামাআত হলো জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হবে না। যেমন খুতবার বিষয়টি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জুমা অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হবে নামাজ শুরু হওয়ার মাধ্যমে। আর এক রাকআত পূর্ণ হওয়া ছাড়া নামাজের শুরু পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা এক রাকআতের কম পরিমাণ নামাজ হয় না। সুতরাং এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জামাআতের স্থায়িত্ব জরুরি। খুতবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা নামাজের সাথে সামঞ্জস্যহীন, সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হতে পারে না। নারী তেমনি ছেলেদের থেকে যাওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাদের দ্বারা জামাআতের পূর্ণতা সাধিত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি জুমার নামাজ শুরু করার পূর্বে লোকেরা ইমামকে একাধিক রেখে চলে যায় তবে সকলের মতে ইমাম জোহরের নামাজ পড়বে, জুমার নামাজ আদায়ের ইজাযত নেই। আর যদি জুমার নামাজ শুরু করার পর ইমামের রুকু সিজদা করার পূর্বে লোকেরা ইমামকে রেখে চলে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম এই সুরতেও শুরু থেকে জোহরের নামাজ পড়বে আর সাহেবাইনের মতে ইমাম জুমার উপরই বিনা করবে অর্থাৎ জুমার নামাজ-ই পড়বে, জোহর পড়ার একেবারেই জরুরত নেই। আর যদি ইমামের রুকু ও এক সিজদা করার পর লোকেরা ইমামকে ছেড়ে চলে যায়, তবে আইখ্বায়ে সালাসা অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মতে জুমার উপর বিনা করবে অর্থাৎ জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ইমাম এই সুরতেও জোহর পড়বে। তাঁর দলিল হলো, জামাআত হলো জুমা আদায়ের

জন্য শর্ত, যেমন ওয়াস্ত আদায়ের শর্ত। সুতরাং যেমনিভাবে ওয়াস্তের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি এমনিভাবে তাহরীমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জামাআত পাওয়া যাওয়াও শর্ত। উপরোক্ত সূরতে যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জামাআত পাওয়া যায়নি; বরং মাঝে জামাআত ছুটে গেছে, এ জন্য জুমার নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং ইমামের জোহরের নামাজ পড়া জরুরি। সাবেহাইনের দলিল হলো, জামাআত হওয়া জামাআত আদায়ের শর্ত নয়; বরং জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। যেমন খুতবা জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত। অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়; বরং অনুষ্ঠিত হওয়ার সীমা পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি, এরপর জরুরি নয়। সুতরাং যখন তাহরীমার সময় জামাআত পাওয়া গেছে তবে তো জুমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এরপর জামাআত বাকি থাকা শর্ত নয়। সুতরাং জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামাআত ফউত হওয়ার দ্বারা জুমা ফউত হয় না। যেহেতু জুমা ফউত হয়নি; তাই ইমাম জুমাই পূর্ণ করবে জোহর পড়বে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, নিঃসন্দেহে জামাআত জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত, যেমনটি আপনারও বলেছেন। তবে নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়া নামাজ শুরু করার দ্বারাই হয়, আর এক রাকআত পূর্ণ হওয়ার দ্বারাই নামাজের শুরু পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এক রাকআতের কমে নামাজ হয় না। তাইতো এক রাকআতের কম ছেড়ে দিলে **لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ** -এর অধীনে এসে যায় না। সুতরাং বুঝা গেল নামাজ বলতে হলে কমপক্ষে এক রাকআত পূর্ণ হতে হবে। যোদ্ধাকথা হলো, জামাআত জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত। আর জুমা অনুষ্ঠিত হয় জুমার নামাজ শুরু করার দ্বারা। সর্বনিম্ন এক রাকআতকে নামাজ বলা যায়। তাহলে বুঝা গেল জুমার নামাজ এক রাকআত পূর্ণ হওয়ার দ্বারা শুরু হবে। সুতরাং এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি জামাআত পাওয়া যায় তবে জুমা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন যদি ইমামের রুকু সিজদা করার পর লোকেরা পলায়ন করে এবং জামাআত ফউত হয়ে যায়, তবে জুমা ফউত হবে না। আর যদি এর পূর্বে পলায়ন করে তবে জামাআত ফউত হয়ে যাবে। সুতরাং যেহেতু জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত তথা জামাআত ফউত হয়ে যায় সেহেতু জুমা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমামের জোহর পড়া ওয়াজিব হবে। বাকি জুমার খুতবাও জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। কিন্তু এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার পাওয়া জরুরি নয়; এর জওয়াব হলো, নিঃসন্দেহে জুমার খুতবা জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত তবে যেহেতু খুতবা হলো নামাজের মুনাফী তথা বিপরীত। যদি নামাজের মধ্যে খুতবা পড়া হয় তবে নামাজই ফাসিদ হয়ে যাবে, এ জন্য এক রাকআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার থাকা শর্ত নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জুমার নামাজ ছেড়ে দিয়ে যদি লোকেরা চলে যায় শুধু নারী ও ছেলেরা থেকে যায়, তবে এদের কোনো ইতিবার নেই। কেননা নিরেট নারী ও ছেলেদের দ্বারা যেহেতু জুমা অনুষ্ঠিত হয় না, তাই তাদের দ্বারা জামাআতের শর্তও পূর্ণ হবে না।

**ফায়দা :** ইমাম সাহেবের দলিলের উপর একটি প্রশ্ন হয়- তা-হলো, যখন এক রাকআতের কমে নামাজ অনুষ্ঠিত হয় না; তাহলে তো নফল শুরু করে ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা কাজা ওয়াজিব না হওয়া উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এক রাকআত আদায় না করে নামাজ ছেড়ে দেয়?

জওয়াব, এক রাকআতের কম-এর দু'টি অবস্থা রয়েছে। এক, তাহরীমা পেল- সুতরাং এই হিসাবে তো সেটা নামাজ। দুই, যেহেতু নামাজ বলা হয় কিরাআত, রুকু, সিজদা ইত্যাদিকে যা এখানে বিদ্যমান নেই, সেহেতু এই হিসাবে তা নামাজ নয়। নফলের ক্ষেত্রে সতর্কতার উপর আমল করতে গিয়ে আমরা প্রথম অবস্থার ইতিবার করে কাজা ওয়াজিব বলেছি। কেননা এর দ্বারা নিঃসন্দেহে অপরাধ থেকে বাঁচা যাবে। আর জুমার মাসআলায় আমরা দ্বিতীয় হালাতের উপর আমল করেছি। কেননা জোহরের নামাজ পড়লে নিঃসন্দেহে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَقِيدٍ وَلَا أَعْمَى لِأَنَّ الْمُسَافِرَ  
يَخْرُجُ فِي حَضْرٍ وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالْأَعْمَى وَالْعَبْدُ مُشْغُولٌ بِخِدْمَةِ بَنُوْلَى وَالْمَرَأَةُ  
بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ فَعِذْرُوْا دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالصَّرَرِ فَإِنْ حَضَرُوا فَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاهُمْ عَنْ  
فَرْضِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوْهُ فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ .

অনুবাদ : মুসাফির, নারী, রোগী, দাস ও শিশুর উপর জুমা ওয়াজিব নয়। কেননা জুমার উপস্থিতিতে মুসাফিরের অসুবিধা হবে। রোগী ও অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা। তদ্রূপ দাস তার মনিবের খিদমতে এবং স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতে ব্যস্ত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য তাদের 'মাজুর' গণ্য করা হয়েছে। তবে যদি তারা উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমার নামাজ আদায় করে, তাহলে ওয়াক্ফিয়া ফরজের পরিবর্তে তা যথেষ্ট হবে। কেননা তারা নিজেই তা বরদাশত করেছে। সুতরাং তারা ঐ মুসাফিরের মতো হয়ে যাবে, যে সফরে সিয়াম পালন করল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আদায়ে জুমা, মুসাফির, নারী, অসুস্থ ব্যক্তি, দাস এবং অন্ধ কারোর উপর ওয়াজিব নয়। দলিল হলো, মুসাফির অসুস্থ ব্যক্তি এবং অন্ধের জুমায় হাজির হওয়ার দ্বারা অসুবিধা হয়। দাস তার মনিবের খিদমতে আর নারী তার স্বামীর খিদমতে নিয়োজিত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করার জন্য তাদেরকে জুমার উপস্থিতি থেকে মাজুর গণ্য করা হয়েছে।

الخ : فَإِنْ حَضَرُوا : যে সকল লোককে জুমা, আদায় থেকে মাজুর ধরা হয়েছে তারা যদি জুমায় উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমার নামাজ আদায় করে, তবে তাদের ওয়াক্ফিয়া ফরজ আদায় হয়ে যাবে। দলিল হলো, তাদের থেকে জুমার নামাজ সাকিত হয়ে যাওয়া এমন কোনো কারণে নয় যা নামাজের মধ্যে পাওয়া যায়; বরং তাদের থেকে ক্ষতি ও অসুবিধাকে দূর করার জন্য জুমার ফরযিয়ত তাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তারা ক্ষতি ও কষ্টকে বরদাশত করে নিয়েছে এবং হিম্মত করে জুমার নামাজ আদায় করেছে। তাই তারা ঐ মুসাফিরের অনুরূপ হয়ে গেল যে সফরে সিয়াম পালন করেছে। অথচ কষ্টের কারণে মুসাফিরকে রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যদি সে রোজা রাখে তবে তা জায়েজ; বরং উত্তম। কেননা সে মুকীমের তুলনায় অধিক কষ্ট করেছে। এমনভাবে এরাও যদি কষ্ট করে জুমা আদায় করে তবে তা জায়েজ হবে।

وَيَجُوزُ لِلْمَسَافِرِ وَالْعَبِيدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَوْمَ فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَا يُعْزِرُهُ لِأَنَّهُ لَا قَرْضَ عَلَيْهِ فَاشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالْمَرَأَةَ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ رُخْصَةٌ فَإِذَا حَضَرُوا يَقَعُ قَرْضًا عَلَى مَا بَيْنَنَا أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَسْلُوبُ الْأَهْلِيَّةِ وَالْمَرَأَةُ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَةِ الرَّجَالِ وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُمْ صَلَحُوا لِلْإِمَامَةِ فَيُضْلَحُونَ لِلْإِقْدَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى .

অনুবাদ : মুসাফির, দাস ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জুমার ইমামতি করা জায়েজ আছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তা জায়েজ নেই। কেননা তাদের উপর (জুমার) ফরযিয়াত নেই। সুতরাং তারা বালক ও স্ত্রী লোকের সাদৃশ্য হলো। আমাদের দলিল হলো, এ হলো তাদের জন্য অবকাশ। সুতরাং যখন তারা উপস্থিত হয়ে থাকে তখন ফরজ হিসাবেই আদায় হবে। যেমন, (ইতঃপূর্বে) আমরা বর্ণনা করে এসেছি। পক্ষান্তরে বালকের তো যোগ্যতা নেই। আর স্ত্রীলোক পুরুষদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। মুসাফির, দাস ও অসুস্থদের দ্বারা জুমা অনুষ্ঠিত হবে। কেননা তারা যখন জুমার ইমামতিরই যোগ্য, তখন তাদের মধ্যে মুক্তাদী হওয়ার যোগ্যতা আরো অধিক রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুসাফির, রোগী এবং দাসের উপর যদিও জুমা ফরজ নয় কিন্তু তাদেরকে জুমার ইমাম বানানো জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিশুদ্ধমতও এটাই। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এদের মধ্য থেকে কারো জুমার ইমাম হওয়া জায়েজ নেই। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, জুমা ফরজ না হওয়ার ব্যাপারে এরা তিনোজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু আর নারীঃ সাদৃশ্য। সুতরাং যেমনিভাবে বান্ধা এবং নারীর জুমার ইমামত জায়েজ নেই এমনিভাবে এদের ইমামতও জায়েজ নেই। আমাদের দলিল হলো, মুসাফির, দাস এবং রোগীর উপর জুমার নামাজ ফরজ না হওয়া তাদের জন্য রুখসত তথা অবকাশ। إِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ - কেননা আল্লাহর বাণী- এর মধ্যে সন্ধানটি ব্যাপক। কিন্তু মুসাফির ইত্যাদির থেকে ক্ষতি বা অসুবিধাকে লাঘব করার জন্য জুমার উপস্থিত না হওয়ার জন্য ইজাজত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এরা জুমা আদায়ের জন্য হাজির হয়ে গেল এবং ক্ষতি ও অসুবিধাকে বরদাশত করে নিয়েছে, তাই এ নামাজ ফরজ হিসাবে আদায় হবে নফল হিসাবে নয়, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এখন মুসাফির ইত্যাদির নামাজ যেহেতু ফরজ হিসাবে আদায় হবে তাই তাদেরকে ইমাম বানানোও জায়েজ হবে। তবে বান্ধা ও নারীদের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা নাবালিগ শিশুর মধ্যে ইমামতের যোগ্যতাই নেই। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার খেতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যেহেতু তার মধ্যে ইমামতের যোগ্যতাই নেই, সেহেতু তাকে কিভাবে ইমাম বানানো সঙ্গীহ হবে। তবে নারীদের মধ্যে যদিও ইমামতের যোগ্যতা আছে কিন্তু তারা পুরুষের ইমামতের যোগ্য নয়। আর যেহেতু তারা পুরুষদের ইমামতের যোগ্য নয়, তাই নারীকে পুরুষদের ইমামত করাও জায়েজ হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, মুসাফির, দাস এবং রোগীর জুমার ইমামত জায়েজ। কিন্তু জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যদি শুধু ঐ লোকেরা এ পরিমাণ অনুযায়ীও হয় যে পরিমাণ দ্বারা জুমা জায়েজ হয়, তবে জুমা অনুষ্ঠিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বক্তব্যকে রদ করে বলেন- মুসাফির, দাস এবং রোগীর উপস্থিতির দ্বারা জুমার জামাআত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। দলিল হলো, যখন এরা ইমামতের যোগ্য, তখন মুক্তাদী হওয়ার যোগ্যতা তো আরো অধিক রয়েছে।

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَوةِ الْإِمَامِ وَلَا عُدْرَ لَهُ كُرْهُ لَكَ وَجَارَتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ زُفَرٌ (رح) لَا يَجْزِيهِ لَأَنَّ عِنْدَهُ الْجُمُعَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ إصَالَةُ الظُّهْرِ كَالْبَدْلِ عَنْهَا وَلَا مَصِيرَ إِلَى الْبَدْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَنَا أَنْ أَصْلَ الْفَرِيضِ هُوَ الظُّهْرُ فِي حَقِّ النِّكَافَةِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إِلَّا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ آدَاءِ الظُّهْرِ بِنَفْسِهِ دُونَ الْجُمُعَةِ لِتَوْقُفِهَا عَلَى نَرَائِطٍ لَا تَتِمُّ بِهِ وَحْدَهُ وَعَلَى التَّمَكُّنِ يَدُورُ التَّكْلِيفُ .

**অনুবাদ :** জুমার দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমা আদায়ের আগে আপন গৃহে জোহরের নামাজ আদায় করে ফেলল অথচ তার কোনো ওজর নেই, তার জন্য তা মাকরুহ হবে এবং তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার এই নামাজ আদায়ই হবে না। কেননা তার মতে জুমা হলো মূল ফরজ আর জোহর হলো তার বিকল্প আর মূলের উপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিকল্পের অভিমুখী হওয়ার অবকাশ নেই। আমাদের দলিল হলো, সকলের ক্ষেত্রেই মূল ফরজ হলো জোহর এটাই যাহিরে মাযহাবের অভিমত। তবে জুমা আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরজ নিরসন করার জন্য সে আদিষ্ট। এ মত এ কারণে যে, সে নিজেই জোহর আদায় করতে সক্ষম রয়েছে, জুমা আদায় করতে সক্ষম নয়। কেননা তা এমন কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল, যা তার একার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আর নিজের সামর্থ্যের উপরই শরিয়তের দায়িত্ব নির্ভরশীল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** কেউ যদি জুমার দিন ইমামের জুমার নামাজ পড়ার পূর্বে নিজ গৃহে জুহরের নামাজ পড়ে ফেলে অথচ তার কোনো ওজরও নেই। তবে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে; কিন্তু এমনটি করা মাকরুহ হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার নামাজ জায়েজ হবে না। এটা ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এরও অভিমত। তাদের দলিল হলো, জুমার দিন জুমা ই হলো আসল ফরজ, আর জোহর হলো তার বদল তথা বিকল্প ফরজ। কেননা জুমার নামাজের দিকে সাযী (তথা দৌড়িয়ে আসার) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জুমা ফউত না হবে জোহর পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং জুমার নামাজে, **مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ** আদায়ের জন্য আদিষ্ট হওয়া আর জোহর নিষিদ্ধ হওয়া, জুমার নামাজই মূল ফরজ হওয়ার দলিল বহন করে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আসলের উপর কুদরত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিকল্পের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। তাই জুমার নামাজের উপর শক্তি থাকা অবস্থায় জোহরের নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। আমাদের দলিল হলো, জুমার দিন মূলত জোহরই ফরজ যেমনটি অন্যান্য দিনেও জোহর ফরজ। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ **ﷺ** -এর বাণী **قَبِلَ الظُّهْرَ جِبْنَ تَزَوُّدِ التَّمَسُّ** -এর বাণী জোহরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য হেলে পড়ে। তাই সূর্য হেলে যাওয়ার পর সব দিনের মধ্যে জোহরেরই ওয়াক্ত। দ্বিতীয় দলিল হলো, বিধান সামর্থ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী- **وَمَنْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** আর ঐ সময়ের মধ্যে নামাজের মুকাল্লাফ সরাসরি জোহর আদায়ের প্রতি সামর্থ্যবান, জুমা আদায়ের প্রতি নয়। কেননা জুমা এমন কতিপয় শর্ত সম্বলিত নামাজ যা একা কোনো লোক দ্বারা পূর্ণ হবার নয়। যেমন- ইমাম হওয়া, জুমাআত হওয়া ইত্যাদি তাই জুমার মুকাল্লাফ বানানোর দ্বারা অসম্ভব কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। তবে জুমার দিন জুমা আদায় করে জোহরের নামাজ (বাদ দেওয়ার) সাকিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই শক্তি থাকা অবস্থায় জুমা বাদ দিয়ে জোহর আদায় করা মাকরুহ হবে।

فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَخْضُرَهَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ بِطَلِّ ظَهْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  
 (رح) بِالسَّعْيِ وَقَالَ لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ السَّعْيَ دُونَ الظَّهْرِ فَلَا يَنْقُضُهُ  
 بَعْدَ تَمَامِهِ وَالْجُمُعَةُ فَوْقَهَا فَيَنْقِضُهَا وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعْدَ فَرَاحِ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنْ  
 السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا فِي حَقِّ إِرْتِفَاضِ الظَّهْرِ  
 احْتِبَاطًا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْفَرَاحِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَعْيٍ إِلَيْهَا وَتَكَرَّرَ أَنْ يُصَلِّيَ  
 الْمَعْدُورُونَ الظَّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَضَرِّ وَكَذَا أَهْلُ السَّجَنِ لِمَا فِيهِ مِنَ  
 الْإِخْلَالِ بِالْجُمُعَةِ إِذْ هِيَ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ وَالْمَعْدُورُ قَدْ يَفْتَدِي بِهِ غَيْرَهُ بِخِلَافِ  
 أَهْلِ السَّوَادِ لِأَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ صَلَّى قَوْمٌ أَجْزَاءَهُمْ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ  
 الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَهُ وَبُنِيَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا  
 أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا .

অনুবাদ : এরপর যদি তার জুমাতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা হয় এবং জুমার জামাআত অভিমুখী হয়, আর ইমাম জুমার নামাজরত থাকেন, তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে গমনের দ্বারাই তার জোহর বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে ইমামের সাথে নামাজে দাখিল হওয়া পর্যন্ত জোহর বাতিল হবে না। কেননা সাঈ জোহরের চেয়ে নিম্নমানের। সুতরাং জোহর সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাঈ তা বাতিল হবে না। আর জুমা হলো জোহরের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। সুতরাং তা জোহরকে বাতিল করে দেবে। আর এটা জুমা থেকে ইমামের ফরিগ হওয়ার পর জুমা অভিমুখী হওয়ার মতো হলো। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জুমা অভিমুখে সাঈ করা জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে জোহর বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে জুমার স্থলবর্তী করা হবে। জুমা থেকে (ইমামের) ফরিগ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা প্রকৃতপক্ষে সেটা জুমা অভিমুখে সাঈ নয়। জুমার দিন শহরে জামাআতের সাথে জোহর আদায় করা মাজুর লোকদের জন্য মাকরুহ। জেলখানায় কয়েদীরাও এ হুকুম। কেননা, তাতে জুমার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। কারণ জুমা হলো সমস্ত জামাআতকে একত্রকারী। আর মাজুরদের সাথে কোনো কোনো সময় অন্যরাও ইকতিদা করে ফেলে। গ্রামবাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের উপর তো জুমা নেই। তবে একদল লোক যদি জোহর জামাআতে পড়েই ফেলে তাহলে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা জোহর জায়েজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেছে। যে ব্যক্তি জুমার দিন ইমামকে নামাজের মধ্যে পাবে সে ইমামের সাথে ঐ পরিমাণ নামাজ পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে পরিমাণ নামাজ তোমরা পেয়েছ, তা পড়ে নাও, আর যে পরিমাণ ফউত হয়েছে, তা কাজা করে নাও।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যে ব্যক্তি জুমার দিন নিজের ঘরে জোহরের নামাজ আদায় করেছে অথচ এখনো জুমার নামাজ আদায় করা হয়নি। অতঃপর তার মনে আসল যে, জুমার নামাজে শরিক হওয়া উচিত। এই ইচ্ছায় সে জামে মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা হলো, এখন এর দুটি সূরত রয়েছে। হয়তো সে ইমামের সাথে জুমার নামাজে শরিক হবে কিংবা শরিক হবে না। যদি সে ইমামের সাথে জুমার নামাজ পেয়ে যায় তবে তার জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে তা নফলে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সে জুমার নামাজে এমন সময় রওয়ানা হয় যে, যে সময় ইমাম জুমার নামাজরত ছিল কিন্তু তার পৌছতে পৌছতে ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেছে। আর এ ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার নামাজ পায়নি, তবে তার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তার জোহরের নামাজ বাতিল হয়ে গেছে। এখন যেহেতু সে জুমার নামাজ পায়নি এবং আদায়কৃত জোহরও বাতিল হয়ে গেছে এ জন্য তার পুনরায় জোহরের নামাজ আদায় করতে হবে।

**সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব হলো,** শুধু ঘর থেকে বের হওয়ার দ্বারা জোহরের নামাজ বাতিল হবে না; বরং জুমার নামাজে শরিক হওয়ার দ্বারা বাতিল হবে। অর্থাৎ তার পৌছার পূর্বেই যদি ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে যায়, তবে তার জোহর বাতিল হবে না। হ্যাঁ যদি ইমামের সাথে জুমার নামাজের কোনো অংশে শরিক হয়ে যায় তবে তার জোহর বাতিল হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, জুমার দিকে সাঙ্গ করা যেহেতু মূল মাকসাদ নয় বরং জুমা আদায়ের অসিলা আর ফরজ জোহর হলো মূল উদ্দেশ্য, তাই জুমার দিকে সাঙ্গ করা জোহরের তুলনায় নিচু পর্যায়ের। আর কায়দা আছে, উঁচু পর্যায়ের বস্তু নিচু পর্যায়ের বস্তু দ্বারা বাতিল হয় না। এ জন্য শুধু জুমার দিকে সাঙ্গ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। আর জুমা যেহেতু জোহর থেকে উঁচু পর্যায়ের তাই জুমার নামাজ জোহরের নামাজকে বাতিল করে দেবে। জুমা উঁচু পর্যায়ের কেন? এর জওয়াব হলো, আমাদেরকে ইসলামি শরিয়ত এই নির্দেশ দিয়েছেন, জুমার দিন জোহরকে বাদ দিয়ে জুমা আদায় করা হবে। তাই জুমার কারণে জোহর সাকিত হওয়া জুমার উঁচু পর্যায়ের হওয়ার দলিল প্রমাণ করে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, বিষয়টি এমন হলো যেমন ইমামের সাথে জুমা থেকে ফারিগ হওয়ার পর জুমা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এই সূরতে সকলের মতে সাঙ্গ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। কেননা এটা অনর্থক একটি সাঙ্গ। এমনিভাবে জুমার দিকে সাঙ্গ জোহরকে ঐ সূরতে বাতিল করবে না। যখন জুমার দিকে সাঙ্গ করার সময় ইমাম জুমার নামাজে ছিল; কিন্তু তার পৌছার পূর্বেই ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেল।

**ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো,** জুমার দিকে সাঙ্গ করা জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জুমা এমন একটি নামাজ যা সব জায়গায় আদায় করা যায় না; বরং তার জন্য বিশেষ স্থানের প্রয়োজন রয়েছে। তাই জুমার দিকে সাঙ্গ ব্যতীত জুমা আদায় করা সম্ভবপর হবে না। সুতরাং বুঝা গেল, জুমার দিকে সাঙ্গ জুমার সাথেই খাস। আর সাঙ্গ যেহেতু জুমার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত তাই জুমার দিকে সাঙ্গও জুমার মর্যাদায় হবে। সুতরাং যেমনিভাবে জোহর আদায় করার পর জুমার নামাজে শরিক হওয়ার দ্বারা জোহর বাতিল হয়ে যায়, এমনিভাবে জুমার নামাজের দিকে সাঙ্গ করার দ্বারাও জোহর বাতিল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো যে সময় সাঙ্গ করেছে ঐ সময় ইমাম জুমার নামাজরত থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ইমামের জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর সাঙ্গ করে তবে এ সাঙ্গ দ্বারা জোহর বাতিল হবে না। কেননা এই সাঙ্গটি জুমার মর্যাদায় নয়। আর মর্যাদায় এই কারণে নয় যেহেতু এটা জুমার দিকে সাঙ্গ নয়।

**ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যকার মতবিরোধটি নিম্নোক্ত মিছাল দ্বারা পরিষ্কার হবে।** যেমন এক ব্যক্তি নিজের ঘরে জোহর আদায় করে জুমার জন্য ঐ সময় বের হলো যখন ইমাম জুমার নামাজে ছিল। কিন্তু তার পৌছার পূর্বেই ইমাম জুমার নামাজ থেকে ফারিগ হয়ে গেল। এখন ইমাম সাহেবের মতে যেহেতু জুমার দিকে সাঙ্গ দ্বারা জোহর বাতিল হয়ে গেল তাই জোহর পুনরায় আদায় করবে। আর সাহেবাইনের মতে যেহেতু জোহর বাতিল হয়নি, তাই জোহরের নামাজ পুনরায় আদায় করবে না।



وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِسَامَ الْح : মাসআলা হলো, কেউ যদি ইমামকে জুমার দিন জুমার নামাজে পায় এবং দ্বিতীয় রাকআতের রুকু'র মধ্যে ইমামের সাথে শরিক হয়ে গেল, তবে সকলের মতে উক্ত ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার নামাজ আদায় করবে। আর যে এক রাকআত ফউত হয়ে গেছে তা ইমামের সালাম ফিরাবার পর পূর্ণ করবে। তার এই নামাজ জুমার নামাজ হিসাবে আদায় হবে জোহর হিসাবে নয়। দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا ۖ ইরশাদ করেছেন, مَا فَاتَكُمْ مِنْ صَلَاةٍ الْإِسَامِ কেননা مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا -এর অর্থ হলো অর্থাৎ ইমামের নামাজের যে অংশ শেখ, তা পড়ে নাও, আর যে অংশ ফউত হয়ে গেছে তার কাজা আদায় করো। অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরাবার পর পড়ো। উল্লেখ্য যে, ইমামের নামাজের যে অংশ ফউত হয়ে গেল তা জুমা ছিল, তাই মুক্তাদী জুমাই আদায় করবে, অন্য কোনো নামাজ নয়।

وَأَنْ كَانَ أَذْرَكَهَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْرِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَهُمَا  
 قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) إِنْ أَذْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَذْرَكَ  
 قَلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ لِأَنَّهُ جُمُعَةٌ مِنْ وَجْهِ ظَهْرٍ مِنْ وَجْهِ لِقَوَاتِ بَعْضِ الشَّرَاطِطِ  
 بِنَى حَقِّهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا إِعْتِبَارًا لِلظُّهْرِ وَيَقْعُدُ لِمَحَالَّةِ عَلَى رَأْسِ الرُّكْعَتَيْنِ  
 عِتْبَارًا لِلْجُمُعَةِ وَيَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ لِإِحْتِمَالِ التَّفْلِيَةِ وَلَهُمَا أَنَّهُ مَذْرُوكٌ لِلْجُمُعَةِ  
 بِنَى هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يُشْتَرَطَ بِنَيْهِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ وَلَا وَجْهَ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُمَا  
 مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَبْنِي أَحَدُهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْآخَرِ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ  
 النَّاسَ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ قَالَ (رض) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح)  
 وَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ  
 لِلْإِخْلَالِ يَفْرُضُ الْإِسْتِمَاعَ وَلَا إِسْتِمَاعَ هُنَا يَخْلَافُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ تَمَتَّدَتْ وَلَا يَسِي حَنِيفَةً  
 قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ مِنْ غَيْرِ فَصَلِّ وَلَا تَلَامَ قَدْ يَمْتَدُّ  
 طَبَعًا فَاشْبَهَ الصَّلَاةَ .

অনুবাদ : যদি ইমামকে তাশাহুদে মাঝে কিংবা সিজদায়ে সাহুর মাঝে পায়, তবে শায়খাইনের মতে সে এর উপর জুমার বিনা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পায়, তবে তার উপর জুমার বিনা করবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় রাকআতের কম অংশ পায়, তবে তার উপর জোহরের বিনা করবে। কেননা এক দিক থেকে তা জুমা আবার অন্য দিকে তার থেকে কতিপয় শর্ত ফউত হওয়ার কারণে তা জোহর। সুতরাং জোহর বিবেচনায় সে চার রাকআত পড়বে এবং জুমা বিবেচনায় দুই রাকআতের মাথায় অবশ্যই বসবে। আর নফল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে শেষ দুই রাকআতে কিরাআতও পড়বে। শায়খাইনের দলিল হলো, এই অবস্থাতেও সে জুমার নামাজ তো পেয়েছে, এ কারণেই জুমার নিয়ত করা শর্ত। আর জুমা তো দুই রাকআত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে যাউল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনো কারণ নেই। কেননা উভয় নামাজ ভিন্ন। সুতরাং একটির তাহরীমার উপর অন্যটির বিনা করা যাবে না। জুমার দিন ইমাম যখন (খুতবা দানের উদ্দেশ্যে) বের হন তখন লোকেরা খুতবা থেকে তার ফারিগ হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় ও কথা বলা বন্ধ রাখবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমামের বের হওয়ার পর থেকে খুতবা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত এবং মিম্বর থেকে নামার পর তাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো, মনোযোগের সাথে শ্রবণের ফরজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। অথচ এই সময়ে শ্রবণের কিছু নেই। নামাজের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামাজ তো দীর্ঘায়িত হয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন বের হন, (খুতবার উদ্দেশ্যে) তখন নামাজ নেই, কথাও নেই। এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তা ছাড়া কথাবার্তা স্বভাবত কখনো দীর্ঘায়িত হয়, তাই তা নামাজের সাদৃশ্য।

### প্রসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কেউ যদি ইমামকে জুমার নামাজের তাশাহহদের মধ্যে পায় কিংবা সিজদায়ে সাহতে পায় তবে শায়খাইনের মতে এই ব্যক্তি জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি সে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পায় যেমন, দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে ইমামের সাথে শরিক হলো, তবে জুমার নামাজ পূর্ণ করবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ না পায় যেমন—রুকুর পরে ইমামের সাথে শরিক হলো তবে জোহরের নামাজ পূর্ণ করবে। এটা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তাশাহহদ কিংবা সিজদায়ে সাহতে শরিক হওয়া ব্যক্তির এই নামাজ একদিক থেকে জুমা আর অপর দিক থেকে জোহর। জুমা তো এ কারণে যে, জুমার নিয়ত করা জরুরি। আর জোহর তো এই কারণে যে, তার ক্ষেত্রে জুমার অনেক শর্ত যেমন জামাআত ফউত হয়ে গেছে। কেননা ইমামের সালাম ফিরাবার পর এ ব্যক্তি এক দিক জুমার নামাজ আদায় করবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির নামাজ যেহেতু একদিক থেকে জুমা অপর দিকে থেকে জোহর, তাই জোহরের দিকে লক্ষ্য করে সে চার রাকআত আদায় করবে, আর জুমার দিকে লক্ষ্য করে অবশ্যই দুই রাকআতের মাধ্যম বসবে। আর যেহেতু শেষ দুই রাকআতের নফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ জন্য এগুলোর মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত কিরাআতও পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের সমর্থন নিকায়্য ব্যাখ্যাতা মোল্লা আলী ক্বারী (র.)-এর পেশকৃত হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) দ্বারাও হয়।

হাদীসটির ইবারত নিম্নরূপ—

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَدْرِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ فَلْيُضِلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا .

যে ব্যক্তি জুমার দিন দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পেল সে এর সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে নেবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পেল না, সে ব্যক্তি জোহরের চার রাকআত পড়বে।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, এই ব্যক্তি এ অবস্থাতেও জুমার নামাজ পেয়েছে, এমনকি তার জন্য জুমার নিয়ত করাও শর্ত। যদি জুমার নিয়ত না করে তবে ইকতিদা সহীহ হবে না। মোটকথা তাশাহহদ কিংবা সিজদায়ে সাহবের মধ্যে শরিক হয়ে সে জুমা পেয়ে গেল আর জুমা পাওয়া ব্যক্তিই জুমা আদায় করবে, জোহর আদায় করবে না। আর জুমা যেহেতু দুই রাকআত তাই সে দুই রাকআত আদায় করবে, চার রাকআত নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সতর্কতা যে, সে জোহর ও জুমা উভয়টি আদায় করবে তা ঠিক নয়। কেননা জুমা ও জোহর দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামাজ। তাই সেগুলোর মধ্যে একটি অপরটির তাহরীমার উপর বিনা করা কিভাবে সহীহ হবে? শায়খাইনের মাযহাবের সমর্থন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও হয়—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُمِّمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوا تَسْعُونَ وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا وَنِيَّ رَوَابِعَ فَأَصَلُّوا .

যখন জুমার নামাজের জন্য ইকামত বলা হবে তখন তার দিকে দৌড়িও না; বরং শান্তভাবে আসো। সুতরাং যখন তোমারা (ইমামকে) পেয়ে গেলে তখন তা পড়ো আর যা ফউত হয়ে গেল তার কাজা করো। অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরাবার পর তা পূরা করো। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পেশকৃত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেলাম দুর্বল বলেছেন।— (ইনায়্য)

رَأَى خَرَجَ الْأَسَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النِّعَ : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম খুতবার উদ্দেশ্য যখন তার কামরা থেকে বের হবেন এবং মিখরের দিকে যেতে থাকবেন, তখন থেকে মুসল্লীগণ নফল ও সুন্নত ইত্যাদি পড়বে না এবং কোনো কথাও বলবে না। আর এ অবস্থা ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত থাকবে। হ্যাঁ তবে কাজা নামাজ পড়তে পারবে। এমনভাবে বিতংক মতানুযায়ী তাসবীহ পড়ারও অনুমতি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সব ধরনের কথা বলা নিষেধ তা তাসবীহ হোক বা অন্য কোনো কথা হোক। সাহেবাইন (র.) বলেন, খুতবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত এবং খুতবার পর তাকবীরে

তাহরীমার পূর্বে কথা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময়গুলোতে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। সাহেবাইনের দলিল হলো, মূলত কথা বলা তো জায়েজ কিন্তু খুতবার সময় কথা বলা খুতবা গুন্যের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অথচ খুতবা গুন্য ফরজ। তাই যেহেতু কথা গুন্যের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সেহেতু ঠিক খুতবার সময় কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যেহেতু খুতবা শুরু করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ করার পর তাকবীরের পূর্বে কোনো কিছু গুন্য ফরজ নয়, তাই এই দুই সময়ের মধ্যে কথা বলার দ্বারা ব্যাঘাত ঘটে না। আর যেহেতু ব্যাঘাত হয় না সেহেতু এই দুই সময়ে কথা বলাও নিষেধ হবে না। তবে এই দুই সময়ে নামাজ নাজায়েজ হওয়ার কারণ হচ্ছে, নামাজ কখনো কখনো দীর্ঘ হয়ে যায়। যেমন ইমাম কামরা থেকে বের হয়ে মিম্বরের দিকে গেল ঐ সময়ে কেউ সুন্নত আরম্ভ করে দিল, ইমাম মিম্বরে উঠে খুতবা আরম্ভ করে দিল অথচ এখনো ঐ ব্যক্তির সুন্নত শেষ হয়নি, এ সুরতে খুতবা গুন্যের মধ্যে ব্যাঘাত হবে। এ জন্য আমরা ঐ দুই সময়ে নামাজ পড়ার অনুমতি দেইনি, তবে কথা বলার অনুমতি দিয়েছি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস-  
 إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَوةَ وَلَا كَلَامَ .

উক্ত হাদীসের মধ্যে খুতবার পূর্বাপরের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ জন্য ইমামের খুতবার জন্য কামরা থেকে বের হওয়ার পর নামাজ পড়া ও কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। খুতবা শুরু করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেও নামাজ পড়া ও কথা বলাকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অন্য একটি হাদীস এর বিপরীত মনে হয়। হাদীসটি হলো-  
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَعَنْ إِسْعَارِ السُّوقِ ثُمَّ صَلَّى .

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন, তখন লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনাদি এবং বাজারের ভাও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, অতঃপর নামাজ পড়তেন। উক্ত হাদীস দ্বারা খুতবার পর তাকবীরের পূর্বে কথা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর জওয়াব হলো, এ ঘটনা তখনকার যখন নামাজের মধ্যেও কথা বলা জায়েজ ছিল, খুতবার মধ্যে কথা বলার অনুমতি ছিল। অতঃপর উপরোক্ত উভয় অবস্থায় কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ জন্য উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না। সাহেবাইনের দলিলের জবাব হলো, নামাজের মতো কখনো কখনো কথাও দীর্ঘ হয়ে যায়। তাই যেমনিভাবে খুতবা আরম্ভ করার পূর্বে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর তাকবীরের পূর্বে নামাজ মাকরুহ, এমনিভাবে উক্ত সময়গুলোতে কথা বলাও মাকরুহ।

وَإِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا صَعِدَ الْأَمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَدَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا هَذَا الْأَذَانُ وَلِهَذَا قِيلَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي وَجُوبِ السَّغَى وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِحُصُولِ الْإِعْلَامِ بِهِ .

অনুবাদ : মুয়াজ্জিনগণ যখন প্রথম আযান দিবেন, তখন লোকদের কর্তব্য হলো বেচাকেনা ছেড়ে দেওয়া এবং জুমা অভিমুখী হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জিকির অভিমুখে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করবেন, তখন তিনি বসবেন এবং মুয়াজ্জিন মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিবেন। এর উপর যুগ পরম্পরায় আমল চলে এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় এই আজানই শুধু প্রচলিত ছিল। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচাকেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই আজানই ধর্তব্য। তবে বিতৃপ্তমত মত হলো, প্রথম আজান ধর্তব্য, যদি সূর্য ঢলে পড়ার পরে হয়। কেননা তা দ্বারা জুমার অবগতি অর্জিত হয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : মুয়াজ্জিনগণ যখন প্রথম আজান দিবেন তখন লোকেরা বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে জুমা অভিমুখে রওয়ানা হবে। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী. **إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**। ইমাম কুদুরী (র.) মুয়াজ্জিন শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। কেননা জুমার আজানের ক্ষেত্রে এটাই প্রচলন ছিল যে, অনেক মুয়াজ্জিন একসাথে আজান দিতো। যাতে তাদের আওয়াজ শহরের সর্বত্র পৌঁছে যায়। তবে সেটা কোন আজান যার পর বেচাকেনা হারাম এবং সাঈ ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, বেচাকেনা হারাম আর জুমা অভিমুখে যদি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ আজানটি ধর্তব্য হবে যা ইমামের কামরা থেকে বের হওয়ার পর মিম্বরের সামনে দেওয়া হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ সিদ্দীকী জমানা এবং ফারুকী জমানায় জুমার জন্য এটাই মূল আজান ছিল। অতঃপর তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন লোকদের আধিক্য ঘটে তখন প্রথম আজানের প্রবর্তন করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে যে আহবানের কথা আলোচনা করা হয়েছে তার দ্বারা দ্বিতীয় আজান উদ্দেশ্য, প্রথম আজান নয়। হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, বেচাকেনা হারাম আর জুমা অভিমুখে সাঈ-এর ক্ষেত্রে প্রথম আজান ধর্তব্য। দলিল হলো, যদি কোনো ব্যক্তি আযানের সময় বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে জুমার দিকে সাঈ করে তবে জুমার পূর্বের সুন্নতসমূহ ফউত হয়ে যাবে। খুতবা শুনা ফউত হয়ে যাবে। আর যদি ঘর জামে মসজিদ থেকে দূরে হয় তবে জুমাই ফউত হয়ে যাবে। এ জন্য প্রথম আজানই ধর্তব্য হবে। তবে শর্ত হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আজান দিতে হবে। কেননা এর দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে গেছে।

## بَابُ الْعِيدَيْنِ

وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَأَلَاوُلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي فَرِيضَةٌ وَلَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَالُوا هَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُّنَّةِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَجْهُ الْأَوَّلِ مُوَاطَّعَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهَا وَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ عَقِيبَ سُؤَالِهِ هَلْ عَلَى غَيْرِهِمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَتَسْمِيَتُهُ سُنَّةٌ لُجُوبِهِ بِالسُّنَّةِ .

### দুই ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা)-এর বিধান

অনুবাদ : যাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব, তাদের সকলের উপর ঈদের নামাজও ওয়াজিব। জামে সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, একই দিনে দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। প্রথমটি হলো সুন্নত আর দ্বিতীয়টি হলো ফরজ। তবে দু'টির কোনো একটিকেও তরক করা যাবে না। গ্রন্থকার বলেন, এতে সুস্পষ্টভাবে সুন্নত বলা হয়েছে। আর প্রথমটি ওয়াজিব হওয়ার সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত। প্রথমোক্ত বর্ণনায় দলিল এই যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে তা পালন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি, যা এক গ্রাম্য সাহাবীর এ প্রশ্ন-আমার উপর এ ছাড়া আরো কোনো নামাজ ওয়াজিব আছে কি? এর উত্তরে বলেন, না নেই, তবে যদি নফল আদায় কর। (তা তোমার ইচ্ছাধীন) প্রথমোক্ত বর্ণনাটি বেশি বিতংক। আর তাকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, তা সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক : জুমা ও ঈদাইনের নামাজের মধ্যে সম্পর্ক হলো (১) উভয়টি দিনের নামাজ। উভয়টিকে অধিক লোকের জামায়াতের সাথে আদায় করা হয়। উভয়টির কিরাআতই জোরে পড়া হয়, জুমার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে ঈদাইনের জন্যও একই শর্ত রয়েছে। তবে খুতবার বিধান ভিন্ন। কেননা খুতবা জুমার জন্য শর্ত কিন্তু ঈদাইনের জন্য নয়। যার উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব তার উপর ঈদাইনের নামাজও ওয়াজিব। কিন্তু যেহেতু জুমা ফরজ হওয়ার দিক থেকে শক্তিশালী আর ঈদাইনের নামাজ ফরজ না হওয়ার কারণে তার মোকাবেলায় দুর্বল, এজন্য জুমার বিধিবিধান আগে বর্ণনা করা হয়েছে আর ঈদাইনের বিধিবিধান পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। (২) জুমার নামাজ অধিক হারে আদায় করা হয়, এ জন্য জুমার অধ্যায়কে ঈদাইনের অধ্যায়ের অগ্রে আনা হয়েছে।

ঈদের নামকরণ : (১) ঈদের দিনে আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহের ই'আদা (اعاد) তথা পুনরাবৃত্তি করেন। (২) عاد এর অর্থ হলো- প্রত্যাবর্তন করা, বারবার আসা। যেহেতু এই মহিমান্বিত দিবসটিও প্রত্যেক বছরান্তে প্রত্যাবর্তন করে এবং এ দিনে যেহেতু মহান আল্লাহর তার অনুগ্রহের পুনঃবৃত্তি ঘটান, এ জন্য একে ঈদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ : ঈদুল ফিতরের নামাজ সর্বপ্রথম প্রথম হিজরি সনে পড়া হয়েছিল। (শরহে নিকায়া) উভয় ঈদের নামাজ প্রবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ أَنَسٍ (رح) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ فَعَلَ أَيْدِلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ الْفَيْطَرِ . (ابْنُ دَاوُدَ)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা বাসীর জন্য দুটো দিন ছিল খেল থামাসা করার জন্য। তিনি বললেন এ দুটো দিন কি? তারা বললো জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনে খেল থামাসা করতাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এই দুই দিনকে অন্য দুই দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যা এই দুই দিনের চেয়েও উত্তম। তা হচ্ছে, এক ঈদুল আযহা, দুই ঈদুল ফিতর।

**ঈদুল ফিতর নির্ধারিত হওয়ার রহস্য :** (১) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো দিন আবশ্যই এমন আছে যার মধ্যে তারা স্বাভাবিকভাবে আনন্দ-খুশি করে থাকে, উত্তম পোশাক পরিধান করে, দামী দামী খানা খায়, তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে **لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا** প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ঈদ রয়েছে এটা হলো আমাদের ঈদ। এটা এমন দিন, যখন লোকেরা সবেমাত্র তাদের রোজা থেকে ফারিগ হয়েছে এবং এক ধরনের যাকাত আদায় করেছে। এজন্য এই দিনে তাদের জন্য দুই ধরনের আনন্দ একত্রিত হয়েছে। এক, তাবয়ী (طبعی): দুই আকলী (عقلی)। তাবয়ী খুশি তো এ জন্য যে, রোযার কঠোর ইবাদত থেকে ফারিগ হয়ে যাচ্ছে এবং মুখাপেক্ষীদের সাদাকা অর্জন হয়ে যাচ্ছে। আর আকলী খুশি হলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফরজ ইবাদত আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। আর তার পরিবার পরিজনকে এ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার সুযোগ দিয়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এ জন্য খুশিগুলো করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**কুরবানির ঈদ নির্ধারিত হওয়ার রহস্য :** ইবাদতের সময় নির্ধারণের মধ্যে এ হিকমতও রয়েছে, এ সময়ের মধ্যে আশ্বিয়ায়ে কোরাম যে তা'আত ও আল্লাহর ইবাদত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে নিয়েছেন, এ সময় আসার দ্বারা তাদের কুরবানির কথা শ্রবণ হয়ে এ ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ঈদুল আযহার দিন হলো এ দিন, যার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই দরবারে পেশ করার ইবাদত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আ.)-এর জানের পরিবর্তে একটি জবাইকৃত দুগ্ধ দান করেছিলেন। এ জন্য ঈদের মধ্যে কুরবানির বিধান এই মুসলিহাতে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মিলাতে ইব্রাহীমীর ইমামঘয় তথা হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর অবস্থাদি এবং তাঁদের জান ও মাল আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করার কথা এবং তাদের সীমাহীন ধৈর্যের কথা শ্রবণ করিয়ে লোকদেরকে নসিহত করা হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা হাজীদেরও সদৃশতা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে যায়। যে কাজের প্রতি হাজী সাহেবগণ নিয়োজিত তার দিকে অন্যান্যদেরকে উৎসাহিতও করা হয়।—(আল-মাসালিহুল আকলিয়া)

**قَوْلُهُ وَتَعِبَ صَلَاةَ الْعِيدِ** ইমাম কুদূরীর বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের নামাজ ওয়াযিব। কেননা তিনি বলেছেন, ঈদের নামাজ এ ব্যক্তির উপর ওয়াযিব-যার উপর জুমার নামাজ ওয়াযিব। জামে সগীরের বর্ণনা অনুযায়ী ঈদের নামাজ সুন্নত। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীর গ্রন্থে বলেছেন, যদি একদিন দুই ঈদ একত্রিত হয়ে যায়, অর্থাৎ জুমা ও ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহা যদি একেই দিনে হয় তবে প্রথমটি অর্থাৎ ঈদের নামাজ হলো সুন্নত আর জুমার নামাজ হলো ফরজ। নিকায়ার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, বিতুদ্ধ মতানুযায়ী আমাদের নিকট ঈদের নামাজ ওয়াযিব। আর এটা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং কতিপয় হানাফীদের মতে ঈদের নামাজ সুন্নত। ইমাম আহমদ (র.) ফরজে কিফায়া-এর প্রবক্তা।

দুই ঈদের নামাজ ওয়াযিব হওয়ার দলিল হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিতভাবে সর্বদা তা পালন করা। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বদা পালন করা ওয়াযিব হওয়ার দলিল হিসাবে গণ্য। দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ সুন্নত হওয়ার দলিল হলো, নজদ বাসী এক গ্রাম্য সাহাবী অস্তির হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আসল। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলামের একটি অংশ বর্ণনা করে বললেন, দিবা-রাত্রে নামাজ হলো পাঁচ ওয়াক্ত। ইহা শ্রবণে সে বলল, **أَلَا أُرَىٰ هَلْ عَلَىٰ عَرْشِهِ** এগুলো ছাড়া আর কোনো নামাজ আমার উপর রয়েছে কি? প্রত্যুত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, **أَلَا أُرَىٰ نَاطِقًا** না, নেই, তবে নফল হিসাবে রয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতিরেকে বাকি সকল নামাজ গায়েরে ফরজ তথা নফল। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ঈদাইনের নামাজ ওয়াযিব নয়। আমাদের পক্ষ থেকে উক্ত দলিলের জওয়াব এই যে, (১) প্রশংসারী গ্রামের বাসিন্দা ছিল, আর গ্রামবাসীদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াযিব নয়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ তার অবস্থা অনুপাতে জওয়াব দিয়েছেন। (২) জওয়াব এই যে, প্রবল সজাবনা রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথোপকথন ঈদের নামাজ ওয়াযিব হওয়ার পূর্বে ছিল। (৩) আল্লাহ তা'আলার বাণী **وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ** দ্বারাও ঈদের নামাজ ওয়াযিব বুঝা যায়। কেননা **وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ**-এর ব্যাখ্যা ঈদের নামাজ দ্বারা করা হয়েছে। আর এটা আমার-এর সীগাহ যা ওয়াযিবকে চায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীর গ্রন্থে ঈদের নামাজকে যে সুন্নত বলেছেন তার জওয়াব হলো এই যে, ঈদের নামাজ যে ওয়াযিব তা সুন্নত তথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর এ উদ্দেশ্য নয় যে ঈদের নামাজ সুন্নত।

وَسُتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكِلَ وَيَتَطَيَّبَ لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمَصَلَّى وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ وَلَأَنَّهُ يَوْمَ اجْتِمَاعٍ فَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ جَبَّةٌ فَكَانَ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ .

অনুবাদ : আর মোস্তাহাব হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু (মিষ্টি) খাবার গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং খুশবু ব্যবহার করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আহার করতেন এবং দুই ঈদেই গোসল করতেন। কেননা এ হলো সমাবেশের দিন। সুতরাং তাতে গোসল করা ও খুশবু ব্যবহার করা সুন্নত হবে। যেমন জুমার জন্য ক্ষেত্র হয়ে থাকে। আর নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। কেননা মহানবী ﷺ-এর একটি পুস্তিনের বা পশমের জোকা ছিল, যা তিনি ঈদে পরিধান করতেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদুল ফিতরের দিনের মোস্তাহাবসমূহের মধ্য থেকে একটি হলো এই যে, ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টি জিনিস আহার করা। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন—

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ثَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرَا . (بخاری)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের নামাজের জন্য) তাম্রাশীফ নিতেন না, যতক্ষণ না বোজোড় খেজুর আহার করতেন।— (বুখারী)

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ التَّحْرِ حَتَّى يَصُحَّى .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু আহার না করে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন নামাজ না পড়ে কিছু আহার করতেন না। দ্বিতীয় মোস্তাহাব আমল হলো গোসল করা। ইবনে মাজাহ শরীফে ফাখিহা ইবনে সা'দের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ التَّحْرِ وَيَوْمَ الْغُرْفَةِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। আকলী দলিল হলো এই যে, দুই ঈদের দিন হলো মানুষের সাথে একত্রিত হওয়ার দিন, মহাসমাবেশের দিন, এজন্য সে দিন গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। যেমন— জুমার দিনে উক্ত উভয় আমল হলো সুন্নত। তৃতীয় মোস্তাহাব আমল হলো, নিজের যে সকল বস্ত্রাদি আছে এর মধ্যে সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পুস্তিনের বা পশমি জোকা ছিল, ঈদ জাতীয় দিনে তিনি উক্ত জোকা পরিধান করতেন। অন্য রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بُرْدٌ أَحْمَرُ يَلْبَسُهُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি লাল রেখা বিশিষ্ট ইয়ামেমী চাদর ছিল তিনি তা জুমা এবং ঈদের দিনে পরিধান করতেন।



وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِغْنَاءً لِلْفَقِيرِ لِيَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلصَّلَاةِ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى  
وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى وَعِنْدَ هُمَا بُكْبَرٌ اِغْتِبَارًا بِالْأَضْحَى  
وَلَهُ أَنْ الْأَصْلُ فِي الثَّنَاءِ الْإِخْفَاءُ وَالشَّرْعُ وَرَدَّ بِهِ فِي الْأَضْحَى لِأَنَّهُ يَوْمٌ تَكْبِيرٍ  
وَلَا كَذَلِكَ الْفِطْرُ.

অনুবাদ : আর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে। যাতে দরিদ্র ব্যক্তি সম্বলতা লাভ করতে পারে এবং তার অন্তর নামাজের জন্য একত্র হতে পারে। অতঃপর ঈদগাহে অভিমুখে গমন করবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলবে না। আর সাহেবাইনের মতে তাকবীর বলবে। তারা ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, ছানা ও যিকির-এর ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। কিন্তু ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরিয়ত প্রকাশ্য যিকিরের আদর্শ দিয়েছে। কেননা তা তাকবীর দিবস। কিন্তু ঈদুল ফিতর সেরূপ নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদের নামাজের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। (১) কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ يُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ هُوَ يُؤَدِّيْنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তা লোকেরা নামাজে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয় এবং তিনি নিজেও তা ঈদের দুই একদিন পূর্বে আদায় করে দিতেন। (২) দলিল এই যে, এর দ্বারা দ্রুত কল্যাণ অর্জন করা হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পর্কে নামাজের জন্য ফারিগ করা হয়। তা হাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اغْنَوْهُمْ, ফকীরদের মনকে হাতপাতা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দাও। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর তাদেরকে আদায় করে দিবে। এ হাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণী- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى- এর ব্যাখ্যা তাকবীর হস্তের উল্লেখ আছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى أَوْ أَعْطَى زَكَاةَ الْفِطْرِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ بِتَكْبِيرِ الْعَبْدِ فِي الطَّرِيقِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْعَبْدِ.

অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফল যে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেছে এবং ঈদের তাকবীর বলে স্বীয় প্রতিপালকের যিকির করেছে- তারপর ঈদের নামাজ পড়েছে।

সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার পর ঈদগাহে অভিমুখে গমন করবে। উল্লেখ্য যে, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মোস্তাহাব। কেননা হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নত। যদি কিছু লোক নিজেদের দুর্বলতার কারণে ঈদগাহ যেতে অপারগ হয়, তবে ইমাম অন্য একজন লোককে নির্ধারণ করে দিবে যাতে সে তাদেরকে শহরের ভিতর মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়িয়ে দেয়। কেননা বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِالصَّغِيرِ صَلَاةَ الْيَمِيدِينَ فِي الْجَامِعِ وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَانَةِ مَعَ خَمْسِينَ شَبَابًا يَمْنُونَ وَيَتَشَوَّوْنَ.

হযরত আলী (রা.) যখন কুফায় তাশরীফ আনলেন, তখন এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানা-লেন যিনি দু'ল লোকদেরকে জামে মসজিদে ঈদাইনের নামাজ পড়াবে। আর তিনি নিজে পঞ্চাশ জন বৃদ্ধ লোকদেরকে নিয়ে ময়দানের দিকে চললেন, তিনি নিজেও পায়ে হেঁটে চলেছিলেন আর ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তিও পায়ে হেঁটে চলেছিলেন।

নিম্নোক্ত মাসআলার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার প্রাক্কালে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে না কি চুপিসারে বলবে? হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলবে। তাদের দলিল হলো ঈদুল আযহার উপর কিয়াস। অর্থাৎ যেমনিভাবে ঈদুল আযহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর শরিয়ত সম্মত এমনিভাবে ঈদুল ফিতরের মধ্যেও তাকবীর বলা শরিয়ত সম্মত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, যিকির এর ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَفًّى وَكَذُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي

উত্তম যিকির হলো যিকিরে খফী তথা অনুচ্চৈঃস্বরে জিকির আর উত্তম রিজিক হলো, প্রয়োজন পরিমাণ রিজিক। প্রয়োজনের বেশিও না আবার কমও না। কোনো এক উর্দু সাহিত্যিক বলেছেন,

مجھے جو بھی دے وہ قبول ہے مگر التجا یہ ضرور ہے \* میرے طرف بھی سوا نہ دے میری ارزو سے بھی کم نہ دے

আমাকে যা দেওয়া হবে তা কুবল। তবে এ অনুরোধ অবশ্যই থাকবে যে আমার পাত্র থেকে অধিকও নয় আবার আমার আশা থেকে কমও নয়। মোটকথা, জিকিরের ব্যাপারে আসল হলো গোপনীয়তা। তাহে ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরিয়ত প্রকাশ্য জিকিরের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ** মুফাস্সিসরীনে কেলাম বলেছেন, এখানে কুরবানির দিনগুলোতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা উদ্দেশ্য। ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহার সমর্থবাদক নয়। কেননা ঈদুল আযহা হলো তাকবীর বলার দিন। এ কারণেই তো কুরবানির দিনগুলোতে তাকবীর বলা ওয়াজিব। কিন্তু ঈদুল ফিতল এরূপ নয়। অধিকন্তু ঈদুল আযহা হজের রুকনের মধ্য থেকে একটি রুকনের সাথে খাস, অর্থাৎ এ দিনে হজের কতিপয় রুকন আদায় করা হয়। আর ঈদুল ফিতরের মধ্যে এগুলো নেই। সুতরাং ঈদুল ফিতর আর ঈদুল আযহা এক নয়। এতে বুঝা গেল ঈদুল ফিতরকে ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে- ইমাম সাহেব (র.)-এর এ কথা বলা যে, ঈদুল ফিতরের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা শরিয়তে নেই- এটা মানার যোগ্য নয়। কেননা আল্লাহর বাণী-

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ .

উক্ত আয়াতের মধ্যে রামজানের রোজা পূর্ণ করার পর তাকবীর বলার খবর দেওয়া হয়েছে। আর তাকবীর পড়ার কথা তো তখনই জানা যাবে যখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ يَوْمَ الْأَضْحَى رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে বের হতেন। বুঝা গেল, ঈদুল ফিতরের দিনও উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার ব্যাপারে, শরিয়তের আছে। জওয়াব এই যে, আয়াতের মধ্যে নামাজের ভিতর তাকবীর বলা উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে **صَلُّوا صَلَاةَ الْعِيدِ وَكَبِّرُوا اللَّهَ فِيهَا** ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করো আর তার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা। হাদীসে ইবনে ওমরের জওয়াব এই যে, উক্ত হাদীসে সনদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুহাম্মদ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ওয়ালীদ হলেন মাতরুকুল হাদীস অর্থাৎ যার হাদীস বর্জনীয়। তাই এই হাদীস দলিলযোগ্য নয়।

وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمَصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مَعَ حُرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ قِيلَ الْكَرَاهَةُ فِي الْمَصَلَّى خَاصَّةً وَقِيلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَامَّةٌ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِإِرْفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقَفَّهَا إِلَى الزَّوَالِ وَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقَفَّهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْجٍ أَوْ رُمَحَيْنٍ وَلَمَّا شَهِدُوا بِالِهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمَرَ بِالخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى مِنَ الْعِدِّ .

অনুবাদ : ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদগাহে নফল নামাজ পড়বে না। কেননা নামাজের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ তা করেননি। এরপর কেউ কেউ বলেন, এই মকরুহ হওয়া ঈদগাহের জন্য নির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে ঈদগাহ ও সব স্থানের জন্য ব্যাপক। কেননা মহানবী ﷺ তা করেননি। যখন সূর্য উপরে উঠে আসার মাধ্যমে নামাজ আদায় করা জায়েজ হয়ে যায় তখন থেকে যাওয়ায় পর্যন্ত ঈদের নামাজের সময় থাকে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন ওয়াত্ব শেষ হয়ে যায়, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য এক বা দুই বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। আর (একবার) যখন সাহাবায়ে কেলাম যাওয়ার পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন, তখন তিনি পরবর্তী দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ করলেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ঈদের নামাজের পূর্বে নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। ঈদগাহেও এবং ঈদগাহ ছাড়া অন্য স্থানেও। ইমামের জন্যও মাকরুহ, মুক্তাদীর জন্যও মাকরুহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الْعِيدُ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদগাহেও এবং ঈদগাহ ছাড়া অন্য স্থানেও। ইমামের জন্যও মাকরুহ, মুক্তাদীর জন্যও মাকরুহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الْعِيدُ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদগাহেও এবং ঈদগাহ ছাড়া অন্য স্থানেও। ইমামের জন্যও মাকরুহ, মুক্তাদীর জন্যও মাকরুহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الْعِيدُ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাজের পূর্বে ঈদগাহেও এবং ঈদগাহ ছাড়া অন্য স্থানেও। ইমামের জন্যও মাকরুহ, মুক্তাদীর জন্যও মাকরুহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الْعِيدُ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ.

قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ الْخ: উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে ঈদের নামাজের শুরু এবং শেষ ওয়াত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, ঈদের নামাজের ওয়াত্ব শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের সূর্য এক বর্ষা বা দুই বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠা হতে আরম্ভ হয়ে যায় এবং সূর্য যাওয়ায় হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। শুরু ওয়াত্বের উপর দলিল হলো (১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামাজ তখন পড়তেন যখন সূর্য এক বর্ষা বা দুই বর্ষা পরিমাণ উপরে উঠে যেতো। (২) দলিল এই যে, সূর্য উঠার হব্ব সময় নামাজ পড়তে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এ জন্য সূর্য উপরে উঠার শর্তারোপ করা হয়েছে। শেষ ওয়াত্বের উপর দলিল এই যে, একবার রমাজানের চাঁদ ২৯ তারিখে দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিছু সাহাবায়ে কেলাম পরের দিন যাওয়ার পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের দিন অর্থাৎ ২রা শাওয়াল ঈদের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিলেন। যদি শাওয়ালের পরও ঈদের নামাজ আদায় করা জায়েজ হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না। এতে প্রতীয়মান হলো, ঈদের নামাজের সময় শাওয়াল পর্যন্ত থাকে।

وَصَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلْإِفْتِيحِ وَلَثَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ  
الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِي فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ  
يُكَبِّرُ لَثَلَا بَعْدَهَا وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) وَهُوَ قَوْلُنَا  
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلْإِفْتِيحِ وَخَمْسًا بَعْدَهَا وَفِي الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ  
خَمْسًا ثُمَّ يَقْرَأُ وَفِي رَوَايَةٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ  
لِأَمْرِ بَنِيهِ الْخُلَفَاءِ فَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِي خِلَافُ  
الْمَعْنُودِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْأَوَّلِ أَوْلَى ثُمَّ التَّكْبِيرَاتُ مِنَ إِعْلَامِ الدِّينِ حَتَّى يُجْهَرَ بِهَا  
فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْجَمْعُ وَفِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى يَجِبُ إلْحَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِيحِ  
لِقَوْلِهَا مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ وَالسَّبْقِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُوْجَدْ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ  
فَوَجِبَ الصَّمُّ إِلَيْهَا وَالشَّافِعِيُّ (رح) أَخَذَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْمَرْوِيَّ كُلَّهُ  
عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتِ التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ .

অনুবাদ : ইমাম লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করবেন। প্রথম রাকআতে এক তাকবীর বলবেন তাহরীমার জন্য। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন। এরপর ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআত কিরাআত দিয়ে শুরু করবেন। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। এ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (র.)-এর মত এবং আমাদের মাযহাব। ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকআতে তাহরীমার জন্য তাকবীর বলবেন তারপর পাঁচটি তাকবীর বলবেন এবং দ্বিতীয় রাকআতেও পাঁচবার তাকবীর বলার পর কিরাআত পড়বেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (দ্বিতীয় রাকআতে) চারবার তাকবীর বলবেন। বর্তমানে ইবনে আক্বাস (রা.)-এর বংশধর খলীফাদের শাসন সমাজে বিদ্যমান থাকার কারণে সাধারণ লোকের আমল তাঁর মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মাযহাব প্রথমোক্ত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা (অতিরিক্ত) তাকবীর বলা এবং হাত উঠানো নামাজের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। সুতরাং নিম্নতর সংখ্যাই গ্রহণ করা শ্রেয়। আর (ঈদের) তাকবীরসমূহ হলো দীনের প্রতীক। এ জন্য তা উল্লেখের আদায় করা হয়। সুতরাং এর প্রকৃত চাহিদা হলো, মিলিতভাবে পাঠ করা। প্রথম রাকাআতে এই তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত করা ওয়াযিব। যেহেতু এ তাকবীর ফরজ এবং প্রথমে হওয়ার প্রেক্ষিতে এটার শক্তি বেশি। আর দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর নেই। সুতরাং (ঈদের তাকবীরগুলো) তার সাথে যুক্ত করাই ওয়াযিব। ইমাম শাফিঈ (র.) ইবনে আক্বাস (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বর্ণিত সব কয়টি তাকবীরকে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাব গ্রহণ করেছেন। ফলে (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর দুই তাকবীরসহ) মোট তাকবীর তাঁর মতে পনেরটি কিংবা ষোলটি হবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) ঈদের নামাজের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই যে, ইমাম লোকদেরকে দুই রাকআত এভাবে পড়াবে যে, প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। তারপর ছানা পড়ে তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। তারপর কিরাআত অর্থাৎ সূরায় ফাতেহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা মিলাবে। তারপর রুকু'র তাকবীর বলে রুকু' করবে এবং সিজদা আদায় করবে। এভাবে প্রথম রাকআত পূর্ণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে প্রথমে সূরায় ফাতেহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা মিলাবে। তারপর তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। এরপর রুকু'র তাকবীর বলে রুকু' করবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উভয় রাকআতে সর্বমোট নয়টি তাকবীর হবে। ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর, দুইটি রুকু'র তাকবীর এবং একটি তাকবীরে তাহরীমা। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা হলো ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ঈদের উভয় রাকআতে সর্বমোট তাকবীর হলো নয়টি। এটাই হানাফী আলিমগণের মায়হাব। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতের দলিল হলো-  
 كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حَذِيقَةٌ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَسَأَلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَ الْحَذِيقَةُ سَلِ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ سَلِ عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَقْدَمُنَا وَأَعْلَمُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَرَكْعٌ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) কোথাও বসা ছিলেন। তাদেরকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ঈদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হুযায়ফা (রা.) বললেন, আশআরীকে জিজ্ঞাসা করুন। আশআরী (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা আব্দুল্লাহ আমাদের মধ্যে প্রবীণ এবং জ্ঞানী। তাই তিনি ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, চার বার তাকবীর বলবে। তারপর কিরাআত পড়বে। তারপর তাকবীর বলে রুকু' করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। কিরাআত পড়বে, তারপর কিরাআতের পর চারবার তাকবীর বলবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম রাকআতের মধ্যে যে পাঁচবার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে একটি হলো তাকবীরে তাহরীমা আর তিনটি হলো অতিরিক্ত। আর একটি হলো রুকু'র তাকবীর। দ্বিতীয় রাকআতের চার তাকবীরের মধ্যে একটি হলো রুকু'র তাকবীর আর তিনটি হলো অতিরিক্ত। মোটকথা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নয়বার তাকবীর বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া হযরত মাসরু'ক থেকে বর্ণিত আছে যে, (رَضِيَ اللَّهُ بِنِ مَسْعُودٍ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ يَسْعَى تَكْبِيرَاتٍ خَمْسًا فِي الْأَوَّلَى وَارْبَعًا فِي الْآخِرَةِ وَيُرَائِي بَيْنَ الْفَرَائِصِ - ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে দুই ঈদে নয় তাকবীরের শিক্ষা দান করতেন। পাঁচটি প্রথম রাকআতে আর চারটি দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে এবং উভয় কিরাআতের মাঝখানে (وصل) করতেন তথা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক পড়তেন। উক্ত রিওয়াযাতের পাঁচ তাকবীর দ্বারা মুমদ হলে তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'র তাকবীর এবং তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর। আর তার তাকবীর দ্বারা মুমদ হল, তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর এবং একটি রুকু'র তাকবীর। উক্ত আছর (أثر) দ্বারাও ঈদের তাকবীর নয়টি প্রমাণিত হলো। ছয়টি অতিরিক্ত আর তিনটি নামাজের। (শরহে নিকায়) মোট কথা, হানাফী মায়হাবের ভিত্তি হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর। হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং এরপর পাঁচবার তাকবীর বলবে। দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে পাঁচবার তাকবীর বলবে অতঃপর কিরাআত পড়বে। অন্য বর্ণনায় আছে দ্বিতীয় রাকআতে চারবার তাকবীর বলবে।

উল্লেখ্য যে, ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের মাঝে দুই স্থানে মতবিরোধ হলো, এক অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে। দুই, এগুলোর স্থান নিরূপণের মধ্যে। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে অতিরিক্ত তাকবীর হলো ছয়টি। তিনটি প্রথম রাকআতে, আর তিনটি দ্বিতীয় রাকআতে। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে অতিরিক্ত তাকবীর দশটি। পাঁচটি প্রথম রাকআতে, বাকি পাঁচটি দ্বিতীয় রাকআতে। অন্য বর্ণনা মতে অতিরিক্ত তাকবীর নয়টি। পাঁচটি প্রথম রাকআতে, আর চারটি দ্বিতীয় রাকআতে।

দ্বিতীয় স্থানের মতবিরোধ এই যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরের স্থান হলো কিরাআত থেকে ফরিগ ইওয়ায পর। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কিরাআত পূর্বে। বিজ্ঞ লিখক আল্লামা বুরহানুদ্দীন (র.) তাঁর সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আজকাল সাধারণ লোকের আমল হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী। তার কারণ এই যে, ঐ সময় ছিল আব্বাসী খলীফাদের উত্থানের সময়। আব্বাসীয় খলীফাগণ ঈদের তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে তাদের দাদামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিতেন। এ কারণেই একবার ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বাগদাদে লোকদেরকে ঈদের নামাজ পড়িয়েছিলেন এবং তাকবীরগুলোর ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমল করেছেন। কেননা আব্বাসীয় খলীফা হাক্করুন রশীদ তাঁর মুক্তাদী ছিলেন। খলীফা তাঁকে হা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রিওয়াযাত

অনুযায়ী আমল করার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের আমল করা মাযহাব বা বিশ্বাসের দিক থেকে ছিল না বরং আকাসীয়া খলীফাদের নির্দেশের প্রেক্ষাপটে ছিল। তবে মাযহাব তো হলো প্রথমোক্ত মত তথা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী। গ্রন্থকার প্রথমোক্ত মতটি মাযহাব হওয়ার ক্ষেত্রে আকসী পেশ করতে গিয়ে বলেন, অতিরিক্ত তাকবীর এবং হাত উঠানো নামাজের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। এ জন্য নিম্নতর সংখ্যা গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয়। কেননা নিম্ন সংখ্যার প্রমাণ অবশ্যই (بالبين) হয়ে থাকে।

ثُمَّ التَّكْبِيرَاتُ الْخ — উক্ত ইবারত দ্বারা অতিরিক্ত তাকবীরসমূহের স্থানের উপর প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, তাকবীরসমূহ হলো দীনের প্রতীক বা আলামত। তাকবীরগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলা হয় যাতে দীনের পতাকা উচু হয়। অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে মূল হলো اصل। তাকবীরগুলোর সাথে তা একত্রিত হয়। প্রথম রাকআতের মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, রুকূর তাকবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। কেননা তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার কারণেও শক্তিশালী এবং রুকূর তাকবীরের পূর্বেও বটে। আর যেহেতু দ্বিতীয় রাকআতের মধ্যে রুকূর তাকবীর ব্যতীত অন্য কোনো তাকবীর নেই তাই দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর তাকবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফিঈ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতকে গ্রহণ করেছেন এবং ইবনে আব্বাসের মতের মধ্যে তাকবীরগুলোর যে সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে— সেগুলোকে তিনি অতিরিক্ত (زوائد) বলেছেন। এমনিভাবে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে সর্বমোট তাকবীর পনের কিংবা ষোল হবে।

গ্রন্থকারের ইবারত الرَّوَائِدُ كُنْتُ عَلَى الْمَرْوِي —এর মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। তা হলো المروي দ্বারা মুরাদ হয়তো এটা হবে যা হেদায়াতে নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে বর্ণিত হয়েছে, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكْبِّرُ فِي الْأَوَّلَى لِلإِنْفِتاحِ, অথবা অন্য কোনো কিছু মুরাদ হবে। যদি দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য হয় তবে ইবারতের মধ্যে تعفید (জটিলতা) হবে। কারণ যা কিতাবের মধ্যে উল্লেখ নেই তার হাওয়াল দিয়ে অনার্থক পাঠ্যকদেরকে পেরেশান করা হবে। আর যদি প্রথমটি উদ্দেশ্য হয় তবে তাকবীরের সংখ্যা ঐ পরিসংখ্যান পর্যন্ত পৌঁছে না। কেননা বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীর নয় বা দশ হয়। তিনটি মূল তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা, প্রথম রাকআতের রুকূর তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর তাকবীর) এর সাথে মিলে বার বা তেরটি তাকবীর হবে।

তা ছাড়া হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, وَطَهَّرَ عَمَلَ الْعَامَّةِ النَّبِيُّ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ, অতঃপর বলেন, وَالتَّائْفِيعُ أَخَذَ, অতঃপর বলেন, ابْنُ عَبَّاسٍ উক্ত ইবারত দ্বারা বুঝা যায় হেদায়া গ্রন্থকারের জমানায় সাধারণ লোকদের আমল পনের কিংবা ষোল তাকবীরের উপর ছিল অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং এ জমানায় বার কিংবা তের তাকবীরের উপর আমল ছিল। তাই উপরোক্ত অস্পষ্টতার জওয়ার হলো এই যে, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে দুটো রিওয়ায়াত যদিও বর্ণিত রয়েছে এক, ঈদাহিনের মধ্যে বার তাকবীর তের তাকবীর। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন মূল তিন তাকবীরের সাথে মিলে সর্বমোট তাকবীর হবে, বার কিংবা তেরটি অর্থাৎ প্রথমোক্ত তাহরীমা এবং উভয় রাকআতের রুকূর তাকবীরের সাথে মিলে বার কিংবা তের তাকবীর। আর তা এভাবে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর, তাকবীরে তাহরীমা এবং উভয় রাকআতের দুই তাকবীর এ হিসাবে সর্বমোট তেরটি তাকবীর হবে। দ্বিতীয় রিওয়ায়াত অনুযায়ী প্রথম রাকআতে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতে চারটি অতিরিক্ত তাকবীর এবং তিনটি হলো মূল তাকবীর। এ হিসাবে সর্বমোট বার তাকবীর হয়; ইবনে আব্বাসের উক্ত রিওয়ায়াতগুলোর উপরে তৎকালে সাধারণ লোকদের আমল ছিল। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উক্ত বার কিংবা তেরো তাকবীর—সবগুলো হলো অতিরিক্ত তাকবীর। এখন এ তাকবীরগুলোর সাথে যদি মূল তিন তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা উভয় রাকআতের দুই তাকবীর মিলিত হয় তবে তা বার বিশটি রিওয়ায়াত হিসাবে সর্বমোট পনের তাকবীর আর তেরো বিশটি রিওয়ায়াত হিসাবে সর্বমোট ষোল তাকবীর হয়ে যাবে। সুতরাং مروي দ্বারা মুরাদ হলো তা-ই যা ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। এখন খোলাসা এই বের হলো যে, হানাফী আলিমগণের মতে ঈদের উভয় রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীর হলো ছয়টি। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে দশটি, ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে বার কিংবা তেরটি। — (শরহে নিকায়)

হানাফীগণের মাযহাবের ভিত্তি হলো, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতের উপর। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হলো ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক তের বিশটি রিওয়ায়াত। আর তা এভাবে যে, দশটি হলো অতিরিক্ত তাকবীর, তিনটি হলো মূল তাকবীর। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মাযহাবের ভিত্তি হলো ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উভয় রিওয়ায়াত (বার কিংবা তের বিশটি)-এর উপর। তবে তিনি মূল তিন তাকবীর ব্যতীত সবগুলোকে অতিরিক্ত তাকবীর বলেন। 'অপ্লাহ-ই সমাক অবহিত।

قَالَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ يُرِيدُ بِهِ مَا سَوَى التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ  
 لِقَوْلِهِ ﷺ لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِيَ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ حُجَلَيْهَا تَكْبِيرَاتُ الْأَعْيَادِ  
 وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إِنَّهُ لَا يُرْفَعُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا قَالَ وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ  
 حُطْبَتَيْنِ بِذَلِكَ وَرَدَ الثَّنَلُ الْمُسْتَفِضُ يَعْلَمُ النَّاسَ فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَأَحْكَامَهَا  
 لَأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ وَمَنْ قَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَهْدِيهِ  
 الصِّفَةِ لَمْ تُعْرِفْ قُرْبَهُ إِلَّا بِشَرَائِطَ لَا تَمُتُ بِالْمُنْفَرِدِ فَإِنْ غَمَّ الْهَلَالُ وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ  
 بِرُؤْيَا الْهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدُ مِنَ الْغَدِ لِأَنَّ هَذَا تَاخِيرٌ يَعُذِّرُ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ  
 الْحَدِيثُ فَإِنْ حَدَثَ عَذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَصِلْهَا بَعْدَهُ لِأَنَّ  
 الْأَصْلَ فِيهَا أَنْ لَا تُقْضَى كَالْجُمُعَةِ إِلَّا أَنَا تَرَكْنَاهُ بِالْحَدِيثِ وَقَدْ وَرَدَ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى  
 الْيَوْمِ الثَّانِي عِنْدَ الْعُذْرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, দুই ঈদের তাকবীরগুলোতে উভয় হাত উপরে উঠাবে। এটা দ্বারা ইমাম কুদুরী (র.) রুকু তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বুঝিয়েছেন। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তন্মধ্যে ঈদের তাকবীরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হাত তোলা হবে না। আমাদের বর্ণিত এ হাদীস তার বিপরীতে দলিল। গ্রহস্থকার (র.) বলেন, নামাজের পর (ইমাম) দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে লোকদেরকে সাদাকা তুল ফিতর-এর আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। যে ব্যক্তির ইমামের সাথে ঈদের নামাজ ফউত হয়ে গেছে, সে তা কাজা পড়বে না। কেননা এই প্রকৃতির নামাজ এমন কিছু শর্তসাপেক্ষেই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যা মুনফরিদ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। যদি চাদ মেঘাবৃত হয়ে যায় আর লোকেরা যাওয়ার পর শাসক (বা তার নিযুক্ত ব্যক্তির) নিকট চাদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম পরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করবেন। কেননা এ বিলম্ব ওজরের কারণে হয়েছে। এ অনুযায়ী হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদি কোনো ওজর বশত পরের দিনও নামাজ আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এর পরে তা আর পড়বে না। কেননা জুমার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হলো কাজা না করা। তবে আমরা বর্ণিত হাদীসের কারণে তা বর্জন করেছি। আর হাদীসে ওজর বশত দ্বিতীয় দিন পর্যন্তই বিলম্বিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে ঈদাইনের তাকবীরসমূহের মধ্যে কান পর্যন্ত হাত উঠানো হবে। এটাই ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতাবল। দলিল হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ বাণী سَبْعَ مَوَاطِنَ ۖ এ সাত তাকবীরের মধ্যে ঈদাইনের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোকেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, ঈদাইনের তাকবীরগুলোর মধ্যে হাত উঠানো হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, হাত উঠানো ইফতিতাহ তথা প্রারম্ভের পূন্যত। যেহেতু অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে প্রারম্ভ নেই, সেহেতু হাত উঠানো হবে না। যেমন- রুকু তাকবীরের মধ্যে হাত উঠানো হয় না।

قَوْلُهُ لَا تَرْفَعِ الْأَيْدِيَّ إِلَّا سَبْعَ مَوَاطِنَ الْخ: হাদীসটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর বিপরীতে দলিল হবে। তবে অতিরিক্ত তাকবীরগুলোর মধ্যে কোনো মাসনুন জিকির আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইনায়া গ্রন্থকারের ভাষা মতে কোনো মাসনুন জিকির নেই। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ চূপ (সুফত) থাকবে। কারণ, ঈদের জামাআত অনেক লোকের সমাগমে আদায় করা হয়। এখন যদি তাকবীরগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে আদায় করা হয়, তাহলে যে সকল মুসল্লী ইমাম থেকে দূরে থাকবে তাদের নিকট ইমামের অবস্থা জটিল হয়ে যাবে যে, ইমাম কোন তাকবীর বলছেন। তবে সামান্য পরিমাণ অবকাশ দেওয়ার দ্বারা জটিলতা দূর হয়ে যাবে। এজন্য তাকবীরগুলোর মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় চূপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ وَخُطْبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْ: গ্রন্থকার (র.) বলেন, ঈদের নামাজ শেষ করে ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে হাদীসে মশহুর ও রয়েছে এবং উম্মতের আমলও রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের শব্দাবলি এই যে, خُطْبَتَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الْ: আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) খুতবার পূর্বে দুই ঈদের নামাজ আদায় করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, سَمِعْتُ الْعَيْنِدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلَّهُمْ كَانُوا يَصَلُّونَ الْعَيْنِدِينَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (رواه البخاري) হাদীসের খোলাসা হলো এই যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তিন খলীফা দুই ঈদের নামাজ প্রথমে আদায় করতেন তারপর খুতবা পড়তেন। তবে ঈদের খুতবা আর জুমার খুতবার মধ্যে দুই রকমের পার্থক্য বিদ্যমান। এক, জুমা খুতবা ব্যতীত জায়েজ নেই কিন্তু ঈদের নামাজ খুতবা ব্যতীতও জায়েজ আছে। দুই, জুমার খুতবা জুমার পূর্বে পড়া হয় আর ঈদাইনের খুতবা নামাজের পর পড়া হয়। কিন্তু যদি ঈদের খুতবা নামাজের পূর্বে পড়া হয় তবে তাও জায়েজ আছে, ঈদের নামাজের পর পুনরায় পড়ার দরকার নেই। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে সাদাকাতুল ফিতর এবং তার আহকামের তালীম দেওয়া হবে। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ قَاتَنَتْ صَلَاةَ الْعَيْنِدِ الْ: মাসআলা, ইমাম ঈদের নামাজ আদায় করে ফেলেছেন এমনভাবে, এক ব্যক্তি বাকি রয়ে গেছে, সে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারেনি তাহলে এখন তার কাজ করার ইজাযত নেই। এটা-ই ইমাম মালিক (র.)-এর মত। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ ব্যক্তি একাকী ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবে। কেননা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ঈদাইনের নামাজের জন্য জামাআতও শর্ত নয় এবং বাদশাহর উপস্থিতি থাকাও শর্ত নয়। এ জন্য তাঁর মতে ঈদের নামাজের কাজ আদায় করা মোস্তাহাব। আমাদের দলিল এই যে, ঈদের নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যেগুলো একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন- জামাআত হওয়া, এ সময়ের বাদশা হাজির থাকা ইত্যাদি। সুতরাং যেহেতু মুন্সফিরদের মধ্যে এ শর্তগুলো পাওয়া যায় না। তাই তার জন্যে একাকী ঈদের নামাজ আদায় করাও জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنَّ غَمَّ الْهَلَالِ وَشَهْدَا الْ: রমজানের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাকৃত হওয়ার দরুন যদি চাঁদ না দেখা যায় এবং ৩০ শে রমজান যাওয়ালের পর লোকেরা প্রশাসকের সমানে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে আর প্রশাসকও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তবে সকলে রোজা ভেঙ্গে দিবে এবং ইমাম আগামী দিন লোকদেরকে ঈদের নামাজ পড়াবেন। দলিল এই যে, এ বিলম্ব ওজরের কারণে হয়েছে এ জন্য এ বিলম্বের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। এ ধরনের বিলম্ব সম্পর্কে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হিদায়ার বিগত পৃষ্ঠার মধ্যে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَلَمَّا شَهِدَا بِالْهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ: লোকেরা যদি যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তবে আগামী দিন ময়দানে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর যদি শাওয়ালের দ্বিতীয় তারিখেও এমন কোনো ওজর পাওয়া যায় যা ঈদের নামাজের জন্য প্রতিবন্ধক, তবে এখন এরপর তথা শাওয়ালের তিন তারিখে ঈদের নামাজ আদায় করার ইজাযত নেই। কেননা ঈদের নামাজের মধ্যে মূলনীতি হলো এই যে, তার কাজা পড়বে না। যেমন জুমার নামাজ ফউত হলে তার কাজা করা হয় না। কিন্তু ওজরের কারণে আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীসের কারণে এ মূলনীতিকে বর্জন করা হয়েছে। সুতরাং যেহেতু হাদীসের মধ্যে আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার কথা বর্ণিত হয়েছে, এ জন্য শাওয়ালের দ্বিতীয় তারিখ পর্যন্ত ঈদের নামাজ বিলম্ব করার অনুমতি হবে। এরপর আর অনুমতি হবে না।



وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَيُؤَخَّرُ الْأَكْلُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَطْعَمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَصَلَّى وَهُوَ يُكَبِّرُ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَالْفِطْرِ كَذَلِكَ نُقِلَ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ لِأَنَّ ﷺ كَذَلِكَ فَعَلَ وَعَلِمَ النَّاسُ فِيهِمَا الْأَضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ وَالْخُطْبَةُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لَتَعْلِيْمِهِ .

অনুবাদ : ঈদুল আযহার দিনও গোসল করা এবং খুশবু ব্যবহার করা মোস্তাহাব। এর দলিল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর নামাজ থেকে ফারিগ না হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্বিত করবে। কেননা হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ কুরবানির দিন (ঈদগাহ থেকে) ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। এরপর আপন কুরবানির গোশত থেকে খেতেন। আর তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কেননা নবী করীম ﷺ পথে তাকবীর বলতেন। আর ঈদুল ফিতরের মতো দুই রাকআত নামাজ আদায় করবে। (সাহাবায়ে কেরাম থেকে) এরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন। তাতে লোকদেরকে কুরবানির (আহকাম) এবং তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবেন। কেননা এ হলো সেই সময়ের আহকাম, আর তা শিক্ষা দানের জন্যই খুতবার রিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কুরবানির ঈদের দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করাও মোস্তাহাব। এর দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং নামাজের পর আহার করা এবং নিজের কুরবানির গোশত থেকে খাওয়া এটাও সুন্নত। দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল। তিনি কুরবানির দিন ঈদের নামাজের পর আহার করতেন এবং নিজের কুরবানি থেকে খেতেন। যদি কেউ কুরবানি না করে সেও ঈদের নামাজের পূর্বে আহার করবে না। কারণ ঈদের পূর্বে না খাওয়া আলাদা সুন্নত। আর নিজের কুরবানি থেকে খাওয়া আলাদা সুন্নত। তবে এমন গ্রাম যেখানে ঈদের নামাজ ওয়াজিব হয় না সেখানকার লোকদের জন্য আগে আহার করাতেও কোন অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَصَلَّى الخ : মাসআলা হলো ঈদগাহে যাওয়ার সময় উক্ত আওয়াজে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এমনটি করতেন। কুরবানির ঈদের নামাজও ঈদুল ফিতরের ন্যায় দুই রাকআত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। ইমাম নামাজের পর দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও এমনটিই করেছেন। ঐ দুই খুতবার মধ্যে লোকদেরকে কুরবানি এবং তাকবীরে তাশরীকের আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা ঐ দিনগুলোতে এ জিনিসগুলোই প্রবর্তিত হয়েছে। আর খুতবা ঐ জিনিসগুলোর শিক্ষাদানের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।

فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يُنْتَعَمُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ الْأَضْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْعَدْوِ وَبَعْدَ الْعَدْوِ  
لَا يَصْلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُوقَّتَةً يَوْفَتِ الْأَضْحَى فَيَقِيدُ بِأَيَّامِهَا لِكِنَّةِ  
مُسْنَى فِي التَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِمَخَالَفَةِ الْمَنْقُولِ وَالتَّغْرِيفِ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ  
لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ تَشْبِيهَا بِالْوَاقِفِينَ  
بِعَرَفَةَ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَرَفَ عِبَادَةً مُخْتَصَّةً بِمَكَانٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً دُونَهُ  
كَسَائِرِ الْمَنَاسِكِ .

অনুবাদ : যদি কোনো ওজর বশত ঈদুল আযহার দিন নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরের দিন এবং (সে দিন সম্ভব না হলে) তার পরের দিন নামাজ আদায় করবে। এরপরে তা আদায় করবে না। কেননা এ নামাজ কুরবানির সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরবানির দিনগুলোর সাথেই তা সীমিত থাকবে। তবে বিনা ওজরে করলে বর্ণিত আমলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে গুনাহগার হবে। আর আরাফা পালন নামে মানুষ যা করে থাকে, তার কোনো (শররী) ভিত্তি নেই। “আরাফা পালন” অর্থ আরাফা মাঠে অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফা দিবসে (জিলহজের নয় তারিখে) কোনো স্থানে মানুষের সমবেত হওয়া। কেননা একটি নির্দিষ্ট স্থানে (আরাফায়) অবস্থান করাই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র তা ইবাদত (বলে গণ্য) হবে না। যেমন- হজের অন্যান্য আমল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি জিলহজের দশ তারিখে নামাজের প্রতিবন্ধক কোনো ওজর পাওয়া যায় তবে একাদশ তারিখে নামাজ আদায় করবে। যদি উক্ত তারিখেও ওজর এসে যায় তবে দ্বাদশ তারিখে ঈদের নামাজ আদায় করবে। আর যদি এ তারিখেও ওজর বিদ্যমান থাকে তবে এরপর আর বিলম্ব করার ইজাযত নেই। দলিল এই যে, কুরবানির ঈদের নামাজ কুরবানির সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য নামাজের ওয়াক্তও কুরবানির দিনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং কুরবানির তিনদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর যাওয়া পর্যন্ত ঈদের নামাজের সময় থাকে। আর যদি ওজর ছাড়া বিলম্ব করে তবুও নামাজ জায়েজ হবে। তবে ওজর ছাড়া বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায় রাশেদীন থেকে এ ধরনের বিলম্ব করার বর্ণনা নেই। উল্লেখ্য যে, এই নামাজ বিলম্ব সত্ত্বেও আদায় হবে কাজা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এটা তার সময়েই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالتَّغْرِيفُ الَّذِي الْخ : “তা’রীফ তথা আরাফা পালন” অর্থ-আরাফার মাঠে অবস্থানকারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্ব করা। অর্থাৎ আরাফার দিবসে লোকেরা কোনো মাঠে সমবেত হয়ে হাজীদের ন্যায় দোয়া করা, কাকুতি-মিনতি ইত্যাদি করা। কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, এটা এমন কোনো কিছু নয় যে, যার ঘরা ছওয়াব হবে। কেননা আরাফায় অবস্থান একটি নির্দিষ্ট স্থান তথা আরাফার সাথে নির্দিষ্ট ইবাদত। এ জন্য আরাফার মাঠ ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করা কিভাবে ইবাদত বলে গণ্য হবে? যেমন- হজের অন্যান্য আমল অন্যত্র আদায় করা যায় না। কিফায় গ্রন্থকার তো এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, যদি বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ঘরের তওয়াফ করা হয় তবে তার ব্যাপারে কুফরির আশংকা রয়েছে। এখন যদি বলা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বসরায় এক মাঠের মধ্যে আরাফার দিন লোকদেরকে সমবেত করেছিলেন? তবে আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, ইবনে আব্বাসের উক্ত আমল দোয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, আরাফায় অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে ছিল না। আল্লাহই সত্যিকার জ্ঞাত।

## فَصَلِّ فِي تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ

وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ يَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ أَخَذًا بِالْأَكْثَرِ إِذْ هُوَ الْإِحْتِبَاطُ فِي الْعِبَادَاتِ وَأَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخَذًا بِالْأَقَلِّ لِأَنَّ الْجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ يَذَعُّ وَالتَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ مَرَّةً وَاحِدَةً اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ هَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الثَّخْلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

### অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাশরীক

অনুবাদ : আরাফার দিনের ফজরের নামাজের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক শুরু করবে এবং কুরবানির দিনের আসরের নামাজের পর তা শেষ করবে। এ হলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন (র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন আসরের নামাজের পর তা শেষ করবে। বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই সাহেবাইন (র.) হযরত আলী (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, দিনের সংখ্যাधिक্যকোর প্রেক্ষিতে। কেননা ইবাদতের ব্যাপারে এতেই সতর্কতা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন। কেননা উকৈঃস্বরে তাকবীর বলার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে। (তাই নিশ্চিতের উপর আমল করা শ্রেয়)। আর তাকবীর এ ভাবে, একবার বলবে اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কেননা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাশরীক খোদ তাকবীর। এখন অর্থ এই হবে যে, এ অনুচ্ছেদে ঐ সকল তাকবীরের বর্ণনা হবে যার নাম হলো তাশরীক। ইনশাাে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীরে তাশরীক যেহেতু কুরবানির দিনগুলোর সাথে খাস এ জন্য ভিন্ন অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিফায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকবীর গুলোর ইয়াফত বা সম্বোধন (إِضَافَتٌ) তাশরীকের দিকে সাহেবাইনের মত অনুযায়ী জায়েজ আছে। কেননা তাঁদের মতে কোনো কোনো তাকবীর তাশরীকের দিনগুলো তথা একাদশ, দ্বাদশ এবং এয়োদশ তারিখেও হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইয়াওমে নাহর তথা জিলহজের দশম তারিখ আসরের নামাজান্তে তা শেষ হয়ে যায়। অথচ আয়্যামে তাশরীকের শুরু জিলহজের একাদশ তারিখ থেকে হয়। যেমন ইনশাাে গ্রন্থকার খোলাসার রেফারেন্সে উল্লেখ করেছেন যে, আয়্যামে নাহর তিন দিন আর আয়্যামে তাশারীকও তিন দিন। কেননা যিলহজের দশম তারিখ নির্দিষ্টভাবে নাহরের দিন। আর এয়োদশ তারিখ নির্দিষ্টভাবে তাশরীকের দিন। একাদশ ও দ্বাদশ নাহর ও তাশরীক উভয়ের জন্য। সুতরাং তাকবীরাতে তাশরীকের শিরোনাম ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা কিভাবে সহীহ হবে? এর এক জওয়াব তো এই যে, জিলহজের দশ তারিখ যদিও ইয়াওমে নাহর ইয়াওমে তাশরীক নয়; কিন্তু ইয়াওমে

তাশরীক তথা জিলহজের একাদশ তারিখের কাছাকাছি (قرب)-এ কুরব (قرب)-এর কারণে তাশরীক-এর দিকে তাকবীর ওলোর ইয়াফত করা হয়েছে। যেমন জায়ে সপীর গ্রন্থে রয়েছে: فَالْإِسْمُ الَّذِي يَنْفَرُ بِهِمُ الْمَغْرِبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ইয়াফুব বলেন, আমি তাদেরকে আরাফার দিন মার্গরিবের নামাজ পড়িয়েছি। অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই আরাফার দিন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মার্গরিবের ওয়াজ্ঞ আরাফার দিনের নিকটবর্তী (قرب) এ জন্য আরাফার দিন বলে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, তাশরীক দ্বারা মুরাদ হলো ঈদুল আযহার নামাজ। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, لَا ذَبْحَ إِلَّا بَعْدَ الشَّرِيقِ, অন্য হাদীসে রয়েছে لَا جَمْعَ وَلَا تَفْطِيرَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَابِعٍ, দ্বারা মুরাদ হলো ঈদের নামাজ। সুতরাং এ সুরতে সকলের মতে ইয়াফত সহীহ হবে। তবে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব না সুন্নত? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলিম ওয়াজিব আর কিছু সংখ্যক আলিম সুন্নত বলেন। ওয়াজিব হওয়ার দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ আর সুন্নত হওয়ার দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বদা তা বলা এবং এর উপর سَوَاطِيت-এর সাথে আমল করা।

তাকবীরে তাশরীকের শুরু-শেষ নিয়ে যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ ছিল সেহেতু ইমামগণের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। আকাবিরে সাহাবা যেমন- হযরত ওমর, হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীকের শুরু হবে আরাফার দিন অর্থাৎ জিলহজের নয় তারিখ থেকে তা শুরু হবে। উক্ত মতকে হানাফী আলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সিগারে সাহাবা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীকের শুরু কুরবানির ঈদের দিন জোহর থেকে হবে। তাকবীরে তাশরীকের শেষ সময়ের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আয়াযমে নাহরের প্রথম দিন অর্থাৎ জিলহজের দশ তারিখের আসরের নামাজ পর্যন্ত। অর্থাৎ জিলহজের দশ তারিখের আসরের নামাজের পর শেষ করে দিবে। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে মোট আট নামাজের পর তথা জিলহজের নয় তারিখ ফজর থেকে দশ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়া হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাহাব। হযরত আলী (রা.) বলেন, তাকবীরে তাশরীক আয়াযমে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত পড়া হবে। অর্থাৎ জিলহজের ত্রয়োদশ তারিখের আসরের নামাজের পর শেষ করবে। সুতরাং হযরত আলী (রা.)-এর মতে মোট তেইশ নামাজের পর অর্থাৎ জিলহজের নয় তারিখ ফজরের পর থেকে ত্রয়োদশ তারিখ আসর পর্যন্ত পড়া হবে। এই মতটি সাহেবাইন (র.) গ্রহণ করেছে। সাহেবাইন (র.) অধিক্যে গ্রহণ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর মতের উপর আমল করেছেন। কেননা, তাকবীর ও ইবাদত আর ইবাদতের মধ্যে সতর্কতা এখানেই যে অধিক্যে গ্রহণ করা। ইমাম আবু হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যা এ কারণে গ্রহণ করেছেন যে, উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা বিদ্‌আত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذَوِّنَ الْجَهْرِ

হাদীসের মধ্যে এসেছে

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَن تَدْعُوا أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোত্রকে দেখলেন যারা দোয়ার সময় তাদের আওয়াজকে বুলন্দ করতো। তিনি বললেন, তোমরা কোনো বধির এবং অনুপস্থিত সত্যকে ডাকছ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো 'আল্লাহ', যাকে তোমরা ডাকছ তিনি বধিরও নন অনুপস্থিতও নন। বরং তিনি সর্বশ্রোতা, সব স্থানে বিদ্যমান। এ জন্য উক্ত আওয়াজে তাকে ডাকার কোনোই প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, দোয়া আর জিকিরের মধ্যে আসল হলো গোপনীয়তা। জিহর তথা উচ্চ আওয়াজ হলো আসলের খেলাফ এবং বিদ্‌আত।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল এই যে, তাকবীরের সূচনা এমন দিনে করা হয় যার মধ্যে হজের একটি রুকন তথা আরাফার অবস্থান আদায় করা হয় সুতরাং তার সমাপ্তিও এমন নাহরের দিনে করা উচিত হবে যার মধ্যে হজের দ্বিতীয় রুকন তথা তাওয়াফে মিয়রাত আদায় করা হয়। তাহলে তাকবীরের শুরু ও শেষ বরাবর হবে। উল্লেখ্য যে, আমল ও ফাতওয়া হলো সাহেবাইনের মতের উপর।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত তাকবীরে তথা **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ** একবার বলবে। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন, পাঁচ কিংবা সাতবার বলবে। এই তাকবীর গুলো সাযিদিনা হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে একুশই বর্ণিত হয়েছে। এই বাক্যগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হলো এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহর দরবারে কুরবানির জন্য স্বীয় কলিজার টুকরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে হাত-পা বেঁধে জমিনের উপর শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালালেন। কিন্তু তার গলা কর্তিত হলো না। তখন হযরত জিবরাঈলের প্রতি নির্দেশ আসল যে, ইসমাঈলের স্থলে ঐ দুখা নিয়ে রেখে আসো যাকে হাবিল আল্লাহর সমীপে পেশ করার জন্য পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়েছিল এবং সেটি আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয়ে অদাবিহ জান্নাতে বিচরণ করছে। জিবরাঈল (আ.) যখন দেখলেন ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করছেন তাই বললেন **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ** ইব্রাহীম (আ.) খ্রীবা উত্তোলন করলেন, জিবরাঈলের আওয়াজকে শুনলেন, মনের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসল **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** যবীহুল্লাহ যখন তা জানলেন এবং পিতা মহোদয় এবং জিবরাঈলের বাক্যগুলো শুনলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসার জন্য তাঁর যবান খুলে গেল আর বলতে লাগলেন **اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** এই বাক্যগুলো কিয়ামত অবধি এক সং ছেলে এবং আল্লাহর ইশকে মাতোয়ারা পিতার কথা স্মরণ করিয়ে যাবে। কুরআনে কারীম কাত্টুকুন গাফল এবং হৃদয় স্পর্শী ভাষায় ঘোষণা করছে,

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ - رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا آدَمُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ - وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِ - وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ -

অর্থাৎ, সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপায়ণ সন্তান দান কর।' অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।'—এভাবেই আমি সৎকর্মপায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই তা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

وَهُوَ عَقِيبُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ فِي الْجَمَاعَاتِ  
 الْمُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ  
 وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مُقِيمٌ وَقَالَا هُنَّ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى  
 الْمَكْتُوبَةَ لِأَنَّهُ تَبَعَ لِلْمَكْتُوبَةِ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَالتَّشْرِيقُ هُوَ الْجَهْرُ  
 بِالتَّكْبِيرِ كَذَا نَقَلَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَلَئِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السَّنَةِ  
 وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اقْتَدَيْنَ  
 بِالرَّجُلِ وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ عِنْدَ اقْتِدَائِهِمْ بِالْمُقِيمِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ قَالَ يَعْقُوبُ  
 صَلَّيْتُ بِهِمْ الْمَغْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْتُ أَنْ أَكْبِرَ فَكَبَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ دَلَّاهُ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ  
 تَرَكَ التَّكْبِيرَ لَا يَتْرُكُهُ الْمُقْتَدِي وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَكُنْ  
 الْإِمَامَ فِيهِ حَتْمًا وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ .

অনুবাদ : এই তাকবীরগুলো ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে শহরে মোস্তাহাব জামাআতে নামাজ আদায়কারী মুকীমদের উপর ফরজ নামাজ সমূহের পর (ওয়াজিব)। সুতরাং স্ত্রী লোকদের জামাআতের ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পুরুষ নেই এবং মুসাফিরদের জামাআতের বেলায় যাদের সঙ্গে কোনো মুকীম নেই, সেখানে তা ওয়াজিব হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, তা ওয়াজিব ফরজ নামাজ আদায়কারী প্রত্যেকের উপর। কেননা এ তাকবীর ফরজ নামাজের تابع (অনুগামী)। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো ইতপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাশরীক অর্থ উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলা। খলীল ইবনে আহমদ থেকে এটি বর্ণিত। তা ছাড়া উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ। আর শরিয়তে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত শর্তসমূহ একত্রিত হওয়ার বেলায়। অবশ্য স্ত্রী লোকেরা পুরুষের পিছনে ইকতিদা করলে এবং মুসাফিরগণ মুকীমের পিছনে ইকতিদা করলে অনুগামী হিসাবে তাদের উপর উপরোক্ত তাকবীরে তাশরীকে ওয়াজিব হবে। ইমাম (আবু ইউসুফ) ইয়াকূব (র.) বলেন, আরারফার দিবসে মাগরিবের নামাজে আমি ইমামতি করলাম এবং তাকবীর বলতে ভুলে গেলাম। তখন ইমাম আবু হানীফা (র.) তাকবীর বললেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাকবীর তরক করলেও মুক্তাদী তা তরক করবে না। কেননা এটি নামাজের তাহরীমার মধ্যে আদায় করা হয় না। সুতরাং তাতে ইমাম অপরিহার্য নন; বরং ইমামের অনুসরণ মোস্তাহাব মাত্র।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর পড়া ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো, এ ব্যক্তি মুকীম হতে হবে, শহরের মধ্যে হতে হবে এবং মোস্তাহাব তরীকায় জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হতে হবে। ইমাম সাহেব (র.) عَقِيبُ الْفَرَضِ (ফরজের পর)-এর قيد এ জন্য বৃদ্ধি করেছেন যে, যদি ফরজের পর অন্য কোনো

আমল পাওয়া যায় যেমন মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল কিংবা কথাবার্তা যি লিগু হয়ে গেল, তবে এ ব্যক্তি তাকবীর বলবে না। **مفروضات**-এর **فید** দ্বারা জানাযার নামাজ, বিতর ও ঈদের নামাজ এবং নফল বের হয়ে গেছে অর্থাৎ এ নামাজগুলোর পর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব নয়। **مستحبین**-এর **فید** দ্বারা মুসাফির বের হয়ে গেছে। কেননা মুসাফিরের উপর তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব নয়। **فی الامصار**-এর **فید** দ্বারা গ্রামের মধ্যে তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। **جماعت**-এর **فید** দ্বারা মুনফারিদ বের হয়ে গেল। **مستحب**-এর **فید** দ্বারা শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জামাআতে নামাজ পড়া বের হয়ে গেল। অর্থাৎ যদি শুধু স্ত্রীলোকেরা জামাআত করে তবে তাদের উপর উপরোক্ত তাকবীর ওয়াজিব নয়। তবে স্ত্রীলোকদের ইমাম যদি পুরুষ হয় এবং মুসাফিরদের ইমাম মুকীম হয়, তবে ঐ স্ত্রীলোক ও মুসাফিরদের উপরও তাকবীর ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর তাকবীর ওয়াজিব হবে যে ফরজ নামাজ আদায় করে। সে গ্রাম্য লোক হোক বা শহরী হোক, মুসাফির হোক বা মুকীম হোক, জামাআতের সাথে নামাজ আদায়কারী হোক বা মুনফারিদ হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক। এটা ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফিঈ (র.) এরও অভিমত। তাঁদের দলিল এই যে, তাকবীর ফরজ নামাজের তাবে বা অনুগামী। সুতরাং যে ফরজ নামাজ পড়বে সে-ই তাকবীর পড়বে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল ঐ হাদীস যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, **لَا جُمُعَةَ وَلَا تُسْبِيحَ وَلَا فِطْرَ وَلَا** উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিভাত হল যে, তাকবীরে তাশরীকের জন্য শহর হওয়ার শর্ত। বিশিষ্ট ভাষাবিদ খলীল ইবনে আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশরীক বলা হয় উচ্চৈঃশ্বরে তাকবীর বলাকে। দ্বিতীয় দলিল এই যে, উচ্চৈঃশ্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ অর্থাৎ বিদ'আত। তবে কিছু স্থানে উচ্চৈঃশ্বরে তাকবীর বলাকে শরিয়ত বাদ (استثناء) দিয়েছে। শরিয়তে উচ্চৈঃশ্বরে তাকবীর বলার অনুমতি ঐ সকল সুন্নেতে প্রদান করেছে যেখানে এ সকল শর্ত একত্রিত হয়। অর্থাৎ শহর হওয়া, মোস্তাহাব তরীকায় জামাআত হওয়া, মুকীম হওয়া ইত্যাদি। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীলোকেরা কোনো পুরুষের ইকতিদা করে কিংবা মুসাফির মুকীমের ইকতিদা করে তবে স্ত্রীলোক ও মুসাফিরদেরও উপরোক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব হবে। এ ওয়াজিব হলো অনুগামী হিসাবে। অর্থাৎ ইমাম যিনি মাতবু' (যার আনুগত্য করা হয়) যেহেতু তার উপর তাকবীর ওয়াজিব সেহেতু যিনি তাঁর তাবে তথা অনুগামী হবে তার উপরও তাকবীর ওয়াজিব হবে। যেমন মুকীমের ইকতিদা করার কারণে মুসাফিরের উপর চার রাকআত নামাজ আদায় করা জরুরি হয়ে যায়।

হিদায়া গ্রন্থকার এখানে একটি ঘটনা উল্লেখপূর্বক আমাদেরকে সতর্ক করেছে যে, যদি ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায় তবে মুক্তাদীরা তাকবীর ছাড়বে না; বরং উচ্চৈঃশ্বরে তাকবীর বলে ইমামকেও অবহিত করবে। এর বিপরীতে ইমাম যদি সিজদায়ে সাহব ছেড়ে দেয় তবে মুক্তাদীও তা ছেড়ে দিবে। কারণ হলো, সিজদায়ে সাহব নামাজের মাঝখানে আদায় করা হয়। এ জন্য সিজদায়ে সাহব করা না করার বেলায় ইমামের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। আর তাকবীর নামাজের মাঝখানে আদায় করা হয় না; বরং নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর পড়া হয়। এ জন্য তাকবীর বলার সময় ইমামের বিন্দ্যমান থাকা ওয়াজিব নয় বরং মোস্তাহাব। সুতরাং ইমাম যদি তাকবীর না-ও বলে তবুও মুক্তাদীগণ বলবে। ঘটনাটি হলো ইমাম আবু ইউসুফ (র.) (ইয়াকুব বলেন, একবার আমি লোকদেরকে আরাফার দিন মাগরিবের নামাজ পড়াই। ঘটনাক্রমে আমি তাকবীরে তাশরীক বলতে ভুলে যাই। তখন আমার শিক্ষক মহোদয় ইমাম আবু হানীফা (র.) পেছন থেকে তাকবীর বলে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, তখন আমিও তাকবীর বললাম। উক্ত ঘটনাটি দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মর্যাদা বুঝে আসে। ইমাম সাহেব (র.) তাঁকে ইমাম বানিয়েছেন এবং তাঁর পেছনে ইকতিদা করেছেন।

بَابُ صَلَاةِ الْكُفْرِ

قَالَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَيْنِ كَهَيَاةِ النَّافِلَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) رُكُوعَانِ لَهُ مَارُوتٌ عَائِشَةُ وَلَنَا رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَالُ أَكْشَفُ عَلَى الرِّجَالِ لِقُرْبِهِمْ فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِرِوَايَتِهِ.

পরিচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফ

**অনুবাদ :** ইমাম কদুরী (র.) বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ লাগে তখন ইমাম নফলের অনুরূপ দু'রাকআত নামাজ আদায় করবেন। প্রতি রাকআতে একটি রুকুই হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, (প্রতি রাকআতে) দু'টি রুকু হবে। তাঁর দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। আমাদের দলিল হলো ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। আর যেহেতু (ইমামের সঙ্গে) নৈকট্যের কারণে বিষয়টি পুরুষদের কাছেই অধিকতর স্পষ্ট সেহেতু ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়াযাতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থকথা : ঈদের নামাজ, কুসুফের নামাজ এবং ইস্তিসকার নামাজের মধ্যকার সম্পর্ক (مُنَاسِبَة) এই যে, উক্ত তিন নামাজ দিনের মধ্যে আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করা হয়। তবে এগুলোর মধ্যে ঈদের নামাজ যেহেতু ওয়াজিব আর কুসুফের নামাজ জমহরের মতে সুন্নত আর ইস্তিসকার নামাজ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধপূর্ণ এ জন্য প্রথমে ঈদ, তারপর কুসুফ এবং তারপর ইস্তিসকার নামাজের আলোচনা করা হয়েছে। কুসুফ-এর অর্থ সূর্য কিছুটা কালো বর্ণের প্রতি দর্শিত হওয়া। অর্থাৎ কক্ষ আচ্ছাদিত হওয়া। এর মধ্যে একটি লুগাত (ব্যবহার-বিধি) খুসুফও রয়েছে। ইমাম মুনিযিরী (র.) বলেন, কুসুফ-এর হাদীস উনিশজন রাবী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ كَافٍ -এর সাথে كَسُوفٍ আর কেউ কেউ خَا -এর সাথে خَسُوفٍ বলেছেন। বুঝা গেল শব্দ দুটি সমার্থবোধক (مُرَادِف)। কিংবা كَسُوفٍ শুধু সূর্যের সাথে খাস আর خَسُوفٍ চন্দ্র সূর্য উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যাপক। কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য গ্রহণের বেলায় كَسُوفٍ আর চন্দ্র গ্রহণের বেলায় خَسُوفٍ বলা হয়। এটা হলো ফকীহগণের পরিভাষা। এর সমর্থন আল্লাহ তা'আলার বাণী الْقَمَرُ وَخَسَفَ الْبَصَرُ আয়াতেও বিদ্যমান আছে। কুসুফের নামাজের সবব বা কারণ কুসুফ তথা সূর্য গ্রহণ। তার জন্য এ সকল শর্ত প্রযোজ্য যা অন্যান্য নামাজের জন্য প্রযোজ্য। কুসুফের নামাজ প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মতের একমত রয়েছে, কেউ তা অস্বীকার করেননি।

মাসআলা : যদি সূর্য গ্রহণ লেগে যায়, তবে জুমার ইমাম সাহেব জামে মসজিদ কিংবা ঈদগাহে গিয়ে লোকদেরকে নফলের অনুরূপ দুই রাকআত নামাজ আদায় করবেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে নফল নামাজ আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করা হয় এমনিভাবে কুসুফের নামাজও আযান ও ইকামত ছাড়া আদায় করবেন। এক রাকআতে একটি মাত্র রুকু হবে। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, কুসুফের এক রাকআতের মধ্যে দুই রুকু হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শব্দার্থ হলো,

قَالَتْ خَسِيفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَمَعَ النَّاسُ وَرَأَى كَثِيرًا فَقَرَأَ: ﴿طُوبَى لِمَنْ كَبَّرَ فَنُكِرَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: ﴿



سَوْنَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْفِرَاقَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَثُرَ فَرَقُهُ وَكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْحَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَنشَى عَلَى اللَّهِ بِسْمًا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ نَعْنَى لَا تَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا يَحْيَايَهُ قِيَادًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ -

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পিছনের লোকদেরকে কাতারবন্দী করলেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলে দীর্ঘ কীরাত পড়লেন। অতঃপর তাকবীর বলে লম্বা রুকু করলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ রাকবানা ওয়া লাকাল হামদ বললেন। তারপর তিনি দাড়ােলেন এবং দীর্ঘ কীরাত পড়লেন, তবে এই কীরাত প্রথম কীরাতের তুলনায় ছোট ছিল। তারপর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এই রুকু পূর্বের রুকুর তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ রাকবানা ওয়া লাকাল হামদ বলে মাথা উঠালেন। তারপর সিজদা করলেন এবং দ্বিতীয় রাকআতেও একই আমল করলেন। সুতরাং তিনি চার রাকআত (রুকু) চার সিজদার সাথে পূর্ণ করলেন। তাঁর নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পূর্বের সূর্য পরিকার হয়ে যায়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদেরকে খুতবা বলানলেন এবং আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হামদ ছালা করে ইরশাদ করেন যে, চন্দ্র সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির থেকে দু'টো নিদর্শন। কারো হায়াত-মওতেব কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন তা দেখবে তখন নামাজের দিকে নৌড়িয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসুফের নামাজের মধ্যে এক রাকআতে দুই সিজদা করেছেন। আমাদের দলিল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

قَالَ ابْنُ كَسْبٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكِدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ জমানায় একবার সূর্যগ্রহণ লাগে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘ সময় দাড়ােলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি রুকু করবেন না। অতঃপর তিনি এ পরিমাণ সময় রুকু করলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মাথা উঠাবেন না। অতঃপর মাথা উঠালেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদায় যাবেন না। অতঃপর তিনি সিজদায় গেলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না। তারপর তিনি মাথা উঠালেন। দ্বিতীয় সিজদা করার সম্ভাবনা মনে হচ্ছিল না। তারপর তিনি সিজদা করলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি মাথা উঠাবেন না, কিন্তু তিনি মাথা উঠালেন। একই আমল তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও করলেন। উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাকআতে একটি মাত্র রুকু আদায় করেছেন, যদিও রুকু ও সিজদা অনেক দীর্ঘ ছিল।

এখন আয়েশা (রা.)-এর হাদীস আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাদীসের অগ্রাধিকার হবে। কেননা পুরুষ যেহেতু ইমামের অধিক নিকটে তাই তার কাছে ইমামের অবস্থা বেশি প্রকাশিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত অনেক দীর্ঘ রুকু করেছেন। যার কারণে প্রথম কাতারের লোকেরা ধারণা করে রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে ফেলে ছিলেন। পরে যারা প্রথম কাতারের পিছনে ছিল তারাও তাদেরকে দেখে মাথা উঠিয়ে নেন। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এখনো রুকুতে আছেন তখন তারা আবার রুকুতে চলে গেলেন। এবং যারা তাদের পিছনে ছিলেন তারাও দ্বিতীয়বার রুকুতে চলে যান। এখন প্রথম কাতারের পিছনের লোকেরা ডালেলেন যে, তিনি দুই বার রুকু করেছেন—এটাকেই তারা রিওয়াযাত করতে শুরু করে দেন। এর দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, হযরত আয়েশা (রা.) তো একেবারেই কাতারের পিছনে মহিলাদের কাতারে ছিলেন। সুতরাং বিধমতি তাঁর নিকট অশেষ (مشتبه) হওয়া একেবারেই সাধারণ ব্যাপার। তাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস কিভাবে দলিল হতে পারে?

وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَ يَجْهَرُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَمَّا التَّطْوِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ فَبَيَّانُ الْإِفْضَالِ وَيُخَفِّفُ إِنْ شَاءَ لِأَنَّ الْمَسْنُونِ اسْتِيعَابُ الْوَقْتِ بِالصَّلَاةِ وَالِدُّعَاءِ فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدُهُمَا طَوَّلَ الْآخَرَ وَأَمَّا الْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ فَلَهُمَا رَوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا جَهَرَ فِيهَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَوَايَةٌ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ وَالتَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ وَهِيَ عَجْمَاءُ.

অনুবাদ : উভয় রাকআতে (ইমাম) কিরাআত দীর্ঘ করবেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে (ইমাম) নীরবে কিরাআত পড়বেন। আর সাহেবাইনের মতে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। কিরাআত দীর্ঘ হওয়ার বক্তব্যটি উত্তম হিসাবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছা করলে ইমাম কিরাআত সংক্ষিপ্তও করতে পারেন। কেননা, সুন্নত হলো গ্রহণের সময়টিকে নামাজ ও দোয়ার দ্বারা পরি ব্যাধ রাখা। সুতরাং একটিকে সংক্ষিপ্ত করলে অন্যটিকে দীর্ঘ করবে। (তবে) নীরবে এবং উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার ঐ কথা বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস ও সামু'রা ইবনে জুন্দুব (রা.)-এর রিওয়ায়াত। আর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কেন হবে না? এটাতো দিনের নামাজ। আর দিনের নামাজ হলো নিঃশব্দ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কুসুফের উভয় রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পড়বে। যেমন, কোনো কোনো হাদীসের মধ্যে প্রথম রাকআত সূরায় আলে ইমরানের সমপরিমাণ পড়ার বর্ণিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে না নীরবে পড়বে? ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, কুসুফের নামাজে কিরাআত নীরবে পড়বে। এরই প্রবক্তা ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং জমহুরে ফুকাহা। সাহেবাইন (র.) বলেন, উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। ইমাম তাহাবী (র.)ও এটাকে গ্রহণ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুরূপ রয়েছে। এ সূরতে তরফাইন তথা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) নীরবে কিরাআত পড়ার পক্ষে হলেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার পক্ষে থাকলেন। মোটকথা, এখানে দু'টি জিনিস রয়েছে— এক. দীর্ঘ কিরাআত পড়া দুই. কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে বা নীরবে পড়া। কিরাআত দীর্ঘ পড়াতো উত্তম। কেননা এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকআতে সূরায় বাকারার সমপরিমাণ আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায় আলে ইমরানের সমপরিমাণ পাঠাতেন। সুতরাং দীর্ঘ কিরাআত পড়ার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ হয়। ইচ্ছা করলে (ইমাম) কিরাআত সংক্ষিপ্তও করতে পারবেন। কেননা সুন্নত তো হলো গ্রহণের সময়টিকে নামাজ ও দোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখা। সুতরাং একটিকে যদি সংক্ষেপ করা হয় তখন অন্যটিকে দীর্ঘ করবে।

আল্লাহা ইবনে আয়হাস (র.) বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ السَّنَةَ الطَّيِّبَةَ وَالْمَدْنُوبَ مُجَرَّدَ اسْتِيعَابِ الْوَقْتِ .

প্রকৃত হক হলো, কিরাআত দীর্ঘ করা সুন্নত আর কুসূফের সময়টিকে পরিপূর্ণ করে রাখা মোস্তাহাব। যেমন- হযরত মুণীরা ইবনে শু'বা (র.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

فَإِذَا رَأَيْتُمُهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَخْلُيَ .

অতঃপর তোমরা যখন তা দেখবে (কুসূফ ইত্যাদিকে) তবে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে এবং নামাজ পড়বে যাতে সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মধ্যে সূর্য পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত নামাজকে দীর্ঘ করতে বলা হয়েছে আর এটা তখনই হবে যখন কিরাআত দীর্ঘ করা হবে। সুতরাং বুঝা গেল কিরাআত দীর্ঘ করা সুন্নত।

উল্লেখ্যের কিরাআত পড়ার ব্যাপারে সাহেবাইন কিংবা শুধু ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস-

قَالَتْ جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَائَتِهِ .

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসূফের নামাজে উল্লেখ্যের কিরাআত পড়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু হানীফা (র.) কিংবা তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস এবং সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসদ্বয়। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের শব্দাবলি হলো,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْكُسُوفَ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا مِنَ الْقِرَاءَةِ .

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুসূফের নামাজ পড়েছি কিন্তু আমি তাঁর কিরাআত থেকে একটি অক্ষরও শুনিনি। এ হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস হলো সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস

صَلَّى يَسًا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لَأَسْمَعَ بِهِ صَوْتًا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুসূফের নামাজ পড়িয়েছেন আমরা তাঁর কিরাআতের কোনো শব্দ শুনিনি। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ্যের ও নীরবে কিরাআত পড়ার বিরোধপূর্ণ হাদীসদ্বয়ের সমাধান এভাবে করেছেন যে, ইবনে আব্বাস এবং সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীসের অগ্রাধিকার হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের উপর রয়েছে। আর অগ্রাধিকারের কারণ হলো, নামাজের মধ্যে পুরুষ যেহেতু ইমামের নিকটবর্তী (قريب) এ জন্য শ্রীলোকদের তুলনায় তাদের অবস্থা তাদের নিকট অধিক স্পষ্ট হবে। তাই ইমামের নামাজের প্রকৃত অবস্থা এবং কিরাআত উল্লেখ্যের আর নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের কথাই অগ্রাধিকার যোগ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইমাম সাহেবের মাযহাবকে অধিক শক্তিশালী করার জন্য দৃঢ়তার সাথে বলছেন যে, কুসূফের নামাজের মধ্যে নীরবে কিরাআত কিভাবে হবে না? অথচ কুসূফের নামাজ দিনের নামাজ। আর দিনের নামাজের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, صَلُّوا الشَّامَ عَجَا, দিনের নামাজ বোঝা অর্থাৎ দিনের নামাজগুলোর মধ্যে কিরাআত নিঃশব্দে পড়া হবে, সশব্দে পড়া হবে না।

وَيَدْعُو بَعْدَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَفْرَاجِ شَيْئًا  
فَارْغَبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ وَالسُّنَّةِ فِي الْأَدْعِيَةِ تَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلَاةِ وَبُصْلَى بِهِمْ  
الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ لَمْ يَخْضَرْ صَلَّى النَّاسُ فُرَادَى تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ  
وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ لَتَعْدُرَ الْاجْتِمَاعَ فِي اللَّيْلِ أَوْ لِيَخُوفِ الْفِتْنَةِ وَإِنَّمَا  
يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَالِ فَافْزَعُوا إِلَى  
الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ .

অনুবাদ : নামাজের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা এ ধরনের ভয়াবহ কোনো অবস্থা দেখতে পাবে, তখন তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ অভিমুখী হবে। আর দোয়াসমূহের ক্ষেত্রে সুনত হল তা নামাজের পরে হওয়া। যে ইমাম জুমার নামাজ পড়ান, তিনিই কুসুফের নামাজ পড়াবেন। তিনি উপস্থিত না থাকলে লোকেরা একা একা নামাজ আদায় করবে। (ইমামতির জন্য কে অগ্রবর্তী হবে, এই) ফিতনা হতে বাঁচার জন্য। চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে জামাআত নেই। কেননা রাত্রিকালে সমবেত হওয়া কষ্টকর। কিংবা ফিতনা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। তাই প্রত্যেকে একা একা নামাজ আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা এ ধরনের ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবে তখন তোমরা নামাজের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সূর্য গ্রহণের নামাজে কোনো খুতবা নেই। কেননা তা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(গ্রন্থকার বলেন,) কুসুফের নামাজ আদায়ের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া করবে। কিংবা দাড়ায়ে করবে। কিংবা লোকদের দিকে মুখ করে দোয়া করবে। লোকেরা কিংবামুখী হয়ে বসে থাকবে আর ইমামের দোয়ার সময় আমীন আমীন বলতে থাকবে। দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী-

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَفْرَاجِ شَيْئًا فَارْغَبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ .

গ্রন্থকার (র.) বলেন, দোয়াসমূহের মধ্যে সুনত হলো নামাজের পরে হওয়া। হযরত আবু উমামা সূত্রে বর্ণিত আছে যে,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ধরনের দোয়া অধিক মাকবুল হয়ে থাকে? তিনি বলেন, রাতের শেষ মধ্যভাগের আর ফরজ নামাজের পরের দোয়া। উক্ত হাদীস দ্বারা শুধু ফরজ নামাজের পরের দোয়া সুনত বলে প্রমাণিত হলো। তা ছাড়া হযরত মুগীরা ইবনে ওবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করতেন।

قَوْلُهُ وَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ : উক্ত ইবারতের মাসআলা হলো, কুসুফের নামাজে এ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো হবে যিনি লোকদেরকে জুমা এবং ঈদাইনের নামাজ পড়ান। আর যদি জুমার ইমাম উপস্থিত না থাকেন তবে লোকেরা একাকী নামাজ আদায় করবে। কেননা এতে ফিতনার সজাবনা নেই। তবে জামাআতের সুরতে ফিতনার প্রবল সজাবনা রয়েছে, কেননা প্রত্যেকেই তখন ইমাম হতে চাইবে কিংবা নিজেদের চাহিদা মতাবিক ইমাম বানাতে চাইবে। এ জন্য এ অবস্থায় উত্তম এটাই যে, একা একা কুসুফের নামাজ আদায় করবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي حُسُوبِ الْقَمَرِ الْخ : মাসআলা : চন্দ্র গ্রহণের সময় নামাজের কোনো জামাআত নেই। কেননা প্রথমত রাত্রিকালে লোকদেরকে একত্রিত করা কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ রাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। তাই প্রত্যেক লোক একা একা নামাজ আদায় করবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী-

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَالِ فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

দলিল এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে জামাআতের কোনো কথা উল্লেখ নেই। আর আসল হলো জামাআত না হওয়া। এ জন্য বলা হয়েছে যে, চন্দ্র গ্রহণের মধ্যে কোনো জামাআত নেই। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ -এর মধ্যে امر -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর امر ওয়াজিব হওয়াকে চায়। তাই চন্দ্র গ্রহণের নামাজকে ওয়াজিব বলা সমীচীন হবে? এর জওয়াব এই যে, চন্দ্র গ্রহণের নামাজ যেহেতু ইসলামে ফরজ ও ওয়াজিব সমূহের মধ্যে নয় বরং তা গ্রহণের কারণে পড়া হয় এ জন্য চন্দ্র গ্রহণের নামাজ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়েছেন তাই সন্নত হবে। আর হাদীসের মধ্যে امر -এর সীগাহ نَدْبٌ তথা মোস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, উজ্জ্বের জন্য নয়।

ইমাম আবুল হাসান কুদূরী (র.) বলেন, কুসূফ ও খুসূকের নামাজের মধ্যে কোনো খুতবা নেই। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সালামের পর দুই ঈদের মতো দু'টি খুতবা রয়েছে। দলিলের ক্ষেত্রে তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস পেশ করেছেন যে,

إِنَّهَا قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .

আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, খুতবা দু'টি জিনিসের একটির জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। হয়তো খুতবা নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত। যেমন জুমার মধ্যে। কিংবা আহকামের তালীম দেওয়ার জন্যে যেমন দুই ঈদের নামাজের মধ্যে। কুসূফের নামাজের মধ্যে এই দুইটির একটিও নেই। তাই কুসূফের নামাজের জন্য খুতবা হবে না। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় সূর্য গ্রহণ কারণে লোকদের এ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কলিজার টুকরা হযরত ইব্রাহীমের বিয়োগের কারণে সংঘটিত হয়েছে। তাই কুসূফের নামাজের পর খুতবা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ধারণাকে দূরীভূত করলেন। আর বললেন

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ .

চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনাবলির দু'টো নিদর্শন, কারো জীবন মরণের কারণে গ্রহণ হয় না। কিফায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা خطب -এর অর্থ হলো দোয়া। কেননা দোয়াকেও খুতবা বলা হয়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, খুতবার হাদীস প্রসিদ্ধির সাথে বর্ণিত নয় তাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দলিল হিসাবে যোগ্য হবে না।

## بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ صَلَوةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا جَازَ وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (الاية) وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَلَمْ تَرَوْا عَنْهُ الصَّلَوةُ وَقَالَ يَصَلِّي الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِمَا رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ النِّعْدِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) قُلْنَا فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَخَدَّ وَبَجَهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ اِغْتِبَارًا بِصَلَاةِ النِّعْدِ ثُمَّ بَخَطَبُ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ ثُمَّ هِيَ كَخُطْبَةِ النِّعْدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ .

### পরিচ্ছেদ : ইস্তিস্কা-এর নামাজ

অনুবাদ : ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ইস্তিস্কা-এর জন্য জামাআতসহ নামাজ আদায় করা সুন্নত নয়। লোকেরা যদি একা একা নামাজ পড়ে নেয় তবে তাও জায়েজ। আসলে ইস্তিস্কা হলো দোয়া ও ইস্তিগ্ফার। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ ইস্তিস্কা করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে নামাজ আদায় করা বর্ণিত হয়নি। সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমাম দুই রাকআত নামাজ আদায় করবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ দুই রাকআত ইস্তিস্কার নামাজ আদায় করেছেন ঈদের নামাজের মতো। ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা বর্ণনা করেছেন। আমাদের বক্তব্য হলো, তিনি একবার নামাজ আদায় করেছেন, আবার কখনো পড়েননি। সুতরাং এটি সুন্নত নয়। মাযসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় রাকআতে কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে, ঈদের নামাজের উপর কিয়াস করে। অতঃপর (ইমাম) খুত্বা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ খুত্বা দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা হবে ঈদের খুত্বার মতো। (দুই খুত্বা বিশিষ্ট) আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে খুত্বা একটিই। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে (ইস্তিস্কার জন্য) কোনো খুত্বা নেই। কেননা খুত্বা হলো জামাআতের অনুগামী। আর তাঁর মতে (ইস্তিস্কার নামাজে) জামাআত নেই।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**পূর্বকথা :** গ্রন্থকার (র.) : **بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِغْفَارِ** বলেননি। যেমনটি তিনি পিছনের **بَاب** গুলোতে বলেছেন কারণ হলে। ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে এর মধ্যে নামাজ সুলত নয়। এজন্য শিরোনামে **صَلَاة** শব্দ ব্যবহার করেননি। ইস্তিসকার অর্থ হলো- পানি, চাওয়া। উল্লেখ্য যে, ইস্তিস্কা এমন স্থানে হয় যেখানে নদ-নদী, খাল-বিল এবং কৃপ ইত্যাদি না থাকে- যার থেকে নিজে পানি পান করতে কিংবা পশু-পাখিকে পানি পান করাবে। কিংবা এগুলো থাকবে তবে তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট হবে না। কেননা এ সকল জিনিস যদি যথেষ্ট পরিমাণ থাকে তবে লোকেরা ইস্তিসকার জন্য বের হবে না; কেননা, ইস্তিস্কা অধিক জরুরতের সময় হয়ে থাকে। অতঃপর যখন ইস্তিস্কার ইরাদা করা হবে তখন মোস্তাহাব হলো ইমাম তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত রোজা রাখার আর তওবা করার জন্য বলবেন অতঃপর চতুর্থ দিন তাদেরকে নিয়ে মাঠে-ময়দানে বের হয়ে যাবেন।

এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইস্তিস্কা কি জিনিস? ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ইস্তিস্কা দোয়া ও ইস্তিগ্ফারের নাম। ইস্তিস্কার মধ্যে জামাআতের সাথে কোনো নামাজ সুলত নয়। হ্যাঁ যদি একা একা নামাজ পড়া হয়, তবে তা জায়েজ হবে। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا .

তখন আমি বললাম তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। দলিল এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করাকে ইস্তিগ্ফারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, নামাজের সাথে করেননি। এতে বুঝা গেল, ইস্তিসকার মধ্যে আসল হলো দোয়া ও ইস্তিগ্ফার। দ্বিতীয় দলিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিস্কা করেছেন কিন্তু তাঁর থেকে নামাজ আদায় করার বর্ণনা নেই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَنْوَالُ رَأَيْتُكَ السَّبِيلُ فَادْعَ اللَّهَ يَغْفِرْنَا فَقَالَ : قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْنَا . (شرح نفايه).

এক ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করছিলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, রাত্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যাতে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত উপরে উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। - (শরহে নিকায়া) উক্ত হাদীসের মধ্যেও ইস্তিস্কার মধ্যে দোয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, নামাজের নয়। তা ছাড়া এ-ও সাবিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) ইস্তিস্কা করেছেন কিন্তু নামাজ পড়েননি।

**قَوْلُهُ وَقَالَ يُصَلِّي الْإِمَامُ رُكْعَتَيْنِ الْخ** : ইস্তিসকার মধ্যে সাহেবাইনের মাযহাব এই যে, ইমাম লোকদেরকে দু' রাকআত নামাজ পড়াবেন। এটা ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফি'ঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর ও মত। দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস—

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَبْذِلًا مَوَاضِعًا مَضْرِعًا حَتَّى آتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالْتَفَتِ إِلَى الْكَبِيرِ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْيَمِينِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিসয়ের সাথে বের হয়ে ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি খুত্বা পড়েননি। দোয়া আর কান্না-কাটির মধ্যেই লিপ্ত ছিলেন। তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়লেন যেমনটি দুই ঈদে পড়া হয়। দ্বিতীয় দলিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ وَحَوْلَ رِدَائِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا  
إِسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) :

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে নিয়ে ইস্তিস্কার জন্য বের হলেন, তারপর তাদেরকে দুই রাকআত নামাজ পড়ালেন এবং নিজের চাদরকে উলটালেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন এবং ইস্তিস্কা করলেন এবং কিবলামুখী হলেন। উভয় রিওয়াযাত দ্বারা ইস্তিস্কার জন্য নামাজ পড়া প্রমাণিত হলো। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, তিনি ইস্তিস্কার মধ্যে কখনো নামাজ পড়েছেন আবার কখনো বর্জন করেছেন। এ জন্য এর দ্বারা ইস্তিস্কার নামাজ জায়েজ হওয়াতো প্রমাণিত হয়, কিন্তু সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হয় না। উল্লেখ্য যে, জায়েজ হওয়ার কথা আমরাও অস্বীকার করি না; বরং কথাতো হলো ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। আর সুন্নত তো হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন। এ স্থানে গ্রন্থকারের ইবারতের উপর এ প্রশ্ন হয় যে, গ্রন্থকার প্রথমে বলেছেন لَمْ تَرَوْهُ عَنْهُ الصَّلَاةُ এবং পরে বলেছেন لَا رَوَى। উল্লেখ্য যে, উভয় ইবারত বিরোধপূর্ণ। এর জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইস্তিস্কার নামাজের ক্ষেত্রে রিওয়াযাত যেহেতু খুবই কম, তাই النَّادِرُ كَالْمَعْدُومِ-এর কায়দার ভিত্তিতে ঐ -কে -مَرُوءٍ ধরা হয়েছে। সুতরাং এখন আর কোনো বিরোধ থাকল না। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নত হওয়া শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সঙ্গে আছেন। মাবসূত নামক গ্রন্থেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَهْرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ الخ বলেন, ঈদের নামাজের মতো ইস্তিস্কার উভয় রাকআতেও উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। তারপর খুত্বা পড়বে! কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে খুত্বা পড়ার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঈদের ন্যায় ইস্তিস্কারও দুটো খুত্বা রয়েছে। উভয় খুত্বার মাঝখানে বসে ব্যবধান করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে একটি-ই খুত্বা। জমিনের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে ফিরে তা পড়বে।



وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالْذُّعَاءِ لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِدَائِهِ وَفَقِيلَ رِدَاءُ لِمَا رَوَيْنَا قَالَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحا) أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَقْبَلُ رِدَاءَهُ لِأَنَّهُ دَعَاءٌ فَيُعْتَمَرُ بِسَائِرِ الْأَعْيَةِ وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاوُلًا وَلَا يَقْبَلُ الْقَوْمُ الْأَوْتَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ وَلَا يَحْضُرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ الْأَسْيَفَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَإِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ -

**অনুবাদ:** দোয়ার সময় কিবলামুখী হবে। কেননা হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ কিবলামুখী হয়েছেন এবং আপন চাদর উলটিয়েছেন। আর ইমাম সাহেব আপন চাদর উলটাবেন। এর দলিল আমাদের বর্ণিত হাদীস। গ্রন্থকার বলেন, এ হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে চাদর উলটাবে না। কেননা এটা-তো দোয়া। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথেই একে বিবেচনা করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা ছিল সুলক্ষণ গ্রহণ হিসেবে। তবে মোকতাদিরা তাদের চাদর উলটাবে না। কেননা এমন বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তা করার আদেশ করেছেন। জিম্মী অধিবাসীগণ ইস্তিস্কার নামাজে হাজির হবে না। কেননা ইস্তিস্কা হলো রহমত নাজিলের প্রার্থনা করার জন্য, অথচ তাদের উপর তো গজব নাজিল হওয়ার কথা।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্তিস্কার দোয়ার মধ্যে মুস্তাহাব হলো, কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিবলামুখী হওয়া আর চাদর উলটানোর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, নিজের চাদর উলটাবে। তার তরীকা হলো, চাদর যদি চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হয় তবে উপরের অংশ নিচের দিকে আর নিচের অংশ উপরের দিকে করবে। আর যদি চাদর গোলাকার হয় যেমন জুব্বা। তবে ডান অংশ বাম দিকে আর বাম অংশ ডান দিকে করবে। চাদর উলটানোর উপর দলিল উপরে বর্ণিত রিওয়াযগুলো। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, চাদর উলটানোর হুকুম হলো ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)ও অনুরূপ বলেন, আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো, চাদর না উলটানো। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মাযহাবও। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, এটা-তো হলো দোয়া। সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সাথেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। আর অন্যান্য দোয়ার মধ্যে চাদর উলটানো নেই, এজন্য ইস্তিস্কার দোয়ার মধ্যেও চাদর উলটানো হবে না। ঐ রিওয়াযের জওয়াব যার মধ্যে চাদর উলটানোর কথা রয়েছে এই যে, এটা-তো সুলক্ষণ হিসাবে ছিল। কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে আকাশের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া চাদর উলটানোর সময় জানানো হয়েছিল। এ জন্য তিনি চাদর উলটিয়ে ছিলেন। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুকতাদীরা তাদের চাদর উলটাতে না। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন চাদর উলটিয়েছিলেন তখন তাকে দেখে অন্যান্যরাও চাদর উলটিয়েছিলেন তিনি তাদেরকে বারণ করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুকতাদীরাও চাদর উলটাতেও এর জওয়াব এই যে, ঐ স্থানে লোকদের চাদর উলটানো এমন ছিল যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজের হালাতে জুতা খুলতে দেখে সাহাবায়ে কেরামও নিজের জুতা খুলে ফেলেছিলেন। সেখানে জুতা খোলা যেমনভাবে দলিলের পর্যায়ে ছিল না এখানেও চাদর উলটানো দলিলের পর্যায়ে হবে না। আর তিনি তাদেরকে এ কারণে বারণ করেননি যে, চাদর উলটানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম নয় বরং আলাচনা তো হলো তা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ইস্তিস্কার মধ্যে জিম্মী অধিবাসীগণ হাজির হবে না। কেননা মুসলমানদের বের হওয়া আত্মাহর রহমত নাজিলের দোয়ার জন্য। আর কাফিরদের ব্যাপারে আত্মাহ তা'আলা বলেছেন وَدَعَا الْكَافِرِينَ إِلَى الْإِنْفِ خَلِيل কাকিরদের দোয়া হলো ক্ষতি ও অনিষ্ট। ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, জিম্মীদেরকে ইস্তিস্কার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। যদি তারা বের হয়ে পড়ে তবে নিষেধও করা যাবে না। তবে এ কথা লক্ষ্যীয় যে, জিম্মীরা যাতে কোনো দিন একা একা বের না হয়; বরং যখন তারা বের হবে তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাদের সাথে বের হবে। কেননা ইস্তিস্কা দ্বারা রিজিক চাওয়া উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে আর আত্মাহ তা'আলা মু'মিন কাকির সকলকে রিজিক দান করে থাকেন। সুতরাং কাকিররা যদি একা একা বের হয় আর আত্মাহর কাছে দোয়া করে এবং ঘটনাক্রমে বৃষ্টি হয়ে যায় তবে তা বড়ই ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

## بَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ

إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً عَلَى وَجْهِ الْعُدُوِّ وَطَائِفَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجْهِ الْعُدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشْهَدُ وَسَلِّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ الْعُدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَصَلُّوا رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَخَدَانَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ لِأَنَّهُمْ لَاحِقُونَ وَتَشْهَدُوا وَسَلِّمُوا وَمَضُوا إِلَى وَجْهِ الْعُدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى وَصَلُّوا رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ لِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ وَتَشْهَدُوا وَسَلِّمُوا وَالْأَصْلُ فِيهِ رَوَايَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى صَلَوةَ الْخَوْفِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي قُلْنَا وَأَبُو يُوسُفَ وَإِنْ أَنْكَرَ شَرْعِيَّتَهَا زَمَانًا فَهُوَ مُحْتَجٌّ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا .

### পরিচ্ছেদ : ভয়কালীন নামাজ

অনুবাদ : যখন (শত্রুর) ভয় তীব্র হয়, তখন ইমাম লোকদেরকে দুই ভাগে ভাগ করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি রাখবেন আর দ্বিতীয় দলকে নিজের পিছনে দাঁড় করাবেন। এরপর এই দলকে নিয়ে এক রাক'আত ও দুই সিজদা আদায় করবেন। যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলবেন, তখন এই দলটি শত্রুর সামনে অবস্থান নিতে চলে যাবে। এবং (শত্রুর মুখোমুখী অবস্থানকারী) ঐ দলটি চলে আসবে। আর ইমাম তাদের নিয়ে এক রাক'আত ও দুই সিজদা আদায় করবেন এবং তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু পিছনে ইকতিদাকারী দলটি সালাম ফিরাবে না; বরং শত্রুর সামনে (অবস্থান গ্রহণ করতে) চলে যাবে। এবং প্রথম দলটি এসে একা একা কিরাআত ছাড়া এক রাক'আত ও দুই সিজদা আদায় করবে। (কিরাআত না পড়ার) কারণ এই যে, তারা হলো "লাহিক" আর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুখোমুখী চলে যাবে। আর অপর দলটি ফিরে এসে কিরাআতসহ এক রাক'আত ও দুই সিজদা আদায় করবে। কেননা তারা হলো মাসবুক। (আর মাসবুকের উপর কিরাআত পড়া ওয়াজিব) এবং তারা তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এ বিষয়ে মূল হলো, ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যে, নবী করীম ﷺ উপরে বর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামাজ আদায় করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) যদিও আমাদের জমা'নায় এর শরিয়ত সম্মত হওয়া অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতে দলিল রয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীস।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**ভূমিকা :** ইস্তিসকার আর ভয়কালীন নামাজের মধ্যকার সম্পর্ক এই যে, উভয়টির প্রবর্তন ভয়ের আশংকার কারণে হয়েছে। তবে এতটুকুন ব্যবধান রয়েছে যে, ইস্তিসকার মধ্যে প্রতিবন্ধক তথা বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া আসমানী এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে। আর ভয়কালীন নামাজের প্রতিবন্ধক হলো ইখতিয়ারী তথা ইচ্ছাকৃতভাবে। যেমন, যুদ্ধ যা হওয়ার কারণ হলো কাফিরদের কুফর আর জালিমদের জুলুম। সুতরাং যেহেতু গায়রে ইখতিয়ারী তথা অনিচ্ছাকৃত কাজগুলো শক্তিশালী হয় এজন্য ইস্তিসকার আলোচনা অগ্রে আনা হয়েছে।

ইমাম কুদুরীর ইবারত **اِذَا دَخَرَا** বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য তীব্র ভয় হওয়া শর্ত। অথচ আম মাশায়িখের মতে তীব্র ভয় হওয়া শর্ত নয়; বরং ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার জন্য শ্রফের নিকটবর্তী হওয়াই যথেষ্ট। এ কারণেই মাবসূত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু লোকের মতে খাওফ (خوف) দ্বারা প্রকৃত (حقيقي) খাওফ মুরাদ নয়; বরং শ্রফের উপস্থিত বা হাজির হওয়া মুরাদ। সুতরাং শ্রফ বিদ্যমান থাকাকে ভয়ের স্থানান্তরিত ধরা হয়েছে। যেমন শুধু সফর কষ্ট-ক্লেশের স্থানান্তরিত হয়ে নামাজ কিংবা রোজার কৃশসতের কারণ হয়ে থাকে।

ভয়কালীন নামাজ আদায়ের পদ্ধতি এই যে, এ সময়কার ইমাম লোকদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবেন। একদলকে শ্রফের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন আর দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত নামাজ পড়াবেন। যখন ইমাম এক রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলবেন তখন এই দল পায়ে হেঁটে শ্রফের মোকাবেলায় চলে যাবে। আর যে দল শ্রফের মুখোমুখি ছিল তারা এসে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে এক রাকআত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু এই লোকেরা সালাম ফিরাবে না বরং শ্রফের সামনে চলে যাবে। এখন প্রথম দল এসে এক রাকআত একা একা আদায় করবে। এই রাকআতটি কিরাআত ছাড়া হবে। কেননা এরা তাহরীমা দ্বারা ইমামের সাথে শরিক হওয়ার কারণে “লাহিক”। আর লাহিকের উপর কিরাআত নেই। এই দলের নামাজ পূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং এরা সালাম ফিরিয়ে শ্রফের সামনে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে তাদের এক রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তাদের এই রাকআত কিরাআত সহ হবে। কেননা এরা প্রথম রাকআতে ইমামের সাথে শরিক না থাকার কারণে মাসবুক। আর মাসবুকের উপর কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এ জন্য এরা কিরাআত পড়বে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ভয়কালীন নামাজের মধ্যে আসল হল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত-যার শব্দাবলি নিম্নরূপ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوَةُ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا فِي مَقَائِمِهِمْ وَاسْتَقْبَلُوا هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَوْلِيكَ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ وَرَمَعَ أَوْلِيكَ إِلَى مَقَائِمِهِمْ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয়কালীন নামাজ পড়িয়েছেন। একদল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় দল শ্রফের সামনে দাঁড়িয়েছে। তিনি তাদেরকে এক রাকআত নামাজ পড়ালেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে এদের স্থানে দাঁড়িয়েছে। আর (তারা) শ্রফের সামনে চলে গেছে। তিনি ﷺ এদেরকেও এক রাকআত নামাজ পড়ালেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর তারা (প্রথম দল) একা একা এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরালা এবং গিয়ে শ্রফের সামনে দাঁড়াল। আর তারা (দ্বিতীয় দল) এদের স্থানে এসে দাঁড়াল এবং একা একা এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরালা।

ইনায়্যা গ্রন্থকার লিখেছেন যে, ভয়কালীন নামাজের উপরোক্ত পদ্ধতি তখন হবে যখন ইমাম মাত্র একজন থাকে এবং তার পিছনে দাঁড়া অন্য ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে তারা রাজি না। কিন্তু যদি ইমাম একাধিক হয় এবং তাদের ব্যাপারে কোনো কোনো মতবিরোধও নেই। তবে উত্তম হলো একজন ইমাম একদলকে পূর্ণ নামাজ পড়াবেন। এবং এদেরকে শ্রফের মোকাবেলায় দাঁড় করাবেন। আর দ্বিতীয় দল যারা শ্রফের সামনে ছিল তাদের মধ্য থেকে একজনকে বলা হবে, সে যাতে তাদেরকে পূর্ণ নামাজ পড়িয়ে দেয়।

হিদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য মতে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনকে অস্বীকার করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) প্রাথমিক অবস্থায় তরফাইনের মতো ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন; পরে তিনি তার মতে থেকে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন, ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তন রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়াতের সাথে খান দলিল হলো, ভয়কালীন নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَأَذًا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ**, যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে তখন তাদেরকে নামাজ পড়িয়ে দিবে। উক্ত আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয়কালীন নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যখন তিনি ইমাম হবেন তখন প্রত্যেক দল তাঁর পিছনে নামাজ পড়ে ফজিলত অর্জন করার চেষ্টা করবে। তার ওফাতের পর উক্ত ঝগড়া দূর হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দল আলাদা ইমামের পিছনে পূর্ণ নামাজ পড়ার শক্তি রাখে। তার ওফাতের পর আর আসা- যাওয়ার করে এভাবে এক এক রাক'আত আদায় করা জায়েজ হবে না, হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রিওয়ায়াত ইমাম আবু ইউসুফের বিপরীতে দলিল। কেননা ইবনে মাসউদের রিওয়ায়াত উপরে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভয়কালীন নামাজ আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু আমি বলি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তিত হওয়ার কথা কোথায় অস্বীকার করেন? ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তো তার জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের প্রবক্তা তবে ওফাতের পরের প্রবক্তা নয়। তাই যেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনের প্রবক্তা সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভয়কালীন নামাজ পড়ানো ইমাম আবু ইউসুফের বিপরীতে কিভাবে দলিল হবে? এর জওয়াব এই যে, ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত ইবারতের দিক থেকে **(من حيث العبارة)** যদিও ইমাম আবু ইউসুফের বিপরীতে দলিল নয় কিন্তু দালালাতের দিক থেকে **(من حيث الدلالة)** দলিল। আর তা এভাবে যে, ভয়কালীন নামাজের সব বা কারণ হলো খাওফ বা ভয়। আর ভয় যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ছিল এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরও আছে। সুতরাং যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় ভয়ের কারণে ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তন ছিল একই কারণে তাঁর ওফাতের পরও তা **شروع** থাকবে। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরামের সালাতুল খাওফ পড়ার বর্ণনা রয়েছে। যেমন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), আবু মুসা আশ'আরী (রা.) ইস্ফাহানে ভয়কালীন নামাজ পড়িয়েছেন। তা ছাড়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাবরিস্তানে অগ্নিপূজকদের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাঁর সাথে হাসান ইবনে আলী (রা.), হুযায়ফা ইবনে ইসহাক (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমরুবনুল আস (রা.) ছিলেন। সাঈদ ইবনে আবিল আস (রা.) তাদেরকে ভয়কালীন নামাজ পড়িয়ে দিলেন কেউ তা অস্বীকার করেননি। তাদের এই অস্বীকার না করা ইজমা-এর স্থলে হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ভয়কালীন নামাজ জায়েজ হওয়ার উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হওয়ার পর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর ভয়কালীন নামাজের প্রবর্তনকে অস্বীকার করাকে ভাল মনে হয় না।

فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكَعَتَيْنِ وَبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَتَيْنِ لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالطَّائِفَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَبُصِّلَى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكَعَةً وَاحِدَةً لَأَن تَنْصِيفَ الرُّكَعَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى أُولَى يَحْكُمُ السَّبْقُ لَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَنَّهُ ﷺ وَالِهُ وَسَلَّمَ شَغَلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ يَوْمِ الْخُنْدَقِ وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا -

অনুবাদ : ইমাম যদি মুকীম হোন তবে প্রথম দলটির সঙ্গে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলটির সঙ্গেও দুই রাকআত পড়বেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজ উভয় দলের সঙ্গে দুই দুই রাকআত করে পড়েছেন। মাগরিবের নামাজে ইমাম প্রথম দলের সঙ্গে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলের সঙ্গে এক রাকআত পড়বেন। কেননা এক রাকআতকে ভাগ করা সম্ভব নয়। তাই অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে প্রথম দলের সাথে সেটা আদায় করাই উত্তম। নামাজের অবস্থায় তারা লড়াই করবে না। যদি করে তবে তাদের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেননি। যদি লড়াই করা অবস্থায়ও নামাজ আদায় করা জায়েজ হতো, তবে তিনি তা তরক করতেন না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : ইমাম যদি মুকীম হোন তবে প্রত্যেক দলকে দুই দুই রাকআত করে নামাজ পড়াবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইকামত অবস্থায় জোহরের নামাজ এভাবেই পড়িয়েছেন। আর মাগরিবের নামাজ এভাবে পূর্ণ করবে যে, প্রথম দলকে দুই রাকআত পড়াবে আর দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত পড়াবে। কেননা সালাতুল খাওফের মধ্যে এই হুকুম রয়েছে যে, ইমাম প্রত্যেক দলকে অর্ধেক নামাজ পড়াবেন। আর মাগরিবের নামাজের অর্ধেক হলো এক পূর্ণ রাকআত ও আধা রাকআত। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এক রাকআতকে আধা আধি করে ভাগ করা যায় না। এ জন্য আমরা বলেছি প্রথম দলকে অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে দুই রাকআত পড়াবে, আর দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত পড়াবে। হযরত ইমাম নববী (র.) বলেছেন এর উল্টা করবে। অর্থাৎ প্রথম দলকে এক রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে দুই রাকআত পড়াবে। কারণ এই যে, প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ফরজ। আর উচিত হলো যে, প্রত্যেক দলের তা থেকে অংশ পাওয়া। এ জন্য বলা হয়েছে যে, প্রথম দলকে এক রাকআত আর দ্বিতীয় দলকে দুই রাকআত পড়াবে। যাতে উভয় দল ফরজ কিরাআতের মধ্যে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ الخ : মাসআলা হলো, আমাদের মতে নামাজ অবস্থায় কোনো দল যুদ্ধবিগ্রহ করবে না। যদি করে তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। শুরু থেকে পড়া জরুরি হবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করার ঘাড়া নামাজ ফাসিদ হবে না। এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ও পূর্ব মত (قول قديم)। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا يَخَافُ وَاسْئَلْنَهُمْ : দলিল এভাবে যে, আয়াতের মধ্যে নামাজের ভিতরে অস্ত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নামাজের মধ্যে অস্ত্র রাখা হয় যুদ্ধবিগ্রহের জন্যেই। বুঝা গেল, নামাজের হালাতে যুদ্ধবিগ্রহ করা জায়েজ। আমাদের দলিল এই যে, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চার ওয়াক্ত নামাজ ফওত হয়েছিল। যেগুলোকে পরে তিনি কাযা করেছেন। নামাজের হালাতে যদি যুদ্ধ জায়েজ হতো তবে তিনি ঐ নামাজগুলোকে সময়মত আদায় করতে কিছুতেই ছাড়তেন না। বুঝা গেল, নামাজের হালাতে যুদ্ধ করা জায়েজ নেই। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের জওয়াব এই যে, নামাজের অবস্থায় অস্ত্র সাথে রাখার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, যাতে কাফিররা মুসলমানদেরকে অগ্রপ্তত্ব মনে করে হামলা না করে বসে। কিংবা যদি লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে লড়াই করবে এবং পড়ে নামাজ দোহরাবো।

فَإِنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادَى يُؤْمُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَىٰ أَيْ جِهَةٍ  
 شَاءَ وَإِذَا لَمْ يَقْدِرُوا التَّوَجُّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا  
 وَسَقَطَ التَّوَجُّهُ لِلضَّرُورَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يَصَلُّونَ بِجَمَاعَةٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِإِنْعَادِ  
 الْإِتِّحَادِ لِلْمَكَانِ -

অনুবাদ : যদি ভয়ভীতি আরো তীব্র হয় তবে লোকেরা সওয়ার অবস্থায় একা একা নামাজ আদায় করবে। আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হয়ে ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا যদি তোমরা ভীত হয়ে পড় তবে হাটা অবস্থায় কিংবা সওয়ার অবস্থায়, (নামাজ আদায় করবে) আর কিবলামুখী হওয়ার হুকুম প্রয়োজনের কারণে রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (সেই অবস্থায়ও) তারা জামাআতের সাথে নামাজ পড়বে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ মত নয়। কেননা (জামাআতের জন্য) অভিন্ন স্থান বিদ্যমান নেই।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি শত্রুর ভয় এত তীব্র হয় যে, শত্রু মুসলমানদেরকে সওয়ারি থেকে অবতরণ করে নামাজ পড়ার অবকাশ দিচ্ছে না তবে এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য সওয়ারির উপরই বসে বসে ইশারায় রুকু সিজদা দ্বারা একা একা নামাজ আদায় করা জায়েজ। কিবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হবে। দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا প্রয়োজনের কারণে কিবলামুখী হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি রিওয়ায়েত এমন আছে যে, সওয়ারির উপর থেকেই জামাআতে নামাজ পড়া উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.)ও এর প্রবক্তা, তবে এ হুকুম সহীহ নয়। কেননা ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য স্থান অভিন্ন হওয়া শর্ত যা এখানে নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে তার সওয়ারির উপর হয়, তবে তার ইক্তিদা করা সহীহ হবে।

## بَابُ الْجَنَائِزِ

إِذَا اخْتُصِرَ الرَّجُلُ وَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ إِعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا اسْتِلْقَاءُ لَأَنَّهُ أَسْرَرُ لِحُرُوجِ الرُّوحِ وَالْأَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ وَلَقِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِقَوْلِهِ ﷺ لَقِنَا مَوْتَائِكُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَرَادُ الَّذِي قَرَّبَ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَاتَ شَدَّ لِحْيَاهُ وَغَمِضَ عَيْنَاهُ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ ثُمَّ فِيهِ تَحْسِينُهُ فَيُسْتَحْسَنُ -

### পরিচ্ছেদ : জানাযার নামাজ

অনুবাদ : যখন কোনো লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে ডান পাশের উপর কিবলামুখী করে শোয়ায়ে। (এটা করা হবে) তার কবরের অবস্থানের অবস্থার প্রতি সামঞ্জস্য রেখে। কেননা সে তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে চিৎ করে শোয়ানোই প্রচলিত। কেননা এ হলো রুহ বের হওয়ার জন্য অধিকতর সহজ অবস্থা। তবে প্রথম সূরত হলো সুন্নত এবং তাকে উভয় শাহাদাতের তালকীন করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- **لَقِنَا مَوْتَائِكُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** তোমরা তোমাদের মৃতদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার সাক্ষ্য দানের তালকীন করো। মৃত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার মৃত্যু আসন্ন। যখন সে মারা যায় তখন তার চোয়াল বেঁধে দিবে এবং চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। যুগ যুগ ধরে একুপই চলে আসছে। তা ছাড়া এতে তার 'সূরত' সুন্দর করা হয়। সুতরাং একুপ করাই উত্তম।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : **جيم-এর যবরের সাথে মৃতব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়। আর যেরের সাথে ঐ খাটিয়ার জন্য ব্যবহার হয় যার উপর মূর্দাকে রাখা হয়।** মউত যেহেতু সর্বশেষ পর্যায়ে আসে এ জন্য জানাযার নামাজকে সর্বশেষ বর্ণনা করা হলো। এখন কেউ যদি বলেন যে, **الصلوة في الكعبة**-কে তো এর পূর্বে আলোচনা করার দরকার ছিল অথচ তার আলোচনা পরে করা হয়েছে- এর জওয়াব হলো হলো, **الصلوة في الكعبة**-এর আলোচনা **كتاب الصلوة**-এর সর্বশেষে এ কারণে করা হয়েছে যে, যাতে **كتاب الصلوة**-এর সমাপ্তি এমন জিনিস দ্বারা হয় যার দ্বারা অবস্থা এবং স্থানগত দিক থেকে বরকত হাসিল করা যায়।

মৃতব্যক্তির উপর জানাযার নামাজ পড়ার কারণ : আকল বা বুদ্ধির চাহিদা হলো, যখন কোনো ব্যক্তিকে অনেক লোক মিলে কোনো আলীশান বিচারকের দরবারে নিয়ে তার জন্য সুপারিশ করে এবং তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে এবং তার জন্য গড়াগড়ি করে কাঁদে। এগুলোর দ্বারা সবিশেষ তার ক্ষমা হয়ে যায়। এটাই হলো জানাযার নামাজের দর্শন। অর্থাৎ জানাযার নামাজের প্রবর্তন এ কারণে করা হয়েছে যে, মুমিনদের একটি দল মূর্দারের সুপারিশে শরিক হয়ে মূর্দারের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে বিরাট প্রভাব রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- **مَنْ مَيَّلَ بِمَوْتٍ فَعَلِمَ عَلَى جَنَائِزِهِ** বলেছেন- কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি তার জানাযায় এমন চল্লিশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি তবে ঐ মূর্দারের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করা

হয়। (উক্ত হাদীসের) ব্যাখ্যা হলো, যখন মানুষের প্রাণ তার শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তখনো কিন্তু তার অনুভূতিগুলো অবশিষ্ট থাকে এবং যে সকল খিয়াল এবং জ্ঞানসমূহ তার সাথে ছিল মৃত্যুর পরও সেগুলো তার সাথে থাকে। অতঃপর আলমে বালা থেকে তার আরো জ্ঞান যোগ হয়। এর ভিত্তিতেই অনেকের শাস্তি কিংবা সওয়াব হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের হিম্মত যখন আলমে কুদুস তথা আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এই মায়েতের জন্য লোকেরা গড়াগড়ি কুরে কান্নাকাটি করে কিংবা মায়েতের জন্য সদকা খায়রাত করে তবে তা আল্লাহর হুকুমে মায়েতের জন্য উপকারী হয়।

জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া হওয়ার দর্শন : কিছু ফরজ এমন রয়েছে যেগুলো ঐ স্থানের কিছু লোক আদায় করার দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। এর কারণ হলো, সব লোক যদি তা একত্রিত হয়ে করা আরম্ভ করে দেয় তবে সামাজিকভাবে তা উলট-পালট হয়ে যাবে। এতে তাদের উপকারী কর্মকাণ্ড বে-কার হয়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের কাজের জন্য এক-এক ব্যক্তিই যথেষ্ট। সুতরাং রুগীর সেবা, জানাযার নামাজ এভাবে প্রবর্তিত হয়েছে যে, রুগী এবং মূর্দারদের কোনো ক্ষতি না হয় এবং কিছু লোক এসে যদি তা পূরা করে তবে উদ্দেশ্যও হাসিল হয়ে যায়।

(احكام اسلام عقل کی نظر میں)

ইমাম কুদুরী (র.) মওত-এর নিকটবর্তী বুঝানোর জন্য اخْتَصَرَ الرَّحْلُ (যখন কোনো লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে مَحْتَضَر বলা হয়। কিংবা এ জন্য যে, মওত তার নিকট হাজির হয়। কিংবা মওতের ফেরেশতা হাজির হয়। (তাই مَحْتَضَر বলা হয়) মওতের আলামত হলো, মৃত প্রায় ব্যক্তির উভয় পা ঢিলা হয়ে যায়, দাঁড়াতে পারে না। নাক বাঁকা হয়ে যায়, অণ্ডকোষের চামড়া লম্বা হয়ে যায়। এখন মৃতপ্রায় লোকের জন্য করণীয় হলো, তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে শোয়াবে। কেননা মূর্দাকে কবরে রাখার এটাই সুন্নত তরীকা। তাই তার উপর কিয়াস করে মৃতপ্রায় লোককেও ঐ ভাবে রাখা হবে। কেননা এ ব্যক্তি তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আমাদের দেশে (মা-ওয়ারাউন্ নাহারের মধ্যে) চিত করে শোয়ানই অধিক পছন্দনীয়। কেননা এ অবস্থা রুহ বের হওয়ার জন্য অধিক সহজ। এ সূরতে মৃতব্যক্তির মাথার নিচে বালিশ জাতীয় কোনো উঁচু জিনিস রেখে দিবে, যাতে চেহারা কিবলামুখী থাকে, আকাশের দিকে না থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো নস (نص) নেই শুধু ধারণা প্রসূত, তাই গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে গ্রন্থকার বলেছেন, প্রথম সূরত সুন্নত। অর্থাৎ পার্শ্বের উপর শোয়ানো সুন্নত। দ্বিতীয় আমল বা কাজ হলো, মৃতপ্রায় লোককে শাহাদাতের তালকীন করবে। অর্থাৎ তার পার্শ্ব বসে উচ্চ আওয়াজে “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” বলবে। তাকে উক্ত কালেমা পড়ার নির্দেশ করবে না। কেননা তার উপরে এ সময়টা অভ্যস্ত কঠিন সময়। আল্লাহ না চাহতো সে যদি অঙ্গীকার করে বসে তবে কুফরের উপর তার খাতমা তথা মওত হবে। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী-لَقَسْرًا مَوْتَكُمْ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ আর موتی দ্বারা ঐ ব্যক্তি মূরাদ যার মওত সন্নিহিত। একেবারে মৃতব্যক্তি মূরাদ নয়। কেননা তালকীন তার ক্ষেত্রে কাজে আসবে না। তৃতীয় আমল বা কাজ হলো, মৃত ব্যক্তির চোয়াল কাপড় ইত্যাদি দ্বারা বেঁধে দিবে। তার চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে। এ তরীকাই যুগ যুগ ধরে চল আসছে। এরূপ করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির সূরত সুন্দর হয়। এ জন্য এরূপ আমল উত্তম এবং মুস্তাহাব হবে।



فَصَلِّ فِي الْغُسْلِ : فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ لِيَنْصَبَ الْمَاءُ عَنْهُ وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خُرْقَةً إِقَامَةً لِرُوحِ السَّرِيرِ وَكَتَفَيْهِ بِسِتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ هُوَ الصَّحِيحُ تَبَسُّرًا وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ لِيَمْكِنَهُمُ التَّنْظِيفُ وَضَعُوهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَنَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ لِأَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ إِلَّا غَتْسَالٍ غَيْرَ أَنْ إِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذَّرٌ فَيُتْرَكُ أَنْ تَمَّ يَفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ إِعْتِبَارًا بِحَالِ الْحَيَوَةِ وَتُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وَتَرَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ وَأَنَّمَا يُوتَرُ لِقَوْلِهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَتَرَى حُبَّ الْيُوتَرِ وَتَغْلِي الْمَاءَ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْخُرْصِ مُبَالَغَةً فِي التَّنْظِيفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْفُرَاحُ لِحُصُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ وَغُسْلُ رَأْسِهِ وَلِيَحْيَتَهُ بِالْخُطْمِ لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ ثُمَّ يَضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ بِأَلْمَاءٍ وَالسِّدْرَ حَتَّى يَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ ثُمَّ يَضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ حَتَّى يَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ هُوَ الْبِدَايَةُ بِالْيَمَانِ ثُمَّ يَجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَفِيقًا تَحَرُّرًا عَنْ تَلَوِثِ الْكَفَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَلَا وَضُوءَهُ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ كَثِيلًا تَبَتَّلَ أَكْفَانُهُ وَجَعَلَهُ أَى الْمَيِّتِ فِي أَكْفَانِهِ وَجَعَلَ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِيَحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ لِأَنَّ التَّطَيُّبَ سُنَّةٌ وَالْمَسَاجِدَ أَوَّلَى بِزِيَادَةِ الْكِرَامَةِ وَلَا يَسْرَحُ شَعْرَ الْمَيِّتِ وَلَا لِيَحْيَتِهِ وَلَا يَقْصُ ظَفْرَهُ وَلَا شَعْرَهُ لِقَوْلِهِ عَائِشَةُ عَلَامَ تَنْصُونُ مَيِّتَكُمْ وَلَآنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لِلزَّيْنَةِ وَقَدْ اسْتَغْنَى الْمَيِّتُ عَنْهَا وَفِي الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْتَهُ وَصَارَ كَالْخِتَانِ —

### অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসলের বিবরণ

অনুবাদ : যখন তাকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে একটি খাটে শোয়াবে। যাতে পানি তার থেকে নিচের দিকে সরে যায়। আর তার সতরের স্থানে একখণ্ড বস্ত্র রেখে দিবে। এরূপ করা হবে সতরের ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য। তবে বিতদ্ধ মত অনুযায়ী গোসলের কাজ সহজ করার জন্য মূল লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট। আর (গোসলদানকারীরা) তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে, যাতে তাদের পক্ষে তাকে পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয় এবং তারা তাকে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ছাড়া অজু করাবে। কেননা অজু হলো গোসলের সুলভ। তবে যেহেতু তার (মুখ ও নাক) থেকে পানি বের করা কঠিন, সেহেতু কুলি ও নাকে পানি দেওয়া তরক করবে। তারপর সারা শরীরে

পানি প্রবাহিত করবে, জীবদ্দশার গোসলের অনুসরণে। অতঃপর তার খাটিয়ায় ধুনা দেওয়া হবে বেজোড় সংখ্যায়। কেননা এতে মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। বেজোড় করার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَبْغِيَانِ الْوَتَرَ** আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন। আর পানি বড়ই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা সিদ্ধ করবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে। যদি তা না পাওয়া যায় তবে স্বচ্ছ পানিই যথেষ্ট। কেননা তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আর তার মাথা ও দাড়ি খিতমী (এক প্রকার তুণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। এরপর তাকে বাম পার্শ্বে শয়ন করা হবে এবং বড়ই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তাকে গোসল দেবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অতঃপর তাকে ডান পার্শ্বে শয়ন করা হবে এবং গোসল করা হবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নিচ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নত। এরপর তাকে বসা হবে এবং নিজের দিকে তাকে হেলান দিয়ে তার পেট হালকাভাবে মুছবে, যাতে পরে কাফন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যদি তার পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে। গোসল বা অজু দোহরাবে না। কেননা গোসল দেওয়া আমরা জেনেছি নস (হাদীস)-এর মাধ্যমে। আর তা একবার পালিত হয়ে গেছে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা তার শরীর মুছে ফেলবে। যাতে তার কাফন ভিজে না যায়। এরপর মাইয়েতকে তার কাফনে রাখবে। অর্থাৎ তাকে কাফন পড়াবে। এরপর তার মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি মাখবে এবং সিঁজদার অঙ্গগুলোতে কাফুর মাখবে। কেননা সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত। আর সিঁজদার অঙ্গগুলো অধিক সম্মান যোগ্য। মাইয়েতের চুল বা দাড়ি আঁচড়াবে না এবং তার নখ আর চুল কাটবে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন **عَلَامَ تَنْصُرُونَ مَيِّتَكُمْ** কেন তোমরা তোমাদের মূর্দারের মাথার চুল পরিপাটি করছ? কেননা এ সব কাজ হলো সৌন্দর্যের জন্য। আর মাইয়েতের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির জন্য এগুলো হলো পরিচ্ছন্নতার বিষয়। কেননা এগুলোর নিচে ময়লা জমে থাকে। সুতরাং তা খত্নার মতো হয়ে গেল।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : হিদায়া গ্রন্থকার মৃতব্যক্তির অবস্থাদি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম গোসলের আলোচনা করেছেন। কেননা মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এরই প্রয়োজন দেখা দেয়। মৃতব্যক্তির গোসলের সব বা কারণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মূর্দারকে গোসল দেওয়ার কারণ হলো এ নাপাকী যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হওয়ার কারণে মূর্দারের শরীরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। কেননা মওতের কারণে মানুষ নাপাক হয় না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মায়োতকে গোসল দেওয়ার কারণ যেহেতু নাপাকী তাহলে অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার উপর **كُنْ** করা হয় না কেন? অথচ হাদাসের সূরতে অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার উপর **كُنْ** করা হয়? এর জওয়াব হলো, জীবদ্দশায় হাদাসের কারণে অজুর অঙ্গগুলো সুতার উপর **كُنْ** করা হয় কষ্ট-ক্রেমকে দূরীভূত করার জন্য। কেননা হাদাস প্রথাই আসে বরং একদিন কয়েকবার আসে। সুতরাং জীবদ্দশায় যদি অজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার উপর **كُنْ** না করা হতো; বরং পুরো শরীর ধোয়ার বিধান থাকতো তবে মানুষ কষ্টের মধ্যে পড়ে যেতো। এ জন্য জীবদ্দশায় হাদাসের কারণে অজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে মওতের কারণে যে হাদাস হয় সেটা বারবার আসে না বরং একবারই আসে সুতরাং যেহেতু মওতের কারণে হাদাস একবার আসায় তেমন কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। এজন্য এ সূরতে সমস্ত শরীর ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, মায়োতের গোসলের কারণ হলো মৃতব্যক্তি মওতের কারণে নাপাক হয়ে যায়। যেমন, অন্যান্য জীবজন্তু মওতের কারণে নাপাক হয়ে যায়। দলিল হলো, যদি কেউ কোনো মৃতব্যক্তিকে নিজের শরীরে বহন করে নামাজ পড়ে তবে তার নামাজ জায়েজ হবে না। আর যদি কোনো নাপাক ব্যক্তিকে বহন করে নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, মৃতব্যক্তি নাপাক। আর নাপাক দূরীভূত হয় গোসল দ্বারা। এ জন্য মূর্দারকে গোসল কোনো একান্ত আবশ্যিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মূর্দা প্রাণীকে যদি গোসল দেওয়া হয় তবে পাক হবে না। কেননা মৃতব্যক্তি গোসলের দ্বারা পাক হয়ে যাওয়া এটা শুধু তার মর্যাদা ও সম্মানের কারণে।

মায়োতকে গোসল দেওয়া জীবিত লোকদের উপর ফরজ কিফায়া। সুতরাং কোনো মৃত ব্যক্তিকে যদি পানিতে পাওয়া যায় তখনো তাকে গোসল দিতে হবে। আর যদি ফুলে ও ফেটে যায় তবে তার উপর পানি প্রবাহিত করে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-ই সম্যক অবহিত।

خ : فَاِذَا ارَادُوْا غُسْلَهُ وَغَسُّوْهُ الخ : উপরোক্ত পুরো ইবারতের মধ্যে মায়েতের গোসলের পদ্ধতির আলোচনা করা

হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, যখন মায়েতকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে কোনো খাটের উপর শোয়াবে। আর খাটের উপর এ জন্য শোয়াবে যাতে পানি মায়েতের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যায়। কেননা তাকে যদি জমিনের উপর রাখা হয় তবে মায়েত ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে। গ্রন্থকার খাট রাখার পদ্ধতি কিংবা খাটের উপর মূর্দারকে রাখার পদ্ধতির কথাও আলোচনা করেননি। ইনয়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের কোনো কোনো লোক বলেছেন যে, খাট কিবলার দিকে লম্বা-লম্বি রাখা হবে অর্থাৎ খাট পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা-লম্বি রাখা হবে। যেমন, অসুস্থ অবস্থায় গুয়ে ইশারায় নামাজ পড়ার সুরতে অসুস্থ ব্যক্তিকে পূর্ব-পশ্চিমে শুইয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পাণ্ডালে কিবলার দিকে আর মাথা পূর্ব দিকে রাখবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, খাট প্রস্তের (عرضا) দিক থেকে রাখা হবে যেভাবে মায়েতকে কবরে রাখা হয়। আলামা শামসুল আইম্মা সারাহসী (র.) বলেন, (খাট) যেভাবে রাখা সম্ভব রাখবে। মূর্দারকে খাটের উপর শোয়ানোর পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। তবে স্বাভাবিক প্রথা হলো, মায়েতকে বিছানার উপর শুইয়ে রাখা হয়। মায়েতকে খাটের উপর শোয়ানোর পর তার সতরের উপর একখণ্ড কাপড় রেখে দেবে। কেননা সতর ঢাকা ফরজ। সূতরাং এ ফরজকে আদায় করার জন্য তার সতরের উপর পর্দা রেখে দেবে। কারণ হলো, মানুষ যেমনিভাবে জীবদশায় সম্মানিত এমনিভাবে মৃত্যুর পরও সম্মানিত। সূতরাং এ সম্মানিত হওয়ার তাকযা হলো, তার সতর ঢেকে দেওয়া। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সহজ করার জন্য সামনের ও পিছনের লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট। নাবী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা আবশ্যক নয়। এটাই যাহিকররিওয়ায়াহ। নাওয়াদির -এর রিওয়ায়াত হলো নাবী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে। যাতে লোকেরা সহজেই মায়েতকে পরিষ্কার করতে সক্ষম হয়। কারণ হলো, গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মায়েতকে পাক করা। তাই যখন কাপড়সহ তাকে গোসল দেওয়া হবে তখন উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। কেননা গোসলের ব্যবহৃত পানি দ্বারা যখন কাপড় নাপাক হয়ে যাবে তখন এর দ্বারা দ্বিতীয়বার তার শরীর নাপাক হয়ে যাবে। সূতরাং গোসল দ্বারা পরিব্রতা অর্জন হবে না। আর যখন কাপড়সহ গোসল দ্বারা তাহারাতের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না তখন তার কাপড় খুলে ফেলাই ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মায়েতকে এমন জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেওয়া সুন্নত যার হাতা এমন ঢিলা হবে যে, গোসলদানকারীর হাত তার মধ্যে অনায়াসে ঢুক যায়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওফাতের পর তার পরিহিত কাপড়সহ গোসল দেওয়া হয়েছে। সূতরাং যে জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষেত্রে সুন্নত তা তার উম্মতের ক্ষেত্রেও সুন্নত হবে তবে শর্ত হলো, কোনো বিষয় দলিল মخصص না থাকতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাপড়সহ গোসল দেওয়ার ব্যাপারে দলিল মخصص বিদ্যমান আছে। তা হলো, আয়শা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَوَضَّأَ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ لُغْسِلِهِ فَقَالُوا لَأَنْدَرِي كَيْفَ نَغْسِلُهُ كَمَا تَغْسِلُ مَوْتَانَا أَوْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْنَا نَبَاةُ فَارَسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ التَّوَمَّ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا نَامَ وَ قَفَّتْ عَلَى صَدْرِهِ إِذْ نَادَاهُمْ مَنَادٌ أَنْ اقْبِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبَاةً فَقَدِ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ أَنَّ السُّنَّةَ فِي سَائِرِ الْمَوْتَى التَّجْرِيدُ وَقَدْ حُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ لِعَظِيمِ حُرْمَتِهِ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখন ওফাত হলো, তখন সাহাবায়ে কেলাম তাকে গোসল দেওয়ার জন্য একত্রিত হলেন, সাহাবীগণ বললেন, আমাদের জানা নেই যে আমরা তাকে কিভাবে গোসল দেব? এমনভাবে গোসল দেব কি যেমনিভাবে সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিকে দেওয়া হয়? কিংবা তাকে এভাবে গোসল দেওয়া হবে যে, তাঁর সাথে তাঁর শরীরের কাপড় বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেলামকে ঘুমি বিভোর করে দিলেন। তাদের মধ্যে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তার ﷺ থুতনী তার সিনার উপর ছিল। এহেন অবস্থায় এক আহবানকারী আওয়াজ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর কাপড়সহ গোসল দিয়ে দাও। সূতরাং সাহাবায়ে কেলাম এ ব্যাপার একমত হয়ে গেলেন যে, সব মূর্দারকে তো কাপড় খুলে গোসল দেওয়া সুন্নত। আর নস তথা হাদীসের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উক্ত হুকুম থেকে খাস করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর রাসূলের মান-মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সাধারণ মূর্দাদেরকে তাদের কাপড় খুলে গোসল দেওয়া সুন্নত। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তাকে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ছাড়া অজ্ঞ করাবে। অজ্ঞ তো এ কারণে করাবে যে, অজ্ঞ হলো গোসলের সুন্নত। কুলি ও নাকে এ কারণে পানি দিবে না যে মৃতব্যক্তির নাকে মুখে পানি প্রবেশ করিয়ে তা বের করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জীবদশার দ্বিতীয়বার উপর কিয়াস করে মায়েতকেও কুলি করানো হবে এবং নাকে পানি দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা বলি এই কিয়াসটি ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইরশাদ করেছেন-

الْمَيِّتُ بَيُزًا وَضَوْءٌ لِلصَّلَاةِ وَلَا يَضْمَضُ وَلَا يَسْتَنْشِقُ -

মায়েতকে নামাজের অঙ্গুর অনুরূপ অজ্ঞ করানো হবে তবে কুলি করানো যাবে না এবং নাকেও পানি দেওয়া যাবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অজু করানোর পর মায়েত্তের সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। দলিল হলো জীবদ্দশার গোসলের হালাতের উপর কিয়াস। অতঃপর তার খাটিয়া বেজোড় সংখ্যায় ধুনি দেওয়া হবে। ধুনি এ কারণে দেওয়া হয়, এতে মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। আর বেজোড় এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَرْضَوْنَ

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে পানি দ্বারা মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হবে সে পানি বড়ই পাতা কিংবা উশনান দ্বারা সিদ্ধ করবে। কেননা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য এটা অধিক কার্যকর। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মৃতব্যক্তির গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানি উত্তম। কেননা গরম পানি দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, মৃতব্যক্তির গোসল পরিচ্ছন্নতার জন্য مشروع হয়েছে। গরম পানি পরিচ্ছন্নতার জন্য অধিক উপযোগী। এ জন্য গরম পানি দ্বারা গোসল দেওয়া উত্তম। তবে গরম পানি দ্বারা যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হয়ে যায় এর জওয়াব হলো, এ কথাতো উদ্দেশ্য তথা পরিচ্ছন্নতার জন্য আরো ভালো হবে। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলা হওয়ার দ্বারা যা কিছু পেট থেকে বের হবে তা গোসলের সময় আর থাকবে না এবং গোসল সমাপ্তির পর কাফন ইত্যাদি আর নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আর যদি সিদ্ধ করা পানি না পাওয়া যায় তবে শুধু স্বচ্ছ পানিই ব্যবহার করা হবে। পানির উপরোক্ত ধারাবাহিকতা হলো শামসুল আইহা শারাখসী (র.)-এর মতে। শায়খুল ইসলাম এবং মুহীত গ্রন্থকার বলেছেন, প্রথমত শুধু পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হবে, পরে ঐ পানি ব্যবহার করা হবে যেগুলোকে বড়ই পাতা দ্বারা সিদ্ধ করা হয়। তৃতীয়বার কাফুর মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা হবে। এটাই ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত রয়েছে—

قَالَ يَبْدَأُ أَوَّلًا بِالْمَاءِ الْفَرَجِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَشَقِ مِنْ الْكَافُورِ وَثَلَاثًا يَبْدَأُ أَوَّلًا بِالْمَاءِ الْفَرَجِ حَتَّى يَبْلُغَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالنَّجَاسَةِ ثُمَّ بِسَاءِ السِّدْرِ حَتَّى يَزُولَ مَا بِهِ مِنَ الدَّرَنِ وَالنَّجَاسَةِ فَإِنَّ السِّدْرَ أَبْلَغُ فِي النِّظَافَةِ ثُمَّ بِسَاءِ الْكَافُورِ تَطْيِيبًا لِبَدَنِ الْمَيِّتِ كَذَا فَعَلَتِ السَّلَاسِيَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِأَذَمِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَسَدُهُمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় অমিশ্রিত পানি দ্বারা শুরু করা হবে তারপর বড়ই পাতার সিদ্ধ করা পানি তারপর কাফুর (কপূর) মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা হবে। প্রথমত শুধু পানি এ জন্য ব্যবহার করবে যাতে শরীরের ময়লা-আবর্জনা এবং নাপাক ইত্যাদি ভিজে গলে যায়। তারপর সিদ্ধ পানি এ জন্য ব্যবহার করা হবে যে, যাতে ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যায়। কেননা বড়ই পাতা পরিচ্ছন্নতার জন্য অধিকতর কার্যকর। তারপর কাফুর মিশ্রিত পানি মৃতব্যক্তির শরীরকে সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই আমল ফেরেশতাগণ আদাম (আ.)-কে গোসল দেওয়ার সময় করেছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মৃতব্যক্তির মাথা ও দাড়ি খিতমী দ্বারা ধুইবে। কেননা খিতমী শাবানের ন্যায় শরীর পরিচ্ছন্নকারী। এ সকল কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মৃতব্যক্তিকে বাম পার্শ্বের উপর শুইয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দেবে। এবং এ পরিমাণ পানি ঢালা হবে যাতে নিচের অংশ যা খাটের সাথে মিলিয়ে আছে সে পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়ে একই আমল করবে। এই ধারাবাহিকতা এ কারণে রাখা হয়েছে যাতে গোসলের সূচনা ডান দিক থেকে হয়। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করা হলো সুন্নত। অতঃপর গোসলদানকারীরা মৃতব্যক্তিকে নিজের শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসাবে আর হালকাভাবে মৃতব্যক্তির পেট মলবে। এই মুহূর্ত এ জন্য যে, তার পেটে যদি কোনো জিনিস থাকে তবে তা বের হয়ে যাবে এবং কাফন নষ্ট হবে না। এই ধারাবাহিকতার মূল রিওয়াযাত হলো.

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ بَطْنَهُ يَدِهِ وَغَبَّ عَنْهُ مِنْهُ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا فَقَالَ طَبْتُ حَيًّا وَمَيِّتًا .

হযরত আলী (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল দিয়েছিলেন, তখন নিজের হাত দ্বারা আন্তে আন্তে তাঁর পেট মর্দন করে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জিনিস চাওয়া যা মৃত ব্যক্তিদের থেকে চাওয়া হয়। অর্থাৎ আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল, হতে পারে তাঁর পেট থেকে কোনো জিনিস বেরিয়ে আসবে কিন্তু কোনো জিনিস বের হয়নি। অতঃপর আলী (রা.) বললেন, আপনি তো জীবদ্দশায়ও পাক ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও পাক।

পেট মর্দন করার পর যদি মৃতব্যক্তির পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে, পুনরায় গোসল বা অঞ্জুর প্রয়োজন নেই। কেননা মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া আমাদের নস তথা হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া। মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া যা ওয়াজিব ছিল তা একবার গোসল দেওয়ার দ্বারা হাসিল হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। গোসল থেকে ফারিগ হওয়ার পর মৃতব্যক্তির শরীরকে পাক কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করবে যাতে পরে কাফন ভিজ্ঞ না যায়।

يَجْعَلُهُ أَوْ كَفَّنَهُ فِي أَكْفَانِهِ الْخ : মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার পর তাকে কাফন পরানো হবে এবং মাইয়েতের মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি (حنوط) মাখবে। হানুত হলো কতিপয় সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যের সমন্বয়ে তৈরি করা এক প্রকারের আতর। যে সকল অঙ্গ সিজদার সময় জমিনে লাগে (যেমন- ললাট, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পা) এগুলোর উপর কাফুর মাখবে। দলিল হলো, মাইয়েতের শরীরকে সুগন্ধিযুক্ত করা সুন্নত। আর যেহেতু উপরোক্ত অঙ্গগুলো দ্বারা সিজদা করা হয় এ জন্য সিজদার অঙ্গগুলো সম্মানের অধিক উপযোগী। আর সুন্নত হওয়ার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

كَانَ آدَمُ النَّبِيُّ رَحْلًا اشْتَرَى طَرْلًا كَانَهُ نَخْلَةً سَحَوِي فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ يَحْتَطِطُ وَكُفِّنَ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالْبُسْدِرِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ كَافُورًا وَكَفَّنُوهُ فِي وَتْرِ مِنَ السِّيَابِ وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَقَالُوا هَذِهِ سَنَةٌ وَلِدَ آدَمُ مِنْ بَعْدِهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا يَا بَنِي آدَمُ هَذِهِ سَنَتُكُمْ مِّنْ بَعْدِ هَٰذَا فَكُنْمْ فَانْعَلُوا رِوَادُ الْحَاكِمِ . (شرح نغايه)

হযরত আদম (আ.) লম্বা চুল এবং দীর্ঘ কায়ী বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন, যেন একটি দীর্ঘ খেজুরের বৃক্ষ। অতঃপর যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনীভূত হলো তখন ফেরেশতাগণ সুগন্ধি আর জান্নাত থেকে কাফুর নিয়ে অবতরণ করলেন। তারপর আদম (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন ফেরেশতাগণ আদম (আ.)-কে বড়ই পাতা দ্বারা সিদ্ধ করা পানি দিয়ে তিনবার গোসল করালেন। তিনবার কাফুর লাগালেন এবং তিনটি কাপড়ে কাফন পরালেন। তার জন্য (লাহাদ) কবর খুঁড়লেন এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়লেন এরপর বললেন, আদম (আ.)-এর পর এই প্রক্রিয়াই আদম সন্তানদের জন্য সুন্নত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আদম সন্তানগণ! আদম (আ.)-এর পর এটা তোমাদের সুন্নত, এমনটি তোমরাও করো।

উম্মে আভিয়ার হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- وَأَجْعَلْنِي فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُورٍ বলেন- মাইয়েতের শরীরে কাফুর লাগাবে। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মাইয়েতের চুল এবং দাড়ি আঁচড়াবে না। তার নখ আর লম্বা চুল কাটা হবে না। দলিল হলো, হযরত আয়শা (রা.)-কে মাইয়েতের চুল ও দাড়ি আঁচড়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন- مَا اسْتَفْهَمِيهِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ عِلَامٌ-এর মধ্যে عِلَامٌ শব্দটি মূলত على মা ছিল অর্থاً استفهامية-এর উপর দাখিল হয়েছিল- عَمَّ نَيْسًا، لَرْن-এর মধ্যে রয়েছে। হয়েছে অতঃপর তার আলিফ ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- نَصَا - يَنْصُرُو - نَصَا - ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মাইয়েতের চুল আঁচড়ানোর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ মৃতব্যক্তিদের মাথা ধরে কেন টানছ? যেন হযরত আয়শা (রা.) মৃতব্যক্তির চুল আঁচড়ানোর প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করেছেন। এবং আঁচড়ানোকে মাথা ধরে টানার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, এ সবকিছু করা হয় সৌন্দর্যের জন্য। আর মৃতব্যক্তির এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এ জন্য এগুলোর একেবারেই দরকার নেই। তবে জীবিত লোকদের হুকুম হলো ভিন্ন। কেননা নখ আর চুলের নিচে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকার কারণে পবিত্রতা অর্জনের জন্য জীবিত লোকদেরকে এগুলো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা খতনার অনুরূপ হয়ে গেল। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির খতনা করা সুন্নত, কোনো মৃতব্যক্তি যদি খতনাবিহীন থাকে তবে আমাদের আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে তাকে খতনা করানো যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

فَصَلِّ فِي التَّكْفِينِ : السُّنَّةُ أَنْ يُكْفَنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِرَارٌ وَقِمِيصٌ وَلِفَافَةٍ لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضَ سَحْلَوِيَّةٍ وَلَا تَهْ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِي حَيَاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَالثَّوْبَانِ إِرَارٌ وَلِفَافَةٌ وَهَذَا كَفْنُ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ (رَضَ) اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا وَلَا تَهْ أَذْنَى لِبَاسِ الْأَحْيَاءِ وَالْإِرَارُ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ وَالْلِفَافَةُ كَذَلِكَ وَالْقِمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ الْكَفْنِ ابْتَدَأُوا بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَلَفُّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَوَةِ وَسَطُهُ أَنْ تَبْسُطَ اللَّفَافَةُ أَوَّلًا ثُمَّ يَبْسُطُ عَلَيْهَا الْإِرَارُ ثُمَّ يَقْمَصُ الْمَيِّتَ وَيُوضَعُ عَلَى الْإِرَارِ ثُمَّ يُعْطَفُ الْإِرَارُ مِنْ قِبَلِ الْبَسَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلِ الْبَيْمَنِ ثُمَّ اللَّفَافَةُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفْنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ بِخَرْقَةٍ صَيَانَةٍ عَنِ الْكُشْفِ .

### অনুচ্ছেদ : কাফন পরান

অনুবাদ : সুন্নত হলো, পুরুষকে ইজার, কামিজ ও চাদর এই তিন কাপড়ে কাফন দিবে। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-কে 'সাহলিয়া'র তৈরি তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া এই হলো স্বভাবত তার জীবদ্দশার সাধারণ পরিধেয় পোশাক। সুতরাং তার মৃত্যুর পরেও একই রকম হবে। অবশ্য যদি দুই কাপড়ে সীমিত রাখা হয় তবে তার জায়েজ আছে। আর এ দুই কাপড় হলো ইজার ও চাদর। এ হলো ন্যূনতম কাফন। কেননা হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, আমার এ কাপড় দু'টি ধুয়ে দিও এবং তাতেই আমাকে কাফন দিও। তা ছাড়া এটা হলো জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক। ইজারের পরিমাণ হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামিজ হলো গলা থেকে পা পর্যন্ত। যখন কাফন পঁচানোর ইচ্ছা করবে তখন মাইয়েতের বাম দিক থেকে শুরু করবে এবং সেদিক থেকে তার উপর লেপটিয়ে দিবে। অতঃপর ডান দিক। যেমন জীবিত অবস্থায় করা হয়। কাফন বিছানোর সূরত হলো, প্রথমে চাদর বিছাবে, তারপর তার উপর ইজার বিছাবে, তারপর মাইয়েতকে জামা পড়ানো হবে, তারপর তাকে ইজারের উপর রাখা হবে। অতঃপর প্রথমে বাম থেকে এরপর ডান থেকে ইজার পঁচানো হবে। অতঃপর একইভাবে চাদর পঁচানো হবে। যদি কাফন সরে যাওয়ার আশংকা হয় তবে একটি বস্ত্র খণ্ড দ্বারা 'গা' বেঁধে দিবে যাতে অনাবৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলমানদেরকে কাফন পরানো ফরজে কিফায়া। সুতরাং মৃতব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয় তবে তার সম্পদ দ্বারা তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব। নতুবা যার কাছে তার নাফাকাহ (نفقة) তথা পারিবারিক ব্যয়ের দায়িত্ব রয়েছে তার উপর ওয়াজিব হবে মায়িতের কাফনের ব্যবস্থা করা। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে স্ত্রীর কাফনের ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর উপর। কর্তব্য, যদিও স্ত্রী মালদার হয়। এরই উপর ফতোয়া। মালদার স্ত্রীর উপর গরীব স্বামীর কাফনের ব্যয় বহন করা জরুরি নয়।

الْحَنَّةُ أَنْ يُكْفَرَ الرَّجُلُ الْخ : কাফন তিন প্রকার। কাফনে মাসনুন, কাফনে কিফায়াহ ও কাফনে যাকরত। উপরোক্ত ইবারতে কাফনে মাসনুনের আলোচনা করা হয়েছে। সুন্নত কাফন পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি কাপড়- (১) ইজার অর্থাৎ লুঙ্গি। এর পরিমাণ হবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। (২) কামিজ, আন্তীন ও কল্লী ছাড়া গলা থেকে পা পর্যন্ত। (৩) লিফাফ, চাদর যত্নরা মাথা থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত ঢেকে যায়। তিন কাপড় সুন্নত হওয়ার উপর দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সাহলিয়ার তৈরি তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল। -سِنْ -سَحْل- এর যবর কিংবা পেশের সাথে ইয়ামনের একটি গ্রামের নাম। আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। একটি তো হলো ঐ কুর্তা যার মধ্যে তাঁর ওফাত হয়েছিল। আরেকটি হলো নাজরানের হুদ্রাহ (حله)। হুদ্রাহ বলা হয় জোড়া কাপড়কে (টু পিস)। (মোট তিনটি হলো) জাবির ইবনে সামুরা (রা.) বলেন، كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَتَوَابٍ تَمِيمٍ، বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছে। কামিজ, ইজার, চাদর। উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি কাপড়ে কাফন পরানো প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় দলিল হলো, মানুষ সাধারণত জীবদশায় তিন কাপড় পরিধান করে থাকে, তাই মৃত্যুর পরও তার তিনটি কাপড় হওয়া দরকার।

فَإِنْ أَقْتَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ الْخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে কাফনে কিফায়ায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে কিফায়া কাফন দুই কাপড়। এক, ইজার, দুই, চাদর (লিফাফ)। এর উপর সিদ্দীকে আকবরের বাণী দ্বারা দলিল দেওয়া হয়। মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাকে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِهِ الَّذِي كَانَ يَمْرُضُ فِيهِمَا إغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُوْنِي فِيهِمَا نَفَلْتُ عَائِشَةَ (رض) أَلَا نَسْتَعْرِى لَكَ جَدِيدٌ قَالَ لَا لَأَتَمَّ أَخُوْجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْكَيْتِ  
হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আব্বাকান বলেছেন, তাঁর ঐ দুটি কাপড়ের ব্যাপারে যেগুলোর পরিহিত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, এই কাপড়গুলো ধুয়ে নিবে এবং আমাকে ঐ দুটি কাপড়েই কাফন দিবে। আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা কি আপনার জন্য নতুন কাপড় ক্রয় করব না? তিনি বলেন, না। জীবিত মানুষ নতুন কাপড়ের অধিক উপযোগী মৃত মানুষের তুলনায়। (ফাতহুল কাদীর) দ্বিতীয় দলিল হলো, ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ছিল, উটনী থেকে পড়ে মারা গেছে। তার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ তাকে দুটি কাপড়ে কাফন দাও। আকলী দলিল হলো, জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক হলো দুই কাপড়। তাই মৃত্যুর পরও দুই কাপড়ে সীমাবদ্ধ রাখা জায়েজ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার তিন কাপড়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইজারের পরিমাণ হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামিজ হলো গলা থেকে পা পর্যন্ত। তবে এ জামার মধ্যে পকেট, কল্লি এবং আন্তীন হবে না।

وَأَذَا أَرَادُوا لَنْ الْكُفْنِ الْخ : মাইয়েতের কাফন পেঁচানোর পদ্ধতি হলো, প্রথমে চাদর বিছাবে। তারপর এর উপর ইজার বিছাবে। অতঃপর এর উপর জামা বিছাবে এবং মৃতব্যক্তির গায়ে তা পরিয়ে দিবে। তারপর ইজারের বাম দিক থেকে পেঁচাবে এরপর ডান দিক থেকে তাহলে ডান দিক উপরে থাকবে। একইভাবে চাদরও পেঁচানো হবে। হিদায়া গ্রন্থকার পুরষের কাফনের কাপড়ের মধ্যে পাগড়ির কথা আলোচনা করেননি। কেননা কেউ কেউ পাগড়িকে কাফনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাকে মাকরুহ বলেছেন। কেননা পাগড়িকেও কাফনের অন্তর্ভুক্ত ধরা হলে কাফনের কাপড় জোড় হয়ে যায়। অথচ সুন্নত হলো কাফনের কাপড় বেজোড় হওয়া। অর্থাৎ তিনটি হওয়া। তবে কেউ কেউ পাগড়িকে উত্তম বলেছেন। দলিল হিসাবে তাঁরা বলেছেন, ইবনে ওমর (রা.) মাইয়েতকে পাগড়ি পরাডেন এবং পাগড়ির শিমলা মাইয়েতের চেহারার উপর রাখতেন। তবে এ মতটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাণী-كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَتَوَابٍ يَخِيْن-এর বিপরীত হয়ে যায়।

ফায়িদা : কাফনের জন্য সুতী সাদা কাপড় ব্যবহার করা সুন্নত। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন، اَلْبَسُوا مِنَ الْبَيَاضِ، বলেন, সাদা কাপড় পরিধান করো। কেননা এটা হলো উত্তম কাপড় এবং এগুলো দ্বারা ইতোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।

وَتُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْفَةٌ تُرْبِطُ فَوْقَ  
 نَذْبِنِهَا لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الْمَوَاتِيَّ غَسْلَنَ إِبْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ  
 وَلَا تَهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ثُمَّ هَذَا بَيَانُ كَفْنِ السَّنَةِ وَإِنْ  
 اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ وَهِيَ ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ وَهُوَ كَفْنُ الْكِفَايَةِ وَيَكْرَهُ أَقْلُ مِنْ  
 ذَلِكَ وَفِي الرَّجُلِ يَكْرَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ مُضْعَبَ  
 بَنِ عُمَيْرٍ جِئِنِ اسْتَشْهِدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَهَذَا كَفْنُ الضَّرُورَةِ وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ  
 الدِّرْعَ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ شَعْرُهَا صَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ  
 ثُمَّ الْإِزَارُ تَحْتَ اللَّفَافَةِ قَالَ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا الْمَيِّتُ وَتَرَا لِأَنَّهُ ﷺ  
 أَمَرَ بِاجْتِمَاعِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وَتَرَا وَالْإِجْمَارُ هُوَ التَّطْيِيبُ فَإِذَا فَرَّغُوا مِنْهُ صَلُّوا عَلَيْهِ  
 لِأَنَّهُا فَرِيضَةٌ۔

অনুবাদ : স্ত্রীলোককে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিবে। যথা- কোর্তা, ইজার, ওড়না, চাদর ও সিনাবন্দ যা ঘারা তার সিনা বেঁধে রাখা হবে। কেননা উম্মু আতিয়্যাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যাকে গোসল দানকারিণী স্ত্রীলোকদেরকে পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন এবং এ কারণে যে, জীবদ্দশায় সাধারণত এই পাঁচ কাপড়ে সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পরেও অনুরূপ হবে। আর এটা হলো সুলত কাফনের বয়ান। যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে যথা ইযার, চাদর ও ওড়না, তবে তা জায়েজ হবে। এটা হলো (মেয়েদের জন্য) নূনতম কাফন (কفن كفاية)। এর চেয়ে কম করা মাকরুহ হবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে এক কাপড়ের উপর সীমিত করা মাকরুহ হবে জরুরি অবস্থা ছাড়া। কেননা মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা.) যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে এক বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ হলো জরুরি অবস্থায় কাফন (কفن ضرورت)। স্ত্রীলোককে প্রথমে কোর্তা পরানো হবে। তারপর তার চুলগুলো দুই ভাগ করে তার বুকে কোর্তার উপরে রাখতে হবে। তারপর তার উপরে ওড়না পরানো হবে। তারপর ইজার দেওয়া হবে চাদরের নিচে। ইয়াম কুদুরী (র.) বলেন, কাফনের কাপড়ের মাঝে মাইয়েতকে রাখার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে। কেননা নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যার কাফনকে বেজোড় সংখ্যায় ধুপ দিতে আদেশ করেছিলেন। আর ধুনী দেওয়ার মানে হলো সুরভিত করা। কাফন থেকে ফারিগ হয়ে মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ পড়বে। কেননা এ হলো ফরজ জ।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে স্ত্রীলোকদের সুলত কাফনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, স্ত্রীলোকদের সুলত কাপড় পাঁচটি। কোর্তা, ইজার, ওড়না, চাদর এবং সিনাবন্দ যা ঘারা তার সিনা বেঁধে রাখা হয়। দলিল হলো উম্মু আতিয়্যাহ হাদীস, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেয়ে হযরত যয়নাবের ওফাত হয়েছিল তখন যে সকল মহিলা তাঁকে গোসল দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ



তাদেরকে তার কাফনের জন্য এই পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন। আকলী দলিল হলো, জীবদ্দশায় মহিলারা সাধারণত পাঁচ কাপড়ে থাকে, এরই উপর কিমস করে মৃত্যুর পরও তাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

وَأَنْ إِنْ تَصَرُّوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَتْرَابِ الْخ : উক্ত ইবারত দ্বারা মহিলাদের ন্যূনতম কাফনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ন্যূনতম কাফনের কাপড় হলো তিনটি- ইজার, চাদর, ওড়না। তিনের কম কাপড়ে মহিলাদেরকে কাফন দেওয়া প্রয়োজন ছাড়া বরং মাকরুহ, তবে জরুরতের ভিত্তিতে জায়েজ আছে। আর এটাকে জরুরি অবস্থার কাফন বলা হবে। এমনিভাবে পুরুষদের এক কাপড়ে কাফন দেওয়া মাকরুহ। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে জায়েজ। পুরুষদের এক কাপড়ে কাফন হলো ন্যূনতম কাফন। দলিল হলো খাবাব ইবনে আরাত-এর হাদীস-

قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ اجْرُنَا عَلَى اللُّو فَيَمْنَا مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نِمْرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَأَ رَأْسَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ .

খাবাব ইবনে আরাত (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করি। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট সাব্যস্ত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে যারা চলে গেছেন এবং দুনিয়ায় কিছু রেখে যাননি তাদের মধ্যে একজন হলেন মুস'আব ইবনে উমায়র (রা.) যিনি উহুদে শহীদ হোন। তিনি একটি ডোরা বিশিষ্ট চাদর রেখে যান। এর দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকতে গেলে পা খুলে যায় আবার পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন মুস'আবের মাথা ঢেকে দেই আর পদ দুয়ের উপর ইখ্‌তার (ঘাস বিশেষ) দিয়ে দেই।

قَالَ وَتَجَمَّرُ الْأَكْفَانُ الْخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে কাফনের কাপড়ে ধূনী দেওয়ার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। اِجَار বলা হলো ধূনী দিয়ে সুগন্ধিময় করাকে। ধূনী বেজোড় সংখ্যায় দেওয়া সুন্নত। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসে এর সাক্ষ্য রয়েছে। কাফন থেকে ফারিগ হওয়ার পর তার উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। কেননা জানাযার নামাজ হলো ফরজে কিফায়া।

## فَصَلِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

وَأَوَّلَى النَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ لِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ إِذْرَاءٌ  
بِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ فَالْقَاضِي لِأَنَّهُ صَاحِبُ وَلَايَةٍ فَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ فَيَسْتَحِبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ  
النَّبِيِّ لِأَنَّهُ رَضِيئُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ قَالَ ثُمَّ الْوَلِيُّ وَالْأَوْلِيَاءُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي  
التَّيَكَاكِجِ -

### অনুচ্ছেদ : মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়

অনুবাদ : সুলতান যদি উপস্থিত থাকেন তবে মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনিই সবচেয়ে বেশি  
হকদার। কেননা তার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলে এতে তাঁর অবমাননা হয়। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে  
বিচারক (অধিক হকদার)। কেননা তিনিও কর্তৃত্বের অধিকারী। আর যদি তিনিও উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার  
ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট ছিল। ইমাম কুদুরী  
(র.) বলেন, তারপর মাইয়েতের অভিভাবক অধিক হকদার। আর ওয়ালী বা অভিভাবকদের ক্রম সেই অনুসারেই  
হবে, যা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّوْكَ - জানাযার নামাজ শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার উপর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী (কিফায়া) জানাযার নামাজ  
ফরজে কিফায়া। ফরজ তো এ জন্য যে, কুরআনের মধ্যে وصل আর হাদীসের মধ্যে وصل। আর-এর সীগাহ ব্যবহৃত  
হয়েছে। আর-এর চাহিদা হলো ওয়াজিব (ফরজ)। কিফায়া এ জন্য যে, সমস্ত মানুষের উপর ওয়াজিব করা অসম্ভব অথবা  
তার মধ্যে কষ্টসাধ্য বিষয়। এ জন্য কিছু সংখ্যকের উপর اكفاء করা হয়েছে। যেমন- জিহাদের মধ্যে জানাযার নামাজ  
ওয়াজিব হওয়ার কারণ (سبب) হলো মৃত হওয়া। নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মৃতব্যক্তির মুসলমান হওয়া। কেননা  
কাফিরের উপর জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا - দ্বিতীয় শর্ত হলো, মৃতব্যক্তির পাক পবিত্র হওয়া। সুতরাং যদি গোসল  
দেওয়ার পূর্বে জানাযার নামাজ পড়া হয় তবে গোসল দেওয়ার পর পুনরায় পড়তে হবে। তৃতীয় শর্ত হলো, জানাযা মুসল্লীর  
সামনে হওয়া। সুতরাং গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে জানাযা যদি মুসল্লীর পিছনে হয় তবুও জানাযার নামাজ  
জায়েজ নেই।

وَأَوَّلَى النَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ - জানাযার নামাজের ইমামত-এর যোগ্যদের তারতীব এই যে, যদি বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধান  
উপস্থিত থাকেন তবে জানাযার ইমামতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তিনিই হবেন। কেননা বাদশাহর উপস্থিতিতে অন্য কাউকে  
ইমাম বানানোর দ্বারা তাঁর অবমাননা হয়। অথচ বাদশাহ হলো যিল্লুল্লাহ তথা আল্লাহর ছায়া। সুতরাং যে তার ইজ্জত করবে  
আল্লাহও তার ইজ্জত করবেন। আর যে তার অবমাননা করবে আল্লাহও তার আমাননা করবেন। যদি বাদশাহ উপস্থিত না

থাকেন তবে বিচারক ইমামতের যোগ্য বলে গণ্য হবেন। কেননা বিচারকের সকলের উপর কর্তৃত্ব আছে। যদিও বিচারক রাষ্ট্রপ্রধানের মনোনয়নের মাধ্যমেই মনোনীত হয়ে থাকে। তাই উভয়ের অগ্রাধিকার হলো ওয়াজিব। অতঃপর বিচারকও যদি উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতের উপর সন্তুষ্ট ছিল। তাই মৃত্যুর পরও তার সন্তুষ্টির ইমামই উত্তম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া সে শরিয়াতের বিরোধীও নয়। অতঃপর মাইয়েতের অভিভাবক ইমামতের যোগ্য। আর মাইয়েতের অভিভাবকদের ইমামতের ক্ষেত্রে ঐ তারতীব তথা ক্রমধারা প্রযোজ্য হবে যে ক্রমধারা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে তবে নিকাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ছেলে স্ত্রীলোকের পিতার উপর অগ্রাধিকার পাবে। আর এখানে পিতা ইমামতের অধিক যোগ্য। আর যদি মাইয়েতের দুই অভিভাবক সমপর্যায়ের হয়। যেমন- তার দুই সৎ ভাই রয়েছে। তবে এদের মধ্যে যার বয়স বেশি সে অগ্রাধিকার পাবে। তবে তার এই এখতিয়ার নেই যে, নিজের স্থানে অন্য কোনো অপরিচিত জনকে ইমামত করার জন্য আগে বাড়িয়ে দিবে, তবে অন্যরা যদি রাজি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন। ইনায়া গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুযায়ী হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবু আবু হানীফা (র.) থেকে ক্রমধারা এভাবে যে, প্রথম হলো সুলতান তথা খলীফা, তারপর ঐ শহরের গভর্নর, তারপর বিচারপতি, তারপর তত্ত্বাবধায়ক বিচারক, তারপর মহল্লার ইমাম, তারপর মৃত ব্যক্তির অভিভাবক। উক্ত ক্রমধারাটি অধিকাংশ মাশায়িখ গ্রহণ করেছেন। ক্রমধারার মধ্যে মাইয়েতের অভিভাবক সবার পরে হওয়া তরফাইনের মতানুযায়ী। নতুবা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মত হলো, অভিভাবক সর্বাবস্থায় মাইয়েতের নামাজের অধিক হকদার। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ.

তরফাইনের দলিল হলো, হাসান ইবনে আলী (রা.)-এর যখন ওফাত হয়েছিল তখন জানাজার নামাজের জন্য হুসাইন (রা.)-এর আরো অন্যান্য লোকেরা এসেছিলেন। সায়েয়েদনা হুসাইন (রা.) ইমামতের জন্য সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-কে আগ বাড়িয়ে দিলেন। যিনি ঐ সময় হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে মদীনার হাকিম ছিলেন। সাঈদ ইবনুল আস (রা.) সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করলেন। তখন হুসাইন (রা.) বলেছিলেন সামনে যান, এটাই হলো সুন্নত। যদি এটা সুন্নত না হতো তবে আমি আপনাকে সামনে যেতে বলতাম না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর পেশকৃত আয়াতটি وَأُولُو الْأَرْحَامِ (الایة) মিরাস আর বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিবাহের অভিভাবকত্ব একমাত্র অভিভাবকদের জন্য, বাদশাহ সহ অন্যদের জন্য নয়।

فَإِنْ صَلَّى غَيْرَ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ يَعْنِي إِنْ شَاءَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجْزَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرَضَ يَتَدَاوَى بِأَوَّلٍ وَالتَّفَلُّ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلِهَذَا رَأَيْنَا النَّاسَ تَرَكَوْا عَنْ أَحْرِمِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وَضَعَ -

অনুবাদ : সুতরাং যদি ওলী ও বাদশাহ ছাড়া অন্য কেউ জানাযার নামাজ পড়িয়ে থাকে তবে ওলী তা পুনরায় পড়তে পারবেন, যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অধিকার বা হক হলো ওলীদের। যদি ওলী জানাযা পড়ে থাকেন তাহলে তার পরে অন্য কারো জন্য আর জানাযার নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়। কেননা ফরজ তো প্রথমবার পড়া দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল স্তরের লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর রওয়া শরীফে জানাযা পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। অথচ যেভাবে কবরে রাখা হয়েছে, সে ভাবেই তাঁর পবিত্র দেহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি ওলী ও বাদশাহ ছাড়া অন্য কেউ জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেয়, তবে ওলী জানাযার নামাজ পুনরায় আদায় করতে পারেন। আর যদি বাদশাহ নামাজ পড়িয়ে দেন কিংবা এমন লোকে পড়িয়ে দেন যিনি জানাযার নামাজের ক্রমধারার ইমামতের মধ্যে ওলীর উপর অগ্রাধিকার রাখেন, তবে ওলী এ নামাজ পুনরায় আদায় করতে পারবে না। আর যদি ওলী জানাযার নামাজ পড়িয়ে দেন তবে এরপর অন্য কারো পক্ষে আর মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ পড়ার ইজাযত নেই। দলিল হলো, ওলীর নামাজ আদায় করার দ্বারা ফরজ তো একবার আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। এ জন্য ওলীর নামাজ পড়ার পর অন্য কারো নামাজ পড়ার অধিকার নেই। এটা হলো আমাদের মায়হাব। ইমাম শাফি'র (র.) বলেন, জানাযার নামাজ বারবার পড়া যায়। তাঁর দলিল হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নতুন কবর অতিক্রম করছিলেন, তিনি কবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বলা হলো এটা অমুক স্ত্রীলোকের কবর। তিনি বললেন, অতিক্রম জানাযার নামাজের জন্য কেন অবহিত করা হলো না? উত্তরে দেওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই স্ত্রীলোকটিকে রাতে দাফন করা হয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছিল পোকা-মাকড় আপনাকে কষ্ট দেয় কিনা, এ জন্য আমরা আর খবর দেয়নি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং কবরের উপর নামাজ পড়লেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযার সময় সাহাবায়ে কেরামের দলে দলে এসে নামাজ পড়ার প্রমাণ রয়েছে, উপরোক্ত ঘটনা দুটি দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযার নামাজ একবারের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার পড়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের দলিল উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলী কিংবা যিনি প্রথম বার নামাজ পড়েছেন তার দ্বারা তো ফরজ আদায় হয়ে গেছে। আর জানাযার ক্ষেত্রে নফল পড়ার স্বীকৃতি শরিয়ত দ্বারা সমর্থিত নয়। এ কারণেই সকল স্তরের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের উপর নামাজ পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। যদি নফল জানাযা শরিয়ত কর্তৃক সমর্থিত হতো তবে সকলে মিলে তা থেকে বিরত থাকতেন না। অথচ রাসূলে আকরাম ﷺ আজও তাঁর কবর মুবারকে এমনভাবে শায়িত যেমনটি তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। কেননা নবীগণের গোশত জমিনের জন্য হারাম। আশিয়ায়ে কেরামের শরীফকে জমিনের মাটি পরিবর্তন করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে, এ স্ত্রীলোকটির কবরের উপর নামাজ পড়েছেন তা এই কারণে ছিল যে, এটা হলো তাঁর হক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-  
 رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ -এর উক্ত হক বাদ দেওয়ার অধিকার কারো নেই। দ্বিতীয় ঘটনার জওয়াব হলো, সিদ্ধীকে আকবর খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযার নামাজের অধিক হকদার ছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফতের মাসআলা সমাধান করা এবং বহুমুখী ফিতনার মোকাবিলা করতে গিয়ে তার আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। লোকেরা তাঁর আগমনের পূর্বেই নামাজ পড়া শুরু করে দিয়েছে। তিনি যখন খেলাফতের কাজ সমাধা করে ফারিগ হলেন তখন জানাযার নামাজ পড়লেন। তারপর আর কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযার নামাজ পড়েননি।

وَأَنَّ دُفِينَ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ  
 إِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَسَّخَ وَالْمُعْتَمِرُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَكْبَرُ  
 الرَّأْيِ هُوَ الصَّحِيحُ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ -

অনুবাদ : যদি জানাযা না পড়েই মৃতব্যক্তিকে দাফন করা হয়ে থাকে তবে তার কবরের উপরেই জানাযা পড়বে। কেননা নবী করীম ﷺ জৈনক আনসারী স্ত্রীলোকের কবরের উপর জানাযা পড়েছিলেন। তবে লাশ গলিত হওয়ার পূর্বেই তার জানাযা পড়বে। আর তা বোঝার ব্যাপারে প্রবল ধারণাই হলো ধর্তব্য। এটিই বিতদ্ধ মত। কেননা অবস্থা, সময় ও স্থান বিভিন্ন রকম রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : কোনো মাইয়েতকে যদি জানাযার নামাজ আদায় করা ব্যতীত দাফন করা হয় তবে তার কবরের উপরেই নামাজ পড়া হবে। দলিল হলো, একজন আনসারী স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় দাফন করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার নামাজ পড়েছিলেন না। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা জানলেন তখন তার কবরের উপর নামাজ পড়লেন।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কবরের উপর নামাজ পড়ার ইজাযত মাইয়েতের খালাপ এবং ছিন্নভিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জায়েজ হবে। ফুলে ফেটে যাওয়ার পর জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফুলা বা ফেটে যাওয়া চিনার উপায় হলো প্রবল ধারণার উপর। অর্থাৎ প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, লাশ ফুলেওনি ফাটেওনি তবে কবরের উপর জানাযার নামাজ পড়া যাবে। আর প্রবল ধারণা যদি এই হয় যে, মাইয়েত ফুলে বা ফেটে গেছে তবে তার উপর জানাযা পড়ার ইজাযত নেই। এটিই বিতদ্ধ মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, দাফন করার পর তিনদিন পর্যন্ত কবরের উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে। এরপর জায়েজ নেই। বিতদ্ধ মতের দলিল হলো, লাশ বিনষ্ট হওয়া মাইয়েতের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে। মোটাতাজা লাশ চীকন হালকা লাশের তুলনায় দ্রুত বিনষ্ট এবং ফুলে ফেটে যায়। এমনভাবে মৌসম আর স্থানের বিভিন্নতার কারণেও বিভিন্ন রকম ধারণ করে। এমনকি গরম আর বর্ষার মৌসুমে ঠাণ্ডার মৌসুমের তুলনায় দ্রুত পচে গলে যায়। ভিজা ও অর্ধ ভূমিতে শুষ্ক ভূমির তুলনায় দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। মোটকথা, যদি প্রবল ধারণা এই হয় যে, তিন দিনের পূর্বেই লাশ বিকৃত হয়ে গেছে তবে তার উপর নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আর যদি প্রবল ধারণা এই হয় যে, তিন দিনের পরেও নষ্ট হয়নি তবে তার উপর তিন দিনের পরও নামাজ পড়া জায়েজ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দীর্ঘ আট বছর পর উহুদের শহীদদের কবরের উপর নামাজ পড়েছেন এর জওয়াব হলো, তিনি শুহাদায়ে উহুদের জন্য দোয়া করেছেন আর দোয়াকেই **صلى** ঘাষ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, শহীদগণের শরীর যেহেতু পচে না গলে না, তাই দীর্ঘদিন পরেও তাদের কবরের উপর নামাজ পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

وَالصَّلَاةُ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَقِبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيَسْلِمُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فَتَسَبَّحَتْ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يَتَابِعْهُ الْمُؤْتَمُّ خِلَافًا لِرَفَرٍ (رح) لِأَنَّهُ مَنْسُوحٌ لِمَا رَوَيْنَا وَنَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي رَوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَالْإِتْبَانُ بِالْدُعَاوَاتِ اسْتِغْفَارًا لِلْمَيِّتِ وَالْبِدَايَةِ بِالنَّيِّءِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ سُنَّةَ الدُّعَاءِ وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ وَلَكِنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِيبًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذَخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَهُ أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا يُكَبِّرُ الْآتِي حَتَّى يُكَبِّرَ أُخْرَى بَعْدَ حُضُورِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُكَبِّرُ حِينَ يَحْضُرُ لِأَنَّ الْأَوَّلَى لِلِافْتِتَاحِ وَالْمَسْبُوقُ يَأْتِي بِهِ وَلَهُمَا أَنْ كُلَّ تَكْبِيرٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ وَالْمَسْبُوقُ لَا يَبْتَدِئُ بِمَا فَاتَهُ إِذْ هُوَ مَنْسُوحٌ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبِّرْ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنْتَظِرُ الثَّانِيَةَ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ -

অনুবাদ : জানাযার নামাজ হলো, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতঃপর ছানা পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নবী করীম ﷺ-এর উপর দরুদ পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। কেননা রাসুল্লাহ ﷺ শেষ যে জানাযা পড়েছেন, তাতে চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং তা পূর্ববর্তী আমল রহিত করে দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলেন, তবে মুক্তাদী তাকে অনুসরণ করবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পাষণ্ড করেন। আমাদের দলিল হলো, পঞ্চম তাকবীরের হাদীসটি আমাদের পূর্ব বর্ণনার প্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। তবে এক বর্ণনা মতে মুক্তাদী ইমামের সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করবে। এ মতই গ্রহণীয়। আর দোয়াসমূহ পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো মাইয়েতের জন্য ইস্তিগ্ফার করা। আর প্রথমে ছানা, এরপর দরুদ পাঠ হলো দোয়ার সুলুত। বাচ্চার জন্য ইস্তিগ্ফার করবে না; বরং এ দোয়া পড়বে اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِيبًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذَخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا হে আল্লাহ তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে সওয়াব লাভের মাধ্যম এবং আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন। ইমাম যদি এক তাকবীর বা দুই তাকবীর বলে ফেলে তবে (পরে) আগত ব্যক্তি তার উপস্থিতির পর ইমামের আরেক তাকবীর বলার পূর্বে তাকবীর বলবে না। এটা হলো ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতির সময়েই তাকবীর বলবে। কেননা প্রথম তাকবীর হলো নামাজ শুরু করার তাকবীর। আর মাসবুককে এ তাকবীর বলতে হয়। উভয় ইমামের দলিল হলো, (জানাযার) প্রতিটি তাকবীর একেক রাকআতের স্থলবর্তী। আর মাসবুক ব্যক্তির নামাজের যে অংশ ফউত হয়ে যায় তা দিয়ে নামাজ শুরু করে না। কেননা এরূপ করা রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সঙ্গে তাকবীর না বলে থাকে, তবে সকলের মতেই সে দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে মুদারিকের সমপর্যায়ভুক্ত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরে বর্ণিত ইবারতের মধ্যে জানাযার নামাজের কায়ফিয়ত তথা অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই গ্রন্থকার বলেন, জানাযার নামাজ চার তাকবীরের সমষ্টি নাম। তার ব্যাখ্যা হলো, নিয়তের পর তাকবীরে তারীম্বা বোধে এবং উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করবে অর্থাৎ আলহামদুল্লাহ কিংবা এ জাতীয় কোনো বাক্য পড়বে। তবে কেউ কেউ

বলেছেন **اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ** পড়বে যেমনটি অন্যান্য নামাজে পড়া হয়। আমাদের মতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পক্ষে। ইমাম শাফিঈ (র.) জানাযার নামাজে অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করেছেন। সুতরাং যেমনিভাবে অন্যান্য নামাজে কুরআন পড়া জরুরি এমনিভাবে জানাযার নামাজের মধ্যেও কুরআন পড়া জরুরি।

আমাদের দলিল হলো, হযরত নাফে' (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, **اَنَّ اَبْنَ عَمْرٍا (رض) كَانَ لَا تَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ عَلٰى**। **اَنَّ اَبْنَ عَمْرٍا** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) জানাযার নামাজে কিরাআত পড়তেন না। আকলী দলিল হলো, জানাযার নামাজ নিরোট একটি রুকন তথা কিয়াস-এর নাম। আর একটি রুকনের মধ্যে কুরআন পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। যেমন সিজদায়ে তিলাওয়াতের মধ্যে একটি মাত্র রুকন হওয়ার কারণে কিরাআত পড়া শরিয়ত স্বীকৃত নয়। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে রাসূলুল্লাহ **ﷺ** এর উপর দরদ পড়বে। কেননা আল্লাহর প্রশংসার পর রাসূলুল্লাহ **ﷺ** প্রতি দরদেরই মর্যাদা। যেমন তাশাহুদদের মধ্যে এই তারতীবই রয়েছে। খুতবার মধ্যেও এই তারতীব রাখা হয়েছে। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে। যদি জানা থাকে তবে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ**। **اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ** যদি এই দোয়া মনে না পড়ে তবে যে দোয়া মনে আসে তা-ই পড়বে। হামদে বারী ও রাসূলুল্লাহ **ﷺ** প্রতি দরদের পর দোয়া এ জন্য রাখা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেছেন—**اِنْ اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّدْعُوَ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ**। **وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُوْهُ**।—এর প্রতি দরদ পড়বে, তারপর দোয়া করবে। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম এ জন্য ফিরাবে যে, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** সর্বশেষ জানাযার নামাজে চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং এর পূর্বের আমল যদি এর বিপরীতও হয় তবে তা রহিত হয়ে গেছে। ইনশা'া গুহকার লিখেছেন চতুর্থ তাকবীরের পর আর সালামের পূর্বে যাযিকুর রিওয়াযাত অনুযায়ী কোনো দোয়া নেই। কোনো কোনো মাশাযিখ বলেছেন সালামের পূর্বে এ দোয়া পড়বে—**رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ**। ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলে তবে মুজাদী উক্ত পঞ্চম তাকবীরের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে না। কেননা চার এর অধিক তাকবীরগুলো উপরোক্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলে তবে মুজাদী তার অনুসরণ করবে। তাঁর দলিল হলো, চার এর অধিক তাকবীরের মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ। যেমন— বর্ণিত আছে একদা হযরত আলী (রা.) জানাযার নামাজের মধ্যে চার তাকবীরের পর পঞ্চম তাকবীর বলেছিলেন। তখন মুজাদীরা হযরত আলী (রা.)-এর অনুসরণ করেছিল। আমাদের দক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে পরামর্শ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ **ﷺ** এর সর্বশেষ নামাজের দক্ষ প্রত্যাবর্তন (رجوع) করেছেন। সুতরাং হযরত আলী (রা.)-এর পঞ্চম তাকবীর বলা রহিত হয়ে গেছে। আর রহিত হওয়া বস্তুর অনুসরণ করা ভুল। মুজাদী যখন পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে না তাহলে তারা কি করবে? এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক, মুজাদী তাৎক্ষণিকভাবে সালাম ফিরাবে, যাতে পঞ্চম তাকবীরে ইমামের বিরোধিতা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় রিওয়াযাত হলো, মুজাদী ইমামের সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় থাকবে, যাতে সালামের মধ্যে অনুসরণ হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় রিওয়াযাতটি-ই গ্রহণীয়। গ্রন্থকার বলেন, দোয়াসমূহ পড়ার উদ্দেশ্য হলো মূলত মাইয়েতের জন্য মাগফিরাত চাওয়া। আর প্রথমে ছানা তারপর নবী **ﷺ**—এর উপর দরদ পড়া হলো দোয়ার সুলত। এ কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জন্য ইস্তিগফার করা হয় না। কেননা প্রাপ্ত বয়স্ক (مكلف) না হওয়ার কারণে তার থেকে কোনো গুনাহের কাজ হয় না। তবে এই দোয়া পড়বে **اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا دُخْرًا وَاجْعَلْ لَنَا شَاَفِعًا وَمُسْتَعِيْنًا**। কোনো ব্যক্তি যদি জানাযার নামাজে এমন সময় শামিল হয় যে, ইমাম এক বা দুই তাকবীর বলে ফেলেছেন, তবে আগন্তুক ব্যক্তি কোনো তাকবীর বলবে না; বরং তার হাজির হওয়ার পর যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তার সাথে সে-ও তাকবীর বলবে এবং ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো ইমামের সালাম ফিরাবার পর কাজ করে নিবে। এটা হলো তরফাইনের মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, হাযির হওয়ার সাথে সাথেই ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলবে। তাঁর দলিল হলো, প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার পর আগন্তুক ব্যক্তি মাসবুকের অনুরূপ হয়ে যায়। আর মাসবুক শামিল হওয়ার পর তাকবীরে তাহরীমা অবশ্যই বলে তাই এ ব্যক্তিও বলবে। তরফাইনের দলিল হলো, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মাসবুকের অনুরূপ। কিন্তু জানাযার নামাজের প্রতিটি তাকবীর একেক রাকআতের স্থলবতী। এ কারণেই তো জানাযার নামাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে **كَانَ يَنْتَبِهُ الظُّهْرُ**। উল্লেখ্য যে, মাসবুক ছুটে যাওয়া রাকআত ওলোর কাজ। ইমামের সালাম ফিরাবার পর করে থাকে, আগে নয়। কেননা সালামের পূর্বে কাজ করার হুকুম রহিত আছে। কোনো ব্যক্তি শুরু থেকে উপস্থিত ছিল কিন্তু ইমামের সাথে তাকবীর বলেন, তবে এই ব্যক্তি ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। কেননা এই ব্যক্তি মুদরিকের ন্যায়।

وَيَقُومُ الَّذِي يَصِلُنِي عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ  
الْإِيمَانِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إِشَارَةً إِلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّهُ  
يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِذَاءِ رَأْسِهِ وَمِنَ الْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ وَسْطِهَا لِأَنَّ أُنْثَى (رض) فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ  
هُوَ السَّنَةُ فَلَمَّا تَأَوَّلَهُ أَنْ جَنَازَتَهَا لَمْ تَكُنْ مَنَعُوشَةً فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ -

অনুবাদ : যে (ইমাম) পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর (জানায়ার) নামাজ পড়বে সে বুক বরাবর দাঁড়াবে। কেননা তা কলবের স্থান এবং তাতেই ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই বরাবর দাঁড়ানোর অর্থ এই দিকে ইঙ্গিত করা যে, তার ঈমানের কারণে শাফাআত করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মাঝামাঝি দাঁড়াবে। কেননা আনাস (রা.) এক্সপ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই সুন্নত। আনাস (রা.) সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে, উক্ত মহিলার জানায়ার উপর অতিরিক্ত আবরণ ছিল না। কাজেই তিনি স্ত্রীলোকটির জানাযা এবং লোকদের সাথে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : জানাযা পুরুষের হোক বা স্ত্রীলোকের হোক, নামাজের সময় ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে। দলিল হলো, সিনা (বুক) হলো কলবের স্থান আর কলবের মধ্যে ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সিনা বরাবর দাঁড়ানোর দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত করে শাফাআত তার ঈমানের কারণে করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, জানাযা যদি পুরুষের হয় তবে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর যদি জানাযা স্ত্রীলোকের হয় তবে ইমাম তার মাঝামাঝি দাঁড়াবে। দলিল হলো আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস— رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِي سِجَّةِ الْمَرْيَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا جَنَازَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَنَعْنَعُهَا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى رَأْسِهِ خُرْفَةٌ تَقْبِيهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الدُّفْعَانِ قَالُوا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَلَمَّا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ أَنَسٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَثَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لَمْ يَحُلْ وَلَمْ يَسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ فَنَعُدُّ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْرَةَ الْمَرْأَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوهُمَا وَعَلَيْهَا نَعْنٌ أَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيئَتِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلَاتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زَيْدٍ يَا أَبَا حَمْرَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُنِي عَلَى الْجَنَائِزِ كَصَلَاةِكَ يُكَبِّرُ

অনেক লোকজন সহ গলি দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা বলল, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়রের জানাযা। (নাফে' বলেন,) আমিও জানায়ার সাথে চললাম। আমি দেখলাম যে, একটি লোক যার শরীরের উপর একটি পাতলা চাদর এবং গরম থেকে পরিম্রাণের জন্য মাথার উপর একটি কাপড় রয়েছে। আমি বললাম, এটা কোন দেশী কিষাণ? লোকেরা বলল, ইনি আনাস ইবনে মালিক (রা.)। নাফে' বলেন, যখন জানাযা জমিনের উপর রাখা হলো তখন আনাস (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। আমি আর তাঁর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। (সুতরাং আমি দেখলাম যে,) তিনি মাইয়েতের মাথার নিকট দাঁড়ালেন এবং চার তাকবীর এমনভাবে বললেন যে, অতি লম্বাও করেননি এবং দ্রুতও বলেননি। অতঃপর তিনি বসতে লাগলেন। লোকেরা বলল, ওহে আবু হামযা (আনাস ইবনে মালিক) এক আনসারী স্ত্রীলোকের জানাযাও রয়েছে। লোকেরা (এ জানাযা) আনাস (রা.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন, তার উপর একটি সবুজ রংয়ের একটি না'শ খাটের উপরে তক্তা ছিল। তিনি তার নিতম্বের পাশে অর্থাৎ মাঝামাঝি দাঁড়ালেন আর নামাজ পড়ালেন যেমনটি পুরুষের পড়িয়েছিলেন। অতঃপর বসে গেলেন। আলা ইবনে যিয়াদ বললেন, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কি জানায়ার নামাজ এমনটি পড়েছিলেন? আনাস (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, হযরত আনাস (রা.) উক্ত তরীকাকেই সুন্নত বলেছেন।

হিদায়া প্রণেতা উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আনসারী স্ত্রীলোকটির জানায়ার উপর না'শ কিন্তু এর দ্বারা স্ত্রীলোকটির পর্দা হচ্ছিল না। এ জন্য আনাস (রা.) এ স্ত্রীলোক আর লোকদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্য মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে গ্রন্থকারের উক্ত ব্যাখ্যাটি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, হাদীসের মধ্যে পরিভ্রাণভাবে نَعْنٌ عَلَيْهَا বাক্যটি রয়েছে। وَبَيْنَهُمَا



فَإِنْ صَلَّيْتَ جَنَازَةً رُكْبَانًا أَجْزَأَهُمْ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ لَا تُجْزِيهِمْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مِنْ وَجْهِ لَوْ جُودَ التَّحْرِيمَةُ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ أَحْتِيَاظًا وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ حَقُّ الْوَلِيِّ فَيَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ لَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ أَيْ الْإِعْلَامِ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ.

অনুবাদ : যদি লোকেরা সওয়ার অবস্থায় জানাযা পড়ে তবে তা জায়েজ হবে সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। কেননা ইহা মূলত দোয়া। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবিক জায়েজ হবে না। কেননা তাহরীমা বিদ্যমান থাকার কারণে একদিক থেকে তাও নামাজ। সুতরাং সতর্কতার খতিরে ওজর ছাড়া কিয়াস তরক করা জায়েজ হবে না। জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান অবৈধ নয়। কেননা অগ্রবর্তিতা হলো ওলীর হক। সুতরাং অন্যকে অগ্রবর্তী করে নিজের হক বাতিল করার তিনি অধিকার রাখেন। কোনো কোনো নুসখা বা অনুলিপিতে اذن (অনুমতি)-এর পরিবর্তে اذان শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হলো লোকদের জানিয়ে দেওয়া অর্থাৎ একে অন্যকে অবহিত করবে, যাতে তারা মাইয়েতের হক আদায় করতে পারে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সওয়ারির উপর আরোহণ করে জানাযার নামাজ পড়া কিয়াস মুতাবিক জায়েজ। কিন্তু ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবিক জায়েজ নয়। কিয়াসের কারণ হলো, জানাযার নামাজ মূলত দোয়ার নাম। এ কারণেই জানাযার নামাজে কিরাআত নেই, রুকু সিজদা নেই। সুতরাং যেমনিভাবে অন্যান্য দোয়া সওয়ারির উপর পড়া জায়েজ এমনিভাবে জানাযার নামাজও জায়েজ। ইসতিহসানের কারণ হলো, জানাযার নামাজ একদিক থেকে নামাজ। কেননা জানাযার নামাজের মধ্যে তাহরীমা রয়েছে। একমাত্র ওয়াক্ত রাত্তীত অন্যান্য নামাজের জন্য যা যা শর্ত রয়েছে জানাযার জন্যও তা তা রয়েছে। সুতরাং সতর্কতার কারণে ওজর ছাড়া কিয়াসকে তরক না করাই উচিত। আর সওয়ারির উপর নামাজ পড়ার সুরতে যেহেতু কিয়াস তরক করতে হয় এ জন্য সওয়ারির উপর জানাযার নামাজ পড়া জায়েজ হবে না।

لَبَّاسٌ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ : উক্ত মতনটির দু'টি নুসখা বা অনুলিপি রয়েছে। একটি হলো صَلَاةِ الْجَنَازَةِ : অপরটি হলো لَبَّاسٌ بِالْإِذْنِ প্রথম নুসখা হিসাবে ইবারতটির দু'টি মতলব বা মর্মার্থ হবে। এক, ওলী যদি অন্য কাউকে জানাযার নামাজ পড়াবার ইজায়ত দেয় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা ইমামত হলো ওলীর হক। সুতরাং সে যদি অন্যকে ইমাম বানিয়ে নিজের হক বাতিল করতে চায়, বাতিল করতে পারবে। দ্বিতীয় মতলব হলো, জানাযার নামাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর যদি ওলী লোকদেরকে বাড়ি ফেরার ইজায়ত দিয়ে দেয় এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা দাফন সমাধা করার পূর্বে ওলীর ইজায়ত ব্যতীত লোকদের ঘরে ফিরা জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় নুসখার ভিত্তিতে ইবারতের মর্মার্থ হলো, জানাযার নামাজের ব্যাপারে অবহিত করা এবং লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

وَالرَّسُولُ ﷺ : বালেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মারা যায় তখন আমাদের তার নামাজের খবর দিও। কোনো কোনো মুতায়াক্বিখীন ঐ ব্যক্তির জানাযার নামাজের জন্য বাজারের মধ্যে ইলান করাকে উত্তম বলেছেন যার নামাজের জন্য লোকেরা উৎসাহী যেমন- আলিম, ইবাদত ওয়ার ব্যক্তি প্রমুখ।

وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَا تَهْ بَنَى لِإِدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ وَلَا تَه يَحْتَمِلُ تَلَوْنَتِ الْمَسْجِدِ وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ -

অনুবাদ : জামাআত হয় এমন মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়বে না। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ পড়বে তার কোনো ছওয়াব নেই। তা ছাড়া এ জন্যও যে, মসজিদ তো তৈরি হয়েছে ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য। তদুপরি মসজিদ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাইয়েত যদি মসজিদের বাইরে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে মশায়েখগণের মতবিরোধ রয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইনাযা গ্রন্থকার উপরোক্ত ইবারতটি বিশ্লেষণ (حل) করতে গিয়ে বলেন, যদি শুধু জানাযা (মাইয়েত) মাসজিদের মধ্যে আর ইমাম ও মুসল্লী মসজিদের বাইরে হয় তবে হানাফী আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ হবে। আর যদি মাইয়েত, ইমাম এবং কিছু লোক মসজিদের বাইরে হয় অন্যান্য সব মসজিদের ভিতরে হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ হবে না। যদি শুধু মাইয়েত বাইরে হয় তবে মশায়খদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মাকরুহ হবে, আবার কেউ কেউ বলেছেন মাকরুহ হবে না। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কোনো অবস্থাতেই মাকরুহ নয়। অর্থাৎ শুধু মাইয়েত যদি মসজিদের ভিতরে হয় তবুও তার উপর নামাজ পড়া মাকরুহ নয়। তাঁর দলিল হলো, যখন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ওফাত হলো, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর লাশ মসজিদের ভেতর প্রবেশ করানো হোক। এমনকি আশওয়াজ মূলতাহারাত সকলেই তাঁর জানাযার নামাজ পড়েছেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর আশপাশের কিছু লোকদেরকে বললেন, কেউ কি আমাদের এই কাজের দোষ বর্ণনা করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ (লোকেরা এর উপর প্রশ্ন তুলেছে) হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, লোকেরা কত দ্রুত ভুলে গিয়েছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহাইল ইবনে বাযযার জানাযা মসজিদের ভিতরেই পড়েছেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মসজিদের ভিতরে জানাযার নামাজ মাকরুহ ছাড়া জায়েজ আছে। অন্যথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ফকীহায়ে উম্মত হযরত আয়েশা (রা.) মসজিদের ভিতর কিভাবে জানাযার নামাজ পড়েছেন।

আমাদের দলিল হলো হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- إِنْ رَسَلَ إِلَيْهِ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ رَأْسُ لُحْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতর জানাযার নামাজ পড়ে তার কোনো ছওয়াব নেই। দ্বিতীয় দলিল হলো, মসজিদ ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ মসজিদে আদায় না করা ই সমীচীন। তৃতীয় দলিল হলো, যদি জানাযা মসজিদের মধ্যে রাখা হয় তবে এর দ্বারা মসজিদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য ওজর ছাড়া মসজিদের মধ্যে মাইয়েতকে উপস্থিত করা মাকরুহ। আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জওয়াব হলো, তৎকালে আনসার ও মুহাজিরগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হযরত আয়েশার আমলকে (কাজটিকে) দোষারোপ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ঐ সময়ও মসজিদের ভিতর জানাযার নামাজ মাকরুহ হওয়া প্রশংসিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সুহাইলের জানাযা মসজিদের ভিতরে পড়েছেন তা এ কারণে ছিল যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকারফরত (معتكف) ছিলেন। তাঁর পক্ষে মসজিদের থেকে বের হওয়া অসম্ভব ছিল। এ জন্য তিনি জানাযা আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুতরাং জানাযা মসজিদের বাইরে রাখা হলো আর তিনি মসজিদের ভিতরে থেকেই নামাজ পড়লেন। আমাদের মতে জানাযা যদি মসজিদের বাইরে হয় আর লোকেরা মসজিদের ভিতরে থেকে নামাজ পড়ে তবে মাকরুহ হবে না। তাই প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকারফের ওজর ছিল। দ্বিতীয়ত জানাযা মসজিদের ভিতরে ছিল না বরং মসজিদের বাইরে ছিল। এ জন্য উক্ত হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করা সমীচীন হবে না।

وَمَنْ بَعْدَ الْوِلَاةِ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَ  
 الْمَوْلُودُ صَلَّيْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهَلْ لَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ وَلَاقِ الْأَسْتِهْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيَاةِ  
 فَتُحَقَّقُ فِي حَقِّهِ سَنَةُ الْمَوْتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَهَلْ أُذِرَجَ فِي خَرْقَةِ كَرَامَةٍ لِبَنِي آدَمَ وَلَمْ  
 يَصَلَّ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا وَيُغْسَلُ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهِ وَهُوَ  
 الْمُخْتَارُ -

অনুবাদ : ভূমিষ্ট হওয়ার পর যে শিশু কেঁদে উঠে, তার নাম রাখা হবে ও তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ صَلَّيْ عَلَيْهِ নবজাতক যদি কেঁদে উঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর যদি না কাঁদে তবে তার উপর জানাযা পড়া হবে না। যেহেতু কেঁদে উঠা হলো প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ। সুতরাং তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন কার্যকর হবে। যে শিশু কান্না-কাটি করেনি তাকে কাপড়ে জড়িয়ে (কবরস্থ করে) দেওয়া হবে। এটা করা হবে আদম সন্তানের মর্যাদা রক্ষার্থে। তবে তার জানাযা পড়া হবে না। এর কারণ ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। অবশ্য গায়রে যাহিরী রিওয়ায়াত মতে তাকে গোসলও দেওয়া হবে। কেননা এক হিসাবে সেও প্রাণী। এটি-ই পছন্দনীয় মত।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِسْتِهْلَالٌ: জন্মের সময় শিশুর উচ্চ আওয়াজ। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো, এমন জিনিস পাওয়া যাওয়া যা শিশুর প্রাণের প্রমাণ বহন করে। যেমন নবজাতকের কোনো অঙ্গ নড়াচড়া করা, তার কান্নার শব্দ বের হওয়া ইত্যাদি। শিশু যদি জন্ম হওয়ার পরই মারা যায়, অর্থাৎ জন্মের সময় তার মধ্যে প্রাণের কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল পরে মরে গেল, তবে এই শিশুরও নাম রাখা হবে। তাকে মাইয়েতের গোসল দেওয়া হবে। তার জানাযাও পড়া হবে। দলিল হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী- إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ صَلَّيْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهَلْ لَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ নবজাতক যদি কেঁদে উঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে আর যদি না কাঁদে, তবে তার জানাযা পড়া হবে না। আকলী দলিল হলো, إِسْتِهْلَالٌ তথা শিশুর আওয়াজ বের হওয়া তার প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাই তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে না। আর যে শিশু জন্মের সময় কান্না-কাটি করেনি এবং তার জীবিত থাকার অন্য কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি, তবে তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে কোনো গর্তে (কবরে) রাখা হবে। এটাও আদম সন্তানদের সম্মানার্থে করা হবে। আর তার জানাযাও পড়া হবে না। দলিল ইতিপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তবে গায়রে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাকে গোসল দেওয়া হবে। দলিল হলো, সে তো এক হিসাবে শরীরের একটি অংশ এবং এক হিসাবে প্রাণীও বটে। উভয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেহেতু শরীরের একটি জুখ বা অংশ তাই তার উপর নামাজ পড়া হবে না। আর যেহেতু এক হিসাবে প্রাণী তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এবং এটাই পছন্দনীয় মত।

وَإِذَا سُبِيَّ صَبِيٍّ مَعَ أَحَدِ آبَوَيْهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَبَعَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُفَرَّ  
بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُ لِأَنَّهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ إِسْتِحْسَانًا أَوْ يُسَلِّمَ أَحَدُ آبَوَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ خَيْرَ  
الْأَبَوَيْنِ دِينًا وَإِنْ لَمْ يُسَبِّ مَعَهُ أَحَدُ آبَوَيْهِ صَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ  
فَحُكِمَ بِالْإِسْلَامِ كَمَا فِي اللَّقِيطِ -

**অনুবাদ :** কোনো শিশু যদি তার (অমুসলিম) মা বাবার কোনো একজনের সঙ্গে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা (ধর্মের দিক থেকে) সে পিতামাতার অনুবর্তী। তবে যদি সে ইসলাম স্বীকার করে নেয় এবং তার বোধশক্তি থেকে থাকে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তার ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ। কিংবা যদি পিতামাতার কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কেননা ধর্ম হিসাবে সে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। যদি পিতামাতার একজনও তার সঙ্গে বন্দী না হয় তবে জানাযা পড়া হবে। কেননা তখন তার ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পাবে। ফলে তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি কোনো শিশু পিতামাতার মধ্য থেকে কোনো একজনের সাথে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে না। কেননা শিশুটি পিতামাতার তাহে তথা অনুবর্তী হয়ে কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **الرُّلْدُ** শিশু ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, শিশু ধর্মের দিক থেকে পিতামাতার অনুগামী হয়। আর যেহেতু এখানে পিতামাতা কাফির তাই শিশুটিও কাফির হবে বলে গণ্য। আর কাফিরের উপর জানাযার নামাজ পড়া হয় না। এ জন্য এই শিশুটিরও জানাযার নামাজ পড়া হবে না। হ্যাঁ যদি শিশু বুর্তমান হয় এবং ইসলাম স্বীকার করে নেয় কিংবা তার পিতামাতার কেউ মুসলমান হয়ে যায়, তবে ঐ শিশুটির উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে। ইসলাম স্বীকার করার সুরতে এই কারণে যে সূক্ষ্ম কিয়াসের (إِسْتِحْسَانٌ) দৃষ্টিতে তার মুসলমান হওয়া সহীহ হয়েছে। আর পিতামাতার এক জনের মুসলমান হওয়ার সুরতে এ কারণে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে যে, শিশু ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তম জনের অনুগামী হয়। আর ধর্ম হিসাবে পিতামাতার উত্তমজন সে-যিনি মুসলমান হয়ে গেছেন। সুতরাং শিশুটিও তার অনুগামী হয়ে মুসলমান বলে গণ্য হবে। আর মুসলমানের যেহেতু জানাযার নামাজ পড়া হয়, তাই এ শিশুটিরও জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর যদি শিশুটি বন্দী হয় কিন্তু তার সঙ্গে তার পিতামাতার কেউ বন্দী না হয় এবং শিশুটি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাযা পড়া হবে। কেননা তার ব্যাপারে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়। অর্থাৎ এক ব্যক্তি জঙ্গল বা অন্য কোথাও একটি শিশু পেল, তার কোনো উত্তরসূরি এবং অভিভাবকও জানা নেই। এখন এ শিশুটি যদি দারুল ইসলামে পেয়ে থাকে তবে তার অনুবর্তী হিসাবে তাকে মুসলমান হিসাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

وَأَذًا مَاتَ الْكَافِرُ وَلَهُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يُغَسِّلُهُ وَيُكْفِنُهُ وَيَدْفِنُهُ بِذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى (ارض) فِيهِ أَيْ طَالِبٍ لَكِنْ يُغَسَّلُ غُسْلُ الشُّوْبِ النَّجِيسِ وَيُلْفُ فِي خِرْقَةٍ وَتُحْفَرُ حَفِيرَةٌ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ سُنَّةِ التَّكْفِينِ وَاللَّحْدِ وَلَا يُوَضَّعُ فِيهِ بَلْ يُلْقَى .

**অনুবাদ :** যদি কোনো কাফির মৃত্যুবরণ করে আর তার কোনো মুসলমান অভিভাবক থাকে তবে সে তার গোসল দিবে, কাফন পরাবে এবং তাকে দাফন করবে। হযরত আলী (রা.)-কে তার পিতা আবু তালিব সম্পর্কে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। তবে তাকে গোসল দিবে নাপাক কাপড় ধোয়ার মতো। আর একটি বস্ত্র খণ্ডে পঁচানো হবে এবং একটি গর্ত খোঁদা হবে। কাফন ও কবরের বেলায় সুন্নত তরীকা অনুসরণ করা হবে না এবং যত্নের সাথে কবর নামানো হবে না; বরং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**মাসআলা :** যদি কোনো কাফির মরে যায় এবং তার কোনো কাফির অভিভাবক না থাকে, বরং মুসলমান অভিভাবক থাকে অর্থাৎ ঐ কাফির ব্যক্তির কোনো নিকটতম আত্মীয় মুসলমান হয় তবে এই মুসলমান অভিভাবক তাকে নাপাক কাপড় ধোয়ার ন্যায় ধুয়ে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে কোনো একটি গর্তে ফেলে আসবে। দলিল হলো, আবু তালিবের ইন্তেকালের খবর যখন হযরত আলী (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দিলেন, তখন তিনি বললেন **اغسله وكفنه واوره ولا تحدث به حديثا حتى**। অর্থাৎ তাকে গোসল দাও, কাফন পরাও এবং জমিনে লুকিয়ে রাখো। এরপর কোনো কথা না বলে আমার নিকট এসো। অর্থাৎ তার নামাজ পড়বে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো সুন্নত তরীকা অনুযায়ী দাফন কাফন না করা। একেই হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কাফির মাইয়েতেকে নাপাক কাপড়ের ন্যায় ধোয়া হবে। সাধারণ কোনো কাপড়ে পঁচানো হবে এবং গর্ত খুঁদে তাতে ফেলে দেওয়া হবে। আর যদি কাফির মাইয়েতের কাফির অভিভাবক বিদ্যমান থাকে, তবে মুসলমানের জন্য উচিত যে, সে কাফির মাইয়েত আর কাফির অভিভাবকের মাঝে সম্পর্ক করে দেবে। তারা তার সাথে যা ইচ্ছা মুয়ামলা করবে।

এর ইবারত **وَلَهُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ** দ্বারা নিকটতম আত্মীয় উদ্দেশ্য। কেননা মুসলমান ও কাফিরের মাঝে হাকীকী অভিভাবকত্ব থাকে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন **وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى** হে মুসলমান! তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে ওলী বানিও না।

## فَصَلِّ فِي حَمِلِ الْجَنَازَةِ

وَإِذَا حَمَلُوا الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ بِذَلِكَ وَرَدَّتِ السُّنَّةُ وَفِيهِ تَكْثِيرُ الْجَمَاعَةِ وَزِيَادَةُ الْإِكْرَامِ وَالصَّبَابَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السُّنَّةُ أَنْ يَحْمِلَهَا رَجُلَانِ يَضَعُهَا السَّابِقُ عَلَى أَصْلٍ عَنْقِيهِ وَالثَّانِي عَلَى صَدْرِهِ لِأَنَّ جَنَازَةَ سَعِيدِ بْنِ مَعَاذٍ هَكَذَا حُمِلَتْ قُلْنَا كَانَ ذَلِكَ لِإِزْدِحَامِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَيَمْتَشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبَبِ لِأَنَّهُ ﷺ جِنَنَ سُئِلَ عَنْهُ قَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ وَإِذَا بَلَّغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُزَوَّجَ عَنْ أَغْنَاءِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ قَدْ تَفَعَّ الْحَاجَةُ إِلَى التَّعَاوُنِ وَالْقِيَامِ أَمَكْنَ مِنْهُ وَكَفَيْفَةُ الْحَمْلِ أَنْ تَضَعَ مُقَدَّمَ الْجَنَازَةِ عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى بَسَارِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى بَسَارِكَ إِنِ شَاءَ لِلتَّيَامُنِ وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ .

### অনুচ্ছেদ : জানাযা বহন করা

অনুবাদ : মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা চারপায়া ধরে খাটিয়া উঠাবে। হাদীসে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এতে জানাযার সহযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং অধিকতর রয়েছে জানাযার সম্মান ও হেফাজত। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো, জানাযা দু'জন লোক বহন করবে। সামনের জন (খাটিয়ার হাতল) কাঁধে স্থাপন করবে। দ্বিতীয়জন বুক বরাবর ধারণ করবে। কেননা হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। এর জওয়াবে আমাদের বক্তব্য হলো, তা করা হয়েছিল সা'আদ (রা.)-এর জানাযায় ক্ষেপ্তরতাগণের ভিড়ের কারণে। আর জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। তবে দৌড়ে নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন مَا دُونَ الْخَبَبِ দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। যখন লোকেরা মাইয়েতের কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন মাইয়েতকে কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে উপস্থিত লোকদের বসে পড়া মাকরুহ। কেননা কখনো সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আর দাঁড়ানো অবস্থায় তা অধিক সম্ভবপর। আর জানাযা বহনের নিয়ম হলো, প্রথমে জানাযার সামনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার পিছনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার সামনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এরপর পিছনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এটা করা হবে ডান দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য। এ নিয়ম হলো পালাক্রমে বহনের ক্ষেত্রে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত অনুচ্ছেদের মধ্যে জানাযা বহনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, মাইয়েতকে খাটিয়ায় কিংবা চৌপায়ায় রাখবে এবং চৌপায়ায় চারপায়া ধরবে। অর্থাৎ চার ব্যক্তি চারপায়া ধরবে। সুন্নত তরীকা এটাই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, السُّنَّةُ أَنْ تُحْمَلَ الْجَنَازَةُ مِنْ حَوَائِشِهَا الْأَرْبَعَةِ. সুন্নত হলো জানাযাকে তার চারদিক থেকে বহন করা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—مِنْ حَمْلِ الْجَنَازَةِ مِنْ حَوَائِشِهَا الْأَرْبَعَةِ غَيْرَ لَهُ مَغْفِرَةٌ مُرْجَبَةٌ—যে ব্যক্তি জানাযা তার চতুর্দিক থেকে বহন করল তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, এর দ্বারা জামাআতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা জানাযার সাথে যদি কোনো লোক না যায় তবে এই চারজন মিলে অবশ্যই

জানাযা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, চারজন দ্বারা একটি জামাআত হয়ে যায়। আর চার ব্যক্তি বহন করার দ্বারা জানাযার ইকরামও হয়। কেননা একটি দল তাদের কাঁধের উপর তাকে বহন করে রাখছে আর যাকে বহন করে রাখা হয়েছে তার মর্যাদাবান ও সম্মানিত হওয়ার ক্ষেত্রে কি সন্দেহ থাকতে পারে! তাছাড়া চার ব্যক্তির জানাযা বহন করার দ্বারা জমিনের উপর পড়ে যাওয়া থেকে হিফাজতেও থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো দুই জন লোক জানাযা এভাবে বহন করবে যে, সামনের ব্যক্তি জানাযা তার কাঁধের উপর রাখবে আর পিছনের ব্যক্তি তার বুকে ধারণ করবে। দলিল হলো, হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) -এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, হযরত সা'আদ (রা.)-এর জানাযার সময় ফেরেশতাগণের ভিড়ের কারণে এমনটি করা হয়েছিল। তাইতো বর্ণিত আছে যে, হযরত সাআদ ইবনে মু'আয (রা.) শাহাদাতের সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা জমিনে অবতরণ করেছিলেন। এর পূর্বে কখনো এই পরিমাণ সংখ্যক ফেরেশতা জমিনে অবতরণ করেনি। মোট কথা, হযরত সা'আদ (রা.)-এর জানাযা দুইজনে বহন করার কারণ ছিল রাস্তা সংকুচিত হওয়া। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ ﷺ পায়ের পাঞ্জার উপর ভর করে চলছিলেন। ইমাম কদুরী (র.) বলেন, জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে তবে দৌড়ে নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যখন জানাযার সাথে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি مَآ دُونَ النَّحْبِ বলেছিলেন। অর্থাৎ হলো- দৌড়ানো অর্থাৎ তিনি চলার মধ্যে দ্রুতভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে দৌড়ানো নিষেধ করেছেন। দ্রুততার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, জানাযা যদি নেককার হয় তবে তাকে আল্লাহর দরবারে দ্রুত পৌঁছিয়ে দাও। আর যদি বদকার হয় তবে এই বালাকে দ্রুত নিজের কাঁধ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর দৌড়ানো এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মাইয়েতের অবমাননা হয়। আমাদের মতে জানাযার পিছনে পিছনে চলা মুস্তাহাব। ইমাম শাফি'ঈ (র.) -এর মতে জানাযার আগে আগে চলা উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। আমাদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর জানাযার পিছনে পিছনে চলতেছিলেন। হযরত আলী (রা.)ও জানাযার পিছনে পিছনে চলতেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, فَضَّلَ النَّبِيُّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ عَلَى النَّبِيِّ أَمَامَهَا كَفَضَّلَ الْكُفْرَةَ عَلَى النَّبِيِّ জানাযার আগে আগে চলার তুলনায় জানাযার পিছনে চলার ফজিলত এমন যেমন ফরজের ফজিলত নফলের উপর। শায়খাইন (র.)-এর আমলের জওয়াব হলো, হযরত আলী (রা.) জানাযার পিছনে পিছনে চলতেন। হযরত আলীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আবু বকর ও ওমর (রা.) তো সামনে সামনে চলেন, তখন হযরত আলী বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা জানাযার আগে আগে চলতেন। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন তাঁদের জানা ছিল যে, জানাযার পিছনে চলা উত্তম। কিন্তু মানুষের আসানির জন্য তারা সামনে থাকতেন।

وَأَذًا بَلْعُورًا إِلَى قَبْرِ الْخ যখন লোকেরা মাইয়েতকে নিয়ে তার কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন জানাযা জমিনের উপর রাখার পূর্বে অন্যান্য লোকদের বসে যাওয়া মাকরুহ। কেননা কখনো কখনো জানাযার লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর সময় মতো লোকদের সাহায্যে তখনই অধিক হারে নেওয়া সম্ভব যখন সে দাঁড়িয়ে থাকবে। এজনা বলা হয়েছে যে, জানাযা জমিনে অবতরণ করার পূর্বে লোকদের বসা মাকরুহ। আর যখন জানাযা জমিনের উপর রাখা হয় তখন লোকদের দাঁড়িয়ে থাকা মাকরুহ। দ্বিতীয় দলিল হলো, জানাযা থাকাকালে মাইয়েতের সন্ধান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব। আর জানাযা অবতরণের পূর্বে লোকদের বসে যাওয়ার দ্বারা মাইয়েতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়। তাই জানাযা অবতরণের পূর্বে বসা মাকরুহ।

হিদায়া গ্রন্থকার জানাযা বহনের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথম মাইয়েতের সামনের ডান পার্শ্বকে নিজের ডান কাঁধের উপর রাখবে, তারপর পিছনের ডান অংশকে ডান কাঁধের উপর রাখবে, অতঃপর মাইয়েতের সামনের বাম অংশকে নিজের বাম কাঁধের উপর রাখবে, তারপর পিছনের বাম অংশকে নিজের বাম কাঁধের উপর রাখবে। দলিল হলো, এই সূরতে ডান দিক অগ্রাধিকার পাবে। কেননা খাটিয়ার সামনের বাম অংশ মাইয়েতের ডান অংশ। কারণ মাইয়েতকে খাটিয়ার উপর চিত করে শুইয়ে রাখা হয়। সুতরাং যখন খাটিয়ার সামনের বাম অংশকে জানাযা বহনকারী তার ডান কাঁধের উপর রাখবে তখন এটা মাইয়েতেরও ডান অংশ হবে, জানাযা বহনকারীরও ডান অংশ হবে। গ্রন্থকার বলেন, এ সূরত তখনই সম্ভব হবে যখন বহনকারীগণ পালাক্রমে বহন করবে। আর যদি বহনকারী শুধু চার ব্যক্তি হয় তবে একই অবস্থায় কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

## فَصَلِّ فِي الدَّفْنِ

وَيُخَفِّرُ الْقَبْرَ وَيُلْحَدُ لِقَوْلِهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعِزِّنَا وَيُدْخُلُ الْمَيِّتَ مِمَّا  
يَلِي الْقِبْلَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ عِنْدَهُ سَلًّا لِمَا رَوَى أَنَّهُ ﷺ سَلَّ سَلًّا لَنَا أَنَّ  
جَانِبَ الْقِبْلَةِ مُعْظَمٌ فَيُسْتَحَبُّ الْإِذْخَالُ مِنْهُ وَاضْطَرَّتِ الرِّوَايَاتُ فِي ادْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ .

### অনুচ্ছেদ : দাফন

**অনুবাদ :** কবরকে লাহাদ রূপে খনন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাহাদ হলো আমাদের জন্য। আর খাড়া কবর হলো অন্য জাতির জন্য। মাইয়েতকে কিবলার দিক থেকে (গ্রহণ করে) দাখিল করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে মাইয়েতকে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -কে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হয়েছিল। আমাদের দলিল হলো, কিবলার দিক হলো সম্মানিত। সুতরাং সে দিক থেকে প্রবেশ করানোই মোস্তাহাব হবে। আর নবী করীম ﷺ -কে কবরে প্রবেশ করানো সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লাহাদ কবর হলো কবরের ভিতর কিবলার দিকে কিছুটা গভীর করে দেওয়া। অর্থাৎ বগলী বানিয়ে দেওয়া এটাকেই বগলী কবর বলা হয়। খাড়া কবর হলো হলো, চওড়া কবর খনন করে তার ভিতর সরু নালীর অনুরূপ বানিয়ে তার মধ্যে মাইয়েতকে দাফন করা। (ইনায়া) মোটকথা আমাদের মতে কবর খনন করে লাহাদ বানানো সুন্নত। তবে শর্ত হলো জমিন নরম না হওয়া। আর যদি জমিন এত নরম হয় যে, লাহাদ বানানো অসম্ভব তবে খাড়া কবর বানানো জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে লাহাদ কবর সুন্নত নয় খাড়া কবর সুন্নত। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, খাড়া কবরের উপর মদীনাবাসীদের উত্তরাধিকারিত্ব রয়েছে অর্থাৎ মদীনাবাসী লোকদের থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে এটাই চলে এসেছে যে, তারা মুসলমান মাইয়েতের জন্য লাহাদ কবর খনন করে না বরং খাড়া কবর খনন করে। আমাদের দলিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- **الْحَدُّ لَنَا وَالشَّقُّ لِعِزِّنَا** ইমাম শাফি'ঈ (রা.)-এর দলিলের জবাব হলো, জান্নাতুল বাকীর (মদীনা শরীফের কবরস্থান) জমি নরম এবং পাতলা ঐ জমিতে লাহাদ বানানো অসম্ভব তাই মদীনাবাসীগণ খাড়া কবর বানান। দ্বিতীয় ইখতিলাফ হলো, আমাদের মতে মাইয়েতকে কবরে দাখিল করানোর সুন্নত তরীকা হলো, মাইয়েতকে ঐ দিক থেকে কবরে দাখিল করানো হবে যা কিবলার সাথে সম্পূর্ণ অর্থাৎ জানাযা কবরের কিবলার দিকে রাখা হবে সেখান থেকে মাইয়েতকে উঠিয়ে লাহাদ কবরে রাখা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, সুন্নত হলো মাইয়েতকে তার কবর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। তার পদ্ধতি হলো, জানাযা কবরের পায়ের দিকে এমনভাবে রাখা হবে যে, মাইয়েতের মাথা কবরের মধ্যে তার পায়ের স্থানের বরাবর হবে। অতঃপর কবরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করতে সে মাইয়েতের মাথা ধরে কবরে প্রবেশ করাবে এবং তাকে টানতে থাকবে। কেউ কেউ বলেন তার পদ্ধতি হলো, জানাযা কবরের থেকে পার্শ্বে এমনভাবে রাখা হবে যে, মাইয়েতের উভয় পা তার মাথার বরাবর হবে। অতঃপর মাইয়েতের উভয় পা ধরে প্রথমে তাকে কবরে প্রবেশ করানো হবে; অতঃপর টেনে পুরো মাইয়েতকে কবরে অবতরণ করাবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঐভাবেই টেনে কবরে অবতরণ করানো হয়েছিল। আমাদের দলিল হলো, কিবলার দিক হলো সম্মানিত, এ জন্য সেদিক থেকে প্রবেশ করানোই মোস্তাহাব হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবরে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী রয়েছে। কোনো বর্ণনায় কিছু আর অপর বর্ণনায় অন্য কিছু রয়েছে। এ জন্য এই বর্ণনাগুলো দলিলযোগ্য নয়।



فَإِذَا وَضَعَ فِي لَحْدِهِ يَقُولُ اِخْلَعْهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ كَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 جِبْنٌ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةَ فِي ۖ رَوَّحَهُ إِلَى الْقَبْلَةِ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَحُلُّ الْعُقْدَةَ  
 لِقُفُوعِ الْأَمْنِ مِنَ الْإِنْتِشَارِ وَيُسَوِّي اللَّيْنُ عَلَى اللَّحْدِ لِأَنَّهُ جَعَلَ عَلَى قَبْرِهِ اللَّيْنِ  
 وَيُسَجِّى قَبْرَ الْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّيْنُ عَلَى اللَّحْدِ وَلَا يَسْجِي قَبْرَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ  
 مَبْنَى حَالِيهِنَّ عَلَى السَّيْرِ وَمَبْنَى حَالِ الرِّجَالِ عَلَى الْإِنْكَشَافِ وَكَرَهُ الْأَجْرُ وَالْخَشَبَ  
 لِأَنَّهُمَا لِأَحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرِ مَوْضِعُ الْبِلَى ثُمَّ بِالْأَجْرِ أَثَرُ النَّارِ فَيُكْرَهُ تَفَاؤُلًا وَلَا بَأْسَ  
 بِالْقَصَبِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُسْتَحَبُّ اللَّيْنُ وَالْقَصَبُ لِأَنَّهُ جَعَلَ عَلَى قَبْرِ طَيْنٍ  
 مِنْ قَصَبٍ ثُمَّ يَهَالُ التُّرَابُ وَيُسَمَّى الْقَبْرُ وَلَا يَسْطَحُ أَيْ لَا يَرُوعُ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ تَرْسِيعِ  
 الْقُبُورِ وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُسْتَمٌّ ۖ

অনুবাদ : মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হবে তখন অবতরণকারী আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিল্লাতের উপর রাখছি বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু দুজানাকে কবরে নামানোর সময় এ দোয়া বলেছিলেন। আর তাকে কিবলামুখী করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই আদেশ করেছেন। আর কাফনের গিরা খুলে দিবে। কেননা এখন আর সেরে যাওয়ার ভয় নেই। আর “লাহাদ” -এর মুখে কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কেননা নবী করীম ﷺ -এর কবর শরীফে কাঁচা ইট বসানো হয়েছিল। লাহাদের মুখে ইট বসানো পর্যন্ত স্ত্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। আর পুরুষের কবর কাপড় দ্বারা ঢাকতে হবে না। কেননা স্ত্রীলোকের অবস্থার ভিত্তি হলো পর্দার উপর আর পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হলো উন্মুক্ত থাকার উপর। পাকা ইট এবং কাঠ দেওয়া মাকরুহ, কেননা উভয়টি দ্বারা বিন্ধিৎ সুদৃঢ় করা হয়। কবর হল গলিত হওয়ার স্থান। তাছাড়া এই পাকা ইটের মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। তাই বদনামী হিসাবেও মাকরুহ হবে। বাঁশ ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। জামে সগীরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাঁচা ইট আর বাঁশ ব্যবহার করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরের উপর একটি বাঁশের গিটু ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর মাটি দেওয়া হবে এবং কবরকে কুহান তথা উটের পিটের উচ্চ হাড়ের অনুরূপ বানানো হবে। একেবারে সমতল বানাবে না। অর্থাৎ চতুর্কোণ বানাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরকে চতুর্কোণ বানাতে নিষেধ করেছেন। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরকে দেখেছে সে বলেছে ঐ কবরটি কোহনে ছিল। (ঝাড় বা উটের উচ্চ হাড়ের অনুরূপ ছিল)।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার বলেন, মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় এই দোয়া পড়বে بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ অন্য বর্ণনায় بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ -এর শব্দ রয়েছে। দলিল হলো, হযরত আবু দুজানা (রা.)-কে কবরে রাখার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। মাবসূত ও বাদায়ে নামক গ্রন্থদ্বয়ে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারও তাদের অনুসরণ করেছেন, অথচ এটা ভুল। কেননা আবু দুজানা আনসারী (রা.)-এর ওফাত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সিদ্ধীকে আকবর (রা.)-এর বিলাফতকালে জসে ইয়ামামার সময় হয়েছিল। সহীহ হলো হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুসুফাদাইনকে (আব্দুল্লাহ) কবরে রাখার সময় উক্ত দোয়া পড়েছিলেন। তা ছাড়া উক্ত দোয়ার প্রমাণ হযরত ইবনে ওমর

فَرَلَهُ وَبَكَّرَهُ الْأَمْرُ وَالْخَسْبُ لَأَنَّهُمَا النِّعَ : কবরের মধ্যে পাকা ইট এবং কাঠ লাগানো মাকরুহ। দলিল হলো, এগুলো দ্বারা নির্মাণ কাজের মজবুতী করা হয়। আর কবর হল গলিত হওয়ার জায়গা, তাই এই স্থানে এগুলো ব্যবহার করা অতিরিক্ত এবং অহেতুক কাজ বৈ-কি? তাই মাকরুহ। পাকা ইট লাগানোর মধ্যে মাকরুহ হওয়ার এ-ও কারণ যে, পাকা ইটের মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। তাই বদনামী হিসাবেও মাকরুহ। যেন তার আখ্যাতের ঘর আগুনের সাহায্যে তৈরি হয়েছে। (তাই মাকরুহ) বাঁশের বাঁশ বা বাঁশ ব্যবহারের কোনো অসুবিধা নেই। জামে সগীরে বর্ণিত হয়েছে যে, কাঁচা ইট ও বাঁশ ব্যবহার করা মোস্তাহাব। কুদুরীর ইবারত দ্বারা মোস্তাহাব বুঝা যায় না। জামে সগীরে ইবারত দ্বারা মোস্তাহাব বুঝা যায়। দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের উপর একটি বাঁশের বাঁশির গিট লাগানো হয়েছিল। তারপর কবরের উপর মাটি ঢেলে দিলে। কবরকে কোহান সদ্দুখ বানানো হবে। অর্থাৎ জমিন থেকে এক বিষত কিংবা এর চেয়ে কিছু উঁচু করে বানানো হবে। কবরকে চতুর্কোণ বানানো না। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে কবরকে চতুর্কোণ বানানো সুন্নত। কোহান বানানো সুন্নত নয়। তার দলিল হলো, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহেবজাদা ইব্রাহীমের ওফাত হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবরকে চতুর্কোণ বানিয়ে ছিলেন, কোহান বানাননি। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরগুলোকে চতুর্কোণ বানাতে বাধ্য করে গেছেন। ইব্রাহীমে নাখয়ী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে দেখেছে এবং শায়খাইন তথা যমরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর কবরকে দেখেছেন, সে আমাকে বলেছে যে, তাদের কবরগুলো কোহান সদ্দুখ ছিল। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর শেকতু দলিলের জওয়াব হলো, ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ﷺ-এর কবর প্রথম চতুর্কোণ ছিল, পরে কোহান সদ্দুখ করে দেওয়া হয়েছিল। মাসবুত এবং মুহীত নামক গ্রন্থদ্বয়ে এভাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহই সত্যক অবহিত।

## بَابُ الشَّهِيدِ

الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمَشْرِكُونَ أَوْ وَجَدَ فِي الْمَعْرِكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَّةٌ فَيُكْفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أَحَدٍ وَقَالَ ﷺ فِيهِمْ زَمَلُوهُمْ يَكْلُمُوهُمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَا تَغْسِلُوهُمْ فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ بِالْحَدِيدِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بِالْعِزِّ وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عَوَضٌ مَا لِيَ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُمْ فَيُلْحَقُ بِهِمْ وَالْمَرَادُ بِالْأَثَرِ الْجَرَاخَةُ لِأَنَّهَا دَلَالَةُ الْقَتْلِ وَكَذَا خُرُوجُ الدِّمِ مِنْ مَوْضِعٍ غَيْرِ مُغْتَادٍ كَالْعَيْنِ وَنَحْوِهِ وَالشَّافِعِيُّ يَخَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلِ السَّيْفِ مَحَاءً لِلذُّنُوبِ فَأَغْنَى عَنِ الشَّفَاعَةِ وَنَحْنُ نَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِهِ وَالشَّهِيدُ أَوْلَى بِهَا وَالطَّاهِرُ عَنِ الذُّنُوبِ لَا يَسْتَعْنِي عَنِ الدُّعَاءِ كَالنَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ -

### পরিচ্ছেদ : শহীদের বিবরণ

অনুবাদ : শহীদ ঐ ব্যক্তি যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিংবা যুদ্ধের মাঠে (মৃত) পাওয়া গেছে আর তার দেহে চিহ্নও রয়েছে। কিংবা মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে হত্যা করার কারণে দিয়ত ওয়াজিব হয়নি। এমন ব্যক্তিকে কাফর দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে কিন্তু গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে উহদের শহীদের শ্রেণীভুক্ত। আর তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাদেরকে তাদের জখম ও রক্তসহ আবৃত করে, গোসল দিওনা। সুতরাং যে কেউ লৌহাঙ্গ দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয় আর সে পবিত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার হত্যার বিনিময়ে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, সে উহদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে। সুতরাং তাকে তাদের সাথে যুক্ত করা হবে। চিহ্ন দ্বারা জখম উদ্দেশ্য। কেননা জখম নিহত হওয়ার আলামত। তেমনি অস্বাভাবিক স্থান থেকে রক্ত বের হওয়াও। যেমন, চোখ বা এঙ্গুর কোনো স্থান থেকে রক্ত রেব হওয়া। শাফি'ঈ (র.) জানাযার নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতভেদ করেছে। তিনি বলেন, তরবারির আঘাত ওনাহ মুছে ফেলে। সুতরাং (জানাযার নামাজের মাধ্যমে) দোয়া ইস্তিগ্ফারের প্রয়োজন নেই। আমরা এর জওয়াবে আইন মাইয়েদের জানাযা পড়া হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আর শহীদ তো অবশ্যই সম্মানের যোগ্য। তা ছাড়া পাপ থেকে পবিত্র ব্যক্তিও দোয়ার প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। যেমন নবী ও শিশু।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব কথা : নিহত ব্যক্তি (مقتول) -এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো যে, সে সময় মতো মৃত্যু বরণ করেছে। সময়ের আগে মরেনি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি সে সময় মতোই মৃতবরণ করে থাকে তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস বা দিয়ত কেন ওয়াজিব হয়? এর জবাব হলো, হত্যাকারী যেহেতু হত্যা করার কারণে পৃথিবীর আইন শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করেছে তাই পৃথিবীর আইন-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য হত্যাকারীর উপর উক্ত আইন আরোপ করা হয়েছে।

শহীদের আহকাম ভিন্ন পরিচ্ছেদে এ কারণে আনা হয়েছে যে, শহীদের মগত অন্যান্য মগতের তুলনায় অনেক দিক থেকে উত্তম। এমনকি আল্লাহর রাস্তার শহীদকে মৃত বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে মৃত বলা না বরং তারা জীবিত তবে তা তোমরা জান না। জানাযার পর শহীদের আলোচনা ذِكْرُ الْخَاصِّ نَعْدَ الْعَامِّ (তথা আম বিষয়ের

আলোচনার পর খাসের আলোচনা)-এর পর্যায় ভুক্তি যেমন কুরআনের মধ্যে মালায়িকা (مَلَائِكَة)-এর পর জিব্রাঈল আর মিকাইল (আ.)-এর বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَكْتَبُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَةُ يَكْتُبُ যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতা, জিব্রাঈল ও মীকাইল-এর শত্রু সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা, কাফিরদের শত্রু। শহীদকে এজন্য শহীদ বলা হয় যে, ফেরেশতাগণ তার সম্মানার্থে মওতের সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং مَشْهُودٌ -এর অর্থ হবে যেমন نَعْلَمُ مَفْعُولُ এর অর্থ ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যেহেতু بِالْحَبَّةِ لَهُ مَشْهُودٌ তথা জান্নাতী হওয়ার ওয়াদা আছে তাই তাকে শহীদ বলা হয়। তৃতীয় কারণ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যেহেতু জীবিত এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত তাই তাকে শহীদ বলা হয়। কেননা শহীদের অর্থও হাজির তথা বিদ্যমান থাকা। ফকীহগণের পরিভাষায় শহীদ বলা হয় যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিংবা যুদ্ধের মাঠে পাওয়া গেছে এবং তার শরীরে হত্যার নমুনাও রয়েছে কিংবা তাকে মুসলমানরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার কারণে দিয়াত ওয়াজিব হয়নি।

শহীদ দুই প্রকার। এক, আখিরাতের আহকামের দিক থেকে শহীদ, যদিও দুনিয়াবী আহকামের দিক থেকে তাকে গোসল ইত্যাদি দেওয়া হয়। দুই, দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় দিক থেকে শহীদ এমনকি তাকে গোসলও দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ: কুদূরী গ্রন্থকার বলেন, শহীদের অনেকগুলো সূরত রয়েছে। এক, কোনো মুসলমানকে মুশরিক লোকেরা হত্যা করেছে। আর তা কোনো অস্ত্র দ্বারা হোক কিংবা লাঠি দ্বারা হোক। দুই, কোনো মুসলমানকে যুদ্ধের মাঠে এমনভাবে মৃত পাওয়া গেছে যে, তার দেহে হত্যার চিহ্ন রয়েছে। তিন, কোনো মুসলমানকে মুসলমানরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার কারণে দিয়াত ওয়াজিব হয়নি। উপরোক্ত তিন সূরতের হুকুম হলো, সর্বসম্মতিক্রমে তাকে কাফন দেওয়া হবে আর যেহেতু সে উহদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত তাই তাকে সর্বসম্মতিক্রমে গোসল দেওয়া হবে না। তবে জানাযার নামাজের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে শহীদগণের জানাযার নামাজ পড়া হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে পড়া হবে না।

শহীদকে তো কাফন এ জন্য দেওয়া হবে যে, কাফন দেওয়া আদম সন্তানদের পুরুষদের জন্য সুন্নত। সুতরাং যদি শহীদগণের শরীরে কাপড় থাকে তবে তা খোলা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন، وَيُصَابِعُهُمْ زَيْلُوهُمْ يَكْفُونَهُمْ وَلَا تُصَابِعُهُمْ وَلَا تُكْفُونَهُمْ তাদেরকে গোসল দিওনা। অন্য হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যদি কেউ জখম হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ অবস্থায় সে উপস্থিত হবে যে, তার ঠং ো রক্তের অনুরূপ হবে তবে ব্রাণ হবে মিশক আবার অনুরূপ। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, যে ব্যক্তিকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, এবং সে পাক পবিত্র হয় এবং বালিগ ও বটে আর তার হত্যার কারণে আর্থিক (مَالِي) কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়নি, তবে সে উহদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে। তাই তাকেও তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

শহীদের জানাযার নামাজের ব্যাপারে আমাদের আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মতে শহীদের জানাজার নামাজও ফরজ কিফায়া। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে শহীদের জানাযার নামাজ নেই। তাঁর মতে জানাযার নামাজ হল মূলত মাইয়েতের জন্য সুপারিশ ও দোয়া। আর তরবারির আঘাত শহীদদের তামাম অপরাধকে মুছে ফেলে। সুতরাং যেহেতু তরবারি শহীদের অপরাধকে মুছে দিয়েছে, তাই তার জন্য আর সুপারিশ এবং দোয়ার প্রয়োজন নেই। এ জন্য বলা হয়েছে যে, শহীদের উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব হলো, মাইয়েতের উপর জানাযার নামাজ নিরোট দোয়ার জন্য পড়া হয় না বরং দোয়া ছাড়া মাইয়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর শহীদ তো সম্মান পাওয়ার অধিক যোগ্য। তাই অন্যান্য মাইয়েতের ন্যায় শহীদেরও জানাযার নামাজ পড়া হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর এই কথা বলা- “যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে পাক হয়ে গেছে তার দোয়ার প্রয়োজন নেই, সে দোয়ার অ-মুখাপেক্ষী” এ কথাটি ভুল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অধিক পবিত্র আর কে আছে? অ-প্রাপ্ত বয়স্ক শিশুও গুনাহ থেকে পাক। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাযা পড়া হয়েছে এবং শিতদের জানাযার নামাজ পড়াও ফরজ। সুতরাং যেহেতু নবী ও শিতের উপর নামাজ পড়া ফরজ সেহেতু শহীদের উপরও ফরজ হবে।

وَمَنْ قَتَلَهُ أَهْلَ الْحَرْبِ أَوْ أَهْلَ الْبَغْيِ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَبَيَّ شَيْءٌ قَتَلُوهُ لَمْ يُغْسَلْ لِأَنَّ شُهَدَاءَ أَحَدٍ مَا كَانَ كُلُّهُمْ قَتِيلَ السَّيْفِ وَالسَّلَاحِ وَلِأَنَّ الشَّهِيدَ الْجُنُبَ غُسِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يُغْسَلُ لِأَنَّ مَا وَبَّ جَنَابَةَ سَقَطَ بِالْمَوْتِ وَالثَّانِي لَمْ يَجِبْ لِلشَّهَادَةِ وَلَا بَيَّ حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَرَفَتْ مَا يَنْعَى غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَابَةَ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا اسْتَشْهَدَ جُنُبًا غَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ إِذَا طَهَرَتَا وَكَذَا قَبْلَ الْإِنْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرَّوَايَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ لَهُمَا أَنَّ الصَّبِيَّ أَحَقُّ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ وَلَهُ أَنَّ السَّيْفَ كَفَى عَنِ الْغُسْلِ فِي حَقِّ شُهَدَاءِ أَحَدٍ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طَهْرَةً وَلَا ذَنْبَ عَلَى الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُمْ -

**অনুবাদ :** যাকে হারবী লোক হত্যা করে কিংবা বিদ্রোহী কিংবা ডাকাতরা হত্যা করে, তাকে যে জিনিস দ্বারা ই হত্যা করুক গোসল দেওয়া হবে না। কেননা উহদের শহীদানদের সকলেই তরবারি বা লৌহস্ত্র দ্বারা নিহত হননি। জানাবাত অবস্থায় কেউ যদি শহীদ হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। সাহেবাইন বলেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা জানাবাত দ্বারা যে গোসল ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যুর কারণে রহিত হয়ে গিয়েছে। আর মৃত্যুর দরুন দ্বিতীয় গোসলটি অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী গোসলটি শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, শাহাদাত গোসল রোধকারী হিসাবে স্বীকৃত, লোপকারী নয়। সুতরাং তা জানাবাতকে লোপ করবে না। আর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে যে, হযরত হানাযালা (রা.) যখন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দান করেছিলেন। হায়িম ও নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যখন পবিত্র হয়ে (শাহাদাত বরণ করে) তখন তার সম্পর্কে একই মতভিন্তুতা রয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হায়িম বা নিফাস শেষ হওয়ার আগে শাহাদাত বরণ করলেও তার সম্পর্কেও একই মতবিরোধ রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। সাহেবাইনের দলিল হলো, শিশু তো এই মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, পবিত্র অবস্থায় থাকা হিসাবে উহদের শহীদানের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর তো গুনাহ নেই। সুতরাং সে উহদের শ্রেণীভুক্ত হবে না।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো মুসলমানকে বিধর্মী রাষ্ট্রের কাম্বিররা হত্যা করে কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রের বিদ্রোহীরা হত্যা করে কিংবা ডাকাতরা হত্যা করে এবং তা যে কোনো জিনিস দ্বারা ই হত্যা করুক-না কেন নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হবে। তাকে গোসল দেওয়া হবে না। দলিল হলো, উহদের শহীদগণ সকলে তরবারি ও অস্ত্র দ্বারা নিহত হননি বরং কাউকে তাদের মাথায় পাথর মেরে শহীদ করা হয়েছে, কাউকে লাঠির আঘাতে দ্বারা শহীদ করা হয়েছে। সুতরাং বুখা গেল শহীদ হওয়ার জন্য লোহার অস্ত্র দ্বারা নিহত হওয়া শর্ত নয়। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ডাকাত কিংবা বিদ্রোহী ব্যক্তির হাতে নিহত ব্যক্তি শহীদদের শ্রেণীভুক্ত হয় না এজন্য তাদের হাতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ না বলা উচিত। এর উত্তর হলো, আমাদেরকে যেমনভাবে কাম্বিরদের সাথে লড়াই করতে বলা হয়েছে এমনিভাবে বিদ্রোহীদের সাথেও লড়াই করতে বলা হয়েছে। তাইতো ইরশাদ হয়েছে **إِلَى أَمْرِ اللَّهِ** যারা বিদ্রোহ করে তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলো সে-ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাই কাম্বিরদের সাথে লড়াই করে মারা যাওয়া আর বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হওয়া একই

এর সমর্থন নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারাও হয়। হযরত হানযালা (রা.) যখন শহীদ হলেন তখন ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হানযালা কোন অবস্থায় ছিল? তাঁর বিবি বলেন, তিনি রাতে আমার সাথে সহবাস করেছিলেন। যখন যুদ্ধের ঘোষণা করে ভেসে আসল তখন গোসল ছাড়াই যুদ্ধে শারিক হয়ে গেছেন এবং শয়ীদ হয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন এটাই কারণ। এখানে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, গোসল দেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব, ফেরেশতাদের উপর নয়। সুতরাং জুনুবি শহীদকে যদি গোসল দেওয়া ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালাকে দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার নির্দেশ দিতেন? জওয়াব হলো, ওয়াজিব তো হলো শুধু গোসল দেওয়া। গোসলদাতা যেমনই হোক। লক্ষণীয় যে, যখন ফেরেশতাগণ আদম (আ.)-কে গোসল দিলেন তখন ওয়াজিব আদায় হয়ে গেছে। আদম সন্তান আদম (আ.)-এর গোসলের পুনরাবৃত্তি করেননি। ফেরেশতাগণের দেওয়া গোসল যদি অসম্পূর্ণ হতো তবে আদম সন্তানগণ আদম (আ.)-এর গোসলের পুনরাবৃত্তি করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালার গোসলের পুনরাবৃত্তি করতেন। একই মতবিধানে হায়য ও নিফাসরত্তে স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রয়েছে। অর্থাৎ যদি হায়য ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে তারা পাক হয়ে যায় কিন্তু এখানে গোসল করেনি, এ অবস্থায় শহীদ হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা ইমাম সাহেবের মতে শাহাদাত গোসলপ্রদায়কারী কিন্তু বিলাপকারী নয়। সাহেবাইন (রা.)-এর মতে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা গোসল প্রথমত মওতের কারণে লোপ পেয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি। অন্য বর্ণনা মতে যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে শহীদ হয়ে যায়, তবে ইমাম সাহেবের মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা রক্ত বন্ধ হওয়ার পূর্বে তার উপর গোসল-ই ওয়াজিব হয়েছিল। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী গোসল দেওয়া হবে। এটিই সহীহ বর্ণনা। কারণ মৃত্যুর কারণে রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আর প্রবাহিত রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় গোসলকে ওয়াজিব করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে যদি হত্যা করা হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে। সাহেবাইন (রা.)-এর মতে গোসল দেওয়া হবে না। সাহেবাইন (রা.) এর দলিল হলো, শহীদকে গোসল না দেওয়ার দর্শন হলো যাকে তার অত্যধারিত হওয়ার আছর বাকি থাকে। সুতরাং শহীদকে গোসল দেওয়া হয় না তার সম্মানার্থে। আর শিশুর ময়লুমিয়াত তার থেকেও অধিক তাই সে মর্যাদা লাভের অধিক উপযুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর দলিল হলো, শহীদানে উল্হদের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। কেননা তরবারির আঘাত ওনুহা'থেকে পাক পবিত্র করে দেয়। অর্থাৎ উল্হদের শহীদগণকে এ কারণে গোসল দেওয়া হয়নি যে, তরবারির আঘাত তাদেরকে ওনুহা'থেকে পাকসফ ও স্বচ্ছ করে দিয়েছে। আর যেহেতু শিশুর কোনো ওনুহাই নেই, তাই শিশু উল্হদের শহীদগণের শ্রেণীভুক্ত হবে না। আর যেহেতু তাদের মতো হবে না, তাই তাদের ন্যায় গোসলও বাদ যায় না। তাই শিশুকে গোসল দেওয়া হবে।

وَلَا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ لِمَا رَوَيْنَا وَيَنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ  
وَالْحَشْوُ وَالسَّلَاحُ وَالْحَبْلُ لَهَا لَيْسَتْ مِنْ جَنْسِ الْكَفَنِ وَيَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ  
مَا شَاءُوا إِنَّمَا لِلْكَفَنِ وَمَنْ ارْتَضَى غُسْلَ وَهُوَ مَنْ صَارَ خِلْقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ  
لِنَبِيلِ مَرَافِقِ الْحَيَوَةِ لِأَنِّ بِذَلِكَ يَخْفَ أَثَرُ الظُّلْمِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شَهِدَاءِ أَحَدٍ  
وَالْإِرْتِثَاقُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُدَاوِيَ أَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ لِأَنَّهُ نَالَ بَعْضَ  
مَرَافِقِ الْحَيَوَةِ وَشَهِدَاءُ أَحَدٍ مَاتُوا عَطَاشًا وَالْكَاسُ تُدَارُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا خَوْفًا  
مِنْ تَفْصَانِ الشَّهَادَةِ إِلَّا إِذَا حُمِلَ مِنْ مَضَرِّعِهِ كَيْلًا تَطَاهُ الْخَيُْولُ لِأَنَّهُ مَانَالٌ شَمِيمًا  
مِنَ الرَّاحَةِ وَلَوْ أَوَاهُ فَسُطَاطٌ أَوْ حِيَمَةٌ كَانَ مَرْتَضًا لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى مَضَى  
وَقْتُ صَلَوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ فَهُوَ مَرْتَضٌ لِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَوةَ صَارَتْ دِينًا فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مِنْ  
أَحْكَامِ الْأَحْيَاءِ قَالَ وَهَذَا مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ  
الْآخِرَةِ كَانَ إِرْتِثَاقًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ إِرْتِثَاقٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ  
الْأَمْوَاتِ -

অনুবাদ : শহীদের রক্ত ধোয়া হবে না এবং তার কাপড় চোপড়ও খোলা হবে না। এর দলিল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীস। তবে চর্মের বা তুলা ভর্তি পরিধেয় অস্ত্রসস্ত্র ও মোজা খুলে নেওয়া হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়। আর কাফনের কাপড় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন অনুযায়ী) ইচ্ছামত বাড়াবে কিংবা কমাবে। যে আহত ব্যক্তি জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভের পর মারা যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবনের আরাম ও সুবিধা গ্রহণের কারণে শাহাদাতের হুকুম লাভের ক্ষেত্রে (কিছুটা সময় ক্ষেপণ করে) পুরনো হয়ে গেছে। কেননা এ কারণে জলমের চিহ্ন কিছুটা লঘু হয়ে গেছে। ফলে সে উহদের শহীদের শ্রেণীভুক্ত হবে না। “সুযোগ সুবিধা” গ্রহণের অর্থ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিন্দা যাওয়া, ঔষধ (ও চিকিৎসা) গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (নিরাপদ স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া। কেননা এভাবে সে জীবনের কিছু সুবিধা ভোগ করল। আর উহদের শহীদগণ পানির পেয়ালা তাদের সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও পিপাসার্ত অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় তারা (পানিটুকু) ও গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কোনো আহত ব্যক্তিকে এ কারণে আহত হওয়ার স্থান থেকে তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয় (তবে তা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না)। কেননা সে কোনো প্রকার আরাম লাভ করেনি। আর যদি কোনো শিবিরে বা তাঁবুতে এনে রাখা হয় তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সে সুবিধা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সে সজ্ঞানে বেঁচে থাকে তবে সে সুবিধা গ্রহণকারী হলো। কেননা উক্ত নামাজ তার জিম্মায় ঋণ হয়ে গেল। আর তা জীবিতদের সাথে সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। যদি আখিরাত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অসিয়ত করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সেও সুবিধা গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। কেননা এটাও সুবিধা গ্রহণ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা অসিয়ত করা তো মাইয়েতের আহকামভুক্ত বিষয়।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শহীদের শরীরে যদি চমড়ার কোনো পোষাক থাকে কিংবা তুলা ভর্তি কোনো পোশাক থাকে কিংবা অস্ত্রসহ বা মোজা থাকে, তবে এগুলো খুলে নেওয়া হবে। এটা হান্নাফী আলিমগণের মায়হাব। ইমাম শাফি'ই (র.) বলেন, শহীদের শরীর থেকে কোনো জিনিস সরানো যাবে না। তার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- **زَمِلُوهُمْ الْغ** অর্থাৎ শহীদগণকে তাদের কাপড়ে দাফন করো। এর মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোন ধরনের কাপড়ে দাফন করা হবে বা কোন ধরনের কাপড়ে করা হবে না এবং কোন ধরনের কাপড় খুলে নেওয়া হবে। উক্ত হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় যে, শহীদের শরীর থেকে কোনো জিনিস খুলে নেওয়া হবে না। আমাদের দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস—

**قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ أَحَدٍ أَنْ يُنَزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَانِهِمْ وَيَسَابِهِمْ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের শহীদানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন, তাদের শরীর থেকে লৌহা ও চর্মের পোশাক খুলে ফেলা হয় এবং যেন রক্ত ও পোষাক সহ তাদেরকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয় একটি অপরটির বিপরীত। এজন্য উভয়টি রেখে কিয়াসের শরণাপন্ন হলাম। কিয়াস বলে চর্মের পোশাক ইত্যাদি খুলে ফেলা হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়। শহীদের শরীরে যদি সুল্লত সংখ্যার চেয়ে কম কাপড় হয়, তবে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে যাতে করে সুল্লত পরিমাণ সংখ্যা পূরা হয়ে যায়। আর যদি সুল্লত সংখ্যার অতিরিক্ত কাপড় থাকে তবে কম করবে যাতে করে সুল্লত পরিমাণ সংখ্যা অবশিষ্ট থেকে যায়।

ثَوْبُ-এর অর্থ কোনো কিছু পুরানো হয়ে যাওয়া। সূরতে মাসআলা হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যদি আঘাতগ্রস্ত হওয়ার পর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে তবে বলা হবে যে, এই শহীদ ব্যক্তি পুরানা হয়ে গেছে। আর যেহেতু জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভের কারণে আঘাতের চিহ্নও লঘু হয়ে গেছে তাই সে উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হবে না। আর যেহেতু সে উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত থাকল না তাই তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা গোসল ঐ সকল শহীদকে দেওয়া হয় না যারা উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, **زِنَات** হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বের কিছু খাদ্য গ্রহণ করা কিংবা নিদ্রা যাওয়া কিংবা চিকিৎসা গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা। কেননা এর দ্বারা সে জীবনের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করল। অথচ উহদের শহীদানদের অবস্থা তো এই ছিল যে, পানি তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল কিন্তু তারা শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকায় তা গ্রহণ করেননি এবং এমনি-ভাবে দুকতে তার জান দিয়ে দিয়েছেন। তবে যদি কোনো শহীদকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এ জন্য তুলে আনা হয়, যাতে সে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয়ে যায় তবে এটা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। কেননা সে কোনো ধরনের আরাম লাভ করেনি। আর যদি তাকে ছোট বা বড় তাঁবুতে এনে রাখা হয় তবে সে সুযোগ গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি শহীদ ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং এই অবস্থায় সে জীবিত ছিল যে তার জ্ঞান বাকি ছিল তবে সে-ও সুবিধা গ্রহণকারী হবে। কেননা এই নামাজ তার জিম্মায় ঋণ হিসাবে বাকি থাকবে। আর নামাজ কারো জিম্মায় ঋণ হয়ে যাওয়া দুনিয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি যদি আখিরাতে সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অসিয়ত করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে-ও সুবিধা গ্রহণকারী হবে। কেননা এটাও ছওয়াব অর্জনের সুযোগ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা এটা মাইয়েতের আহকামভুক্ত বিষয়।



وَمَنْ وَجَدَ قَتِيلًا فِي الْمِصْرِ غُسِلَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالِدِيَّةُ فَخَفَّ أَثَرُ الظُّلْمِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَتِلَ بِحَيِّدَةٍ ظُلْمًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ وَالْقَاتِلُ لَا يَتَخَلَّصُ عَنْهَا ظَاهِرًا رِثًا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْعُقُوبَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (رح) مَا لَا يَلْبَثُ كَالسَّيْفِ وَيَعْرِفُ فِي الْجَنَائِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

অনুবাদ : যাকে নগরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো কাসামাহ ও দিয়াত। সুতরাং এতে করে তার জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে যায়। তবে যদি জানা যায় যে, তাকে লৌহস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। (এমতাবস্থায় গোসল দেওয়া হবে না) কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো কিসাস যা একটি শাস্তি। আর হত্যাকারী বাহ্যত কোনক্রমেই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে অস্ত্রে প্রাণ সংহার বিলম্বিত হয় না, তা তলোয়ারের হুকুমভুক্ত। ইনশাআল্লাহ جنایات (অপরাধসমূহ) অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলা : যদি কোনো নিহত ব্যক্তিকে শহরে পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী জানা নেই, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা এই সুরতে মহল্লাবাসীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং এই দিয়াতের ফায়দা মাইয়েত পাবে। তাই নিহত ব্যক্তি যদি ধনী হয় তবে এর দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। সুতরাং দিয়াতের ফায়দা যেহেতু মাইয়েতের হাসিল হলো তাই তার উপর থেকে জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে গেল, আর যেহেতু এই নিহত ব্যক্তি পরিপূর্ণ মজলুম থাকল না সেহেতু সে উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্তও হবে না। এবং শহীদানের উহদের ন্যায় তার থেকে গোসল বাদ যাবে না। তবে যদি জানা যায় যে, সে ধারাল কোনো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে এবং হত্যাকারীও জানা আছে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা এ সুরতে কিসাস ওয়াজিব। আর কিসাস হলো শাস্তি, বিনিময় নয়। আর যেহেতু কিসাস হলো শাস্তি বিনিময় নয় সেহেতু জুলুমের প্রতিক্রিয়াও হালকা হবে না; বরং নিহত ব্যক্তি পূর্ণরূপে মজলুম বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু সে পূর্ণরূপে মজলুম তাই উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে তাকেও গোসল দেওয়া হবে না। তবে হত্যাকারীও বাঁচতে পারবে না। কারণ হত্যাকারী যদি ধরা পড়ে তবে দুনিয়াতেই সাজা পাবে। আর যদি ধরা না পড়ে তবে আখিরাতে সাজা পাবে। মোটকথা, যদি হত্যার কারণে হত্যাকারী কিংবা হত্যাকারীর অভিভাবক কিংবা তার আকিলার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় তবে হত্যাকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে শহীদ হবে না। সাধারণ মানুষের ন্যায় তাকেও গোসল দেওয়া হবে। আর যদি হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয় তবে নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে এবং তাকে গোসল দেওয়া হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়। প্রশ্নটি হলো, যার হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হলো সে ব্যক্তি উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা উহদের শহীদানের হত্যার কারণে কোনো জিনিস ওয়াজিব হয়নি। আর যে ব্যক্তি উহদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত নয় তাকে গোসল দেওয়া হবে। সুতরাং তাকেও গোসল দেয়া উচিত যার হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হয়? এর জওয়াব হলো, কিসাসের ফায়দা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক আর সমস্ত মানুষ পায়, নিহত ব্যক্তি পায় না। সুতরাং যেমনিভাবে উহদের শহীদানের কোনো ফায়দা হাসিল হয়নি এমনভাবে তাদেরও কোনো লাভ হয়নি। এর বিপরীত হলো দিয়াত। কেননা দিয়াতের লাভ নিহত ব্যক্তি পায়। এমনকি দিয়াতের মাল দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। আর যদি অসিয়ত থাকে তা-ও পূরণ করা হয়। সাহেবাইন বলেন, যে সকল অস্ত্র প্রাণ সংহারে বিলম্ব করে না সেগুলোও তরবারির হুকুমভুক্ত। অর্থাৎ শহরে যদি কোনো নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারীও জানা থাকে এবং আরো জানা আছে যে, ধারালো অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো ভারী পাথর কিংবা লাঠি দ্বারা মারা হয়েছে, তবে সাহেবাইনের মতে হত্যাকারীর উপর কিসাসও ওয়াজিব হবে। আর যেহেতু অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তাই সে শহীদ হওয়ার কারণে তাকে গোসলও দেওয়া হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ধারালো অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো ভারী অস্ত্র দ্বারা হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। মোটকথা, কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য ইমাম সাহেবের মতে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা শর্ত। আর সাহেবাইনের মতে শর্ত নয়। বিস্তারিত আলোচনা জিনায়াত অধ্যায়ে করা হবে।

وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَاذِلٌ نَفْسَهُ لِإِنْفَاءِ حَقِّ مُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ وَشَهِدَاءُ أَحَدٍ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِإِنْفَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَلْحَقُ بِهِمْ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبَغَاةِ أَوْ قُطِّعَ الطَّرِيقُ لَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلِيًّا لَمْ يَصَلَّ عَلَى الْبَغَاةِ -

অনুবাদ: যাকে হদ বা কিসাস হিসাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে। কেননা সে তার উপর সাব্যস্ত হক আদায় করার জন্য স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেছে। অথচ উহুদের শহীদগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। যে সকল বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত নিহত হয় তাদের উপর জানাযা পড়া হবে না। কেননা আলী (রা.) বিদ্রোহীদের উপর জানাযা পড়েননি।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি হদ কিংবা কিসাস হিসাবে কতল হয় তবে তাকে গোসলও দেওয়া হবে এবং তার জানাযাও পড়া হবে। কেননা সে তার উপর ওয়াজিব হককে আদায় করার জন্য আপন জান দিয়ে দিয়েছে। আর উহুদের শহীদগণ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এ জন্য হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত ব্যক্তিকে উহুদের শহীদানদের সাথে যুক্ত করা যাবে না। তা ছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত মায়ীযে আসলামী (রা.)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। তখন তাঁর চাচা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন **فُتِلَ مَا عَزَّ كَمَا يُفْعَلُ الْكِلَابُ فَمَاذَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعُ** -এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন **لَا تُفْلَ مِنْهَا** আল্লাহর রাসূল! মায়ীযকে কুকুরের ন্যায় হত্যা করা হয়েছে। বলুন এখন আমি কি করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন **أَمِنْ هَذَا** এমনটি বল না, সে তওবা করেছে। এমন তওবা করেছে যে, তার তওবা যদি সমগ্র জমিনবাসীকে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যাও, তাকে গোসল দাও এবং তার জানাজা পড়।

আর যদি কোনো বিদ্রোহী বা ডাকাত নিহত হয়, আমাদের মতে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে না। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, পড়া হবে। তাঁর দলিল হলো, বিদ্রোহী আর ডাকাত মু'মিন। ওয়াজিব হকের জন্য হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেল যাকে প্রস্তরাঘাত কিংবা কিসাস হিসাবে হত্যা করা হয়েছে। উপরোক্ত পৃষ্ঠা গুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, হদ কিংবা কিসাস হিসাবে নিহত ব্যক্তির উপর জানাযা পড়া হবে। সুতরাং বিদ্রোহী ও ডাকাতও নিহত হলে তার জানাযার নামাজ পড়া হবে। আমাদের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.) খারেজীদেরকে গোসল দেননি এবং তাদের জানাযাও পড়েননি। অথচ খারেজীবা বিদ্রোহী ছিল। হযরত আলী (রা.)-কে বলা হয়েছিল **كُنْفَارٌ** তারা কি কাফির? হযরত আলী (রা.) বলেন **لَا وَلَكِنَّهُمْ إِخْوَانُنَا بَغَاةٌ عَلَيْنَا**, তবে তারা আমাদের ভাই। আমাদের সাথে বিদ্রোহ করেছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, বিদ্রোহী ও ডাকাতদেরকে গোসল না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়া। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং অন্যদেরকে সজাগ করার জন্য করা হয়। যেমন ডাকাতদেরকে তিনদিন পর্যন্ত শুলীতে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, শুলীতে এ কারণে চড়ানো হয়, যাতে তার শাস্তি হয় এবং অন্যরা সতর্ক হয়। আল্লাহই সম্যক অবহিত।

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرَضُهَا وَنَفْلُهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا وَلِمَالِكٍ فِي  
الْفَرَضِ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي جُوفِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ اسْتَجْمَعَتْ  
شَرَائِطَهَا لَوْجُودِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِنَّ صَلَّى الْإِمَامُ  
بِجَمَاعَةٍ فِيهَا فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازٍ لِأَنَّهُ مُتَوَجَّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَا  
يَعْتَقِدُ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرُّيِ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ  
الْإِمَامِ لَمْ تَجْزِ صَلَاتُهُ لِتَقْدِيمِهِ عَلَى إِمَامِهِ وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلُّوا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ  
مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّأْخُرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ  
عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَانِبِ .

### পরিচ্ছেদ : কাবার অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করা

অনুবাদ : কাবার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ। উভয় বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) -এর  
ভিন্ন মত রয়েছে। আর শুধু ফরজের ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের দলিল রাসুলুল্লাহ  
ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করেছেন। আর এ কারণে যে, অভ্যন্তরীন নামাজের  
যাবতীয় শর্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। এতে কিবলামুখী হওয়াও পালিত হয়েছে। কেননা, সমগ্র কা'বা সম্মুখে রাখা শর্ত নয়।  
ইমাম যদি কা'বার ভিতরে জামাআতের ইমামতি করেন, আর তখন মুক্তাদীদের কেউ ইমামের পিঠের দিকে নিজের  
পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় তবুও নামাজ জায়েজ হবে। কেননা সে কিবলামুখী রয়েছে এবং আপন ইমামকে ভুলের উপ-  
রয়েছে বলেও মনে করে না। চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত। আর তাদের মাঝে যে ইমামের  
চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা সে ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। ইমাম  
যদি মাসজিদুল হারামে নামাজ পড়ান আর লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে বৃত্তাকারে করে দাঁড়ায় এবং  
ইমামের নামাজে ইকতিদা করে তাহলে তাদের মধ্যে যে কা'বার দিকে ইমামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হবে, তার  
নামাজও জায়েজ হবে, যদি সেই পাশে দাঁড়িয়ে না থাকে, যে পাশে ইমাম আছেন। কেননা একই পার্শ্বে হওয়া  
বেলায়ই অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পাবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

**পূর্ব কথা :** **كَتَابُ الصَّلَاةِ** -এর শেষ পর্যায়ে এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সালাত অধ্যায়ের সমাপ্তি একটি বরকতপূর্ণ জিনিস দ্বারা হয়। বায়তুল্লাহর নাম কা'বা এ কারণে রাখা হয়েছে যে, কা'বা শরীফ চৌকোণ বিশিষ্ট। তাই কা'বা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

**الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ** : আমাদের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল উভয় নামাজ জায়েজ। ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে উভয়টি নাজায়েজ। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নফল জায়েজ, ফরজ জায়েজ নয়। হিদায়া গ্রন্থকার লিখেছেন কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ ও নফল জায়েজ না হওয়ার নিসবত ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর দিকে করা লেখকের (কاتب) ভুল। কেননা আসহাবে শাফি'ঈ তাদের কিতাবগুলোর মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাব জায়েজ হওয়া লিখেছেন, নাজায়েজ হওয়া নয়। এর জওয়াব হলো, কা'বার দরজা যদি খোলা থাকে আর সামনে সুতরাহ না থাকে তবে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ নফল পড়া ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। আর যদি কা'বার দরজা বন্ধ থাকে কিংবা সামনে সুতরাহ থাকে তবে জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) দলিল দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়ে সে কা'বার এক অংশের ইস্তিকবাল করে আর অপর অংশের ইস্তিদবার করে। সুতরাং নামাজের অবস্থায় ইস্তিকবালে কিবলার তাকায়া হলো, নামাজ সহীহ হয়ে যাওয়া। আর ইস্তিদবার-এর তাকায়া হলো নামাজ ফাসিদ হয়ে যাওয়া। তাই সতর্কতামূলক আমাদের দিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের চাহিদা নফলের ক্ষেত্রে এটাই ছিল যে, নফলও কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ না হওয়া। তবে যেহেতু নফলের ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, এ জন্য নফলের ক্ষেত্রে কিয়ামকে বর্জন করা হয়েছে। তা ছাড়া নফলের ভিত্তিও কিছুটা সহজ ও আসানীর উপর করা হয়েছে তাইতো দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়া জায়েজ। আর ফরজ যেহেতু নফলের শ্রেণীভুক্ত নয় এ জন্য ফরজকে নফলের সাথে যুক্ত করে কা'বার অভ্যন্তরে ফরজ পড়ার ইজাযত দেওয়া হয়নি। আমাদের দলিলে হলো, মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতর দুই রাকআত নফল আদায় করেছেন। হাদীসটি হলো -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا قَالِ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالِ جَعَلَ عُمُودَ بَيْنَ عَنِّي بِسَارِهِ وَعُمُودًا عَنِّي بِيَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدٍ وَرَأَى ثُمَّ صَلَّى وَكَانَ الْبَيْتُ يُؤْمِنُ عَلَى رِجْلَيْهِ أَعْمِدٌ وَكَانَ هَذَا يَوْمَ الْفَتْحِ .

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ উসামা, বিলাল এবং ওসমান ইবনে তালহা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। ততঃপর তাঁরা কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে তাঁরা অবস্থান করলেন। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি বিলাককে জিজ্ঞাসা করলাম যখন বিলাল বাইরে বের হয়ে আসলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ কি কি আমল করেছেন? বিলাল বললেন, দু'টি খুঁটি তিনি বাম দিকে রাখলেন, একটি ডান দিকে আর তিনটি পিছনের দিকে রাখলেন। তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন। তখন বায়তুল্লাহর ছয়টি খুঁটি ছিল। আর ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের দিন ছিল। যদি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া নাজায়েজ হতো তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কা'বার ভিতর নামাজ পড়তেন না। এখন আপনারা যদি বলেন যে, তা নফল ছিল তবে এর জওয়াবে আমরা বলব জায়েজ হওয়ার যে সকল শর্ত নফলের রয়েছে সেগুলো ফরজেরও বাটে। এ জন্য ফরজও নফলের শ্রেণীভুক্ত হবে। সুতরাং নফলের ন্যায় ফরজও কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ হবে। দ্বিতীয় দলিল হলো, যে নামাজ কা'বার অভ্যন্তরে পড়া হয়েছে তার মধ্যে নামাজের সমগ্র শর্ত ছিল, এমনকি ইস্তিকবালে কিবলাও পাওয়া গিয়েছে। কেননা সমস্ত কা'বা সামনে রাখা শর্ত নয়, আর এটা সম্ভবপরও নয়।

**فَوَانَ صَلَّى :إِسْمَاءُ بِحَمَاعِ** : কা'বার ভিতরে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার চারটি সূরত রয়েছে। (১) মুক্তাদীর চেহারা ইমামের পিঠের দিকে হবে। (২) মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে হবে। (৩) মুক্তাদীর পিঠ ইমামের পিঠের

দিকে হবে। (৪) মুক্তাদীর পিঠ ইমামের মুখের দিকে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সুরত জায়েজ ছাড়াই জায়েজ। দ্বিতীয় সুরত কারাহাত সহ জায়েজ। আর চতুর্থ সুরত একেবারেই জায়েজ নেই। প্রথম সুরত জায়েজ হওয়া তো যাহির। দ্বিতীয় সুরত এ জন্য জায়েজ যে, ইমামের অনুসরণ পাওয়া গেছে। আর প্রতিবন্ধক তথা ইং : ... যাওয়া পাওয়া যায়নি। এ সুরতে কারাহাত এ জন্য যে, যখন মুক্তাদীর চেহারা ইমামের চেহারার দিকে হবে তাহলে সুরত তথা ছবি সামনে রেখে ইবাদতকারীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই উক্ত সুরতে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে সূতরাহ রাখা সমীচীন হবে। তবেই ঐ সাদৃশ্য থেকে বাঁচা যাবে। তৃতীয় সুরত জায়েজ হওয়ার কারণ হিদায়া গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, মুক্তাদী কিবলামুখী ও এবং সে নিজের ইমাম ভুলের উপর রয়েছে বলেও মনে করে না এবং নিজের ইমামের আগ্রহও না। এর বিপরীত হলো তাহাররীর মাসআলাটি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ে এই ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ করেছে আর সে ইমামের হালাতও জানে, তবে এই মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা তার আকীদা হলো ইমাম ভুলের উপর রয়েছেন। চতুর্থ সুরত জায়েজ না হওয়ার কারণটি যাহির। কেননা এ সুরতে মুক্তাদী তার ইমামের আগে হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, এটাতো একেবারেই জায়েজ নেই।

ফায়দা : যে মুক্তাদী ইমামের ডানে কিংবা বামে থাকবে তার নামাজও জায়েজ হবে।

وَرَأَى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ : মাসআলা, ইমাম মসজিদে হারামে ইমামত করে নামাজ পড়াল, লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে দাঁড়াল এবং ইমামের ইক্তিদায় নামাজ পড়ল, তবে যে দিকে ইমাম নেই সে দিকে যদি মুক্তাদী ইমামের তুলনায় কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয় তবে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু যে দিকে ইমাম আছে সেদিকে যদি ইমামের তুলনায় কা'বার অধিক নিকটবর্তী হয় তবে উক্ত মুক্তাদীর নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায় অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পায়। সুতরাং ইমামের দিকে যে মুক্তাদী ইমামের তুলনায় কা'বার নিকটবর্তী হবে এতে সে ইমামের আগে হয়ে যাবে। আর যে মুক্তাদী তার ইমামের আগে হবে তার নামাজ জায়েজ হবে না। আর যে দিকে ইমাম নেই সে দিকে অগ্রবর্তিতা প্রকাশ পায় না। এ জন্য এদিকের লোকদের নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে।

وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ  
الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ إِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُونَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ يُنْقَلُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى  
عَلَى جَبَلٍ أَبِي قُبَيْسٍ جَازَ وَلَا بِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ  
التَّعْظِيمِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

**অনুবাদ :** যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে তার নামাজ জায়েজ। এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণ, আমাদের মতে কা'বা হলো আসমান পর্যন্ত খোলা স্থল ও শূন্য স্থান, ভবন নয়। আর ভবন তো স্থানান্তরিতও হতে পারে। এ জন্যই তো কেউ জাবালে আবু কুবায়স-এর চূড়ায় উঠে নামাজ আদায় করলে তার নামাজ জায়েজ হবে। অথচ ভবন তো তার সম্মুখে বিদ্যমান নেই। তবে মাকরুহ হবে। কেননা এতে কা'বার প্রতি অসম্মান করা হয় এবং এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের মতে কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া জায়েজ আছে, যদিও তার সামনে সুতরাহ না থাকে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া জায়েজ নেই, তবে যদি সামনে সুতরাহ থাকে তাহলে জায়েজ হবে। উক্ত ইখতিলাফের ভিত্তি হলো, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে নামাজের মধ্যে কা'বার ভবনের দিকে ফিরে দাঁড়ানো জরুরি। আমাদের মতে কিবলা নাম হলো কা'বা, কা'বা ভবনের নাম নয়; বরং ঐ স্থান যেখানে কা'বার ভবন আছে সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত পুরো খোলা ও শূন্যের নাম হলো কা'বা। ভবনের নাম কা'বা এ কারণে নয় যে, ভবন স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই কেউ যদি জাবালে আবু কুবায়সের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হবে। অথচ তার সামনে ভবন ইত্যাদি কিছুই নেই। এমনিভাবে যদি কা'বা থেকে অনেক উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়েও নামাজ আদায় করে তবে তাও জায়েজ হবে। তবে এতটুকু তো অবশ্যই ধর্তব্য যে, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া মাকরুহ। কারণ হলো, কাবার ছাদের উপর উঠার দ্বারা কা'বার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ জন্য মাকরুহ বলা হয়েছে। তা ছাড়া কাবার ছাদের উপর নামাজ পড়া থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ الْمَجْرَزَةِ وَالْمَرْبَلَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالْحِمَامِ وَقَوَارِعِ الطَّرِيقِ وَمَعَاطِنِ الْأَيْلِ وَقَوْفَ ظَهْرِ نَبْتِ اللَّهِ تَعَالَى .

আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত জায়গায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন— (১) মাযবাহ তথা জবাইয়ের স্থান (২) ডাক্তারি (৩) কবরস্থান (৪) গোসলখানা (৫) রাস্তার মাঝখান (৬) উট বাঁধার স্থান (৭) বায়তুল্লাহর ছাদ। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কা'বার ছাদের উপর নামাজ পড়া নিষেধ। আল্লাহই সত্যক অবহিত।

اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْخَوَّابُ الرَّجِيمُ .